বৈশাখ—১৩২৯

পঞ্চবিংশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

আর্য্য-দর্পণ

সনাতনধর্ম্মের মুখপত্র

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্নিজরতান্বিপশ্চিতা-
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ ॥

সূচী

আর্য্য-দর্পণের নিয়মাবলী

আর্য্যদর্পণে সাধারণতঃ ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ২।।০ টাকা মাত্র, নমুনার জন্য ।১০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও বর্ষারম্ভ হইতে পত্রিকা লইতে হয়।

আর্য্যদর্পণ প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও মাসের পত্রিকা যথাসময়ে না পাইলে ডাক ঘরে অনুসন্ধান করিয়া ডাকবিভাগের উত্তরসহ পরবর্ত্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে জানাইলে সেই সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

পত্র ব্যবহারকালে গ্রাহক নম্বর না দিলে কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না। গ্রাহক নম্বর পত্রিকার মোড়কের উপর হাতের অক্ষরে লেখা থাকে।

আর্য্যদর্পণে লেখকের নাম প্রকাশ হয় না, সুতরাং সমস্ত লেখাই সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হয়। এজন্য প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। টিকিট ও শিরোনামাযুক্ত খাম দিলে অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয়।

টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, বিনিময়পত্রাদি নিম্নঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

"আর্য্য-দর্পণ"—কার্য্যালয়
পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম)

ঋষি-বিদ্যালয়

(অধস্তন বিভাগ)

আধুনিক শিক্ষার সহিত প্রাচীন রীতি নীতির সংযোগে যাহাতে ছাত্রের সর্ব্ববিধ শিক্ষা পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। আশ্রমের সম্পূর্ণ নিয়মাধীনে রাখিয়া ছাত্রগণকে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্কুলের নির্দ্ধারিত সময় ছাড়া সব সময়েই ছাত্রেরা আশ্রমের নিয়মানুকূলে উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। অন্তেবাসিগণ যাহাতে মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষভাবে বুৎপন্ন হইতে পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময় তাহারা আপন আপন গৃহে যাইতে পারিবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যানুকূল নিয়মাদি কোন প্রকারেই ভঙ্গ করিতে পারিবে না। ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালককেই এই বিভাগে গ্রহণ করা হইবে। আশ্রমে উৎসর্গীকৃত ছাত্রের ব্যয় ভার আশ্রমই বহন করেন, অপরের জন্য মাসিক খরচ সর্ব্বপ্রকারে ১০্ টাকা। অভিভাবকগণ নিম্নের যে কোন ঠিকানায় আবেদন করুন।

অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয়, উত্তর বাঙ্গালা
সারস্বত আশ্রম, পোঃ বগুড়া

অধ্যক্ষ—ঋষি-বিদ্যালয়, দক্ষিণ বাঙ্গালা
সারস্বত আশ্রম, পোঃ হালিসহর
(২৪ পরগণা)

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়তাম্বিপশ্চিতা
মর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ ॥
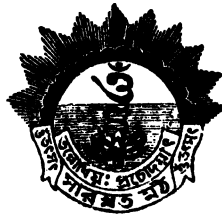
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে
তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

পঞ্চবিংশ বর্ষ—১৩৩৯

সম্পাদক—শ্রীমৎ সত্যচৈতন্য ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২॥০ প্রতি সংখ্যা—।০

বর্ষ-সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

নববর্ষে

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥

—হে অগ্নি, শোভন পথ দিয়া তুমি আমাদিগকে সম্পদের দিকে লইয়া যাও। হে দেবতা, তুমি আমাদের সকল কর্ম্মই তো জান। কুটিল পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে অপসারিত কর; আমরা বার বার তোমার প্রণতি-গাথা গাহিতেছি।

বর্ষমুখে অগ্নিরই আবাহন করি, কেননা ইনিই যথার্থ যৌবনের দেবতা। ঋষি বলিতেন, হে অগ্নি, তুমি চিরপুরাতন হইয়াও চিরযুবা, তোমার শিখা তো

কখনো ম্লান হয় না। অগ্নি স্বয়ং শুধু যুবক নন, তিনি যাহাকে স্পর্শ করেন, তাহাকেও অগ্নিময় করিয়া তাহার মাঝে যৌবন-শ্রী ফুটাইয়া তুলেন। হে অনন্ত-যৌবন-প্রাণ স্বরূপ! আবিরাবির্ম এধি— আমাদের মাঝে আবির্ভূত হও। মৃত আবর্জ্জনা-স্তূপের মত আমরা পড়িয়া আছি, আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার স্পর্শে আমাদের দীপ্ত সচেতন করিয়া তোল।* আমাদের এই জড়ত্বের মূলে যে তুমিই চেতনা রূপে লুকাইয়া রহিয়াছ, একবার তাহা বুঝাইয়া দাও।

"সুপথা নয়" —শোভন পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও—"রায়ে নয়"—সম্পদের দিকে আমাদিগকে লইয়া যাও। কোন পথ সুপথ, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। এই শুধু বুঝি, প্রাণের আগুণ দীপ্ত হইয়া যে-পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, সেই পথই সুপথ। সে পথে প্রতিপদক্ষেপে মৃত্যুর বিভীষিকা করাল ছায়া বিস্তার করিলেও তাহাই আমাদের সুপথ। আজ আরামের পথ চাহি না, চাই আগুণের পথ। পথ চলিতে চলিতে যদি প্রাণ দীপ্ত হইয়া উঠে, সেই দীপ্তিতে চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তবেই বুঝিব, অগ্নিস্বরূপের অনুচর আমরা সুপথ ধরিয়াই চলিয়াছি বটে! ভয় আমাদিগকে চিরকাল শাসন করিয়া আসিয়াছে, দিশারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথের সন্ধান পাই নাই, ভার-বাহী বলীবর্দ্দের মত শ্রান্তচরণে তথাকথিত সনাতন পথে চক্ষু বুজিয়া গড়াইয়া চলিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি, একবার জিজ্ঞাসা করিবার পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হয় নাই; —আজ হে অগ্নিস্বরূপ, তোমার স্পর্শে আমাদের সে মোহ ছুটিয়া যাক্। উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলিতে জ্বলিতে ধ্রুবের পানে ছুটিয়া চলি, প্রতিপদক্ষেপে চলার আনন্দকে বীর্য্যের সহিত, দীপ্তির সহিত অনুভব করি। সংস্কারের পথকে সুপথ বলি না, যে পথে আগুণ জ্বলিয়া ওঠে সেই পথই সুপথ! হে দেবতা, সেই পথে তুমি আমাদের লইয়া চল।

"রায়ে নয়!"— ঐশ্বর্য্যের দিকে আমাদিগকে লইয়া চল।— হাঁ, ঐশ্বর্য্য চাই বই কি, শক্তি চাই বই কি! মিথ্যা বৈরাগ্যের ভাণ ধরিয়া বলিতে চাহি না,— নিঃস্ব হওয়াই জীবনের পরম সার্থকতা! সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কেবল দারিদ্র্যের আরাধনাই করিয়া আসিয়াছি, বৈরাগ্যের আবরণে নিজের নির্ব্বীর্য্য-তাকে ঢাকিয়া আসিয়াছি, তাই আজ আমাদের মত হতভাগা আর দুনিয়ায় দুটা নাই। হে পুরোহিত, তুমিই যে রত্নধাতম, শ্রেষ্ঠ রত্নের ভাণ্ডারী যে তুমি, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। সে শ্রেষ্ঠ রত্ন যে শুধু আধ্যাত্মসম্পদ, তাহা বলিতে

চাহি না। তুমি অন্তরেও রত্নধা, বাহিরেও রত্নধা। সমস্তটা জাতিই যদি আপাদ মস্তক আধ্যাত্মিক হইয়া ওঠে, তাহা হইলে সে যে সুপথে চলিয়াছে এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। শুধু মোক্ষকে লইয়া চতুর্ব্বর্গের পূর্ণাদর্শ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া একদিকে অর্থকাম, আর একদিকে মোক্ষ — এই হিন্দুর চতুর্ব্বর্গের আদর্শ। ব্যক্তিগত আদর্শে অর্থকাম হেয়, মোক্ষ উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু জাতিগত আদর্শে সকলেরই সমান স্থান রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। বৈদিক ঋষির "তোকং চ তনয়ং দেহি," আর শক্তিসাধকের "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"— উপেক্ষার বিষয় নয়। নিজের ভোগের জন্য ঐশ্বর্য্য না চাহিতে পারি, কিন্তু জাতিকে, দেশকে ঐশ্বর্য্যশালী দেখিতে চাই বই কি! অতএব আমার জন্য না হোক, আমাদের জন্যই বলি, হে অগ্নে— রায়ে নয়। ঐশ্বর্য্যের দিকে আমাদিগকে লইয়া চল।

হে সত্যস্বরূপ! তোমার নিকট আর একটা প্রার্থনা, কুটিল পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও। সত্যের পথ সহজ পথ, শক্তির পথও সহজ পথ। আমাদের জীবনে যেন কুটিলতার ছায়াপাত না হয়। বিবর-সঞ্চারী মূষিকের মত নানা কুটিল অভিসন্ধির অন্ধপথে আমরা চলিতে চাহি না— আমাদের জীবন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হউক, আমাদের কথায় ও কাজে কোথায়ও যেন অস্পষ্টতার লেশ মাত্র না থাকে। আমরা সত্যের সাধক— যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, অকুণ্ঠ চিত্তে তাহা প্রচার করিব, নির্ভীক চিত্তে তাহার সাধনা করিব।

হে দেবতা, তুমি সেই বীর্য্য আমাদের দাও—যুযোধি অস্মদ্ জুহুরাণাম্ এনঃ —কৌটিল্যের পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও।

আত্মস্বরূপ! নববর্ষে এই লও আমাদের প্রাণের আবৃত্তি—"ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেমঃ।"

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জ্ঞান ও কর্ম্ম

কর্ম্ম বড় না জ্ঞান বড় এই লইয়া মহা বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। জ্ঞানে-কর্ম্মে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে যখন মানুষ অক্ষম হইয়া পড়িল, তখনই একদিকের ঝোঁকটা অত্যন্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। এই সামঞ্জস্যের শক্তি যখন জাতির ভিতর হইতে অপসারিত হয়, তখনই জাতির অধঃপতন দেখা দেয়। কেবল কর্ম্ম কেবল জ্ঞান কোনটাই আদর্শ নয়। জ্ঞানে কর্ম্মে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারিলেই দৈহিক-মানসিক-আত্মিক শক্তিতে মানুষ সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। কর্ম্মে বিতৃষ্ণা আসে কখন? —যখন মানুষ কর্ম্মকে জ্ঞানের পরিপন্থী বলিয়া মনে করে। এই সংশয় লইয়া অনেকের মনেই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের সমাধানের দরুণ অনেকেই জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —জ্ঞান বড়, না কর্ম্ম বড়? যোগবাশিষ্ঠে আছে, সুতীক্ষ্ণ নামে এক ব্রাহ্মণ এইরূপ সংশয়ে সংশয়ান্বিত হইয়া অগস্তি মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন——

মোক্ষস্য কারণং কর্ম্ম জ্ঞানং বা মোক্ষ সাধনম্।
উভয়ং বা বিনিশ্চিত্য একং কথয় কারণম্॥

কর্ম্ম—মুক্তির কারণ, না জ্ঞান-মুক্তির কারণ। অথবা কর্ম্ম জ্ঞান উভয়ই মুক্তির কারণ। ইহার মধ্যে নিশ্চয় করিয়া একটা কারণ আমায় নির্দ্দেশ করুন।

প্রত্যুত্তরে অগস্তি বলিলেন—

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥

পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সাহায্যেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। তিনি আরও বলিলেন—

কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে।
কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনান্তূভয়ং বিদুঃ॥

কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু উভয়ের সাহায্যে মুক্তি হয়। এইজন্যই প্রকৃত জ্ঞানীগণ জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়কেই মোক্ষের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন।

মুনিপ্রবর সংক্ষেপে জ্ঞান-কর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন মীমাংসা করিয়া দিলেন, আর কোথায়ও এইরূপ সুমীমাংসা পাওয়া যায় না। আকাশে উড়িতে হইলে পাখী উভয় পক্ষেরই সাহায্য লইয়া তবে মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে। তেমনি মুক্তি লাভ করিতে হইলে জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া চলিবার যো নাই। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তবেই ঠিক প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় কর্ম্মী হইয়া পড়িলে উচ্চস্তরের বৃত্তি সমূহের বিকাশ হয় না। কেবল কর্ম্মীদের মাঝে এইজন্যই জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। তেমনি নিছক জ্ঞানীও কেবল জ্ঞানালোচনায় শেষটায় অলস নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে। জ্ঞানের লক্ষণ জড়ত্ব নয়। জ্ঞানে বুদ্ধি প্রতিভা-কর্ম্মের দৈবী বিকাশ হয়। জ্ঞানে চিত্ত যখন স্বচ্ছ বিশুদ্ধ থাকে, তখন অজস্র কর্ম্মের মাঝেও তাহার চিত্তে মলিনতার ছাপ পড়িতে পারে না। এইজন্যই মুনি-ঋষিরা সামঞ্জস্যের পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধ্যান-ধারণা দ্বারা মনের ময়লা অপসারিত হয়, কিন্তু মনের ময়লা ছাড়াও তো আরও প্রতিবন্ধক রহিয়াছে আমাদের। সত্যলাভের পথে তাহারাও কম বিঘ্ন উৎপাদন করে না। দেহের জড়ত্ব কেবল জ্ঞানালোচনায় বা আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা অপসারিত হয় না। দৈহিক জড়ত্ব—দৈহিক কর্ম্ম প্রচেষ্টা দ্বারাই অপসারিত হয়। তখন সুস্থদেহে সুস্থ মনে ব্রহ্মকে ধারণা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন হয়! কেবল কর্ম্মীর জ্ঞান নাই, সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তেমনি কেবল জ্ঞানীরও নৈষ্কর্ম্মের দরুণ চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, সুতরাং সে ও মুক্তিলাভের অনধিকারী।

ঋষিযুগ বা বৈদিক যুগকে আমারা সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ ধরিতে পারি। ঋষিদের জীবন-যাপন প্রণালী জ্ঞান-কর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্যই জ্ঞানে-কর্ম্মে তাঁহাদিগের মধ্যে কোথাও নানতা দেখিতে পাইবে না। আদর্শ জীবন ইহাকেই বলে। মুষ্টিমেয় কয়টী নির্জ্জন বনে বসিয়া আত্ম চিন্তা করিলেই তাহা ঠিক ঠিক জাতিকে আদর্শ জাতিতে পরিণত করিতে পারিবে না। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই আমরা কোন সময় হইয়া পড়িয়াছি কেবল জ্ঞানী, কোন সময় হইয়া পড়িয়াছি অতি মাত্রায় প্রেম প্রবণ; আবার কোন সময় জ্ঞান-প্রেম উভয়কে বিসর্জ্জন দিয়া তমোঃভিভূত হইয়া কেবল কর্ম্মী সাজিয়াছি। আমাদের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ এই সামঞ্জস্যের পথকে অবজ্ঞা করিয়া চলা। আমরা এক একদিক দিয়া চরম উন্নতি লাভ করিয়াছি, কিন্তু অন্য দিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা-উপেক্ষা ছিল বলিয়া সেই উপেক্ষার পথ দিয়াই শত্রু প্রবেশ করিয়া আমাদের উন্নতির পথকে সমূলে বিনাশ করিয়াছে। এইজন্যই আমাদের মাঝে দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি হইলেও সমগ্র জাতির ভিতর এখনো যথেষ্ট দৈন্য বা দুর্ব্বলতা রহিয়াছে। এই দুর্ব্বলতার দরুণই উন্নত হইয়াও আমরা পদে পদে নিপীড়িত! আদর্শ জাতি জ্ঞানে-কর্ম্মে—দৈহিক শক্তিতে সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষ—এই কথাটী ভুলিয়া গেলে আমাদের চলিবে না।

শক্তি থাকিলে মানুষ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অনায়াসে চলিতে পারে। তখন জ্ঞানও কর্ম্মের বিরোধী হয় না। আবার কর্ম্মও জ্ঞানের বিরোধী হয় না। যে কোন দিক দিয়া দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিলেই মানুষ স্বার্থপর হইয়া উঠে, গা বাঁচাইয়া চলিবার ফিকির বাহির করে। নিয়ত অভ্যাসের ফলে কর্ম্মের গ্লানিতে মনকে একটুও কলঙ্কিত করিতে পারে না। এই অভ্যাসযোগের কথা গীতায় বার বার বলা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ কোথায়ও অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি না করিয়াও আসল লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে—ইহা অসম্ভব নয়। কেবল মাত্র অভ্যাসের ফলে নিরাসক্ত হইয়াও কর্ম্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয়। তখন ইন্দ্রিয়গুলি কর্ম্ম নিরত হইলেও মন সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তা নিয়া থাকিতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদ্ Jamesও এই কথা বলিয়াছেন—"The more of the details of our daily life we can hand over to the effortless custody of automatism, the more higher powers of mind will be set free from their own proper work." অভ্যাসের ফলেই এই শক্তি আয়ত্ত হয়। তখন কর্ম্মত্যাগ না করিয়াও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়।

শক্তির অভাব হইলেই সামঞ্জস্যের শক্তিও থাকে না। তখন কোনমতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখাই ধর্ম্ম হয়। কোনমতে বাঁচিয়া থাকাটাই মানুষের আদর্শ নয়। মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায় শোভন,

বীর্য্যে, সর্ব্ব বিষয়ে বিশারদ হইয়া। সুতরাং বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই সামঞ্জস্যের পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে।

কর্ম্ম করিয়াই জনকাদির মত রাজর্ষিরা জ্ঞানলাভে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মকে বাদ দেন নাই। কর্ম্ম করিয়াও যাঁহারা চিরমুক্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই অভ্যাসযোগে সিদ্ধ হইয়াছেন। এই অভ্যাসের ফলে কর্ম্মের ভিতরও মনটাকে তাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মচিন্তায় ডুবাইয়া রাখিতে পারিতেন। ভারতের এই ছিল আদর্শ। সুতরাং বাহিরের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া তপোবল অর্জ্জন করিয়া প্রচণ্ড কর্ম্মী হইয়াও, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা প্রদীপ্তোজ্জ্বল থাকিত। প্রাণী মাত্রেই কর্ম্ম ছাড়া কেহই এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। কর্ম্ম করে ইন্দ্রিয়গুলো, কিন্তু আমরা মনকেও তাহার সঙ্গে বিজড়িত করিয়া ফেলি, এইজন্যই মনও আমাদের সঙ্গে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু অভ্যাসযোগের ফলে মানুষের মন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়াও কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের— "অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ"—এই বাণীতে উপরোক্ত কথারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। অসংখ্য বন্ধন মাঝেও মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। এইজন্যই অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করিলেও মুক্তির পথ বন্ধ হয় না। মনের দিক দিয়া মুক্ত হইতে না পারিলে, বাহিরের মুক্তি পাইয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যতই আমরা জ্ঞান লাভ করি, শিক্ষিত হই, ততই আমাদের প্রাণটা উদার হয়, অপরের দুঃখে সমব্যথিত হইতে থাকে। জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া অপরের দুঃখ বুঝিয়াও যদি নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বসিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিব জ্ঞানার্জ্জনে আমাদের স্বার্থপরতাই শিক্ষা দিয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি কর্ম্মপ্রচেষ্টাও দেখা না দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই জ্ঞান— কেবল জ্ঞান, তাহার মাঝে সামঞ্জস্যের বীজ নাই। এই কেবল জ্ঞানালোচনায় কতজন যে কৈবল্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সাংখ্যের মাঝেও এইরূপ কৈবল্যবাদী রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এইরূপ স্বাধীনতা পাইয়াও যে কি সুখ হয়, তাহা কৈবল্যবাদীরাই জানেন।

ইন্দ্রিয়গুলোকে সৃষ্টি করিবারও একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে ভগবানের। তাহাদিগকে বিনা কাজে রাখিলে তাহারা আরও বেশী উৎপাত আরম্ভ করিয়া দেয়। নিছক জ্ঞানালোচনায় সকল বৃত্তির তৃপ্তি হয় না; কাজেই যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া চলে মানুষ, তাহারাই শেষে মানুষকে প্রতি পদে পদে বাধা দেয়। কাজেই সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলা ছাড়া দ্বিতীয় কল্যাণপ্রদ পন্থা আর নাই।

মনে মনে আমরা অনেক সমস্যাকেই সহজে মীমাংসা করিয়া ফেলি, কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখি প্রতি পদে পদে আমাদিগকে আঘাত পাইতে হয়। কাজেই বাস্তব জীবনের এই অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্য করিয়া তোলা কেবল মানসিক শক্তি দ্বারাই সম্ভবপর হয় না— অনেক ক্ষেত্রে মানসিক বলের চেয়ে দৈহিক বলের প্রয়োজন হয় বেশী। আদর্শ জীবন লাভ করিতে হইলে দেহে-মনে-প্রাণে সর্ব্ব বিষয়ে বলিষ্ঠ - উন্নত হওয়া প্রয়োজন। ঋষিযুগে আমরা এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই দেখিতে পাই।

মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাকেও খাটাইয়া লওয়া প্রয়োজন। দৈহিক শক্তির হ্রাস হইলেই মানুষ তখন অতি মাত্রায় ভাবুক হইয়া পড়ে। আর অতি মাত্রা ভাবুকতায় মানুষের জীবনে প্রাণে শক্তি সঞ্চার হয় না। এই দুর্দ্দিনে দার্শনিকদের ব্যক্তিগত

জীবনের অনুসন্ধান লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, অনেক অশিক্ষিত হইতেও তাঁহারা অনেক বিষয়ে অধঃপতিত। জ্ঞান বলিতে শুধু মন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বুঝা নয়, দেহ দিয়াও জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে হয়, তবেই জ্ঞানের সার্থকতা!

কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই যে আমরা সুচিন্তায় দিন অতিবাহিত করিতে পারি তাহাও নয়। বরঞ্চ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জোর করিয়া কর্ম্মত্যাগ করাতে হিতের চেয়ে অহিতই হয় বেশী। স্বতঃ প্রকাশমান জ্ঞান সকলের অন্তরেই বিরাজিত—কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অভাবে সেই জ্ঞান অন্তরকে সাত্ত্বিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সকলের হৃদয়েই জ্ঞান-প্রবাহ বহিয়াছে। কিন্তু চিত্তের মালিন্যকে অপসারিত না করা পর্য্যন্ত সেই বিশুদ্ধ প্রবাহে সম্মিলিত হওয়া যায় না। নির্ম্মল পানীয় জল পাইতে হইলে যেমন অনেকখানি মাটি খুঁড়িতে হয়, তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলেও অনেক সাধ্য সাধনার প্রয়োজন হয়। দীর্ঘকাল এবং নিরন্তর সাধনার পর যথার্থ জ্ঞানের দীপ্তি মানুষকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে। জ্ঞানলাভ এত সহজ নয়। Culture বলিতে শুধু মনের Cultureকেই বুঝায় না, দেহে-মনে-প্রাণে সর্ব্ববিষয়ে বিশুদ্ধ পরিমার্জ্জিত হওয়া চাই। এই সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য থাকিলেই জ্ঞানে-কর্ম্মে বিরোধ না হইয়া বরঞ্চ পরস্পরের মাঝে ঐক্য দেখা দেয়।

কর্ম্ম যখন মানুষের স্বভাব, কর্ম্ম না করিয়া যখন মানুষ থাকিতে পারে না, তখন এই স্বভাবের অনুসরণ করিয়াই মুক্তির আস্বাদন পাইতে হইবে। কর্ম্মত্যাগ ঋষিদের আদর্শ ছিল না। তাহা হইলে ঋষিরা উপনিষদে এই বাণী কখনো প্রকাশ করিতেন না—

> কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
> এবং ত্বয়ি, নান্যথেতোঽস্তি ; ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

"কর্ম্ম করিয়া যাও— কর্ম্ম কখনো মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, সুস্থ দেহ লইয়া কর্ম্মের আনন্দ উপভোগ কর। কাজ ছাড়া যে তোমরা থাকিতে পারিবে না, সুতরাং মনের আনন্দে কর্ম্ম সম্পাদন কর।" উপনিষদে, গীতায় সর্ব্বত্রই কর্ম্মত্যাগকে নিন্দা করা হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজনই যে হয় না, কেননা মনের স্বাধীনতা অর্জ্জন হইলে কর্ম্মময় জীবনেও নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির আনন্দ উপভোগ করা যায়। জ্ঞান ছাড়া কর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞান উভয়েই অপরিপক্ক। একে অন্যের বিরোধী না হইয়া পরস্পর পরস্পর দ্বারা উপকৃতই হইয়া থাকে। জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ লাভ করিতে হইলে জ্ঞান-কর্ম্মে সামঞ্জস্য করিয়া লইতেই হইবে।

গীতা

(ভূমিকা)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বক্তা, অর্জ্জুন শ্রোতা; শ্রীকৃষ্ণ গুরু, অর্জ্জুন শিষ্য। গীতা বুঝ্‌বার আগে এঁদের জীবনের mission কি, তাই বোঝা দরকার। আগে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝ্‌ব। তাঁকে বুঝতে হলে আবার ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার একটু ইতিহাসও বুঝে নিতে হয়।

ভারতবর্ষ চিরকালই অধ্যাত্মরাজ্যের সত্যের সন্ধানী। কি করে দিব্য জীবন লাভ করা যেতে পারে, তারই গবেষণা তার উদ্দেশ্য! শ্রীকৃষ্ণ যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সত্যলাভের তিনটী পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। কর্ম্মপথ বল্‌তে তখনকার লোকেরা আবার দুটী পথ বুঝতেন—(১) বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম বা বাইরের সকাম কর্ম্ম; (২) আধ্যাত্মিক কর্ম্ম বা রাজযোগ; কর্ম্মবাদীরা বল্‌তেন, এতেই দিব্যজীবন লাভ হবে। কেউ কেউ বল্‌তেন, যজ্ঞ কর, অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে, তাই—দিব্য জীবন। কেউ বল্‌তেন, তপস্যা কর, প্রাণায়ামাদি যোগের সাধনা কর, ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, বাহিরের স্বর্গ কয়দিনের, ভিতরেই অক্ষয় স্বর্গ বা আত্মানন্দ লাভ করবে। জ্ঞান-পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে সত্য-লাভের উপায় বলে নির্দ্দেশ কর্‌তেন। তাঁরা বল্‌তেন, জ্ঞান বিচার করে জগৎ থেকে আলাদা হয়ে যাও—নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প হয়ে যাও—সমস্ত কর্ম্মত্যাগ কর, শান্ত হও—ব্রহ্মকে লাভ করবে। ভক্তিবাদীরা বল্‌তেন, শুচিসংযত হয়ে ঈশ্বরের ভজনা কর, পূজা কর, তাঁতে নির্ভর কর, বিশ্বাস কর—সত্যলাভ কর্‌তে পারবে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সত্য সম্বন্ধে এইটুকুই বুঝেছিল। শ্রীকৃষ্ণ এসে তার পরেও আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন—তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরেও বল্‌লেন প্রেমের কথা। বল্‌লেন কি, বৃন্দাবনে নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সত্যলাভের পূর্ণতর পথ আছে—সে হচ্ছে প্রেম। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—কোনটাতেই মানুষ সহজ ভাবে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পারছে না, ভগবানকে চাইতে গিয়ে সে মানুষভাব থেকে দূর সরে যাচ্ছে। অবশ্য মানুষের অশুদ্ধি দূর কর্‌তেই হবে, কিন্তু তা বলে শুদ্ধ, পূর্ণ, দিব্য মানব কি অসম্ভব? সোজা কথায়, ভগবান্ কি মানুষ হতে পারেন না? ভগ-বান্‌কে কি মানুষরূপে পাওয়া যায় না, ভালবাসা যায় না? ভক্তিতেও ভগবান্ দূরে থাকেন, প্রেমে তিনি বুকের মানুষ হন। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমধর্ম্ম নিয়ে এলেন জগতে। বৃন্দাবনের সরল হৃদয় গোয়ালাদের মাঝে তিনি এক প্রেমের মহাপ্লাবন বইয়ে দিলেন। এগার বছর বয়সের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শেষ হল। কিন্তু এর মাঝেই তিনি এমন তরঙ্গ তুল্‌লেন যে ওই এগার বছরের ছেলে কারু সন্তান, কারু সখা, কারু স্বামী হয়ে সমাধির দিব্যানুভূতিতে সকলকে পাগল করে তুল্‌লেন। তাঁর গোপী নিয়ে যে লীলা, অনেকে মনে করে, তা বুঝি সাধারণ মানুষের মতই কামের খেলা। এটুকু বোঝে না, এগার বছরের ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়ের কখনো কাম-সম্বন্ধ হয় জগতে? অথচ গোপীরা মধুরভাবে তাঁকে ভালবাসত। শ্রীকৃষ্ণ এই দিয়ে দেখালেন, এই মধুর ভালবাসা সাধারণ স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা নয়—ভগবানের দেহ এখানে ছোট্ট ছেলের দেহের মতই পবিত্র, নির্ব্বিকার, কামগন্ধহীন। মানুষ দিব্যভাবে বিভোর না হলে এমনি সহজ হতে পারে না—প্রেমলাভ করতে পারে না—এই দেহেই ভগবানকে আস্বাদন করতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ এমনি করে প্রেমের ধর্ম্ম তো জগতে নিয়ে এলেন। এখন জগৎকে বোঝাবেন তা কি করে? সরল বিশ্বাসী গোয়ালারা তাঁকে বিশ্বাসে বুঝেছে। কিন্তু যারা তার্কিক, যারা সভ্য, সমা-জের যারা পাণ্ডা, তারা তো বুঝ্‌বে না। তা ছাড়া দেশটা তখন ঐশ্বর্য্যমত্ততা ও ক্ষাত্রগর্ব্বের চরমে উঠেছে। ক্ষাত্রভাবটা রাজসিক ভাব—এতে কখনো প্রেম ফোটে না। অতএব প্রয়োজন ভারতবর্ষের ক্ষাত্রশক্তিকে নিস্তেজ করা। ভগবান্ সময় বুঝে

এসেছেন। দুই ক্ষাত্রশক্তির মাঝে মহাযুদ্ধ—কুরুপাণ্ডবের লড়াই শুরু হয়েছে। ভগবান্ নির্লিপ্ত-ভাবে লড়াই মিটাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রকৃতির প্রেরণা অলঙ্ঘ্য। লড়াই বাধলই, তিনিও তো তাই চান। নিজে তিনি অবশ্য নির্লিপ্ত! তাই কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র না ধরে সারথি হয়ে তিনি যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত করলেন।

অর্জ্জুন হলেন শ্রীকৃষ্ণের সহায়। অর্জ্জুন নইলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না— কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্তি নির্মূল হ'ত না। এই অর্জ্জুন যুদ্ধ করতে এসে একেবারে বেঁকে বসলেন, বললেন—"আমি মানুষ মারতে পারব না।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন, এখন যুগের প্রয়োজনে মানুষ মারা প্রয়োজন; আজ যদি ক্ষাত্রতেজ না নিভে, ভারতবর্ষ প্রেমধর্ম্ম গ্রহণই করতে পারবে না। তা ছাড়া ক্ষত্রিয়দেরও বড় বাড়াবাড়ি—এদের পতনও প্রাকৃতিক নিয়মে অবশ্যম্ভাবী! আজ কয়েক লাখ লোক মরবে বটে, কিন্তু তার ফলে বহু সহস্র বছর ধরে ভারতবর্ষে শান্তি আসবে। অর্জ্জুনের এত জ্ঞান তো ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগীশ্বর—তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে যুগ প্রয়োজন দেখে, অর্জ্জুনকে বললেন—"যুদ্ধ তোমায় করতেই হবে, এ ভগবানের বিধান। তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলো না, যা কর্ত্তব্য সামনে পড়েছে, করে যাও।" অর্জ্জুন ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই উপলক্ষে তাঁর সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সব ধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল—(জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি) সে সবার বিশ্লেষণ, আলোচনা করে, নূতন ভাবে তাদের ব্যাখ্যা করে এমন একটী অপরূপ সামঞ্জস্য নিয়ে এলেন যে অর্জ্জুনের মনে আর কোনও সংশয় রইল না—তিনি ঘাড় হেঁট করে বললেন—"করিষ্যে বচনং তব।"

গীতা শ্রীকৃষ্ণের সেই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা। এতে কর্ম্ম পথ, জ্ঞানপথ ও ভক্তি পথের এমন নূতন ভঙ্গীতে আলোচনা আছে যে তারা সবাই মানুষকে প্রেমের পথে, সহজ ধর্ম্মের পথে নিয়ে যায়। গীতাতে প্রেম কি, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আলোচনাও করেন নি কিন্তু,— এমন কি প্রেম শব্দটা পর্য্যন্ত গীতায় নাই। শুধু এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করতে এসেছি।' সে নূতন ধর্ম্ম প্রেম, সে কথা বলাই বাহুল্য! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না এইজন্য যে, গীতাতে প্রেমের ভূমিকা হয়ে রইল—লোকে জানল, আমরা ধর্ম্মের এইটুকু এ পর্য্যন্ত পেয়েছি; কিন্তু আরো দু'এক পুরুষ না গেলে যুদ্ধের এই বিক্ষোভটা না মিটলে, মানুষ প্রেমের শান্তি চাইবে কেন? যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন এঁরা সবাই দেহ ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের পথ শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই পরিষ্কার করে গেলেন অন্য উপায়ে। তিনি জানতেন, অর্জ্জুনের মত শুদ্ধ আধার না হলে এই প্রেমধর্ম্ম কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। তাই তিনি কৌশলে অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে দেওয়ালেন। ছেলে হল অভিমন্যু। সেই অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎ যখন মুমূর্ষু, তখন চিরকুমার জ্ঞানমূর্ত্তি শুকদেব তাঁকে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনের কথা— বৃন্দাবনের সেই প্রেমলীলার কথা বললেন। এর আগে ব্যাস আর শুক ছাড়া সে সব কথা কেউ জানত না। পরীক্ষিতের সভায় অনেক মুনিঋষি ছিলেন। সবাই এই প্রথম শুনতে পেলেন— ভগবানের সহজ লীলার কথা— মানুষের দেহে ভগবান নেমে আসার কথা। তারই নাম ভাগবত; গীতার পর ভাগবত। দুটীতে ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ধর্ম্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। বেঁচে থাকতে গীতাতে তিনি অতীত ধর্ম্মমতগুলির সামঞ্জস্য করেও প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পথ করে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাগবতে তাঁর প্রেমের কাহিনী জগতে প্রচারিত

হল। অর্জ্জুন ছিলেন গীতার শ্রোতা, ক্ষাত্রশক্তি নির্ম্মূল করবার উপলক্ষ্য; এই অর্জ্জুনেরই পৌত্র পরীক্ষিৎ হলেন ভাগবতের শ্রোতা, প্রেমধর্ম্ম প্রচারের উপলক্ষ্য।

এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন, এই জন্যই তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটালেন, আর সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ দেবার ছলে গীতাতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করে গেলেন। —শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় হোক্— তাঁদের শতকোটি নমস্কার !!

১ অর্জ্জুন বিষাদ যোগ ॥

প্রথম অধ্যায়ে গীতার উপদেশ আরম্ভ হয় নি। এটাতে শুধু অর্জ্জুনের কান্নাকাটী! ব্যাপারটা এই। যুদ্ধের জন্য উভয়পক্ষ প্রস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথে করে নিয়ে এলেন। অর্জ্জুন বল্লেন, "রথ মাঝখানে রাখ, আমি একবার দেখি কাদের সঙ্গে লড়্তে হবে।" শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, "আচ্ছা, দেখ।" অর্জ্জুন দেখেন— সবাই আত্মীয় বন্ধু বান্ধব। তাঁর মন ভেঙ্গে পড়্ল। এই যে পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এত বিক্রম নিয়ে এসেছিলেন, সে সব কোথায় উড়ে গেল। বল্লেন, "একি! স্বজন বধ করে রাজ্য ভোগ করতে হবে? চাই না অমন রাজত্ব। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা না হয় অবুঝ, তা'বলে আমরাও অবুঝ হব? ওরা আমায় মেরে ফেলুক, তবুও আমি ওদের মারতে পারব না। আমরা যদি সবাই মারামারি কাটাকাটি করে মরি, কি লাভ হবে? দুদিন পরেই ঘোর সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হবে— জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম দুই-ই উচ্ছন্ন যাবে। না ঠাকুর, এ আমি পারব না—লড়াই আমার দ্বারা হবে না।" এই বলে গাণ্ডীব ছেড়ে দিয়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। এই হল প্রথমাধ্যায়ের সার মর্ম্ম!

গীতায় প্রত্যেকটা অধ্যায়কে যোগ বলা হয়েছে। যোগ মানে সত্যলাভের উপায়। প্রথমাধ্যায়ের নাম অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ। অর্জ্জুনের বিষাদটাও সত্যলাভের উপায় হয় কি করে? এই একটা প্রশ্ন হতে পারে। এর উত্তর হচ্ছে, অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমটা দুঃখের ভিতর দিয়ে সংশয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সমস্ত গীতাখানিতে অধ্যাত্মরাজ্যের সকল সত্যই কি করে জীবনের স্তরে স্তরে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে, তার সঙ্কেত রয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি নিজের অবস্থায় তৃপ্ত থাকে, কোথায়ও ঘা না খায়, তার মনে কোন সংশয় না জাগে, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে খেলে বেড়ায়, তা হলে সে কি কখনো ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে? এইজন্য সত্যলাভের প্রথম অবস্থায় প্রয়োজন—নিজের মনের সংশয়, সেই সংশয় দূর করবার ব্যাকুলতা, আর সংশয়-দূরকর্ত্তা গুরু। অধ্যাত্ম জীবনের এই প্রথম অবস্থাটা বড়ই কষ্টকর। নিজে আমরা বাস্তবিক কিছু বুঝি না, অথচ মনে করি, সবই বুঝি—জানি। দেখনা, অর্জ্জুন দয়াধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে কত বড় একটা Lectureই দিয়ে ফেল্লেন। এই যে—"আমি সব জানি, সব বুঝি"— শিষ্যের এই অহঙ্কারও একটা জ্বালা, তার নিজের পক্ষেই জ্বালা। বেচারা কি করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। চারদিক যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকে। আগেকার সংস্কার সব আছে, সেগুলোও সরতে চায় না—অথচ গুরু নূতন পথে নিয়ে যাচ্ছেন—বিষম ফ্যাসাদ। মনটা তখন কেমন গোমরা হয়ে থাকে। কিন্তু ভয় নাই—অধ্যাত্মজীবনের গোড়াতে এমনি একটু কুয়াসা থাকেই। দিব্য পুরুষের বাণীর দীপ্তিতে সে কুয়াসার ঘোর পরমুহূর্ত্তেই কেটে যায়। তাই বিষাদকেও একটা যোগ বা সত্যলাভের সিঁড়ি বলা হয়েছে। অর্থাৎ ওই পথে দুঃখ, সংশয়, এই সব থেকে সুরু।

অর্জ্জুনের একটা কথা লক্ষ্য কর্‌তে হবে। উনি এক জায়গায় বলছেন (৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) — "এই যুদ্ধে যে জাতি-ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম উচ্ছন্ন যাবে।" এটুকুর মাঝে রহস্য আছে। অর্জ্জুনের মনে সমাজের শৃঙ্খলাটাই বড় হয়ে জাগছে, তিনি জাত-কুলকেই বড় করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ভগবান যে প্রেমের ধর্ম্ম নিয়ে আসছেন, যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আজ এই মরণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, তার মাঝে জাত কুলের বালাই নাই। ভালবাসায় জাত কুল ভাসিয়ে নেয় — যেমন গোপীদের নিয়েছিল। অর্জ্জুনের মুখে জাত কুলের এই আর্ত্তনাদ শুনে মনে হয়, এ যেন প্রাচীন ভারতেরই প্রেম ধর্ম্মের প্লাবনের বিরুদ্ধে আর্ত্তনাদ। কিন্তু এ আর্ত্তনাদ ক্ষণিকের; ধর্ম্মের বান যখন ডাকে, জাতকুল তখন ভেসেই যায়।

আচ্ছা এর পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখ্‌ব, ভগবান্ অর্জ্জুনকে কি বলে বোঝান।

(ক্রমশঃ)

মাহেন্দ্রক্ষণে

মুক্তি সকলেই পাচ্ছে। কর্ম্ম থেকে মুক্তি আমরা রোজই পাচ্ছি। দিনের কর্ম্মান্তে যে ঘুমিয়ে পড়ে জীব — এও তো মুক্তি। তবে কথা হচ্ছে, এটা প্রকৃতির বশে। নিজের ইচ্ছায় যদি জগৎটার প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারি, অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রে জগৎটা আমার কাছে যদি প্রলীন হয়ে যায়, সেই তো যথার্থ মুক্তি! নিজের জীবনটা যদি সমগ্রতঃ নিজের মুষ্টিতে আন্‌তে পারি, এমন অবস্থা যদি লাভ হয় তাহলে তার চেয়ে বড় মুক্তি আর কি চাই? এক কথায় বল্‌তে গেলে — full nervous control ই হ'ল চরম মুক্তি! এ বড় সহজ কথা নয়, এইজন্যই নিয়ত অভ্যাস চাই। সহজে কি কেউ কারও বশ্যতা স্বীকার করতে চায়?

*

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনকে খুঁজেছে উভয়েই — একজন বিকারকে রোধ করে নির্ব্বিকারের সঙ্কেত আবিষ্কার করে নিয়েছে, আর একজন বিকারকে বিকাররূপে রেখেই বিচার করেছে — নিষ্কাম ভাবে আলোচনা করে জগতের জ্ঞান সম্পদ বাড়িয়ে গেছে — তত্ত্ব খোঁজে নি। অধ্যাত্ম রাজ্যে আমরা চালাক — ইহরাজ্যে ওরা চালাক। নির্ব্বিকার পুরুষ এবং বৈচিত্র্য প্রসবিনী প্রকৃতি উভয়কেই জানতে হবে। নিছক প্রকৃতি বা নিছক পুরুষের জ্ঞান পূর্ণ নয় — উভয়কে জানতে হবে। এইজন্যই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আদর্শের সম্মিলনেই পূর্ণ আদর্শের সৃষ্টি হবে।

* *

সাংখ্য বেদান্ত দুই-ই সচ্চিদানন্দই দেখেন, তবে বুঝতে তফাৎ — একজন ভিতরে, একজন বাইরে। বৈদান্তিক দেহ ছাড়বার সময় ছড়িয়ে যাবেন, সাংখ্যসাধক ছাড়িয়ে আসবেন, নিরালম্ব পুরীতে লীন হবেন। কিন্তু নির্ব্বিকল্প অবস্থার পরও যাঁরা নেমে আসেন, তাঁদের সমাধিকে সবীজ বলা যায় না, কেননা তিনি তো শুধু নীচের টানে

নামেন না — তিনি নামেন নিশ্চয়ই নিজের অনু-মোদনে এবং পর প্রয়োজনে। তাঁদের নেমে আসার হেতু অব্যাখ্যাত, অলৌকিক সাধন জগতের অতীত কথা। সবীজ নির্ব্বীজ সাধনক্ষেত্রে। তাঁর তো কোন ইচ্ছা থাকে না— জীবত্বিতের ইচ্ছাটী পর্য্যন্ত থাকতে তো নির্ব্বিকল্প সমাধি হবে না।

* *

জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, তিন যে এক তা বুঝি, অথচ জ্ঞেয়ের কিছু সংস্কার যদি থেকে যায়, তাই হ'ল বেদান্তের সবিকল্প সমাধি। আর তিন যেখানে এক— তাই নির্ব্বিকল্প। প্রথমটীর উদাহরণ— 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাচ্যতা; দ্বিতীয়টী শুধু 'অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ।"

* *

বৈদান্তিকের অন্তরঙ্গ আস্বাদন— শ্রীগৌরাঙ্গে। শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিশ্রাম ভূমি। কাজেই যারা তাঁর ভাবকে হজম করতে না পেরে অতি বিশ্রামশীল হয়ে পড়েছে, তাদের আলস্যের আরোপ তাঁতে করার একটা অজুহাত জুটেছে। অথচ তিনি জীবনে কেমন ইন্দ্রিয়জয়ী ছিলেন। আত্মজ্যোতির সর্ব্বাঙ্গীন সাধনার সমর্থনের জীবন্ত ভাষা তাঁর জীবন শ্রীগৌরাঙ্গে অবতারত্বের পূর্ণ আস্বাদ!

* *

বৈদিক ধারা লুপ্ত হয় নি— তবে প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পায় নি—বাঙ্গালার ধারণায় ছড়িয়ে গেছে। আমরা যা মনে করি আধুনিক— বীজ খুঁজলে দেখি, তাও সনাতন। দেশ বিভাগ, জাতি বিভাগ, সব ধাপ্পাবাজী! এক অনাদি অনন্ত সত্যের স্রোত বয়ে চলেছে। মূল সত্যকে যদি মানতে হয়, তাহলে বলতে হয়, যা উৎপন্ন তাই বিকারশীল। তাহলে গোঁড়ামীর স্থান রইল কোথায়?

* *

বিদর্শনের উপপাদ্য যা, তা ঠিক আমাদের ইন্দ্রিয়-জগতের বিরোধী কথা।

(১) ইন্দ্রিয় ছাড়া আমরা নড়তে চড়তে পারি না, কিন্তু **বেদান্তের** ব্রহ্মানুভূতি; অর্থাৎ এমন স্বচ্ছতা, এমন নিরপেক্ষতা, সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি যার নাগালও পায় না।

(২) শ্বাস ছাড়া আমরা বাঁচি না, কিন্তু যোগের সমাধি ঠিক তার বিপরীত অবস্থা— সমস্ত বায়ু তখন নিশ্চল।

(৩) সাধারণতঃ দেহ আর আমি আলাদা; কিন্তু বৈষ্ণব বলছেন, জীবের আপ্ত চিন্ময় তনু— যা দেহ, তাই দেহী। দেহ বজায় রেখেও ভগবানের সম্পূর্ণ আস্বাদন— পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমন্বয়— পঞ্চেন্দ্রিয় বর্জ্জন করে নয়।

* *

তুমি যতই জড় হও— তোমাকে আমি চিন্ময় দেখি। শুধু মোহিত হয়ে দেখা নয়— এ দেখা রীতিমত শক্তির দেখা— দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কাউকে চিন্ময় দেখতে পারবে না। পরমহংসদেব সবকে চিন্ময়রূপে দেখতেন, এ দেখা কি মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার দরুণ? নিজের বাহির ভিতর চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে, তখন সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের দ্বারা জড়ও চেতনবৎ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সত্যদৃষ্টি না খুললে কোন বিষয়েরই যথার্থ স্বরূপ আমরা অবগত হতে পারি না। জগৎকে আমরা যা বুঝছি, যা দেখছি, এ সব তো ভুয়ো, সত্যিকার দ্রষ্টা তিনিই, যাঁর চোখ বহির্জ্জগৎ হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়ে গিয়েছে।

*

সাংখ্যের সাধনা — প্রথমেই আমি অন্ধ; যা পাচ্ছি তাই fact— বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে চলছি। কিন্তু বোধি দিয়ে— শ্রদ্ধা ও

শ্রীগুরু বিশ্বাস নিয়ে যদি শুধু বোঝা নয়, অনুভবের চেষ্টা কর, তবে দেখবে—শুধু তত্ত্ব নয়, পেছনে প্রাণ, চেতনা, আলো। একটা কথাও আছে—facts as facts do not create a spirit of reality. সাংখ্যের বিশ্লেষণ বুদ্ধির সঙ্গে যদি 'বোধি' জিনিষটীর যোগ হয়, তাহলেই বিশ্লেষণের বস্তু জড় চতুর্বিংশতি তত্ত্বও আলোময়, চেতন হয়ে উঠে। বিশ্লেষণ দ্বারা বুদ্ধির পরিতৃপ্তি, কিন্তু অনুভবদ্বারা সর্বাঙ্গের তৃপ্তি সাধন হয়।

* *

অখণ্ড আমির সদা-জাগ্রত ধারা—intellectual development যত হবে, এ অনুভূতি ততই বাড়বে। যারা intellectually strong তারা খুবই sensitive. জীবনে একটা কিছু ধরে রেখেছে যারা—যেমন গান্ধী, আশু মুখার্জী, চিত্তরঞ্জন—এঁদের আমির সত্তানুভূতি খুব প্রবল। সঙ্কল্প-বিকল্প-বিহীন মানব জড়, তাদের 'আমিত্বের' অনুভব খুবই অস্পষ্ট।

* *

সত্ত্বের প্রাণ জ্ঞান—নিত্যনূতন অনুভূতি এনে দেবে। দু'দিন সাত্ত্বিক হয়ে চললেই তো এর প্রমাণ পাও। আলো হ'তে আলো—আনন্দ হতে আনন্দ—সর্ব্ব বৃত্তির সামঞ্জস্য—জীবনের এক সুর—অকাম্য মমতা—এই সব হ'ল সত্ত্বের লক্ষণ। সাত্ত্বিক হলে রজোবৃত্তি গুলো থাকবে না কেন—হাতের মুঠোয় থাকবে। জগতে ব্যর্থ কেউই নয়।

* *

আমাদের কাজের একটা তাৎপর্য্য আছে। যে যাই করুক, তদ্‌গত হয়ে যদি করে, তবে সংস্কার অর্জ্জন ক'রে, বর্জ্জন তাদের করতে হবে না—বর্জ্জনের ফল, ত্যাগের অমৃত শক্তি তাদের মাঝে আপনি ফুটবে। সাধনার আসল শক্তিটা নিজের বিশ্বাসেরই শক্তি—শ্রীগুরু তার আলম্বন। সাধনা ঐ আলম্বনে নির্ভর লাভ করবার জন্য। যাকে তাকে তো বিশ্বাস হয় না। চকিতে যদি একবার বিশ্বাস হয়ে যায়, তবে সমগ্র সাধনার ফল, অসাধনের ধন অফুরন্ত মাধুর্য্যরাশি বুক উজাড় করে প্রাণে ঢেলে দিবেন। কিছু না করেও শুধু বিশ্বাসে শরণাগতিতে সব পাওয়া যায়।

* *

সমাধিকেই চরম কাম্য মনে না করে, স্বেচ্ছায় সমাহিত হতে পারার শক্তি যখন জন্মাল, তখনই পূর্ণ জ্ঞান। সমাধিটা যেন জ্ঞানীর হাতের পাঁচ। সমাধিরও পরিপাক অবস্থা রয়েছে; যে কোন শক্তি লাভই হোক্ না, ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগের ক্ষমতা না জন্মানো পর্য্যন্ত শক্তি ঠিক ঠিক তো আয়ত্ত হল না।

* *

সুষুপ্তি জমাট অবস্থা—অসুর। স্থূল-বিশ্বাসের গোড়াতে অজ্ঞানকে আশ্রয় করেই আসতে হয়েছে। অজ্ঞানও যেন সত্য। এই ই হ'ল অসুর। নামতেও হয় অসুরের লড়াইর ফলে, উঠতেও হয় অসুর জয় করে। উন্নতির পথে অসুরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—প্রশ্বতিলয়। সৃষ্টির গোড়াতেই অজ্ঞান, পাপ, বা অসুর ইত্যাদি—একই কথা না হলে চলত কি? খৃষ্টান, পারসীক, গ্রীক্ প্রভৃতি সব উৎপত্তিক ধর্ম্মেই অসুর শক্তির প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে। বৌদ্ধের 'মার'। পুরাণেও অসুর—তবে দেবতার একটু বাড়াবাড়ি।

* *

ভাল অবস্থা থেকে টলাতে এলে যদি আপত্তি জাগে, তবে বুঝবে শুদ্ধ সত্ত্বে আছ। শুদ্ধ সত্ত্বে কর্ম্ম থাকে - গুণাতীত স্বরূপে কর্ম্ম নাই। এইজন্যই

শুদ্ধসত্ত্বই চরম আদর্শ নয়— গুণাতীত স্বরূপই জীবনের লক্ষ্য। তবে কিনা গুণাতীতের প্রতি আকর্ষণ না থাক্‌লে শুদ্ধসত্ত্বে থাকা যায় না। নির্গুণের সঙ্গে যুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব; নির্গুণবিযুক্ত মলিন সত্ত্ব। রামানুজের আদর্শ লক্ষ্য ছিল শুদ্ধসত্ত্ব। কিন্তু অনির্ব্বচনীয় তবে গেলেন কোথায়?— শঙ্কর বুঝি তারই সামঞ্জস্য করলেন।

* *

ঘুমিয়ে পড়লে যে জ্ঞান, তাই পূর্ণ জ্ঞান। জাগ্রত জ্ঞান তো কর্ম্মমিশ্রিত! আমাদের জ্ঞান হচ্ছে নীচের ৩টা চক্রের, বাকী ক'টা চক্রের জ্ঞান আনা সহজ নয়। ঊর্দ্ধ জগৎ যখন বিকশিত হয়, তখন আমরা থাকি ঘুমে। যদি ঘুমিয়েও জেগে থাকতাম, তবেই তার অনুভব— তাঁর আনন্দ আর পরিপূর্ণ ভোগ হ'ত।

* *

প্রকৃতি তমঃ বটেন জড় হিসাবে; কিন্তু তিনিই ধারণায় এলে শুদ্ধতত্ত্ব। তমের দিক দিয়ে যেটা বুঝতে পার না, বুঝতে পারলে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সত্ত্ব। উদাহরণ— নিদ্রা; ঘোর তমোবৃত্তি। কিন্তু পঞ্চদশী বলছেন, সাক্ষী হতে পারলে এই নিদ্রাই ব্রহ্মজ্ঞান।

* *

ভাষানিরপেক্ষ কথা এক রকম আছে— নিমিষের মাঝে নিখিলের তাৎপর্য্য যাতে ফুটে ওঠে। ভাষায় 'প্রকৃতি' যা, তাই হল কোটি শব্দের বোধিনী যাতে না বুঝেও বোঝা যায়। অনুভব ছাড়া প্রমাণ নাই।

—ওম—

সৌন্দর্য্যের মোহ

সৌন্দর্য্য যদি সত্যকে হৃদয়ে ধারণ না করিয়া বিকশিত হয়, তাহা হইলে সেই সৌন্দর্য্যের শক্তি মানুষকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অবনতির দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়! সত্যের দিকে লক্ষ্য থাকে না বলিয়াই সৌন্দর্য্যে মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। আমার মনে হয় তোমার সৌন্দর্য্য-লিপ্সাটাই বড়, কিন্তু সত্য তার কাছে অনেক ছোট! এইজন্যই আমার আশঙ্কা হয়, ভালবাসার পথ ধরিয়া তোমার পতন আরম্ভ না হয়। কামের কাছে দেহের সৌন্দর্য্যটাই চরম, কিন্তু প্রেমে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি আসে, তাহাতে রক্ত-মাংসের দেহের কথা মনেই থাকে না। সেই ভালবাসা সেই প্রেম হয় পবিত্র আত্মায় আত্মায়।

সুন্দর কোন কিছু দেখিলেই তুমি মুগ্ধ হইয়া যাও, সুন্দর জিনিষের প্রতি তোমার অমন আকর্ষণ, কিন্তু এই কথাটী মনে রাখিও অজ্ঞানার ভালবাসায় অনেক মালিন্য থাকে। কাজেই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্থূলের প্রতি তোমার এই যে আকর্ষণ, উহাতে অনেক ছলনা, অনেক অসত্যের বীজ সঙ্গোপিত।

কুমার সম্ভবে পার্ব্বতীর কথা পড়িয়াছ তো? যিনি মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই চাহিয়াছিলেন পার্ব্বতী রূপ দিয়া ভুলাইতে। কিন্তু পরিণামে কি দাঁড়াইয়াছিল? মহাদেবের কাছ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিয়াই এইজন্য "নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী"— পার্ব্বতী বাহিরের এই রূপকে মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলেন। আসল সৌন্দর্য্য যে ইহা নয়, পার্ব্বতী উহা বুঝিতে পারিলেন। এইজন্যই তপস্যা দ্বারা যথার্থ রূপকে বিকশিত করিয়া তুলিবার দরুণ তিনি কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিলেন।

সুন্দরকে, সত্যকে যদি একসঙ্গে লাভ করিতে চাও— তাহা হইলে তোমাকে তপস্যা অবলম্বন করিতেই হইবে। যৌবনের সৌন্দর্য্যের অস্থায়ী প্লাবনে যদি তুমি প্রলুব্ধ হইয়া পড়, তাহা হইলে দেখিবে সেই সৌন্দর্য্যে তোমাকে প্রশান্ত না করিয়া উত্তেজনায় উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। ভালবাসার আশ্রয় যেখানে স্থূল, সেইখানে যদি পরস্পরের চিত্ত অবিশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী!

আসল সত্য বা সৌন্দর্য্যের স্থান গভীরতম অনুভূতির মাঝে, বাহিরকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া এই জন্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্যপিপাসুর মন ক্রমশঃই অন্তর্মুখী সাধনার রস পাইতে থাকে। এমন অনেককে জানি, হঠাৎ পরস্পরের মাঝে ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই ভালবাসাকে পবিত্র— অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই তাহারা,— ইহার কারণ কি? কামনার মিলন, নিছক প্রয়োজনের মিলন খুবই অস্থায়ী এই জন্যই প্রয়োজনের বাহির হইয়া পড়িলেই তখন আর কাহারও প্রতি কাহারও লক্ষ্য থাকে না। পশুর মাঝে এই ভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু মানুষও আপনার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া অনেক ক্ষেত্রে পশু সাজিয়া বসে।

ভালবাসার পথ যে খুব সহজ পথ, তাহা আমিও অস্বীকার করি না বটে, কিন্তু তপস্বী হইতে না পারিলে ভালবাসাকে অবিকৃত রাখা সম্ভবপর হয় না, ইহাও আমি স্বীকার করি। প্রকৃত ভালবাসিবার, ভালবাসিবার পাত্র পাওয়াই দুষ্কর। অবশ্য কাহারও ভাগ্যে সেই পবিত্র সম্বন্ধ অনায়াসে জুটিয়া যায়, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত দুটী একটী মাত্র। অধিকাংশকেই তিল তিল করিয়া সাধনা করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। নিজে ভাল হইলে, নিজে পবিত্র হইলেই শেষ হইল না, যাহাকে ভালবাসিব সেও যেন ভালবাসার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইজন্যই আমি দেখি, প্রকৃত মিলন খুব কচিৎই হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি গোজামিল, আর এইজন্যই সম্মিলিত জীবনে কাহারও শান্তি নাই।

ভালবাসার পাত্র বা আধার যত বিশুদ্ধ হয়, ভালবাসার পবিত্র সম্বন্ধ ততই স্থায়ী হইতে থাকে। এইজন্যই ভগবানকে ভালবাসার পাত্র মনে করিলে, তাহাতে আর নিজের পতনাশঙ্কা থাকে না। পরম পবিত্র ভগবানকে ভালবাসিলে তাহা হইতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়—এই জন্যই ভগবদ্ভক্তের মনে কোন দিনই অপবিত্র ভাব আসিতে পারে না।

সুন্দরকে তপস্যার ভিতর দিয়া না পাইলে সেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে না। যৌবনের প্রথমাবস্থায় বাহিরের রূপটাই চরম মনে হয়, কিন্তু যৌবনের অজস্র রঙ্গীন কল্পনার মাঝে যদি একটু স্থিরচিত্ত হইয়া ভাবা যায়, তাহা হইলেই সৌন্দর্য্যের মূল কোথায় তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। বাহিরটা কাহাকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সুন্দর সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—অন্তরে এই প্রশ্ন জাগিলে বাহিরের প্রতি যে উপেক্ষা আসে তাহা নয়—কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্যানুভূতির তুলনায় বাহিরের রূপ তাহার কাছে হার মানিয়া যায়।

এই জগৎকে, এই জগতের সৌন্দর্য্যকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু আমার মনে হয়, মনের অনুসন্ধান না করিয়া স্থূলের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে অনেক খানি প্রবঞ্চিত হইতে হয়। তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্থূলের প্রতি যে স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আসে, তাহাকে আমি ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি না। না বুঝিয়া ভালবাসার নামই মোহ, আর বুঝিয়া ভালবাসার নামই জ্ঞান।

আমাদের ভালবাসা অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এইজন্যই ভালবাসা আমাদিগকে মুক্তি না দিয়া বন্ধনদশায় নিপতিত করে, আর ভগবানের ভালবাসা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এইজন্যই জগৎকে এত করিয়া প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াও তিনি চিরমুক্ত। তুমি লিখিয়াছ, স্থূল ছাড়া তুমি কিছুই বুঝ না, সুতরাং এই বাস্তব জগতের ভালবাসার ভিতর দিয়াই পবিত্র ভালবাসা বলিয়া যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহার আস্বাদন পাইবেই পাইবে— বেশ, ভাল কথা। তোমার এই সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি— কিন্তু তোমাকে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য আমার আর অন্য কিছু নয়, এই বাস্তব জগতের ভালবাসার মাঝে অনেক জটিল সমস্যা অনেক বিচিত্র দ্বন্দ্বের উদ্ভব হইবে, এই সব দ্বন্দ্বের মাঝেও যাহাতে তুমি তোমার আদর্শের কথা ভুলিয়া না যাও, এইজন্যই তোমাকে তপস্যার কথা বলিয়াছিলাম— এখনও আবার বলিতেছি। ভিতরে শক্তি সঞ্চয় না হইলে, দ্বন্দ্বে পড়িয়া অনেকেই লক্ষ্য হারা হইয়া যায়। তুমি আজ যে প্রাণের জোরে এই সব কথা বলিতেছ, সেই প্রাণের জোর যেন তোমার অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার দিকেই তোমাকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে

তুমি কথায় কথায় পাতঞ্জলের কথাও টানিয়া আনিয়াছ। 'যথাভিমত ধ্যানাদ্বা' এই সূত্রটীর উল্লেখ করিয়া তুমি তোমার বক্তব্য বলিয়াছ। আমি তোমার কথা একেবারে উড়াইয়া দিয়া তোমার বিশ্বাসে আঘাত করিবার কোন প্রয়োজনীতা দেখি না। সুতরাং তোমার বক্তব্যের প্রতিবাদ না করিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে জানাইব। ধারণার কথাপ্রসঙ্গে পাতঞ্জলের 'দেশবন্ধচিত্তস্য ধারণা' এই সূত্রটীর উল্লেখ করিয়াছ। যথাভিমতধ্যানাদ্বা— ইহার অর্থ তুমি করিয়াছ, যাহার ধ্যানে তোমার মন বসে, তাহার ধ্যানই তো তোমার পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু তুমি যাহার ধ্যান কর বলিয়া লিখিয়াছ, বাস্তবিকই কি তাহার ধ্যানে তোমার মন বসে? না, তোমার মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠে? এ বিচার আমার কাছে নয়, তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখিও। স্থূল আদর্শের এই জায়গাতেই মস্তবড় গলদ থাকিয়া যায়, এইজন্যই নিছক শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে আদর্শ ধরিলেই সর্বপ্রকারে কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। মোহে পড়িয়া শেষটায় মানুষ চিত্ত বিকারের হেতুকেই চিত্ত স্থৈর্য্যের উপায় বলিয়া মনে করে। ভাগবত তনু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূল তনুর প্রতি লক্ষ্য দেওয়াই উচিৎ নয়। 'ধারণার' কথা বলিতে গিয়াও তুমি ঠিক এইরূপই অনেক কথা বলিয়াছ। চিত্তকে দেশ বিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নামই ধারণা। এখন 'দেশবিশেষ' বলিতে কি তোমার কামনার স্থূল আশ্রয়কে বুঝিয়াছ? এই যদি বুঝিয়া থাক তুমি, তাহা হইলে শাস্ত্রকে সুবিধানুযায়ী ব্যাখ্যা ছাড়া ইহাকে আর কি বলিতে পারা যায়?

মোটের উপর আমার বক্তব্য এই যে তুমি যে পথ ধরিয়া তোমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাইতে চাও সেই পথই তোমাকে বাধা দিবে সর্বাগ্রে। জগতের সবই সুন্দর, কিন্তু সুন্দরের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে কেবল সৌন্দর্য্যপিপাসু হইলেই চলিবে না— সত্য পিপাসুও হইতে হইবে— এই কথাটি মনে রাখিও। আমার বক্তব্যের ইহাই চরম কথা জানিবে। ইতি—

তোমার…

তীর্থরেণু

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

যারা বেনিয়া, তারা যে শুধু মাল নিয়ে কারবার করে, তা নয়; পয়মাল করাও তাদের কাজ। যখন শোন মানুষের মুখে এই অজুহাত যে "এটা আইনে আছে, শাস্ত্রে আছে," তখনি জেনে রেখো, লোকটা একটা অকাণ্ড বাধালো বলে। আইনের জোরে দখল হচ্ছে বে-আইনী। সত্যিকার স্বত্ব জন্মায় ভালবাসায়। স্বত্বাধিকার মানে তো আমার নিজের করে নেওয়া? —তা এই জগৎটাকেই আমি আপন করে নিচ্ছি — আমি নিখিলের স্বত্বাধিকারী।

আইনের হুম্‌কি দিয়ে তুমি বাতাসে, মাটীতে, একটী পরমাণুতে তোমার দখলী স্বত্ব প্রমাণ করতে পার? ওই সমুদ্রতরঙ্গ তোমার হুকুম মানবে? ওই যে একটুকরা কর্পূর পরম যত্নে কাগজে মুড়ে রাখছ, ওকে বল দেখি, "ওরে তুই আমার!" ওতো উপে যাবেই, তুমি ওকে ধরে রাখতে পারবে? টাকাকড়িকে বলতে পারো, "ওরে তোরা আমার—আমার—আমার।" যতই বলনা কেন, এদিক দিয়ে কীটে আর কলঙ্কে তিল তিল করে সব খেয়ে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? নিজের দেহটা-কেই কি বলতে পার, ওরে তুই আমার! এই বলে এক আঙুল আয়তন তার বাড়াতেই পার, না কমাতেই পার?

স্বত্ব অর্থ কি? যা যার নিজ-স্ব, অর্থাৎ স্বরূপ, তাতেই তার স্বত্ব। বাতাসের স্বত্ব কি? পাথরের স্বত্ব কি? মানুষের স্বত্ব বা অধিকার হচ্ছে ব্রহ্ম-ভাব। জঙ্গল থেকে একটা লাঠি কেটে পালিশ করে বেড়াবার ছড়ি করে নিল কেউ। লাঠিটার পেছনে এতখানি যে খাটুনি, তার লাঠিটার ওপর স্বত্ব জন্মালো কিসে? লাঠিটা তো শুধু প্রকৃতিরই সৃষ্টি নয়—এটা যে কতকপরিমাণে মানুষের নিজের সৃষ্টি। লাঠিটাকে মানুষ আপন করে নিয়েছে, তার মাঝে সে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, এ তার অঙ্গীভূত হয়েছে, তাই এতে তার স্বত্ব জন্মেছে।

একটা লোক জাহাজে চড়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল তার কতকগুলি মোহর। মোহরগুলি নিরাপদে রাখবার জন্য একটা গেঁজিয়াতে পুরে বেশকরে সে কোমরের সঙ্গে জড়াল। ভাবল, মোহরগুলিতে এইবার তার জোর-দখল জন্মাল। দৈবাৎ জাহাজ ডুবি হওয়াতে সে-ও ডুবে গেল। তখন দেখে, তার মস্ত একটা ভুল হয়েছে। মোহরগুলিরই বরং তার ওপর জোর দখল জন্মেছে, কেননা আপন ভারে তারা যে তাকে তলের দিকে টেনে নিচ্ছে!

জগতে যা কিছু দেখছ সব দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের যাচাই হচ্ছে। হাতের মুঠোয় আনতে হবে সবই। আত্মশক্তির প্রয়োগ করতে পারলে তবে একটা জিনিষ ঠিক আপন হয়।

ছেলের হাত থেকে ছুরীটা কেড়ে নিই, কেননা সে তার ব্যবহার জানে না, অতএব ছুরীতে তার স্বত্ব থাকতে পারে না। সংসারের জঞ্জালে যার বুক পোরা, সে আরামে আছে না ব্যারামে আছে? কুকুরটা গাপোষের ওপর আরামে শুয়ে আছে, কোনো কিছুর ওপরই তার স্বত্ব নেই— তাই কি?

নিউজীলাণ্ড যাবার কড়ি যদি—হাতে না থাকে

তো অমরাবতীতে চল। অনেকদূর হাঁট্তেও হবে, আর রাস্তায় যেতে অনেক কিছু দেখ্তেও পাবে।

উপকরণকে পূজা কর্তে হয় না, শাসন করতে হয়।

আত্মস্থ হও—কিছুতেই স্বত্ব রেখো না, অতএব সবই ভোগ কর।

একটা লোকের ইচ্ছাশক্তির সামনে জগতের ইতিহাস নুয়ে পড়তে পারে, জান?

...হে মরণ! করালবদন নরকের বিভীষিকা! সাধ হয়েছে, তোমার মাঝে একবার ঝাঁপিয়ে পড়ি—একবার দেখে আসি, ভয় আর বিপদের সনাতন মুখোসগুলি কোথায় তুমি লুকিয়ে রাখ। একবার তাদের দেখে আসি, তারপর তো জানিই চিরকালের জন্য তারা অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে।

বিচিত্র-প্রসঙ্গ

দোলের সম্বন্ধে তুমি কিছু শুনতে চেয়েছ। যে জিনিষটা অতি পুরাতন অতএব সর্ব্বজন পরিচিত, তার সম্বন্ধে নূতন কথা বলা বড় শক্ত, তবে তা নিয়ে আলোচনা করায় সুখ আছে! বিশেষতঃ যাঁরা আমাদের অতি আপনার, তাঁদের নিয়ে আলোচনা কখনও যেন পুরাতন হতে চায় না! তাক লাগিয়ে দেবার মত কোনও কথা তোমায় শুনাতে পারব না, আর তা চাই ও না; হিন্দুর উৎসব নিয়ে অনেক তাক লাগানো কথা তোমারও হয়ত জানা আছে। সহজ আনন্দের ব্যাপারটীকে যদি আমরা সরল ভাবে বুঝ্তে পারি, তা হলেই যথেষ্ট হল না কি?

ইতিহাসের দিক দিয়ে হিন্দুর উৎসবগুলিকে যাচাই কর্বার একটা রেওয়াজ আছে। আমি ঐতিহাসিক নই, সুতরাং বল্তে পারব না, দোললীলার আদি কোথায়—খৃষ্ট জন্মাবার আগে, না পরে! যদি একটু লক্ষ্য করে দেখ, তাহলে বুঝ্তে পারিবে, হিন্দুর প্রায় সমস্ত উৎসবের মূলেই একটা সনাতনত্বের আভাস পাওয়া যায়। নিউটন কবে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তার তারিখ লেখা আছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটা কালের গণ্ডী ছাড়া—ওটা প্রকৃতির আইন! হিন্দুর উৎসব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যেতে পারে। হয়ত কোনো উৎসবের মূলে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বনিয়াদ কোনো দিন ছিল, কিন্তু হিন্দুর সর্ব্বসমঞ্জসা প্রতিভা ইতিহাসের সঙ্কীর্ণতা হতে তাকে মুক্তি দিয়ে নিত্য কালের বস্তু করে নিয়েছে! তাই আজ একটা উৎসবের গোড়ার ইতিহাস খুঁজ্তে গেলে শেষ পর্য্যন্ত আর থৈ পাওয়া যায় না। দেখি, হিন্দুর উৎসবের তত্ত্ব নিত্য, তার অনুষ্ঠান কালে অভিব্যক্ত মাত্র। তা ছাড়া এই উৎসবের মাঝে অন্তরে-বাইরে এমনি করে সুর মিলে আছে যে, বাইরের উৎসবটা মনে হয় শুধু অন্তরের অনুভবের রূপক মাত্র।

অনেকে বলেন, এই বসন্তোৎসব নববর্ষের উৎসব। একথা অবিশ্বাস কর্বার কোনও হেতু দেখি না। বেদ-সাহিত্যে বসন্ত হতে বর্ষগণনার কথা স্পষ্ট পাওয়া যায়! তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। স্বভাব-ধর্ম্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনেক অনুষ্ঠান আজ সংস্কারের সামিল হয়ে

দাঁড়িয়েছে – কিন্তু তার মূলে একটা স্বভাবের প্রেরণা না থাক্‌লে কিছুতেই তা সর্ব্বজনবরণীয় হতে পার্‌ত না। প্রকৃতির নববর্ষ বসন্তেই বটে! মানুষ যত বড় দাম্ভিকই হোক্ না কেন, সে যে প্রকৃতি ছাড়া, এ কখনো হতে পারে না! বসন্তে দেখ্‌তে পাচ্ছি— মুক্ত প্রকৃতির কোলে বসে আমি আজ যেমন করে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমরা বোধ হয় তাই তেমন করে দেখতে পাচ্ছ না—সবুজে সব ছেয়ে গেল! এই সবুজের সাড়া কি মানুষের বুকেও পড়ে না? একটা গাছ যেমন মাটীর বুক ফুঁড়ে উঠেছে, চরিষ্ণু মানবও তেমন করে বিশ্ব-প্রকৃতির মর্ম্ম ভেদ করে ফুটেছে! প্রকৃতির বুকে যখন শ্যামের আবির্ভাব হয়েছে, তখন তারও বুকে না হয়ে পারে না! সভ্য মানুষ সে ইতিহাস ভুলে যেতে পারে, কিন্তু অসভ্য প্রকৃতির দুলাল আজও তা ভোলে নি! আসামে আছ, দেশটাকে তত সুসভ্য মনে কর না। কিন্তু উৎসবের মাঝে স্বভাবের লীলা যত সহজে এ দেশে ফুটে ওঠে, তেমনটী আর কোথায়ও বুঝি দেখা যায় না। পাজির তিথিধরা উৎসব এখানে তত নাই— এখানে আছে 'বিহু' - আর এই চৈত্রের শেষে "রঙ্গালী বিহু"—যে বিহুর আনন্দ অনার্য্য অসভ্য পার্ব্বত্য মিরি জাতিকেও চঞ্চল করে তুলে ঘর ছাড়া করে। জানি, দোলের তিথির সঙ্গে বিহুর তিথি মিলে না, কিন্তু আমি সে দিক দিয়ে কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি, মানুষের অবিকৃত স্বভাবের অভিব্যক্তির কথা। সে স্বভাবটাই সত্যিকার সনাতন ধর্ম্ম-- যার অভিব্যক্তি জাতিভেদ যুগভেদ মানে না। বসন্ত প্রকৃতির নববর্ষ, মানুষের প্রাণ মহাপ্রকৃতিরই অভিব্যক্তি-- অতএব মানুষের প্রাণও এই বসন্তেই নববর্ষের উৎসবে মেতে ওঠে। সেই আনন্দের অভিব্যক্তিই এই দোল লীলায়, এই রঙ্গালী বিহুতে— প্রাচীন যুগের মদনোৎসবে। শুধু হিন্দুর এই উৎসব নয়; খুঁজে দেখ, এই বসন্তোৎসব নানা আকারে, নানা জাতির মাঝে চিরকাল হয়ে আস্‌ছে, আজও হচ্ছে। গ্রীকপুরাণ বর্ণিত Return of Propinein প্রকৃতির এই নববর্ষের উৎসব। ইংলণ্ডে আজও May-queenকে নিয়ে বসন্তের উৎসব হয়— সে উৎসব বৃন্দাবনের আনন্দোৎসবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। Roman Catholicদের মাঝে আজও Carnivalএর উৎসবপ্রমত্ততা মানুষের প্রাণে বসন্ত জাগরণের সূচনা করে।

দোললীলা যে সনাতন ধর্ম্ম উৎসব, তার হেতু মনে হয় এই খানে। হিন্দু প্রকৃতিরই পূজারী। মনে পড়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈদিকধর্ম্মকে 'প্রকৃতি পূজা' বলে খাটো কর্‌তে চেয়েছিলেন-- তাঁরা বলেছিলেন, বৈদিক ধর্ম্ম হচ্ছে- a religion without philosophy, a child like worship of nature. আমরাও কথাটা শুনে দমে যেতাম, ভাব্‌তাম, তাই বা হবে! আর ধর্ম্মের আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা বের কর্‌বার চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হতাম। আজ মনে হচ্ছে philosophyটা ধর্ম্মের বিকার— বিকার রোগীর প্রলাপ মাত্র। সহজধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ground যদি প্রকৃতির মাঝে নিহিত না থাকে, তা হলে তা কখনো একটা sustaining force হতে পারে না! আর childlike worshipএর কথা? —আজ শোন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কি বল্‌ছেন! সমাধির psychology নিয়ে গবেষণা কর্‌তে গিয়ে তিনি বল্‌ছেন— Introversion is nothing but a return to the uterine stage— বুদ্ধির evolutionকে উল্‌টিয়ে আবার মাতৃজঠরস্থ ভ্রূণের মত হয়ে

যাওয়াই হচ্ছে সমাধির psychology—যার জলন্ত উদাহরণ সে দিন রামকৃষ্ণ দেখিয়ে গেছেন।

তাই বলি ভাই, দোলের আনন্দে শুধু হিন্দুর প্রাণই দোলে না! সমস্ত প্রকৃতির বুকে যে নব-জাগরণের আনন্দ-হিল্লোল, হিন্দু তাকেই sublime করেছে— এই তার বিশেষত্ব! ইংরেজ আজ May-queenএর মাঝে দেখে নারীর তারুণ্যের লীলা বিলাস, তাই নিয়ে সে প্রমত্ত হয়। হিন্দু সেখানে দেখ্‌ত তার অন্তরের চিরন্তনী রাধিকার আবির্ভাব; দেখে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে নুয়ে পড়ত। এইটুকু জেনো হিন্দু genius—তুচ্ছকেও মহিমময় করে তোলা। এই হচ্ছে **মানবধর্ম্ম**।

বসন্তের এই আনন্দকে দোলের রূপ দেওয়া হ'ল কেন? আনন্দ স্থিতিতেও প্রকাশ পায়, গতিতেও প্রকাশ পায়। পুরুষের আনন্দ স্থিতিতে, প্রকৃতির আনন্দ গতিতে; এইটুকু বোঝাবার জন্য কালের বুকে কালীর নৃত্য! আচ্ছা বল্‌তে পার, গতির সনাতন রূপ কি? বৈজ্ঞানিক বলেন, সরল রেখায় ছুটে যাওয়াই হচ্ছে গতির ধর্ম্ম! সত্যি তাই; আমাদেরও প্রাণটা সরল সোজা রাস্তায় ছুট্‌তে পার্‌লে তৃপ্তি পায়! গ্রহ-নক্ষত্র সব সরল পথে ছুটে চলেছে—ঘর ছেড়ে যে বেরিয়েছে, তারই সরল সোজা পথ। কিন্তু যেমন কেন্দ্রাতিগ শক্তি বিশ্বলীলার একদিক, তেমনি কেন্দ্রানুগ শক্তিও আর একদিক। বিকর্ষণে যে অনন্তের দিকে সোজা ছুটে চলেছিল, আকর্ষণ তাকে টেনে রেখেছে কেন্দ্রের দিকে। এই দুইটী শক্তির ক্রিয়াতে সৃষ্টি হল—আবর্ত্তন, movement in a circle. বৈজ্ঞানিক বলেন, এই centripetal আর centrifugal force এর সমন্বয় বশতঃ ধ্রুব বিন্দুকে কেন্দ্র করে সৌর জগৎ নিত্য আবর্ত্তিত হচ্ছে। শুধু সৌর জগৎ নয়, একটা অণুর সংস্থানও তাই—শিব বিন্দুকে কেন্দ্র করে শক্তি বিন্দুর অবিশ্রাম আবর্ত্তন! জান, এই হচ্ছে সনাতন রাসচক্র? রাধাশক্তি বিশ্বাতিগ, কৃষ্ণশক্তি বিশ্বানুগ—দুটীর সামঞ্জস্যই হলো রাসের মণ্ডলী নৃত্য!

ভেবোনা আমি কৃষ্ণলীলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে বসেছি। শুধু এই বল্‌ছি, যতই দিন যাবে, ততই দেখ্‌তে পাবে বিজ্ঞান আর ধর্ম্মে বাস্তবিক বিরোধ নাই। বিজ্ঞান বহির্দ্দর্শন, ধর্ম্ম অন্তর্দ্দর্শন—বাহিরে ভিতরে সমস্তটা জগৎই এক সুরে গাঁথা। ধর্ম্মের একটা তত্ত্ব যখন বিজ্ঞানের একটা তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়, তখন কে কার কাছ থেকে চুরী করেছে, সে নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া বোকামী! দেখতে পাচ্ছনা ভাই, "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"--বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিকে যিনি প্রচোদিত করছেন, ধার্ম্মিকের বুদ্ধিকেও তিনিই প্রচোদিত করছেন। পরমাণুর অন্তরে বৈজ্ঞানিকও সেই নিত্যানন্দ বিলসিত চিন্ময়-চিন্ময়ীকেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে! Kelvinএর Vortex-rings আর শুকদেবের রাসচক্র--দুইই যে সেই সচ্চিদানন্দেরই অভিব্যক্তি; এতো কারু patent নয় ভাই!

আসল কথা কি জান, মানুষের মনটা বড়। যে মন বিজ্ঞানের সত্য দর্শন করে, সেই মনই আবার অধ্যাত্মতত্ত্বকেও দর্শন করে। মানুষের মনের মাঝে যদি দোলের লীলা না থাকত, তাহলে সে কোথাও সে লীলা প্রত্যক্ষ করতে পারত না--না বিজ্ঞানে, না ধর্ম্মে! আজ বৈজ্ঞানিক বল্‌ছেন, The whole universe is only rhythmic movements. সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, সমস্তটা জগৎই ছন্দ -'পৃথিবী বৈ ছন্দঃ, নক্ষত্রাণি বৈ ছন্দঃ' ইত্যাদি। দুটী কথা একেবারে এক নয়? একজন হয়ত বুদ্ধির পথ দিয়ে, intellect

এর ভিতর দিয়ে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, আর একজন বোধির পথ দিয়ে intuition এর পথ দিয়ে একই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। একটা মনের দান, আর একটা প্রাণের দান; কিন্তু মনে আর প্রাণ একই সত্যের দুটী পিঠ মাত্র নয় কি?

মানুষের মনে ছন্দ আছে, প্রাণে ছন্দ আছে, তাই জগৎটাকে ছন্দরূপে সে অনুভব না করে পারে না। আর এই ছন্দই দোল-লীলার তাৎপর্য্য! তুমি কবিতা ভালবাস, গান ভালবাস। মানুষ মাত্রেই এই দুটী জিনিষ ভালবাসে—এর মধ্যে সুসভ্য আর অসভ্য কোন তফাৎ নাই। কবিতার মূল কথাটাই হ'ল ছন্দ, গানের সুরের মূলে আছে ছন্দ। একবার ভেবে দেখেছ কি, কেন কবিতায় আর গানে আমাদের প্রাণ এমন করে সাড়া দেয়? মানুষ যখন আর কিছুই সৃষ্টি করে নি, তখনও সে কাব্য আর সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে; তার আনন্দের আদি অভিব্যক্তিই এই দুটী ছন্দোলীলাতে! বৈদিক ঋষি তাই বল্লেন, তুমি কবিমনীষী! তাই বল্লেন, সামের সুরেই সৃষ্টির আদি স্পন্দন. সামবেদই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা! গ্রীকপুরাণের orpheus এর কথা মনে পড়ে নাকি? Pythagoras এর music of the spheres এর কথা মনে পড়ে নাকি?

এই কবিতা আর সঙ্গীতই হচ্ছে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন দোললীলা। শব্দের মিলটুকু, সমের মিলটুকু এদের প্রাণ, মূল কথা হচ্ছে—বৈচিত্র্যের মাঝে বারবার এককে ফিরে পাওয়া, discord এর মাঝে harmony'কে বারবার সাক্ষাৎ করা—এতেই অন্তর আনন্দে দুলে ওঠে। আর জগতের যত philosophy, তার মূল প্রচেষ্টা কি এই নয়? বিশ্ব-মানবের হৃদয়-বৃন্দাবনে যে সর্ব্বসমঞ্জসা ভাবের দোললীলা, তাই কি philosophy নয়?

তোমার চিন্তায় এই দোল, তোমার কাব্যে এই দোল, তোমার সঙ্গীতে এই দোল, তোমার নৃত্যে এই দোল, জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তনে এই দোল। বাহিরের দিকে চেয়ে দেখ, ষড়ঋতুর আবর্ত্তনে এই দোল, বসন্তের বাতাস যে গাছের পাতাকে কাঁপিয়ে গেল, নদীর বুকে ঢেউ তুলে গেল, তারও মাঝে এই দোলের লীলা। ওই অনন্ত আকাশে যে সবিতা, "আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ"—তিনিও দুলছেন, উত্তরায়ণ হতে দক্ষিণায়ণ পর্য্যন্ত তাঁর হিন্দোলা বার বার আন্দোলিত হচ্ছে। কে জানে, রাধাকৃষ্ণের দোল-লীলা এই আদিত্যরূপী বিষ্ণুর দোললীলারই রূপক কিনা? এই দোলের এক প্রান্ত ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে, আর একপ্রান্ত শ্রাবণের পূর্ণিমাতে। একটী দোলায় প্রকৃতির জাগরণ ও পূর্ণ বিকাশ, আর একটী দোলাতে তার সংহরণ ও প্রলয়; তাই হয়ত প্রকৃতি-পূজারী হিন্দুর কাছে দোলে আর ঝুলনে সূচিত হয়েছে।

যাক, বাইরের দোল নিয়ে আর কিছু বল্‌তে চাই না। এখন অন্তরের দোল নিয়ে দু'চার কথা বলি। গোড়াতে গতির কথা বলেছিলাম। গতির যেটী সরল রূপ, সেইটী হল তুরীয় অবস্থা-- it is beyond the control of all agencies. সমস্তটা জগৎকে যদি জড়িয়ে দেখতে পারি, তাহলে দেখ্‌বে it is moving in an infinite straight line অথবা it is infinitely at rest—দুটা একই কথা। এই বস্তুটাই নির্ব্বিকল্প সমাধিগম্য প্রত্যয়। দোলের মূলে এই তত্ত্বটী আছে, তাই দোলের আগেই শিবচতুর্দ্দশী — সেখানে বহির্জগতের প্রলয়। এইটী জেনো হিন্দুর বিশেষত্ব! সংযমের ভিতর দিয়ে সে আনন্দকে চিরন্তন সত্যরূপে লাভ করতে চায়। তাই রাসের উচ্ছ্বসিত আনন্দের পূর্ব্বে তার ঘোর অমানিশায় প্রলয়ঙ্করী কালীর

আরাধনা, দোল পূর্ণিমার আগে ভূতচতুর্দ্দশীতে মৃত্যুঞ্জয়ের আরাধনা। এ-ও কিন্তু আর এক দোললীলা; আগেরটীতে শক্তিকে আয়ত্ত করে শিব শক্তির বিশ্বানুগ লীলা দর্শন, আর পরেরটীতে শিবকে প্রসন্ন করে শিবশক্তির বিশ্বাতিগ লীলা দর্শন। আগেরটী সাংখ্য, পরেরটী বেদান্ত। যাক্ সে কথা আর এখন নয়। শুধু এই বল্‌ছিলাম, হিন্দুর উৎসবেরও কেমন sceintific basisটা লক্ষ্য কর। বারো মাসে তের পার্ব্বণের যে ব্যবস্থা আছে, শুধু বাহ্যাড়ম্বর করে নয়, সাধকের হৃদয় নিয়ে যদি সেগুলোই অনুষ্ঠান করে যাও, তা হলে দেখবে, এযে শুধু বহিঃপ্রকৃতির পূজা তা নয়, এ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির জাগরণ—বাহিরে ভিতরে এমনি করে সুর বাঁধা রয়েছে। এই তো সত্যিকার universal sceince—religion. এই জিনিষটাকে নিজেদের জীবনে মূর্ত্তিমন্ত করে তুলে—গোঁড়ামী আর বাগাড়াম্বর ছেড়ে জগৎময় ছড়িয়ে দিতে পার ?

দেখ, এইখানে একটা কথা না বলে পারছি না। নিন্দাচ্ছলে কোনও কথা বল্‌ছি না, কেননা কোনো ধর্ম্মের esoteric sideটা না জেনে পাকামী করাকে নির্ব্বুদ্ধিতা বলেই মনে করি। তবুও Roman Catholic carnival বা বসন্তোৎসবের সঙ্গে হিন্দুর দোলের একটু তুলনা না করে পারছি না। হিন্দুর দোলের পূর্ব্বে শিবের আরাধনা, বহির্জগতের প্রলয় — মৃত্যুপতির আরাধনায় অমৃতলীলার আস্বাদন! ব্যাপারটা deeply real & psychological. কিন্তু Roman Catholicদের Carnival ঠিক তার বিপরীত। তাই Carnivalএর প্রমত্ততার পরেই তাদের Lent বা খৃষ্টের তপস্যার অনুকরণে তপস্যা—তারপর Easterএ সিদ্ধি। হিন্দুর Lent আগে, Carnival পরে, আর ইউরোপের Carnival আগে Lent পরে। আজও ইউরোপ ব্যাপী Carnivalএর প্রমত্ততা দেখা যাচ্ছে, কে জানে এইবার ইউরোপের Ash-Wednesdayর তিথি সমাগত প্রায় কিনা! নিন্দা করছি না বা নিজেদের খুব চতুর মনে করছি না! হয়ত একটা জাতির এই spirit. নিখিল মানবের যিনি অন্তর্য্যামী, তিনিই জানেন কাকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছেন!

যাক্, যে কথা বল্‌ছিলাম। গতির যেটা তুরীয় রূপ, সেটা সাধ্য; আর তার যে লীলায়িত রূপ, সেটা জ্ঞানীর সিদ্ধি, অজ্ঞানীর বন্ধন। গতির দুটী universal aspect আছে, একটী unlimited তাকেই বলেছি তুরীয়; আর একটী হচ্ছে limited, তার প্রকাশ আবর্ত্তন বা movement in circleএ! হিন্দুর দর্শনে এইটাকেই বলা হয়েছে সংসারচক্র, পুনরাবৃত্তি, জন্মমরণ-প্রবাহ ইত্যাদি। কি করে এই movement in circle থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, সেই হচ্ছে সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান একবার হয়েছে রাসলীলাতে, কাল শক্তির আরাধনায়। রাসও movement in circle, কিন্তু তা গুণাতীত। আত্মারামকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রকৃতির অনন্ত আবর্ত্তন, চিরন্তন আনন্দোল্লাস—এটা প্রকৃতিরই সাধনা, এ সাধনার মূলে সাংখ্য।

চক্রাবর্ত্তন হতে অব্যাহতি পাবার আর এক উপায় হচ্ছে দোল! দোলটা কি জান? movement in semicircle. দোলনায় চড়ে দেখেছ? momentumটা নিজের ভিতর থেকেই দিতে হয়; তার যে pointএ তুমি climaxএ পৌঁছাচ্ছ—সেই pointএ আত্মশক্তির বলে গতিরোধ করে তাকে উজান পথে চালাতে হবে—এই হল দোলের mechanism. রাস চক্রে পুরুষ স্থির ছিলেন, আর দোলায় পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে

সামরস্যে দুলছেন— কিন্তু এখানেও তিনি ভগবতের ভাষায় বলতে গেলে; "অন্তরবরুদ্ধ সৌরতঃ।" এইটুকু বোঝাবার জন্যই দোলের আগে শিব পূজার ব্যবস্থা! জান তো, দোলের আগে বহ্ন্যুৎসব বা হোলিকা দহন করতে হয়? তার মূল কথাটা কি? পুরাতন বর্ষের সমস্ত আবর্জ্জনা পুড়িয়ে দেওয়া। হতে পারে, এই বহ্ন্যুৎসব প্রকৃতির আইনও বটে। এখানে পাহাড়ের কোলে বসে নিত্যই প্রকৃতির বহ্ন্যুৎসব দেখতে পাচ্ছি— আর সঙ্গে সঙ্গে দেখছি প্রাণের নবজাগরণ! কিন্তু অন্তরেও একটা বহ্ন্যুৎসবের প্রয়োজন আছে। তাই মদনভস্ম। শিব এসে পার্ব্বতীকে বুকে তুলে নিলেন, কিন্তু তার আগে "স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার।"

এই বহ্ন্যুৎসব ছাড়া কখনো দোলের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। প্রকৃতিকে যদি ভোগ করতে চাও তো আগে প্রাণে আগুণ জ্বালাও— সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক্, সেই ভস্মমুষ্টি গায়ে মেখে শিব হয়ে যাও। শ্মশানেশ্বর হয়ে তবে বহ্ন্যুৎসবে মাত। আর জেনো, শিবচতুর্দ্দশীতেই দোলের প্রতিষ্ঠা— এই যেমন আমার চারদিকে দেখতে পাচ্ছি, শ্মশানের বুকে বসন্তের উৎসব, একদিকে চিতা জ্বলছে, আর একদিকে নবীনপ্রাণ মুকুরিত হচ্ছে! বাস্তবিক, মরণের ভিতর দিয়েই অমৃতের পথ, Lentএর পরই Carnival সত্য।

রাসে আর দোলে যে একটু পার্থক্য আছে, তা বোধ হয় বুঝতে পারছ? সাধনার দিক দিয়ে এর পৌর্ব্বাপর্য্যটুকুও লক্ষ্য করবার বিষয়। সম্ভোগই সত্যকার ধর্ম্ম, কিন্তু সে সম্ভোগ কামনার দহনে, সংযমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত! রাসচক্র আত্মারামের সম্ভোগের চিত্র, কিন্তু এখানে প্রকৃতিই সাধিকা। তাই গোপীর কাত্যায়নী পূজা, তাই তার বস্ত্রহরণ বা পাশমুক্তি। অবশ্য বস্ত্রহরণের অন্য রহস্যও আছে, সে কথা আজ নয়। অমানিশায় কালীপূজায় শক্তির উদ্বোধন হল। বাইরের জগৎ যখন সুপ্ত, তখন তোমার অন্তরে দীপালি— প্রকৃতি জাগলেন, মূলাধার হতে কুণ্ডলিনী সহস্রারে উঠে সমাধি মগ্ন শিবকে অধীর আবেগে চুম্বন করলেন, শিব চোখ মেলে চাইলেন শুধু— প্রকৃতি নিবিড় আলিঙ্গনে শিবকে জড়িয়ে ধরলেন। শিবশক্তির এই বিপরীত রতিটুকুই অন্তরের রাস, এইটুকুই শারদপূর্ণিমার রাসের ভূমিকা।

ভাগবত বলছেন, রাসেশ্বর প্রকৃতিকে "বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে," রমণের বাসনা তাঁর মনে উদয় হল বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি "আত্মারামোহপ্যরীরমৎ"— তিনি নিজে আত্মারাম থেকে প্রকৃতিকে রমণ করালেন। রাসে যে তিনি "অন্তরবরুদ্ধ সৌরত" এ তাঁর প্রকট অবস্থা। রাস চক্রের কেন্দ্রে পুরুষ স্থির—প্রকৃতি নৃত্যচঞ্চলা, realityর এই হচ্ছে subjective aspect. এখানকার পথ হচ্ছে উজান পথ—নিরোধের সাধনা দ্বারা আত্মপ্রকৃতির শোধন চাই, অভ্যাসযোগদ্বারা অটল স্থৈর্য্যের অধিকারী হওয়া চাই। এই সাধনায় প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পুরুষাভিমুখী হবে, তাই এর মূলে রয়েছে সাংখ্য বিজ্ঞান।

রাসচক্রে তিনি অটল, প্রকৃতির সঙ্গে দোলায় দুলতে পারেন তিনিই। দোল পুরুষের সম্ভোগ। এখানেও তিনি "অন্তরবরুদ্ধ সৌরত" বটে, এখানেও তিনি 'অচ্যুত', কিন্তু তবুও প্রকৃতির অনুরাগের ফাগে তিনি রঞ্জিত, লীলাচ্ছলে প্রকৃতির ধর্ম্ম তিনি কতকটা স্বীকার করে নিয়েছেন। এই দোল পুরুষের বিলাসের চূড়ান্ত—এ দোলা মাটীকে

ছুঁয়ে যেতে চায়, অথচ ছুঁয়ে যায় না—রসিকের ভাষায় বলতে গেলে, "সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচায় সাপ না গিলয়ে তায়।"

আর একটা লক্ষ্য করো, বহিঃপ্রকৃতির তরফ থেকেও এই দুটী লীলার একটী সাধন সঙ্কেত পাওয়া যায়। রাসের পর কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির জাগরণ। একই তত্ত্বেরই রাস হচ্ছে esoteric side, দোল exoteric side. সাধনার বেলাতেও তোমায় এই ইঙ্গিত অনুসরণ করে চলতে হবে। রাসের সময় যে বাহিরের জগতে কপাট পড়েছিল, সে কপাট রুদ্ধ রাখতেই হবে, যাবৎ না চিন্ময়ী বীণাপাণির আবির্ভাব হয়। জ্ঞানের উন্মেষে তবে তোমার সম্ভোগের অধিকার জন্মাবে— তবে তুমি স্মরজিৎ শঙ্কর হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সামরস্যের দোলায় দুলতে পারবে।

Reality'র objective aspectটা আমরা অতি সহজে গ্রহণ করতে পারি, কেননা এটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহজ ধর্ম্ম। কিন্তু objective reality কে আমরা হাতের মুঠায় রাখতে পারি না কেন? অধ্যাত্মসাধনার মাঝেও মানুষের প্রাণে এই প্রশ্নই জাগে। এর উত্তর রাস আর দোলের সাধনায় পাই। Subjectivity দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারলে তবে objective worldএ তাকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে দোলানো যায়। জগৎটাকে যদি দোলা দিতে চাও, তাহলে আগে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর, রাসচক্রে অটল থাকতে শেখ, শিব হয়ে অপরে বহ্ন্যুৎসব কর।

—ওম্—

গলদ কাহার?

পরিচালক বা নেতা সবাই হতে পারে না অমল! ভগবান সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বিষয়ে তাদের গুণী করে সৃষ্টি করেন বলেই, কেহ কেহ জন্ম থেকেই সকলের উপর নির্ব্বিরোধ কর্ত্তৃত্ব করে যেতে পারে। তুই সেদিন নন্দকুমার বাবুর কথা বলছিলি। আমি বেশ জানি কর্ত্তৃত্ব করবার লোভটাই আছে উনার, কিন্তু আসলে সে শক্তি নাই। লোভী বলেই কর্ত্তৃত্ব করতে গিয়েও যে অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়, অপরের মন জুগিয়েও চলতে হয়, নিজের আচার-আচরণ-ব্যবহার দিয়ে যে আস্তে আস্তে সকলের হৃদয় দখল করতে হয়, সে সঙ্কেত তিনি জানেন না। এই জন্যই সবাই তাঁর আদেশ অবহেলা করুক বলে সর্ব্বদাই তিনি অমূলক আশঙ্কা অভিমান দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন। তিনি থাকবেন সর্ব্বদা প্রভুর কড়া মেজাজ নিয়ে, অথচ অপরে কেন তাঁর সঙ্গে মন-প্রাণ খুলে মিশে না, এই হ'ল তাঁর এক অন্যায় আব্দার। একজন আর একজনের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারে হৃদয়ের মহত্ত্ব দিয়ে, আইন কানুন দিয়ে নয়। হৃদয়হীন কর্ত্তৃত্বে মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয় না, এরূপ কর্ত্তৃত্বের প্রভাবে সংস্কৃত মানুষের মনে ঘুণ ধরে। তখন দোষ হয় অপরের, কিন্তু নিজের ব্যবহার-আচরণ-বাক্যের দোষেই যে অপরের এই বিকৃতি, তা কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। এই জন্যই মনে হয় নন্দকুমার বাবু যদি অনর্থক কর্ত্তৃত্বের লোভে প্রলুব্ধ না হয়ে উঠতেন, তবে কিন্তু তাঁর দিনগুলি বেশ শান্তিতেই কাটত। কিন্তু হলে কি হবে—কর্ম্মভোগ তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। এত আঘাত, এত ব্যর্থতা, তবু তার এক বাতিক!

কাঠের পুতুলকে যেমন ইচ্ছা তেমনি নাচানো যায়, কিন্তু মানুষ তো কাঠের পুতুল নয়, তার মাঝে যে প্রাণ আছে, স্বাধীন ইচ্ছা আছে, এই জন্যই অপরের মনোমত এক তালে, এক সুরে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আমার মনে হয়, মানুষ যখন মানুষের উপর স্কন্ধ হয়ে ওঠে, তখন বোধ হয় মানুষ যে মানুষ— এ কথাটা আর তাদের স্মরণ থাকে না, তারা মনে করে কাঠের পুতুল তো কেমন সুন্দর নাচে, তবে মানুষই বা কেন নাচবে না? কথাটা যে কতবড় অযৌক্তিক তা কিন্তু সকলই বুঝে, কিন্তু প্রভুত্বের প্রলোভনে যাদের দৃষ্টি অন্ধ, তারা জেনে শুনেই এই অযৌক্তিক কথার উপরই জোর দেয় বেশী।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যাঁর রয়েছে, তিনিই নেতা বা পরিচালকের আসন গ্রহণ করার যোগ্য। এই বিবেকানন্দের কথাই ধর না। তাঁর কোন্ দিকে শক্তির ন্যূনতা ছিল? দর্শন, কাব্য, মনস্তত্ত্ব, যখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সবটাতেই যেন তাঁর সমান অধিকার। এইজন্যই বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ নিয়েও তিনি একটা সঙ্ঘ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কেননা সকলের মনের প্রাণের খোরাক জোগাবার শক্তি উনার ছিল। কিন্তু আজ কাল অধিকাংশই প্রভুত্ব করতে চায় নিজের দৈন্য নিয়ে। একি কখনো সম্ভব?

পাঁচজনকে নিয়ে সঙ্ঘ গড়ে তুলবার সাধ নন্দকুমার বাবুর যথেষ্টই আছে, আর এ আকাঙ্ক্ষা থাকা খুবই ভাল কথা, কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির পাঁচ জনকে পরিচালন করবার শক্তি আছে কিনা উনার—একথা তিনি মোটেই তলিয়ে দেখতে চান না। একটা আদর্শ সঙ্ঘের মাঝে জ্ঞানী, কর্ম্মী, সাধক, চিন্তাশীল, ভাবুক সকলেরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এদিক দিয়ে নন্দকুমার বাবু কাকে কি সাহায্য করতে পারেন বল্ তো দেখি? ছেলেরা যে উনার প্রতি বিরূপ— একি সাধে?

আমি এর গলদ কোথায় তা আবিষ্কার করে ফেলেছি অমল! আমার মনে হয় অনেক সঙ্ঘের ব্যর্থতা অনুপযুক্ত পরিচালকের দোষেই সাধিত হয়ে থাকে। যোগ্যতা না থাকলে, অভিমানকেই অনেক মানুষ যোগ্যতার আসনে বসিয়ে প্রভুত্ব করতে চায়। নন্দকুমারবাবুর গলদ এইখানে। তিনি খুব কর্ম্মী এ কথা মানি বটে, সঙ্ঘের একমাত্র কর্ম্ম পরিচালনার ভার নিয়ে থাকবার যোগ্যতা উনার আছে, কিন্তু সার্ব্বভৌম কর্তৃত্ব করতে হলে যে সব বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও গুণের আবশ্যক, সে গুণ—সে প্রতিভা তো উনার নেই! এই জন্যই বলছিলাম যে সঙ্ঘ পরিচালনার সর্ব্বতোমুখী গুণ সকলের থাকে না, আর এর দরুণই সঙ্ঘের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াও দুষ্কর।

নেতা বা পরিচালকের কাছে গিয়ে সকলের প্রাণের সকল জ্বালা উপশম হবে— কিন্তু নন্দকুমার বাবুর প্রভুত্বের অভিমান নিয়ে উনার চারিপাশে যে সীমানা দিয়ে নিজে সুরক্ষিত, তার কাছে তো অন্যের যাবার পথ নেই! কতখানি ধৈর্য্যশালী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হলে যে মানুষ মানুষের পরিচালক হতে পারে, এ দিক দিয়ে উনার বিন্দুমাত্র চিন্তা হয় না। কোথায় উনার কাছে গিয়ে সকলে শান্তি পাবে, না তিনি নিজেই অশান্তির আগুনকে উস্কিয়ে তুলেন। অথচ অকৃতকার্য্যতার দরুণ উনারই কিন্তু অভিমান বেশী।

এইজন্যই আমার একটা কড়া অভিমত আছে অমল! আমি বলি দুর্ব্বলের কোন দিন সঙ্ঘ হতে পারে না—তাতে কেবল অশান্তি, উপদ্রবেরই সৃষ্টি হয়! শক্তি সম্পন্নদের দিয়েই প্রকৃত সঙ্ঘের সৃষ্টি সম্ভবপর। সঙ্ঘ শক্তিশালীদের সমাবেশ

ক্ষেত্র, সেখানে দুর্ব্বলের স্থান নাই! কেন না আদর্শের মাঝে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে তো তা ঠিক ঠিক আদর্শই হল না। সকল দিক্ দিয়ে নিজের যোগ্যতা অর্জ্জন না করে কর্ম্ম ক্ষেত্রে নামাই উচিত নয়। আর নিজের অযোগ্যতা থাকলে সকলের আহ্বানের প্রলোভনকেও প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু অনেকেই কর্ত্তৃত্বের লোভ সংবরণ করতে পারে না। নন্দকুমার বাবু বাইরে যতই নিরভিমানী বলে নিজকে ব্যাখ্যা করুন না, উনার ভিতরে এই কর্ত্তৃত্বের প্রলোভনটাই সব চেয়ে বড়। আমার কথাগুলো গভীর ভাবে তলিয়ে তার পর তোর অভিমত জানাস্!

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন, মঙ্গলবার— বৃন্দাবনের মাতাজীর পায়ের অসুখ বেশী হওয়ায় বের হব কি হব না এই করতেই অনেক সময় কেটে গেল। তার পায়ে কানাইয়া লতার ডোগা পাতা লবণ দিয়ে চটকিয়ে তারই রস লাগান হচ্ছে। অনেক বিচার বিবেচনার পর সামান্য এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হয়ে গেল। স্বর্গ লছমী হতে বের হয়ে ক্রমশঃ নিম্ন পথে আধ মাইল আসার পর **ভৈরবশীলা** পেলাম। ভৈরবজীকে প্রণামাদি করে আরও দেড় মাইল ক্রমশঃ নিম্ন পথে উৎরাই করার পর গৌরীকুণ্ড পেলাম। এই গৌরীকুণ্ডের বিবরণ যাবার সময় পাঠকদের বিস্তারিতরূপে জানিয়েছি। এখানে এবেলা থাকলে মন্দ হত না, কিন্তু অনেকের ইচ্ছা না থাকায় আবার চলতে লাগলাম। ধীরে ধীরে দুই মাইল পথ অতিক্রম করে **মুণ্ডকাটা গণেশ** পেলাম। এ মুণ্ডকাটা গণেশের বিস্তৃত বিবরণ তথা তার অদ্ভুত পরাক্রমের কথাও পাঠকদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি। এখানে গণেশজীকে প্রণাম করে আবার ক্রম নিম্ন পথে আধ মাইল যাবার পর পূর্ব্ব বর্ণিত **শোনপ্রয়াগ** পেলাম, এই শোন প্রয়াগ হতে আমাদের দক্ষিণের পথে যেতে হবে। এখান হতে দুটী রাস্তা গিয়েছে, একটী ত্রিযুগী নাথে, যে পথে আমরা উৎরাই করে এসেছিলাম সে ডাইনের রাস্তাটি, অন্যটি হরিদ্বার বা বদরীনারায়ণের দিকে— দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ বাম দিকে যে পথটি খাড়া চড়াই সেই পথে (এই পথে বদরীনারায়ণ ও হরিদ্বার যেতে হয়) যেতে হবে। এখানে বেশ খাবার পাওয়া যায়। আমরা সকলেই গরমাগরম পুরী ও মিষ্টিদ্বারা সাধারণ ভাবে জলযোগ করে দক্ষিণের পথে চড়াই করতে লাগলাম। এক মাইল চড়াই করে একটী জংশন স্থানে এসে পৌছলাম। যারা হরিদ্বার হতে এদিকে আসেন, তাঁরা এই জংশনে এসে উপরের পথে ক্রমোচ্চ চড়াই করে উত্তর দিকে যেয়ে প্রথমে শাকম্ভরী দেবীকে দর্শন করেন, পরে ত্রিযুগী নারায়ণে যান। এই শাকম্ভরী দেবীর স্থান হতে সিধা উৎরাই অন্য একটি পথ এসে শোন প্রয়াগে মিলিত হয়েছে। আমরা

ভৈরব শিলা ½ মাইল

মুণ্ডকাটা গণেশ ২ মাইল

শোন প্রয়াগ ½ মাইল

যাবার দিন ঐ পথে উৎরাই করে কেদারনাথে গিয়েছিলাম, বোধ হয় পাঠকদের মনে আছে। আর যাঁরা ত্রিযুগী নারায়ণে না যেয়ে কেদার নাথে যান, তাঁরা ডান দিকের পথে খাড়া উৎরাই করে শোন প্রয়াগ হয়ে কেদার নাথে যান— যে পথে আমরা এলাম। এখান হতে যে পথটি ত্রিযুগী নারায়ণে গিয়েছে, সে পথটি বেশ খাড়া চড়াই বটে। তবে খুব বন জঙ্গলাবৃত অরণ্যের ভিতর দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা এবং মনোরম বটে। এই জংশনটি রুদ্র প্রয়াগ হতে ৩৭½ মাইল, কেদার নাথ হতে ১০½ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে কোন চটী বা ধর্ম্মশালাদি কিছুই নাই। অনেক যাত্রী এখানে পথ ভুল করে থাকেন, তাই এ স্থানের বিবরণ বিশদ ভাবে জানালাম। আমরা এস্থান হতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে আরও ১½ মাইল আসার পর

রামপুর
৭ মাইল

রামপুর চটী পেলাম। শোন প্রয়াগ হতে রামপুর আড়াই মাইল। রামপুর আসার ১ মাইল পূর্ব্বে অর্থাৎ ত্রিযুগী নারায়ণের যাবার জংশন হতে আধ মাইল এসে ঝরণার স্রোতে কাঠের ঘটী বাটী আদি তৈরী কচ্ছে দেখতে পেলাম। জিনিষগুলি দেখতে বেশ সুন্দর বটে। লোভও হয়েছিল কিনবার জন্য; কিন্তু বোঝার ভয়ে কিনি নাই। অনেক যাত্রী কিনে আনেন বটে! আজ আমরা সকাল বেলাই ৭ মাইল পথ চলে এসেছি, বিকেলবেলা অত্যধিক বৃষ্টির জন্য বের হতে পারি নাই। এপথে এবার যাত্রী খুব কম হওয়ার জন্য চটীতেও যথেষ্ট জায়গা মিলে, তথা দুধও যথেষ্ট মিলে, দামও বেশ সস্তা, তিন আনা সের।

রামপুর খুব বড় চটী। বড় বড় ঘরবালা ১৫ ১৬ জন দোকানদার আছেন। এ ছাড়া বাবা কালী কম্বলী বালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। আমরা সদাব্রত নিলাম। অতি সুন্দর ঝরণার জল পাওয়ায় জামা কাপড়াদি সাবানদ্বারা পরিষ্কার করা গেল। বাবা কালীকম্বলীবালার ধর্ম্মশালা হতে গরীব যাত্রীদের শীত নিবারণের জন্য কম্বল কর্জ্জ দেওয়া হয়। ফিরবার সময় কম্বল ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

বিকেল বেলা আমরা পাক করি নাই। ত্রিযুগী নারায়ণের মত এখানে দোকানদারকে দিয়াই এক সের পুরী ভেজে নি। তাকেও আধপোয়া ঘী ময়াম দিয়ে আধ পোয়া পুরী বেশী নিব কথা হয় এবং সে আধ পোয়া ঘীয়ের দাম তাকে অতিরিক্ত দিব বলা হয়, সেও তাই স্বীকার করে খুব উৎসাহের সহিত পুরী বানাতে লেগে গেল। তাকে বলে দিলাম পুরীর সঙ্গে শাক চাই। এখানে শাকের খুব অভাব—আলু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। চটীবালা পুরী বেচে লাভের আশায় পাহাড় ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি খুব বড় বড় ঢেকি শাক (যা বাংলা দেশে আমরা কখনও খাই নি বটে, তবে কলিকাতার বাজারে বিক্রি হতে দেখেছি।) জোগাড় করে নিয়ে এল। সেই ঢেকি শাকের শাক তথা আধ সের ডাল পাকায়ে দিবে। সে ডালের দাম আলাদা দিব। আজ যেরূপ প্রবল জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল তাতে চটীবালাকে দিয়েই পুরী, শাক, ডাল তৈরি করে নেওয়াই সুবিধাজনক বুঝেছিলাম, নতুবা জলে ভিজে ভিজে কষ্ট পেতে হবে যে! পাছে চটীবালা আটাতে ঘী ময়াম না দেয় তথা পুরী ভালরূপ ভাবে না ভাজে, সেই জন্য আমি, বড় মা, সারদা ভায়া, হরিদাস ভায়া, তার পুরী ভাজার কড়াইয়ের চারিদিকে ঘিরে বসে আগুণ তাপতে ছিলাম। বেশ শীতও ছিল বটে! চটীবালা অত্যধিক লাভের আশায় এত আনন্দিত হয়েছিল যে, সে একা পুরী তৈরী না করে তার

জন্য একজন বড় ভাইকে —(সেও এক চটীবালা) ডেকে এনে নিজে পুরী বেলতে থাকে এবং তার ভাইকে পুরী ভাজতে দেয়। যে চটীবালা এসে পুরী ভাজতে আরম্ভ করলো, সে খুব হুঁসিয়ার তথা বুদ্ধিমান বলে খ্যাত। আমাদের চটীবালা মনে করেছিল, তাকে দিয়ে পুরী ভাজালে নিশ্চয়ই লাভ বেশী হবে। এ চটীবালা কখনও পুরী তৈরী করে বিক্রি করে নি। যদি কেউ অর্ডার দেয় তো তৈরী করে দেয়। এরা সেই হিসেবে এক সের পুরী ভাজার জন্য নূতন ধোয়া কড়াই চাপায়ে তাতে আধ পোয়া ঘী মেপে নিয়ে (আমাদের সামনে) তাতে পুরী ভাজতে আরম্ভ করলো। কয়েকখানা পুরী ভাজার পরই সমুদয় ঘী শেষ হয়ে যাওয়ায় পুনরায় মেপে আধপোয়া ঘী দেয়। যখন এক পোয়া ঘীতেও অর্দ্ধেক পুরী ভাজা হল না, তখন মনে করলো আমরা বাঙ্গালী যাদু জানি; বোধ হয় যাদু করে আমরা তার ঘী উড়িয়ে দিচ্ছি। তারা দুজনে ভীত হয়ে বাকী পুরীগুলি ভাজতে নারাজ হয়ে গেল। আমাদের আবার চার জনের একসের পুরী না হলে চলবে না। কাজেই শাসায়ে আরও এক পোয়া ঘী দিয়ে বাকী সব পুরী ভেজে নিলাম। এক সের পুরী ভাজতে আধসের ঘী খাওয়ায় তারা দুজনে এমন ভীত হয়েছিল যে পুরী ভেজেই তারা দুজনে এখানকার সমুদয় চটীবালার কাছে যেয়ে ভীত চিত্তে এ বিষয় বলাতে ক্রমে ক্রমে সমুদয় চটীবালা এসে ভীত চিত্তে আমাদের দেখে গেল। এদেশে, শুধু এ দেশে কেন সমুদয় ইউ-পী, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতনা, মধ্যভারত, গুজরাত, কাঠিয়াবার প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রবাদ আছে যে "বাঙ্গালী অব্বল দরজার যাদুকর।" তার উপর যদি কামরূপ কামাখ্যার বাঙ্গালী হয় তো সে নিশ্চয়ই যাদু জানে বলে এদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমি একবার রাজপুতনায় এক বিপদে পড়েছিলাম। হিমালয় হতে নেমে আমি রাজপুতনায় যোধপুর অঞ্চলে বড় একজন জায়গীরদারের ওখানে আশ্রমের প্রচারে উপস্থিত হই। পরিচয়পত্র সঙ্গে আছে। সে জায়গীরদারের রাজা উপাধি। তার সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি আমার থাকার ভালরূপ বন্দোবস্ত করে দিলেন. আমি সেখানে বেশ আনন্দে কয়েক দিন কাটাবার পর, একদিন রাত্রি বেলা তাঁরই একজন বৃদ্ধ চর (তার এক চোখ কাণা, বয়সে প্রায় ৭০ হবে) এসে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করার পর আমার জন্মভূমির কথা জিজ্ঞাসা করায় আমি "বাংলা দেশে" বলি, তথা আসামের আমাদের মঠের কথাও জানাই। কথায় কথায় একথাও বলি যে কামাখ্যা হয়েই আসাম মঠে যাবার রাস্তা। সে বেচারী যখন শুনলো যে আমি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, তার উপর কামাখ্যার উপরে আসামে আমার গুরুকুল, তখন নিশ্চয়ই আমি যাদু জানি এই ভয় তার হৃদয়ে জমে গেল। তখন রাত ১০টা। সে বেচারী আমার নিকট হতে বিদায় নিয়ে, সেই রাত্রিবেলাই ছুটে ছুটে যেয়ে রাজাকে এ সংবাদ দেয়। রাজা সাহেবকে পাছে যাদু করে নিই, এই ভয়ে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রাজা সাহেব, তার মন্ত্রী, কেসিয়ার গার্ড ও সেই কাণা সকলে এক সঙ্গে মোটরে চড়ে পালায়ে যায়। তারপরও সেখানে আমি ৭।৮ দিন ছিলাম, ঐ দিনের মধ্যে আর তাদের নাম গন্ধ পাই নাই। আমার কাছেও আর কোন লোক আসে নি। অগত্যা সেখান হতে পোটলা তুলতে হল। এখনও এ দেশ বাংলার নামে এত ভীত!

আজ এখানেও সেই অবস্থা। আমরা যতই তাদের বুঝাতে যাই, তারা ততই উল্টো বুঝে। সে চটী বালার কাছে দই ছিল, আমাদের দিয়ে

বলেছিল; পাছে দইও যাদু করে উড়ায়ে দেই, সেই ভয়ে সে বেচারা কাঠের সিন্দুকস্থ দইয়ের ভাঁড় বের করে নি। বরং অন্য একজন দোকানদারের নিকট হতে আরও একটি তালা এনে তাতে লাগিয়ে দিল। দুটী তালা থাকতে আর যাদু করে নিতে পারবো না এই বিশ্বাস। মাঝে মাঝে আমাদের কেমন আনন্দ হত বুঝে নিন।

১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, বুধবার— সারা রাত ভরে প্রবল জোরে বৃষ্টি হয়েছে। শীতও বেশ পড়েছিল, কিন্তু শেষ রাতে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় ভোরে উঠেই রওনা হলাম। আমরা এখন ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি। বৃন্দাবনবাসিনী মাতাজীর পা আজ অনেকটা ভাল। তাকে সঙ্গে করে ধীরে ধীরে চলে দুই মাইল আসার পর

বাদলপুর
২ মাইল

বাদলপুর চটী পেলাম। মাঝে ঝরণার জন্য মাঝারী গোছের দুটী চড়াই উৎরাই করতে হয়েছে। আমরা বাদলপুর না থেমে ধীরে ধীরে আরও আড়াই মাইল চলার পর **কাটাচটী** পেলাম,

কাটাচটী
২ মাইল

কাটাচটী বেশ বড় তথা খুব ভাল চটী। এখানে বেশ বড় বড় ২৫।৩০ খানা দোকান, সরকারী ডাকবাংলা, ধর্ম্মশালা, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের ও মিঠাইর দোকান, কাপড়াদি, ষ্টেশনারি জিনিষাদি, জুতা, চিমনী, কম্বল, কেদারবদরীনাথের মাহাত্ম্যাদি বই, ফটো, আংটী, প্রভৃতি অনেক জিনিস পাওয়া যায়। টিহরীর পর এত বড় চটী আর আমরা পাই নাই। জিনিষপত্রও অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশ সস্তা। যাঁরা মোট বইতে পারেন, তাঁরা কেদারনাথে যাবার সময় আবশ্যকীয় জিনিষ এখান হতে কিনে নিয়ে যেতে পারেন। জায়গাটি সহর গোছ, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জলের ঝরণা তিনটী বেশ সুন্দর, এবং একটী নদী গোছের বড় ঝরণায় সদাই কল কল শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে। যাঁদের সঙ্গে গিনি, নোট থাকে, তাঁরা চেষ্টা করে এখানে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাবেন। নতুবা আগে ভাঙ্গান খুব অসুবিধাজনক—হয়ত আগে নোট ভাঙ্গান যাবেই না। কাল বিকেলে এখানে এসে থাকতে পারলে বেশ সুবিধা হত। স্থানটি দেখেও থাকবার ইচ্ছা হচ্ছিল। অনেক দিন হল আমাদের জুতা ছিঁড়ে একদম ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। জুতার জন্য খুবই অসুবিধা ভোগ কচ্ছি, এখানে কাঁচা চামড়ার নাগরাই জুতা পাওয়া যায় শুনেছিলাম, কিন্তু খোঁজ করেও পেলাম না। এখানে অনর্থক বেশী দেরী না করে রওনা হওয়া গেল। আসবার সময় পথে দুইটী জলের বড় ধারা ও শিবালয় পাওয়া গেল। সীধা পথে ধীরে ধীরে চলে পৌনে দুই মাইল আসার পর **দুর্গাপুর** চটি পেলাম।

দুর্গাপুর
১৷৷ মাইল

দুর্গাচটির অন্য নাম মৈষণ্ডা চটি। নিকটেই সমৃদ্ধিশালী মৈষণ্ডা গ্রাম অবস্থিত। এখানে মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরে আমরা মাকে দর্শন করে নিলাম। মন্দিরের ভিতর আলো প্রবেশ করার কোন পথ নাই। একটি দর্পণে বাহিরের আলোক প্রতিফলিত করে দেবীমূর্ত্তি আলোকিত করে দর্শন করতে হয়। যাত্রীদের থাকার ভাল বন্দোবস্ত নাই। মন্দিরের সামনে বেশ প্রশস্ত প্রাঙ্গন, তার পূর্ব্ব ধারে গভীর খাদের পাশে দুইটী স্তম্ভের মধ্যে দুইটি মোটা শিকলে দোলনা ঝোলান আছে। পয়সা দিলে সেখানে দুলতে দেয়। আমি ত বাল্যকালের মত খানিকক্ষণ তাতে দুলে নিলাম, ঝুলবার সময় ভয় হচ্ছিল বটে।

এখানেও পাহাড়ী কাঁচা চামড়ার নাগরাই জুতা বিক্রী হয়। আমি ও বড় মা দুই জোড়া

জুতা দুই টাকায় কিনে নিলাম, আমার জুতা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছিল, Keeds এর জুতা ছিল তাই রক্ষা। মুচী না পাওয়া গেলেও মাঝে মাঝে নিজেরাই সুই সুতো বের করে সিলাই করতে হয়েছে। উপায় ছিল না—জুতা ছাড়া পথ চলাও দুষ্কর; অধিকন্তু পথে জুতা মিলে নাই যে কিনে নিব। নূতন জুতা কিনেই পুরাণ জুতাকে এই পবিত্র ক্ষেত্রে পেন্সন দিলাম, সেও খুব ভুল করেছিলাম। তজ্জন্য কষ্টও পেতে হয়েছে বেশ, কাঁচা চামড়ার জুতা রৌদ্র পেয়ে এমনি ছোট হয়ে গেল যে পায়ে দেওয়া দুষ্কর। গুপ্ত কাশীতে পৌঁছে তাকে অনেক তেল খাওয়ায়ে এবং ঠুকে ঠুকে অনেকটা ঠিক করে নিয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমহিষ-

শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির ইতিবৃত্ত

মর্দ্দিনী মূর্ত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ পাওয়া যায়। বরাহ পুরাণের ৮৮ অধ্যায় হতে ৯২ অধ্যায় পর্য্যন্ত উক্ত আছে যে, ব্রহ্মা কৈলাসে গমন করে শিবজীভগবানের নিকট নিবেদন করেন যে, মহিষাসুরের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে সমস্ত দেবতা আমার শরণ নিয়েছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এঁদের শান্তির ব্যবস্থা করুন। তখন শিব বিষ্ণু-ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় বিষ্ণু ভগবান সেখানে প্রকট হন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব তিন দেবতাই সাধনা করতে বসলে তাঁদের তিন মূর্ত্তি অন্তর্ধান হয়ে এক মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। সেই মূর্ত্তির দৃষ্টিতে এক দেবী কুমারীরূপে উৎপন্ন হন। তখন আবার তিন দেব প্রকট হয়ে সেই দেবী মূর্ত্তিকে বর দিলেন আপনার নাম "ত্রিকলা" হউক। আপনি সব কালেই বিশ্ব রক্ষা করবেন। আপনার দেহে তিনবর্ণ সুতরাং আপনি আপনার শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করুন। দেবী এই আশীর্ব্বাদ শুনে তিন ভাগে বিভক্ত হলেন—এক শুক্লবর্ণ, দ্বিতীয় রক্তবর্ণ, তৃতীয় কৃষ্ণবর্ণ। যে দেবী শুক্লবর্ণা হলেন, তাঁর নাম ব্রাহ্মী হল, তিনি জগতে প্রজা উৎপত্তি করতে প্রবৃত্ত হলেন। রক্তবর্ণ কুমারী শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে বিষ্ণুর রূপে সংসার রক্ষা করতে লাগলেন। ত্রিশূল ধারণকারিণী নীলবর্ণ রৌদ্র শক্তি জগৎ সংহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। এই তিন শক্তি হতে বৈষ্ণবী শক্তি কুমার ব্রত ধারণ করে বদরীকাশ্রমে তপস্যা করতে গমন করেন। তপস্যা করতে করতে অনেক দিন অতীত হওয়ার পর সেই শক্তির মনে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। তাঁর ক্ষোভ হতে অনেক কুমারী সুন্দর রূপ ধারণ করে নানাপ্রকার মনোহর ভূষণাদিতে ভূষিত হয়ে উৎপন্ন হন, এইরূপ অনেক কুমারী উৎপন্ন হতে দেখে দেবী নিজের মায়াবলে একটী নূতন নগর সৃষ্টি করলেন এবং সেই নগরে সমস্ত দেবীগণ সহ নিবাস করতে লাগলেন। প্রথমে দেবী অন্য সৃজিত দেবীগণ দ্বারা পূজিত হয়ে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

নারদমুনি চিরকালই কলহপ্রিয়। দুই পার্টিতে ঝগড়া লাগাতে তিনি বেশ ওস্তাদ! একদিন নারদমুনি মহিষাসুর দৈত্যের নিকট উপনীত হয়ে বলেন, আমি এক অদ্ভুত নগর দেখে এলাম, সেখানে নানা প্রকার রত্নাদিতে ভূষিত অনেক কুমারী নিজ শোভাতে জগত শোভান্বিত করে শোভিত আছেন। আমি জানি জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ রত্নের মালিক আপনি। সুতরাং এসব স্ত্রীরত্ন আপনারই হওয়া উচিত।

মহিষাসুর প্রেরিত "বিদ্যুৎ প্রভ" নামক দূত মায়াপুরে উপনীত হয়ে দেবীকে প্রণাম করে বলেন, "দেবি! কেয়া নদীর তীরে মহিষ্মতী নামক পুরে মহিষাসুরের জন্ম হয়েছে। তিনি তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরে দেবতাদের অজেয় হয়ে অসুর রাজ্য বিস্তার করছেন। তিনি নারদ

মুনির মুখে আপনার রূপ গুণের সংবাদ শুনে আপনার উপর মোহিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর মনোরথ পূর্ণ করা আপনার কর্ত্তব্য।"

দেবী কোন উত্তর না দেওয়ায় দেবীর জয়া নাম্নী সখীকে নানা প্রকার তিরস্কার করে দূত প্রস্থান করার পর দেবীর আদেশে সমস্ত কুমারী সৌম্য স্বভাব ও মনোহর রূপ পরিত্যাগ করতঃ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সেই সময় মহিষাসুরও অগণিত সেনা সহ সেখানে এসে উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেধে যায়। দেবীর সহচরীগণ অল্পক্ষণের মধ্যেই মহিষাসুরের প্রায় সব সেনা ধ্বংস করলে অল্প সংখ্যক সেনা পালায়ে যেয়ে মহিষাসুরের নিকট উপনীত হয়ে রণবার্ত্তা নিবেদন করেন। তখন মহিষাসুর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে হাতে গদা ধারণ করে দেবীর কাছে পৌছেন। দেবী নিজের আঠার ভুজে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে শিবজীকে স্মরণ করলে, শিবজী ভগবান প্রকট হন। দেবী তাঁর নিকট অনুমতি নিয়ে অসুরসৈন্য ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অসুর সৈন্য নাশ করেন। তখন মহিসাসুর বেগতিক দেখে অন্তর্ধান হয়ে পালিয়ে পৈত্রিক প্রাণটি রক্ষা করেন। কিন্তু পালাবার জন্য তাঁর মধ্যে ধিক্কার হওয়ায় পুনরায় এসে যুদ্ধ করতে থাকেন। এইরূপে তিনি অনেকবার পালিয়ে যান, আবার ফিরে এসে যুদ্ধ করতে থাকেন। এইরূপ ভাবে দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের এক হাজার বৎসর যুদ্ধ হয়. সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে মহিষাসুর যুদ্ধ করছিল। একদিন শতশৃঙ্গ নামক পর্ব্বতের উপর সিংহ হতে দেবী লাফিয়ে মহিষাসুরের উপর পতিত হয়ে ত্রিশূল দ্বারা তার কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করলে মহিষাসুর প্রাণ ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮২।৮৩ অধ্যায়ে এবং দেবী ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দ্বিতীয় ভাগের ২০ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেবীর উৎপত্তি ও মহিষাসুরের বধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, এই স্থানেই মহিষাসুর বধ হয়েছিল।

স্কন্দ পুরাণের কেদারখণ্ডের উত্তর ভাগের ২৫ অধ্যায়ে উক্ত আছে:— কেদারনাথের দক্ষিণ ভাগে মহিসাখণ্ড স্থান আছে। পুরাকালে শ্রীদেবী মহিসাসুরের মাথা কেটে তার দেহ এখানে ফেলে দেন। মহিষমর্দ্দিনী দেবীকে দর্শন করলে মানব শিবলোক প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

সঙ্ঘের মূল তত্ত্ব

সঙ্ঘ বল, মিশন বল, আশ্রম বল, মূলে দু'একটী প্রাণীর প্রাণ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ হওয়া চাই, তবেই এই সব মহদনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে। একটী প্রাণের সঙ্গে আর একটী প্রাণের খাঁটী সংযোগে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, যে দৈবী ভাবের উন্মেষ হয়, তাহারই অব্যর্থ প্রেরণায় শত শত প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া আসিয়া একত্রে সম্মিলিত হয়। সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় এই ভাবেই। যাহারা আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসে, তাহারা এই প্রাণের স্পর্শ পাইয়াই উন্মাদ হইয়া যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্রাদি এই সব

হইল অনেক পরের কথা, আসল কথা হইল ভালবাসা, প্রাণের বিনিময়। এই পবিত্র ভালবাসার দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হয়। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের কাছ থেকে বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব খুঁজিয়া পান নাই— পাইয়াছিলেন একটী আত্মভোলা অমায়িক পুরুষের প্রাণের পরশ। এই প্রাণের পরশেই বিবেকানন্দের ভিতর আসল বিবেকানন্দ জাগিয়া উঠিল। তখন এই বিবেকানন্দই হইলেন দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, ধর্ম্মপ্রচারক বিবেকানন্দ। কিন্তু এই সব গুণের বিকাশের মূলে রহিয়াছে জীবন্ত মানুষের পবিত্র অগ্নিময় পরশ। এই স্পর্শেই বিবেকানন্দ উন্মাদ হইয়াছিলেন, নিজেকে ভুলিয়া, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। ত্যাগের মূলে যেখানে এই দিব্য পরশ রহিয়াছে, সেইখানেই আশ্চর্য্য সৃষ্টির লীলা দেখিতে পাই। বৌদ্ধদের সঙ্ঘের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু এই সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব। এত সব ভিক্ষু ভিক্ষুণী যে এইরূপ আশ্চর্য্য ত্যাগ দেখাইতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল বুদ্ধদেবের প্রতি তাহাদের অমায়িক ভালবাসা। এই ভালবাসার আকর্ষণের কাছে অন্য আকর্ষণ তাহাদের কাছে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যই তাহারা এমন মহান্ ত্যাগ দেখাইয়া জগতের আদর্শ হইতে পারিয়াছে। কাজেই সৃষ্টির মূল রহস্যের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

সঙ্ঘের বেদী সৃষ্টি হয় উৎসর্গীকৃত খাঁটী কয়েকটী প্রাণীর প্রাণের উপর। কাজেই যেখানেই সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, পাঁচটী প্রাণ একত্রিত হইয়াছে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে কাহারও না কাহারও আত্মদান রহিয়াছেই। এই আত্মদানের মহিমাই, প্রাণে প্রাণে দৈবী সম্মিলনই এত গুলো প্রাণকে আবার একত্রিত করিতে পারে। মানুষ ভালবাসাই চায়, প্রথমে প্রাণে প্রাণে যোগ দেখিয়াই উদ্বুদ্ধ হয়, ইহার পর আর অন্য কিছু। এই আত্মদানকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা সঙ্ঘের মূল রহস্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। খাঁটী দুটী প্রাণের সংযোগে যে কি অব্যর্থ শক্তির সঞ্চার হয়, তাহা মানুষ বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। দর্শন, বিজ্ঞানের মূল এই সহজ ভালবাসা। ভাগবতকে আমরা এত শ্রদ্ধার চোখে দেখি, কিন্তু তাহার মাঝে গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৈবী ভালবাসাই হইল আসল কথা। এই ভালবাসার কথা, প্রাণে প্রাণে যোগের কথাই দর্শন বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। এই জন্যই দর্শনের মাঝেও মানুষ এত রস পায়।

সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই প্রাণের স্পন্দন। এই স্পন্দন মানুষকে উত্তেজনায়

আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না, উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। মানুষ এই সহজ পথ—ভালবাসার পথকে ছাড়িয়া দিয়া অনর্থক ব্যর্থ প্রয়াসে সময় অতিবাহিত করে। জগতে যত কিছু বড় কাজ হইয়াছে, তাহার মূলেই রহিয়াছে প্রাণ। দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে পরে। ভগবান জগৎকে ভালবাসিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টির মূলে প্রথমেই তাঁহার মনে সূক্ষ্ম বিচারের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। এমনি ভাবে যেখানেই সৃষ্টি, সেইখানেই প্রাণ বা ভালবাসা রহিয়াছে। আমরা এই আসল কথাটীকে ভুলিয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যের মোহেই মুগ্ধ হইয়া পড়ি।

আত্মদানকে অনেকেই দুর্ব্বলতা বা অজ্ঞানতা বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, তাহারা সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য্য এখনো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ভালবাসা বা প্রাণের উপরই যে যত কিছু তত্ত্বের সৃষ্টি — এই কথা মানুষ নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা না করিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। সঙ্ঘের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অনেক সময় সঙ্ঘের মূল তত্ত্ব-বস্তুকেই আমরা ভুলিয়া যাই। এইজন্যই যাহাকে উপলক্ষ করিয়া আমরা সম্মিলিত হই, তাহার অন্তর্ধানেই আমাদিগের সঙ্ঘের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সঙ্ঘের মূল ভিত্তি যে ভালবাসার উপর -- আত্ম-দানের উপর, এই কথাটী ভুলিয়া যাই বলিয়াই আমাদের সঙ্ঘ স্থায়ী হয় না।

তপস্যা ছাড়া সৃষ্টি রক্ষা করা যায় না। সঙ্ঘও সৃষ্ট বস্তু— সুতরাং তপস্যার অভাবে সঙ্ঘেও বিকৃতি প্রকাশ পায়। সঙ্ঘে যাহারা যোগদান করে, তাহারা তাহাদের কঠোর দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়. তাহাদের আত্মত্যাগ বা মহান্ আদর্শের উপরই যে সঙ্ঘের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, এই কথা তাহাদের মনে থাকে না। তপঃশক্তি-তেই সঙ্ঘের সৃষ্টি, আবার এই তপঃশক্তির অভাবেই সঙ্ঘের প্রলয় বা ধ্বংস।

মূলে একটা বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই অবিশ্বাসীর সঙ্ঘে স্থান হয় না। এই অবিশ্বাস লইয়া যাহারা সঙ্ঘে আছে, তাহারা সঙ্ঘের শক্তিকে খর্ব্ব করে। ইষ্ট বস্তুতে সম্পূর্ণ দেহ-মনের সমর্পণেই যে সব কিছু হয় বা হইতে পারে এই বিশ্বাস যাহাদের নাই, তাহারা সঙ্ঘে থাকিবার যোগ্য নয়। সঙ্ঘের মূল মন্ত্রই হইল **সমর্পণে সিদ্ধি।**

আমি একা বসিয়া বসিয়া দর্শনের নূতন নূতন সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি, কিন্তু পাঁচজনকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলে দেখা যায়, দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে প্রাণের সহযোগই বেশী কার্য্যকরী হয়। কাজেই প্রাণের বিনিময়ই হইল আসল কথা। প্রাণ দিয়া মানুষ যেখানে

মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে, সেই বিশ্বাসের অগ্নিময় বীর্য্যের সঙ্গে আর কোন কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। সঙ্ঘকে যাহারা প্রাণ দিয়া ভাল না বাসে, সঙ্ঘের মহিমা তাহাদের কাছে কোন দিন প্রতিভাত হয় না।

সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যই হইল একটী প্রাণের সঙ্গে আর একটী প্রাণের অনাবিল মিলন। একের লয়েই বহুর সৃষ্টি। অহঙ্কারী জীবনের পক্ষে আত্মবিলয়ের সাধনা বড়ই সুকঠিন, কিন্তু যে ভাবেই হোক যেখানে কোন প্রকারে দুটী প্রাণের মিলন হইয়াছে. সেইখানেই দেখি আশ্চর্য্য সৃষ্টির মহিমা। আমার মনে হয়, মানবের সকল উদ্যম, সকল চেষ্টা এই মিলনকে লক্ষ্য করিয়াই।

মানুষ মূল বস্তুটী ছাড়িয়া দিয়া অনেক সময় খোসা লইয়াই সময় কাটায়। সহজ কথাটা মানুষ সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। অথচ এই সহজ ভালবাসার মহিমা দেখিয়াই কিন্তু মানুষ আবার মুগ্ধ বিস্মিতও হইয়া যায়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের খবর লইয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে মূলে ২।১ টী প্রাণীর অব্যর্থ আত্মদান রহিয়াছেই, আর সেইজন্যই সেই আত্মদানের মহিমার উপরই আজ এই বিরাট প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ। কেহ না কেহ জ্বলন্ত বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মদান না করিলে সঙ্ঘের সৃষ্টি হইতে পারে না। সঙ্ঘ সৃষ্টির এই অব্যক্ত নিগূঢ় তাৎপর্য্যটী যাহারা ধরিতে না পারে— তাহারা শুধু প্রতিষ্ঠান দেখিয়াই মুগ্ধ হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের মূলে যে কাহারও ভালবাসা বা আত্মদান রহিয়াছে, তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না। বিচারাবিচারের কোন প্রয়োজন নাই, কাহাকেও যদি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারা যায়, তাহা হইলেই সব সফল হইয়া উঠিবে। নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা বহু প্রাণকে একত্রে সম্মিলিত করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য তাঁহারাই পূজার্হ।

মহৎভাব বা মহৎ সঙ্কল্প মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার কতকগুলি প্রাণ চাই। তাহাদের নিজের স্বার্থ নিজের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণভাবে ইষ্ট বস্তুতে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে। সঙ্ঘে যাহারা যোগদান করিবে, তাহাদের এই মনোভাব লইয়াই সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইবে। আমার মনে হয়, প্রথমে ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া যাহারা ইষ্ট বস্তুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছে, তাহাদের ভিতরই যথার্থ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হইয়াছে— যেমন বিবেকানন্দ। প্রথমে বিবেকানন্দের মনে ব্যক্তিত্বের অভিমান বা বেদান্ত প্রচারের অভিলাষ ছিল না, সত্যলাভের দরুণ একজন মহাপুরুষকে প্রাণ দিয়া তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার

সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইয়া গিয়াছিল। নিজের কথা, ব্যক্তিত্বের কথা তখন তাঁহার মনে জাগেই নাই। তখন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পদমূলে নিজকে সম্পূর্ণভাবে লয় করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার প্রাণে প্রকৃত শান্তি আসে!

ভালবাসায় মানুষ সব ত্যাগ করিতে পারে। মহান্ ত্যাগের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, কাহারও না কাহারও প্রতি ভালবাসা থাকাতেই প্রাণের ভিতর অমন ত্যাগ শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্ঘের মাঝে যখন দেখি ব্যভিচার দেখা দেয়, ত্যাগশক্তি স্তিমিত হইয়া আসে, তখনই আশঙ্কা হয়, সঙ্ঘসেবীদের মাঝে নিশ্চয়ই ইষ্টবস্তুর প্রতি অবিশ্বাস আসিয়াছে। এই অবিশ্বাসের সংক্রামক রোগীদের সঙ্ঘে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য যাহারা ভুলিতে বসিয়াছে, তাহাদের মত হতভাগ্য আর কেহই নাই।

জীবনে কাহাকেও প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে হইবে, এবং সেই ভালবাসা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে এক জীবনের প্রভাব কি করিয়া শত শত জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সঙ্ঘের বীজ মন্ত্র এই ভালবাসার মাঝেই আত্মগোপন করিয়া থাকে। আর প্রকৃত ভালবাসা যেখানে, সেইখানেই সেই বীজ মূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয়।

আজীবন মহৎ সঙ্কল্পকে হৃদয়ে উজ্জ্বল করিয়া রাখা সহজ কথা নয়। তিল তিল করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া মুখের কথা নয়। যাঁহারা অমর জীবনের সন্ধান না পাইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এই ত্যাগ কখনো সম্ভবপর হয় না। যথার্থ সঙ্ঘসেবী এই অমর জীবনের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই সঙ্ঘের দরুণ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। সহজ কথায় বলিতে গেলে সঙ্ঘের মূল আদর্শই হইল ইষ্টবস্তুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা, এবং সেই ভালবাসায় নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। সঙ্ঘের ব্যক্তিগত কোন সাধনা নাই, ইষ্টবস্তুর মহান্ শক্তির সুষ্ঠু বিকাশের দরুণই আমরা সকলে একত্রিত হইয়াছি— ইহাই সঙ্ঘসেবীদের আদর্শ। সুতরাং ব্যক্তিগত সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ সঙ্ঘের আদর্শ নয়, সমষ্টি-প্রাণের এক সমর্পণের মন্ত্রেই সঙ্ঘের সিদ্ধি।

আদর্শের কথা

প্রতিহিংসাবৃত্তি মানুষের মন থেকে সহজে যেতে চায় না, এইজন্যই কেবল মৌখিক কথায় মানুষ অহিংস হতে পারে না। অহিংস হ'তে হলে, বহু তপস্যার প্রয়োজন হয়।

হৃদয়কে উন্নত না করলে পবিত্র মহান না করলে ভিতরের আক্রোশ কোন দিনই লোপ পায় না। এই জন্যই মৌখিক শান্তির কথা সবাই বলছে বটে, কিন্তু মন প্রাণ বিশুদ্ধ না হওয়ায় প্রত্যেকের ভিতরই গুপ্ত প্রতিহিংসার বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। ইহাই কি মানব জাতির শুভদিন আগমনের পূর্ব্বাভাষ?

সুখ এবং শান্তি সবাই চায়, কিন্তু এর উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে একজন বাড়ায় জগতের দুঃখ, আর একজন প্রকৃতই জগতে শান্তি আনয়ন করে। ভারতের ঋষিও একদিন বলেছিলেন—'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।' কিন্তু সেই সুখ, সেই আনন্দ কি বাইরের? ভূমার সন্ধান নিতে গিয়ে ঋষি আত্মস্থ হবার পথকেই বরণ করে নিলেন।

অল্পে যাদের তুষ্টি এসে পড়ে, তারা নিতান্তই শামুকের মত ক্ষুদ্র আধার। মহান্ সুখকে অন্তরে না খুঁজে, বাইরে যারা অন্বেষণ করে, তারা তো যথার্থ শক্তির সন্ধান পায় না কোনদিন! তবে মানুষের ভিতর সামঞ্জস্য করে চলবারও একটা স্বাভাবিক শক্তি এবং আকাঙ্খাও রয়েছে। এই জন্যই বোধ হয় হৃদয়ের অনাবিল আনন্দকে বাইরের জগতের সঙ্গেও কি করে সামঞ্জস্য করে আরও প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, এইজন্যই মানুষ অমন উতলা হয়ে ওঠে, আর অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে।

সামঞ্জস্যের সুর উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই পাই আমরা। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।' অস্থি-মজ্জায় আমাদের ত্যাগের শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে বলেই বোধ হয় প্রচুর ভোগের সামগ্রী দেখেও আমাদের মন ধৈর্য্যহারা হয়ে লোভী আখ্যা ধারণ করে নি! গোড়ায় আমাদের মস্তবড় একটা শক্তিসম্পন্ন মূল মন্ত্র রয়েছে। দুর্ব্বল হয়েও দেখি, থেকে থেকে সেই মূল মন্ত্রেরই ক্রিয়া এখনো মাঝে মাঝে অব্যর্থ ভাবে আধারে আধারে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে ওঠে! এইজন্যই বোধ হয় সর্ব্বহারা হয়েও আমাদের প্রাণের কোথাকার যেন একটা সঞ্চিত বলের প্রেরণায় এখনো আমাদের মরা প্রাণে শক্তির তরঙ্গ খেলতে আরম্ভ করে।

মহান্ আদর্শকে, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের বাণীকে আমরা আদর্শ করে চলি বলেই এত পতনের আশঙ্কা হতেও আমরা পরিত্রাণ পাই। নিবৃত্তির উদ্দীপনার কাছে ভোগের উত্তেজনা খুবই নিষ্প্রভ এবং ক্ষণস্থায়ী। পাশাপাশি দুটো আদর্শ রয়েছে বলেই পরস্পরের বিচার করে উন্নত আদর্শকেই আমরা বরণ করে নেই।

ভোগে মানুষকে অন্ধ করে, বিচার-শক্তি-হীন করে তুলে, এইজন্যই বোধহয় কল্যাণকামী ঋষিরা ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগের আদর্শকে চেতনায় উজ্জ্বল রাখবার উপদেশ দিয়েছেন। মূলে ত্যাগের কথা স্মরণ ছিল বলেই বোধ হয় সংসার করেও

যাজ্ঞবল্ক্য এমন ভাবে সংসারের প্রতি বিরাগী হয়ে উঠ্‌তে পেরেছিলেন। এটা খেয়ালের কথা নয়— ভারতের প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে এই ত্যাগের মন্ত্র গোপনে গোপনে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে ত্যাগটাই যেন আমাদের স্বভাব, ত্যাগ করেই যেন আমরা সুখ পাই, ভোগটা আকস্মিক মাত্র।

পেছনে আমাদের যে ত্যাগের আদর্শটা রয়েছে, তা যদি আমাদের অস্থি মজ্জায় অমন করে বিজড়িত হয়ে না যেত, তাহলে বোধ হয় শক্তির উন্মাদনায় আমরাও অন্যান্য জাতির মত পাশবিক শক্তিতে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু আমাদের শক্তি প্রয়োগ করেছি আমরা নিজেদেরই উপর— এইজন্যই শক্তি প্রয়োগ করে নিজের জীবনেই দ্বন্দ্ব চলেছে, কিন্তু বাইরের জগতে তুমুল ভাবে অশান্তি উৎপাদন করি নি আমরা। আত্মিক-শক্তি লাভের প্রচেষ্টা কি দুর্ব্বলতা? ভারতের ঋষিদের অস্ত্র বল কি ছিল?— কিছুই নয়, কিন্তু তবু তাঁরা জগতের আদর্শ হলেন কি করে? একমাত্র আত্মিক-বলেই তাঁদের কাছে সকল শত্রু পরাজয় স্বীকার করেছিল। আমরা যদি উত্তেজনার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র ভুলে যাই, তাতে আমাদের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বেড়ে যাবে শুধু।

হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত কখনো সত্যিকার মিলন ঘটে না। সংযমে, তপস্যায় অন্তর বিশুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লে, বাইরের ভেদে কোন অনিষ্ট করবে না এই বিশ্বাসেই আমাদের পূজ্য মুনি-ঋষিরা সর্ব্বাগ্রে নিজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রবাখবার উপদেশই দিয়েছেন। জগতে যত অশান্তি আর সংগ্রামের সৃষ্টি - শুধু আমাদের অন্তরের মালিন্য নিয়ে। অন্তর পরিশুদ্ধ হলে লোলুপতা থাকে না— এইজন্যই অপরের সঙ্গে সংগ্রাম হবারও কোন কারণ ঘটে না।

জাতীয় আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোন দিন আমাদের উন্নতি হবে না। কাজেই অপরের দেখাদেখি ভোগের পথ বেছে নিলে যেমন আমাদের কল্যাণ হবে না, তেমনি নিছক ত্যাগের আদর্শ ধরে থাক্‌লেও কিছু হবে না। শক্তি তো থাকা চাই-ই, কিন্তু সেই শক্তির মত্ততায় উচ্চ আদর্শের কথা ভুলে গেলেও চলবে না। অনেক জাতিই ধর্ম্ম নীতি বিসর্জ্জন দিয়ে বড় হয়ে উঠছে, তাদের দেখাদেখি বড় হবার লোভ যদি আমাদেরও পেয়ে বসে, তাহলে আমাদের মরণকেও বরণ করে নিতে হবে। অন্যান্য জাতি নিছক ভোগকেই চরম মনে করতে পারে, কিন্তু আমাদের তো সে আদর্শে কল্যাণ নাই!

সাংখ্য ও বেদান্ত

সাংখ্যে এবং বেদান্তে মূলগত পার্থক্যই হইল দুঃখকে লইয়া। সাংখ্য বলেন দুঃখ সত্য, জগতে দুঃখ নাই ইহা কেহই বলিতে পারিবে না; সুতরাং এই দুঃখের হাত হইতে কি করিয়া পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহার উপায় আবিষ্কারের দরুণই সাংখ্য বাদীর চরম প্রচেষ্টা। কিন্তু বেদান্ত দুঃখকে স্বীকারই করেন না, কিম্বা স্বীকার করিলেও তাহাতে বড় বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেদান্ত বলেন,

আনন্দই সত্য—আর যত কিছু সব মিথ্যা। দুঃখের অবধি নাই, সুতরাং সাংখ্যবাদীর জিজ্ঞাসারও নিবৃত্তি নাই; কিন্তু বৈদান্তিকের কোন সংশয় নাই, জিজ্ঞাসা নাই; তবে কি বৈদান্তিক জড়? – তা নয়। বৈদান্তিকের বাণী বাহির হয় আনন্দ হইতে, বৈদান্তিকের প্রত্যেকটী কার্য্য আনন্দের উদ্দীপনায় ভরপুর।

একজন দুঃখকে স্বীকার করিয়া দুঃখ বাড়াইলেন, তিনি হইলেন সাংখ্যবাদী; আর একজন আনন্দকে স্বীকার করিয়া দুঃখকে প্রশমিত করিয়া দিলেন, তিনি হইলেন বৈদান্তিক। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের দিক দিয়া নয়, আনন্দের বাণীতে মানুষের প্রাণ যতখানি উদ্বুদ্ধ হয়, দুঃখের বাণীতে কি তা হয়?

সাংখ্যের 'আমি' নিছক নিজকে লইয়াই বিব্রত, কিন্তু বৈদান্তিকের 'আমি'র মাঝে সাংখ্যের 'আমি'রও অবাধে স্থান রহিয়াছে। সুতরাং বৈদান্তিকের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই। সাংখ্যবাদী বলিলেন, আত্মা হইতে যাহা পৃথক তাহাই প্রকৃতি, জড়, অনাত্মা; আর একমাত্র আত্মা আমিই। কিন্তু বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে অনাত্মবস্তু বলিয়া কিছুই নাই - সবই আমিময়।

সাংখ্যের পুরুষ যাহাদিগকে জড় বলিয়া অবজ্ঞা করিলেন, তাহারাই সাংখ্যের পুরুষের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই সাংখ্যের পুরুষ ইচ্ছা করিয়া কতকগুলি শত্রুর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার চেষ্টায় নিরত হইলেন। বৈদান্তিকের ঠিক উল্টো ব্যাপার। বৈদান্তিকের শত্রু নাই, কেননা বৈদান্তিক তো আমি ছাড়া আর কাহাকেও দেখেন না, সুতরাং নিজের সঙ্গে তো নিজের বিরোধ হইতেই পারে না।

সাংখ্যের পুরুষের এই সংগ্রাম-ব্যাপারকে অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই পুরুষের মূলেই যে দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, এবং সেই দুর্ব্বলতার দরুণই যে তাহার অসংখ্য শত্রু, এ কথা কেহই তলাইয়া দেখে না। সাংখ্যের 'আমি' ক্ষুদ্র 'আমি', এই জন্যই ক্ষুদ্রত্ব তাহার রহিয়াই গিয়াছে কিন্তু বৈদান্তিকের উদার দৃষ্টিতে কোথায়ও ক্ষুদ্রত্ব নাই।

দুঃখকেই আমরা সত্য বলিয়া থাকি, যেহেতু শোক দুঃখে অহরহঃই আমরা জর্জ্জরিত। দুঃখের বেদনাই আমাদের কাছে সত্য এবং তীব্র। কিন্তু এককালে আনন্দই যে সত্য ছিল না, স্বাভাবিক ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

বৈদান্তিকের দুঃখ থাকিলেও দুঃখই তাঁহার চরম নয়, আনন্দের তুলনায় দুঃখের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সাংখ্যবাদীর কাছে দুঃখই চরম সত্য। এইজন্যই একজন যেখানে দুঃখ নিবারণের দরুণ সবিশেষ ভাবে সচেষ্ট, আর একজন সেই জায়গায় বসিয়াই আনন্দে বিভোর।

দুঃখকে ভিত্তি করিয়াই সাংখ্যবাদীর জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। কিন্তু বৈদান্তিকের জিজ্ঞাসার মূলে রহিয়াছে আনন্দ। এইজন্যই সাংখ্যবাদী বলিলেন, "এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত, যদি দুঃখং নাম জগতি ন স্যাৎ।" দুঃখ না থাকিলে মানুষের ভিতর শাস্ত্র-জিজ্ঞাসা জাগিত না। বৈদান্তিকের ঠিক ইহার উল্টো সুর। তিনি বলিলেন, আনন্দ না থাকিলে মানুষের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি নিরোধ হইয়া যাইত। আনন্দ আছে বলিয়াই মানুষের ভিতর জিজ্ঞাসা জাগে! এই জন্য বৈদিক যুগের ঋষিদের মাঝে জিজ্ঞাসা রহিয়াছে দেখি, কিন্তু সেইখানে যেন তাঁহাদের

বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। উপনিষদ পাঠ করিলে বুদ্ধির তৃপ্তির চেয়ে হৃদয়ের তৃপ্তিই হয় বেশী।

দুঃখ আছে, দুঃখ থাকুক, কিন্তু দুঃখকে চরম বলিয়া মানিয়া লওয়ার কি প্রয়োজন রহিয়াছে? তাহার দিকে দৃষ্টি না দিলে সে যে আপনিই মরিয়া যাইবে। যেখানে উপেক্ষার প্রয়োজন ছিল বেশী, সেই খানেই দৃষ্টি দিলেন সাংখ্যবাদী বেশী। 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' – বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। সাংখ্যের প্রয়োজন দুঃখনিবৃত্তি, এই জন্যই তাহার শাস্ত্র জিজ্ঞাসা জাগরিত হইয়াছে, কেন না দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় শাস্ত্রই বলিয়া দিবেন। কিন্তু বৈদান্তিকের তো মূলেই দুঃখ নাই, সুতরাং তাঁহার জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়াছে আনন্দ হইতে।

সাংখ্য বিশ্লেষণ বাদী, আর বেদান্ত সংশ্লেষণবাদী। একজন এই জগতের দুঃখটাকেই সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ উপায়াবিষ্কারে যত্নবান, আর একজন এই জগৎময় আনন্দের প্লাবন দেখিয়া নিজেও আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, অপরকেও তাহার আস্বাদন দিবার দরুণ পাগল হইয়া উঠিয়াছেন।

সাংখ্যবাদী পরিবর্ত্তন চায়, শোধন চায়, কিন্তু বৈদান্তিক কোন কিছুকে ওলট পালট না করিয়াই সেই অফুরন্ত আনন্দের প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায়। মানুষকে দুঃখের কথা বলিয়া দুঃখ হইতে বিমুক্ত করা যায় না; আনন্দ দাও, আনন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল, দেখিবে মানুষ দুঃখের কথা আপনি ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সংগ্রাম দ্বারা শক্তির অপব্যয় না করিয়া সহজেই তো সংশোধন করা সম্ভবপর।

দুঃখের নিদান জানিলেই কি হইল, দুঃখ হইতে কি পরিত্রাণ পায় মানুষ? কাজেই দুঃখ-মোচনের মূল নিদান হইল আনন্দ – নিছক বিবেক জ্ঞান নয়। সকল হইতে পৃথক হইয়া থাকিলেই কি দুঃখনিবৃত্তি হয়? বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, এইজন্যই যাহার সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া ওঠা যায় না, সেই স্থলে ঠিক তাহারই বিপরীতের সাহায্য লইতে হয়। দুঃখকে এড়াইয়া চলিতে পারিতেছি না, বেশ দুঃখ থাকুক; কিন্তু আনন্দকে ঘরে নিয়া আসিলেই হইল। তখন দুঃখ কোথায় থাকে দেখা যাইবে!

বৈদান্তিকের ভিতর বিশ্বমৈত্রীর ভাব, সমন্বয়ের ভাব, এই জন্যই বৈদান্তিকের প্রাণে আক্রোশ বা বিরোধের বীজ নাই। কিন্তু সাংখ্যবাদীর জগতের প্রতি একটা আক্রোশ রহিয়াছে। প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেলেও অনেক সাংখ্যবাদী এই আক্রোশের সংস্কারকে ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না।

নিজকে বিরাট ভাবে অনুভব করিতে পারার নামই নির্ব্যক্তিক অবস্থা। কিন্তু সাংখ্যবাদীর ব্যক্তিত্বের বোধ অতীব তীব্র, ইহার কারণ সকলের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া 'কেবল' হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন তিনি। নিজকে ছোট করিয়া এই যে অসংখ্য ব্যক্তিত্বের উদ্ভব, ইহাতেই সংগ্রামের, বিরোধের, অসামঞ্জস্যের সূত্রপাত হয়। বৈদান্তিক এইরূপ শত শত আমিকে মহাহ্রদবৎ অবিক্ষুব্ধচিত্তে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিয়াছেন। সাংখ্যের চেয়ে বেদান্ত এইজন্যই একদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ। বৈদান্তিকেরও 'অহং' বোধ রহিয়াছে, কিন্তু সেই 'অহং' এর মাঝে কোথায়ও সঙ্কীর্ণতা নাই।

দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সাংখ্যবাদী বুদ্ধি দ্বারা যতদূর পারিয়াছেন, কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধির উপরেও তো অনেক কিছু রহিয়াছে, সুতরাং দুঃখের মূল উৎপাটন করিবেন এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া তিনি সাধন-ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির প্রতি এই অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকার দরুণই সাংখ্যবাদী দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে গিয়াও পরিত্রাণ পান নাই। ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট এই শত্রুর হাত হইতে কিছুতেই তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। প্রচেষ্টা বা উদ্যমকে যদি প্রশংসা করিতে হয়, তাহা হইলে সাংখ্যবাদীকে ধন্যবাদ না দিয়া কিছুতেই পারা যাইবে না। অলৌকিক কিছু না মানিয়া নিজের মন-বুদ্ধি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন তিনি, কি করিয়া জগতের দুঃখ বিদূরিত করিতে পারা যায়। তাঁহার এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

সাংখ্যবাদী আবিষ্কার করিলেন বিবেক জ্ঞানের অভাবই দুঃখের মূল। অর্থাৎ যথার্থতঃ আমি যাহা নহি, তাহাকে যথার্থ মনে করিয়াই আমাদের দুঃখের সূত্রপাত। প্রকৃতি এবং আমাতে কোন যোগাযোগ নাই, আমি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। প্রকৃতির বিকারের সঙ্গে নিজকে ঘুলাইয়া ফেলাতেই আমাদের এত অশান্তি। কিন্তু সাংখ্যবাদীর দুর্ব্বলতা এই জায়গাতেই যে তিনি বিবেক জ্ঞানে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াও প্রকৃতির প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া চলেন কেন? সাধারণ অবস্থায় যে ভয় ছিল, সাধনার পরও যদি সেই ভয়ই থাকিয়া গেল, তাহা হইলে সাধনায় লাভ কি হইল? আর বাস্তবিকই যদি তিনি ভয়াতীত হইলেন, তাহা হইলে প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়াও তো তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কোন বিঘ্ন না হওয়ারই কথা। এই দিক দিয়া বলিতে গেলে বৈদান্তিকই প্রকৃত নির্ভীক, জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াও জগতের মায়ায় তিনি বিমুগ্ধ নন। আসল পুরুষকার বা পৌরুষত্ব তো ইহাই। কুমারসম্ভবের সেই অতুলনীয় শ্লোকটী মনে পড়ে— 'বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।'

বিশ্লেষণ প্রয়োজন বটে, কিন্তু সেই প্রয়োজন সার্থক হয়, যদি অন্তরে আবার সংশ্লেষণ দৃষ্টিও ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ সাংখ্যের পথ ধরিয়া যদি বৈদান্তিক না হওয়া গেল, তাহা হইলে নিছক বিশ্লেষণের পথে চরম শান্তি পাওয়া যায় না। দুঃখ দূর করিতে গিয়া সাংখ্যবাদী যাহাদের শত্রু বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদের তো অন্ততঃ তাহার প্রতি ক্ষোভ রহিয়াছে, সুতরাং জগতের দুঃখ দূর করিতে গিয়াও তো সকলের দুঃখ দূর করিতে পারিলেন না তিনি। সেই তো শত্রু থাকিয়া গেল, সেই তো ভয় থাকিয়া গেল, তাহা হইলে দুঃখেরই বা চরম নিবৃত্তি হইল কোথা? কাজেই বিরোধ ছাড়া যদি কোন পন্থা থাকিয়া থাকে, তাহাকেই বরণ করিয়া লওয়া উচিৎ নয় কি? নির্ব্বিরোধের পন্থা একমাত্র বৈদান্তিকই দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং বৈদান্তিকই শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থানীয়।

—•—

বর্ত্তমানের গান

অতীতকালের সুখ স্বপনের কথা
ওগো পথিক ! ভাবছ বৃথাই মনে,
ঘুচায় না সে দারুণ দুঃখের ব্যথা
থামায় শুধু চলারই মাঝখানে।

কল্পনার ওই রঙীন তুলির ভরে
আঁকছ বটে সুখের ছবি কত,
বাস্তবে তা ফুটবে না তো যাবে দূরে সরে
শুধু মরুর মরীচিকার মত।

অতীত যাহা অতীত ও গো তাহা
আস্‌বে না তা কোন কালে ফিরে,
সাম্‌নে যা রয়, যায় নাকো তা কহা
সে যে গভীর ভবিষ্যতের নীরে।

কালের মাঝে সত্যি যদি থেকে থাকে কিছু
তবে তাহা শুধুই বর্ত্তমান,
অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের পিছু
ছোটায় বৃথা হতাশ করে প্রাণ।

তাই তো তাদের চিন্তা ছেড়ে ছার
লক্ষ্য রাখ্‌তে বলি বর্ত্তমানে,
সফল ক'রে প্রতিটী ক্ষণ তার
সজাগ চলা চল্‌তে প্রতিক্ষণে।

অতীত স্মৃতি ভবিষ্যতের আশা
উভয়ই যে রিক্ত শূন্য ফাঁকা,
বিজয় তিলক সফলতার ভাষা
বর্ত্তমানের ভালেই শুধু আঁকা।

নাই অতীত তাই নাই ভবিষ্যৎ মোর
বর্ত্তমানই সদাই বর্ত্তমান,
বর্ত্তমানের পেছুই জীবন ভোর
ঢাল্‌ব আমার অদম্য এ প্রাণ।

রঘুনাথ দাস

"শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত" গ্রন্থ যে শুধু শ্রীচৈতন্ত দেবের জীবন কাহিনী বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু মহাপ্রভুর জীবন-প্রবাহের সঙ্গে তদানীন্তন যে সকল মহাপুরুষের জীবন-স্রোত আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পূত জীবন কাহিনীকেও উদার ভাবে আপন অঙ্গে স্থান দান করিয়া উক্ত গ্রন্থ ধন্ত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবন একক জীবন নয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সহযোগে তিনি পূর্ণ; মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য একাকীই অবতীর্ণ হন নাই, ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি সপারিষদ তাঁহার অবতার। শ্রীচৈতন্যদেব এমন একটী আকর্ষণীর ভাব লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন, যে আকর্ষণের প্রভাবে তদানীন্তন দিগ্‌গজ পণ্ডিত মণ্ডলী, কোটি পতি ধনিক সম্প্রদায় আপন আপন পাণ্ডিত্যাভিমান, ধনগর্ব্ব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগী সাজিয়াছিলেন, পথের ভিখারী হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর এক একটী পার্ষদ ত্যাগের এক একটী জীবন্ত বিগ্রহ, বৈরাগ্যের এক একটী ঘন প্রতি মূর্ত্তি! সংযমের পূত পাবকে কেমন করিয়া দেহ-মন-প্রাণ শোধন করিয়া তীব্র অনুরাগের অমিয় স্পর্শে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তাঁহাদের জীবনে সুপরিস্ফুট। এক এক জনের ত্যাগবৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। বর্ত্তমানে আমরা চাই বেশ মোহ আরামে সংসার সুখ উপভোগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে, প্রেমধন প্রাপ্ত হইতে। ত্যাগ বৈরাগ্য এখন আমাদের নিকট উপেক্ষিত, সংযম বহু দূরে বিতাড়িত! আমরা সহজ ভাবে সহজ জীবন কাটাইয়া অসাধনের ধনকে পাইতে চাই, একূল ওকূল দু'কূল বজায় রাখিয়া ফাঁকি দিয়া সত্যবস্তু লাভের পন্থা খুঁজি। ইহা অপেক্ষা আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন আর কি হইতে পারে? কিন্তু যদি আমরা মহাপ্রভুর পার্ষদগণের জীবনী আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, সমগ্র জীবন ব্যাপী কেমন করিয়া তাঁহারা ত্যাগবৈরাগ্যকে মাথার মুকুট করিয়া রাখিয়াছিলেন, সংযমের কঠোরতাকে কি ভাবে আপন আপন জীবনে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। জ্ঞান লাভ করা কি এতই সহজ? প্রেম লাভ করা কি এতই অনায়াস? যদি জ্ঞান লাভ জীবনের লক্ষ্য হইয়া থাকে, যদি প্রেম লাভ জীবনের কাম্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ বৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, তাঁহাদের ত্যাগ বৈরাগ্যকে আমাদের অঙ্গের ভূষণ করিতে হইবে। মহাপ্রভুর পারিষদ বর্গের প্রত্যেকের জীবনই আদর্শস্থানীয়, প্রত্যেকের অনুষ্ঠিত ত্যাগ বৈরাগ্যই আমাদের অনুকরণীয়!

"শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত" গ্রন্থ ভক্ত-জীবনীর রত্নাকর। এই অমৃত সাগরে অবগাহন করিতে পারিলে বহু অমূল্য রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেকটী রত্নই দ্যুতিমান্, প্রত্যেটী রত্নই স্বকীয় প্রভায় প্রভান্বিত। এই রত্নরাজির মধ্যে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসের জীবন কাহিনী অন্যতম—আপনার ঔজ্জ্বল্যে ইহা চরিতামৃতের একটী বিশিষ্ট

স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী তৎকৃত গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে তাঁহার পূত নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:—

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই রঘুনাথের জীবন কাহিনীই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব, আর দেখিব কেমন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—

"কৃপাগুণৈ র্ষঃ কুগৃহান্ধ কূপা
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথ দাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেহন্তরঙ্গং—"

স্বীয় কৃপাগুণ দ্বারা সুকৌশলে রঘুনাথ দাসকে কুগৃহরূপ অন্ধ কূপ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক স্বরূপের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপন অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হোসেন সাহ বাঙ্গালার নবাব হইলে তাঁহার নিকট হইতে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই সহোদর "সপ্তগ্রাম" পত্তনী লইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তৎকালে ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইত। তন্মধ্যে নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অবশিষ্ট ৮ লক্ষ টাকা উক্ত দুই ভ্রাতা ভোগ করিতেন। তৎকালের ৮ লক্ষ টাকা বর্ত্তমান সময়ের কোটী মুদ্রার তুল্য, সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয় এইভাবে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বিশিষ্ট ধনিকের মতই কালযাপন করিতেন। রঘুনাথ এই ধনী গৃহস্থেরই আদরের সন্তান।

অনুমান ১৪১৭ শকাব্দে কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ঔরসে রঘুনাথের জন্ম হয়। আবাল্য ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় লালিত পালিত হইয়াও তুচ্ছ বিষয় ভোগের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই, তুচ্ছ বিষয় সুখেচ্ছা তাঁহার মুক্তিপ্রয়াসী চিত্তকে কঠোর বাঁধনে বাঁধিতে পারে নাই। রঘু বাল্যাবধি লেখা পড়ায় যত যত্ন করিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্মে ততোধিক অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ হরিদাস বাবাজীর নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে ইঁহার স্বভাব কোমল হৃদয় একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। ঘটনা বিশেষে হরিদাস স্থানান্তরিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা রঘুর হৃদয়ে যে ধর্ম্ম বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রঘুনাথ ধনিকের ব্যবহার্য্য বস্তুতে একেবারে অনাসক্ত হইয়া পড়িলেন। কি বহুমূল্য মনোহর পরিচ্ছেদ, কি স্বর্ণালঙ্কার, ইত্যাদি বিষয় ইনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময় রঘুনাথ তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন, প্রেম-পুলকিত চিত্তে তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন, অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় প্রভুর প্রসাদ লাভ করিলেন। এইভাবে রঘুনাথের শুদ্ধচিত্তে প্রেমের সঞ্চার হইল, রঘুনাথ পাগল হইলেন।

• •

প্রভু নীলাচলে চলিয়া গেলেন, রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, সংসার যেন শত বৃশ্চিকের মত তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল— তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উদাসী হইয়া পড়িলেন।

রঘুর পিতামাতা পুত্রের এই প্রকার সংসারে অনাসক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন, মনে করিলেন বুঝি অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত সুন্দরী রমণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের সংযোগ

হইলেই পুত্রের যাবতীয় উদাসীনতা দূরীভূত হইবে —সে আবার সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু প্রারব্ধ যাহার অন্যবিধ, সারাৎসারের পানে যাহার চিত্ত প্রধাবিত, রমণীর সৌন্দর্য্য কি তাহাকে সংসারে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?

নীলাচলে ছুটিয়া যাইবার জন্য রঘু দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, কোন্ শুভ মুহূর্তে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবেন তিনি তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন সুযোগ মিলিল; গভীর নিশীথে সকলের অজ্ঞাতসারে রঘু গৃহত্যাগ করিলেন। গোবর্দ্ধনের জনবলের অভাব ছিল না। প্রভাতে পুত্রের অদর্শনে তিনি চতুর্দ্দিকে তাহার সন্ধানে লোকজন পাঠাইলেন, রঘু ধৃত হইয়া গৃহে আনীত হইলেন। কড়া পাহারার ব্যবস্থা হইল, রঘুর গৃহের বাহির হওয়া নিষেধ হইল, পুত্রের প্রত্যেক আচরণের উপরই পিতার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইল। এত সত্বেও কিন্তু মুক্তিপিপাসু বন্ধন ছুটিয়া আরও বহুবার পলাইলেন, প্রতিবারই সংসারাসক্ত পিতা সংসারবিমুখ পুত্রকে ধরিয়া আনিলেন। প্রতিনিয়ত ১১ জন প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়াও যখন কোন সুফল ফলিল না, তখন রঘুর পিতা রঘুকে পট্টরজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, রঘু পিতৃহস্তে বন্দী হইলেন।

রঘুনাথের বিষম জ্বালা। প্রাণ চায় তাঁর গৌরাঙ্গের চরণে ছুটিয়া যাইতে, সংসারান্ধকূপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমের আলোকে চলিয়া যাইতে, কিন্তু সংসারের কঠোর বন্ধন তাঁহাকে এক পদও অগ্রসর হইতে দেয় না, শাসনের তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রতি নিয়তই যে তাঁহার পৃষ্ঠের উপর দোদুল্যমান! কি নিষ্ঠুর এ সংসার, কি নির্মম তার ব্যবহার!

নিরুপায় হইয়া রঘুনাথ ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে "হা গৌরাঙ্গ" "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল, ক্রন্দনের আতিশয্যে তাঁহার চোখ ফুলিয়া উঠিল। রঘুর ক্রন্দনে প্রতিবেশী জনগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য আর অপ্সরা সম যুবতী নারী যাহার চিত্তকে সংসারে আবদ্ধ করিতে পারিল না, সামান্য দড়ির বাঁধনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা, এ যে বিষম বাতুলতা। দড়ি দিয়া তো শুধু তাহার দেহটাকেই বাঁধা যায়, কিন্তু প্রাণ-মন তো তাহাতে বাঁধা পড়ে না। বরং বাহিরের বাঁধন যতই শক্ত হইতেছে, তাহার চিত্ত ততই সংসার হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। তোমাদের নিষ্ঠুর পীড়নে নিপীড়িত হইয়াই সে এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বারবার ছুটিতেছে। বন্ধন খুলিয়া দাও, রঘু যে ভাবে সংসারে অবস্থান করিতে চায়, তাহার সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা করিয়া দাও, তাহা হইলেই আর সে বারবার এভাবে পলায়ন করিবে না, তোমাদেরও উদ্ব্যস্ত করিবে না।"

প্রতিবেশীদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া গোবর্দ্ধন পুত্রের বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলেন, সংসারের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়া তাহার মনের গতি ফিরাইবার কত চেষ্টা করিলেন, রঘু শুধু অবনতশিরে সাশ্রুনয়নে নির্ব্বাক হইয়া সে সমস্ত শুনিয়া গেলেন।

এই ভাবে পিতার কোমল-কঠোর আবেষ্টনীর মধ্যে রঘুর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। যে প্রাণ চায় সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে ছুটিয়া যাইতে, তাহাকে এই ভাবে কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করিয়া স্বার্থপর সংসার তাহার কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল। মুমুক্ষুপ্রাণ গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, রঘু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রঘুর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রভুর চরণে ছুটিয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আকুলভাবে প্রাণের ঠাকুরকে মনে মনে নিবেদন করিলেন—"ওগো দেবতা! তুমি আমাকে এমনি ভাবে সংসারের কঠোর বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছ যে তোমার পায়ে ছুটিয়া যাইবার উপায় নাই। মোহ-মুগ্ধ জীব আমি, এই সংসার রূপ মোহ-গর্ত্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া তোমার অভয় পদে কি স্থান দিবে না প্রভু! দাও দেবতা আমার বন্ধন ছুটাইয়া, আমি বন্ধনহারা মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করি, তোমার প্রেমে মজিয়া যাই।" রঘু প্রভুর চরণ দর্শন জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন, তিনি আবেগ কম্পিত কণ্ঠে পিতৃ সকাশে নিবেদন করিলেন—"প্রভুর দর্শনে শান্তিপুর যাইবার অনুমতি প্রদান করুন, নতুবা এ দেহে আর প্রাণ থাকিবে না—ইহা দৃঢ় সত্য।" গোবর্দ্ধন পুত্রের ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়া বহু লোকজন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে শান্তিপুর পাঠাইয়া দিলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া দিলেন যেন বেশী বিলম্ব না হয়।

রঘুর কি আজ আনন্দের সীমা আছে? যাঁহার শ্রীচরণ দর্শনজন্য এতদিন কত মর্ম্মান্তিক দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়াছেন, সংসারের কত কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়াছেন, আজ তাঁহার সেই অভয় চরণ দর্শন ঘটিবে, তাঁহার মধুমাখা বাণী কর্ণে প্রবেশ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া দিবে! হোক্ না কেন সময় সঙ্কীর্ণ, থাকুক না কেন প্রহরীস্বরূপ শত সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া, কিন্তু তবু তো তিনি আজ মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও তাঁহার দর্শন পাইবেন, তাঁহার স্পর্শনের আনন্দ উপভোগ করিবেন! প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর যেমন বর্ষার ধারা নামিয়া আসে, তেমনি কি আজ সন্তাপ তাপিত রঘুর হৃদয়ে দেবতার অমিয় করুণা ধারা ঝরিয়া পড়িল?

রঘুনাথ ৭ দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া প্রভুর সঙ্গ করিলেন; এই ৭ দিনে তিনি সংসার ভুলিলেন, আপনাকে ভুলিলেন। এই সাত দিন ধরিয়া প্রতিনিয়তই তাঁহার এক চিন্তা—'কেমন করিয়া আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নীলাচলে ছুটিয়া যাইতে পারিব, কেমন করিয়া আমি মহাপ্রভুর চরণ সেবার অধিকারী হইব, কেমন করিয়া আমি সাধু সংসর্গে কাল যাপন করিতে পারিব, কেমন করিয়া আমি অনিত্যের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হইব!' মহাপ্রভু রঘুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একদিন রঘুকে আপনার কাছে ডাকিয়া স্নেহ মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"যাও রঘু, গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসার-আগুনে পুড়িতে পুড়িতে আরও বেশী খাঁটী হও, অন্তরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বালাইয়া নিরাসক্ত ভাবে আসক্তের ন্যায় সংসার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। যাহারা অন্তরে সাধক, তাহারা বহিঃসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তর্গত বৈরাগ্য বাহিরে প্রকাশ না করিয়া নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কার্য্য করিলে যে ফল লাভ হয়, পরকে দেখাইবার জন্য বৈরাগ্য ভাব ধারণ তদপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলে ভগবান্ই উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন। তুমি অন্তরে নিষ্ঠা-ভাব পোষণ করিয়া বাহিরে লৌকিক আচরণ করিয়া যাও, অচিরেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আমি বৃন্দাবন হইতে যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, সেই সময় তুমি সুযোগ বুঝিয়া

কোন ছল অবলম্বন পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিও। শ্রীভগবান্‌ই তখন তোমার সে সুযোগ জুটাইয়া দিবেন, আর তাঁহারই কৃপায় সেই ছল তোমার মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইবে। যাহার উপর শ্রীভগবানের কৃপাকণা সিঞ্চিত হয়, কে তাহাকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? তাঁহার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাক, সময়ে সুযোগ ঘটিবে, তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে।"

মহাপ্রভুর এই উপদেশানুযায়ী রঘুনাথ সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব পোষণ-পূর্ব্বক বাহিরে ঘোর বিষয়ীর মত সংসারকার্য্যে লিপ্ত হইলেন। পিতামাতা পুত্রের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং যাহাতে পুত্রের এই সংসারাসক্তি চিরন্তন হয়, আর যেন রঘুর অন্তরে গৃহ ত্যাগের সঙ্কল্প না জাগে,তাহার জন্য ইষ্টের চরণে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর রঘুনাথ সংবাদ পাইলেন যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন. এখন কোন্ ছল অবলম্বন করিয়া কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে গৃহত্যাগ করিতে পারিবেন তাহাই হইল তাঁহার বর্ত্তমানের একমাত্র চিন্তা: তিনি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন: এদিকে সংসারে একটি বিরাট বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তগ্রাম মুলুকের তদানীন্তন যবন বংশীয় চৌধুরী হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাসের নিকট হইতে কোনপ্রকার আর্থিক উৎকোচ না পাইয়া তাঁহাদের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন, এমন কি ভ্রাতৃদ্বয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া স্বকীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাজদরবারে নালিশ করিয়া একজন উজীর আনাইলেন। চৌধুরীর এবম্বিধ ষড়যন্ত্রে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস ভীত হইয়া গৃহ ছাড়িয়া পলাইলেন, নিরীহ রঘুনাথ যবন-হস্তে বন্দী হইলেন।

বহু অনুসন্ধানেও যখন পলাতক ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন সন্ধান মিলিল না, তখন চৌধুরীর যাবতীয় আক্রোশ সমস্তই পড়িল রঘুর উপর। তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য চৌধুরী রঘুকে প্রতিনিয়ত ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন, কটূক্তি করিতে লাগিলেন, এমন কি স্পষ্টভাবে বলিলেন— "বাপ জ্যেঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা।" পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সন্ধান না বলিলে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, রঘুনাথ ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়াও নিরুত্তর রহিলেন, কেননা তিনি জানেন যবন-রোষ-বহ্নির সম্মুখে তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত যে জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে! নিজে তিনি সর্ব্ববিধ যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু চোখের সম্মুখে স্বীয় অভিভাবকবর্গের কঠোর শাস্তি দেখিবেন কেমন করিয়া? নির্ব্বাক্ রঘুর উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, তীক্ষ্ণ বেত্রদণ্ড তাঁহার পৃষ্ঠের উপর নাচিতে লাগিল, কিন্তু দেহ স্পর্শ করিল না. পৃষ্ঠদেশের অতি সন্নিকটে যাইয়াই যেন তাহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। রঘুর কমনীয় কান্তি দেখিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রহারোদ্যত যবনের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল. তিনি রঘুকে প্রহার করিতে পারিলেন না।

কি উপায়ে আপনাকে এবং অভিভাবকগণকে এই যবন-রোষ হইতে উদ্ধার করিবেন, রঘুনাথের এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহসা নিজের মাঝে যেন এ সমস্যার সমাধান মিলিল, তিনি যবন সকাশে মিনতি প্রকাশ করাই স্থির

সিদ্ধান্ত করিয়া বিনয়-নম্র বচনে তাঁহাকে বলিলেন —"আমার পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত আপনারই দুই ভাই। ভাই ভাই পরস্পর বিবাদও হয়, আবার পরক্ষণেই তাঁহাদের মিলনও হয়, এ রীতি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভাইএর কোন অপরাধ অবলম্বন করিয়া চিরদিন ভাইএর প্রতি আক্রোশ পোষণ করা উচিত? আমাকে অনুমতি করুন, আমি কালই আবার আপনাদের তিন ভাইকে একত্র করিতেছি, যাহাতে বিরোধের কারণ অপসৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। আমি আপনাকে আমার পিতার তুল্যই সম্মান করিয়া থাকি, পিতার নিকট আমি যেমন স্নেহের পাত্র, আপনার নিকটেও তাই। আপনি আমার পালক—প্রভু, আমি আপনার পাল্য। পালক হইয়া পাল্যের প্রতি, স্নেহদ হইয়া স্নেহার্হের প্রতি তাড়ন-ভৎর্সনা কি শোভা পায়? আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্‌, আপনাকে আর বেশী কি বলিব?

রঘুনাথের এই স্নেহ-মধুর কথা শুনিয়া কঠোর হৃদয় যবনের চিত্ত গলিয়া গেল, তাঁহার শ্মশ্রু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি স্বহস্তে রঘুর বন্ধন মোচন করিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন —"যাও বৎস! তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম, আজ হইতে তুমি আমার সন্তান হইলে তোমার জ্যেষ্ঠতাত বুদ্ধিহীন, নতুবা আমাকে কিছু না দিয়া এইভাবে সপ্তগ্রামের সমস্ত উপস্বত্ব নিজেরাই ভোগ করিবেন কেন? আমিও ত এই ভূখণ্ডের অংশীদার, কাজেই আমাকেও কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য! যাহা হউক আগামী কল্যই তুমি তাঁহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সুবিবেচনার উপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন আমি বিনা আপত্তিতে তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।"

অতঃপর সত্যনিষ্ঠ রঘুনাথ আপন কথানুযায়ী পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাতকে আনয়ন করিয়া চৌধুরীর সহিত তাঁহাদের ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিলেন, দেনা পাওনা সম্বন্ধে আপোষে নিষ্পত্তি হইল, যবন-রোষ শান্ত হইল, তাঁহারা আবার নিঃসঙ্কোচে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে রঘুনাথের সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

সাংসারিক নানা বিভ্রাট প্রভৃতিতে এই প্রকারে রঘুনাথের ১ বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর রঘুনাথ নীলাচলে যাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বের মত এখন আর কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল না, তাই রঘু অনায়াসে একদিন রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করিলেন, কিন্তু কঠোর সংসার এবারও তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করিল, পিতা দূর হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনাইলেন। রঘুর প্রাণ সংসার হইতে ছুটিয়া গিয়া মহাপ্রভুর পাদমূলে বিশ্রাম করিতে চায়, তাঁহার পিতা কিন্তু তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে চান, এই দ্বন্দ্বের লীলা বহুদিন ধরিয়া চলিল,—একবার নয়, দুইবার নয় বহুবার তিনি এই ভাবে পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, প্রতিবারই তিনি পিতৃদেব কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন—প্রতিবারই তাঁহার পিতা তাঁহাকে লোক জন দিয়া দূর হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিলেন।

পুত্রের এই প্রকার অত্যধিক সংসারবিরক্তি দেখিয়া তদীয় জননী রঘুনাথকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য স্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন। গোবর্দ্ধন কিন্তু পুত্রের ঐকান্তিক সংসার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া এবং বারবার তাহার গৃহ হইতে প্রস্থিতির বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া উত্তর করিলেন:—

ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কি মতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে ॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে,
চৈতন্য চন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে ?

এতদিনে যেন গোবর্দ্ধন দাসের পুরুষকার হার মানিল, তিনি পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব মনে করিয়াই বলিলেন—"জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে।" বাস্তবিকই গোবর্দ্ধন স্বীয় পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য কি কম চেষ্টা করিয়াছেন ? তাঁহার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, অগাধ সম্পত্তি, সে সমস্তেরই উত্তরাধিকারী রঘুনাথ। এই ঐশ্বর্য্যের সহিত আবার রমণীর রমণীয় সৌন্দর্য্যের সংযোগ হইল, কাম আসিয়া কাঞ্চনের সহিত মিলিত হইল, কিন্তু রঘুনাথ যে ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, যে সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় জাগতিক কাম-কাঞ্চন ম্লান হইয়া গেল, তাহাদের পৌনঃপুনিক আকর্ষণ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই কামকাঞ্চনের মোহন বন্ধনের পরিবর্ত্তে অতঃপর আসিল শাসনের বজ্রদণ্ড, স্থূলের কঠোর বন্ধন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল, রঘু সকল বন্ধন কাটাইয়া বার বার ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। মানুষের চেষ্টার যতটুকু সীমা, গোবর্দ্ধন তাহাও অতিক্রম করিলেন, তথাপি রঘুকে সংসারাসক্ত করিতে পারিলেন না— তাই আজ তাঁহার মুখ দিয়াই বাহির হইল— "জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে।" শুধু কি প্রারব্ধের উপরই সমস্ত জোরটুকু দিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন! তারপর আবার বলিলেন— "যাহার উপর চৈতন্যের কৃপা হইয়াছে, যে চৈতন্যের প্রেমে পাগল, তাহাকে কে সংসারে ধরিয়া রাখিতে পারে ?" প্রারব্ধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব অবনত শিরে স্বীকার করিয়া তাহার উপর তিনি কৃপার আসন রচনা করিলেন. প্রারব্ধ এবং কৃপা দুই-ই যার অনুকূল তাহার সিদ্ধি অনিবার্য্য, সংসারের কোন বাধাই তাহাকে ব্যাহত করিতে পারে না, গোবর্দ্ধনের এই স্থির বিশ্বাস জন্মিল ; তিনি পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

২৫শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯ | ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৬৫ | | ২য় সংখ্যা।

আশীর্ব্বাদ

আজ শঙ্করাচার্য্যের জন্মোৎসব। যাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে তোমরা সম্মিলিত—আনন্দে উদ্দীপিত হইয়াছ, তাঁহার জীবনের ভাব বুঝিয়া নিজেদের জীবনকেও তদনুযায়ী গড়িয়া তোল—ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।

শঙ্কর এবং গৌরাঙ্গই শ্রেষ্ঠ দুটী আদর্শের চরম সীমা। শঙ্করের জ্ঞানকে জীর্ণ করিয়া এই জগতেই নিত্য ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট বড়র দিক দিয়া বলিতেছি না, কিন্তু শঙ্করের জ্ঞানের পরও আরও কিছু রহিয়াছে। সেই নিত্য ভাব-লোকের তত্ত্ব বুঝিয়া এই জগতেও সেই ভাবকে প্রত্যেকের জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তোল। জ্ঞান ভাল, কিন্তু জ্ঞান দিয়া যদি

জগৎকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে না পারি, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের সার্থকতা কি ?

যিনি জ্ঞান লাভ করেন—তিনিই শঙ্কর। এক শঙ্কর হইয়া গিয়াছেন বলিয়াই যে আর শঙ্কর হইবে না, তাহার কোন মানে নাই। জ্ঞানকে পরিপাক করিয়া যাঁহারা এই স্থূল জগতে সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ইত্যাদি নিত্য-ভাব অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের অধিষ্ঠান আমি বহু ঊর্দ্ধে মনে করি। অনেকের ধারণা, শঙ্করের মত বুঝি আর কেহই হইতে পারিবে না, কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। শঙ্করই যে চরম তাহা নয়। শঙ্কর-গৌরাঙ্গের জীবনের সম্মিলিত আদর্শই তোমাদের জীবনের আদর্শ। কোন একদিককেই চরম মনে করিও না।

জ্ঞান চাই—কিন্তু সেই জ্ঞানকেও চরমে প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। নিছক শুষ্ক জ্ঞানে কিছু হয় না—জ্ঞানেরও প্রয়োগ চাই। জ্ঞানীই জগতের প্রকৃত সেবক। কোন কিছুতেই আবদ্ধ করিতে পারিবে না, এই সংস্কার, এই বল প্রাণে আছে বলিয়াই, জ্ঞানীই সকলের সেবা অকুণ্ঠিত চিত্তে করিয়া যাইতে পারে।

তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়াছ বুঝিব তখনই, যখন তোমরা অপরের দুঃখে-দৈন্যে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। শঙ্করের জ্ঞান বলিতে আমি পুঁথিগত জ্ঞান বুঝি না। জগতের অবিদ্যা দূর করিবার দরুণ শঙ্করা-চার্য্যের ন্যায় যাহাদের প্রাণে আকুলতা আসিবে, বুঝিব তাহারাই শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান লাভ করিয়াছে।

জ্ঞান লাভ করার পরও তোমাদের জীবনে নিত্য লোকের ভাব ফুটিয়া উঠুক—এই আমার আশীর্ব্বাদ। ভগবানকে তোমরা এই জীবনে, এই দেহ-মন দিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিবে। জ্ঞান বলিতে তো আমি মানস কোন ক্রিয়াকে বুঝি না; প্রাণকে শীতল করে, পরিপূর্ণ আনন্দে মাতাইয়া তুলে যাহা, তাহাকেই বলি আমি জ্ঞান। তোমরা ক্রমশঃ সেই জ্ঞান লাভে অধিকারী হও—ইহাই আমার প্রার্থনা।

পুঁথিগত জ্ঞানীর অভাব নাই। তাঁহারা কি জগতের অবিদ্যা মালিন্য দূর করিতে সক্ষম? অবিদ্যাকে দূর করা যায় যে জ্ঞানের আলোকে, সেই জ্ঞানের দীপ্তিতে তোমাদের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। বেশী না—অন্ততঃ তোমাদের মাঝে দু'পাঁচটী এই জ্ঞান লাভের দরুণই আকুল হইয়া উঠ। জগতের দুঃখ পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা দূর করা যায় না—সে অন্তরের দুর্লভ জিনিষ, তাহাকে পাইতে হইলে বহির্জ্জগতের কথা ভুলিয়া গেলেও লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন কারণ হয় না।

একান্ত জ্ঞানী হইয়া উঠ বলিয়াই তোমাদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হয়। জ্ঞান লাভ করিয়া যে স্থলে পৌছিবে, সেখান হইতে সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখা যায়। তোমাদের কেহই সে চরম জ্ঞানের সন্ধান পাও নাই বলিয়াই বিরোধকে অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিরোধ অবস্থা লাভ করিতে পারিতেছ না। হতাশ হইও না—জীবনের লক্ষ্য সেই চরম জ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ আমার সঙ্গে জগতের সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য সূত্রের সন্ধান জানিয়া লওয়া।

আমার শেষ কথা—শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান লাভ কর, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের প্রাণ, মনের বল, সাহস—এই গুলিই হইল আসল। জ্ঞান লাভ করিয়া যদি এই দৈবী গুণ গুলিই নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু জীবনের কোন সার্থকতা হইল না। শঙ্করের মত জ্ঞানী এবং গৌরাঙ্গের মত হৃদয়বান্ হও তোমরা—এই আমার আশীর্ব্বাদ।

গীতা

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্য যোগ

অর্জ্জুন যে সমস্ত কথা বল্‌লেন, তা শুনে মনে হয়, কত বড় প্রাণ তাঁর। একেবারে খাঁটী অহিংসাবাদ। শত্রুরা এসে তাঁকে মেরে ফেল্‌লেও তিনি তাদের ওপর হাত তুল্‌বেন না। এ সব কথা শুনলে মনে হয়, এ যেন যীশুর উক্তি! তিনি বলেছিলেন, তোমার এক গালে যদি কেউ চড় মারে তো আর এক গাল ফিরিয়ে দিও। আমাদের দেশের সাধুদেরও এই উপদেশ—

"চুপ করে সয়ে যাও—প্রভু আছে।"

অর্জ্জুন তো কেঁদেই ফেলেছেন একেবারে (২।১), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ হয়ে কোথায় তাঁর কান্নায় সায় দেবেন, না এক ধমক দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "এ কি! এখন সঙ্কটের সময়, এর মাঝে তোমার এই মোহ এসে জুটলো কোথা থেকে?—ছিঃ! (২)

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!—নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং—ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ। (৩)

এ কি! ক্লীবের মত হয়ে পড়েছ কেন? এ নাকি তোমায় মানায়?—ছিঃ, এই কাতরতা—এ তো তোমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মাত্র! এ তুচ্ছ!—shake it off and be up! Fight your enemies!—"

এই যে কথাগুলি, এই হল গীতার সুরু—অধ্যাত্ম সাধনার সুরু! ও পথে যখন চলি, তখন আমাদের সমস্তটা প্রকৃতির মাঝে একটা ওলট পালট হতে থাকে। তখন অনেক সময় নাকী সুরে কান্না বেরিয়ে পড়ে। সংসারী পণ্ডিতের মত কথা বলি, কি, তাদের কথা শুনি—আর ভাবি, তাই তো, ঠিকই তো বল্‌ছে!—এই সময় ভগবান্ গুরু রূপে এসে ঝাঁকি দিয়ে বলেন, "হচ্ছে কি? বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুধু! Weakness is no religion! You must show your strength. The whole life is a fight and do you mean to be a coward at the very outset?—Be a man! shake off all weakness! নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। You must struggle and face your enemies boldly. The weak and the impotent can never attain God-head! Be a hero! Fight weakness! Fight sins! Fight death! That's the begining of religion."

বিবেকানন্দ বল্‌তেন, গীতায় এই শ্লোকটার তেজটুকু যার হৃদয়ে নাই, তার গীতা পড়াই বৃথা। ঠিক কথা। জীবনে ওই কথা গেঁথে নিতে হবে একেবারে—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ—ক্লীব হয়ে পড়ো না—ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং—তুচ্ছ এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা! বীর্য্য চাই—বীর্য্য চাই।

এই ঝাঁকুনীতেই কিন্তু অর্জ্জুনের নেশা ছুটে গেল। তিনি তখন বল্‌ছেন—"এঁরা সব গুরুজন, কি করে এঁদের হত্যা করি। এঁদের রক্তপাত করে রাজ্য ভোগ কর্‌তে হবে? বুঝ্‌তে পার্‌ছি না কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। দেখ, আমার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, আর তাইতে আমার ভিতরের ভাবটা যেন মরে আছে (কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ); কি যে আমার কর্ত্তব্য তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমার পক্ষে যা কল্যাণ হবে, তা তুমিই বলে দাও—

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্—

আমি তোমার শিষ্য, তোমায় আঁকড়ে ধর্‌লাম—আমায় তুমি শাসন কর।" (৪-৭)

অর্জ্জুনের এই আত্মসমর্পণটা কি সুন্দর! কিন্তু তাঁর হিসাবী বুদ্ধি যায় নি। তাই পরের শ্লোকেই (২৷৮) আবার বলছেন, "কি করে যে আমার এই জ্বালা যাবে, তাতো বুঝ্তে পারছি না।"—সমর্পণ করেছেন বটে, কিন্তু সেটা তখনো সম্পূর্ণ হয় নি, তাই মনের ভিতর দ্বন্দ্ব চলছেই। (৮-৯)

শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসলেন মাত্র। তার পর গম্ভীর হয়ে বললেন, "অর্জ্জুন—প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে—পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে! কিন্তু জান, সত্যিকার পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা বাঁচা মরা নিয়ে দুঃখ করেন না? (২-১১)

এই "প্রজ্ঞাবাদ" শব্দটা লক্ষ্য করতে হবে। আগেই বলেছি, গীতায় সে যুগের অনেক মতের সমালোচনা আছে। "প্রজ্ঞাবাদ" তারই একটা। সংসারে কতগুলি চলতি কথা আছে—সংসারীরা বিজ্ঞের মত সেই কথাগুলি ঝাড়ে, অথচ তার আসল মানে যে কি, তা তলিয়ে বুঝে না। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাগুলোকে "প্রজ্ঞাবাদ" বা পণ্ডিতী কথা বলছেন। এই যে অর্জ্জুন বলছেন, "ও মা, গুরুজনের ওপর হাত তুলব নাকি? জাত কুল খোয়াব নাকি?"—এই সমস্ত কথা গুলোই হচ্ছে প্রজ্ঞাবাদ। শুনলে পর প্রথমটায় মনে হয়, "তাইত, সত্যিই তো বলছে।" কিন্তু আসলে কথাগুলো প্রচলিত সংস্কার মাত্র। এর মূলে কোন বিচার নাই। শ্রীকৃষ্ণের মতে ধর্ম্মটা চলতি সংস্কার নয়—সেটা বুঝবার জিনিষ, উপলব্ধি করবার জিনিষ। লোক-মত কখনো ধর্ম্ম হতে পারে না। সত্যের খাতিরে লোক-মত উলটিয়ে দিতে হবে—জীবন দিয়ে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করতে হবে। বীর্য্য প্রকাশ করতে হবে, তাতে প্রাচীনের সংস্কারে আঘাত লাগে তো লাগুক।—তোল ঝড়—গাছের পুরণো পাতা সব খসে পড়ুক—নূতন পল্লব-শ্রী নিয়ে প্রকৃতি হেসে উঠক। Those "learned words" are only fool's utterances. Spum at those babies talks! Cut out a new path for yourself. Drive deep into the mysteries of life and create a new gospel for your guidance. Let these babies talk, what do we care?

এইখান থেকেই গীতার উপদেশ সুরু হল। মনে রাখতে হবে, অধ্যাত্ম সাধনার গোড়াতেই প্রজ্ঞাবাদ বা সংসারের পণ্ডিতী কথার hypnotism থেকে মুক্ত হতে হবে।

এর পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশগুলো দিলেন, আমরা তার আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বুঝে নেওয়া দরকার যুদ্ধ করতে চান্ নি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করালেন। যুদ্ধ হিংসামূলক কর্ম্ম। অর্জ্জুনকে হিংসায় প্রবৃত্ত করালেন কেন? এই সংশয় মনে জাগতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এর বিস্তৃত জবাব দিয়েছেন, যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব। এখানে মোটামুটী দু'চারটা কথা বলে রাখি।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের missionটা যদি বুঝে থাক, তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, এই যুদ্ধটা তাঁর ধর্ম্ম সংস্থাপন বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধটা আপাততঃ স্বজনবধ, নরহত্যা প্রভৃতি পাপের নিদান বলে মনে হচ্ছে, অর্জ্জুনও তাই বলছেন। কিন্তু এটা যুদ্ধের আপাততঃ ফল মাত্র। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিপাত হল বটে; কিন্তু সমস্তটা ভারতবর্ষ বেঁচে গেল। ফল দেখে কাজের বিচার করতে হবে। যুদ্ধ ভাল কাজ, এ কথা শ্রীকৃষ্ণ বলছেন না। কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য যদি এই যুদ্ধটা প্রয়োজন হয়, তাহলে **নির্বিকারভাবে** তাই করতে হবে বই কি! Duty to

mankind is above everything. Dutyর সাম্‌নে sentimentএর বিচার সব সময় শুভ ফল প্রসব করেনা।—কোন রাজা অপরাধী পুত্রের প্রাণ-দণ্ড করেছিলেন, পুত্রস্নেহ সেখানে আমল পায় নি।

কথা হতে পারে, যুদ্ধটা যে এমনি একটা imperious duty, তা না হয় মান্‌লাম; কিন্তু অর্জ্জুন বেচারী যুদ্ধ কর্‌তে চায় না, সে চায় দয়া-ধর্ম্মের অনুশীলন কর্‌তে। তার হৃদয়ের দয়া-বৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়ে হিংসায় তাকে প্রণোদিত করা, এ কেমন হল?—অর্জ্জুনকে ছেড়ে দিয়ে অপরকে দিয়ে যুদ্ধ করালেই তো হ'ত।—এইখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরুর মত গভীর অন্তর্দ্দর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অর্জ্জুনের অবস্থা বেশ বোঝেন। তিনি জানেন, অর্জ্জুনের ওটা প্রকৃত দয়া নয়—ওটা দয়ার উত্তেজনা মাত্র। আসলে ওটা তাঁর মোহ—ঘোর তামসিক ভাব। কঠিন কর্ত্তব্যের সাম্‌নে পড়ে অনেকের ভিতর থেকে এমনি সাত্ত্বিকতার ভাণ বেরিয়ে পড়ে—অর্জ্জুনেরও তাই হয়েছে। নইলে তিনি যুদ্ধে আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কৌরবদের মার্‌বার জন্য তৈরী হয়েই এসেছিলেন। চিরকাল তিনি লড়াই করে এসেছেন—আজ হঠাৎ একেবারে পরম বৈষ্ণব হওয়াটা তাঁর স্বভাবের পরিচয় নয়—স্বভাবের বিকার। সাত্ত্বিকতা আর তামসিকতা অনেক সময় দেখ্‌তে এক রকম। আমাদের দেশটা খুব সাত্ত্বিকতার বড়াই করে, কিন্তু আসলে এমন তামসিক জাত আর দুনিয়ায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দরকার রাজসিক উত্তেজনা—দরকার কর্ম্ম; sense of stern duty জাগিয়ে তোলা দরকার। বিনিয়ে বিনিয়ে নাকী কান্নার প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না। শ্রীকৃষ্ণের মত এক ঝাঁকুনী দিয়ে বল্‌তে হবে—"নাও সাত্ত্বিকতার ঢং রাখ—কাজ কর। ভাবুকতা কর্‌লে চলবে না, কাজ চাই।"

এখন দেখা যাক্, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি করে বোঝালেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে চারটী বিষয় বোঝাতে চেয়েছেন—(১) মৃত্যুকে জয় কর্‌বার রহস্য (১২-৩০ শ্লোঃ) (২) স্বধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে সামাজিক বিচার (৩১-৩৮); (৩) নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (৩৯-৫৩); (৪) স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ (৫৪-৭২)। আমরা এক এক করে তার আলোচনা কর্‌ব।

১ মৃত্যু রহস্য (১২-৩০)

অর্জ্জুনের প্রধান আপত্তিই হচ্ছে, যুদ্ধে তিনি স্বজন বধ কর্‌বেন কি করে? মরণকে তাঁর বড় ভয়।—মরণটা যে ভয়ের কিছু নয়, তা বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দুটী যুক্তি দিয়েছেন, একটী যুক্তি দেহের ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, আর একটী আত্মাকে লক্ষ্য করে। প্রথমতঃ দেহের ধর্ম্মই যে মরণ, তাই বোঝাতে গিয়ে তিনি বল্‌ছেন, দেখ, বাঁচা মরা নিয়ে পণ্ডিতেরা কখনো দুঃখ করেন না, কেন না আমরা কেউ চিরকাল থাক্‌ব না (১২); জন্ম যখন হয়েছে, তখন মরণ একদিন হবেই, আর মরণ হলে একদিন জন্মাতেও হবে (২৭); বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য—পর পর দেহের এই বিকারগুলো হচ্ছে—ঠিক natural courseএ বার্দ্ধক্যের পর মরণ বলে একটা stage আস্‌বেই, তার জন্য এত ভয়ের কি আছে? (১৩)। যদি বল, মরণের তো একটা যন্ত্রণা আছে! তার উত্তরে বলি, এই দেহ দিয়ে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ কতই তো ভোগ কর্‌ছ, কিন্তু কোনো ভোগই তো চিরস্থায়ী হচ্ছে না; সমস্ত অনুভূতিই "মাত্রা-স্পর্শ" অর্থাৎ কিনা, তাদের তীব্রতার একটা পরিমাণ আছে, সহের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই আর অনুভূতি থাকে না; অতএব সুখ-দুঃখ সব সইতে হবে (১৪)। সুখ-দুঃখ যার কাছে সমান, তাঁর কাছে মরণ-যন্ত্রণা কি একটা বেশী কিছু?" (১৫)

মরণ সম্বন্ধে এই হল দেহের তরফ দিয়ে যুক্তি। এ সব যুক্তি আমরা সবাই জানি। আসল কথাটা শ্রীকৃষ্ণ এর পরে বল্‌ছেন। বল্‌ছেন, "দেখ, মানুষের দেহটাই চরম নয়। এই দেহের পরেও তার আত্মা আছেন। দেহের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু আত্মার তো মরণ নাই (১৮)! দার্শনিক বিচারে আমরা বুঝি, যা আছে তা কখনো নাই হতে পারে না, ভিন্ন ভিন্ন আকারে তা দেখা দিতে পারে মাত্র, কিন্তু nothing is lost, nothing is created (১৬)। আত্মা আছেন বলে যখন অনুভব কর্‌ছি, তখন সে আত্মার কখনো বিনাশ হতে পারে না, অবস্থান্তর হওয়া সম্ভবপর মাত্র (১৭)। কাজেই সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, আত্মার মরণ-বাঁচন নাই, তিনি মরেন-ও না, কাউকে মারেনও না (১৯-২১)। মরণটা তা হলে কি? সে শুধু আত্মার পোষাক বদল মাত্র (১২)। দেহটাকে কাটা যায়, ছেঁড়া যায়, পোড়ান যায়—কিন্তু চেতনাকে কাটা-ছেঁড়া তো যায় না—**তিনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার!** (২৩-২৪) তার পর দেখ, মরণটাকে এত ভয় কর্‌ছ কেন? আত্মীয় স্বজনদের দেখ্‌তে পাবে না বলে তো? কিন্তু এ জগতে আসবার আগে তারা কোথায় ছিল, তাও তো জানতে না, মরে কোথায় যাবে, তাও জান্‌বার উপায় নাই; জীবনের আদি আর অন্ত রহস্যে ঢাকা, শুধু মাঝখানকার খবর আমরা জানি, তবে আর এর জন্য দুঃখ কি? (২৮) আত্মা এক আশ্চর্য্য রহস্য, এটুকু ঠিক যে দেহটা বধ করা যায়, কিন্তু আত্মাকে বধ করা যায় না; তবে আর শোক কিসের? (২৯-৩০)"

এই তো হল মোটামুটি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে গীতার উপদেশ। এখন এর তাৎপর্য্য কি, তাই বুঝে দেখ্‌ব। শ্রীকৃষ্ণের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে আমরা কিছু জানি না বলেই মৃত্যুকে ডরাই। মৃত্যুভয়কে জয় কর্‌তে হবে জ্ঞান দিয়ে। এই জ্ঞান সাংখ্যজ্ঞান বা **বিবেক জ্ঞান!** বিবেক মানে একটা হতে আর একটার তফাৎ বোঝা। দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমাদের দেহ আছে; অনুভব কর্‌ছি আত্মাও আছে। এখন দেহ আর আত্মার তফাৎটা বুঝ্‌তে হবে। যদি জান্‌তে পারি যে আত্মা আর দেহ একেবারে আলো আর আঁধারের মতই বিপরীত-ধর্ম্মী, তা হলে দুটাকে কখনো এক করে ঘুলিয়ে দেখ্‌ব না; আর তা হলেই দেহের বিকারে আমি কষ্টও পাব না। তখন দেখ্‌ব, মরণটা দেহেরই হয়, আত্মা অমর।

আচ্ছা, এই আত্মা জিনিষটা কি?—সোজা কথায় বল্‌তে পারি **আত্মা হচ্ছে অনুভব!** আমাদের মাঝে যে একটা জ্ঞানের প্রবাহ চল্‌ছে, সেইটাই আত্মা। এই জ্ঞান কখনও স্তিমিত হয়ে থাকে, কখনো বা দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। যখন ভিতরটা অগ্নিশিখার মত জ্বল্‌তে থাকে, তখন আমরা আনন্দে, শক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠি—তখন বুঝি, এই তো আত্মার প্রকাশ! আবার এ-ও অনুভব করি যে এই দীপ্তির কখনও শেষ হতে পারে না। যতই জ্বলি, মনে হয়, আরো জ্বল্‌তে পারি, আরো আনন্দ পেতে পারি। ভিতরটা জ্বলে উঠ্‌লে তখন আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক কিছুরই বোধ থাকে না—জালাটা যদি চরমে ওঠে, শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, মরণ পর্য্যন্ত থাক্‌বে না। আর একটা ব্যাপার এই, মন যখন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, তখন ভিতরটা স্তিমিত থাকে, কিন্তু মন যতই অন্তর্মুখী হয়, যতই একাগ্র হয়, ততই আত্মানুভব ফুটে উঠ্‌তে থাকে—ধ্যানে তার প্রমাণ পাই। যতই ধ্যান জমে আসে, ততই আমার সত্তার একটা firm basis পাই, "আছি-আছি" এই বোধটি তীব্র হয়ে

জল্‌তে থাকে—তাকেই ঋষিরা বলেন, আমার "সৎ"-স্বভাব। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি—একটা দীপ্তি। (এমন কি দেহটা পর্য্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন জ্বর হয়েছে)। এই দীপ্তিই জ্ঞানের দীপ্তি—ঋষিরা বলেন আত্মার "চিৎ"-স্বভাব। আর আনন্দ তো আছেই। তিনটী মিলিয়ে আত্মাকে বলে—"সচ্চিদানন্দ"। এই সচ্চিদানন্দই আমাদের জীবনের আদর্শ, এই হচ্ছে আত্মস্বরূপ। কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছি—আত্মা তো আজগুবি একটা কিছু নয়, অনুভবরূপে তিনি আমার মাঝে আছেন। মন চঞ্চল হলে তিনি স্তিমিত হয়ে থাকেন। ধ্যানে মনকে স্থির কর—আত্মা সচ্চিদানন্দ হয়ে ফুটে উঠ্‌বেন—তুমিই তাকে অনুভব কর্‌বে। এই অনুভবের চরম সীমাই হচ্ছে নির্ব্বিকল্প-সমাধি।

তা হলে আমাদের মাঝে দুটো জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্ছি—একটা আত্মা, আর একটা দেহ। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, এ দুটী একেবারে পরস্পরের বিপরীত। কি রকম বিপরীত, তা দেখ। প্রথমতঃই দেখ্‌ছি দেহটাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, কাটা যায়, পোড়ানো যায় ইত্যাদি, আত্মাকে এ সব কিছুই কর্‌তে পারা যায় না। দেহটা চঞ্চল, তার বিকার হয়, সে নড়ে চড়ে। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, দেহ-মন স্থির না হলে আত্মাকে জানাই যায় না। যখন ধ্যানে তাঁর স্বরূপ বুঝ্‌তে পারি, তখন দেখি তিনি স্থির-প্রশান্ত (শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় "স্থাণুর-চলোঽয়ং" (২৪)। দেহটা এক জায়গায় আছে, আত্মা সর্ব্বব্যাপী। কি করে বুঝি? ধ্যানে মনটাকে বিরাট্ করে ছড়িয়ে দিই যখন, তখন যতই ছড়াতে থাকি, ততই সচ্চিদানন্দের অনুভব পাই। এমনি করে দেখ্‌ছি, দেহ আর আত্মা এই দুটী একেবারে বিপরীত। এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখাই হচ্ছে **বিবেকজ্ঞান।**

আমাদের প্রত্যেককে সাধনার গোড়াতেই বিবেকানন্দ হতে হবে। সর্ব্বদা ভাব্‌তে হবে, "আমি দেহ নই—দেহের দাস নাই। কাম-ক্রোধ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়, আলস্য, জড়তা—এসব দেহের ধর্ম্ম। এরা আমায় বাঁধবে? Am I a slave to them? —Never. যারা দেহের বিকারের দাস, সেই সংসার আমায় চালাবে? সাধ্য কি? আমি আত্ম-স্বরূপ! ধ্যানে তন্ময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ! আমি নির্ব্বিকার, মৃত্যুঞ্জয়, চিদ্‌ঘনবিগ্রহ! দেহ নই—আমি দেহ নই," তেজের সঙ্গে এইটী ভাব্‌তে হবে—তবে ধ্যানে মন জম্‌বে, আত্মসাক্ষাৎকার হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, তুমি যদি এই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাক, অর্থাৎ আমি দেহ নই, এই জ্ঞানটী তোমার জাগ্রত থাকে, তা হলে তোমার কাছে মরণ বলে কিছু থাকৃতে পারে না। কেন না মরণটা তো দেহের একটা natural পরিণাম (১৩)! দেহ হতে সর্ব্বদা নিজকে পৃথক্ জান্‌লে, দেহটা আলগা হয়ে যায়—কাপড় ছাড়ার মত দেহটা ছেড়ে আত্মা শিবস্বরূপে বিহার করেন। এ তো logical কথা। রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, "ক্রমেই দেখ্‌তে পাচ্ছি খোলটা আর চৈতন্যটা আলাদা হয়ে আছে—শুপারী শুকালে পর যেমন খোসা থেকে আলাদা হয়ে যায়।" সমাধিতে দেহ বোধ থাকে না, অথচ আত্মস্বরূপের জ্ঞান থাকে—সাধারণ জ্ঞানেই দেহ বোধ থাকে না। কাজেই যাঁরা নিত্য সমাধিস্থ অর্থাৎ সর্ব্বদাই আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের দেহ ছাড়্‌তে কষ্ট কি? দেহ ছাড়লেই তো আনন্দ। অতএব আত্মজ্ঞানী বা পণ্ডিতের পক্ষে মরণটা ভয়ের কিছু নয়।

বল্‌তে পার সাধারণ লোক তো আত্মজ্ঞানী নয়, তারা মরণকে ডরাবে না কেন? তারও জবাব আছে। একটু বুঝে দেখ্‌লে তাদেরও মরণকে ভয় করা উচিত নয়। কথা হচ্ছে দেহটা নিয়ে। দেহ যদি

না থাকে, তা হলে দেহের বোধও থাক্‌বে না, কেমন ? দেহের বোধ না থাকাটা তো দুঃখের কিছু নয়। ধ্যান তো দূরের কথা, এই যে লোক রোজ ঘুমুচ্ছে, তখন তো দেহের বোধ থাক্‌ছে না, কষ্ট হচ্ছে কি ?—মোটেই না। বরং ঘুমে লোকে রোগের যন্ত্রণা, পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলে যাচ্ছে। ঘুম দিয়েই তো ভগবান্ রোজ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, "ওরে দেহটা ছাড়্‌তে ভয় পাস্ কেন ? দেখ্ দেহ ছেড়েও তোর কোন কষ্ট হয় না।" লোকে বল্‌বে, "দেহ ছেড়ে গেলে যাদের ভালবাসি, তাদের যে আর দেখ্‌তে পাব না, সেই জন্য কষ্ট হয়।" তার দুটা জবাব। যদি দেহ ছাড়্‌লে কোন জ্ঞানই না থাকে, তা হলে প্রিয়জনকে দেখ্‌তে না পেলেও তো কষ্ট নাই—ঘুমেও তো তাদের দেখ্‌তে পাও না। যারা অজ্ঞানী, তাদের মরণটা এমনি হয়—সুতরাং মরার পর তাদেরও কোন কষ্ট থাকে না। এই হল একটা জবাব। আর একটা জবাব হচ্ছে, "দেহ ছাড়্‌লে পরেও দেখা-শুনার শক্তি লোপ পায় না, তা হলে তুমি স্বপ্ন দেখ কি করে ? তখন তো দেহ থাকে না, অথচ প্রবাসী প্রিয়জনকেও দেখ্‌তে পাও। কাজেই ধ্যানধারণাদ্বারা ভিতরটাকে একটু জাগিয়ে যদি দেহ ত্যাগ কর, তা হলে তাদের দেখ্‌তেও আট্‌কাবে না। কাজেই মরণের ভয় কিসের ? ভয়ের আর একটা কারণ হচ্ছে—"মর্‌লে পর পাপের শাস্তি—নরক-যন্ত্রণা যে আছে !" পাপের শাস্তি হচ্ছে কর্ম্মফল—বেঁচে থাকতে সে পাপের শাস্তি হচ্ছে না ? কোথাও পালিয়ে কর্ম্মফল এড়াতে পার্‌ছ ? মর্‌লে পর ফলটা যে বেশী মাত্রায় ফল্‌বে, তা তো নয়। বরং বেঁচে থাকতে শাস্তিটা হয় দেহে-মনে ; মর্‌লে পর সেটা হবে শুধু মনোময় দেহে। মরণকে ভয় কর্‌বার আর একটা কারণ হচ্ছে—মরণ যন্ত্রণা—"মর্‌বার সময় মানুষ কি কষ্ট পেয়েই মরে।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, এ কষ্টটা তো দেহের—তাও আবার সেটা "মাত্রাস্পর্শ"—অনিত্য (১৪)। যতক্ষণ বেঁচে আছ, ততক্ষণই কষ্ট, মরলে পরেও যে সে কষ্ট থাকে, তার তো প্রমাণ নাই, কেন না অতি কষ্টের পর মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, অচেতন হয়ে যায়, তেমনি না হয় মরেই গেল, সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও ফুরিয়ে গেল। তারপর ভয়ানক যাতনা পেয়েও তো মানুষ আবার বেঁচে উঠে। তা হলে যাতনা ভোগটা তো হয় জীবনের এপারে —ওপারে তো নয়। তবে "মরণ-যন্ত্রণা" বলে একটা মিথ্যা বিভীষিকা কেন ?

কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, জ্ঞানীর তো দূরের কথা, সাধারণ লোকেরও মরণকে ভয় করা উচিত নয়। সাধারণ লোকের পক্ষেও মরণটা দুঃখের হতে পারে না। জ্ঞানীর কাছে মরণ তো দুঃখের হতেই পারে না বরং তিনি এই মরণকে জয় করে এর থেকে আরো আনন্দ নিঙড়ে বার করেন। জ্ঞানীর কাছে মরণটা আর ঘুমটা এক রকম। **তিনি যদি নিদ্রা জয় করতে পারেন, তাহলে মরণও জয় করতে পারেন।** সাধারণ লোক প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী ঘুমিয়ে পড়্‌ছে, আবার জাগ্‌ছে; আবার ঘুমুচ্ছে—তাতে তাদের কোনও দুঃখই নাই। কিন্তু জ্ঞানী দেখ্‌ছেন, ঘুমে খানিক সময়ের জন্য তাঁর ইষ্ট-চিন্তা বাদ পড়ে গেল, তিনি শিবস্বরূপ হতে বিচ্যুত হলেন। এখানে প্রকৃতিই জয়ী হল। তিনি তো তা চান্ না। তিনি স্বাধীন হতে চান—প্রকৃতির দাসত্ব করতে চান্ না। অতএব ঘুমেও তিনি জেগে থাক্‌তে চান। ঘুমে দেহটা ঢলে পড়্‌ল, আত্মা ঢলে পড়্‌বে কেন ? জাগ্রতে আত্মার দীপ্ত আনন্দ—ঘুমে স্তিমিত আনন্দ। এই তো প্রকৃতির কাছে পরাজয়! না, ঘুমেও আনন্দকে দীপ্ত রাখতে চাই।

তাই জ্ঞানীর ঘুমের সঙ্গে লড়াই। আর এইজন্যই মৃত্যুর সঙ্গেও লড়াই। নিদ্রা-জাগরণের মত জন্ম-মরণের মাঝে কেবল ঘুরপাক খাওয়াবে প্রকৃতি? আবার আমার ইষ্ট চিন্তায় ব্যাঘাত?—তা হবে না। অতএব মরণেও অমর হতে হবে। দেহ মরুক, আমার আত্মা মরবে না। মৃত্যুতেও আত্মজ্ঞান জাগিয়ে রাখ্‌ব। সমাধিদ্বারা তা সম্ভব। অতএব সমাধিস্থ পুরুষ মৃত্যুঞ্জয়ী।

এখন ধর, দুজনার মাঝে খুব ভালবাসা আছে। তারা যদি ঘুমের দাস হয়, তাহলে মৃত্যুরও দাস হবে। তাহলেই সব সময় পরস্পরকে পাবে না। আর পাওয়ার ইচ্ছা যদি একান্ত তীব্র হয়, অর্থাৎ তারা যদি পরস্পরকে ভগবান-জ্ঞানে ভালবাসে, তাহলে মৃত্যুও নিদ্রাতে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল—এই তো হল জ্বালা। কিন্তু তারা দু'জনাতেই যদি সাধনাদ্বারা মনঃসংযম ক'রে, ধ্যান ক'রে সমাধি আয়ত্ত কর্‌তে পারে, তা হলে তারা আত্মস্বরূপে—সচ্চিদানন্দ স্বরূপে চিরকাল মিলিত হয়ে থাক্‌বে—মৃত্যু তাদের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। সোজা কথায় তারা উমা-মহেশ্বর হয়ে যাবে। আহা, অবোধ সংসারীরা এমনি করে চির মিলনের পথ না খুঁজে শুধু দেহের তৃপ্তি নিয়ে প্রকৃতির দাস-দাসী হয়ে কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছে, দেখ দেখি! তপস্যার পথে, বীর্য্যের পথে, সচ্চিদানন্দের পথে কত আনন্দ, তা তারা বোঝে না। সংসারের তপ্ত খোলায় খইয়ের মত লাফালাফি কর্‌ছে—আর ভাব্‌ছে, "আমি একটা কি!" করুণা হয় না গো তাদের এই দম্ভ দেখে? দেখ, দেহ আর আত্মার তফাৎ বোঝাতে আর একটা কথা বলি। লক্ষ্য করো, আমাদের স্থূল দেহ-টা জমাট—আর মনটা ছাড়া ছাড়া। দেহের উপাদানগুলি জলে, বাতাসে, চালে, ডালে ছড়িয়ে ছিল—সে গুলোকে একত্র করে যেই উদরস্থ কর্‌লাম, অমনি তারা জমাট বেঁধে আমার দেহটা গড়ে তুল্‌ল। দেহটা যতই জমাট, মনটা ততই আল্‌গা-আল্‌গা। এই ব্যবস্থাটা উলটিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই দেহটা শিথিল হয়ে আল্‌গা হয়ে যাবে—আর বোধটা ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়্‌বে; **আর মনটা জমাট বেঁধে যাবে। জমাট মনই আত্মা।** মন যতই জম্‌বে, ততই স্বভাবতঃ দেহ বোধটা ছড়িয়ে পড়্‌বে—এ একেবারে আইন। ধ্যানে তাই হবে বুঝেছ? কেন্দ্রে আমি সচ্চিদানন্দরূপী, **ভাবটা যেন জমাট বেঁধে একটা রূপ হয়ে গেছে**—আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা মনে হবে আমার দেহ। জ্ঞানীর মরণটা এমনি। সমাধিদ্বারা যাঁরা অমনি মনটা জমিয়ে ফেল্‌তে পার্‌বেন, তাঁরাই মৃত্যুর পর ভাগবত দেহে চিন্ময়-চিন্ময়ী হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়্‌বেন। বুঝ্‌তে পেরেছ? এমনি করে দেহ ও আত্মার বিবেকজ্ঞানদ্বারা সমাধির পথ প্রস্তুত কর্‌তে হবে—মৃত্যু জয় কর্‌তে হবে। "আমি দেহ নই—সচ্চিদানন্দ রূপিণী আত্ম স্বরূপা আমি!" —শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্যের সহিত এই ভাবনা ভাব দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এমনি ভাবে দেহ আর আত্মাকে পৃথক জেনে মরণের মোহ হতে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ কর্‌তে বল্‌ছেন। বাস্তবিক মৃত্যু যদি বিভীষিকার কোনও কারণ না হয়, তাহলে প্রয়োজন বোধে যদি যুদ্ধে শত্রু বধ করা যায়, তাহলে দোষ কি? শ্রীকৃষ্ণ বৈজ্ঞানিকের মত মৃত্যুরহস্য বিচার করে এই কথা বল্‌ছেন—কঠোর জ্ঞানের কথা, অথচ অতি খাঁটী কথা।

তাহলে বল, আমি মানুষ মার্‌ব—তাতে আমার পাপ হবে না? শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, "কাউকে মেরে ফেল্‌লে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়, কেন না মরণটা

ভয়ানক—এই বুদ্ধিতে জীব হত্যা যদি পাপ বল, তাহলে সেটা ভুল। কেন না, মরণে বাস্তবিক কষ্ট নাই। জ্ঞানীর তো নাই-ই—অজ্ঞানীরও নাই। পাপ হচ্ছে তোমার মনে। তুমি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে, কি হিংসায় বশীভূত হয়ে মার্‌লে—তাতেই পাপ হল। **তোমার চিত্তের মলিনতাতে পাপ!** কিন্তু তোমার চিত্তে যদি এতটুকু বিক্ষোভ না থাকে, **একেবারে নির্ব্বিকার হয়ে** কর্ত্তব্য বোধে ধর্ম্ম-যুদ্ধে যদি তুমি শত্রু বধ কর, পাপ হবে না।" (৩৮)

আর একটা কথা। যেমন অপরকে নির্ব্বিকার হয়ে মার্‌ব, তেমনি নিজেও নির্ব্বিকার হয়ে মর্‌ব, এই ভূমিতে মনটা প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই। নইলে দেহ আর আত্মার বিবেকজ্ঞান পরকে মার্‌বার বেলায়, নিজের গায়ে একটা ছুঁচ্ ফুটলেও অস্থির হয়ে পড়া—এমনি ফাঁকিবাজী করলে চল্‌বে না। বড় কঠিন পথ—অপরকে আর নিজকে এক করে ফেল্‌তে হবে। "সর্ব্ব ভূতে আমি" এই জ্ঞান থাকা চাই। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে তবে যুদ্ধে লিপ্ত করেছিলেন। কাজেই দেখ, এ কত বড় কথা!

তার পর যুদ্ধের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় যুক্তি—সেটা হচ্ছে, অর্জ্জুনের personal status নিয়ে। এর মাঝে বিশেষ কিছু বুঝ্‌বার নাই। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, "দেহ আর আত্মার বিবেকজ্ঞান যদি বা না-ই বোঝ, এইটুকু তো বোঝ, লড়াই কর্‌তে এসে ফিরে যাওয়া তোমার মত মানীর পক্ষে কত বড় অপমান! অতএব তোমার স্বধর্ম্মের দিকে তাকিয়েও তো পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলে এই প্রস্তাব শেষ কর্‌বার মুখে ভগবান্ বললেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব। নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥— ৩৮

যুদ্ধ কর্‌তে হবে—নির্ব্বিকার হয়ে কর। যুদ্ধে জিৎবে—কি হার্‌বে, তোমার লাভ কি লোকসান হবে, এটা পরিণামে সুখের হবে না দুঃখের হবে—এ সব চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। আত্মস্থ থেকে fight করে যাও—because it is your duty to fight. তাহলে তোমার কোনও পাপ হবে না—কোন অন্যায় হবে না। মনের দ্বন্দ্বই হচ্ছে পাপ। যে পাপী সে কখন বীর হতে পারে না। মনে দোনামনা নিয়ে লড়াই করা চলে না। অথচ লড়াই কর্‌তেই হবে—because the whole life is struggle. তাই লড়াই যদি কর্‌তেই হয়—বীরের মত লেগে যাও। Don't hesitate, don't brood, don't tremble, strike boldly. That's like a man!

এরপর সুরু হবে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ।—

কর্ম্মযোগ

এইবার শ্রীকৃষ্ণ গীতার একটী মর্ম্ম-রহস্য উদ্ঘাটন কর্‌বেন। অর্জ্জুনকে তাই তিনি বল্‌ছেন, "দেখ, তোমায় আমি **সাংখ্য** অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের কথাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত বল্‌লাম, এখন **যোগ** বা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে তোমায় বল্‌ছি শোন! এই কর্ম্ম-যোগের মহাশক্তি; এর এক কণিকাতেও পুঞ্জীভূত ভয় দূর হয়ে যায়।" (৩৯-৪০)

এখানে শ্রীকৃষ্ণ দুটী কথা বল্‌ছেন—সাংখ্য আর যোগ। এই নামে দুটী দর্শন বা সত্য লাভের উপায় আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটী সেই দুটী দর্শনের বীজস্বরূপ বলা যেতে পারে। সোজাসুজি আমরা এই বুঝে নেব—"সাংখ্য" বলতে আত্মজ্ঞানকে বোঝায়; এটী আমরা

বিচার দ্বারা, "বিবেকজ্ঞান" দ্বারা লাভ করতে পারি। এর জন্য আমাদের এই স্থূল জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে হয় না, বরং জগৎ থেকে সরে গিয়ে ক্রমশঃ নিজের ভিতরে ঢুকে যেতে হয়। এটাকে বলতে পারি—analytical knowledge of the self. এর প্রথম স্তরই হচ্ছে—এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ যা বলে এলেন, অর্থাৎ **বিদেহ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া**—দেহ আর আত্মা তফাৎ বলে জানা—দেহের বিকারে বিচলিত না হওয়া—এমন কি মৃত্যুতে পর্য্যন্ত নির্বিকার থাকা।—এই হল **সাংখ্য।**

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জীবনের ideal সাংখ্যও হতে পারে, যোগও হতে পারে। যোগ কি?—সোজা-সুজি বুঝি, যোগ মানে সাধনা। সাধনা হচ্ছে activity. You must be active. You should never sit idle. You should discard nothing, reject nothing, but turn everything to a source of divine power. You are to fight your battles boldly and disinterestedly. That is Yoga. যোগ হচ্ছে জীবনের practicality. বলতে পারি, এটা synthetic knowledge of the self. এই যোগই হচ্ছে '**কর্ম্ম**'—যে কর্ম্মের কথা চিঠিতে লিখেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই সম্বন্ধে কতকগুলি অপূর্ব্ব সঙ্কেতের কথা বলেছেন, যা নাকি সাধক মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সে কথা বলবার আগে, 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে তখনকার যুগের যে ধারণা ছিল, সে সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়া দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অনেক প্রাচীন পন্থাকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই কর্ম্মযোগ তার মাঝে একটী। ভূমিকাতেই বলে এসেছি, প্রাচীনেরাও কর্ম্মযোগ যে সত্য লাভের উপায়, তা স্বীকার করতেন। তাঁদের মতে কর্ম্ম দুই রকম—বাহ্য কর্ম্ম আর আন্তর কর্ম্ম। দুটীতেই একটা উন্নত স্তরে মানুষকে নিয়ে যায়। বাহ্য কর্ম্মের সাধনা হচ্ছে বৈদিক যাগ যজ্ঞ। বিধিমত যজ্ঞ কর—স্বর্গ লাভ হবে। স্বর্গ কি?—অনন্ত সুখের আকর। সে সুখ এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের সুখ। এ জগতে পূর্ণ যৌবন সুখ, পূর্ণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, পূর্ণ মানসী সিদ্ধি মানুষ পায় না। যজ্ঞাদিদ্বারা দেবতার আরাধনা করে যদি সে দেবত্ব লাভ করতে পারে, তা হলেই সে ওই পূর্ণ সুখের অধিকারী হতে পারে। অতএব বাহ্য কর্ম্মের সাধনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান মানুষের পুরুষার্থ বা জীবনের ideal হওয়া উচিত। এই ছিল এক শ্রেণীর দার্শনিকের মত। শ্রীকৃষ্ণ এর নাম দিয়েছেন—"বেদবাদ।"

আবার আর একটী কর্ম্মপন্থ ছিল—আন্তর কর্ম্মের সাধনা বা আজ কাল আমরা "রাজযোগ" বলতে যা বুঝি। এর আটটী অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এ-ও দেহ-ইন্দ্রিয় ও মনকে নিয়ে কারবার। কিন্তু তাদের আপ্যায়িত করে বেদবাদীদের মত ভোগ-সুখ কামনা করা তার উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য তাদের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে focussed করে আত্মশক্তির উদ্বোধন—দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের সুখ নয়— তারও ওপারে আত্মার গভীরতম আনন্দের অনুভূতিই রাজযোগের লক্ষ্য। এ-ও কর্ম্মযোগের সাধনা।

কর্ম্মযোগের এই দুইটী আদর্শের মাঝে বেদ-বাদের আদর্শকে শ্রীকৃষ্ণ আচ্ছা করে চাবুক লাগিয়েছেন। রাজযোগের আদর্শ জীবনে অতি প্রয়োজনীয় বলে তিনি তাকে গ্রহণ করতে বলেছেন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগ ব্যাখ্যাও করেছেন। কিন্তু এইখানেই তিনি থামেন নি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "এর পরও কর্ম্মযোগ আছে। সমাধিতে

ডুবে যাওয়াই জীবনের শেষ নয়। হাঁ, দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের যে ভোগ-লোলুপতা, তার কবল হতে আত্মাকে নির্ম্মুক্ত করবার জন্য রাজযোগ প্রয়োজন; কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করে আবার জগতে এসে **সহজ মানুষ** হয়ে কর্ম্মও করতে হবে।” আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে, ভাগবত দেহ-মন নিয়ে, ঠিক ভগবানের মত যে কাজ করে যাওয়া, সেই হচ্ছে গীতার **কর্ম্মযোগ বা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ।** তিনিও মহাযোগীশ্বর, কিন্তু আবার মহাকর্ম্মী; তাঁর সমস্তটা জীবন তিনি পর-হিতে উৎসর্গ করেছেন। জগতে তিনি কর্ম্ম করেছেন—কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ বধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, যদুবংশ ধ্বংস প্রভৃতি তথাকথিত “নিষ্ঠুর” কাজও তিনি করেছেন— কিন্তু **নির্ব্বিকার হয়ে,** আত্মস্বার্থে নয়, **জগদ্ধিতার্থে।** প্রচলিত কর্ম্মের routineকে তিনি একেবারে উলটিয়ে দিলেন— যুদ্ধে নরহত্যা করব না বলে যে লোকটা সাত্ত্বিকতার দোহাই দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরে এনে তিনি যুদ্ধে লাগালেন, আবার বলছেন, “নৈবং পাপমবাপ্স্যসি”— এতে তোমার পাপ হবে না।” এ কি রহস্যময় কর্ম্ম-যোগ!— এই রহস্যের কথাই শ্রীকৃষ্ণ এখন বলছেন।—

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন বেদবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলছেন, “দেখ, আমাদের জ্ঞানকে সমাধির ভূমিতে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যারা বেদবাদ নিয়ে আছে, মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ করছে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য। কামনায় তারা অন্ধ, স্বর্গকেই তারা মানুষের চরম আকাঙ্খিত বলে জানে। কিন্তু কামনা থাকতে কখনো জন্মরোধ হয় না, সুতরাং সেই স্বর্গ থেকেও মানুষকে আবার ফিরে আসতে হয়। (৪২-৪৪) তাই বলি, বেদবাদ নিয়ে এত হৈ-চৈ করবার তোমার দরকার কি? বেদ তো তোমায় গুণাতীত হবার শিক্ষা দিচ্ছে না, অথচ তোমাকে গুণাতীত হতে হবে। (৪৬)

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্—

এই হওয়াই তোমার লক্ষ্য হোক্। তুমি হবে, **নির্দ্বন্দ্ব**—সুখ বা দুঃখ, অনুরাগ বা বিদ্বেষ, মান বা অপমান—কিছুতেই তোমায় টলাতে পারবে না, চিত্তে তোমার কোনও দ্বিধা থাকবে না। তুমি হবে **নিত্য সত্ত্বস্থ**— an eternal source of bliss, wisdom and power. যারা বেদ-বাদী, তারাও সত্ত্বগুণেরই উৎকর্ষ চায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামনা থাকায় তারা সত্ত্বগুণে টিকতে পারে না, রজোগুণ ও তমোগুণের ঝাপটায় আবার নীচে নেমে আসতে হয় তাদের। কিন্তু ভিতরে যদি তুমি কোনও কামনা না রাখ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মানাপমান সব নির্ব্বিকার হয়ে গ্রহণ করতে পার, জগতের কোন কিছুর প্রতিই যদি তোমার আসক্তি না থাকে, তা হলে তোমার ভিতর যে সাত্ত্বিকতার আবির্ভাব হবে, যে আনন্দ ও শক্তির প্রস্রবণ তোমার ভিতর থেকে উৎসারিত হবে, তার আর ক্ষয় নাই। অতএব দ্বন্দ্বাতীত হও— অবিচলিত হও— হয়ে নিত্য-সত্ত্ব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হও। **নির্যোগ-ক্ষেম** হও— যা তোমার নাই, তার জন্য ছটফট্ করো না, বা যা আছে তাকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করো না। বাহ্য সম্পদ্ সমুদ্রের ঢেউ, একবার আসছে, আবার যাচ্ছে; ছটফট করে তুমি কিছু পাবেও না, ব্যস্ত হয়ে কিছু আগলাতেও পারবে না। অতএব আত্মবান্ হও— আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাক— ধ্যানের গভীর শক্তিতে তলিয়ে গিয়ে নিজের স্বরূপ-মহিমা উপলব্ধি কর। (৪৫)

“এই হচ্ছে জীবনের আদর্শ। এই আদর্শে চলতে গেলে তোমার বুদ্ধিকে **ব্যবসায়াত্মিকা**

কর্‌তে হবে। **ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি** কাকে বলে জান?—জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি, আত্মতত্ত্বলাভের প্রতি প্রবল ঝোঁক। পথে কোথাও থামা নেই, বিশ্রাম নেই, এদিক-ওদিক তাকানো নেই,—সমস্ত বাধা-বিপত্তি প্রলোভন জয় করে সেই চরম লক্ষ্যে—সমাধিতে পৌঁছাবার জন্য যে তীব্র মনোবেগ তাই হচ্ছে "**ব্যবসায়**"। যাদের এই ব্যবসায় নেই, তাদেরই বুদ্ধি কেবল ডালপালা মেল্‌তে থাকে; তারা আজ এটা, কাল ওটা—এই করে বেড়ায়। আত্মজ্ঞান তাদের জন্য নয় জান্‌বে। (৪১)

"বেদবাদীদের কাছে তুমি অনেক কথাই শুন্‌তে পাবে। কিন্তু সে সব কথা শুনে তোমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হবে ছাড়া লাভ হবে না কিছুই। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। শ্রুতি নিয়ে—বেদ নিয়ে মাথা ঘুলাবার দরকার নেই,—সমাধিতে চিত্তটী ডুবিয়ে দাও—বুদ্ধি স্থির হোক্—তা হলেই যথার্থ কর্ম্মযোগ কি, তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। তখন মনে হবে, এইবার ঠিক জিনিস পেয়েছি—এত দিন আবোল-তাবোল কথা শুনেও কিছু হয় নি, আর শোনবারও কিছু নেই।" (৫২-৫৩)

এই পর্য্যন্ত হল বেদবাদের সমালোচনা। এর মাঝে শ্রীকৃষ্ণ এইটুকু বোঝাতে চেয়েছেন, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের দিকে নজর দিও না (আধুনিক ভাষায় রামকৃষ্ণদেব যাকে বল্‌তেন, কাম আর কাঞ্চন ত্যাগ কর)। নির্ব্বিকার প্রশান্ত আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হও। কামনা-বাসনা ছাড়—নিষ্কাম হও। কামনা চিত্তের স্পন্দিত অবস্থা—চিত্তকে নিস্পন্দ কর।

এইখানে একটা গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। সমস্ত বাসনাই কি আমরা রুদ্ধ করব? বাসনা যদি না থাকে, তা হলে কর্ম্মে প্রবৃত্তিই বা আস্‌বে কোথা থেকে? আর কর্ম্ম যদি না থাকে, তা হলে জগৎও থাকে না, আমিও থাকি না। তা হলে এ তো আত্মপ্রতিষ্ঠা হল না, এ হল আত্মহত্যা! অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তা চান্ না। তা হলে অর্জ্জুনের যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে চেতিয়ে তুল্‌বার জন্য তাঁর এত মাথা-ব্যথা হ'ত না।

কামনা ত্যাগের রহস্যটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে এই খানে, নইলে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মযোগ আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ব না। এটা চাই—ওটা চাই, এ মানুষের স্বাভাবিক। আকাঙ্ক্ষা যদি মানুষের মাঝে না থাক্‌ত, তা হলে মানুষ কখনো বড় হতে পার্‌ত না—সে জড় হয়ে যেত। ছোট ছেলেপিলে দেখ্‌বে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে কেবল, স্থির করে এক জায়গায় বসিয়ে দাও—কিছুক্ষণ পরেই তারা ঘুমিয়ে পড়্‌বে। সাধারণ মানুষেরও সমস্ত কামনা রুদ্ধ করে দাও—সেও জড়বৎ হয়ে পড়্‌বে। আমাদের দেশের লোকেরও তাই হয়েছে। এরা বড় শান্ত, বড় তৃপ্ত, কোনো কিছুতেই আকিঞ্চন নাই—তার ফলে দেখ, এমন জড়, হাজার হাজার বছর ধরে পরের গোলাম একটা জাতিও দুনিয়ায় খুঁজে পাবে না। নিষ্কাম হতে যাওয়ার এই বিপদও আছে।

আবার পাশ্চাত্য দেশের ভোগী জড়বাদীদের দেখ, জীবনটা যেন তাদের একটা whirl wind! কি উদ্দামতা, কি চঞ্চলতা!—অথচ শান্তি আছে কি?—সমস্ত ইউরোপ জুড়ে আজ হাহাকার উঠেছে New light-এর দরুণ। তাই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষী Romain Rolland আজ বাংলার নিরক্ষর রামকৃষ্ণদেবের পায়ে লুটিয়ে বল্‌ছেন—"যা খুঁজেছিলাম, তোমার কাছে পেয়েছি।"—নিষ্কাম না হতে যাওয়ার আবার এই ফ্যাসাদ!

শ্রীকৃষ্ণ এই দুটী extremeর মাঝে সমন্বয় নিয়ে এলেন। তিনি বল্‌ছেন, "তুমি কামনা রাখ্‌তে পার্‌বে না, অথচ তোমায় ঘোর কর্ম্মী হতে হবে।"

কি করে তা সম্ভব?—কামনা না থাকলে কর্ম্ম হবে কোথা থেকে?—এই paradoxএর উত্তর এই—কামনার মূল কোথায়, তা যদি আমরা বুঝ্তে পারতাম, **তা হলে কামনাকে আয়ত্তে রেখে** আমরা কর্ম্ম করে যেতে পারতাম—তা হলেই 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'র উদয় হ'ত। ধর, আমাদের মনে এটা সেটা কত কিছুই তো জাগ্ছে,—কেন জাগ্ছে, এ আমরা খুঁজে দেখি? কিম্বা নানা বিরোধী কামনার মাঝে কোনো সামঞ্জস্য করি? কি ভাবে কামনার সার্থকতা ঘট্লে আমাদের চির তৃপ্তি হত, তা চিন্তা করি?—কখনই না। শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় বল্তে গেলে আমাদের বুদ্ধির **ব্যবসায়** নাই—একটা চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের বোধ নাই। তাই আমরা কোনো কামনাকে তৃপ্ত করেই সুখ পাই না—নিত্য সত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি না, দ্বন্দ্বের হাত এড়াতে পারি না। আমাদের এই কামনাও নিশ্চয়ই কোনো একটা উচ্চতর ইচ্ছাশক্তির পরিণাম—অর্থাৎ আর কোনো মহত্তর সত্তার ইচ্ছাই আমাদের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠ্ছে নিশ্চয়ই। সেই ইচ্ছাটী যদি আমরা ধরতে পারি, তা হলেই আমাদের কামনার মাঝে একটা সামঞ্জস্য আসে। এটাকেই Carlyle বলেছেন to find one's work, one's life's mission. যদি বুঝ্তে পারি—আমি ভগবানের হাতে যন্ত্র মাত্র—তিনি আমাকে দিয়ে এই করাতে চান, আমার জীবনের যত কিছু কামনা-বাসনা—তার এই **একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র তৃপ্তি**—তা হলেই কিন্তু কামনার বিকার থেকে আমরা মুক্তি পাই।

অর্জ্জুনের জীবনে এইটী সুন্দর ফুটে উঠেছে। অর্জ্জুনের রাজ্যলিপ্সা বেশ ছিল, তাই যুদ্ধ করতে এসে ছিলেন। এই হল তাঁর এক কামনা। আবার যুদ্ধে স্বজন বধ করতে হবে, এই মোহে পিছিয়ে গিয়ে বৈষ্ণব হবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্লো, এই তাঁর এক কামনা। দুই কামনার দ্বন্দ্বে বেচারী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে বল্লেন, "দেখ, তুমি কেবল বাইরে বাইরে হাৎড়ে মরছ। তলিয়ে দেখ, ভগবান্ তোমাকে দিয়ে কি চান্। নিজে না বুঝ্তে পার, আমি তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তা হলে এই দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার পাবে। আজ যদি স্পষ্ট বুঝতে পার, যুদ্ধে তোমাকে দিয়ে নরহত্যা করানোই ভগবানের অভিপ্রায়, তুমি যন্ত্র মাত্র, তা হলে বাইরের দৃষ্টিতে যুদ্ধ যত বড় পাপই হোক্না কেন, তোমাকে সে পাপ স্পর্শ করবে না। অথচ তুমি **তাঁর ইচ্ছাতেই তোমার ইচ্ছা** জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে। যুদ্ধ না করলেও কখনো এই নিশ্চিন্ততা তোমার আস্বে না, যদি তুমি কামনার এই রহস্যটী না বোঝ।"

তা হলেই দেখ, কামনা ত্যাগ মানে সব কিছু ছেড়ে দেওয়া—এ গীতার উপদেশ নয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম,—এই তিনটী সাধনার পথ অনুযায়ী কামনা ত্যাগের তিন রকম অর্থ হতে পারে। তুমি যদি জ্ঞানী হও, তা হলে তোমার পক্ষে কামনা ত্যাগ অর্থ—সব কিছুতে নির্লিপ্ত থাকা। সমুদ্রের বুকে তরঙ্গ উঠছে—তবুও সমুদ্র নির্ব্বিকার। তেমনি, তুমিও দেখছ, তোমার বুকে কামনা জাগছে—কিন্তু তুমিও নির্ব্বিকার। (এই নির্ব্বিকারের পরখ আছে, সেটা পরে বল্ছি।) জ্ঞানী এমনি করে কামনা ত্যাগ করছেন; অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটা আমাদের ইচ্ছামূলক হলেও সে ইচ্ছার সঙ্গে যেমন আমরা জড়িত নই, জ্ঞানীও তেমনি তাঁর কোন কামনাতেই জড়িত নন।

তুমি যদি ভক্ত হও, তা হলে তোমার কামনা ত্যাগের অর্থ এই হবে যে, তুমি অনুভব করবে,

এ ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা নয়, তাঁরই ইচ্ছা—তুমি যন্ত্র মাত্র। হাতটী নাড়ছ, তা-ও তোমার ইচ্ছাতে নয় তাঁরই ইচ্ছাতে। এমনি করে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকটী কর্ম্মে নিজকে তাঁর হাতের যন্ত্রের মত পরিচালিত করা, নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, ভগবান্‌দ্বারা **আবিষ্টের মত** হয়ে কর্ম্ম করা, এই হচ্ছে ভক্তের কামনা-ত্যাগ। এখানেও ভক্ত নির্ব্বিকার।

তুমি যদি কর্ম্মী হও, তা হলে তোমার কামনা-ত্যাগের অর্থ এই হবে, বিধির নির্ব্বন্ধ বশতঃ তোমার সামনে এসে এই কাজগুলি উপস্থিত হয়েছে কি তোমার মনে এই ইচ্ছার উদয় হয়েছে। বেশ, কাজ করে যাও—**কিন্তু তার ফলটা কি হল, তার জন্য একটুও ব্যস্ত হয়ো না।** যা হবার তা হোক্‌গে—তুমি নির্ব্বিকার থাক। তোমার শুধু এইটুকু কর্ত্তব্য ছিল, করে তুমি খালাস। এরই কথা শ্রীকৃষ্ণ এখন বল্‌ছেন। পরে এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব।

জ্ঞানী আর ভক্তের কামনাত্যাগের বেলায় বলেছিলাম যে তাঁরা নির্ব্বিকার;—হৃদয়ে কামনা জাগছে, কিন্তু তাতে তাঁদের কোনো বিকার হচ্ছে না। কি করে এটা বুঝব? ধর, একজন জ্ঞান বা ভক্তির ভাণ করে বল্‌ছে, "আমার ভিতর অমুক কুকর্ম্মের বাসনা হয়েছিল, তাই নির্ব্বিকার হয়ে করে গেছি—আমার সঙ্গে এই কামনার কোনো যোগ নেই, কিম্বা এ তাঁরই ইচ্ছা।"—তা হলে কি জবাব হবে? —জ্ঞানী বা ভক্তের কামনাত্যাগের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে, **তাঁদের শক্তি থাকা চাই, আর ফলাকাঙ্ক্ষা একদম থাকবে না।** ধর একজন জ্ঞানীর রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। তিনি সে ইচ্ছা চরিতার্থ করলেন কি না করলেন সে দিয়ে তাঁর কাজের বিচার করব না। দেখব, তাঁর কাছে এই ইচ্ছা আর অনিচ্ছা দুই-ই তুল্যমূল্য কি না অর্থাৎ যেমন ইচ্ছা হয়েছে, তেমনি সেই ইচ্ছাকেও তিনি রোধ করে তৃপ্ত থাক্‌তে পারেন কি না। এ শক্তি যদি তাঁর না থাকে, রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছাকে যদি তিনি আত্মবশে না রাখতে পারেন, রসগোল্লা না পেয়ে তাঁর মনে যদি এতটুকুও ক্ষোভ হয়, কিম্বা রসগোল্লা খেয়ে যেন বড় কৃতার্থ হলেন এমনি ভাব হয়, তা হলে তিনি কামনাত্যাগী এ কথা বল্‌তে পারব না। "আমি কামনার দ্রষ্টা মাত্র" কিম্বা "আমার এ কামনা ভগবানেরই কামনা" এ কথা বল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে কামনারোধের শক্তিও থাকা চাই—নইলে ও শুধু ফাঁকিবাজী!

আর শেষ কথা এই—দেখবে, জ্ঞানী বা ভক্তের কামনায় কখনো জগতের অমঙ্গল হয় না। রাম-কৃষ্ণদেবের কথায় বল্‌তে গেলে, "তাঁদের কখনো বেতালে পা পড়ে না।" তাঁদের সমস্ত কামনা, সমস্ত কর্ম্মের মূলে এমন সুন্দর একটী সামঞ্জস্য রয়েছে, এমন একটী চমৎকার অর্থ রয়েছে যাতে তাঁদের সমস্তটা জীবনই একটী কবিতার মত ছন্দোবদ্ধ হয়ে ফুটে ওঠে। "আমি দ্রষ্টামাত্র বা যন্ত্র মাত্র"—এ বলে তাঁরা কখনো কারু অনিষ্ট করতে পারেন না, **বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা** তাঁদের ছুঁয়ে যায় না। তাঁদের কামনার ফল সর্ব্বদাই সৎ হবে, কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে তাঁরা কেবল আত্ম-হিতকর (খুব উঁচু অর্থে) অথবা লোকহিতকর কাজই করেন। সাধারণ লোক ভাল কাজও করে, মন্দ কাজও করে; মন্দ কাজই বেশী করে, ভাল কাজ করতে তাদের বেগ পেতে হয়—এই হচ্ছে তাদের কামনার ফল। আর এঁরা শুধু ভাল কাজই করেন, ভাল কাজ করাটা এঁদের পক্ষে স্বাভাবিক

হয়ে দাঁড়ায়।—তাঁদের কামনাতে জগতের মঙ্গল হয়, এই তাঁদের কামনার ফল।

আর এক রকম কামনা আছে, যা ত্যাগ কর্‌তে পারা যায় না—যে কামনাকে পোষণ করাই পুরুষার্থ। গীতাতে ভগবান্ তার ইঙ্গিত মাত্র করেছেন, কিন্তু ভাগবতে তা ফুটে উঠেছে। সে কামনা হচ্ছে, **প্রেমের কামনা।** যোগবাশিষ্ঠ তাকে বলেন "সতী বাসনা"। ভগবানের প্রতি অনুরাগ বশতঃ যে কামনার উদয় হয়—"তাঁকে চাই, নইলে বাঁচব না"—এই যে তীব্র আকুলতা বা সংবেগ—এ কামনা আমাদের মাথার মণি। জ্ঞানী এই কামনাকে বলেন "মুমুক্ষুত্ব", ভক্ত একেই বলেন "ভক্তি" বা "পরানুরক্তি", কর্ম্মী একেই বলেন "সেবাভিলায", যোগী একে বলেন "সংবেগ", প্রেমিক একে বলেন "পীরিতি"। এটী জীবের সহজ স্বভাব, ভগবানের আনন্দশক্তির ব্যঞ্জনা। এই 'পীরিতি'র কামনা যেখানে জেগে ওঠে—সেখানে মানুষ ভগবান হয়ে যায়, ভগবান্ মানুষ হয়ে যান্। যাকে ভালবাসি, তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তন্ময় হয়ে যাই—নিজের দেহবোধ, ইন্দ্রিয়বোধ, অহংজ্ঞান কিছুই থাকে না—'আমি' 'তুমি' হয়ে যায়—একটী সাধারণ মানুষের মাঝেও (সাধারণ বল্‌তে এই বুঝি, যে শাস্ত্র জানে না, ভগবান টগবান্ কথায় বোঝে না) যদি এই জিনিষটী ফুটে ওঠে—তা হলে তার যে কামনা, সে ভগবানের মাথার মণি। পতঞ্জলির মতে এই তো সমাধি! ভগবান্ সেখানে সহজ হয়ে ফুটে উঠেন। এই যে পরমা কামনা বা 'রতি' বা সহজ 'পীরিতি'—এইখানে পৌছাবার জন্য ১৮ অধ্যায় গীতা আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

কানু! এই পীরিতি আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোল। আমরা আত্মহারা হয়ে যাই—ভালবাসায় গলে গিয়ে বলি—"ওগো, এ দেহ-মন-প্রাণ সব তুমিময়।" ভোলানাথ! এই পীরিতিতেই না তুমি জগৎ ভুলে আছ? রাই! এই পীরিতিতেই না তুমি উন্মাদিনী?—দাও এক কণিকা এই পীরিতির—এই দিব্য কামনার—বিবশ হয়ে যাই, বিভোর হয়ে যাই, পাগল হয়ে যাই।

(ক্রমশঃ)

——×——

মাহেন্দ্রক্ষণে

ব্যাপ্তিবোধ ঠিক ঠিক হ'লে ঔদাসীন্য থাকতে পারে না। আত্মা যত উজ্জ্বল হবে, ঔদাসীন্য ততই কম্‌বে। আত্মজ্ঞানীর বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য নাই। বরঞ্চ তাঁদের কর্ম্মেরই ইয়ত্তা নাই। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ। কোন প্রয়োজন নাই, অথচ তিনি অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করে যাচ্ছেন। মানুষ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে—কর্ম্মও তাকে জ্ঞানের পথেই সাহায্য করে।

* *

ভালবাসা মানে আনন্দময় পবিত্র অনুভূতি—জ্ঞান। জ্ঞানই ভালবাসা! আসক্তিতে চিত্ত পঙ্কিল হয়ে ওঠে, তাই আসক্তিকে ভালবাসা বলা যায় না। প্রকৃত ভালবাসায় দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। মানুষ নিজকে জানে না বলেই অপরকে ভালবাসে। নিজের স্বরূপ জান্‌তে পার্‌লে তখন আর ভালবাসার দরুণ অন্যত্র যেতে হয় না। আত্মস্বরূপের চেয়ে সুন্দর আর কেউই হতে পারে না।

ভাবের দিকে যা অখণ্ড, বস্তুর দিক দিয়ে তা খণ্ড —একটা সত্ত্ব, একটা তমঃ। ভাবের দিকে গেলে ভেদ থাকে না, বস্তুর দিকে নেমে এলেই ভেদের সৃষ্টি হয়। অথচ তত্ত্বকে বুঝতে হলে এই জন্যই সমাধির প্রয়োজন। আমরা যা দেখ্ছি, যা করছি সবই খণ্ডিত। এত ভেদের সৃষ্টি হচ্ছে কেন?—না আমরা মূল ঐক্যকে হারিয়ে বসেছি। ভাবের মাঝে অনৈক্য বলেই আমাদের আজ এই দুর্গতি। বাইরের ভেদ ভেদই নয়—আসল ভেদ অন্তরে। সুতরাং অন্তরকে বিশুদ্ধ করে তোলাই হল আসল কাজ।

* *

মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ Great principle, অর্থাৎ যাকে বলা যায় message—জীবনের নিয়তি—এ এক এক জনের এক এক রূপ। শ্রীচৈতন্যের জীবনের নিয়তি বা মহত্তত্ত্ব ছিল প্রেম; বিবেকানন্দজীর মহত্তত্ত্ব ছিল ঘুমন্ত জাতিকে আধ্যাত্মিক প্রেরণায়, কর্ম্মে, জাগ্রত উদ্বুদ্ধ করে তোলা। সবই এক বটে, কিন্তু প্রত্যেকের মাঝে বৈশিষ্ট্যের বীজ রয়েছে—এরই নাম নিয়তি। ব্যক্তিত্ব বলে কোন জিনিষ নাই, বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রারব্ধ বা নিয়তিকে কেউই খণ্ডাতে পারে না। এইজন্যই জীবন্মুক্ত হয়েও প্রারব্ধ ভোগ কর্তে হয়। অবশ্য এই ভোগে কোন কিছু আসে যায় না, নূতন করে কর্ম্মও সঞ্চয় হয় না।

* *

প্রকৃতি অব্যক্তা, কাজেই তাঁকে জান্তে হলে বুদ্ধির সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন চাই। অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতিকে জানা অসম্ভব! তবে কৃপা করে যদি প্রকৃতি বুদ্ধিকে সেই আলোক প্রদান করেন, তা হলে বুদ্ধি দিয়েও জানা সম্ভব। প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই সমাধিগম্য। স্থূল বুদ্ধির দ্বারা কারও সীমা-সংখ্যা পাওয়া যায় না।

* *

আমার মহত্তত্ত্ব—আমার নিয়তি—আমি জীবনে যা কর্‌ব, তার মূল; অর্থাৎ আমার যে স্বভাবকে ছেড়ে আমার জীবন চলে না, তাই আমার মহত্তত্ত্ব। সাধু হোক্, অসাধু হোক্—প্রত্যেকের এমনিতর একটা নিয়তি থাকে। এই নিয়তিকে কেউই লঙ্ঘন করে চল্‌তে পারে না। সাধনা করে যদি আমার জীবনের মহত্তত্ত্বকে জান্‌তে পারি, তা হলে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করে যেতে পারি। আমাকে কি কর্‌তে হবে, তা জানি না বলেই অনেক বাজে কাজ করে মরি। জীবনের অমোঘ সঙ্কেত জান্‌তে পার্‌লে তখন আর পণ্ডশ্রম কর্‌তে হয় না। কদাচিৎ কেউ জীবনের নিয়তিকে জানেন—তাঁরাই মহাপুরুষ। আর এইজন্যই অল্প সময়ের মাঝে তাঁরা এত মহান্ কাজ করে যেতে সক্ষম হন।

* *

ত্যাগ হচ্ছে ভোগ কর্‌বারই একটা সূক্ষ্মতম কৌশল। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে ইহাই বলা হয়েছে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। ভোগও অনেক রকমের। শুধু তামসিক ভোগই কি ভোগ—আর সাত্ত্বিক রাজসিক ভোগ কি ভোগ নয়? ত্যাগের কথা বল্‌লেই মানুষ শিউরে উঠে।—ভাবে, তা হলে তো সবই গেল—জীবনটাই ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু ত্যাগের দ্বারা যে অখণ্ড ভোগ লাভ করা যায়—এ কথা কেউই তলিয়ে বুঝ্‌তে চায় না। অর্থাৎ স্থূল ছেড়ে তারা এক চুলও এদিক-ওদিক যাবে না। ইহা কি মনুষ্যত্বের লক্ষণ—না অন্য কিছুর?

* *

সংস্কার ত্রিধা—বেগ, স্থিতিস্থাপকত্ব, ভাবনা। এই ভাবনাতেই অধ্যাত্ম জগতের মূল সূত্র রয়েছে। শাব্দী ভাবনা—এমন hypnotic power যে "তত্ত্বমসি" বল্‌তেই যোগ্য পাত্রে শক্তি-সঞ্চার হয়ে

যায়। এ-ও সংস্কার—কিন্তু সংস্কারনাশক সংস্কার। শঙ্করাচার্য্য এই মত যথেষ্ট সূচিত করেছেন—তাঁর ভাষ্যে, কর্ম্মে। শ্রীমৎ রামতীর্থের জীবনেও এর প্রমাণ পাই। আর নিজেদের জীবনেও কি পাওয়া যায় না?—ঠাকুরের এমন এক একটী কথা হঠাৎ প্রাণে আমরণ কালের মত লেগে যায়, ৭ বচ্ছর মুখস্থ কর্‌লেও যা লাগ্‌ত না।

* *

"জ্ঞান কোন মানসিক ক্রিয়াই নয়"—ক্রিয়াজন্য হওয়া তো দূরের কথা। শিষ্য যদি তৈরী হয়, গুরুর মুখের একটী কথাতে নিখিলের জ্ঞান তার অন্তরে জেগে উঠ্‌তে পারে। যার কথা তোমার মর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করে যায়, সে-ই তোমার আচার্য্য। এর মাঝে কোন যুক্তি-তর্ক নাই।

* *

শিবহীন শক্তি থাকলে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হবে। আবার শক্তিহীন শিব কুঁড়ের বাদশা। কাজেই শিব-শক্তির মিলনেই পূর্ণ-আদর্শের প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য জাতি শক্তিকেই স্বীকার করে নিয়েছে—শিবকে নয়। এইজন্যই প্রলয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আর প্রাচ্য আজকাল একমাত্র শিবকেই অবলম্বন করেছে—এই জন্যই তার শৌর্য্য-বীর্য্য নাই। পরস্পরকে পরস্পরের কাছে অবনত হতে হবে—এ একেবারে অবধারিত কথা। কেন না দৈন্য বা অপূর্ণতা উভয়ের মাঝেই রয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত কারও আত্মম্ভরিতা টিক্‌বে না।

* *

একটা বৃত্তির সঙ্গে অনেকগুলি বৃত্তি জাগে। তার মাঝে বেছে একটাকে বাড়িয়ে দাও, বাকীগুলি আপনি দমে যাবে। যদি একটু-আধটু থাকে—ন বিকম্পিতুমর্হসি। মোটকথা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকা চাই। ইচ্ছানুযায়ী মনের গতিকে ফিরিয়ে দেবার শক্তি জন্মে গেলেই আর পতনের আশঙ্কা নাই। জেনে-শুনে মানুষ আত্মহত্যা করে না। অন্যায় বুঝার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনকে তা থেকে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত করে ফেলা যায়, তা হলেই আর কোন দোষ স্পর্শ কর্‌তে পারে না।

* *

ভগবানও মায়াতীত, ভক্তিও মায়াতীত। অথচ ভক্তি এমন জিনিষ, যাতে ভগবান বাঁধা। কাজেই ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়। সুতরাং ভক্তি বা অমায়িক প্রীতিটী এমন একটী অনির্ব্বচনীয় চিজ্, যা ভগবান্ দ্বারা প্রযুক্ত হয়েও ভগবানকেই বাঁধে। এই হচ্ছে ভক্তির মায়া।

* *

সেবার স্বাধীনতা প্রকৃতি-অংশে, ত্যাগের স্বাধীনতা পুরুষ-অংশে—সুতরাং উভয়ই স্বাধীন। একজন সেবার ভিতর দিয়ে পায় মুক্তির আস্বাদন, আর একজন ত্যাগের ভিতর দিয়ে পায় মুক্তির আস্বাদন। যার যার স্বভাবের ভিতর দিয়ে উভয়ই মুক্ত। সুতরাং কে ছোট, কে বড় এই প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না।

* *

জ্ঞান সকলেরই হয়—কিন্তু নিঃসংশয় করা গুরুর কাজ। শাস্ত্রদ্বারা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা মনের সংশয় দূরীভূত হয় না। এইজন্যই নিঃসংশয় হয়েছেন এমন কারও কথা এসে প্রাণে স্পর্শ করা চাই—তা না হলে মনের খট্‌কা থেকে যায়ই।

সমর্পণ

ওগো সুন্দর তুমি কে গো—
আজি এ স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে
আমার হৃদয়ে জাগো।
কে গো তুমি মম অন্তরতম
নাশিয়া প্রভায় অন্তর-তমঃ
ভিখারীর মত দুয়ারে দাঁড়ায়ে
কিসের ভিক্ষা মাগো॥

সুন্দর তুমি অতি—
নন্দিত তুমি বন্দিত তুমি
জন-গণ-অধিপতি।
আসিয়াছ তবু ভিখারীর বেশে
ভিক্ষা লইতে এ দীন আবাসে
কেমনে তোমারে তুষিব বল না
কি দিয়ে জানাব নতি॥

অদেয় নাহিত কিছু—
যাহা চাহ আজি সকলি সঁপিব
মাথাটী করিয়া নীচু।
লহ ধন জন লহ এই গেহ,
তোমারই সকলই মোর নহে কেহ;
প্রদানি তোমারে যাহা থাকে তাহা
ভুঞ্জিব আমি পিছু॥

আসনি ত তুমি কভু—
সমর্পিয়া তাই দিয়াছি সকলি
তুষ্ট না হলে তবু?
দিয়েছি পূর্ব্বে বাহিরের ধন,
দিনু এবে পুনঃ দেহ-প্রাণ মন,
দখিন বয়ানে যাহ গো ফিরিয়া
হে মোর জীবন প্রভু!

তবু নাহি গেলে হরি—
তবুও এখনও পাবার আশায়
রয়েছ দুয়ার ধরি!
নাই নাই আর মোর কিছু নাই,
রিক্ত শূন্য আমি— আমি যে একাই,
আমার যা ছিল দিয়েছিত সবি
তোমার ঝুলিতে ভরি।

আছে কি এখনও বাকী—
যা দিয়েছি সব মিথ্যা প্রদান
সকলি তবে কি ফাঁকি?
দিয়েছিত বটে তোমারে সকলি
আমার আমিরে দেই নাই বলি
ভিখারীর বেশে এখনও দাঁড়ায়ে—
রহিয়াছ তুমি তাই কি?

ধর তবে বঁধু ধর—
আমার আমিরে মেলিয়া ধরিনু
হর তুমি তারে হর।
নাহি আর আমি নাহি মোর কেহ
নাহি মন প্রাণ নাহি মোর দেহ—
আমার আমিকে সঁপিনু আজিকে
তোমার চরণ'পর॥

থাক থাক শুধু তুমি—
লীন হোক্ আজি অহমিকা-মায়া
তোমার চরণ চুমি।
তোমার এ দেহ তোমার এ মন,
তোমার এ আমি তোমারি আপন,
তোমার তুমিতে ভরিয়া তুল এ
অহং-শূন্য ভূমি॥

বিচিত্র-প্রসঙ্গ

স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষের কাছে নারীর মোহিনী মায়া কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, বরঞ্চ রূপ-যৌবনে গর্ব্বিতা নারী প্রতিহত হইয়া বিফল মনোরথ লইয়া ফিরিয়া আসে। পার্ব্বতী প্রথমে নিজের রূপ-যৌবন লইয়া গিয়াছিলেন মহাদেবকে ভুলাইতে, কিন্তু স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এই নিদারুণ উপেক্ষায় পার্ব্বতী মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মনে-প্রাণে বুঝিলেন, যাহাকে পাইতে তিনি গিয়াছিলেন, তাহাকে পাওয়ার পথ এত সহজ নয়। বাহিরের রূপে মুগ্ধ নন বলিয়াই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান-তন্ময়তায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। পার্ব্বতী রূপ-যৌবনের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ভাবিয়াছিলেন, আমার এই রূপ বুঝি স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষের মনকেও চঞ্চল করিয়া তুলিবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পার্ব্বতীর সেই ভুল ধারণা সহজেই চূর্ণ হইয়া গেল। একটু ভূমিকা করিয়া রাখিলাম। এখন তোর প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

দেখ্ পরেশ—আমি বলি নারী-পুরুষ কেহই স্ব-প্রতিষ্ঠ নয় বলিয়াই আজ আমাদের দেশের এই দুর্গতি। ভালবাসাকে পবিত্র রাখিতে হইলে যে মনের কত অবাঞ্ছনীয় কামনা-বাসনাকে নিষ্পেষিত করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আজকাল দেখা যায়, অনেক সাহিত্যিক নারীর সকল কামনা-বাসনা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহার সমবেদনা লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। তাহাদের মতে বাসনা-কামনার ইন্ধন যোগানই হইল—সমাজের, দেশের হিতের কল্যাণের একমাত্র পন্থা।

এই সব ভাব আমাদের নিজস্ব ভাব নয়। এই জন্যই প্রথম প্রথম সাহিত্যিকদের নূতন লেখা পড়িয়া খুবই মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে সাহিত্যিকদের মাঝেও কত বড় গলদ রহিয়াছে। তাহারা সাহিত্যের নাম করিয়া নিজেদের বিকৃত রুচিকেই প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। ইহাতে দেশের দশের হিত হইবে কি না, সেই সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তাই জাগে না। অতৃপ্ত-বাসনাকে সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করিবার অভিপ্রায়েই যেন তাহাদের সাহিত্য-সৃষ্টি। এইজন্যই আজকালকার সাহিত্য পড়িয়া অনেকেরই চিত্ত-বিকৃতি ঘটে। লোভে পড়িয়া, বিনা সাধনায় তাহারা চায় উপভোগ করিতে। এইজন্যই দেখি, সাহিত্যদ্বারা দেশের শ্রী, সম্পদ, স্বাস্থ্য কোন কিছুই ফিরিয়া আসিতেছে না। কেবল উত্তেজনা—আর ভোগের কথাই যেন সাহিত্যের একমাত্র উপাদান। তুই কি মনে করিস্—নারীরা পুরুষদের মত কর্ম্মী, আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করিলেই দেশের শান্তি, শ্রী ফিরিয়া আসিবে? এই সম্বন্ধে তোর কি মত আমি জানি না। কিন্তু আমার মত যদি বলি, তাহা হইলে এই বলিব যে এইরূপ বাহিরের শিক্ষায় দীক্ষায়ই সব কিছু হইবে না। আসল কথা তপস্যার দ্বারা অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে কোন পথেই শ্রেয় লাভ হইবার আশা নাই।

মন-বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলেই রিপুর হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। ইহার দরুণ আলাদা সাধনার প্রয়োজন। বরঞ্চ মার্জ্জিত মন-বুদ্ধিদ্বারা

সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করিবার একটা অত্যুগ্র লোলুপতা আসে। এইজন্যই আমার মতে বিনা সাধনায় কাহারও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

দোষ নারী-পুরুষ উভয়েরই। সুতরাং সাধনা উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন। স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষের কাছে নারীর মর্য্যাদা অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। এইজন্যই মহাদেব রূপযৌবনসম্পন্না পার্ব্বতীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তপস্বিনী পার্ব্বতীর সেই বল্কল পরিহিত বিশীর্ণ দেহের রূপেই মুগ্ধ হইলেন। সাধারণ মানুষ কি এই তপস্বিনীর রূপকে পছন্দ করে? এইজন্যই আমি বলি, বিশুদ্ধ চিত্তসম্পন্ন না হইলে রুচির মধ্যেও বিকৃতি বা লোলুপতা থাকিয়া যায়। ভগবান্ আমাদের যে দেহ-মন-বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও যে কতখানি সংযমের প্রয়োজন তাহা আর বলিবার নয়।

মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করুক, তাহাদের মন-বুদ্ধি মার্জ্জিত হোক্—কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনের বিশুদ্ধির দরুণ কোন না কোন ব্রত গ্রহণ করা উচিত। ব্রতহীন জীবন দৈবী জীবনের সন্ধান জানিতে পারে না। আমাদের মুনি-ঋষিদের প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধানের ভিতর দিয়া জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিলে, সেই জীবন যে সকলের আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে!

আজীবন ভোগের ভিতর দিয়া দিনগুলি অতিবাহিত করাই কি শ্রেষ্ঠ আদর্শ? ভোগের কাল যাহাতে বাড়ে, সেই নিয়া গবেষণা—চিন্তা করাই কি মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য? যথার্থ সমবেদনা যে কি—তাহা বলা বড়ই সুকঠিন। আমার মতে যে সমবেদনায় মানুষকে সত্য হইতে বিচ্যুত করাইয়া ভোগের পথে মনকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া আসে, তাহা কখনো কল্যাণকামীর যথার্থ সমবেদনা নয়। অপরের সুখ বিধান, আর কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেওয়া এক কথা নয়।

দেহকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে না পারিলে যথার্থ প্রেমের উদ্বোধন হয় না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথাই মনে কর না? শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া শ্রীরাধিকার অহরহঃ ভাব-সমাধি লাগিয়া থাকিত—অর্থাৎ দেহাতীত ভূমিতেই শ্রীরাধিকা থাকিতেন বেশী সময়। আজ কালকার ভালবাসা যে স্থূল দেহকে লইয়া। নিছক ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকিবার মত চিত্তের সেই সংযম এবং পবিত্রতা আছে কয় জনার? অধিকাংশই আমাদের মুনি-ঋষিদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম-সংযমকে কটাক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ যে এখনো বাঁচিয়া আছে, এক কথায় বলিতে গেলে সংযমই তাহার একমাত্র কারণ। অন্যান্য দেশের মত ভোগসর্ব্বস্ববাদী হইলে— আমাদের অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ।

মানুষের আসল দুঃখ যে কি তাহা গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিতে পারে না বলিয়াই, অনেক দরদী সাহিত্যিক নর-নারীর ক্ষণস্থায়ী ভোগের পথের বিঘ্নকে দূর করিবার দরুণ অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। কিন্তু এই ভোগের পরিণাম কি—তাহা কয়জন চিন্তা করেন? স্বাভাবিক জিনিষ খুবই সুন্দর। কিন্তু ভগবানের স্বাভাবিক সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রাখে কয় জন? ভগবান স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে উন্নত হইতে—অবনতির পথে যাইতে নয়। কিন্তু এই সহজ কথাটী মনে রাখিয়া দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন কয় জন? এ সব সম্বন্ধে প্রশান্ত চিত্ত লইয়া চিন্তা করিলে তুই-ও সব বুঝিতে পারিবি।

তপস্যাদ্বার সৌন্দর্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। দৈবী-জীবন লাভ করিতে হইলে তপস্যা তাহার অপরিহার্য্য অঙ্গ। আজকাল 'স্বভাব' 'স্বভাব' বলিয়া অনেকেই চিৎকার করিয়া থাকে—কিন্তু সেই স্বভাবকে অবিকৃত রাখার কৌশল জানে কয় জন? স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার দরুণই তপস্যার প্রয়োজন হয়। রূপকে সফল করিবার দরুণই পার্ব্বতী উগ্র-তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী এই কথা বুঝিয়াছিলেন যে, সৌন্দর্য্যকে অক্ষত রাখিতে হইলে মদনের উপাসনা ছাড়িয়া সত্যের উপাসনা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক দুঃখ-কষ্ট-তপস্যার ভিতর দিয়াই জীবন প্রকৃত সাফল্য-মণ্ডিত হয়।

হর-পার্ব্বতীই পুরুষ-নারীর প্রকৃত আদর্শ। স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষ, আর স্ব-প্রতিষ্ঠা নারীর জীবন কিরূপ অনাবিল শান্তিতে অতিবাহিত হয়, হর-পার্ব্বতীর জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোথায় দেহকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, না আজ কালকার সাহিত্য পড়িয়া দেহবোধটা যেন আরও বেশী করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে। সাহিত্যকে সমাধির সঙ্কেতও বলিয়া দিতে হইবে। তবে না তাহা হিতকারী সাহিত্য হইবে! ভোগের তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলাই সাহিত্যের লক্ষ্য বা আদর্শ নয়—এইজন্যই বলি প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টিও কঠিন ব্যাপার। আসল জীবনের সন্ধান কি সাহিত্য বলিয়া দিতেছে? তাহা হইলে তো কথাই ছিল না।

নিজকে নিরুপায় ভাবিবার মত বড় পাপ আর নাই. সুতরাং নারী-পুরুষের মনের স্বাধীনতা থাকিবে না কেন? কিন্তু স্বাধীনতাদ্বারা জীবনকে যদি উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে সেই স্বাধীনতায় লাভ? আর নিজের মনের উপরই যদি শক্তিচালনার ক্ষমতা না জন্মাইল তাহা হইলে আর হইল কি? মনে কত লালসা-বাসনাই ওঠে, কিন্তু সব কি সফল হয়? আর ইহা কি কখনও সম্ভব? দেহবোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেহকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া থাকিবার ক্ষমতাও না জন্মে, তাহা হইলে দেহাতীত অমর-জীবনের সন্ধান মিলিবে কি করিয়া? দৈবী-জীবন কি কল্পনার বিষয় শুধু?

তুই তো আজকাল সাংখ্য পড়িতেছিস্। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি দিয়াই তোকে আরও ভাল করিয়া বুঝান যাইতে পারে। যে পুরুষ স্ব-প্রতিষ্ঠ, তাহার মন যোগাইবার দরুণ প্রকৃতি যে কিরূপ আকুলা, তাহা আর বলিবার নয়। প্রকৃতি সেই পুরুষের কাছে দিব্য-প্রকৃতিরূপে ধরা দেয়। প্রকৃতির আসল রূপ তাহাই। কিন্তু ভোগলোলুপ মানুষের কাছে প্রকৃতির বিকৃতিই প্রকট। প্রকৃতির যত কিছু আয়োজন—সব পরার্থে। সেই পর কে?—না পুরুষ। এত কিছু বন্ধন স্বীকার করিয়াও যে প্রকৃতি কোন কিছুতেই বদ্ধ হয় না, তাহার একমাত্র কারণ পুরুষের প্রতি তাহার ঐকান্তিক ভালবাসা। এই ভালবাসায় প্রকৃতি নিজকে তিল তিল করিয়া দান করিয়া দেয়। স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষ প্রকৃতির এই অফুরন্ত আত্মত্যাগের মহিমা দেখিয়া স্তব্ধ-বিস্মিত হইয়া যায়। ভোলানাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছেন সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন কেন?—না, প্রকৃতির এই নিঃস্বার্থ আত্মদানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে। আজকাল উল্টো হইয়া দাঁড়াইয়াছে—পুরুষই প্রকৃতি সাজিয়াছে। পুরুষের আর সেই স্ব-প্রতিষ্ঠ নির্ব্বিকার উদাসীন ভাব নাই! আর এইজন্যই নারী-পুরুষের মাঝে এক মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। প্রকৃতি সেবা করিয়াই সন্তুষ্ট—কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ যে তাহাকে সেবাধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। সেবা গ্রহণ

করিতে পারে কে? —না, নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষ।

নারী যেখানে স্ব-প্রতিষ্ঠা, সেখানে ভোগের কথা মনেই আসে না—মনে জাগে শুধু শ্রদ্ধা! স্ব-প্রতিষ্ঠা নারীই পুরুষের যথার্থ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। এই শ্রদ্ধার ভাব যতই জাগ্রত হইবে—নারী-পুরুষের সম্বন্ধও ততই পবিত্র এবং মধুর হইবে।

শুধু উপার্জ্জনেই অভাব কমে না। গুছানো একটা মস্ত বড় কাজ। প্রকৃতির বিশেষত্ব এই খানেই। পুরুষ যাহা সংগ্রহ করে—প্রকৃতি তাহা সুবিন্যস্ত করিয়া গুছাইয়া রাখে। ইহাতেই সংসার বেশ স্বচ্ছলভাবে চলিতে পারে। নারী-পুরুষ উভয়ই যদি উপার্জ্জনক্ষম হয়, তাহা হইলে কি অভাব কমিয়া যাইবে বলিয়া তুই মনে করিস্? পুরুষের ন্যায় নারীও যদি সমান উপার্জ্জনশীলা হয়, তাহা হইলেই পুরুষকে প্রকৃত সাহায্য করা হইল না। পুরুষের দেহ-মন-প্রাণকে প্রশান্ত-পবিত্র-শুদ্ধ-সরস রাখিতে হইলে নারীকে সমান উপার্জ্জনশীলা না হইলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। নারী-পুরুষের মিলন পার্থিব জীবনের সুখভোগ বাড়ানের দরুণ নয়। এইখানেই অন্যান্য দেশের আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের আদর্শের স্বাতন্দিন পার্থক্য!

—*—

উপদেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তাহলে তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তোমাদের মাঝে অনেকেই আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছ। আমি তো তোমাদের কোন কিছু গোপন করি না। আমি তো স্পষ্টই বলেছি, এখনো বলি, তোমরা আমায় ছেড়ে গিয়েছ বেশ তাতে আমার কোন দুঃখ নাই—আমার যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, তবে তোমরা এসে তা আমায় ধরিয়ে দাও—আমি যদি তা সত্য বুঝি, তাহলে অবাধে তোমাদের মত গ্রহণ করব—আর যদি তোমাদের ভুল তোমরা বুঝ্‌তে পার, তাহলে আবার আমার কাছে ফিরে এসো। কিন্তু কৈ কেউ তো নিজের দোষ বুঝ্‌তে পেরেও ফিরে এল না। এ দ্বারাই বুঝি, যথার্থ সত্যপিপাসু তোমাদের মাঝে কয় জন?

আমি ছাড়া কি দুনিয়াতে আর সাধু নাই? বেশ তো আমার কাছে কিছু না পেলে, অন্য সাধুর আশ্রয় লও। যার জন্য একদিন ঘর বাড়ী ছেড়ে এসে ছিলে, তার সন্ধান জেনে নাও। কত সাধু-মহাত্মা রয়েছেন। খুঁজলে তাঁদের সাক্ষাৎ মিলেই। কিন্তু তোমাদের অনেকের প্রাণেই তো যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগে নি, এইজন্যই দেখি আমাকে ছেড়ে গিয়ে দিব্যি তোমরা ঘর-সংসারে প্রবেশ করছ। এই কি সত্যপিপাসুর লক্ষণ? আমাকে ছেড়ে গিয়ে যদি কেউ উন্নত হবে বলে মনে কর, আমি তাকে সানন্দচিত্তে বিদায় দিচ্ছি। মঠ-আশ্রম আমার জীবনের লক্ষ্য নয়—তোমরা প্রকৃত মানুষ হও আমি এই চাই। সুতরাং মঠাশ্রম ছেড়ে গিয়ে যদি স্বাধীন ভাবে সাধন-ভজন করে বিশেষ উন্নত হবে বলে মনে কর, তাদের আমি অবাধে বিদায়

দিচ্ছি। আমি তাতে বাধাই বা দেব কেন? কেন না তোমরা সাধু হও—আমিও তো এই-ই চাই। এখানে কি তোমরা খেতে আর ঘুমাতে এসেছ? কিন্তু কৈ, আমাকে ছেড়ে গিয়ে তো তোমাদের লক্ষ্য ঠিক থাকে না। আস্তে আস্তে জীবনের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে তোমরা এক এক জন এক এক পথ অবলম্বন কর। আমাকে ছেড়ে গিয়ে যদি তোমাদের লক্ষ্য ঠিক থাক্‌ত, তাহলে আমার কোন দুঃখ ছিল না, কেন না গুরু শিষ্যের মঙ্গলই চান, কাছে থেকে যদি শিষ্যের অবনতি হয়, তাহলে গুরু তাকে কেন কাছে রাখ্‌বেন? কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি—তোমাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক নাই। এই মঠে-আশ্রমে যখন তোমরা আস—তখন তোমাদের কি তীব্র বৈরাগ্য ছিল, তখনই বা জীবনের লক্ষ্য কি ছিল, আর আজ যারা আমায় ছেড়ে গিয়েছে আত্মোন্নতির দরুণ, তাদের পরিণামই বা কি হচ্ছে! এ সব দেখে শুনে কি প্রাণে আঘাত লাগে না?

মাঝে তোমাদের মাঝে "ব্যক্তিত্ব" "ব্যক্তিত্ব" বলে এক রব উঠেছিল। তোমাদের ধারণা আমি বুঝি ব্যক্তিত্বকে চেপে রাখ্‌তে চাই। কিন্তু কেউ তো এ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা কর নি, তাই আমার মনোভিপ্রায় না জেনেই অযথা একটা মতবাদ আমার উপর আরোপ কর্‌ছ। ব্যক্তিত্ব আমিও স্বীকার করি। কিন্তু ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সাধনা করে ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ হয় না। আমাদের আদর্শ হল প্রথমে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দেওয়া। ভাস্করানন্দ কি ভাস্করানন্দ হবেন বলে আগে থেকেই সঙ্কল্প করে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন? তা যদি হ'ত, তাহলে তিনি ভাস্করানন্দ হতে পার্‌তেন না। তিনি যখন বের হয়য়ছিলেন ঘর ছেড়ে, তখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল অহংকে চূর্ণ করা। গুরু হবেন বা জগতের হিত করবেন—এ সব সঙ্কল্প ছিল না। জগতের উপকার কর্‌ব এই বাসনা যাদের—তারা কখনো জগতের হিত কর্‌তে পারে না। এ সব ভগবানের কাজ—তিনি যাকে দিয়ে যা করাবার করাবেন। তার পর ব্যক্তিত্বের তো লোপ নাই। কেন না ব্যক্তিত্ব যে প্রারব্ধ! গুরু তো নিরপেক্ষ, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁর সকল শিষ্যকেই সমান কৃপা করেছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দের মত আর কেউ হতে পারলেন না কেন?— না বিবেকানন্দ একজনই। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য রয়েছেই, এর মার নেই। সুতরাং এ দিকে জোর দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। ব্যক্তিত্ব আপনি ফুটে উঠ্‌বে—ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের দরুণ আলাদা কোন সাধনের প্রয়োজন করে না।

আমার কাছে যারা রয়েছ, তাদের আমি আত্মসমর্পণের কথা বলি। কিন্তু আত্মসমর্পণদ্বারা ব্যক্তিত্বের বা বৈশিষ্ট্যের লোপ হয় না, কেবল নিজের অহঙ্কার মান-অভিমান এই বিঘ্নগুলিই দূর হয়। আর মান-অভিমান থাক্‌তে যে প্রকৃতই ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না!

তোমরা পাঁচজন একত্রিত হয়েছ, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে উন্নত হবে বলেই। আমার কোন স্বার্থ নাই এতে। স্বাবলম্বী হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হও তোমরা—ইহাই আমার অভিলাষ।

মঠ-আশ্রম ছেড়ে গেলেই আমাকে ছাড়া হ'ল না। কিন্তু তোমরা যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপথে ধাবিত হও, তখনই আমাকে যথার্থভাবে ছেড়ে চল। আমার দুঃখ হয় তাতেই বেশী। লক্ষ্য ঠিক না থাক্‌লে, আমার মঠ ছেড়ে গেলেও সত্যলাভের কোন বিঘ্ন হবে না। কিন্তু তোমরা তো জীবনের প্রতিজ্ঞাকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার না। অধিকাংশই

আত্মসুখপরায়ণ হয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে যাও।

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ কোনরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ নয়। সুতরাং শিষ্যের মাঝে আত্ম-জাগরণ হোক্—নিঃস্বার্থ ভাবে গুরু এরই জন্য যা কিছু সহায়তা করেন। কিন্তু সত্যের পথ বড়ই কঠিন পথ— অধিকাংশই চায় সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্ন রেখে সত্যলাভ করতে। বিরোধ লাগে তাদেরই বেশী, তারাই নিজের চেয়ে অপরকে বেশী দোষী বা বিঘ্ন বলে মনে করে। নিজের ইচ্ছাটাই যদি প্রবল হয়, তা হলে ভগবদিচ্ছা কেমন করে তার মাঝে লীলায়িত-মূর্ত্ত হবে? মানুষ ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই বড়াই করে মরে। ব্যক্তিত্ব দিয়ে কি লাভ হবে? নিজেদের অহংবোধই যে ভগবানের কৃপা উপলব্ধির বড় বিঘ্ন, এ কথা তোমরা কেহই বুঝ না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অভিমানশূন্য হয়ে ভক্ত সেজেছিলেন, তাতে কি তাঁর ব্যক্তিত্ব লোপ পেয়ে গিয়েছিল?

আমি জানি আমার আশ্রয় নিয়ে যারা রয়েছ, তারা সাধন-ভজন কিছুই কর না—একমাত্র আমার উপর নির্ভর করে চল্‌ছ তোমরা। সুতরাং এর মাঝেও যদি আমার সঙ্গে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা কর, তা হলে তো তোমাদের জীবনের কোন উন্নতিই হবে না। বিশ্বাসের যে কত বড় শক্তি, তা তো তোমরা বুঝ্‌বে না। কেন না, তোমাদের মাঝে কয়জন আছ—যারা আমাকে সরল প্রাণে বিশ্বাস কর। তোমরা এখানে কেন এসেছিলে—দু'বেলা দুটী খেতে, না জীবনের উন্নতির দরুণ? আঘাত দেওয়া আমার লক্ষ্য নয়, কিন্তু লক্ষ্যহারা হয়ে জীবন যাপন কর্‌লে, তাকে আঘাত দিয়ে জাগাতে হবে বৈ কি?

আমি মঠ আশ্রম চাই না—কিন্তু তোমাদের চাই। তোমাদের মাঝে একটাও যদি যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠ—তা হলেই বুঝ্‌ব আমার সকল আশা, সকল সাধ পূর্ণ হল।

(ক্রমশঃ)

—×—

ব্রহ্মানন্দ

পঞ্চদশীতে আছে :—

> নদ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্।
> স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জ্জুনংপ্রতি॥

"যে সময়ে দ্বৈতভাব থাকে না এবং নিদ্রারও আবির্ভাব হয় না, সেই সময়ে যে সুখের অনুভব হয়, তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই বিষয়েই নানা ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

দ্বৈতের চিন্তা না থাকিলে সাধারণ মানবের সেই অবস্থায় ঘুম আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু ঘুম তো হইল তামসিকতার লক্ষণ! ব্রহ্মানন্দের মাঝে তামসিকতার তো স্থান নাই। সুতরাং একের চিন্তা করিয়াও এক ভাবে চিত্ত সদা জাগ্রত রাখিতে পারিলেই তাহাই ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। এইজন্যই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন যে, ভেদও থাকিবে না অথচ ঘুমও আসিবে না। এক কথায় বলিতে গেলে সুষুপ্তির দ্রষ্টা হইতে পারিলেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়। নিদ্রা তো পতঞ্জলির মতে একটা বৃত্তি, সুতরাং সেই বৃত্তির দ্রষ্টা হওয়া কি অসম্ভব? সুষুপ্তিতে সব একাকার, সেইখানে কোন

ভেদ থাকে না—সুতরাং সেই একাকারের রাজ্যে যদি সাক্ষী চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হইল আর কি !

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই ভেদাতীত অদ্বৈত-বাদের কথাই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন, "হে ভগবন্—আপনি যে আমাকে এ বিষয়ে মোহগ্রস্ত করিলেন। আমি যে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সবই যদি একাকার হইয়া গেল, তাহা হইলে আর থাকিল কি ? আমার যে ইহাতে ভয় হয়।" মৈত্রেয়ী এই জায়গায় নিজের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুষুপ্তির মাঝেও যে দ্রষ্টা হওয়া সম্ভবপর, এই সঙ্কেত মৈত্রেয়ী বুঝিতে পারেন নাই। দ্বৈত যদি না থাকে, তাহা হইলে চিত্ত সজাগ থাকিবে কাহাকে অবলম্বন করিয়া ? ইহা অবশ্য আমাদের সাধারণ বুদ্ধির কথা, কিন্তু দ্বৈতভাব রহিত হইয়াও যে সজাগ—সচেতন থাকা সম্ভবপর, পঞ্চদশীকার তাহাই বলিয়াছেন। দ্বৈত ভাবনা না থাকিলেই সাধারণের ঘুমের ভাব আসিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু এই ঘুমকে ঠেলিয়া যাঁহারা চেতনাকে উজ্জ্বল রাখিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হন।

আমরা কতকগুলি মিথ্যা সংস্কারের মোহে অভিভূত হইয়া থাকি। এই সংস্কারের হাত হইতে রেহাই না পাইলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ভেদের রাজ্যে আছি বলিয়া ভেদ ছাড়া কিছুই বুঝি না। ভেদাতীতের কথা কেহ বলিলে বলি, ও সব অলীক কল্পনা ! কিন্তু সাধনাদ্বারা চিত্ত-মন-বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলে তখন সকল কথারই তাৎপর্য্য প্রতিভাত হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ সুন্দর কয়টী কথা বলিয়াছিলেন—"যেখানে দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেখানেই এক জন অপর জনকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে জানে, কিন্তু ব্রহ্মবিদের কাছে সবই আত্মময়। তখন তিনি কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবেন, কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবেন, কিরূপে কাহাকে শ্রবণ করিবেন, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবেন, কিরূপে কাহাকে মনন করিবেন, কিরূপে কাহাকে জানিবেন ? যাহাদ্বারা সমুদায়কে জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে ? অয়ি মৈত্রেয়ী ! বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে ?"

কিছুই যদি জানিবার করিবার না রহিল, তাহা হইলে তো তামসিকতায়ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে ! কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীর কোথায়ও অস্পষ্টতা, আচ্ছন্নতা নাই। তাঁহারা অদ্বৈতানন্দেই ভরপুর। ব্রহ্মবিদ্ আপ্তকাম, আতটপূর্ণতা লইয়া অনাবিল শান্তিতে তাঁহারা দিন অতিবাহিত করেন। নিছক চেতনাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারা সহজ কথা নয়। কোনরূপ মালিন্য থাকিলে ইহা সম্ভবপর নয়। এইজন্যই দেহ-মনের মালিন্য থাকিলে ব্রহ্মানন্দলাভ না হইয়া নিদ্রানন্দই লাভ হইয়া থাকে। নিদ্রার ঘোরে তখন কোন্ এক অজানা তামসিক রাজ্যে কাল অতিবাহিত করিতে হয়।

অদ্বৈততত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এইজন্যই দ্বৈত-রহিত অবস্থায় অনেকেরই ঘোর নিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ধ্যান করিতে বসিয়াও কতজন যে ঘুমে ঢলিয়া পড়ে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মন ক্রমশঃ অদ্বৈততত্ত্বাভিমুখী হইলেই তখন আর চিত্তকে সজাগ রাখিতে পারে না অনেকেই। এই জন্যই চিত্ত স্থির হইয়া আসিলে সুষুপ্তির কোলে

অনেকেই ঢলিয়া পড়েন। এই সঙ্কটকালে সজাগ থাকিতে পারিলেই সুষুপ্তির আনন্দকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারা যায়।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, প্রত্যয়ের একতানতাই ধ্যান। কিন্তু এই একতানতার মাঝে অনেকেই জ্ঞানসূত্র হারাইয়া ফেলে। এইজন্যই তখন আসিয়া তাহাদিগকে ঘুমে অভিভূত করিয়া ফেলে। ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানকে উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। জ্ঞান শূন্য ধ্যানে মানুষকে অন্ধতম প্রদেশে লইয়া চলে। এইজন্যই পতঞ্জলিতে আছে—জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ভাবনাও করিতে হইবে।

বুদ্ধি যখন সূক্ষ্ম পরিমার্জ্জিত হয়—এক কথায় বুদ্ধি যখন আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তখনই বুদ্ধিদ্বারা অদ্বৈততত্ত্বের তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। পঞ্চদশীকার এই জায়গাতেও একটী সুন্দর শ্লোক বলিয়াছেন।—

সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃসন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ।
অলীনত্বান্ন নিদ্রৈবা ততো দেহোঽপি নো পতেৎ॥

সমাধি যোগ অভ্যাসদ্বারা বুদ্ধির কিরূপ সূক্ষ্মতা হয়, তাহার কথাই বলিতেছেন। সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলেই বুদ্ধি পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি তখন এইরূপ সূক্ষ্ম হয় যে, কোন বিষয়ই সেই বুদ্ধির অগোচর থাকে না। তখন সেই বুদ্ধিদ্বারাই সদসৎ বিবেচনা করিতে পারা যায়, বুদ্ধি তখন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া কেবল ব্রহ্মানন্দেই অনুরক্ত থাকে। বুদ্ধির এই অবস্থাকে নিদ্রা বলা যায় না। কারণ সেই সময়ে অন্তঃকরণ বিলীন হয় না। যাবৎ অন্তঃকরণের সত্তা থাকে, তাবৎ নিদ্রা হয় না, এবং এই অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই দেহের পতন হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে বুদ্ধিকে অতীব সূক্ষ্ম করিয়া লইতে হইবে। স্থূল বুদ্ধির অদ্বৈত রাজ্যে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার নাই। দ্বৈত-ভাবনা ছাড়িয়া দিলেই, তাহারও কর্ম্ম শেষ হইল। অর্থাৎ স্থূল-বুদ্ধির সীমা এই দ্বৈতের রাজ্যেই শেষ, সুতরাং তাহাকে লইয়া আর ঊর্দ্ধ দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না।

একাকারের রাজ্যে অনেকেরই বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়। অনেকেই সুষুপ্তির কোলে এইজন্যই ঢলিয়া পড়ে। কিন্তু যিনি গুড়াকেশ হইতে পারিয়াছেন, তিনিই জানেন এই একাকার অবস্থার ঊর্দ্ধেও এক পূর্ণ চেতনা, পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সত্যের অধিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহাকে জানিতে পারিলে, অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে—তখন ঘুমও উপভোগের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

অবলম্বন ছাড়া মানুষ থাকিতেই পারে না, বিশেষতঃ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। কাজেই কোন অবলম্বন যখন থাকে না, তখন তাহারা ঘুমে অচেতন। বুদ্ধি চরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত না হইলে, নিরালম্ব অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এইজন্যই সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সমাধিযোগের ক্রমঃ অভ্যাস চাই। সমাধিদ্বারা বুদ্ধি পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। তখন বিনা অবলম্বনেই তাহার ভিতর পূর্ণানন্দের প্লাবন আসে। সমাধির অভ্যাসপটুতাদ্বারা যে সময়ে মানুষ অহঙ্কারকে সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই সময়েই নিজানন্দ অনুভব হইতে থাকে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা এইরূপে নিরন্তর সমাধিযোগ অভ্যাস করিতে করিতে অহঙ্কারকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলে, চিত্তের সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তখন স্বভাবতঃই নিজানন্দ অনুভব করিতে পারেন।

যদিও সমাধিযোগাবস্থা চিরস্থায়ী নহে, তথাপি সেই সমাধিযোগ-অনুষ্ঠান কালে ব্রহ্মানন্দ নিশ্চিত হয়। সমাধি চিরকাল থাকে না বটে, কিন্তু সেই সমাধি যে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থিত হয়, তাহাতেই

ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ জানা যায়। অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝিবার একমাত্র পন্থা হইল সমাধিযোগ অবলম্বন—ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নাই। কোন অবলম্বন থাকিবে না, অথচ চিত্তকে সমান ভাবে উদ্বুদ্ধ রাখা, যাহারা সমাধিযোগের নিগূঢ় সঙ্কেত জানিতে না পারিয়াছে, তাহারা এই কথা মোটেই বিশ্বাস করিতে পারে না। ভেদবুদ্ধিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় অভেদ-তত্ত্বের কথা মোটেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। এইজন্যই ক্রমশঃ সমাধিযোগ অভ্যাস ছাড়া সেই অদ্বৈত-তত্ত্বের তাৎপর্য্য বুঝা সম্ভবপর হয় না। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ক্রমের পথই দেখাইয়াছেন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে নিবারিত করিতে হইবে। সমাধিযোগ অভ্যাসের ফলেই সমাধি আসে। সমাধি একটা অলৌকিক ব্যাপার নয়। অবশ্য মনকে বাগ মানানোই হইল কঠিন কথা। এই-জন্যই গীতাকারও বারংবার অভ্যাসযোগের কথা বলিয়াছেন।

সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া জ্ঞানালোকে চির প্রদীপ্ত হইয়া থাকিতে পারিলেই ব্রহ্মানন্দ লাভ হইল। ব্রহ্মানন্দ আর কিছুই নয়। সর্ব্ব বৃত্তি নিরোধ হইলে তখন মানুষ অচেতন হইয়া যায় না। বরঞ্চ বৃত্তি নিরোধ হইলেই সাক্ষীচৈতন্যের উজ্জল-মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। আত্মার স্বরূপ এই অবস্থাতেই অপ্রচ্যুত থাকে, অন্যান্য সময়—"বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র"—আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত থাকায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। কাজেই বৃত্তি-নিরোধ করিলে আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রতিভাত হয়। সমুদ্রের স্বরূপ অর্থাৎ গাম্ভীর্য্যকে বুঝিতে হইলে তরঙ্গ থাকিলে চলিবে না। তরঙ্গের অব-সানে সমুদ্র স্থির-ধীর-গম্ভীর।

দ্বৈত-ভাবনা না থাকিলেই যে অভাব-বোধ জাগ্রত হইবে, তাহা নহে। বরঞ্চ দ্বৈতের অব-সানেই হৃদয় পূর্ণানন্দে অভিষিক্ত হইতে থাকে। পতঞ্জলি যে নিদ্রাকে বৃত্তি বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখন নিদ্রা আসে এই অভাব-প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়াই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দে তো অভাব-প্রত্যয় থাকে না। দ্বৈত-ভাবনা থাকে না বটে, কিন্তু অদ্বৈত-তত্ত্ব তো অভাব-প্রত্যয় নহে। সুতরাং অদ্বৈত-তত্ত্বকে আশ্রয় করিলে অজ্ঞানরূপী নিদ্রাই বা আসিবে কেমন করিয়া? অদ্বৈত বলিতে বুঝি আমরা শূন্য—কিন্তু অদ্বৈত-তত্ত্বই পূর্ণ। একের মাঝে সব রহিয়াছে বলিয়াই, সেই একের সাধনা করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায়। মন-বুদ্ধি মার্জ্জিত-সূক্ষ্ম হইলেই—ব্রহ্মানন্দের আস্বা-দন পাওয়া যায়। তখন ভেদ থাকে না, আবার ভেদের অভাবে ঘুমেও অভিভূত করিয়া দেয় না—এই মাঝামাঝি অবস্থাতেই ব্রহ্মানন্দ বিরাজমান।

—×—

রঘুনাথ দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তখন মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়ের ঘরে ঘরে নাম প্রেম বিলাইতেছেন, আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতেছেন, তাঁহার কৃপায় গৌড় দেশ তখন প্রেমের বন্যায় প্লাবিত

হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের রঘুনাথও সে কথা শুনিয়াছেন, শুনিয়া তাঁহার ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গচরণে ছুটিয়া যাইতে প্রতি পাদক্ষেপে বাধা পাইয়া তিনি এখন গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনায় অধীর হইয়াছেন। এই সঙ্কটসময়ে যদি আপনার জনের দর্শনলাভ ঘটে, যদি হৃদয়ের কথা তাঁহাকে জানাইবার অবসর লাভ হয়, যদি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাঞ্ছিত দেবতার অমৃতময়ী বাণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তৃষিত সন্তপ্ত প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল হইতে পারে, এই ধারণায় রঘুর প্রাণ নিত্যানন্দের চরণদর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি পিতৃসকাশে তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবর্দ্ধন পুত্রের সংসারবিরাগের আতিশয্য দেখিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই এখন পুত্রের এই প্রার্থনায় আপত্তি করিলেন না, যাইতে অনুমতি দিলেন। পিতার আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ প্রভূত অর্থ সঙ্গে করিয়া পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দের উদ্দেশ্যে চলিলেন।

গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ তটে বৃক্ষমূলে প্রভুপাদ পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ তথায় গিয়া উপস্থিত। দূর হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের তেজঃপুঞ্জসমন্বিত কলেবর সন্দর্শনে তাঁহার চিত্ত পুলককম্পিত হইল, দূর হইতেই তিনি প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী সেবক প্রভুকে জানাইলেন যে—গোবর্দ্ধনাত্মজ রঘুনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। প্রভু একথা শুনিয়া হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন—

> এত দিনে চোরা তুই দিলি দরশন।
> আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন॥

রে চোর! এতদিনে তুই দেখা দিলি? চোরের মত এতদিন ধরা না দিয়া দূরে দূরে সরিয়া থাকিতেছিলি,—বহুদিন পরে তোকে নিকটে পাইয়াছি, আয় নিকটে আয়, আজ তোর অপরাধের কিছু দণ্ড দিব,—এই বলিয়া প্রভু রঘুনাথকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রভুর আহ্বান শুনিয়াও রঘুনাথ সঙ্কোচাধিক্যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্থির হইয়া করযোড়ে একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ আমার দয়াল ঠাকুর, তিনি রঘুনাথের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার কাছে টানিয়া আনিলেন, কৃপা পরবশ হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে স্পর্শ করিলেন, রঘুনাথের অঙ্গ পুলককণ্টকিত হইল, তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"রঘুনাথ! তুমি তো জান, আমি মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়ের ঘরে ঘরে নাম বিলাইতেছি, অনেক দিন হইতে এই অঞ্চলেই অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু তুমি এ সংবাদ শুনিয়াও তো এক দিনের জন্যও আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই, বরং যেন দূরে দূরেই সরিয়া থাকিতেছ। রঘুনাথ! তুমি যে প্রভুর চিহ্নিত দাস, তোমার তো এ আচরণ শোভা পায় না; তুমি আসিবে, আমাদের সঙ্গে মিশিবে, আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আপনা হারাইবে, আমরা ইহাই চাই। যাহা হউক আজ তোমায় নিকটে পাইয়াছি, এখন তোমায় কিছু দণ্ড দিব, তুমি দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।"

রঘুনাথ আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বাহিরে কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন—"ওগো দেবতা! তুমি কি জান না যে আমি কেমন বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি, শতবার চেষ্টা করিয়াও তো এ বন্ধন ছিঁড়িতে পারিতেছি না প্রভু! জানি না আজ কেমন করিয়া তোমার চরণ দর্শনের ভাগ্য ঘটিল, অথবা সবই তোমার কৃপা।

এখন কৃপা কর, কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার কর, যাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে মিলিত হইতে পারি তাহার বিধান কর। জানি আমি, আমার কর্ম্ম-দোষ খণ্ডে নাই, তাই প্রতি বারই প্রতিরুদ্ধ হইতেছি; তুমি যদি আমাকে দণ্ড দাও দেবতা, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার কর্ম্ম ফল খণ্ডন হইয়া যাইবে—আমি শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ প্রাপ্ত হইব। অতএব তুমি যে কোন দণ্ডেরই বিধান কর না কেন, তাহা যতই কঠোর হউক, আমি হাসি মুখে মাথা পাতিয়া লইব।"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন— "রঘুনাথ! তোমার দণ্ড কি জান? তুমি আমার সাঙ্গোপাঙ্গকে আজ দধি চিড়া ভক্ষণ করাও; এই হইবে তোমার দণ্ড— কেমন?"

এই দণ্ডাদেশ পাইয়া রঘুনাথের আনন্দ আর ধরে না, তিনি আজ প্রভুর পার্ষদগণের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন, তাঁহার মত সুখী কে? বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইল। রঘুনাথের আদেশে তাঁহার নিজ জন মহোৎসবের উপকরণ আনয়ন ব্যপদেশে চতুর্দ্দিকে ছুটিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই শত শত কলসে দুগ্ধ, শত শত ভারে দধি, স্তূপে স্তূপে চিনি, সন্দেশ, চিড়া, কদলী প্রভৃতি দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রভুর সম্মুখে স্থাপিত হইল। চিড়া ভিজাইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ মৃৎকুণ্ডিকা এবং ভোজন করিবার পাত্রস্বরূপে অজস্র হোলনা প্রভৃতিরও সংযোগ করিতে বাকী রহিল না। ব্রাহ্মণগণ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। আয়োজন দুই প্রকারের হইল, এক দধি-চিপিটক অপর দুগ্ধ-চিপিটক। পর্ব্বত পরিমিত চিপিটকের স্তূপ— সমস্তই প্রথমে তপ্ত দুগ্ধে ভিজান হইল, তৎপরে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক দধি চিনি কলা দিয়া, অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধে চাপা কলা চিনি ও ঘৃত কর্পূর সহযোগে মাখান হইল, অতঃপর তাহা পৃথক্ পৃথক্ শত শত হোলনায় সজ্জিত হইল। ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত হইলে পর ভক্তগণের উপবেশনের বন্দোবস্ত হইল।—প্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ ব্যতীতও মহোৎসবের নাম শুনিয়া বহু ব্রাহ্মণসজ্জন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ তটভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই আনন্দ ভরে যিনি যেখানে পারিলেন উপবেশন কবিলেন, তীরে স্থান না পাওয়ায় অনেককে আবার প্রসাদ গ্রহণ জন্য জলে দণ্ডায়মান হইতে হইল, কিন্তু ইহাতেও কাহারও দুঃখ নাই, সকলেই আনন্দাতিশয্যে হরিধ্বনি দিতে থাকিলেন।—প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল, প্রত্যেকের সম্মুখে দুইটী করিয়া পাত্র স্থাপিত হইল। ২০ জন পরিবেশক এই বিরাট ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এমন সময় পানিহাটির সুবিখ্যাত ভক্ত রাঘব পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এই অভাবনীয় ব্যাপার সন্দর্শনে অতীব বিস্মিত হইলেন। দ্বিপ্রহরে যে প্রভুর তাঁহার বাড়ীতে সেবা গ্রহণের কথা ছিল! তাই তিনি এই বিপুল আয়োজন দেখিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন—"প্রভু একি ব্যাপার! এখানে উৎসব করিতেছ, ঘরে যে প্রসাদ রহিয়াছে!" প্রভু উত্তর করিলেন—"দিনে এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া, রাত্রিতে তোমার ঘরে প্রসাদ গ্রহণ করিব। আর জান কি?—

> গোপ জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
> বড় সুখ পাই এ পুলিন ভোজন রঙ্গে॥

আমি নিজে গোপ জাতীয়, আমার সঙ্গে যাহাদিগকে দেখিতেছ ইহারাও গোপ, পুলিন ভোজনে আমার বড় সুখ হয়।" এই বলিয়া রাঘব পণ্ডিতের সম্মুখেও দুইটী পাত্র স্থাপন করিলেন। যখন পরিবেশন শেষ হইল, তখন নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর

ধ্যান করিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দের আকর্ষণে দয়াল ঠাকুর তথায় প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইলেন। তখন দুই ভাই মিলিয়া প্রতি ভক্তের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেকের চিপিটক দেখিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেকের পাত্র হইতে এক এক গ্রাস করিয়া তুলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক মহাপ্রভুর মুখে তুলিয়া দিতেছেন, মহাপ্রভুও সঙ্গে সঙ্গে আর এক গ্রাস লইয়া নিত্যানন্দের মুখে উঠাইয়া দিতেছেন, এই ভাবে উভয়েই সকল স্থান ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বৈষ্ণবগণ সানন্দচিত্তে এই রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। অথচ এ লীলা সকলের নয়নগোচর হয় নাই, কোন কোন ভাগ্যবান্ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন মাত্র।

সকল স্থান ঘুরিয়া প্রভুদ্বয় নিজেদের আসনে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে চারিটী ভোজ্যদ্রব্যপূর্ণ পাত্র স্থাপিত হইল. তাঁহারা নিজেরা সেবা আরম্ভ করিলেন এবং অপর সকলকে 'হরি-ধ্বনি' দিয়া বসিবার অনুমতি দিলেন। আজিকার এই অভাবনীয় ব্যাপার সকলের চিত্তেই পুলিন-ভোজনের স্মৃতি জাগাইয়া দিল। কোন্ এক স্মরণাতীত যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটে গোপ-বালকগণ সহ যে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, আজ বুঝি গঙ্গাতটে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ সেই লীলারই পুনরাভিনয় করিতেছেন, এই ভাব সকলের চিত্তেই দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। সকলেই আজ আনন্দে বিভোর, সকলেই আজ উল্লাসে মাতোয়ারা। ঘন ঘন হরিধ্বনি উঠিতেছে, সেই ধ্বনি আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া—কোন্ সুদূর প্রান্তে ভক্তির হিল্লোল লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কে জানে? প্রভুদ্বয় নিজেদেরই প্রকটিত লীলা সন্দর্শনে নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।—রঘুনাথ ধন্য যে আজ তাঁহার দণ্ড উপলক্ষ্য করিয়াই এই আনন্দ-লীলার সমাবেশ ঘটিয়াছে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রঘু-নাথকে আপনাদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ অর্পণ করি-লেন—রঘুনাথ আপনা হারাইলেন। এইভাবে সে দিনের আনন্দ-উৎসব শেষ হইল। এই উৎসব গৌরমণ্ডলে "চিড়াদধি মহোৎসব" নামে খ্যাত।

দিন শেষ হইল, রাত্রি আসিল। নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে রাঘব পণ্ডিতের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সকল ভক্ত নাচিতে লাগিলেন, অবশেষে প্রভুপাদ স্বয়ং নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নর্ত্তন-ভঙ্গীতে প্রেম উথলিয়া উঠিল, ভক্তগণ-মধ্যে মহাভাবের উদয় হইল। স্বয়ং মহাপ্রভু সক-লের অগোচরে নিত্যানন্দের নৃত্য দেখিতে লাগি-লেন, নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শনলাভ ঘটিল না।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রভু আছেন কোন্ সুদূর উড়িষ্যার প্রান্তদেশে, আর কীর্ত্তন-উৎসব হইতেছে বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লীতে, হঠাৎ সেখানে এই অসময়ে তাঁহার আগমন কি সম্ভব? তাঁহার চিড়াদধি মহোৎসবে যোগদান, রাঘব-মন্দিরে নিত্যানন্দের নৃত্য সন্দর্শন, এ সমস্তই যেন হেঁয়ালী! ইহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবানে সমস্তই সম্ভব। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা, যাঁহার ইচ্ছাতেই এই বিশ্বের উদ্ভব-বিনাশ, তাঁহার ইচ্ছামত তিনি যে কোন স্থানে প্রকট হইতে পারেন; এ কথা স্বীকার না করিলে যে তাঁহার শক্তির অনন্ততায় ব্যাঘাত ঘটে, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ব্যাহত হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি একস্থানে অবস্থিতি করিয়াও বহুস্থানে দর্শন দিতে পারেন। যে ঠাকুর রাসমণ্ডলীতে গোপীদের সংখ্যানুযায়ী আত্মমূর্ত্তির বিকাশ ঘটাইয়া আনন্দ-লীলার অপূর্ব্বতা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই

ঠাকুরই যে আজ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া নবরঙ্গের অভিনয় করিতেছেন, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। যাঁহারা সাধন-ভজন করিয়া, যোগ-যাগ-তপস্যা করিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষ নামে খ্যাত, তাঁহারাও যোগবলে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া এক কালে বহুস্থানে একই মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন, এই রহস্যের কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন সন্দেহ নাই। আর যিনি স্বয়ং যোগেশ্বর, তাঁহাতে এই সামান্য বিভূতির প্রকাশ কি অসম্ভব? এই বিশ্বই যে তাঁর বিভূতি! শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্ম বিভূতির কথা ব র্না করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

তবু যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার বলিতে কুণ্ঠিত, অথবা শ্রীভগবান্ই যে শ্রীগৌরাঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষলীলা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা যাঁহাদের অন্তরে এখনও স্থান পায় নাই, তাঁহাদিগকে এ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। একটু ধীর স্থিরভাবে মহাপ্রভুর অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে মানুষে এ সমস্তের সমাবেশ আদৌ সম্ভব কি না! আর যদি একবার গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে এই সামান্য বিভূতি—একস্থানে অবস্থান করিয়া একই সময়ে বহুস্থানে আত্মপ্রকাশরূপ বিভূতি—শ্রীভগবানের অন্যান্য বিভূতির তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইবে।

যাহা হউক, মহাপ্রভু যে কীর্ত্তনোৎসবে মাঝে মাঝে ভক্তমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন, প্রত্যক্ষভাবে ভক্তদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, তাহা তিনি স্বয়ং শ্রীমুখেই বলিয়া ছিলেন, অতএব এ সমস্ত পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ব্যাপারে অবিশ্বাসের স্থান কোথায়? শ্রীনিত্যানন্দকে যখন মহাপ্রভু নাম-প্রেম বিলাইবার জন্য গৌড়দেশে প্রেরণ করেন, সেই সময় তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে নিত্যানন্দের নৃত্যের সময় তিনি সকলের অলক্ষিতে অবস্থান করিয়া তাঁহার নৃত্য দর্শন করিবেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ চৈতন্য চরিতামৃত হইতে আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধার করিয়া দিতেছি। যথা—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করহ প্রকাশে॥
* *
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥

আমরা জানি, নদীয়ায় অবস্থানকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গসহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনে রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। এখন তো প্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন, নদীয়ায় আর তিনি ফিরিবেন না,—আর তেমন করিয়া নাচিবেন না—কেমন করিয়া শ্রীবাস এখন সেই প্রভুবিহীন অঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দ করিবেন, এই তাঁহার বিষম দুঃখ। অন্তর্য্যামী প্রভু শ্রীবাসের এই মনোব্যথা জানিতে পারিয়া নীলাচল হইতে বিদায় লওয়ার কালে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব॥

অতএব দুঃখ করিও না শ্রীবাস, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে তোমাদের সঙ্গ করিব, তোমরা সর্ব্বদাই আমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিবে। আর এক কথা, মা আমার জনমদুঃখিনী, সাত সাতটী কন্যার বিয়োগ-সংঘটনের পর তাঁহার বিশ্বরূপের ন্যায় পুত্র-রত্ন লাভ হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্বের ব্যথা সব ভুলিয়া

ছিলেন, কিন্তু তিনিও যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন, তখন তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল,—সে সময় আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলাম—মা, দাদা চলিয়া গেলেন তাহাতে কি? আমি আজীবন তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সেবা করিব। কিন্তু শ্রীবাস! আমি আমার সে কথা রাখিতে পারি নাই, বিধির নির্ব্বন্ধে আমাকেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তবুও আমি যতটুকু পারি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেছি, আমি প্রতি দিনই একবার করিয়া মাকে দেখা দিয়া আসি, মা তাহা সত্য কি মিথ্যা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পুত্র-বিরহ-কাতর মায়ের এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, অতএব তুমি এ সমস্ত কথা বলিয়া—তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে যে তাঁহার নিমাই তাঁহার কোল ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। —এক দিনের একটী ঘটনা বলিতেছি শুন। ইতিমধ্যে এক দিন মা আমার পরিপাটী সহকারে রন্ধন করিয়া যোড়ষোপচারে ঠাকুর ভোগ দিতে বসিয়াছেন, এমন সময় আমার চিন্তা তাঁহার চিত্তে প্রবলবেগে জাগিয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—এই সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন আমার নিমাইর খুবই প্রিয় ছিল,—হা নিমাই তুমি কোথা? —মায়ের আকুল ক্রন্দন আমার বুকে বাজিল, আমি তথায় উপস্থিত হইয়া মায়ের সম্মুখস্থ যাবতীয় প্রসাদ ভক্ষণ করিলাম। চোখের জলে মায়ের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই, —তার পর হঠাৎ চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখেন যে পাত্র শূন্য! তিনি ইহার মর্ম্মরহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন স্বয়ং বালগোপাল আবির্ভূত হইয়া কি এই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া গেলেন, অথবা অস্পৃশ্য জন্তু আসিয়া সমস্ত উদরসাৎ করিয়া গেল! তাঁহার মনে বিষম সন্দেহ হওয়াতে পুনরপি সেই স্থান নিকাইয়া নূতন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন বাড়িয়া ঠাকুর ভোগ লাগাইলেন। মা আমার উপস্থিতিতে বিশ্বাস করিতে পারেন না, আমি যে তাঁহার আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার কোলের কাছে উপস্থিত হই, তাহা তিনি ঠিক বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না, ধরিয়াও ধরিতে পারেন না। তুমি মাকে এ সব কথা বুঝাইয়া বলিও—বলিও যে তোমার নিমাই প্রতি দিনই তোমার কাছে আসে, অতএব দুঃখ করিও না মা!—আমি যে ঘটনাটীর উল্লেখ করিলাম শ্রীবাস, সেটী অতি অল্প দিন হইল ঘটিয়াছে, মায়ের আমার এখনও সে কথা স্পষ্ট স্মরণ রহিয়াছে, তুমি মাকে ৺ বিজয়া দশমীর কথা উল্লেখ করিয়া বিশেষ ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে, অতএব তাঁহাকে সব বুঝাইয়া বলিও, আর নিজেরাও বুঝিয়া রাখিও যে আমি সর্ব্বত্র সমভাবে তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি।"

এ স্থলে মহাপ্রভুর উক্তির অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যে কীর্ত্তন-নর্ত্তনে, মহোৎসব প্রভৃতিতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন—তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট স্থূল বাক্যেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতএব এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনায় অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। যাঁহারা -মহাপ্রভুর জীবনের এবম্বিধ চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহাদের "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" অথবা "শ্রীশ্রী অমিয় নিমাই চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।—

* *

কীর্ত্তন শেষ হইলে নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্ডিতের আহ্বানে ভক্তগণসহ ভোজনে বসিলেন,

নিত্যানন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাপ্রভুর আসনও দেওয়া হইয়াছিল, তিনিও তখন তথায় আসিয়া বসিলেন। আনন্দে রাঘবের অশ্রু ঝরিতে লাগিল, বার বার পুলক-কম্প হইতে লাগিল। সেই আনন্দারূঢ়াবস্থাতেই তিনি একলা সকলের পরিবেশন করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ অমৃতোপম প্রসাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন—"আমরা তো বসিলাম, কিন্তু রঘুনাথ যে বসেন নাই, তাঁহাকে বসিতে দাও,"—ইহার উত্তরে রাঘব পণ্ডিত বলিলেন যে সব শেষে উনি বসিবেন। এ কথার মর্ম্ম রহস্য তখন কেহই উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু যখন রাঘব পণ্ডিত প্রভুদ্বয়ের ভুক্তাবশিষ্ট পাত্র রঘুর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন, তখন ভোজনে বিলম্ব জনিত রঘুর সৌভাগ্যে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর রঘুর যে তখন মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। রাঘব পণ্ডিত রঘুকে উদ্দেশ্য করিয়া তখন—

> কহিল চৈতন্য গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
> তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥
> ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে সদা অবস্থান।
> কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্॥
> সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু, সদা সর্ব্বত্র বাস।
> ইহাতে সংশয় যার সেই হয় নাশ।

যাহা হউক রঘুনাথ মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলেন এবং ভক্তপ্রবরের কৃপায় যে তাঁহার সংসার বন্ধন মোচনোন্মুখ হইল—তাহা স্মরণ করিয়া বার বার প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইতে থাকিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নানান্তে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজগণসহ সেই বৃক্ষ মূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়—

> রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
> রাঘব পণ্ডিত দ্বারে কৈল নিবেদন॥

কি নিবেদন করিলেন? না—"ও গো প্রভু! আমি পামর, আমি হীন, আমি জীবাধম, তথাপি শ্রীচৈতন্যের চরণ পাইবার ইচ্ছা বার বার অন্তরে জাগিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে, আমি তো এই ইচ্ছাকে কিছুতেই দমাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। জানি, বামনের চন্দ্র ধরিবার ন্যায় আমার এ আশা সফল হইবার নয়, তথাপি একই উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হইয়াও প্রয়াস পাইয়া আসিতেছি। গৃহ ত্যাগের আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, বহুবার পলাইয়াছিও; কিন্তু প্রতি বারই দুরন্ত বন্ধন আসিয়া আমাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, প্রতি বারই আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার কৃপা না হইলে চৈতন্যকে পাওয়া যায় না। অতএব প্রভু, তুমি আমায় কৃপা কর, তোমার কৃপা পাইলে এ হেন অধম আমিও তাঁহার চরণ পাইতে পারি। অযোগ্য আমি, অপাত্র আমি, তাই এ কথা তোমার সকাশে নিবেদন করিতেও ভয় হয়, প্রভু দয়া করিয়া তুমি আমায় চৈতন্যপ্রাপ্তির বিধান করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণ আমার মস্তকে স্থাপন কর, আর আশীর্ব্বাদ কর যেন নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারি।"

রঘুনাথের আজ কি নিষ্কিঞ্চন ভাব! অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনি, মুগ্ধ জীবের অভীপ্সীত কাম কাঞ্চন তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া লুটাইতেছে, তবু তিনি সে সকলের দিকে দৃকপাত না করিয়া—দীন হীন কাঙ্গালের মত আজ নিতাইয়ের কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন। বাস্তবিকই যত দিন পর্য্যন্ত জীবের অভিমান বিসর্জ্জিত না হয়, নিজেকে যত দিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন বলিয়া অনুভূতি না আসে, তত দিন মহতের কৃপা পাওয়া যায় না, মহতের আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায় না। তাই মহতের কৃপার অধিকারী রঘুর আজ তদনুকূল

সমস্ত গুণরাজির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, রঘুর কৃপা প্রাপ্তি এখন অবশ্যম্ভাবী।

নিত্যানন্দ রঘুনাথের আর্ত্তি শুনিয়া কৃপাবিষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন, হাসিয়া ভক্তগণকে বলিলেন—"দেখ, ব্যাকুলতার তীব্র জ্বালা লইয়া যে রঘুনাথ আজ চৈতন্য লাভের আশায় আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে, সে রঘুনাথ সামান্য ব্যক্তি নহে। সাধারণ জীব যে সুখের কল্পনাও করিতে পারে না, এই রঘুনাথ সেই সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অবহেলে পদ দলিত করিয়া—চৈতন্য প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। চৈতন্যের কৃপা না হইলে কি কাহারও এবম্বিধ মতি হয়? অথবা ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি?

> কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
> ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

অতএব ভক্তগণ! তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন রঘুনাথ অচিরে চৈতন্য চরণ প্রাপ্ত হয়েন।"

এই বলিয়া প্রভু রঘুনাথকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে আপনার শ্রীপাদ স্পর্শ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

রঘুনাথ!

> তুমি যে করাইলে এই পুলিন ভোজন।
> তোমা কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন॥
> কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
> নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈল প্রসাদ ভোজন॥
> তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল আপনে।
> ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
> স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
> অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবে চরণে॥
> নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
> অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণে॥

নিত্যানন্দের এই আশীর্ব্বাদ পাইয়া রঘুনাথ তত্রত্য সকল ভক্তের চরণ বন্দনা করিলেন, সকলেই রঘুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিভৃতে রাঘব পণ্ডিতের সহিত যুক্তি করিয়া রঘুনাথ প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে প্রভুর সেবার্থে ১০০ শত মুদ্রা ও সাত তোলা সোণা দিয়া বলিলেন—প্রভুর সমীপে যেন এখন একথা জ্ঞাপন করা না হয়। অতঃপর রাঘব পণ্ডিত রঘুকে স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া ঠাকুর দর্শন করাইলেন, মালা চন্দন দিলেন এবং পথে খাইবার জন্য বিস্তর প্রসাদ প্রদান করিলেন। রঘু এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত, হঠাৎ তাঁহার একটী সাধু সংকল্প মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি পুনরায় রাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন—

> প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
> পূজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ॥
> বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ দয়।
> মুদ্রা দেহ বিচারি যার যত যোগ্য হয়॥

রঘুর এই কথায় রাঘব পণ্ডিত হিসাব করিয়া যে পরিমাণ অর্থের নির্দ্ধারণ করিলেন, রঘু সানন্দ-চিত্তে সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য রাঘবের হস্তে তাহাই গচ্ছিত রাখিলেন। অবশেষে নিত্যানন্দ-কৃপাপ্রাপ্ত রঘুনাথ— প্রভুর প্রসাদপ্রাপ্তি-জনিত অতুল আনন্দোফুল্ল রঘুনাথ, রাঘব পণ্ডিতের স্বকীয় প্রণামী স্বরূপ এক শত মুদ্রা ও দুই তোলা সোণা অতি বিনয় সহকারে তাঁহার অগ্রে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

—×—

উদ্বোধন-মন্ত্র

হাল ছেড়ে দিতে নাই, এরই মাঝে তোমাকে struggle কর্‌তে হবে এবং সেই struggleএই সত্য দৃষ্টি তোমার বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। চিত্তকে সঙ্কীর্ণ চিন্তার গণ্ডী হতে মুক্তি দাও—তাহলেই দেখ্‌বে, যারা তোমার বিরোধী—তারাও তোমারই বিরাট্ সত্তার এক দেশ মাত্র। এইটুকু দেখেছি ভাই, চিত্তকে একটা **ভাবে** ভাবিত না রাখ্‌লে কর্ম্ম করা অসম্ভব। ভাব বল্‌তে আমি বুঝি—emotion—উপনিষদের ঋষি যাকে বলেছেন প্রাণ। আমাদের দেশে তথাকথিত প্রাণের উপাসনা খুবই হয়; ভাবুকতারও অন্ত নাই, কিন্তু দেখ, কোনোটাই বলিষ্ঠ চিন্তার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে স্থায়ী হয় না। আমরা শামুকের খোল—একটু পেলেই বুঝি হয়ে গেছে। জগতে বড় আধার বড় বেশী সৃষ্টি হয় না। যে দুটী চারটী সৃষ্টি হয়, তাঁদের সমস্তটা জীবনই একটা জ্বালা—একটা দ্বন্দ্ব। মহা প্রাণ ক্ষুদ্রপ্রাণকে গ্রাস কর্‌তে চায়। ক্ষুদ্র প্রাণেরাও যথাসাধ্য resist করে—এমনি ক'রে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। চিন্তা করে দেখ, প্রাণের পুষ্টির এই রীতি সর্ব্বত্র; স্থূলেও—চিন্তা-জগতেও। ছোট ছোট প্রাণের বিভিন্নমুখী খেলা—interestএর নানা রকম clash—এই হতে অধর্ম্মের উৎপত্তি। এই সমস্ত গুলিকে synthesise কর্‌বার জন্যই মাঝে মাঝে ভগবানের মহাপ্রাণ শক্তি যুগাবতার রূপে আবির্ভূত হয়। তখনই জগৎ জুড়ে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ এক দিক দিয়ে যেমন ধ্বংস করে, তেমনি অপর দিক দিয়ে সৃষ্টিও করে। গীতায় এই দুটী রূপই দেখ্‌তে পাচ্ছ না? শ্রীকৃষ্ণ উপদেষ্টারূপে great harmoniser. তাঁর gospelই হচ্ছে—gospel of peace, gospel of love, gospel of harmony! আবার সেই তিনি একাদশ অধ্যায়ে নিজকে প্রকট কর্‌ছেন, "কালোঽস্মি লোক-ক্ষয় কৃৎ" ব'লে। তাঁর ঐ বিশ্বরূপ যে বিভিন্নমুখী ক্ষুদ্র প্রাণগুলিকে নির্ম্মমভাবে চর্ব্বণ করে গ্রাস কর্‌ছে, তা কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? কিন্তু এতেই আবার মহাপ্রাণের পুষ্টি হচ্ছে। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সহস্র সহস্র বৎসর ধরে শান্তিতে তোমরা আধ্যাত্মিক জগতে কত অদ্ভুত আবিষ্কারই করে চলছিলে।

এই যে মহাপ্রাণ বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র প্রাণকে গ্রাস করে, এর মাঝে একটা করুণাও আছে—বেদনাও আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ভারতবর্ষের বিভিন্নমুখী বিক্ষিপ্ত প্রাণশক্তিকে এমনি করে synthesise কর্‌লেন, তখন তাঁকে কি বিপুল বেদনা অনুভব কর্‌তে হয়েছে, বুঝ্‌তে পার? এই বেদনার অতি আধুনিক রূপ দেখ্‌তে পাবে—বিবেকানন্দের জীবনে। ওই আর এক মহা প্রাণ—and he crushed many little things to assimilate them. যে যত বড় হবে, তাকে তত বাধার সঙ্গে লড়্‌তে হবে, তত ব্যথা তাকে পেতে হবে। এক দিক দিয়ে সে হবে নির্ম্মম, আর এক দিক দিয়ে সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। ঠিক যেন বুদ্ধদেবের মত!

ব্যথা পাও, বিরুদ্ধতা অনুভব কর বলে দুঃখ করো না। তোমার প্রাণ যে বড় এ তারই পরিচয়। জীবনে দুটী জিনিষ নিয়ে এস—

extensity আর intensity. চিত্তকে উদার কর এবং গম্ভীর কর। Bravely think কর, আবার deeply feel কর। এই দুটীতে প্রাণ শক্তির স্ফুরণ হবে—তোমার horizon of vision widened হবে—তখন দেখ্‌বে, যারা বাধা দিচ্ছে, তারাও তোমার help কর্‌ছে—তোমার vast scheme এর মাঝে তারাও একটী জায়গা দখল করে আছে। And they are resisting, just to submit. যারা বাধা দিচ্ছে, তোমার বিপুল প্রাণের রসে যে দিন নিঃশব্দে তাদের জারিত করে ফেল্‌তে পার্‌বে, সেদিন বুঝ্‌বে, ওই বাধাটুকুরও সার্থকতা ছিল—ওটা প্রাণেরই সংক্রমণের একটা রূপ!

এই কথাটী মনে রেখো—তোমার ক্রিয়াকই অমৃত! অতএব বাহিরের এই হট্টগোলকে মনের এক চতুর্থাংশের বেশী স্থান দিও না। বার বার নিজের ভিতর ডুবে যেতে চেষ্টা কর। 'সমাধি পূর্ব্বক সমাধি' বলে পতঞ্জলিতে একটা কথা আছে। তার অর্থ কি জান? চিত্তকে সর্ব্বদা উর্দ্ধমুখীন করে রাখা—সমাধিভূমিতেই রাখা, আর মাঝে মাঝে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। পঞ্চদশীতেও আছে—সমাধি অনুষ্ঠানের কথা। সবিকল্পক সমাধি অনুষ্ঠানেই ক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। সুতরাং মনটাকে সর্ব্বদা তন্ময় অবস্থাতেই রাখ্‌তে হবে। খুব ঘুম পেলে পরেও বাধ্য হয়ে জেগে থাক্‌তে হলে শরীরের যেমন অবস্থা হয়—ঘুমের দিকেও ঝোঁকটা থাকে পনের আনা—তেমনি অন্তর্ম্মুখীনতার দিকে পনের আনা ঝোঁক রেখে এক আনা দিয়ে কাজ কর, তাহলে সে কাজে তৃপ্তি পাবে।

নিজে তৃপ্ত হলে অপরকেও তৃপ্ত করা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মাঝে অতৃপ্তি থাক্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপরকে তোমার দলে টানবার জন্যে চেষ্টা কর্‌তে পার বটে, কিন্তু কাউকে বাঁধতে পার্‌বে না। একমাত্র প্রাণই প্রাণকে বশ করে। মহাপ্রাণ হও—মহাতৃপ্তিতে পূর্ণ হও—অপরের প্রাণকেও তুমি বশীভূত কর্‌তে পার্‌বে। যদিই বা তারা বিরোধ করে, তো সে বিরোধ সাময়িক—they must submit to your magnetic attraction.

Never mind, you are bound to be victorious! Struggle on! Never seek enjoyment—even the enjoyment of bliss! You are born to fight and you must fight on against all odds!

অভিভাষণ

[উত্তর বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্ত সম্মিলনীর ৭ম বার্ষিক অধিবেশনে বিভাগীয় সদস্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় দ্বারা পঠিত]

প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃবৃন্দ,

আজ এই শুভ মুহূর্তে, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণস্পৃষ্ট এই পুণ্য ভূমিতে আমি আপনাদের সাদরে আহ্বান করিতেছি। উত্তর বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্ত সম্মিলনীর এই বর্ত্তমান অধিবেশন শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শুভ অধিষ্ঠানে আজ আনন্দের লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া পূর্ণতা লইয়া ফুটিয়া উঠিল, দীর্ঘ ষষ্ঠ বর্ষ পরে আমাদের বিভাগীয় সম্মিলনীর ইতিহাসে ইহা একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। আসুন, আজ এই সুশুভক্ষণে শ্রীগুরুনারায়ণের রাতুল চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমরা রিক্ত হই, আমাদের আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখ-শোক-স্মৃতিরাশি বিস্মৃতির অতল সলিলে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হই, অনিত্যের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া আমরা নিত্য মিলনের অমৃতময় আস্বাদ অনুভব করি।

সার্ব্বভৌম ভক্তসম্মিলনীতে যাঁহারা একবারও যোগ দিবার শুভ অবসর লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিয়াছেন সম্মিলনীতে আনন্দের ঘন মূর্ত্তি প্রকটিত হয় কি না! শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে যাঁহারা একবারও সম্মিলনীর উদ্দেশ্য বিবৃতি শ্রবণ করিবার মহা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন ইহার কোন সার্থকতা আছে কি না! বর্ষপরে একটী করিয়া সম্মিলনী, আরাধ্য দেবতার প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানে আপনার জনদের লইয়া মহামিলন, বন্ধনহারা আনন্দের উজ্জ্বলতম অনুভূতি,— এ যেন সংসার-মরুচারী তৃষিতকণ্ঠ পথিকের ক্লান্তিহারী মরুদ্যান, নিদাঘদগ্ধ শ্রান্তপান্থের শ্রান্তিহারী পান্থ নিবাস!

সাধক-কবি গাহিয়াছেন—"সংসারপথ শঙ্কট অতি কণ্টকময় হে।" এই শঙ্কটময় কণ্টকপূর্ণ ধূ ধূ মরুর পরপারে যাইতে হইলে, শান্তি ও আনন্দের স্নিগ্ধ পরশ পাইতে হইলে জীবন-পথের মহা বিশ্রাম ক্ষেত্র স্বরূপ এই মরুদ্যানের—পান্থ নিবাসের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহা একমাত্র শান্তিপ্রয়াসী—আনন্দপ্রয়াসীর নিকটই সুপরিস্ফুট! সংসার-মরুযাত্রীদের মধ্যে যাহারা এই আনন্দ-মিলনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া চঞ্চল চরণে মায়ার পানেই প্রধাবিত হয়, মরীচীকা ভ্রান্ত মৃগের মত অৰ্দ্ধপথেই তাহাদের গতিরোধ অবশ্যম্ভাবী!

আনন্দই জীবনের কাম্য, আনন্দই জীবনের সাধ্য; এই আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা; যে উদ্দেশ্য সাধন ব্যপদেশে এই সম্মিলনীর সূত্রপাত, প্রধানতঃ তাহা তিনটী স্তরে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম আদর্শ গৃহস্থজীবন গঠন, দ্বিতীয় সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় ভাব-বিনিময়। ঠাকুর চান আমরা আদর্শ গৃহস্থ হই, ঠাকুর চান আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হই, ঠাকুর চান আমাদের মাঝে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান চলুক, এমনি করিয়া মর্ত্ত্যেই আমরা অমৃত অস্বাদনের অধিকারী হই।

বাস্তবিকই বর্ত্তমানে আমাদের গৃহস্থ জীবন অতিমাত্রায় পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাহা শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির আগুন বুকে করিয়াই আমাদের মাঝে নামিয়া আসিয়াছে। একদিন এই গৃহস্থের অঙ্গন আলোকিত করিয়াই ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকী আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, এই গৃহস্থের অঙ্গনেই একদিন বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যতদিন ভারতের গৃহস্থ সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, ততদিন ভারতের গৃহে আদর্শ পুরুষের—আদর্শ নারীর অভাব ঘটে নাই, যে দিন হইতে সে লক্ষ্য হারা হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার বুকে অমানিশার আঁধার নামিয়া আসিয়াছে। এই অমানিশার ঘোর কাটাইয়া ভারতাকাশে স্নিগ্ধ কৌমুদীর বিকাশ করিতে হইলে আবার আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিদের আদর্শ ধরিয়া চলিতে হইবে, তাঁহারা হৃদয়ে যে জ্ঞানের বহ্নি জ্বালাইয়া সংসার-মোহ দূর করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান আবার আমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে, তাঁহারা যে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া সাংসারাসক্তি দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই আনন্দকে আবার জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

জীবনকে করিতে হইবে মধুময়, জীবনকে করিতে হইবে আনন্দময়; এই জীবনের সংস্পর্শে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকেও ভাসাইতে হইবে আনন্দের প্লাবনে। এই প্রাচীন আদর্শকে দেশের মাঝে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে চাই কতকগুলি আত্মোৎসৃষ্ট প্রাণের মহা মিলন, যে মিলনে চির সুপ্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিবে, যে মিলনে দেশের মাঝে মহাশক্তির জাগরণ হইবে। যত দিন দেবতারা ব্যষ্টি শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দানব দলনে সচেষ্ট ছিলেন, ততদিন তাঁহারা তাহাদেরই হস্তে পরাজিত হইয়াছেন—লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু যখন তাঁহারা ব্যষ্টিত্বের অভিমান ছাড়িয়া সমষ্টিতে আত্ম-প্রাণ আহুতি দিলেন—বহু ছাড়িয়া এক হইলেন, তখনই তাঁহাদের মাঝে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটিল—তখনই তাঁহারা দৈত্য দমনে সমর্থ হইলেন। তেমনি করিয়া আমাদের মাঝেও আজ যে নৈতিক-আধ্যাত্মিক অবনতির প্রচণ্ড দৈত্যকুল নামিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে অপসৃত করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, দানবের সিংহাসনে দেবতার আসন রচনা করিতে হইলে এই সঙ্ঘ-শক্তিরই উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদানে এক অখণ্ড মহাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই সম্মিলনীই আমাদের সেই ভাব বিনিময়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র, সঙ্ঘ-শক্তি উদ্বোধনের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতেই ভাব ও শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িবে ব্যষ্টি সঙ্ঘে, ব্যষ্টি জীবনে।

আজ বর্ষপরে আমাদের সেই মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছে, বর্ষপরে আবার পরস্পর মিলনানন্দের দিব্য অনুভূতি লাভের অবসর মিলিয়াছে। এই মিলন সামাজিক মিলন নয়, রাষ্ট্রিক মিলন নয়, ইহা আমাদের প্রাণের মিলন, আনন্দের মিলন। এখানে আভিজাত্যের গর্ব্ব নাই, পণ্ডিত-মূর্খের ব্যবধান নাই, ধনী নির্ধনের পার্থক্য নাই। এখানে সব এক। এক আমাদের পন্থা, এক আমাদের লক্ষ্য—এক আমাদের সাধনা, এক আমাদের সাধ্য। আসুন আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণতি জানাইয়া আমরা তাঁহারই অভীপ্সীত আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে দৃঢ় সঙ্কল্প হই, সঙ্ঘ-শক্তির প্রতিষ্ঠা কল্পে অবহিত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদানে মহাভাবের আবির্ভাব ঘটাই। শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরে বর্ষিত হউক,

তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা আমাদের পথের বাধা অপসারিত করুক, তাঁহারই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহারই পন্থায় চলিয়া আমরা আবার ঋষিযুগের সূচনা করি। ওঁ জয়গুরু।

—×—

যবে আসো

(আমার) সকল দুয়ার রুদ্ধ করিয়া
তুমি যবে ঘরে আস—
খুলে যায় মোর গোপন-হৃদয়
বুঝি তুমি ভালবাস।

(আমার) টুটে যায় যত মোহের বাঁধন
সব মুখে তুমি হাস—
যে দিকে তখন ফিরাই নয়ন
মনে হয় কাছে আস।

(আমার) রহে না জগতে অপূরণ কিছু
সব দুখ তুমি নাশো—
পলকের মাঝে কেটে যায় যেন
দীরঘ-বরষ-মাসও!

(শুনি) তোমার বারতা সকল ভুবনে
ঘোষে জড় বাতাসও—
ক্ষণেকে পুলকে লীন হয় মন
তুমি যবে কাছে আসো।

—(*)—

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুর্গাপুর চটী হতে বের হয়ে ক্রমশঃ উৎরাই পথে পৌণে দুই মাইল এসে **ব্যুঙ্গ চটী** পেলাম।

ব্যুঙ্গ চটী
১৮ মাইল

যাঁরা কেদারনাথে যান; তাঁদের পক্ষে পথটি বেশ চড়াই, আমরা উৎরাই করে এসেছি। আমরা আসার সময় প্রথমেই উপরে ধর্ম্মশালা দেখ্‌তে পেয়ে সেখানে আড্ডা নিয়েছিলাম। সেখানে জলের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় আধ মাইল নীচে এসে বেশ ভাল জল সংযুক্ত একটী চটী পেলাম। স্থানটি বেশ ভাল, থাকবারও বেশ ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু কি জানি কেন আজই গুপ্তকাশী যাওয়ার জন্য প্রাণটি আকুল হওয়ায় এখানে আর বিশ্রাম না করে রওনা হলাম। এ পথে বের হয়ে আলু ভিন্ন অন্য তরি-তরকারীর মুখ পর্য্যন্ত দেখি নি। এ চটীতে একটি বড় পাকা শুকনো কুমড়া পাওয়ায় সাত আনা দিয়ে তাকে কিনে (প্রায় দশ সের ওজন হবে) ঘাড়ে করে নিয়ে রওনা হলাম। একে ত শরীর নিয়ে চলা দুষ্কর, তার উপর আবার এমনি কষ্ট করেও কুমড়ো খাবার সখ্ হয়? পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে, এক খেঁয়ে খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছিল—তাই প্রাণ আই ঢাই কচ্ছিল কিছু খাবার জন্য। এখান হতে গুপ্ত-কাশী ৪ মাইল। আজ সেখানে গিয়েই থাকবো ঠিক হল। এই ৪ মাইল পথ কুমড়ো ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এলেও কিন্তু কয়েক দিনের আশায় না রেখে সঙ্গীয় সকলকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম।

. ব্যুঙ্গ চটীর অপর নাম **ভিরুঙ্গ চটী**। আমরা এখান হতে বের হয়ে ক্রমশঃ উৎরাই করে আধ মাইল এসে ঝরণার পারে একটি চটী পেলাম। আমরা প্রথমে যে চটীতে আড্ডা নিয়ে কুমড়ো কিনেছিলেম, সেখানে মাত্র দুটী চটী। কিন্তু সেখান হতেও এখানে চটী বেশী, তথা এখানে জলের খেলা অতি সুন্দর। জলের স্রোতে চক্র ঘুরিয়ে নানাপ্রকার কাঠের জিনিষ তৈরী কচ্ছে। এ চটী-টির নামও ব্যুঙ্গ চটী। এখানে ভগবতী দেবীর একটি মন্দির আছে, তাতে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আড্ডা নিয়ে থাকেন। এ স্থানের জলের খেলা অতি সুন্দর, অনেকটা রামবাড়া চটীর মত। দুর্গা-পুর হতে আস্‌তে ঝরণার জন্য তিন চারটি চটী উৎরাই করতে হয়েছে। এখান হতে এক মাইল

নারায়ণ চটী বা
ভেট চটী
২ মাইল

চড়াই ও এক মাইল সীধা চলে **নারায়ণ চটী** বা **ভেট চটী** পেলাম।

এখানে শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের বিশাল মন্দির, বীর-ভদ্রের মন্দির ও ৪।৫টী ছোট ছোট মন্দির, ৭।৮খানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরযুক্ত চটী, খাদ্যদ্রব্য তথা মিঠাই প্রভৃতির দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা বিদ্যমান। এই নারায়ণ চটী এক সময় বহু মন্দির-সুশোভিত একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। পাণ্ডাগণ বলেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যদেব এই স্থানে বদরীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে ৩৬০টী মন্দির নির্ম্মাণ করে-ছিলেন। অনেকগুলি ভাঙ্গা মন্দির এখনও বিদ্যমান থেকে পূর্ব্বের গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করছে। শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের মন্দিরের সম্মুখে একটি জয়স্তম্ভ বিদ্যমান। রাস্তার অপর পার্শ্বে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের

মন্দির তথা অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির বিদ্যমান। গুপ্তকাশীর মত এখানেও অলকানন্দা ও সরস্বতী নাম্নী দুটী ধারা গোমুখী ও গজমুখী হতে বের হয়ে তৃষিত লোককে অনবরত জলদান করছে। গোমুখী ও গজমুখী আকৃতি বিশিষ্ট নল দুটী পিতল নির্ম্মিত। এখানেও সঙ্কল্প করে স্নানাদি করে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করতে হয়। নিকটে বেশ কলা বাগান আছে। বৃকাসুর—যাকে ভস্মাসুর বলে, তিনি শিবের তপস্যা করে বর প্রার্থনা করেছিলেন

ভস্মাসুর

যে আমি যার মাথায় হাত দিব, সে যেন ভস্ম হয়ে যায়। এটী সেই স্থান। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ৬৩ অধ্যায়ে উক্ত বৃত্তান্ত উক্ত আছে। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্দের ৮৮ অধ্যায়েও উক্ত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এখান হতে মন্দাকিনী নদী পার হয়ে **কালীমঠে** যাওয়া যায়।

কালীমঠ

কালীমঠে অনেকগুলি দুর্গামন্দির বিদ্যমান। সেখানে ছাগ ও মহিষ বলি হয়ে থাকে। কালীমঠের নীচে কালী নাম্নী নদী প্রবাহিতা। রাজপুত অধিবাসীরা তাদের প্রথমা কন্যাকে এখানে দেবতার সেবায় উৎসর্গ করত। আজকাল প্রায় সে প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানে যেতে হলে এই নারায়ণ চটী হতে স্থানীয় লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

আমরা এখানেও না থেমে আবার চলতে লাগ্‌লাম, এক মাইল যাবার পর **নালা চটী** পেলাম। কেদারনাথ হতে এই চটী ২৩ মাইল। এখান হতে একটী পথ নীচের দিকে গিয়েছে —সেই পথে উখী মঠ হয়ে বদরীনাথ যেতে হয়। আমরা গুপ্তকাশী দেখি নাই, কাজেই আমরা এ স্থান হতে বদরীর পথে না যেয়ে হরিদ্বারের পথে যেয়ে

নালা চটী
১ মাইল

গুপ্তকাশী দেখে, পরে উখীমঠ হয়ে বদরীনাথ যাব। সামান্য ঘুরতে হবে। এখানে ললিতাদেবীর ও মহাদেবের মন্দির এবং ২।৩ খানা দোকানও আছে। নিকটেই গুপ্তকাশী বলে বোধ হয় এখানে লোক জন প্রায় থাকে না। আমরা এখানে না থেমে উপরের দিকে চড়াইয়ের পথে সামান্য সামান্য চাড়াই ও সীধা রাস্তা চলে এক মাইল আসার পর **গুপ্তকাশী** পেলাম। গুপ্তকাশী মন্দাকিনী গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের কোলে মন্দাকিনী হতে প্রায় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। ঠিক ঐরূপভাবে মন্দাকিনীর অপর পারে সম উচ্চে উখীমঠ অবস্থিত। গুপ্তকাশী হতে উখীমঠের দৃশ্য অতি সুন্দর তথা উখীমঠ হতেও গুপ্তকাশীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। দুটী স্থানই বিশেষ প্রসিদ্ধ তথা সহর বলে ঘোষিত। রাত্রিবেলা যখন চটীবালারা নিজের নিজের ঘরে আলো দেয় তথা যাত্রীগণ যখন পাক করতে থাকে, তখনকার দৃশ্য আরও মধুর—চিত্ত-মন —হরণকারী। আমরা দুই যায়গাতেই রাত্রিবাস করে দুই স্থানেরই দৃশ্য দেখে নিয়েছি। এ স্থানটি কেদারনাথ হতে ২৪ মাইল, রুদ্র প্রয়াগ হতেও ২৪ মাইল—অর্থাৎ রুদ্র প্রয়াগ ও কেদারনাথের ঠিক মাঝে অবস্থিত। এখানে পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস আছে। টেলিগ্রাফ আফিস এ পথে এখানেই শেষ - এর পর আর উপরে টেলিগ্রাফ আফিস নাই। কেবলমাত্র আজকাল, যতদিন যাত্রী চলে তথা যতদিন কেদারনাথের মন্দির খোলা থাকে, ততদিনের জন্য একটী টেম্পোরারী পোষ্টাফিস কেদারনাথে খোলা হয়ে থাকে। সহরের বাইরে একদম খোলাস্থানে পোষ্টাফিস তথা টেলিগ্রাফ আফিসটী অতি সুন্দর। পোষ্টাফিসের বাঙ্গলাটি দেখে সেখানে থাক্‌বার ইচ্ছা হয়।

গুপ্তকাশী
১ মাইল

বাবা কালী কম্বলীবালার ধর্ম্মশালাতে সদাব্রত দিবার ব্যবস্থা আছে, আমরা সদাব্রত নিলাম। এ ছাড়া কয়েকটি বেশ ভাল ভাল দোকান আছে, তন্মধ্যে কেদার সিং নামীয় ভদ্র লোকের দোকানটি বড়, ভাল এবং জিনিষাদি সবই প্রায় দরকার অনুযায়ী পাওয়া যায়; দামও নির্দ্দিষ্ট। লোকটি ভাল, আমরা তার দোকান হতে হারিকেনের চিমনী একটি ।৶৴ আনা, সান লাইট সাবান দুই জোড়া ৪ খান ১৲ টাকা, নানা প্রকার মসলাদি, আচার, বড়মার গেঞ্জি প্রভৃতি কিনে নিলাম। যে সব জায়গা আমরা ঘুরে এসেছি, সে সব জায়গার তুলনায় এখানে জিনিষাদি একটু সস্তা বটে। এর দোকানে সর্ব্বপ্রকার কাপড়াদি, চাউল, ডাল আদি, ষ্টেশনারী জিনিষ, এমন কি জুতা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আজ সকাল বেলাই পার্ব্বতীয় পথ বার মাইল অতিক্রম করে এসেছি। দুধ দই মিলে, ।৵ আনা সের। কিন্তু এখানকার লোক গুলি কলিকাতার গোয়ালাদের বোধ হয় মাসতুত ভাই, তাদের চেয়েও বেশী জল মিশায়—যদিও এদেশে জল মিশাবার নিয়ম নাই। শুধু জলই মিশায় না, দুধ ঘন দেখাবার জন্য দুধে আরও যেন কি মিশিয়ে থাকে, সেই দুধ খেয়ে আমাদের ভয়ানক পেটের অসুখ হয়েছিল, লোকটিকে পুলিশে দিব ঠিক করেছিলাম। শেষে হাতে পায়ে ধরে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং ভবিষ্যতে আর ঐরূপ কর্‌বে না স্বীকার করায় ছেড়ে দিয়েছিলেম।

দেব প্রয়াগ ছাড়ার পর সর্ব্বপ্রকার জিনিষাদি সংযুক্ত এমন দোকান আর দেখি নাই। গুপ্তকাশীকে পাহাড়ীরা সহর বলে। বাড়ী গুলির সামনে স্তরে স্তরে আবাদ চলেছে। তাতে বেগুণ, কপি, কাঁচা লঙ্কা, কলা, মানকচু ইত্যাদি নানা প্রকার শাকশব্জির সামান্য সামান্য আবাদ আছে। এতদিন পরে কলা গাছ ও কচু গাছ দেখ্‌তে পেলাম। সবগুলিই কাঁচা কলা।

আমরা চটীতে পৌছে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণের উত্তর পার্শ্বস্থ দ্বিতল ঘরে জায়গা নিয়ে তখনই একজন পাণ্ডার সঙ্গে মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান কর্‌তে গেলাম। দুটী নলের মুখ হতে অনবরত কুণ্ডে জল পড়্‌ছে—একটি হাতীর মুখ, অন্যটি গরুর মুখ বিশিষ্ট; দুটীই পিতলের তৈরী। হাতীর মুখের ধারাটীর নাম যমুনা ও গরুর মুখের ধারাটীর নাম গঙ্গা। প্রত্যেক যাত্রীকেই এই কুণ্ডে স্নান করে নারিকেলের ভিতর গুপ্ত দান করা বিধি। আমরা আনন্দের সহিত স্নান কর্‌লাম। যদিও জল বেশী নয়, তথাপি সাঁতার কর্‌তে ছাড়লাম না। দুটী ধারা দিয়ে অনবরত কুণ্ডে জল পড়্‌লেও কুণ্ডে জল সর্ব্বদায়ই একই পরিমাণ থাকে, কারণ অন্য দিক দিয়ে উদ্‌বৃত্ত জল বের হয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বেই বলেছি এখানে গুপ্ত দানের বিধি; শুক্‌নো নারিকেল কিনে (এ দেশে শুক্‌নো নারিকেলকে গোলা বলে) চাকুদ্বারা চৌকোনা করে তার এক টুক্‌রা বের করে নিয়ে, তন্মধ্যে টাকা, পয়সা, সোনা, রূপা আদি পুরে গুপ্ত দান কর্‌লে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় বলে পাণ্ডাগণ বলে থাকেন। উক্ত নারিকেলসহ দানটা পাণ্ডাগণই গ্রহণ করে থাকেন। প্রবাদ যে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেবতাগণ এই স্থানে গুপ্তভাবে তপস্যা করেছিলেন তথা মহাদেবকে গুপ্তভাবে দান করেছিলেন বলে এর নাম "গুপ্ত কাশী"। উত্তরাখণ্ডে এই স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ বলে খ্যাত।

কুণ্ডটির চারি দিক খুব প্রশস্তভাবে পাথর দিয়ে বাঁধান। তার তিন দিকে দোকান তথা চটী, পশ্চিম দিকে বড় বড় দুটী মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে যেন

উঁকি মেরে গুপ্তদানের রহস্য দেখছে। এখানকার সমস্ত ঘর, চটী, মন্দির আদি সমস্তই পাথরের। ছুটী মন্দিরের একদিকে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজমান, তৎপার্শ্বে পার্ব্বতী দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বর বিরাজিত আছেন। মূর্ত্তিগুলি হৃদয়-আকর্ষণকারী। অর্দ্ধনারীশ্বরের পার্শ্বে পঞ্চ পাণ্ডব ও ভৈরবের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডের উত্তর ভাগের ২৪ অধ্যায়ে উক্ত আছে, মাঘ মাসের মকর রাশিতে সূর্য্য এলে এখানে স্নান দান করলে মহাপুণ্য লাভ হয়ে থাকে।

হিন্দুস্থানে তিনটী কাশী বিদ্যমান,—একটি বাণারসী কাশী, তার খবর বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দুস্থানী (সমস্ত ভারতকে হিন্দুস্থান বলে, তাতে যে বাস করেন তাকে হিন্দুস্থানী বলে) জানেন, দ্বিতীয় হল এই গুপ্ত কাশী—যার বিবরণ উপরে দিলাম, তৃতীয় হল উত্তর কাশী, যার বিস্তৃত বিবরণ গঙ্গোত্তরীতে যাবার সময় দিয়েছি। তিনটীই পুণ্যপ্রদ মহাক্ষেত্র।

* *

পাঠকগণের স্মরণ থাকতে পারে, আমরা হরিদ্বার হতে রওনা হয়ে কেদার-বদরীর পথে দেবপ্রয়াগ (হরিদ্বার হতে ৫৮ মাইল) পর্য্যন্ত এসে সেখান হতে অন্য পথে টিহরী হয়ে যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী যাই। যারা যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরী না যেয়ে বরাবর কেদার-বদরীর পথে রওনা হন, তাঁরা দেবপ্রয়াগ হতে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে এই গুপ্ত কাশীতে এসে উপনীত হন এবং এখান হতে কেদারনাথ যাত্রা করেন,—যে পথে আমরা এলাম। আমরা কেদারনাথ হতে গুপ্ত কাশী পর্য্যন্ত এসেছি এবং পথের বিবরণ সবিস্তারে জানিয়েছি। মাঝখানে দেবপ্রয়াগ হতে এই গুপ্ত কাশী পর্য্যন্ত পথের বিবরণ জানান হয় নি, এ পথ টুকুর খবর না জানালে পাঠকদের যাত্রার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হবে; বিশেষতঃ যাঁরা গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরী না যেয়ে দেবপ্রয়াগ হতে এ পথে আসবেন, তাঁদের পক্ষে ত পথগুলির বিবরণ জানা বিশেষ দরকার। তাই তাঁদের অবগতির জন্য তথা আমার ভ্রমণ-কাহিনীও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং পূর্ণ করার জন্য এ পথ টুকুরও বিবরণ বিস্তৃত ভাবে দিচ্ছি। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

বিগত অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে সারস্বত মঠের পঞ্চ বিংশ বার্ষিক উৎসব ও পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমৎছঙ্করাচার্য্যের জন্ম মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস পুনঃ নূতন করিয়া অসন প্রতিষ্ঠার দরুণ বিশেষ ভাবে পূজা হোম, আরতি, বেদ-গীতা-চণ্ডীপাঠ ও নাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজান্তে সকলেই যজ্ঞীয় তিলকাদি ধারণ করেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যেই ফলমূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রসাদ বিতরিত হয়। পাশ্ববর্ত্তী গ্রাম ও সহরের ভক্তগণও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এবার বাংলাদেশ হইতেও কোন কোন শিষ্যভক্ত উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিভাগীয় সম্মিলনী

বিগত ১৭ই ও ১৮ই বৈশাখ তিস্তা—রাজপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উত্তর বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্ত-সম্মিলনীর ৭ম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্বয়ং এই সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া, কুচবিহার, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বিভাগীয় ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত, বিভাগীয় সদস্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী, বগুড়া জেলা সদস্য শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ চাকী, কুচবিহার জেলা সদস্য শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দলই, রংপুর জেলা সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর প্রামাণিক ও জলপাইগুড়ি জেলা সদস্য কুমার শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দেব এই সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। ইহাতে আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন, সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং ভাব বিনিময় এই তিনটী বিষয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের আগমনোপলক্ষ্যে তত্রত্য আশ্রমে দর্শনার্থী জন সাধারণের এত অধিক সমাগম ঘটিয়াছিল যে, সুদূর পল্লীতে তাহার আংশিক কল্পনা করাও অসম্ভব! এই দুই দিন ধরিয়া যেন উক্ত স্থানে একটী প্রকাণ্ড মেলা বসিয়াছিল, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চারি দিক হইতে নানা প্রকার যান বাহনে লোক সমাগমের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ-বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় নাই। দেশ বাসীর প্রাণে ক্রমশঃ ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিতেছে, ইহা তাহারই জলন্ত নিদর্শন।

সম্মিলনীর নির্দ্ধারণানুযায়ী রাজপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতঃপর সারস্বত সঙ্ঘান্তর্ভূক্ত হইয়া "রাজপুর সারস্বত সঙ্ঘ" নামে অভিহিত হইল।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দির

বিগত ৫ই এপ্রিল কুতবপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন সমিতির অনুমোদন জন্য স্কুলের প্রারম্ভ হইতে গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্কুলের আয় ব্যয়ের এক হিসাব উপস্থিত করেন। সমিতির সভ্যবৃন্দ উক্ত হিসাব মঞ্জুর করেন এবং এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।—

"ম্যানেজিং কমিটি প্রদত্ত আয় ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর করিলেন। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী ইতঃপূর্ব্বে কাথুলী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০০০৲ দান করিয়াছিলেন এবং গত ইংরাজী ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে উক্ত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টী বর্ত্তমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত সম্মিলিত হওয়ার পর শেষোক্ত বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ১৩০ বিঘা জমি এবং তৎসংলগ্ন ইমারত, বাগান এবং পুষ্করিণী ইত্যাদি খরিদ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থে উক্ত সম্পত্তির জন্য কয়েকজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত স্বামিজী এই বিদ্যালয়ের জন্য ৩২০০০৲ টাকার উপর ব্যয় করিয়াছেন এবং মাসিক খরচের জন্য ছাত্র বেতনের অতিরিক্ত যাহা প্রয়োজন হইবে এবং আবশ্যক মত এক কালীন যে খরচের প্রয়োজন হইবে, তাহা নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভাবিকালে বিদ্যালয়টী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত হইলে এবং স্কুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে স্বামিজী তাঁহার মঠ হইতে যাহাতে বিদ্যালয়টীকে মাসিক ১০০৲ একশত টাকা করিয়া চির দিনের জন্য সাহায্য করা হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টীর স্থাপন ব্যাপারে স্বামিজী স্থানীয় জনমণ্ডলীর নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এইজন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ স্বামিজীকে তাঁহাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।"

কুতবপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ইং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয়

আয় ব্যয়ের হিসাব

জমা		খরচ	
ছাত্র বেতন …	৫৬৯৪৸০	জমি ও ইমারতের মূল্য সমেত রেজিষ্টারী খরচ …	৮৪১৪॥০
কৃষি বিভাগের আয় …	৩১৯৸/১০	মেরামতি … …	১৮৬৭।৶/৭॥
এম, ই, স্কুলের জন্য জিলা বোর্ডের সাহায্য …	২৭৩॥০	বোর্ডিং ঘর, খাবার ঘর, পায়খানা ইত্যাদি প্রস্তুত ব্যয় …	৯১৭০।/১৫
প্রতিষ্ঠাতার দান …	৩১৫০০৲	আসবাব … …	১৩১৬৸০
		পুস্তক … …	৬৫৯৸/১০
		পোষ্টেজ, ছাপা খরচ, কালী, কলম ইত্যাদি … …	১৮৩৸/১৫
		টিউব ওয়েল … …	৩৭৬৲
		এষ্টাব্লিশমেণ্ট (শিক্ষকগণের বেতন) …	১০৫১০৸৶/১০
		চাষের জন্য যন্ত্রপাতি সমেত বলদ গাড়ী … …	৫৮৭।৶/৫
		খাজনা … …	৩১৭৸৶/১০
		বিবিধ … …	৬৩৮৸৶/১০
		প্রভিডেণ্ট ফণ্ড …	২৭১/১০
		রিজার্ভ ফণ্ড … …	৩০০০৲
		কন্টীঞ্জেন্সি … …	৩১৩৸/০
		নৌকা খরিদ …	১৬১।১৫
	৩৭৭৮৮/১০		৩৭৭৮৮/১০

সাহায্য প্রাপ্তি

[অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবোপলক্ষে]

দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম …	৫৲	বীরখেতি সারস্বত সঙ্ঘ …	১৲
উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম …	৩৲	আমিলাইস জয়গুরু মহিলা সঙ্ঘ …	২৲
জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রম …	২৲	শ্রীহরবিতচন্দ্র রায় (২১৯৬ গ্রাহক) …	১৲
পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম …	৫৲	শ্রীগোবর্দ্ধন কুণ্ডু … …	৫৲

নাম	টাকা
শ্রীবিশ্বেশ্বর বসু	২৲
শ্রীসারদাচরণ দাস	১৲
শ্রীনলিনীকান্ত মুখার্জ্জি	১৲
শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ	২৲
শ্রীসরযূ রক্ষিত	৷৷০
শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস	২০৲
শ্রীনারায়ণদাস নন্দী	১৲
শ্রীগিরীশ নন্দী	৷৷০
শ্রীরাধানাথ দে	১৲
শ্রীকৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীমতী গঙ্গাদেবী	১৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়	১৲
শ্রীগণ[illegible] দেব	২৲
শ্রীবিহারীমোহন শর্ম্মা	১৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৷৷০
শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৷৷০
শ্রীননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়	৷৷০
শ্রীননীগোপাল সেন	২৷৷০
শ্রীজয়ন্তকুমার ঘোষ	১৲
শ্রীতারানাথ দাস মণ্ডল	১০৲
শ্রীনৃসিংহপদ পাল	৷৷০
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মাইতি	১৲
শ্রীসচ্চিদানন্দ ভোল	৩৲
শ্রীভৈরবচন্দ্র হাজরা	১৲
শ্রীরাধাশ্যাম মিত্র	২৲
শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী	২৲
শ্রীজানকীমোহন রায় চৌধুরী	১৲
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৲
শ্রীসচ্চিদানন্দ সাহা	৫৲
শ্রীনীহাররঞ্জন নন্দী	৫৲
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ধর	৩৲
শ্রীআনন্দময়ী দত্ত	২৲
শ্রীবিন্দুচরণ দাস	২৲
শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
শ্রীচন্দ্রকান্ত দাস	৷০
শ্রীভগীরথ দর্জ্জি	৷০
শ্রীজগবন্ধু কুণ্ডু	৷০
শ্রীরাখালচন্দ্র পাল	৷৷০
শ্রীসুরেন্দ্রলাল পাল	৷৷০
শ্রীসুরেন্দ্রলাল কুরি	৷০
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র পাল	৷৷০
শ্রীপ্রিয়নাথ কর্ম্মকার	৷৷০
শ্রীহাসিপ্রভা সরকার	৷৷০
শ্রীকুমুদিনীকান্ত সাহা	৩৲
শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাইতি	২৲
শ্রীমন্মথনাথ বসু	২৲
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতি	২৲
শ্রীভীমাচরণ বসু	২৲
শ্রীসারদাপ্রসাদ পট্টনায়ক	২৲
জনৈক ভক্ত	১৲
শ্রীঅমূল্যচরণ দাস	২৲
শ্রীজগৎনারায়ণ চাকী	২৲
শ্রীনবীনচন্দ্র রায় (আলোকবাটি)	৷৷০
শ্রীকৈলাসচন্দ্র সরকার	২৲
শ্রীকেনারাম মণ্ডল	৷০
শ্রীঅমরনাথ মণ্ডল	৷৷০
শ্রীযামিনীভূষণ দাস	৷০
শ্রীগুরুচরণ দাস	৷৷০
শ্রীকুমুদবন্ধু মাইতি	১৲
শ্রীশরৎচন্দ্র বানার্জ্জি	১৲
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	২৲
শ্রীযতীন পাল	৷৷০
শ্রীধরণী মাইতী	১৲
শ্রীরাজমোহন কুরী	৫৲
শ্রীব্রজবাসী কুরী	১৲
শ্রীইন্দ্রমোহন কুরী	১৲
শ্রীসত্যবান কুরী	১৲
শ্রীরমেশচন্দ্র কুরী	১৲
শ্রীকৃষ্ণধন কুরী	১৲
শ্রীদয়ালচন্দ্র কুরী	১৲
শ্রীশ্রীনন্দন কুরী	১৲
শ্রীভুবঞ্জয় কুরী	১৲

২৫শ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৯ | ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৬৬ | | ৩য় সংখ্যা

উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জাগিয়াও তোমরা ঘুমেই বিভোর—তোমাদের চেতনা নিম্নগামী, এই জন্যই ঊর্দ্ধ-প্রতিষ্ঠ আনন্দের আস্বাদন পাইতেছ না। তোমরা জাগ্রত হও—চেতনার উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠ। ঘুমেই তোমাদের অমূল্য সময় অতিবাহিত হইতেছে—জীবনের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া কবে তোমরা অজর-অমর অনুভূতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। জীবনের উন্নতিই যাহাদের লক্ষ্য—,

ঘুম তাহাদের বিশিষ্ট শত্রু। নিদ্রাজয়ী হইয়া যাইতে হইবে। জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে কোথায়ও যেন চেতনার প্রশান্ত দীপ্তি আচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে। সমগ্র চেতনাকে লইয়া একমুখী করিয়া ধ্যানে বস—দেখিবে তোমার অপ্রাপ্য কোন কিছুই থাকিবে না।

এক এক গ্রন্থিতে আমাদের মনের সংস্কার দৃঢ়ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে,—সকল গ্রন্থির উন্মোচন হওয়া চাই—তাহা হইলেই পূর্ণ চেতনার রাজ্যের সন্ধান পাইবে।

নিদ্রাজয় করিতে না পারিলে, অমর জীবনের সন্ধান মিলিবে না। ঘুমেই তোমাদের সময় অতিবাহিত হয়, জাগিয়া থাক আর কতক্ষণ? ভিতরে তীব্র সংবেগের সৃষ্টি কর, শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে গমন করিয়া দিব্য-জ্ঞান লাভে ধন্য হইয়া যাও। মোহ-নিদ্রা পরিহার করিয়া একবার উঠ— জাগ।

আরাম করিয়া সত্যের সন্ধান মিলিবে না, সত্যের পথ ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ। দুর্গম পথে যাইতে হইলে, অনেক শক্তির প্রয়োজন। এই জন্যই বলি, তোমরা যে পথে আসিয়াছ—তাহা বড়ই কঠিন। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য এই সমস্ত দৈবী গুণ না থাকিলে, এই পথে চলাই অসম্ভব। এই পথ দুর্ব্বল অধিকারীর দরুণ নয়—যাহারা অটুট ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বিগতভী হইতে পারিয়াছ—তাহারাই এই দুর্গম-পথের যাত্রী হইতে পারিবে।

ভয় কাহাদের—যাহাদের চিত্ত দুর্ব্বল, বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প করিবার শক্তি যাহাদের ভিতর নাই। সত্যের পথে বিমুখ হয় তাহারাই! তোমাদের কাউকে আমি ছোট অধিকারী বলিয়া মনে করি না। আত্মসমর্পণের পথ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। তোমরা নিজের ক্ষুদ্র জীবন দান করিয়া, বৃহৎ জীবনের অনুভূতি পাইবার পথে চলিয়াছ। তোমাদের মাঝে আলস্য, জড়ত্ব কিছুই আসিতে পারিবে না। কেন না, তোমরা যে আজ আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছ। তোমাদের মাঝে আমার দৈবী গুণগুলিই অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে। সুতরাং আমার ন্যায় তোমরাও জীবন্মুক্তির আস্বাদন পাইবে। সমর্পণের পথে তোমরা উন্নতিলাভ করিতেছ বুঝিবে কেমন করিয়া? যখন

দেখিবে, শরীর হইতে জড়ত্ব বলিয়া জিনিষটী সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। আনন্দের উদ্দীপনায় তোমাদের ভিতরটা সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। কাজ করিয়াও তখন ক্লান্তি আসিবে না, দেহের ক্লান্তি আসিলেও মন তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে না। কর্ম্মের কৌশল অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে পারা যায়, তাহা বুঝিবে এই সমর্পণের পথেই। এই জন্যই বলি, আর সময় নষ্ট করিও না, উঠ—জাগ, সমর্পণের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া দিব্য-জ্ঞান লাভ কর, দিব্য-কর্ম্মের সন্ধান জানিয়া লও।

যাহারা সদা-জাগ্রত, সদা-চেতন তাহাদের তো কোন পথেই ভয় নাই। সত্যের আলোকে প্রতি পদক্ষেপটি তাহাদের কাছে সুস্পষ্ট। সাধকের জীবনে অন্ধকার নাই। তাহাদের জীবনে বৈরাগ্যের যে তীব্র আগুন প্রজ্জ্বলিত, তাহার দীপ্তিতেই তাহাদের গন্তব্য স্থলটীও আলোকমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠে তাহাদের চোখের সম্মুখে.

দুর্গম পথ বটে, কিন্তু সত্যলাভেচ্ছু সাধকগণই সেই পথের একমাত্র যাত্রী। তোমরা সব বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছ, সত্যলাভ করিবে এই অভিপ্রায়ে। মনের সেই সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে যেন কখনও তোমরা বিচ্যুত না হও। বাস্ত-ভোজী হইও না। জীবনের লক্ষ্য যেন নিষ্কম্প প্রদীপবৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত উজ্জ্বল থাকে। উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত !!

চাওয়া আর পাওয়া

জীবনে কি চাই, ইহাই তন্ময় হইয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কি হইলে যে প্রাণে ঠিক ঠিক শান্তি আসিবে, তাহা বুঝিতে হইলে হুজুগ ছাড়িয়া নিজের মাঝে গভীর ভাবে আত্মস্থ হইয়া যাইতে হইবে। চাওয়ার আমাদের অন্ত নাই, কামনার অজস্র বন্ধনে আমরা জর্জ্জরিত, কিন্তু কৈ কিছুতেই তো প্রাণে শান্তি পাইতেছি না। একটা ছাড়িয়া, আর একটা ধরি, আর একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরি, এইরূপ চঞ্চলতার ভিতর দিয়াই আমাদের জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। শান্তির সন্ধান কে বলিয়া দিবে?

প্রাণে কি চায় ইহা না বুঝিয়াই আমরা একটা কিছু চাহিয়া বসি, এইজন্যই আমাদের চাওয়ারও কোন মূল্য নাই, পাওয়ারও কোন মূল্য নাই। জীবনে কি লাভ হইলে যে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইতে পারিব—এই সম্বন্ধে আমরা ভাবি কয় জন? কেবল চঞ্চলতা, আর উত্তেজনা। জীবনের একটা স্থিরতা নাই; অথচ এইরূপ চঞ্চলতাই নাকি প্রাণের লক্ষণ।

আমাদের প্রাণ কি চায়, তাহা ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না বলিয়াই, প্রাণের হাহাকারও মিটিতেছে না কিছুতেই। প্রাণ একটা কিছু চায় ইহা বেশ বুঝি, কিন্তু কি চায় তাহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নাই। এইজন্যই আমাদের চাওয়া যেমন কুহেলিকাময়, পাওয়াও তেমনি প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ। মনে হয় আমাদের এখনো সে সুদিন আসেনি। অর্থাৎ আমরা যে কি চাই, কি পাইলে যে আমাদের জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে আমাদের চেতনা এখনো জাগ্রত হয় নি। প্রাণে সেই সত্যিকার আকুলতা আসিলে, চাওয়া ঠিক ঠিক খাঁটী হইলে কি আর প্রতি পদে পদে অমন ব্যর্থতা আসিত?

এইজন্যই বলি বাহিরের চঞ্চলতার সঙ্গে আত্ম-সংমিশ্রন না করিয়া, এখনো নীরব সাধনায় তন্ময় হইয়া ভাবিয়া দেখা উচিত—আমরা ঠিক ঠিক কি চাই। আমাদের প্রাণের খাঁটী প্রার্থনা কি?

মন-প্রাণ এক করিয়া যাহা চাইব, তাহাই আমাদের জীবনকে সকল দিক দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবে। কিন্তু জীবনের এই মুখ্য প্রয়োজনটীকে আবিষ্কার করিতে হইলে বহু সাধ্য সাধনার প্রয়োজন। জীবনের চরম সত্য এত সহজে ধরা দিবে না। তাহার সন্ধান জানিতে হইলে—তিল তিল করিয়া সাধন জগতে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের চাওয়া যেন বিকারগ্রস্থ রোগীর প্রলাপের মত, তার সঙ্গে সত্যিকার প্রাণের যোগ নাই। এইজন্যই দেখি যাহা চাই, তাহা না পাই-লেও দিব্যি নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় আমাদের দিন অতিবাহিত হয়।

ঋষিযুগে দেখিতে পাই, শিষ্যের উপর গুরুর কি কঠিন পরীক্ষা। শিষ্যের প্রাণের চাওয়াকে খাঁটী করিয়া তুলিবার দরুণই যে এই কঠোর পরীক্ষা, তাহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়। জীবনে এই কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত বলিয়াই, তাহাদের প্রার্থনার ব্যর্থতা বড় দেখা যায় না। অনেক সংযমের পর, তাহারা যাহাই প্রার্থনা করিত, তাহাই পূর্ণ হইত।

যাহা আমাদের অতীব প্রয়োজন, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তাহাকেও আমরা অনায়াসে অবজ্ঞা করিয়া চলি। কিন্তু উত্তেজনা তো চিরস্থায়ী নয়—এই-জন্যই উত্তেজনার পর অবসাদ আসে; অবসাদের পর আবার সেই প্রাণের নিদারুণ আকুলতা। মোট কথা মুখ্য প্রয়োজনের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত চঞ্চলতার পথেই আমাদের গতি।

সাধনা করা আর কিছুর দরুণ নয়—আমরা কি চাই তাহাই যেন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। চাওয়া ঠিক হইয়া গেলে পাইতে বড় বেশী সময় লাগে না। চাইতে জানি না বলিয়াই, পাওয়ার পথেও অহরহঃ আমাদের প্রবঞ্চিত হইতে হয়।

আমরা অনেক শাস্ত্র বচন জানি, জ্ঞানী বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু প্রাণের অশান্তি তো বিদূরিত হয় না কিছুতেই। এক কথায় বলিতে গেলে, কি পাইলে, জীবনের কোন স্তরে পৌছিতে পারিলে যে চরম শান্তি পাইব, তাহার সম্বন্ধে মোটেই তো আমাদের জ্ঞান নাই। জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি কর্ম্মেই যেন প্রবঞ্চনার আধিপত্য বেশী।

হয়ত যাহার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, চাওয়ার বেলায় সেইরূপ একটা অদ্ভুত জিনিষই চাহিয়া বসি। যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যাহা চাহিয়াছ, তাহার সম্বন্ধে তোমার সাধারণ জ্ঞান আছে কি? তাহা হইলে আর কোন প্রত্যুত্তর পাইবার আশা নাই। এইজন্যই বলি আমাদের চাওয়ার মাঝেও যে কত ভেজাল, কত অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা ঠিক ঠিক চাহিবার যোগ্য পাত্রও নই। যাহা চাই, তাহার সঙ্গে প্রাণেরও কোন যোগাযোগ নাই।

অনেক দ্বন্দ্বের পর, অনেক সংগ্রামের ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তাহার পর জীবনের চরম লক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—জীবনের চরম লক্ষ্য কি তাহা বুঝা যায় না। এইজন্যই চিত্তশুদ্ধির আগে চাওয়ার মাঝেও ব্যভিচারের অন্ত থাকে না।

আমি মুক্তি চাই, মোক্ষ চাই—ইত্যাদি বড় বড় কথা অনায়াসেই আওড়াইয়া যাইতে পারি, কিন্তু মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণাই নাই। লোকমুখে শুনিয়া যাহা চাই, তাহা আমাদের প্রাণের চাওয়া নয়; এইজন্যই অনেক মুক্তি পিপাসু—বিনা মুক্তিতেই আমোদে আহ্লাদে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। তাহাদিগকে কি যথার্থ মুক্তি-পিপাসু বলা চলে?

জীবনে যাহা চাই, তাহা ছাড়া যখন এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিব না, চাওয়া খাঁটী হইয়াছে বুঝিব তখনই। আমরা ধর্ম্ম চাই, মুক্তি চাই, মোক্ষ চাই, স্বরূপ চাই, কত কিছুই চাই, কিন্তু যাহা চাই, তাহা না হইলেও তো দিন বেশ চলিয়া যায় দেখি। এইজন্যই বলি আমাদের চাওয়া খাঁটী হয়নি এখনো। কি চাই—ইহা হইতে বড় গুরুতর সমস্যা আর জীবনে নাই—এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে তো আর কোনরূপ অভাববোধই জাগিতে পারিবে না।

কামনার অন্ত নাই আমাদের—কিন্তু কি পাইলে যে আমরা সর্ব্বকাম হইতে পারিব, তাহাই সকলের চিন্তা করা উচিত। কি চাই—ইহা বুঝিতে হইলেও সমাধির প্রয়োজন। সর্ব্ব বৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলে হৃদয়ে যে আশা বা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠে, তাহাই ঠিক সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা। নিজের মাঝে গভীর ভাবে তলাইয়া যাইতে না পারিলে, অর্থাৎ সমাধি না আসিলে, জীবনের ঠিক ঠিক লক্ষ্য ধরা বড়ই সুকঠিন। এইজন্যই বলি, কি চাই নিজের মাঝে তাহা বেশ যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে।

পাওয়ার দরুণ ব্যাকুল না হইয়া, চাওয়াকে যাহাতে খাঁটী করিতে পারি, তাহার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। ভিতরে তীব্র বৈরাগ্যের আগুণ প্রজ্বলিত থাকিলে—অনেক চাওয়ার বস্তুই পরিণামে ভস্মীভূত হইয়া যায় দেখি; কিন্তু যাহা খাঁটী তাহার ধ্বংস হয় না কিছুতেই। এইরূপভাবে কত চাওয়া, কত পাওয়ার ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই এক দিন সত্যিকার চাওয়া এবং পাওয়া থাকিয়া যাইবে।

পাই না বলিয়া অপরের উপর ক্ষোভ করা বৃথা, কেন না নিজের চাওয়ার মাঝে গলদ আছে বলিয়াই যে পাইতেছি না, ইহাই হইল আসল কারণ, অন্য সব কারণ গৌণ। কি চাই, একদিনে তাহা বুঝিতে পারিব না, এইজন্যই কত চাওয়া, কত পাওয়া ঘটিবে, কিন্তু আসল যাহা পাওয়ার, তাহা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনের অশান্তি দূর হইবে না কিছুতেই। পাওয়ার দরুণ ব্যাকুল না হইয়া, সকলেরই গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ জীবনের মুখ্য প্রয়োজন কি, কি পাইলে আর কোনরূপ অপূর্ণতা থাকিবে না আমাদের। ইহার নামই প্রকৃত চাওয়া এবং পাওয়া।

গীতা

কর্ম্মযোগের ভূমিকা

দুটী পথের কথা শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—সাংখ্য আর যোগ। সাংখ্য জ্ঞানপথ আর যোগ হচ্ছে কর্ম্মপথ। সাংখ্যের গোড়ার কথা হচ্ছে **বিবেক** অর্থাৎ আত্মা হতে অনাত্মাকে তফাৎ কর্‌তে শেখা। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই—আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে যিনি আনন্দ পেয়েছেন, তিনিই বিবেকানন্দ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ এই সাংখ্য-পথের ব্যাখ্যা করেছেন—আগেই আমরা সে সব কথার আলোচনা করেছি। এখন যোগপথের কথা হবে। যোগ কি?—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বল্‌ছেন—

যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং—

কর্ম্মের কৌশলই হচ্ছে যোগ। কথাটা বুঝতে হলে কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার।

জগতে দুটী তত্ত্ব আমরা দেখতে পাই—একটী অচঞ্চল, আর একটী চলিষ্ণু। দার্শনিকেরা একেই বলেছেন পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ নিশ্চল, নির্ব্বিকার, শিবস্বরূপ,—আর প্রকৃতি চঞ্চলা, পরিণামিনী, ওই শিবের বুকেই নৃত্যপরায়ণা কালী। পুরুষ নিত্য, প্রকৃতি লীলা; পুরুষ গুণাতীত, প্রকৃতি গুণময়ী; পুরুষ অকর্ত্তা, প্রকৃতি কর্ম্মরূপিণী! এ জগৎটা প্রকৃতি-পুরুষের লীলা—আমাদের জীবনটাও তাই। প্রকৃতির চাঞ্চল্যই হচ্ছে কর্ম্ম—প্রাণের স্পন্দনই হচ্ছে কর্ম্ম। We are throbbing with life—অতএব আমাদের জীবন কর্ম্মময়। হাত-পায়ে যা কর্‌ছি, তাই শুধু কর্ম্ম নয়—আমাদের চিন্তা, বাসনা—এ সবই প্রকৃতির স্পন্দন, অতএব সবই কর্ম্ম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ গুলির অধীন থাক্‌ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত—we are nature's children. এই কর্ম্মময় জীবনই সবাই

যাপন করছে—একেই বলে গুণের বন্ধন, একেই বলে সংসার। সংহাররূপিণী কালীর নৃত্যই চার দিকে দেখতে পাচ্ছি। শিবস্বরূপে যে তাঁর প্রতিষ্ঠা তাকে দেখছি না—দেখছি না যে এই চঞ্চলতার মূলেও আমাদের মাঝে এক সচ্চিদানন্দময় পুরুষ "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ" হয়ে আছেন। কালীকেই দেখতে পাচ্ছি, তাই সংসার শ্মশান, শিবকে যদি দেখতে পেতাম, তাহলে দেখতাম, এই সংসারই কৈলাস—ভূতপ্রেত আছে বটে, কিন্তু তারা আর বিভীষিকা নয়—গৌরী-শঙ্করের ছেলেমেয়ে তারা! একদিকে কর্ম্মের চঞ্চলতা, আর একদিকে সমাধির প্রশান্তি—একদিকে প্রকৃতির বিকর্ষণ, আর একদিকে পুরুষের আকর্ষণ—এই দুটীতে জীবনের লক্ষ্য দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

বলা বাহুল্য, সমাধিই চাই, কর্ম্ম চাই না, সংসার চাই না—কিন্তু সমাধি লাভের উপায় কি? কর্ম্মের জাল যে জগৎ জোড়া, তা এড়াবে কি করে? একটা পথ হচ্ছে বিবেক—প্রকৃতির গুণলীলা থেকে তফাৎ থাকা। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাঁরা সাংখ্যপথ বা জ্ঞানপথ বা বিবেকের পথ অনুসরণ করতেন, তাঁরা literally জগৎ হতে তফাৎ হয়ে যেতেন—literally তাঁরা সব কর্ম্ম ছেড়ে পাহাড়ের গুহায় বা জঙ্গলে আশ্রয় নিতেন। বুদ্ধ-শিষ্যেরাও এই পথ অবলম্বন করতেন। আধুনিক কালেও প্রাচীনপন্থী সন্ন্যাসীদের মাঝে অনেকে তাই করেন। শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু তা মত নয়। তিনি বলেন, এ কি রকম জ্ঞান? রোগ ভাল করতে নিয়ে রোগীকে মেরে ফেলার মত—মাথা ব্যথা সারাতে গিয়ে মাথাটা কেটে ফেলার মত। কর্ম্মও সত্য, ব্রহ্মও সত্য। ব্রহ্মকে লাভ করতে গিয়ে যদি তুমি কর্ম্মকে বর্জ্জন কর, তাহলে সত্যের একদেশ মাত্র পেলে—পরিপূর্ণ সত্যের অধিকারী হতে পারলে না। ব্রহ্ম কি কর্ম্ম ছাড়া? প্রকৃতির এ কর্ম্ম কার ইঙ্গিতে হচ্ছে? শিব যদি বুক পেতে না দিতেন, তাহলে কালী নাচতেন কোথায়? ব্রহ্ম কর্ম্মের মাঝে থেকেও কর্ম্মের অতীত, বন্ধনের মাঝে থেকেও তিনি মুক্ত, তোমাকে সেই কৌশলটী শিখতে হবে। "এমন বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করতে হবে যাতে কর্ম্মের বন্ধন থেকে তুমি বেঁচে যাও।" (৩৯) সৃষ্টি ছাড়া সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণ বড় বলতেন না। সাংখ্য পথেও তিনি কর্ম্মত্যাগ করতে বলেননি, পরে এ সম্বন্ধে তাঁর মত আরও সুস্পষ্ট করে বলবেন (৩য় অধ্যায়)। তার নিজের জীবনেই দেখ না কেন—কর্ম্ম আর জ্ঞানের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য তাঁর মাঝে—তিনি মহাযোগেশ্বর। তোমাকে আগেই বলেছি—ঠিক ঠিক জগদগুরু বলতে আমি শিবকে বুঝি না—বুঝি শ্রীকৃষ্ণকে। জগদগুরুর সমাধিস্থ অবস্থা হচ্ছে শিব; আর তিনি যখন গুরু হয়ে জীবনের কুরুক্ষেত্রে এসে তোমার রথে সারথি হয়ে বসলেন, তাঁর অমৃতময়ী বাণী তোমায় শুনালেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। এই জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণের **বাণী** আর শিবের **ভাব**—এ দুটীতে ভারতবর্ষকে হাজার হাজার বছর চালিয়ে এসেছে—জগৎকেও চালাবে। এই শ্রীকৃষ্ণও যৌবনে সাধনা করবার জন্য কিছুদিন নির্জ্জনে ছিলেন বটে, তার পর দেখ, কর্ম্মক্ষেত্রেই তাঁর জীবন কেটে গিয়েছে—মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে নিজের জীবনকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি মানুষকে বড় করে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি একাধারে মহাজ্ঞানী, মহা-যোগী, মহা প্রেমিক—মহাকর্ম্মী। তিনিই জগদ্‌-গুরু—পরিপূর্ণ মানব তিনি। তাঁকে সমস্ত প্রাণ লুটিয়ে প্রণাম কর।

কর্ম্মের বন্ধন এড়াবার আর একটী পথ হচ্ছে—যোগ-পথ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে নয়, কিন্তু কৌশলে কর্ম্ম করে কর্ম্মের বন্ধন হতে মুক্ত

হতে হবে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" (৫০) এই হচ্ছে গীতোক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মযোগ।

জিজ্ঞাসা করতে পার, "কর্ম্মের বন্ধন" বলতে কি বুঝব? সংসারের যা গলদ, কর্ম্মের বন্ধনও তাই, কেন না সংসার আর কর্ম্ম তো এক কথা। সংসারে দুটী গলদ—দুঃখ আর অধীনতা। নিরবচ্ছিন্ন সুখ আমরা পাই না কোথায়ও—এই এক দোষ; আর যা খুসী তাই করতে পারি না—সব কিছুতেই আমাদের হাত-পা বাঁধা। সংসারে যদি পরিপূর্ণ **সুখ** আর **স্বাচ্ছন্দ্য** থাকৃত, তাহলে আমাদের নালিশ কিছুই থাকৃত না।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেও কর্ম্ম পথে থেকে এই দুটী গলদ দূর করবার চেষ্টা ঋষিরা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কর্ম্মযোগের উপদেশ দেবার পূর্ব্বে প্রাচীন কর্ম্মযোগের তীব্র সমালোচনা করেছেন (৪১-৪৬, ৫২-৫৩)। তিনি একে বলেছেন **বেদবাদ।** তাঁর সমালোচনার সার কথা এই—

"বেদবাদীরা মানুষকে স্বর্গের লোভ দেখিয়েছেন। সংসারে মানুষ দুঃখী, মানুষ স্বাধীন নয়। তাই তাদের ডেকে বেদবাদীরা বল্ছেন, তোমরা 'যজ্ঞ' কর, দেবতাদের খুসী কর, তাহলে স্বর্গে গিয়ে বিপুল **ভোগ** এবং অকুণ্ঠ **ঐশ্বর্য্য*** লাভ করবে। এর দরুণ তাঁরা কত আড়ম্বরপূর্ণ (ক্রিয়াবিশেষ বহুল (৪৩) যজ্ঞেরই বিধান করেছেন। কিন্তু তাতে কি বাস্তবিকই মানুষ আনন্দের সন্ধান পাবে? বাস্তবিকই স্বাধীন হবে? ভোগ আর ঐশ্বর্য্য যে আকারেই আসুক না কেন, তা প্রকৃতির দান। ভোগ আর ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকে কি মানুষ প্রকৃতির গণ্ডী এড়াতে পারবে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ প্রকৃতির অধীন থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার চাঞ্চল্য দূর হবে না—কেন না প্রকৃতি যে চির চঞ্চলা। সুতরাং স্বর্গের ভোগ আর ঐশ্বর্য্যও কখনো চিরস্থায়ী হবে না। অতএব স্বর্গ হতে আবার তার পতন হবেই— **আবার তাকে এই জগতে জন্মাতে হবে।** এ যেন রাধাচক্রে উঠে ঘূরপাক খাওয়া। শক্তি কোথায়? ভোগ আর ঐশ্বর্য্য যাদের লক্ষ্য, তাদের মূলে আছে কামনা; কামনা বুদ্ধিকে পাঁচ ডেলে করে তোলে, তাতেই অজ্ঞান এবং অশান্তি বাড়ে শুধু। কর্ম্মবন্ধন এড়াবার যথার্থ উপায় হচ্ছে **সমাধি** লাভ করা। কিন্তু কামনায় চঞ্চল চিত্ত কখনো সমাধি লাভ করতে পারে না। ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি থাকলে কখনো আত্মজ্ঞান ফোটে না। বেদ গুণময়—তোমায় যেতে হবে গুণের পর পারে। ভোগ আর ঐশ্বর্য্য তোমার লক্ষ্য নয়—তোমার লক্ষ্য আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান যেন সর্ব্ব প্লাবনী বন্যার জল, আর বেদের শিক্ষা যেন গোষ্পদের জল, এ দুয়ে কি তুলনা হয় কখনো (৪১-৪৬)। বেদ তোমায় অনেক কথা শুনাবে বটে, কিন্তু যখন আসক্তির মোহ থেকে তুমি নির্ম্মুক্ত হবে, নিজের মাঝে অনন্ত জ্ঞানের উৎস খুঁজে পাবে, তখন দেখবে, এত দিন যা শুনে এসেছ, তা কিছুই নয়—আর তোমার শুনবারও কিছুই নাই। এমনি করে বেদের বাণী শোনবার ঝোঁক যখন তোমার চলে যাবে, বুদ্ধি স্থির হবে, চিত্ত সমাহিত হবে, তখন আমার যোগ পথের রহস্য তোমার আয়ত্ত হবে (৫২-৫৩)।"

বেদবাদের নিন্দা শুধু যে শ্রীকৃষ্ণই করেছেন, তা নয়। তাঁর পূর্ব্বে সাংখ্য দর্শনকার কপিলও বেদবাদকে criticise করেছেন। সাংখ্য কারিকায় ঈশ্বর

*'ঐশ্বর্য্যের' একটা Technical Term, তার অর্থ যা খুসী তাই করবার ক্ষমতা—রামকৃষ্ণদেব যাকে বলতেন—'সিদ্ধাই'।

কৃষ্ণ (একজন দার্শনিক) Pilosophically prove করেছেন যে যজ্ঞমূলক যে কর্ম্ম system, তাতে কখনো মানুষের স্বারূপ্য লাভ হতে পারে না। সে সব তর্ক আমাদের এখানে তোলবার কোন প্রয়োজন নাই। যখন সাংখ্য পড়্‌বে, তখন দেখবে, কি চমৎকার psychological analysis করে তাঁরা এমনি করেছেন যে ভোগ আর ঐশ্বর্য্য—যার ওপর নাকি সংসারের লোকের এত ঝোঁক, তাতে কিছুতেই আত্মার তৃপ্তি হতে পারে না। যাক্—এখানে শুধু একটী কথা তোমায় লক্ষ্য কর্‌তে বলি, শ্রীকৃষ্ণের সমালোচনা কোথায়ও destructive নয়, it is always constructive. এইখানে যজ্ঞের নিন্দা করেছেন (আর যজ্ঞই হল বেদবাদীদের সাধনা) বটে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে আবার এই যজ্ঞেরই এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে (৩য় অধ্যায় ৯-১৬), যে এমন sublime utterance তুমি জগতের কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রে পাবে কি না সন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণের geniusএর এই হচ্ছে beauty—তিনি যে গালাগালি করেন, তা-ও মায়ের মত। মানুষ idealএর original grandeurটা ভুলে যায়, তাকে বিকৃতি করে তোলে; শ্রীকৃষ্ণ গান দিয়ে বিকার ঘুচিয়ে দেন, but he never kills the spirit. He is just like a stern but affectionate mother. এই তো জগদ্‌গুরুর মহিমা।

কর্ম্মযোগ

এইবার শ্রীকৃষ্ণের Grand philosophy of Karma সুরু হল। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ যে কথাটী বলেছেন, তার আর তুলনা নাই—ওই একটী কথাই আমাদের জীবনের ideal হতে পারে। কথাটী এই—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

—শুধু কর্ম্ম কর্‌বার অধিকারই তোমার আছে, ফল তো তোমার এলাকাতে নয়। তুমি কর্ম্ম ফলের নিমিত্ত ভাগী হয়ো না; আবার কর্ম্ম ছেড়ে দেবার ঝোঁকও যেন তোমার না হয়।

এখন শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটীর একটু আলোচনা করা যাক্।—আগেই বলে এসেছি, শ্রীকৃষ্ণের মত হচ্ছে কর্ম্মের ভিতর থেকেই কর্ম্মের বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া—অর্থাৎ এমন কৌশলে কর্ম্ম করা, যাতে বাঁধা না পড়্‌তে হয়। কর্ম্মের ফলে দুঃখ আর অধীনতা ভোগ কর্‌তে হয় বলেই যে আমরা কর্ম্মে ফাঁকি দিয়ে বাঁচব, তা হয় না। কর্ম্ম ত্যাগ করে যারা নাকি কর্ম্মের গলদ এড়াতে চায়, তারা নানা রকম সূক্ষ্ম psychological crisisএ পড়ে; তৃতীয় অধ্যায়ে সে সব কথা শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে বল্‌বেন। আবার বেদবাদীদের মত যারা ভোগ আর ঐশ্বর্য্য লাভ করে দুঃখ আর অধীনতার হাত হতে বাঁচতে চায়, তারাও শেষ পর্য্যন্ত ঠকে যায়। সুতরাং কর্ম্মহীন সন্ন্যাসবাদ বা সকাম বেদবাদ, কোন দিক দিয়েই কর্ম্মযোগের পূর্ণ সিদ্ধি হয় না। এ দুটাই extreme; আমাদের নিতে হবে middle course.

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—উপায় হচ্ছে—**কর্ম্ম কর কিন্তু ফল চেও না!** কাজ তোমার কর্‌তেই হবে, কেন না তুমি ভগবানের যন্ত্র, তোমার দেহ মনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন বাজাবার জন্য, সুতরাং "কাজ কর্‌ব না"—এ বল্লে তোমার ছুটী নাই। কিন্তু কাজ করে তার rewardটী expect করো না। তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র; তোমার জীবনে কোন্ রাগিনীর আলাপ তিনি কর্‌বেন, তা তিনিই জানেন। তোমার ওপর হুকুম

এসেছে কাজ করবার—কাজ করে যাও। তার ফল কি হবে, তিনিই জানেন—তিনি মজুরী স্বরূপ হাত খুলে যা দেন, তাঁর দান বলে তা গ্রহণ করতেই হবে। murmur করে কোন লাভ নাই। তোমার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ—তুমি কি বোঝ, তাঁর উদ্দেশ্য কি? অতএব তাঁর বিধান স্বচ্ছন্দ মনে মেনে চল।

এই হচ্ছে নিষ্কর্ম্ম কর্ম্মযোগ—ফল না চেয়ে কাজকর। কথাটী ছোট্ট, কিন্তু তার অর্থ অতি গভীর; আর তার সাধনাও বড় সহজ নয়। এর একটু psychological analysis দরকার।

প্রথমেই প্রশ্ন হয়, কাজ করব, অথচ তার ফল চাইব না?—একি অন্যায় ব্যবস্থা, আমরা মানুষ। আমরা কি বুঝিনা—কিসে থেকে কি হয়? কোন্ cause থেকে কোন্ effect হয়, তা কি আমরা জানি না? যদি জানি, তাহলে উপযুক্ত cause থেকে উপযুক্ত effect expect করবনা? আর expect করবারই যদি আমাদের কিছু না থাকে তাহলে কাজ করবার প্রেরণাই বা পাব কোথা থেকে?

কথাগুলি একদিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু আর একদিক দিয়ে বিচার করলে তার ভুল বেরিয়ে পড়ে। আমরা বুঝি, cause & effectএর relationও জানি—কিন্তু **সবই বুঝি না বা সমস্তটা relationও জানি না।** সব বুঝি না জানিনা বলেই পদে পদে জীবনে কেবল ঠক্‌ছি, সবই যদি বুঝ্‌তাম, তাহলে জীবনটা তো আগাগোড়া successই হত। তা হয় না কেন? খুব calculation করে কাজ করেও unexpected result হয় কেন? অতএব যদি ঠিক জ্ঞানবিচার করে কথা বল, তাহলে তোমাকে বল্‌তেই হয়, কর্ম্ম আর তার কালের মাঝে যে universal relation টা তুমি আবিষ্কার করেছ—তা **probable** মাত্র quite certain, তা বল্‌তে পার না। মনে আছে—Inductive logicএর গোড়াতেই এই কথাটা? খুব certain যে Inductive generalisation, তারও value probable; তারও পেছনে একটা 'if' আছে। "কাল সূর্য্য উঠ্‌বে" if the present system of the universe continues. কে জানে, আজ রাত্রেই যদি সব ওলট্-পালট্ হয়ে যায়? Inductive logic causation আবিষ্কার করে, universal relation খোঁজে, কিন্তু সেও সাহস করে বল্‌তে পারে না যে সে causationএর সবটুকু বোঝে। Inductive logic থেকেএই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করো—ঠিক জ্ঞানীর বিচারে দেখ্‌তে গেলে, causal relationটাও only probable.

তাহলে জগতে চল্‌ব কি করে? দুটী পথ আছে। যদি জ্ঞানী হও, তাহলে take things as they are and do not be led by vain desires. Unexpectedএর জন্য prepared থেকো। ভেবেছ—এই কাজের এই ফল হবে। খুব বেশী জোর করে ভেবো না; আর একটা মনকে বুঝিয়ে রেখো, দেখ্, এই কাজের এই ফল না-ও হতে পারে, তখন যেন দুঃখ করিস্ না। আর যদি ভক্ত হও, তাহলে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আশা-নিরাশা সব তার দান বলে মাথা পেতে নাও—তুমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী এই ভাবে কাজ করে যাও।

কর্ম্মের psychologyটা বোঝ। কর্ম্মের মূলে থাকে will power বা বাসনা; তার সঙ্গে কতকটা আনন্দময় কল্পনা—pleasurable imagination! এই দুটীর প্রেরণাতেই মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠে কর্ম্ম করে। ধর একজন বাড়ীতে দালান দেবার জন্য খুব খাটছে, খাটুনীর মূলে কি? দালান হোক্ এই বাসনা। এই বাসনা জাগ্‌ল কেন?—না সে **কল্পনা করে** দেখেছে দালান হলে ভারী

মজা। এই **বাসনা** আর **সুখ কল্পনা** এতেই তাকে খাটিয়ে মারছে। এখন কার মনে কখন কি বাসনা উঠবে, তার কোনও ঠিক নাই। আর বাসনাকেও বাস্তবিক কর্ম্মের জন্য দায়ী করাও চলে না। ধর, একজন নিজে খাবে বলে খাট্‌ছে; আর একজন পরকে খাওয়াবে বলে খাট্‌ছে। দুটা বাসনার মূলে দু'রকম আনন্দ কল্পনা। ওই আনন্দ কল্পনার বিভিন্নতাতেই বাসনাও বিভিন্ন হয়েছে। সুতরাং কর্ম্মের জন্য দায়ী কর্‌তে হলে সুখ কল্পনা-কেই দায়ী কর্‌তে হয়। সুখের idea. নানা জনের নানা রকম—কিসে প্রকৃত সুখ হবে, এ লোকে বুঝে না। তাইতে নানা ভাবে বাসনা চরিতার্থ কর্‌তে গিয়ে মানুষ কখনও অভীষ্ট সুখ পায়, কখনো বা পায় না। এই হতেই জগতে দুঃখের সৃষ্টি হয়। দালানে শুতে পার্‌লেই সুখী হবে মনে করেছিলে; কিন্তু দালান কর্‌তে গিয়ে ঋণ হয়ে গেল হয়ত। তখন দালানে শুয়েত ঋণের চিন্তায় ঘুম হয় না, হয়ত বা আপশোষই হয়, কেন দালান কর্‌তে গিয়ে ছিলাম।

অহরহঃ এই হচ্ছে। উপায় কি?—উপায় **সুখ কল্পনা ত্যাগ।** "জগতে কোনও কিছুতে সুখী হব" এ ভুল ভেঙ্গে যাক্। ধনে সুখ নাই, জনে সুখ নাই, মানে সুখ নাই। তবে সুখ কিসে আছে?—প্রকৃত সুখ জ্ঞানীর দ্রষ্টৃত্বে বা প্রেমিকের লীলারস আস্বাদনে। জ্ঞানী বিশ্বময় নিজকে ছড়িয়ে দেখ্‌ছেন—ভাল মন্দ কত কিছুই আস্‌ছে, তিনি কাউকে আবাহনও কর্‌ছেন না, বিসর্জ্জনও কর্‌ছেন না—তিনি নির্ব্বিকার। প্রেমিক দেখ্‌ছেন—সবই তাঁর লীলা। মরণকেও তিনি বল্‌ছেন, "প্রিয়তমের দূত", তিনি ভালও চান না—মন্দও চান না। মনের এই রকম অবস্থা হলে তবে ঠিক ঠিক কর্ম্ম করা যায়।

একটা প্রশ্ন মনে হয়। আমরা তাহলে কি ভগবানের খেয়াল খুসীর ক্রীড়নক মাত্র? যদি আমাদের সাধ না পূরবে, তবে সাধের সৃষ্টি করেন কেন তিনি? তিনি নিষ্ঠুর, না প্রেমময়?

মায়ের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। মা কি সন্তানের সাধ পূরণ করেন না? নিশ্চয়ই করেন। কিন্তু অন্যায় সাধ সব সময় পূরণ হয়ত করেনও না। ছেলেটার সর্দ্দী হয়েছে দেখে. মা হাত হতে পেয়ারা-টা কেড়ে নিলেন। ছেলে মনে কর্‌ল, মার মত এত নিষ্ঠুর আর কেউ নাই। ভুলে গেল—এই মা-ই কতবার কত কিছু খাইয়েছেন, বুকে করে রেখেছেন অসুখের সময় আহার নিদ্রা ছেড়ে সেবা করেছেন। আমাদেরও তাই হয়। হাতের পেয়ারাটা কেড়ে নিলেই বলি, ভগবান্, সাধ পূরালে না? তুমি কি নিষ্ঠুর। তাঁর আরো কত দয়ার কথা ভুলে যাই।

সুতরাং বাসনা পূরণ হল না বলে ভগবানে যেন বিশ্বাস না হারাই। তা ছাড়া আরও একটা উন্নত অবস্থা আছে। এমন সময় হয়, যখন আমার ইচ্ছা আর তাঁর ইচ্ছা এক হয়ে যায়। যা পূরণ হবে না, এমন বাজে ইচ্ছা মনে জাগেই না—সুতরাং আমার যা ইচ্ছা, তাই হয়। মন শুদ্ধ বাসনার আধার হয়। শুদ্ধ বাসনাকে সত্য সঙ্কল্প বলে। রামকৃষ্ণের এমনি শুদ্ধ বাসনা ছিল। মা তে তন্ময় হয়ে গিয়ে মার ইচ্ছা আর তাঁর ইচ্ছা এক হয়ে গেল। তাই তাঁর মনে যে বাসনাই উদয় হত, তা মায়েরই বাসনা—তাই সফল হ'ত। সাধারণের মনে কেবল "কাম সঙ্কল্প"—অর্থাৎ অদূরদর্শীর মত, সুখ কল্পনায় অভিভূত হয়ে এটা সেটা চাওয়া। কামসংকল্প সব পূরণ হয় না। তাইতে বেদনার সৃষ্টি হয়। সেই বেদনার হাত হতে উদ্ধার পাবার জন্যই ভগবান্ বল্‌ছেন, নিষ্কাম কর্ম্ম কর—কিছু চেও না—যা

যা হাতের কাছে আসে তাই করে যাও। এমনি ভাবে করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যায়—তার পর সত্যকঙ্কল্প জাগে—বাস্তবিক তখনই চাওয়ার অধিকার জন্মে—ভগবানের সঙ্গে যোগ হলে পর। তখন যা চাই, তাই পাই; আর তাতে জগতের কল্যাণ হয়। তাহলে দেখ, আগে কামনা ত্যাগ—ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন—আত্ম সমর্পণ; তার ফলে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার যোগ—এরই নাম সমাধি। সমাধির পর ফিরে এলে তখন ভগবানের বাসনাই আমার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠবে—তখন যা চাইব, তাই পাব—আর তাতে আত্মার শান্তি ও জগতের কল্যাণ হবে। এই হচ্ছে বাসনার philosophy! সমাধির এ পারে unexpected result এ আমাদের বিব্রত করে, তাই ভগবান্ বল্লেন, expect করো না কিছু; সমাধির ওপারে তাঁর আলো যখন বুকে এসে পড়ে, দিব্য দৃষ্টিতে যখন সব ভাসে, তখন আর unexpected বলে কিছু থাকে না—দেখতে পাব—তাঁর ইচ্ছাতে এই বাসনা হয়েছে—এই কর্ম্ম হবে—ঠিক এই ফলও পাব। তখন নিশ্চিন্ত। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ—ভগবান্ সাধ বা বাসনা জাগান, পূর্ণ করবার জন্যই; কিন্তু সে বাসনা শুদ্ধ বাসনা হওয়া চাই, তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে বাসনা জাগানো চাই।

কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ দুটী কথা বলছেন—(১) কর্ম্ম ছেড়ো না (২) কর্ম্ম ফলের হেতু হয়ো না। প্রথমটীর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি। দ্বিতীয়টী নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।—কর্ম্ম ফল কি?—শ্রীকৃষ্ণ তাকে তিনটী ভাগে ভাগ করেছেন—(১) সিদ্ধি ও অসিদ্ধি (success and failure), (২) সুকৃত ও দুষ্কৃত (virtue and sin); (৩) জন্ম-বন্ধন (cycle of rebirth)! কর্ম্ম করতে গেলেই এ গুলো আসবে। কি রকম, বলছি! একটা কিছু করতে গেলেই তো ফল কল্পনা করি আমরা? মনটা তখনই দুলতে থাকে—"হবে, কি হবে না।" —পাব কি পাব না।" যদি কল্পনার অনুরূপ ফল পাই—তো সুখী হই; এরই নাম সিদ্ধিতে হর্ষ। আর যদি না পাই তো বেজার হই—এরই নাম অসিদ্ধিতে শোক। এই হল কর্ম্মের প্রথম ফল—নিজের অন্তরে এই দাগ পড়ল। তার পর কর্ম্মের দ্বিতীয় ফল হচ্ছে—সুকৃত-দুষ্কৃত বা পাপ-পুণ্য। যে কোনও কাজই করতে যাই না কেন, তাতে কারু ভাল, কারু মন্দ করি—কারু অভিশাপ বা কারু আশীর্ব্বাদ জুড়িয়ে নিই। অর্থাৎ আমার কর্ম্মে জগতের মাঝে একটা বিক্ষোভ হয়ই—সে কর্ম্ম যত ভালই হোক্ না কেন। রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে সংসার থেকে টেনে আনলেন—জগতের উপকার হল- কিন্তু তার পরিবারের দুর্দ্দশা হল। উচিত অনুচিত বিচার করছি না—দেখছি এ হয়। আর এই বিক্ষোভের দাগটাও বুকে লাগে। এই হল দ্বিতীয় কর্ম্ম ফল। তৃতীয় কর্ম্মফল হচ্ছে—জন্মান্তর। এইটাই সব চেয়ে ভীষণ! কর্ম্ম করতে গিয়ে বাসনার রাশ টেনে রাখতে পারি না—একটা বাসনায় আর একটা জুটিয়ে আনে। বাড়ীখানা পাকা করতে গিয়ে জমিদারীর ইচ্ছা হল, তাহতে লাঠীবাজী, জাল-জুচ্চোরী কত কি। সব বাসনা পূরণও হয় না—অশুদ্ধ বাসনা কিনা। কিন্তু যা চেয়েছ, ভগবান্ তা দেবেন; হয়ত এ জন্মে হয়ে উঠল না—তাই আর একবার জন্মাতে হল। জন্মালেই তো আবার সেই দেহের খাঁচায় আটকে পড়া—একে তো সময় নষ্ট, তার ওপর আরো নূতন কর্ম্মজালে জড়ানো। এতে হয়ত ২৫ বছর বয়স তোমার লাগল, গত জন্মে মরবার আগ পর্য্যন্ত যেটুকু lesson পড়েছিল—তা revise করতে। কি ভীষণ loss of time বল দেখি! তাই বারবার

জন্মানোটাকে জ্ঞানী এত ভয় করেন। সাধক অবস্থাতেই ভয় বটে, সিদ্ধ অবস্থাতে নয়। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাধি আয়ত্ত না কর্‌ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মর্‌তে চাই না, কেন না আবার জন্মাতে হলেই কতটা সময় বৃথা যাবে। কিন্তু সমাধি লাভ করে, সিদ্ধ হয়ে জগতের কল্যাণের জন্য হাজার বার জন্মাতে রাজী আছি—কেননা তখন যে জ্ঞান নিয়েই জন্মাব, জ্ঞানের ওপর দেহের আবরণটা তখন হবে খুব পাতলা—নূতন আলুর খোসার মত একটু ঘস্‌লেই উঠে যাবে।—যাক্! এই তো দেখ্‌লে কর্ম্মফল—সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য বোধ আর জন্মান্তর। কাজ কর্‌তে গেলেই এই গুলো এসে জুট্‌বে; অথচ ভগবান্ বল্‌ছেন, "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"—অকর্ম্মা হয়ো না। তা হলে কি করে কাজ কর্‌ব?—উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে—**ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কাজ কর।** সেই কথাটী ৪৮-৫১ শ্লোক পর্য্যন্ত বুঝিয়ে বল্‌ছেন।

বল্‌ছেন—যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"—

যোগযুক্ত হয়ে কাজ কর—অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিশিয়ে দিয়ে—তাঁকে সাক্ষী রেখে, তাঁর প্রেরণায় কাজ কর। সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি বা কামসঙ্কল্প বা মতলববাজী ছাড়। ফলে সিদ্ধিই হোক্, অসিদ্ধিই হোক্—নির্ব্বিকার থেকো। যা হবার, তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে এবং মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে। তোমার যতটুকু কর্‌বার, তাঁর ইচ্ছাতেই করেছ—ব্যস্। (৪৮)

তার পরের শ্লোকে বল্‌ছেন, বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ অবলম্বন কর। জ্ঞানীর মত কর্ম্ম কর। জ্ঞানী মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখছেন,—দেখ্‌ছেন তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে—এই দেহ-মন মায়ের হাতেরই যন্ত্র মাত্র। মা আমাকে দিয়ে এই করাতে চান্।—আচ্ছা, তাই হোক্। আমি শুধু আনন্দময়ীর আনন্দলীলা দেখে যাচ্ছি। তা বলে এলিয়ে পড়্‌ব না—ক্লীব হব না—হৃদয় দুর্ব্বল কর্‌ব না। সিংহ বাহিনীকেই বহন কর্‌ছি—কিন্তু সিংহের মত তেজ বুকে নিয়ে। এইখানেই আমাদের গোল আমরা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে গুতা খাই—আর বলি, তাঁর ইচ্ছা। এ অজ্ঞান— ঘোর তমঃ। তার চাইতে বরং রজোগুণের কর্ম্ম ভাল। জ্ঞানী যে দেখে যাচ্ছেন—সে দেখা বীরের মত। যীশু জান্‌তেন, Judus তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তাঁকে সবাই মেরে ফেল্‌বে—জেনেও বিচলিত হননি বা পালাবার চেষ্টা করেননি, কি Judusএর প্রতি তাঁর মনোভাব বিকৃত হয়নি। বুদ্ধদেব জান্‌তেন, কর্ম্মকারের হাতের খাবার খেয়েই তাঁর প্রাণ যাবে, জেনেও, সে খাবার প্রত্যাখ্যান করেন নি—যারা জান্‌ত না, তারা প্রসাদ চেয়েছিল, দেন নি। শ্রীকৃষ্ণ জান্‌তেন, ব্যাধ তাঁর প্রাণ বধ কর্‌বে, তাঁর যাওয়ার সময় হয়েছে—তাই নিজেই এমনভাবে সব আয়োজন কর্‌লেন, যাতে ব্যাধ তাঁকে স্বচ্ছন্দে মার্‌তে পারে। এ সব কি প্রচণ্ড শক্তির পরিচয়! অতএব জ্ঞানী যে সব দেখে যাবেন এমনি শক্তিধর হয়ে, যা হবার তাই হবে—এটা অজ্ঞানের বুলি নয়। কি হবে, তা জানি—জেনে বিচলিত নই। মৃত্যু হোক, তাতেও কাতর নই। হৃদয়ে **মহাশক্তির প্রেরণা অনুভব করে,** তবে নিজকে ছেড়ে দেওয়া। এইটী বিশেষ করে লক্ষ্য করো। এইখানেই আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমরা ক্লীবের মত গুতা খাই, আর বলি, যা হবার হল। এ গীতার শিক্ষা নয়। (৪৯)

তার পরের শ্লোকে বল্‌ছেন,—জ্ঞান হলে পূর্ব কর্ম্মের দরুণ যে পাপ-পুণ্য তা তোমায় স্পর্শ কর্‌বে

না। কেন না, তুমি যে জান্‌ছ, তোমাকে দিয়ে ভগবান্‌ এই করাবেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে টেনে আন্‌লেন, পরিবারের কষ্টের দিকে তাকালেন না—কেন না, তিনি **জানেন,** এই পরিবারের প্রতি এ অন্যায় টুকু তাঁকে কর্‌তেই হবে—তাতে জগৎ যে উদ্ধার হয়ে যাবে। নিজেই বল্‌তেন, "মায়ের বুক থেকে ছেলে কেড়ে আনি আমি, তাতে কত শক্তিকেই রুষ্টা করেছি।" কিন্তু তিনি জগতের জন্য তা করছেন, তাই এ তাঁকে কলঙ্কিত কর্‌ছে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নরহত্যা হল—পাপ বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন জ্ঞান দৃষ্টি দিলেন অর্জ্জুনকে, কিসে কি হচ্ছে বুঝিয়ে দিলেন, তখন অর্জ্জুন দেখ্‌লেন—এ তাঁর কর্ত্তব্য, নির্ব্বিকার হয়ে তাকে করে যেতে হবে—আত্মস্বার্থের প্ররোচনায় নয়—হিংসার তাড়নায় নয়। (৫০)

এমনি করে চিত্তকে সমস্ত কর্ম্মে নির্ব্বিকার রাখ্‌তে পার্‌লে, সব রকম কামনা ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে কর্ম্মযোগের সাধনা হতেই শক্তি লাভ হয়—সমাধি হয়। তখন আর বার বার এ জগতে আস্‌তে হয় না। (৫১)

নির্ব্বিকার হয়ে কাজ করে যাও মানে—পূর্ণ জ্ঞানে জাগ্রত থাকা বুঝ্‌তে হবে—বিশ্বের শক্তিকে হৃদয়ে অনুভব কর্‌তে হবে—যা খুসী তাই কর্‌বার ক্ষমতা লাভ কর্‌তে হবে—Christineএর মত প্রচণ্ড will power অর্জ্জন কর্‌তে হবে। নইলে জড়ভরত আর সমাধিস্থ পুরুষে তফাৎ কি? জগতে এমন অনেক লোকই দেখা যায়—যারা callous; তারাই কি নিষ্কাম কর্ম্মযোগী? তা নয়। "আমিই বিশ্বের মহাশক্তি" এই জ্ঞান অন্তরে রেখে তবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। জান্‌ছি সবই তো আমারই লীলা। আমার এই দেহ মন আমারই অনন্ত শক্তির একটা তরঙ্গ মাত্র—একে দিয়ে যা কাজ হচ্ছে—তা আমারই ভাগবতী ইচ্ছায় হচ্ছে—তার জন্য আমার কোনও বিচলিত ভাব নাই। এমনি করে চিন্ময়ীরভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে তবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর্‌তে হবে। নইলে ফল পাওয়ার শক্তি আমার নাই, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর্‌ছি—এ হচ্ছে ঘোর তামসিকতা। গীতা তাই বার বার বল্‌ছেন—

"বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ"—

জ্ঞানের শরণ নাও। (৫২)—সে জ্ঞান কি? বই পড়া জ্ঞান নয়—Realisation—উপলব্ধি। সে জ্ঞান আত্মস্বরূপের জ্ঞান—সে জ্ঞান জগৎ রহস্যের জ্ঞান। আমি জান্‌ছি—আমি সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি—আমিই জগজ্জননী। আমি জান্‌ছি—এ জগৎ আমারই লীলা, আমারই শক্তির প্রকাশ। এই অনুভূতিতে তন্ময় হয়ে, সমাধি লাভ করে—তার পর এই ব্যষ্টি দেহ মন দিয়ে সুখ-দুঃখ যা কিছু ভোগ কর্‌বার, ভাল মন্দ যা কিছু কর্ম্ম কর্‌বার **নির্ব্বিকার** হয়ে কর্‌ছি। নির্ব্বিকার হয়ে কর্‌ছি মানে—এই জাগ্রত অবস্থাতেও আমি **সমাধিস্থ।** আমার এমন শক্তি থাকা চাই যে ইচ্ছা কর্‌লে আমি এই মুহূর্ত্তে নির্ব্বিকল্প—সমাধিতে ডুবে যেতে পারি। এই শক্তি ভিতরে রেখে তবে "যা হবার তাই হোক্‌" বল্‌ছি। রামকৃষ্ণদেব গলার ঘাতে কষ্ট পেলেন—"যা হবার তাই হোক্‌" বলে। এখন এই কথাটা তিন রকম ভাবে বলা চলে। হতাশ হয়ে বলা চলে—"কি আর কর্‌ব। কষ্ট ভোগ কর্‌তেই হবে, কর্‌ছি—যা হবার তাই হোক্‌।"—এই বল্‌ছি, আর যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি, সাধারণ জীব যেমন করে। আবার কেউ খুব সহিষ্ণু হতে পারে—অসাধারণ সহ্যশক্তি নিয়ে বল্‌তেও পারে—"যা হবার হোক্‌, care করি না" এরা মন্দের ভাল। আর ইচ্ছা কর্‌লেই দেহ

হতে মনকে সমাধি-ভূমিতে তুলে নিচ্ছি—এই শক্তি নিয়ে বল্‌ছি—"আচ্ছা, হোক্ না যা হবার তাই।" এইটাই হচ্ছে আসল বলা।

তবেই দেখ্‌তে পাচ্ছ—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ পূর্ণ জ্ঞান ভিতরে নিয়ে কর্‌তে হবে। এই হচ্ছে লক্ষ্য। অর্থাৎ সমাধির পর ফিরে এসে ঠিক ঠিক ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হয়ে কাজ করা চলে। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সিদ্ধ মহাপুরুষরাই হতে পারেন। কিন্তু এই কর্ম্মযোগের একটা সাধনাও আছে—সেটাকেও সাধকরূপে আমরা গ্রহণ কর্‌তে পারি। সে হচ্ছে —কোনো কামনা না রেখে কাজ করে যাওয়া—তাতে জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়তা হয়। বিশেষতঃ কর্ম্ম যখন ছাড়্‌তে পার্‌ব না—মনের চিন্তাও তো কর্ম্ম। কিন্তু এর মাঝেও জ্ঞানের প্রতি—সমাধির প্রতি—ধ্যানের প্রতি মনটাকে ফিরিয়ে রাখ্‌তে হবে। ওইটা আগে—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কাজ করা পরে। নইলে যে ধ্যানী নয়, সে কামনা শূন্য হয়ে কাজ কর্‌লেও চরম সত্য লাভ কর্‌তে পার্‌বে না—যদিও তার চিত্ত খুব শক্ত ও নির্ব্বিকার হবে। বারো বছর নিষ্কাম কর্ম্ম করে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। অর্দ্ধেক সত্য লাভ করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের ব্যবস্থা থাক্‌লে পূর্ণ সত্য লাভ কর্‌তে পার্‌তাম।

তা ছাড়া—"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান ভিতরে না থাক্‌লে পর কর্ম্মযোগ weakness, callousness, fear এই সব নিয়ে আস্‌তে পারে। অতএব, আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা quote কর্‌ছি—"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি"—"বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ"—যোগযুক্ত হয়ে কর্ম্ম কর ; **জ্ঞানের** শরণ নাও।

ক্রমশঃ

কৃপার কথা

কৃপা জিনিষটা সম্পূর্ণ খুসীর উপর নির্ভর করে। জোর-জুলুম করে কৃপা আদায় করা যায় না। জগৎ কর্ত্তা সন্তুষ্ট হয়ে যদি কিছু দেন তবেই আমাদের তা প্রাপ্য—তা না হলে অর্থাৎ তাঁর খুসী না হলে তাঁর কাছ থেকে আমরা কি পেতে পারি? উপনিষদেও আছে—

> নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> 　　ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
> 　　আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

কৃপা মানে খুসী। অর্থাৎ তিনি যার উপর খুসী হবেন, সে-ই কৃপা লাভে ধন্য হয়ে যাবে। কাজেই কৃপার উপর তো কোন যুক্তি-বিচার খাটবে না। এর উপর কৃপা না করে, তার উপর কেন কৃপা কর্‌লেন, এর কোন কৈফিয়ৎ নাই। আগেই বলেছি কৃপা মানে—তার খুসী—খেয়াল।

যারা আত্ম-শক্তিতে সাধন-ভজন করে উন্নত হবার যোগ্য নয়, অর্থাৎ যারা একমাত্র কৃপাভিখারী তাদের নিজের কোন মান-অভিমান থাকা উচিত নয়। কৃপাভিখারীর স্থির বিশ্বাস থাকা চাই—অর্থাৎ তিনি একদিন কৃপা কর্‌বেনই—প্রাণে এই জোরটুকু থাকা চাই।

চাওয়াটা আমার কাছে, কিন্তু দেওয়াটা তো সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। খুসী হলে, কিম্বা তাঁকে খুসী কর্‌তে পার্‌লে হয়ত আমার

চাওয়ায় বরাদ্দের চেয়েও তিনি বেশী কিছু দিয়ে বস্‌বেন। বাস্তবিকই মানুষ কামনা করে ঠকে শুধু—তাঁর উপর নির্ভর কর্‌লে, তাঁর দানে তখন ক্ষুদ্র আধার পরিপূর্ণ হয়ে উপ্‌চে পড়ে।

একমাত্র আমার প্রয়োজনে যখন তাঁকে আস্‌তে হয়, তখন তিনি অনেক ছোট হয়ে আসেন, কিন্তু আমার কামনা-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ, প্রয়োজন এ সব যখন কিছুই থাকে না, তখনই দেখি তিনি পরিপূর্ণরূপে আসেন—তার প্রমাণ, আমার ক্ষুদ্র আধার তখন তাঁর অসীম কৃপা ধারণে অসমর্থ হয়ে ওঠে। আমার প্রাণ তখন যায় যায় আর কি?

চেয়েই যে মানুষ পাওয়ার পথ বন্ধ করে, কিম্বা যতখানি পেত, তা থেকে বঞ্চিত হয়, এ কথা মানুষ বুঝে না। তবে কি মানুষের ভিতর তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগা উচিত নয়? না, তা হবে কেন? প্রার্থনা কর্‌তে হবে—"প্রভু, তুমি এসো! কিন্তু আমি যেন তোমার প্রকাশের পথে বিঘ্ন না হই। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা যেন—তোমার মহান ইচ্ছাকে বাধা প্রদান না করে, মোট কথা আমি কিছুই জানি না—আমাকে নিয়ে তোমার যা খুসী তাই কর।"—এই হল প্রকৃত কৃপাভিলাষীর প্রাণের উক্তি। কি দিয়ে যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিসে যে তিনি সন্তুষ্ট হন—তা মানুষে বুঝ্‌বে কেমন করে, যদি তিনি নিজে কৃপা করে এসে সে পথ দেখিয়ে না যান। বুদ্ধি দিয়ে, পাণ্ডিত্য দিয়ে কিছুতেই তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না—এইজন্যই বলা হয় ভগবানকে লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কঠিন বটে, কিন্তু আবার তিনি নিজে এসে যখন ধরা দিয়ে বসেন, তখন দেখি, বাঃ, তাঁকে পাওয়া যে কত সহজ। আধ্যাত্মিক জগতের এই এক গূঢ় রহস্য।

তিনি খুসী হয়ে যা দেন, আমার চাওয়ার চেয়ে তাঁর পরিমাণ অনেক বেশী। এইজন্যই বলি, নিজের বিদ্যাটুকু জাহির না করে, তাঁর উপর নির্ভর করে বসে থাকাই সব চেয়ে শ্রেয়ঃ। আমি চাই আমার নিজের প্রয়োজনে—কিন্তু তিনি যখন খুসী হয়ে আমাকে কিছু দেন, তখন তো তাঁর মনে আমার প্রয়োজনের কথা জাগে না। তাহ'লে তো আমার আনন্দ উপ্‌চে পড়্‌ত না। তিনি খুসী হয়ে যা দেন, তাতে যে আমার প্রয়োজনও মিটে—আবার প্রাচুর্য্যের এক উৎসবও লেগে যায়। অর্থাৎ বিচারাবিচার করে তিনি কিছু দেন না বলেই—সবটুকু কৃপা ধারণ করেও রাখ্‌তে পারি না। এতেও এক অপার আনন্দই অনুভব করি।

মানুষ বুঝে না বলেই চায়—তা না হ'লে তিনি যে দেবার দরুণ উন্মুখ হয়েই আছেন। আমার যে ঠিক ঠিক কি প্রয়োজন—তা-ও তো আমি জানি না—তাহলে কি আর চাওয়ার মাঝে ব্যভিচার হত? এইজন্যই সব চেয়ে নিরাপদ হল—তাঁর উপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে চলা।

কৃপার দান, সন্তুষ্টের দান, কর্ত্তব্যের দানের চেয়ে অনেক উপরে। এইজন্যই কর্ম্ম করে যা পাই—তাতে প্রাণ ভরে না। কর্ম্ম সার্থক হয় তিনি যখন আমার কর্ম্মের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার তাকান।

চাওয়াটাও পাওয়ার পক্ষে এক মহা বিঘ্ন। হয়ত তিনি যা দিতেন, চেয়ে আমি সে পথ বন্ধ করে দিলাম মাত্র। আমি চাইলে তো—তার খুসী মত তিনি আমায় দিতে পারলেন না কিছু। কাজেই অল্প নিয়েই আমাকে ফির্‌তে হয়।

কিছু চাওয়া উচিত নয়, তবে কি মানুষ জড়-পিণ্ড হয়ে যাবে? তা নয়! তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌তে হবে—"প্রভু! আমি যে কি চাই, ঠিক ঠিক আমি তা ধর্‌তে পার্‌ছি না। আমার মাঝে চাওয়াটাকে তুমি স্পষ্ট করে তোল। অনেক কিছু পাচ্ছি কোনটাই তো স্থায়ী হচ্ছে না। তবে তো

আমার চাওয়ার মাঝেই গলদ রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। প্রার্থনা করার পূর্ব্বে, চাওয়ার পূর্ব্বে, আমি কি প্রার্থনা করব, কি চাইব তা আমাকে বলে দাও।"

চেষ্টা-যত্ন করে তাঁকে খুসী করা যায় না, তিনি নিজে যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন না হন। এইজন্যই কিসে যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এর কারণ খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। তিনি যখন খুসী হন, তখন দেখি আমার শত শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি খুসী। আবার দেখি শত কাজ করেও তাঁকে তুষ্ট করতে পারি না। কাজেই কি করলে যে তিনি সন্তুষ্ট হবেন—এ কথা কেউ বলতে পারে না। উপনিষদের সেই কথাই ফিরে এল—"তিনি নিজে যাকে বরণ করে লন।"

চিন্তা করে দেখ্‌লে বুঝি, আমরা কত অসহায়, কত অক্ষম, কত অজ্ঞ। প্রকৃতিকে জয় করে ফেল্‌ব বলি, কিন্তু প্রকৃতির সকল রহস্যই তো বুঝে উঠ্‌তে পারি না, তাই তো তাকে চিণ্ময়ী প্রকৃতি, জড়াপ্রকৃতি নামে আখ্যা দিতে হয়। আমার সবখানি যখন আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না, তখন সর্ব্বজ্ঞের কাছে আত্ম নিবেদন করাই কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? অর্জ্জুনের মাঝে বিষাদযোগ এসেছিল। কিন্তু অর্জ্জুনের নাড়ী নক্ষত্র সবই তো শ্রীকৃষ্ণ জান্‌তেন কিনা, তাই তার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে কঠোর কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশই দিলেন তাকে!

আমাদের জীবনের লক্ষ্য যে কি, কি করলে যে আমাদের শ্রেয়ঃ হবে—আমাদের স্বল্পবুদ্ধি দিয়ে তা আমরা ধরতে পারি না—কিন্তু অভিমানটী আছে সর্ব্বজ্ঞের মত। কিছুই যখন জানি না—তখন যিনি সব জানেন তাঁর শরণাপন্ন হওয়াই কি কল্যাণকর নয়?

নিজের প্রকৃতি যে মানুষ অনেক সময় ধরতে পারে, তা প্রকৃতি কৃপা করে তার রহস্য জানিয়ে দেয় বলেই। আত্ম শক্তিতে আমরা কিছু দূর পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারি—তার পরেই অনির্ব্বচনীয় বাদ, মায়াবাদ, কৃপাবাদ স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ এর পর যে কিসে কি হয় তার কার্য্য-কারণ সূত্র আমরা আবিষ্কার করতে পারি না। বিচার-বিশ্লেষণের রাজ্য খুবই ছোট—কিন্তু বিচারাতীত রাজ্যের ব্যাপ্তির অন্ত নাই। মানুষ যখন কৃপাবাদের অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখনই মানুষের ভিতর প্রকৃত ব্যাকুলতা আসে, কেন না জানার অভিমানের চেয়ে, না জানার যোগ্যই বেশী করে জেগে উঠে তখন। শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই কৃপা স্বীকার করতে হয়—তা প্রকৃতিরই হোক, পুরুষেরই হোক, দেবতারই হোক, আর মানুষেরই হোক।

আমরা জানি না এ কথাও ঠিক—আবার তিনি যখন কৃপা করে বুঝিয়ে দেন, তখন সব জানি, সবই বুঝি।

বক্তা-শ্রোতা

শাস্ত্র কথায় আজকাল অনেকেরই মন মজেনা। মাসিকপত্রিকাদিতে শাস্ত্রীয় প্রবন্ধের যত না উদ্‌গ্রীব পাঠক পাওয়া যায় তার চেয়ে ঢের বেশী পাওয়া যায় উপন্যাস বা গল্প-পাঠক। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে একদল বলবেন যে, যারা শাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে একেবারে নীরস হয়ে গেছেন, স্বাভাবিক বস্তু যা, তা তাদের চোখে না প'ড়ে কেবল শাস্ত্রের কুটমটির ভিতর দিয়ে সব তাদের চোখে পড়ে। তাই ও সব প্রবন্ধ কেবল ঘোরালো চশমাওয়ালাদেরই ভাল লাগ্‌বে, আমাদের সাফ (স্বাভাবিক) চোখে ও সবের মাহাত্ম্য ধরা পড়েনা। আর একদল হয়ত নব্য পাঠকদের মস্তিষ্কশক্তির ও রুচির নিন্দায় মুখর হয়ে শুধু এক তরফা গাল দিয়েই নিরস্ত হবেন।

কিন্তু লেখক ও পাঠক উভয়দলেই যদি ধৈর্য্য ধারণ ক'রে আপনাপন ত্রুটীর অনুসন্ধান করেন ও বিরুদ্ধপক্ষের কথা বিদ্বেষবিহীনভাবে বিচার করেন, তবে লেখক ও পাঠক উভয় দলেরই উন্নতি হয়। আর এই লেখক ও পাঠক নিয়েই যখন দেশের শিক্ষিত সমাজ গঠিত এবং অশিক্ষিত সমাজ শিক্ষিতদেরই প্রভাবে প্রভাবিত হয়, তখন শুধু দেশের সাহিত্যই যে দেশের গতি পরিবর্ত্তিত ও উন্নত কর্‌তে পারে, তা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিক যা হয়, তাই চিত্রিত কর্‌তে গিয়ে শুধু কেবল অবনত দিকটাই যদি সাহিত্যে বা চিত্রে চিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং জনসমাজ তাই যদি নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ ক'রে খুসী হয়, তবে বুঝ্‌তে হবে দেশের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। মন্দ যেমন স্বাভাবিক, চেষ্টা ও উন্নতিও তেমনি স্বাভাবিক। তাই কোনও কবি বা লেখকই শুধু মন্দ দিকটাই লেখার মাঝ দিয়ে সকলের চোখে উজ্জ্বল করে ধরেন না, সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর সত্যের সৌন্দর্য্য ও মহিমাও প্রকটিত করেন। তাই অমাবস্যার পরে পূর্ণিমার মত, দুঃখের পরে সুখের মত তা সকলের উপভোগ্য হয়। কিন্তু এই অবনত ও উন্নত অবস্থার মাঝে যে সুতীব্র প্রচেষ্টা, প্রাণপাতী সংগ্রাম, সত্যের সাধক ভিন্ন সাধারণের চোখে তা বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয় না। তাই সত্য সাধকের সাদা চোখ আর সাধারণের সাদা চোখের মাঝে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। সাধকের পক্ষে যা স্বাভাবিক, অসাধকের পক্ষে তা দুরূহ বা অস্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, নিম্নস্তরের অনুভূতি অধিকাংশ লোকের পক্ষে সুগম ব'লে কেবল তারই প্রচারে লেখক হয়ত সাধারণের পরিচিত হবার শীঘ্র সুযোগ পান, কিন্তু তাতেই দেশের উন্নতি বা যথার্থ সেবা হয় না।

সাহিত্য দেশের উন্নতি-অবনতির মাপকাঠী। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নানা বিভাগে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু নৌকার মাঝিরা বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভাবে নৌকা বাহিলেও যেমন যে হাল ধ'রে থাকে, সেই কর্ণধারের ঈপ্সিত দিকেই নৌকা চলে, তেমনি সাধারণে যা-ই করুক না কেন, দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকদিগের চিন্তানুসারেই দেশের গতি কোন্‌দিকে তা ধরা পড়ে। কারণ, সাধারণের মধ্যে যা স্বাভাবিক, সাহিত্যিকেরা তাই ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধু যা স্বাভাবিক, কেবল তাই ফুটিয়ে তুল্‌তে গিয়ে যদি

নিম্নস্তরের স্বভাবকেই ফুটানো হয়, উন্নতস্তরের স্বভাবের এক আধটু বিকাশ তার মাঝে না থাকে, তবে সে কাব্য সেখানেই মৃতপ্রায় যে। অতি অল্পে অল্পে যেমন রাতের আঁধার কেটে দিনের আবির্ভাব হয়, তেমনি সাহিত্যিকেরা অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত জন সমাজের মন সৌন্দর্য্য-প্রেমে আকৃষ্ট ক'রে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যান। দেশের লোকের রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ দিন দিন উন্নত করার দায়িত্ব তাই শিক্ষিত ও সাহিত্যিক দিগের যতখানি, ততখানি আর কারো নয়। এই মহান্ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রে যাঁরা বঙ্গবাণীর বা যে কোনও ভাষার সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের যে কতদূর ধীরস্থির, সংযমী, শক্তিশালী হয়ে পরের মন আকর্ষণ করতে হয়, তা আর বল্‌বার নয়। দেশের ভিত্তি দেশের আভ্যন্তরিক চিন্তা-ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা গঠন করেন প্রবীণ সাহিত্যিকেরা তাঁদের প্রাণ-মন-বিমোহন সাহিত্যের ভিতর দিয়া। কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ছাড়াও আরও যে কতখানি ও কতরকমের দায়িত্ব তাঁদের, সে কথা ভাবেন ক'জন লেখক ?

কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে যেমন এই কথা, দর্শনা-লোচনা বা শাস্ত্রপাঠ সম্বন্ধেও এই কথা। কেবল শুধু ভাবের আবেগই মানুষের জীবনের সর্ব্বস্ব নয়—চলার পথে তার বিচারও চাই। কাব্য যেমন মানুষকে প্রেমের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে মুগ্ধ করে, দর্শনও তেমনি জীবনের বহু সমস্যা সমাধান ক'রে সত্যপিপাসুকে মহান্ আনন্দ দান করে। কাব্য বল্‌তে যেমন শুধু সংস্কৃত কাব্য না বুঝিয়ে প্রত্যেক উন্নত ভাষার কাব্যকেই বুঝায়, তেমনি দর্শন বল্‌তে শুধু সংস্কৃত দর্শনই নয়—প্রত্যেক উন্নতজাতির চিন্তাধারাই তাদের দর্শনে স্থান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের দর্শন বল্‌তে সংস্কৃত দর্শনই বুঝি এবং শাস্ত্র বল্‌তে সংস্কৃত ভাষার কচ্‌মচিই বুঝি—তা এখন সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রই হোক, আর দর্শন শাস্ত্রই হোক। সংস্কৃত হলেই তা সাধারণের কাছে দুরূহ।

কিন্তু সাধারণের কাছে না হয় সংস্কৃতভাষা দুরূহ বলে শাস্ত্র-চর্চ্চা নীরস হতে পারে, শিক্ষিত লোকের কাছে তা হয় কেন ? তার কারণ, আমাদের চিন্তার বিষয়ই অত্যন্ত স্বল্প বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। জীবনে মোহটাকেই খুব বড় আসন দিয়ে তারই জয়গানে আমরা ব্যাপৃত। সৌন্দর্য্যের মোহে সত্য বস্তুর অনুসন্ধান আমরা ভুলে যাই। এমন কি সত্য-সাধনার আয়াসটুকুও যাতে স্বীকার করতে না হয়, সে জন্য যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী নানা বচন রচনে নিজেকে ভুলিয়েই রাখ্‌তে চাই বেশী। কাব্যচর্চ্চার নামে নিজের মনের মলিন সংস্কারগুলিই যাতে আরও দৃঢ়মূল হয়, তারই সন্ধানে ব্যাপৃত থাকি। কিন্তু কাব্যময় জীবনেরও প্রথমে যে তপস্যার আগুনে নিজেকে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়, সে কথা মনে থাকে না। তাই অ-সংস্কৃত মনে সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ সত্য-ভাবের কথা ভাল লাগ্‌বে কেন ? এই হল আমাদের মত শতকরা নিরান্নব্বই জন পাঠকের অবস্থা।

তারপর আসল কথা হচ্ছে শাস্ত্র শোনাবে কে ? কার কথায় শাস্ত্র বাক্যে তেমন গভীর বিশ্বাস আসবে ? একেই তো নানা অত্যাচার ও অনাচারে মন আমাদের কত পুরুষ থেকে যে অবিশ্বাসের ধ্বজা উড়িয়ে আস্‌ছে তার ঠিক নাই, তারপর হঠাৎ যার কাছে এসে শাস্ত্র কথা শুনতে পেলাম, তার মুখে ও কাজে আদৌ সামঞ্জস্য নাই। মুখে সত্য-বাক্যের মহিমা জয় গানে যিনি মুখর, তারই কার্য্যাবলীর মাঝে যদি সত্যের তিলমাত্রও সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে সে সত্য প্রচারে সত্যের আরও

অপলাপ হয়। যিনি বল্‌ছেন—Follow my words, not me—আমার বাণীর অনুসরণ কর, আমাকে নয়—তাঁর জীবনের সব না হউক, অন্ততঃ কিছুটা ভাগ যদি সত্যের জন্য তীব্র সাধনায় ব্যয়িত না হয়, তবে আর সাধারণের চেয়ে তিনি কোন্ দিকে বিশেষত্ব অর্জ্জন করলেন, যে তারই জোরে অপরের উপর তিনি অমন আদেশ বা উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা রাখ্‌বেন? উপনিষদে এই ধরণের উপদেষ্টাকে দুর্ব্বল ধানুকীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুর্ব্বল ধানুকীর তীর যেমন তার ধনু হতে নিক্ষিপ্ত হলেও লক্ষ্যস্থলে পৌছাতে না পেরে সে স্থল বিদ্ধ করতে পারে না, অতপস্বী বা অব্রহ্মচারীর বাক্যও তেমনি শ্রোতার হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করে তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। কাজেই কেবল সম্মানের লোভে উপদেষ্টার আসনে বসলেই হল না, তার সম্মান রক্ষা করতে হলে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

শাস্ত্রে আছে বল্‌লেই লোকে মানবে কেন? তাদের শাস্ত্রের উপর তত বিশ্বাস নাই, কেন না ওটা শোনা কথা, তারা নিজেরা হয়ত জানে না। কিন্তু তারা জানে শাস্ত্রের প্রবক্তা তোমাকে। নির্জীব পুঁথির কাগজে প্রাণ নাই, কিন্তু প্রাণ আছে তোমাতে। প্রাণ চায় প্রাণবন্তকে। মানুষের প্রাণ আছে, তাই তারা চায় শাস্ত্রের প্রাণস্বরূপ শাস্ত্রময় জীবন্ত একজন মানুষ। প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবেসে যদি তারা আনন্দ পায়, তবেই তাদের মাঝে তাঁর প্রভাবে অলক্ষ্যে শাস্ত্র বাক্য প্রবেশ করবে, এবং অক্ষরে অক্ষরে তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। নতুবা চর্ব্বিত চর্ব্বণ শাস্ত্র বাক্যের নীরসতা কারোও প্রাণকে সরস করতে—আনন্দ দিতে পারবে না। অথচ এ কথাও ঠিক যে, কাব্যের চেয়ে দর্শনের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনের বহু জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। কাব্যের মত দর্শনও নিশ্চয় এক সময়ে সমাজের বহুজনের স্বভাব ও অভাবের সুদীর্ঘ পর্য্যালোচনা থেকেই উদ্ভব হয়েছে। সে জন্য বিশিষ্ট একটী দর্শন বিশিষ্ট এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে জীবনের পরম আশ্রয় স্বরূপ হয়েছে। অবশ্য বল্‌তে পার যে, তাহলে বিশিষ্ট দর্শন বিশিষ্ট এক শ্রেণীর লোকের জন্য, কোনও দর্শনই (universal) বিশ্বের সকলের জন্য নয়। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিভিন্নস্তরের মনোবৃত্তিধারী মানুষের জন্য বিভিন্ন পন্থা স্বীকার ও সৃষ্টি করেই ভারতে এত ধর্ম্মের উদ্ভব এবং ভারত এত বৈচিত্র্যের আকর।

কিন্তু যিনি যে ধর্ম্মের বা যে শাস্ত্রেরই মহিমা প্রচার করুন না কেন, নিজের জীবনে সেই ধর্ম্ম বা শাস্ত্র বিশেষভাবে ফলিয়ে তুল্‌তে না পারলে তাঁর পক্ষে সে প্রচার কার্য্য থেকে বিরত হওয়াই উচিত। বরং নিজের সাধনায় ব্রতী থেকে নিজের জীবনের সঙ্কটও পরিত্রাণের উপায়গুলি বন্ধু ভাবে অপরকে জানালে অপরের চিত্তে দাগ পড়ে বেশী, কিন্তু শুধু ধর্ম্ম প্রচারে নিজের বা অপরের কাহারও তেমন লাভ নাই। প্রত্যেকের নিজের জীবনই অগাধ শাস্ত্রে পরিণত হতে পারে যদি তা অধ্যয়ন করার কৌশল সে নিজে জানতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের কত সমস্যাই যে আমাদের চিত্তকে কতবার কত প্রকারে আন্দোলিত করে, তার ইয়ত্তা নাই। সে সমস্তের সুন্দর মীমাংসা করে চলবার মত বুদ্ধি বা চিত্তের বল আমাদের অনেকেরই নাই। যথার্থ উপদেষ্টার কাজ হচ্ছে সেখানে আমাদের দরদী হয়ে সমাধানের সাহায্য করা। কিন্তু যে নিজের জীবন নিয়েই আকুল সে আবার পথ দেখাবে কারে?

এই তো গেল শাস্ত্রবক্তার জীবনের কথা। তারপরে তাঁর বাণী সম্বন্ধেও অনেক বিচার করবার আছে। সাধারণ কথাও পরের মনের মত করে

না বললে অপরে তাতে আকৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রের কথা, জীবনের দোষ ত্রুটী বা সংগ্রামের কথা যে কত নীরস, তা বল্‌তে হলে যে কতখানি মনোরম করে বলা দরকার, তা বলে শেষ করা যায় না। অবশ্য যিনি সমস্ত সংগ্রামের পার হয়ে গিয়ে উর্দ্ধ জগতের প্রেরণায় বিশ্বহিতের জন্য আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসেন, সেই প্রকার মহাপুরুষের পক্ষে কথা বলবার নূতন কৌশল তেমন ভাবে নূতন করে শিখবার প্রয়োজন হয় না—তাঁদের বিশ্বময় প্রসারিত প্রাণের আকর্ষণে তাঁরা যে ভাবে যে কথা বলেন, তাই অনেকের প্রাণে একান্ত আকর্ষণের কারণ হয়, কিন্তু সাধারণ বক্তা বা লেখকের ভাগ্যে সাধারণতঃ তেমন ঘটে না। তাঁদের বলার ভঙ্গীটিও নিপুণতার সঙ্গে শিখ্‌তে হয়। প্রথমোক্তের দল আসেন চাপরাশ পাওয়ার পর—আর শেষোক্ত দল যেন বহুদিন খাটার পর চাপরাশ পান। যিনি চাপরাশ দেন, তিনিই প্রথমে এঁদের ভিতর অমনিভাবে লেখার বা বলার প্রেরণা দেন, নতুবা কেহই আপন অহমিকার জোরে এ পথে উন্নতি করতে পারেন না। তাই তপস্বী হয়ে, একাগ্র হয়ে দেবতার আরাধনা চাই, যেন দেবতার কৃপা তাঁকে মাত্র উপলক্ষ্য করে বিশ্বের মাঝে প্রসারিত হয়। নিজকে একান্ত শূন্য করে তাঁর আশায় থাকা চাই।

কিন্তু আমাদের হয় বিপরীত। সামান্য দুপাতা পড়তে না পড়তেই অথবা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে দু'একটা কথা শুন্‌তে না শুনতেই আমরা স্বয়ং সিদ্ধ হয়ে বসি আর উপদেষ্টা সেজে উপদেশের বস্তা খুলে ফেলি। প্রামাণ্য হোক্ বা না হোক্, বড় বড় কথায় নিজের মত চালাবার জন্য তখন এমন একটা নেশা চেপে বসে যে, সে উন্মত্ততা দেখে প্রাজ্ঞেরা উপহাস করেন। কিন্তু আমরা অজ্ঞ সমাজে বিজ্ঞ সাজ্‌তে কুণ্ঠিত হই না। স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অজুহাতে বহু সময়ে যে কত ঋষিবাক্য অশ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তার ইয়ত্তা নাই। আর যাঁরা তা শোনেন বা পড়েন তাঁদের মাঝে হয়ত অনেকই বড় বড় শাস্ত্রের নাম শুনেই এক অজানিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন। আর যাঁরা যথার্থ অভিজ্ঞ, তাঁরা সে উদ্দামতা বালসুলভ চপলতা মনে ক'রে উপেক্ষা পূর্ব্বক হেসে যান মাত্র। সুতরাং আমাদের উপর কথা বলার আর কেউ নাই।

পাণ্ডিত্যের দরুণ যদি পূর্ব্বে কিছু মাত্র প্রসিদ্ধি থাকে, তবে ত আর কথা নাই। অতি শীঘ্রই নিজের ও অপর সাধারণের অবনতির পথ অলক্ষ্যে প্রশস্ত হয়। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এ ভাব বেশী দিন টিক্‌তে পারে না। কালের করাল গতিতে একদিন ভ্রম ধরা পড়ে ও সংশোধন হয়। এই সব কারণে শাস্ত্রাধ্যায়ীর পক্ষে নিরভিমানতা একান্ত প্রয়োজন। অনন্ত অধিকারীর জন্য অনন্ত শাস্ত্র। তার মাঝে যেটা তুমি গ্রহণ করবে, তাতে সত্য জানবার জন্য জীবন ঢেলে দিবে। কিন্তু এ ভাবে তার মাঝ থেকে যে সত্য আহরণ করবে, তাই যে জগতের সকলের পক্ষেই খাটবে, তার প্রমাণ কি? তা ছাড়া তার মাঝে বড়াই করবারই বা কি রয়েছে? আমি যেটুকু জেনেছি, তাতে আমার অবশ্য একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই, কিন্তু তাই বলে জগতে যে আমার চেয়ে বড় অধিকারী নাই, বা এই সত্যেরই আরও ব্যাপকভাব করেও মাঝে প্রকটিত হবে না, তাই বা কে বল্‌লে? যথার্থ সাধক বা সিদ্ধ একান্ত বিশ্বাস অথচ সম্পূর্ণ নিরভিমানতার সঙ্গে আপনার মত পোষণ করবেন। এই দুটীর একত্র সংঘটন বড়ই বিরল।

এই ভাবে যেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মাঝে তপস্যা সঞ্চিত হয়, সেখানেই শাস্ত্র বাক্যের

মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। আর এই ভাবের "বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তে রমন্তে তত্র সম্পদঃ।" তা ভিন্ন গুরু গম্ভীর ঋষির তপোবনে স্নিগ্ধতা ও শান্তি নষ্ট করার জন্য কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল পশু প্রকৃতির জীবের প্রয়োজন নাই। জানি তাতে যথার্থ বক্তা ও শ্রোতার সংখ্যা হয়ত কম হবে, কিন্তু তাতে দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই। সংখ্যাধিক্যই সারবত্তার প্রমাণ নয়। যদি আমরা শাস্ত্রকে শুধু পুঁথির কচ্‌কচি করেই চিরকাল রেখে দেই, যদি তাকে জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত করে নিত্যকার সঙ্কটে তার মাঝে সান্ত্বনার বাণী না পাই, বুদ্ধি যদি আমাদের এতই ধূমায়িত থাকে যে, সে বাণীর অর্থ আমরা বুঝ্‌তে না পারি বা প্রাণের জ্বালা মিটাবার মত সেই বাণীর ভিতর দিয়ে একখানা সমবেদনা জ্ঞাপক হৃদয়েরই পরিচয় না পাই, তবে কাজ নাই আমাদের অমন লোক দেখানো নীরসশাস্ত্রবাক্য আওড়িয়ে। কিন্তু তবুও বলি, যা আমরা চাই, তা ওর মধ্যে রয়েছে; যদি যথার্থ প্রদর্শক বা গুরু মিলে তবে এই শাস্ত্রের মাঝেই এমন অমৃতের সন্ধান পাবে যে জীবন ধন্য হয়ে যাবে—আর কিছু চাইবার থাকবে না।

আত্মানুসন্ধান

নিজের মাঝে নিজকে খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন শিক্ষাতেই প্রাণ পূরবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মার মাঝে আলোকের সন্ধান পাবে, এই হল প্রাকৃত বিধানের মর্ম্ম কথা। বুদ্ধি স্বভাবতঃই এই বিধানের ভিতর দিয়ে পরিশীলিত হবার মত উপাদানে গঠিত হচ্ছে।

পরের জন্য আমার কি কর্‌বার রয়েছে? আসল কাজ আমির সন্ধান নেওয়া। আমাকেই মেলে ধর্‌তে পারি মাত্র—যার গরজ সে আপনি এগিয়ে এসে বরণ কর্‌বে। স্বরূপ বিচ্যুত হয়ে বা ব্যস্ত বিচলিত হয়ে কোন সত্যিকার কাজ হয় না। কাজের অভিমান, অহমিকার আস্ফালন—সান্ত শক্তিকে অনন্ত শক্তিতে যোগযুক্ত না জানারই এসব ফল। ক্ষুদ্রত্বকে তলিয়ে দিতে হবে মাত্র, তারপর মহত্ত্বের প্রভা আপনি প্রভাবিত কর্‌বে। আয়ত্ত কর্‌বার ব্যগ্রতাই সাধনা নয়, সাধনা হচ্ছে নিজে নিজের আয়ত্ত হবার ব্যগ্রতা। স্বাধীন হওয়া মানেই নিজকে নিজের অধীন করা। আত্মাধীনতাই সকল সাধনার গোড়ার কথা।

যা তোমার আত্মা নয়, যা তোমার পর, সেদিক থেকে চোখ তুলে নাও—বহির্ম্মুখী ব্যাকুলতা শান্ত-শীতল হোক্‌। এই তো সত্য।

হাজারো দিক্‌ দিয়ে বিচার করেও শেষ পর্য্যন্ত আত্মকেন্দ্রেই সাধককে অটল হয়ে বস্‌তে হবে এসে। আমার দুঃখ ঘুচাতে না পার্‌লে পরের সমস্যা মিটাব কি করে? তারপর শোনা যায়, সমস্যা জিনিসটাও নাকি মায়া। মায়া অর্থাৎ যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, প্রমাণ করা যায় না, অথচ স্বীকার কর্‌তে হয়। যার যার সমস্যা তার তার কাছে গুরুতর সত্য; কিন্তু মীমাংসকের কাছে মায়া। এ ক্ষেত্রে একজন আর একজনকে কি করে বোঝাতে পারে? লৌকিক কোন্‌ ন্যায়, কোন্‌ যুক্তি তার

সহায় হবে? একমাত্র সমাধান আপনার অলৌকিকত্ব। আমার অলৌকিকত্ব দিয়ে লৌকিক সমস্যার পরপারের কোন বস্তু সমস্যাগ্রস্তের প্রাণে আমি যদি সঞ্চারিত করতে পারি, তবেই মীমাংসা হবে খাঁটী। কারো বুদ্ধিকে কখনো তৃপ্ত করা যায় না। কারো লক্ষ্য কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না। শুধু অলক্ষ্য শক্তি সঞ্চারে অব্যক্ত প্রাণলীলায় মোহমুগ্ধ প্রাণে একটা মাদকতা ছুঁইয়ে দেওয়া যায় মাত্র। তাতেও সদ্য ফলের আশা দুরাশা। যদিস্যাৎ নিজের মাঝে সে সন্ধান সে পায়, তবেই তোমার দেওয়া সার্থক—তার সার্থকতাতেই তুমি সার্থক—নিছক তোমার বলে কোন সার্থকতা যদি তোমার কৃত জগদ্ধিতের মাঝে তুমি খুঁজতে যাও, সেটা অত্যন্ত ভুল হবে। জীবনে যদি কিছু পেয়ে থাক, একবার দাতাকে স্মরণ কর। তাঁর দেওয়া প্রমাণ করতে পারবে? কোন্ দুয়ার দিয়ে কখন যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তা কি তুমি জান্‌তে? মধু চিরকাল অজানা থেকেই আস্‌বে—এইটাই মধুর মধুত্ব। তাই তো দিনের পর দিন আকুলতা তোমার অন্ত পাবে না।

তুমি যে তোমাকে জান্‌ছ না, অথচ জান্‌তে চাচ্ছ, এই তোমার জীবনের অগতিত্ব। কোন্ অগতিতে গিয়ে এই গতির শেষ হয়ে আছে তা তুমি বল্‌তে পার না। বল্‌তে পার না বলেই, তোমার কাছে রহস্যময় বলেই তার উপর তোমার এত টান। যদি তুমি জান্‌তে আমি এই এবং আমার যা কিছু তা এই পর্য্যন্ত, তবে আর চলা হত না—নিজের মাঝে কোন নূতনত্ব খুঁজে পেতে না। বল্‌তে পার; নূতনত্ব একটা জঞ্জাল; চিরকালের সুঅভ্যস্ত প্রাকৃত পুরাতন নিয়মগুলো যদি এই মুহূর্ত্তে বিপর্য্যয়িত হয়ে যায়, তোমার ধাতে সইবে না। তাই দেখ, তুমি নূতন এবং পুরাতন দুই। তোমার ধাত পুরাতন বা প্রাক্তন, কিন্তু স্বয়ং তুমি চিরনূতন। তোমার তুমিকে নিত্যনূতনমত অজস্র ভঙ্গিমায় তুমি উপভোগ করছ। সুতরাং নিজকে অফুরন্ত করতে হলে এই নিত্য নূতন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবকেই মেনে নিতে হবে বৈ কি? নিত্যনূতন আর চির পুরাতনের সঙ্গেই সর্ব্বোপনিষৎ প্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্মৈক্য।

আসল কথা হচ্ছে সুখই চাও আর দুঃখই পাও—তোমাকে ছেড়ে তোমার গতি নাই। যেমন করেই হোক্ জগৎটাকে ধাতে সইয়ে নিতেই হবে। কাউকে হাত করতে হলেই আপন কোটে আপনাকে আরো গ্যাঁট হয়ে বস্‌তে হয়। তাই সুখ-দুঃখে মিশ্রিত বিধি বিধানের সুনিয়ত অঙ্কুশাঘাতে বারবার তোমাকে তোমারি মাঝে তোমারি আসনে ফিরিয়ে আন্‌ছে। অধ্যাত্ম জগৎটা মস্ত বড় স্বার্থের সাধনা। আগে নিজকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসানো চাই—স্ব-র অর্থটা যথাযথ আয়ত্ত করা চাই, তা নইলে কিছুই হবে না।

সীমার জগতে যখন জন্মেছ, তখন একদিক দিয়ে তোমার ইতি নিশ্চয়ই আছে। তোমার একটা দিক অসীমের দিকে ফেরানো আছে অবশ্য, সে দিকের জন্য ভাবতে হবে না, কিন্তু তোমার সীমার দিকটা এই সসীম জগতের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যে কোঁদল বাধিয়ে ফিরবে—এটা তো হবে না। যা কিছু কর্ত্তব্য এই সীমার দিকটাতে নিজকে যতটুকু জান, ততটুকুকে যদি নিভাঁজ করতে পার, অজানার মীমাংসা আপনি হবে।

বৃত্তিস্বারূপ্যমিতরত্র

খাটী জিনিষ পেতে হলেই, তার মাঝ থেকে ভেজাল দূর করে দিতে হবে। নিজকে জানা বা আত্মাকে জানাই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের আত্মা নানা বিষয়ে ঘুলিয়ে গেছেন, তাঁর স্বরূপ আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন। এখন তাঁকে জান্‌বার উপায় কি? পাতঞ্জল দর্শনে আত্মাকে জান্‌বার উপায় কি সঙ্কেত দিয়েছেন—তাই আমরা এখন আলোচনা করব। পতঞ্জলি বল্‌ছেন—বৃত্তি নিরোধ কর্‌লেই আমরা আত্মাকে জান্‌তে পারব—আমরা যে তাঁকে ধর্‌তে—ছুঁতে পারি না তার কারণ আর কিছুই নয়—"বৃত্তিস্বারূপ্যমিতরত্র"। বৃত্তির সঙ্গে তিনি একাকার হয়ে থাকেন বলেই, তাঁর স্বরূপ আমাদের কাছে অস্পষ্ট। আর আমরা নিজকে জানি না—নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই জগতে এত অশান্তি এবং দুঃখ অনুভব করি। বৃত্তি নিরোধ কর্‌লেই—তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্‌। তখন আত্মা স্বীয়রূপে অবস্থান করেন। সেই সময়ই আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকে, কিন্তু অন্যান্য সময় তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে যান। এইজন্যই সাধারণ অবস্থায় আমাদের আত্মজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। আমরা কাজকর্ম্ম করি—প্রকৃতি দ্বারা চালিত হয়ে—স্বরূপের অমোঘ শক্তি নিয়ে নয়। কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অবসাদ আসে আমাদের এইজন্যই।

তাহলে এই দাঁড়াল যে, বৃত্তিই আমাদের স্বরূপকে আড়াল করে রাখে, আবৃত করে দেয়। সুতরাং এই বৃত্তি যদি না থাকে, তাহলেই আমাদের আত্মানন্দ লাভে কোন বিঘ্ন হবার আশঙ্কা থাকে না।

সাংখ্য কিন্তু এ জায়গায় জোর দিয়েছেন অন্য ভাবে। তিনি বল্‌ছেন, বেশ তো বৃত্তি উঠুক না, তাতে আমার কি? আমার বিবেক জ্ঞান থাক্‌তে কোন শত্রুই এসে আমাকে পরাজিত কর্‌তে পার্‌বে না। কেন না আমি যে জানি আমি আর বৃত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। যা আমি নই—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? মূল প্রকৃতিই আমার অনাত্মীয়া—আর বৃত্তি তো অনেক পরের কথা। সাংখ্যবাদী বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন শুধু জ্ঞানের জোরে, বিবেকজ্ঞান সহায়ে। "নেতি নেতি" করে সাংখ্যবাদী পুরুষের যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎ কর্‌লেন।

পতঞ্জলি সাংখ্যের চেয়েও এক দিক দিয়ে বলবান। তিনি বল্‌লেন, বিবেকজ্ঞান দিয়ে আলাদা করার কি প্রয়োজন? সমূলেই তাকে বিনাশ করব—বৃত্তি উঠতেই দেব না। এরই নাম চিত্তবৃত্তি নিরোধ। যা আমার শত্রু তাকে রেখে তো অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের আশা নাই। সুতরাং বৃত্তির তরঙ্গ উঠে যাতে আমাদের স্বরূপ আবৃত না হয়, তারই চেষ্টা কর্‌তে হবে। যে আমার শত্রু তাকে প্রথমেই টুঁটি চেপে ধর্‌তে হবে।

সাংখ্যবাদী বল্‌লেন, আরে এত ভয় কি? বিবেকজ্ঞান থাক্‌তে আমার এত শত্রুর ভয় কেন কর্‌তে হবে! উঠুক না শত শত বৃত্তি—কিন্তু আমার বিবেকজ্ঞান যদি কোন সময় ব্যাহত না হয়, তাহলে আর ভয় কিসের? আসল কথা হল, বিবেকজ্ঞান। বিবেকজ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি না বলেই, প্রকৃতির হাত থেকে আমাদের নিস্তার পাওয়া সুকঠিন হয়ে ওঠে। আত্মসাক্ষাৎকার

করতে গিয়ে একজন বিবেকজ্ঞানকে অবলম্বন করলেন, আর একজন বৃত্তি নিরোধের পন্থা ধরলেন। উভয়ই শক্তিশালী সাধক কিনা—কাজেই প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করতে পারলেন উভয়ই।

দুটী পন্থা—হয় মননের জোরে আত্মসাক্ষাৎকারের বিঘ্নকে অপসারিত করতে হবে, নয়ত যোগবলদ্বারা বিঘ্ন বিদূরিত করতে হবে। সাক্ষাৎ লড়াই করতে হলে একটু বিশেষ শক্তি চাই। বৃত্তি নিরোধ করতে হলে—মনের জোর, দেহের জোর, ধৈর্য্য এই সব গুণগুলি থাকা অবশ্যই কর্তব্য। আমরা অহোরাত্র জানছি যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এসব দুর্নিবার বৃত্তিই আমাদিগকে স্বরূপ বিচ্যুতির পথে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু আমরা চুপ মেরে আছি। বৃত্তিই যেন আমাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, আমাদের যেন তার উপর কোন হাত নাই। কিন্তু পতঞ্জলিই এসে এখানে আমাদের বিশেষ আশ্বাস প্রদান করলেন। তিনি বললেন, বাঃ, পুরুষের অসাধ্য কি আছে? পুরুষ ইচ্ছা করলে সকল বিঘ্নই বিদূরিত করতে পারে। বৃত্তি যদি আত্মসাক্ষাৎকারের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহলে ইচ্ছামাত্র সেই বিঘ্নকে দূর করে দিতে হবে বৈ কি? এই ক্ষমতা যদি আমার করায়ত্ত না থাকল, তাহলে আমি পুরুষ কিসে? ইচ্ছা করলে আমি বৃত্তিকে যখন খুসী তখনই বন্ধ করে দিতে পারি।

এ কথাও ঠিক কর্তৃত্বের শক্তি দু'দিনেই আয়ত্ত হয় না। এইজন্যই দীর্ঘকাল অভ্যাস এবং প্রযত্ন দ্বারাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা জন্মে যায়। বৃত্তিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা—দু'দিন একদিনের কাজ নয়। এইজন্যই যারা যোগপথ অবলম্বন করবে, তাদের নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠানও করতে হবে, এবং ধৈর্য্য ধরে সময়ের অপেক্ষাও করতে হবে।

—১৬ক

সাধারণ লোক আশঙ্কা করে বৃত্তি যদি না থাকে, মনেরই যদি লয় হয়ে গেল, তাহলে আর রইল কি? রইবে আর কি—আত্মা থাকবে তখন। মনের মরণ হলেই আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। এই মনই তো যত সব অনিষ্টের গোড়া। তাকে মেরে ফেলতে পারলেই তো ইষ্টসিদ্ধি। বৃত্তি উঠে কোথায়?— মনে। সুতরাং মন থাকতে আত্ম-স্বরূপ অবগত হওয়া যাবে না।

বৃত্তির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রথম প্রথম হয়ত সব ক্ষেত্রে জয়ী হওয়া যাবে না, তাবলে হতাশ হলেও চলবে না। দুরন্ত রিপু কি দু'দিন এক দিনেই আসবে? বৃত্তি নিরোধ করতে গেলে, তখন আরও বেশী করে উপদ্রব আরম্ভ হয়। কাজেই সে সময় ধৈর্য্যহারা হয়ে হাল ছেড়ে দিলেই—সব পণ্ড হবে।

মনকে যত প্রশান্ত রাখতে পারব, আত্মসাক্ষাৎকারও ততই সুস্পষ্ট হবে। প্রশান্ত মনেই আত্মার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই আভাসে যারা তৃপ্ত হতে পারে না, তাদের শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র সাথী মনকেও বিদায় দিতে হবে। এই মনের অন্তর্ধানেই আত্মজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বৃত্তি যত কম উঠবে মনে, ততই স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকবে। কাজেই সদাসন্তুষ্ট মানস হয়ে থাকতেই চেষ্টা করতে হবে। বৃত্তি যত উঠবে—আত্মা ততই আড়ালে পড়ে যাবেন। অথচ আত্মানুভূতি ছাড়া আমাদের কোন পথেই কল্যাণ নাই কিন্তু। কর্ম্ম করার সময় আত্মানুভূতি স্পষ্টোজ্জ্বল থাকে না বলেই —ভূতের মত কর্ম্ম করে যাই আমরা, কিন্তু সেই কর্ম্ম কখনো আমাদের মুক্তির পথে সাহায্য করে না। যোগবলের সঙ্গে সঙ্গে যদি সাংখ্যের বিবেকজ্ঞানও থাকে, তাহলে আর কথাই নেই। বৃত্তি নিরোধ করতে গিয়েও যদি কোন বৃত্তি উঠেই পড়ে,

তাহলে বিবেকজ্ঞান অবলম্বন তার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হতে হবে।

মনের মরণ হলে, মানুষ তখন জড় হয়ে যাবে—এই আশঙ্কা অনেকেই করে থাকেন। আসলে কিন্তু ব্যাপার তা হয় না। এই মন যখন একান্ত আত্মানুরাগী হয়ে পড়ে—তখন এই মনের ভিতর দিয়েই আত্মার মহিমা প্রকট হয়ে ওঠে। লয়ের মাঝেই দিব্য-জীবন, দিব্য-সৃষ্টির বীজ সঙ্গোপিত হয়ে আছে। সুতরাং লয়ে ভয়ের কিছু নাই।

সাংখ্যের বিবেকজ্ঞান, কিম্বা যোগের চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় অবলম্বন ছাড়া আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

এই দু'পথের এক পথ অবলম্বন করতেই হবে। উভয় পথেই পৌরুষ থাকাই চাই। বিবেকজ্ঞানেও যদি স্বরূপ সাক্ষাৎকার না হয়, তাহলে জান্তে হবে এখনো অনেক গলদ আছে। অবশ্য যথার্থ বিবেক-জ্ঞানে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেই। বৃত্তি উঠলেও যদি বিবেকজ্ঞানদ্বারা স্বরূপ অপ্রচ্যুত রাখতে পারা যায়, তাহলে তো ভালই, আর তা যদি না হয়, তাহলে যোগের নিরোধ পন্থা অবলম্বন করতেই হবে। অমঙ্গল হচ্ছে দেখেও যারা প্রতিকারের চেষ্টা করে না তারা নিতান্ত অধম। আত্ম-সাক্ষাৎকারই প্রত্যেক জীবনের চরম লক্ষ্য। সুতরাং এর যত বিঘ্ন আছে—তা দূর করবার দরুণ সকলেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দিও না

হৃদয়সিন্ধু মথিয়া যখন তোমারে সেথায় পাই—
সব সুখ-দুখ্ সার্থক হয়, তাই মিলে যাহা চাই।

তোমাহারা চিত্ত কত কিছু আনে, ঘর মোর ভরে যায়,
বাহিরে সবাই তাহাতেই সুখী, মোরি প্রাণ কাঁদে হায়!

শিবহীন যাগে মত্ত সবাই, সতী-দেহ-নাশ ভাবে না কেউ—
যে বোঝে সে দেখে—শত আয়োজন বরিছে মরণ-সাগর ঢেউ।

তাই বলি ওগো দিও না, দিও না তোমা হারা মোরে সুখের লেশ—
শত দুঃখমাঝে তোমা নিয়ে থাকি—সে সুখের মোর নাহি যে শেষ,

অন্তর্জ্জগৎ

"একাংশেন স্থিতো জগৎ"—অপরূপ বিভবশালী শ্রীভগবানের মাত্র এক অংশদ্বারা এই জগৎ বিধৃত। যে পরমাশ্চর্য্য জগৎ আমাদের কোটি কোটি জন্মের লীলাভূমি, যাহা আমাদের কাছে অসীম, চিররহস্য-জালে আবৃত, সেই জগৎ জগৎপাতার মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশে স্থিত। তাহা হইলে ইহার অপরাপর অংশে যে লীলা অভিনীত হয়, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান তাহা আয়ত্ত করিতে পারে না। কারণ বিশাল জগতের সামান্য অংশও যাহাদের নিকট অনন্তরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাদের কাছে সেই বিরাট জগতের অতিরিক্ত অংশ কল্পনাবহির্ভূত। তাই শাস্ত্রে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন— "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"। যিনি এই অসীম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অনন্তদেব এই জগতের চেয়েও দশ অঙ্গুলি অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ জগৎ হইতে বহুগুণে ব্যাপক হইয়া বিরাজ করেন। স্থূলবুদ্ধি তাঁহার সীমা কোথায় পাইবে?

জগতের ভৌগলিক সংস্থানেও দেখা যায়, সমুদয় পৃথিবীর তিন ভাগ জল, মাত্র এক ভাগ স্থল। সেই এক ভাগ মাত্র স্থলের অধিবাসীর মধ্যে বিচিত্র প্রাণীর অনন্ত লীলা। সেই অনন্ত লীলার জ্ঞান সান্ত বুদ্ধিতে আবৃত হইতে পারে না। সুতরাং সমগ্র জগতের জ্ঞান সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আবার মানুষ স্বভাবতঃই আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ আপন ক্ষুদ্র মনের ক্ষুদ্র আবেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যবহারিক জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, সে সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই অচেতন। অবচেতনার ভিতর দিয়া (through unconcious mind) আমাদের মনে অনেক কিছু খেলিয়া যায়, কিন্তু সে সমস্ত নিত্যকার অভিজ্ঞতা, সচেতন মনের অভাবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু সঞ্চিত রাখিতে পারে না। সুতরাং অসীমের মাঝে সসীমের জ্ঞানও আমরা অবহেলায় লাভ করিতে পারি না। যেটুকু পারি, তাহাতেই আবার আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকি। এইরূপে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জ্ঞানই অপূর্ণ, অপর জীবের তো কথাই নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে যে জীব জগতের যে সংস্পর্শে আসে, শুধু তারই জ্ঞান লইয়া আপনার অন্ধকারে আপনি আবৃত থাকে।

বিরাট জ্ঞানসিন্ধু এইরূপে চিরকাল প্রসারিত থাকিয়াও আমাদের কাছে আবরিত। তাহার অনন্ত অসীম বিস্তার আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধির অগম্য বলিয়া চির অন্ধকারে আবৃত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু তবুও আমরা যেটুকু আয়ত্ত করিতে পারি, তারই গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করি। মোহান্ধ মানব এমনি স্বল্পে তুষ্ট, আবার অভাবের বেলাও স্বল্পেই রুষ্ট! আর যাঁরা খাঁটী জ্ঞানী, তাঁরা কিন্তু জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়াও গম্ভীর ও প্রশান্ত। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরম তথ্য-আবিষ্কারক নিউটন বলিয়াছিলেন—"আমি জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমি হইতে মাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি—মণিমুক্তাদি মহা অমূল্য নিধি এখনও বিশাল বারিগর্ভে নিহিতই রহিয়াছে"। খাঁটী জ্ঞানীর কথা এমনি বটে। আর আমরা? 'গণ্ডুষ জলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে'। সক্রেটিস্ বলিতেন, "সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় মাত্র এইটুকু বুঝিয়াছি, এইটুকু মাত্র জানিয়াছি যে আমি কিছুই জানি না"। এ

শুধু বিনয়ের বাঁধাধরা মামুলি গৎ নয়। সত্যই এই বিচিত্র জগতের অতি ক্ষুদ্রতম যে প্রকাশ, তাহার জ্ঞানও অসীম অনন্তে বিস্তৃত। সুতরাং ক্ষুদ্র মানব-মস্তিষ্ক আর তার কতটুকুই বা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম শ্লোকে আছে—

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্॥ ১॥

—যদি তুমি মনে কর যে, তুমি ব্রহ্মকে নিজ আত্মায় প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তমরূপে জানিয়াছ, তবে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্প জানিয়াছ। দেবতাদিগের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ যতটুকু জানিয়াছ, তাহাও অল্প, অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য।

ইহার এক শ্লোক পরে উপনিষদের অন্য মন্ত্র যথা :—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

—যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু অসম্যক্-দর্শীদের নিকট তিনি বিজ্ঞাত। অল্পজ্ঞান অহঙ্কারী মানবের গর্ব্ব এমনি।

কিন্তু অহঙ্কারী ছাড়া সত্যিকার তপস্বীও দেখা যায়। অপ্রধৃষ্য তুঙ্গগিরি হিমালয়কেও লঙ্ঘন করিতে প্রয়াসী, ভারতবর্ষে এমন তপস্বীরও অভাব নাই। তাঁহারা বিদেশী দাম্ভিকের মত শুধু স্থূল লইয়াই বড়াই করেন না। স্থূলে হিমালয়কে স্থূল শরীর নিয়া লঙ্ঘন করিতে হয়ত চেষ্টা না করিতেও পারেন, কিন্তু যে বিরাট্-জ্ঞান-সমুদ্রের একাংশে এই জগৎ বিধৃত, সেই জ্ঞানসমুদ্র অনেক ঋষিই পাড়ি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই বিপুল চেষ্টার অমৃতময় ফলই উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্র। প্রকাশ-মান জগতের ঊর্দ্ধে গিয়া তাঁহারা যেই লোকের সংবাদ আনিলেন, তথায় আরোহণের উপায়ও অদ্ভুত! বহির্জ্জগৎ হইতে আপনাকে গুটাইয়া না লইলে ঊর্দ্ধজগতের ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জগতের তথ্য নিয়াই যার মন আকুল, অর্থাৎ যে এখানেই মজে, সে সেখানের খোঁজ পায় না। কিন্তু সেখানের খোঁজ যে জানে, সে এখানের সব খবর আপনি পায়। তাই আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবিষ্ট ঋষির ধ্যাননেত্রে এই স্থূল জগতের কিছু এড়াইতে পারে না, কিন্তু স্থূলসর্ব্বস্ব ব্যক্তির চোখে আধ্যাত্মিক রাজ্য অন্ধকারময়।

আসল কথা হইতেছে জীবনের ব্যাপকতা নিয়া। এ রাজ্য থেকে ওরাজ্য পর্য্যন্ত যার জীবন ব্যাপ্ত হয়, সেই-ই দুই রাজ্যের খবর জানে, আর যার চিত্ত শুধু এই রাজ্যের ক্ষুদ্র বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত, সে আর তদূর্দ্ধের খবর পাইবে কোথা হইতে? মানুষ শক্তি-মান বটে, কিন্তু যেমন বিষয় নিয়া শক্তিপ্রয়োগ করিবে, তদ্রূপ শক্তিই প্রকাশ হইবে। পাশ্চাত্য জগৎ স্থূলের উপর শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার শক্তি তাহাতেই নানাকারে প্রকাশ পাইয়াছে, আর প্রাচ্য ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্য নিয়া বেশী চর্চ্চা করিয়াছে, তার শক্তি সেদিকেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি স্থূল শক্তি অপেক্ষা ব্যাপক, তাই অধ্যাত্মসেবী এরাজ্যেরও খবর জানিতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতবাসী তাহা হইলে স্থূলের উপর পাশ্চাত্যের মত শক্তি প্রয়োগ করে নাই কেন? ইহার উত্তর পূর্ব্বেও আংশিকভাবে বলা হইয়াছে যে, এই রাজ্যের স্থূল নিয়া ব্যাপৃত থাকিলে

সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যে পাশ্চাত্যের মত তাঁহারাও অজ্ঞ থাকিতেন। কিন্তু স্থূলের উপর পাশ্চাত্যের তুলনায় উদাসীন ছিলেন বলিয়াই স্থূলের উপর অধিকার থাকা সত্বেও পাশ্চাত্যের মত এ বিষয়ের চর্চ্চাতে অধিকদূর প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু স্থূলের উপরও যে তাঁহাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। তবে উদাসীনতা হেতু সে শক্তি সর্ব্বসাধারণে উৎসরিত হয় নাই।

জীবনযাত্রা সহজভাবে নির্ব্বাহ হইতে যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমস্তই তখন সচ্ছল থাকাতে স্থূলভূতকে নিষ্পেষণ করিয়া বস্তুবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতে বর্ত্তমানের মত এত প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং তখনকার সমাজের চেয়ে এখনকার সমাজ নানাপ্রকার অভাবদ্বারা জীর্ণ বলিয়া অভাবপূরণার্থে নানা উপায়ে স্থূল হইতে এই যে বিজ্ঞানের উদ্ভব, ইহাদ্বারা সমাজ-দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য তত ভাল নয় বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তবে অভাবে পড়িয়া স্থূলবুদ্ধির এই উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসার বিষয় বটে। কিন্তু জীবনের সবটুকু শক্তি যদি এই ভাবে স্থূলের অভাব পূরণেই ব্যয়িত হয়, তবে তাহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। জীবনের স্থূল দিকটাকে লক্ষ্য করিয়াই আজ যে বিজ্ঞানের এত ছড়াছড়ি, তাহা মানবজীবনকে দৈহিক আরামের দিকেই দিন দিন প্রলুব্ধ করিতেছে, এই স্থূল জগৎ ছাড়াইয়াও যে মানুষের তৃপ্তিদায়ক কিছু থাকিতে পারে তাহার সন্ধান সে দেয় না। তাই অভাবরাক্ষসীর প্রচণ্ড ক্ষুধা পশ্চিমকে অলক্ষ্যভাবে দিন দিন ধ্বংসের দিকে টানিতেছে, আর আমরা তাহাই ইচ্ছাপূর্ব্বক ডাকিয়া লইতেছি। স্থূল-প্রিয়তার পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ তাহার পরিচয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা পাশ্চাত্য মনীষীদিগের তদ্দেশীয় সামাজিক বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদের হতাশার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন।

তাহা হইলে জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার উপায় কি? দৈহিক যত প্রকার ভোগ-সুখ সম্ভব, তাহার চূড়ান্ত করিয়া পরিণামে যদি বিনাশই অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে দৈহিক আরামের চেষ্টায় জীবনের সব শক্তি প্রয়োগ করিয়া লাভ কি? আবার দেহ না হইলে যখন কোনও কার্য্যই সাধিত হয় না, তখন দেহকে একেবারে বাদ দিলেও চলে না। সুতরাং এখানে যদি আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া দেহকে উপলক্ষ্য ধরি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পূর্ণতাই জীবনের চরম তৃপ্তি ধরা যায় ও দেহকে মাত্র তাহা-রই করণ বা উপায় রূপে ব্যবহার করা যায়, তবেই মানুষ প্রকৃত সুখী হইয়া পূর্ণ জীবন উপভোগ করিতে পারে। জগতের যে সামান্য অংশ আমাদের নিকট প্রকাশিত, তাহা উপভোগের জন্য জীবনেরও সামান্য শক্তি প্রয়োগ করিয়া অধিকাংশ শক্তিই সেই অপ্রকাশিত মহান্ অংশ উপলব্ধি করিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। যে একাংশদ্বারা জগৎ বিধৃত, সেই একাংশ আমাদের জীবনেরও মাত্র একাংশদ্বারা উপভোগ করিতে হইবে। বাকী সেই অপ্রকাশিত অপরাপর অংশের পরিচয় লাভে সমস্ত জীবন উৎসর্গ চাই।

কিন্তু বর্ত্তমানের দুর্ব্বল মানব এই জগতের স্থূল অভাবই মিটাইয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং এই জগৎ ছাড়াও যে তৃপ্তিদায়ক একটা উন্নততর জগৎ (Higher world) রহিয়াছে, তাহার সন্ধান জানিবে কি করিয়া? যাহা মাত্র জীবনের একাংশ দ্বারা অধিকার করিবার কথা, তাহা জীবনের সমস্ত অংশদ্বারাও অধিকৃত হয় না, সুতরাং, সমগ্র জীবনের বাস্তবিক যে লক্ষ্য, তাহার শতাংশের একাংশেও সে পৌঁছিতে পারে না। কাজেই অভাব তার মিটিবে

কি করিয়া? এই স্থূল রাজ্যের অভাবই সে সারাজীবন ভরিয়া মিটাইতে পারে না, সুতরাং ইহার পরের উৎকৃষ্ট জগতে আর সে প্রবেশ করিবে কি করিয়া? এই স্থূল অভাব পূরণের কামনাতেই জীব জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়া মরে। তাহার সে কষ্ট সে ইচ্ছা করিয়া যাচিয়া লয়। কিন্তু সকল কষ্টের অবসান যাতে হয় সেদিকে সে যায় না। ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা বা অবিবেক। বস্তুতঃ অবিবেকীর এই প্রাণ ফাটা দুঃখকে ইচ্ছা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া বিবেকীর প্রাণ স্বতঃই ব্যথিত হয়। কিন্তু মহামায়ার এমনি খেলা আপন রক্ত আপনি চুষিয়া কুকুরের শুষ্কহাড় চর্ব্বণের মত মানুষ আপনাকে সুখী করিতে চায়। কিন্তু অন্তরের আগুন নিবে না।

অন্তরের অতৃপ্তির আগুন নিবাইতে হইলে চাই ঐ অপ্রকট গভীরে আত্ম বিসর্জ্জন। ধ্যানের গম্ভীর জগতে আপনাকে নিমগ্ন করিতে না পারিলে এই অতৃপ্ত বাসনার হস্ত হইতে রেহাই নাই। মানুষ ভাবে প্রকাশই সুখ ও আনন্দ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অপ্রকাশের সন্ধানে উধাও হওয়ার পর প্রকাশের সন্ধান সেখানে মিলিলে তবেই আনন্দ। নতুবা স্বতঃই প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র জগতের কোলাহলে মজিয়া থাকিলে কেবল কর্ণের বধিরতা ও আত্মচেতনার বিলোপেরই সম্ভাবনা। স্তব্ধতার ভিতরেও যে আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ, তাহা স্তব্ধ হইতে না পারিলে অনুভব করা যায় না। কিন্তু সেই 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ' আনন্দকে লাভ করিবার তীব্র ব্যাকুলতা না জাগিলে শুধু জোর করিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই সে আনন্দ মিলে না। বরং সে মৌনভাব মহা অস্বস্তিকর হইয়া উঠে। এমন কি দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক-মানব হঠাৎ চুপ করিয়া পাগল হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। তাই নির্জ্জন বাস একটা শাস্তি।

প্রকাশের মাধুর্য্য অনুভব করিতে হইলে চাই ধ্যানগাম্ভীর্য্য। কোলাহলের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কোলাহলরত হইলে ক্রীড়াপুত্তলীর মত কেবল নাচিতেই হয়, দ্রষ্টার মত সে ক্রীড়ার মাধুর্য্য দর্শন বা উপভোগ তার ভাগ্যে ঘটে না। কবি দরিদ্রের বা কিশোরের ভাব দ্রষ্টারূপে সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন বলিয়াই অনেকেই আপনার বর্ণনা-চিত্র সজীব করিয়া অঙ্কিত করিতে পারেন। কিন্তু যে তদাকারকারিত হইয়া আপনার সত্তা আর পৃথক রূপে অনুভব (discriminate) করিতে পারে না, সে আর দরিদ্র বা কিশোরের ভাব ফুটাইয়া তুলিবে কি করিয়া? এই দ্রষ্টা (বা self discrimination এর) ভাব আসে অন্তরে বাহিরে চুপ হইয়া যাইতে পারিলে। বাহিরে যেমন মৌন অর্থাৎ জগতের সমস্ত সম্পর্ককে একমাত্র বাহ্যিরোধদ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে, অন্তরে তেমনি সমস্ত চিন্তাকে দূর করিয়া ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন হওয়া চাই। অপ্রকট আনন্দ তবেই প্রকট হইবে।

এই জগতের যাহা কিছু আমাদের সম্পর্কিত, তাহার অতিরিক্তও যে একটা অন্তররাজ্য এবং উন্নততর রাজ্য (Inner and higher world) রহিয়াছে, অন্তরে আগে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাহার অনুসন্ধান করা চাই। প্রিয়জনের জন্য যেমন নিজকে বঞ্চিত করিয়াও উত্তম দ্রব্য মানুষ রাখিয়া থাকে, তেমনি জীবনের প্রধান চেষ্টা চাই সেই অলৌকিক আনন্দ লাভ করিবার জন্য। জীবনের একাংশে স্থিত হইয়াই বাহিরের জগতের স্থূল অভাব মিটাইতে হইবে। বৃহত্তর অংশ প্রযুক্ত হইবে সেই ভূমার দিকে—মহান্ আনন্দের অভিমুখে। সুতরাং তেজীয়ান্ ও শক্তিমান হইতে হইবে। এমন তেজ ও শক্তি চাই যে, সেই শক্তিময় জীবনের মাত্র একাংশ দ্বারাই বাহিরের সমস্ত অভাব যেন পূরণ হইতে পারে। দুর্ব্বলের

জীবনধারা তাহা সম্ভবপর নয়। সেজন্য শাস্ত্রের হুঙ্কার—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বাহিরের এই বিচিত্র কোলাহলপূর্ণ বিরাট জগতের অন্তরালে যে অপ্রকট মহান ও গভীর আনন্দ বিদ্যমান, তাহা দ্বারা এই প্রকাশমান সমগ্র জগৎ বিধৃত। তাহার মাত্র একাংশ দ্বারা বিধৃত। সুতরাং সেই মহান আনন্দ দ্বারা জগৎ আবৃত করিয়া যাহা কিছু দর্শন কর—দেখিবে সেই অমৃতময়—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।"

চঞ্চল জগতে যাহা কিছু সমস্তই তৎকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত। সুতরাং তাহাকেই লাভ কর।

—*—

ভক্তের ঈর্ষ্যা

ভক্তে ভক্তে ঈর্ষ্যা দেখ্‌তে বড়ই মজা লাগে হরেন! এক ঠাকুরকে, এক ইষ্টকে ভালবেসে—কেন যে তাদের মাঝে অমন ঈর্ষ্যার সূত্রপাত হয়, তা ঠিক ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি না, তাদের এ ঈর্ষ্যাটা দেখে ভারী আনন্দ হয় কিন্তু। আনন্দ হয় আমার এইজন্য যে তারা প্রতিযোগীতা করে একটী মহৎ বিষয় নিয়ে। সুতরাং ঈর্ষ্যার ভিতর দিয়েও তারা ক্রমশঃ উন্নতই হতে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভক্তের দৃষ্টিটা যদি আরও একটু উদার হ'ত তাহলে বোধ হয় এতটুকু বিরোধও হ'ত না।

ভক্ত না হলেও ভক্তের প্রাণের ব্যথা-দরদ-আকুলতা কিছুটা বুঝি। এইজন্যই ভক্তদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা আছে দেখেও, তারা যে এক ইষ্টের দরুণ প্রত্যেকেই অমন আকুল হতে পারে। তাতেই আমাকে মুগ্ধ করে ফেলে বেশী। ঈর্ষ্যা শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বে না—থাক্‌বে ইষ্টকে পাওয়ার দরুণ গভীর আকুলতা। এই ঈর্ষ্যার দরুণই দেখি, প্রত্যেকের প্রাণের আকুলতার অবধি নাই। ঠাকুরকে সুখী কর্‌তে, সুখী দেখ্‌তে সবাই আকুল।

যাকে ভালবাসি, তার উপর যেন আমারই একচেটিয়া অধিকার। আমার প্রাণের বস্তুকে অন্যে দখল কর্‌বে—এ যেন ভক্তের প্রাণে কিছুতেই সহ্য হয় না—এইজন্যই ভক্ত চায় তার ঠাকুরটী তার ইষ্টটী নিছক তার হয়েই থাকুক। কিন্তু এ জায়গায় ভক্তের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ। তারা ভেবে দেখে না যে, আমার ঠাকুরটীকে ঠিক আমারই মত আকুলতা নিয়েই যে আরও দশ জন পেতে চায়। এখানে যদি ভক্তের দৃষ্টি উদার হয়ে যেত, তাহলে কিন্তু ভক্ত দূতীয়ালী করেই আরও বেশী সুখ এবং আনন্দ পেত। কিন্তু ভক্তের এই মোহ, ইষ্টের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা—এ দেখে যেন ভাল-মন্দের বিচার অনেক সময় লোপ পেয়ে যায়। মনে হয়, ভগবান্‌কে যদি ভক্তের প্রাণ দিয়ে অমন করে ভালবাস্‌তে পার্‌তাম। ভক্তের এই অন্ধ ভালবাসাই যদি আমাকে উন্মাদ করে তুল্‌ত……।

ভাই হরেন! তুই বলিস্ যে এই ঈর্ষ্যাটা কখনো ভাল নয়—এতে ভক্তে ভক্তে এমন বিরূপ ভাব থাক্‌বে কেন? আমি বলি, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা যায়, তার উপর একটা স্বাভাবিক অখণ্ড আধিপত্য কর্‌বার বাসনা জন্মে যায়ই। এইজন্যই মনে হয়, আমি যেমন ঠাকুরের সুখ-দুঃখ-ব্যথার কথা বুঝি, জগতে আর কেউ বুঝি তেমন করে বোঝে

না। ঠাকুরকে খুসী করতেই তো ভক্ত সব সময় আকুল, কাজেই মনে-প্রাণে কোথায়ও তো কোন দুরভিসন্ধি নাই তার। কাজেই অনিষ্ট হবে ভক্তের কিসের দরুণ ?

তুই-আমি বিচারক হয়ে কত টিপ্পনীই কাট্‌তে পারি—কিন্তু ভক্তের প্রাণের অবুঝ ভালবাসা দেখে তখন যে বিচার তিক্ত হয়ে ওঠে! কেমন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা মনে করে দেখ্ তো—কথাটা সত্যিই বল্‌ছি কি না ?

আমার শুধু মনে জাগে তাদের প্রাণঢালা বিশ্বাস, ইষ্টপ্রীতির দরুণ এই বে-ভুলা ভাব, যার সঙ্গে যুক্তি-তর্কের কোন কথাই খাটে না। প্রাণ ঢেলে দিলে কি করে প্রাণের সঞ্চার হয়, ভক্তদের দেখেই তা বুঝি। এইজন্যই আবার তোকে মাঝে মাঝে এ কথাও বলি যে, ভক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। খাঁটী ভক্ত দুনিয়াতে খুবই দুর্লভ।

প্রকৃত ভালবাসায় সমাধি নিয়ে আসে। এই জন্যই বলি, ঈর্ষ্যায় যার সূত্রপাত, সামঞ্জস্যেই তার পরিণতি। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়ে প্রত্যেকের প্রাণে ইষ্ট-প্রীতির গভীর আকুলতা আসুক, তখন দেখতে পাবে, সব গিয়ে একই লক্ষ্যে বিলীন হয়ে সম্মিলিত আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। ঈর্ষ্যার ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হলেও তখন আর ঈর্ষ্যার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে জাগবে না।

ঈর্ষ্যায় যদি ইষ্টদেবের আসন হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়, তাহলে অমন ঈর্ষ্যা যে আমার মাথার মনি। ঈর্ষ্যায় যেখানে অবনতি আনয়ন করে না, সেখানে ঈর্ষ্যার মাঝে বিরোধের সূত্রপাত হলেও—মূল লক্ষ্য থেকে কেহই বিচ্যুত হয় না।

আগেই তোকে বলেছি, ভালবাসায় সমাধি নিয়ে আসে। বাস্তবিকই যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তার কথা ভেবে ভেবে মন তন্ময় হয়ে যায়, তখন আর ঈর্ষ্যা-দ্বেষের কথা মনেই থাকে না। প্রথমাবস্থায় অবশ্য ভালবাসার মাঝে ঈর্ষ্যা থাকে, কিন্তু ভালবাসা যত উন্নত হতে থাকে, ততই অপরের তৃপ্তিটাও নিজের মাঝে উপলব্ধি করা যায়, তাই অপরের ভালবাসা দেখে তখন আর ঈর্ষ্যা হয় না। প্রকৃত ভালবাসায় এমনি করে দ্রষ্টৃত্ব এনে দেয়।

ঈর্ষ্যাকে আমি খারাপ বল্‌ছি না এইজন্য যে, ভক্তে ভক্তে ঈর্ষ্যা হলেও, ইষ্ট বস্তুর প্রতি কারও হতাদর হয় না। অর্থাৎ ইষ্টপ্রীতির দরুণ সব ভক্তই আকুল। ভক্তের মাঝে যখন ব্যাপ্তিবোধটা জেগে ওঠে, তখনই আর ঈর্ষ্যার লেশ মাত্রও থাকে না। আমার ভালবাসার ধনকে—অপরে ভালবাস্‌লে যে আরও গৌরবের, আরও আনন্দের কথা—প্রথমাবস্থায় ভক্ত একথা বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তের ভিতর যখন ঔদার্য্য আসে, তখন আর এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিরোধ থাকে না। প্রতিযোগীতা হলেও, ইষ্টের প্রীতি বিধানের দরুণ—ভক্তের কি আকুলতা। এটাই দেখবার বিষয়—পরস্পরের ঈর্ষ্যা এর কাছে অনেক ছোট—অনেক তুচ্ছ। ঠাকুরকে, ইষ্টকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও যেখানে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হয়, সর্ব্বভক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় সেইখানেই আবার ঔদার্য্য দেখা দেয়। ঠাকুরের দরুণ—প্রত্যেকের কি আকুলতা এটা যখন দেখি, তখন কি আর ভক্তে ভক্তে ঈর্ষ্যার কথা মনে থাকে ? ভালবাসার প্রথম অবস্থায় একটু বিরোধ, একটু অসামঞ্জস্য থাকেই—কিন্তু পরিশেষে সব সামঞ্জস্য হয়ে যায়। ঈর্ষ্যায় সাহায্য করে বৈ কি ? চিত্তের মাঝে একটা সদাজাগ্রত ভাব এনে দেয়। কিন্তু প্রতিযোগীতার ভাব না নিয়েও চিত্তকে সজাগ উদ্বুদ্ধ রাখা যায়—সে কথা ক্রমশঃ বুঝা যায়।

কথাবার্ত্তা

সে দিন ছিল রবিবার। আশেপাশের যত ছেলে ও যুবকের দল এই রবিবারেই ছুটী পেয়ে দেখা করতে আসত ও নানা রকম আলোচনা হত। সে দিনটী সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। বিকালের দিকটায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—রাস্তাঘাট এখনও শুকায়নি। পথে দুই একটী মানুষ দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই দেখি যাদের আসবার কথা ছিল, দলবেঁধে এই কাদা-বৃষ্টির মাঝেও তারা নানা গল্প করতে করতে এসে হাজির। প্রথমটায় আলাপ সম্ভাষণাদিতে কেটে গেল। মনে মনে ভাবছি এই জলবৃষ্টির দিনেও যে এরা নিয়মিত আসবার কথা স্মরণ রেখেছে ও এসেছে, —এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে এরা কিছু পা'ক বা না পাক, জায়গাটীর প্রতি একটা শ্রদ্ধা এদের মনে এসেছে। হয়ত কালে এই শ্রদ্ধার বিনিময়ে জীবনে কিছুনা কিছু মহত্ত্বস্তু লাভ করতে পারবে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাস্ করলাম—আচ্ছা, তোমরা আজ বৃষ্টির ভিতরেও যে এলে বড়? রাস্তায় কাদা আছে মনে ছিল না?

জানি, এরমাঝে সকলের সমান শ্রদ্ধাও নাই, সবাই জীবনে সমান বস্তুও লাভ করবে না, তবু কেহ শ্রদ্ধায়, কেহ কৌতূহলে, কেহবা পরীক্ষার্থ এই যে এখানে এসেছে, এতে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ কতকটা সময় আমাদের একটা কিছু সদালোচনায় কাটবে ত? কিন্তু কিছুদিন ধ'রে এরা যে শত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে এখানে নিয়মিত দিনে এসে হাজির হচ্ছে, এতে এবিষয়ে এদের কার মনে কি ভাব পোষণ করছে?……যাই হোক্ উত্তরে একজন বল্‌ল "কি জানি, এই সময়টা ছিল আমার তাস খেলার সময়, কিন্তু প্রথম দিন এখানে আসবার পর হইতে কেবল মনে হয়, কবে আবার রবিবার আসবে? সোমবারের পরে মাঝে আর একটা কেন রবিবার হ'ল না? রবিবার হলেই ভাবি যে, কখন চারটে বাজবে! তাই একটু আগেই বেরিয়ে পড়ি, দেখি সাথীরা কে কি করছে, দেখি এখানে যারা আসে, প্রায় সবারই আমার দশা! কাজেই এখন সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি। কাদার কথা ত মনে হয় নি।

হেসে বল্‌লাম, "এতখানি বিস্মরণ কিন্তু ভাল নয়, হয়ত অনেকের মনে এই এতখানি দূর ও কাদার কথা মনে হওয়ায় আসবে না বলেই ঠিক করেছিল। বরং, ততক্ষণে একটা খিচুড়ীর যোগাড়ে ব্যাপৃত হতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে এই বৃষ্টির মাঝে তুমি গিয়ে একটা মহা উপদ্রব আরম্ভ করলে, সবাইকে টেনে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে।"

সবাই হেসে উঠলে। বল্‌লে, "তাহ'লে সে যোগাড়টার তো এখানেই বেশ সুবিধে। বেশ ভোগ দেওয়া—প্রসাদ পাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে অনেক আলোচনায় মনটাও ভরে নেওয়া যাবে। আমরা সবাই লোভী বলেই কাদার কথাটা কারুই খেয়াল হয়নি। তা যাক্ এখন না হয় আমাদের ভেতরটা কাদা করে দিন্—শান্তি হোক।"

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, সেদিন যে এতটা কীর্ত্তন হল, অনেকে নাচলে কাঁদলে, বলত তা থেকে কে কি স্থায়ী ফল লাভ করেছ?"

সবাই চুপ। কারু কারু মুখ দেখে বুঝলাম

কিছু বল্‌তে চাইলেও ভাষা পাচ্ছে না। তখন নিজেই মন্তব্য ক'রে বল্‌লাম, "দেখ, তোমাদের মাঝে অনেকেই ভক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু কোমল প্রাণ ভক্ত না হয়ে কেহ যদি তোমাদের কাঝে কঠোর প্রাণও থাকে, তবে কি সে অপাংক্তেয় বা তোমাদের অপেক্ষা নীচ ?"

অনেকের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে আপত্তি জ্ঞাপিত হচ্ছে দেখে বলে চল্‌লাম—"দেখ, মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব। তার মনে যদি বৈচিত্র্যই না থাকে তবে সেই এক খেয়ে সৃষ্টির চেয়ে সংখ্যায় অল্প বা একটী মানুষ সৃষ্টি করলেই ভগবানের বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হ'ত।" কাছেই একটি ছেলে বসেছিল, দেখলাম সে আমার কথায় তার ভিতরটা প্রকাশিত হতে চলেছে দেখে খুব আগ্রহ ও উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

আমি বল্‌লাম "হৃদয়ের কোমলতা যেমনি ভক্তি-পথে মানুষকে অগ্রসর করে, তেমনি কঠোরতাও বিচারের পথে জ্ঞানের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়। কিন্তু প্রায় সকলের ভিতরেই সাধারণতঃ জ্ঞান প্রেম দু'ভাবই থাকে, চরমে যেমন জ্ঞান প্রেমের সমন্বয় হয়, তেমনি সাধারণ অবস্থায়ও আংশিক ভাবে জ্ঞান-প্রেমের বীজ সকলের ভিতরেই রয়েছে। তবে অধিকারী ভেদে কমবেশী হয়। আর জীবনের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞান বা প্রেম দুটার একটা বেশী করে ফুটে উঠে।"

"কিন্তু তাবলে যে অন্যটা একেবারেই থাকে না তানয়। বিশেষ প্রচণ্ড সাধক ভিন্ন প্রেম শূন্য খাঁটি জ্ঞানী অথবা জ্ঞানশূন্য খাঁটী প্রেমিক দেখাযায় না। কিন্তু দেশের স্বভাবানুযায়ী সাধারণতঃ দেখা যায় বাঙ্গালী বেশীর ভাগ ভাবুক বা প্রেমিক আর হিন্দু-স্থানিরা সাধারণতঃ বেশীর ভাগ জ্ঞান চর্চ্চা করে। বাঙ্গালাদেশে বহুভক্ত মহাপুরুষের জন্ম ও লীলাভি-নয়ের ফলে এবং প্রাকৃতিক কমনীয়তা প্রযুক্ত ভক্তির ভাবই ফোটে বেশী। আর অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ও কঠিন হিন্দুস্থলের লোক তাহাদের কঠোর দেহের সঙ্গে একখানি কঠোর বিচার পূর্ণ হৃদয়ই বেশী ধারণ করে। অবশ্য সবাই যে একরূপ হবে, বিশেষত্ব বা পার্থক্য থাকবে না, তা নয়। Exception বাদ দিলে প্রায়ই Mass হিসাবে এমনটী দেখা যায়।"

"তাই যদি হয়, তবে জ্ঞানী বিবেকানন্দের হিন্দু-স্থানেই জন্ম হওয়া উচিত ছিল, তিনি বাঙ্গালীই বা হলেন কেন, আর ভক্ত রামকৃষ্ণেরই বা শিষ্য হলেন কেন ?"—একটী ছেলে অনুন্নত স্বরে আপত্তি অথচ সঙ্কোচের সহিত কথাটা বলে মুখ ফেরাল।

হেসে বল্‌লাম—"বেশত, এমনি ধরণের আপত্তির কথাই তো তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই বেশী। সব কথাই যদি শুধু মেনে নাও বিচার না কর, তবে বুঝব তোমরা ভেড়ার পাল। তা বলে হঠাৎ না বুঝে সিংহ ও হয়ো না।"

সবাই হেসে উঠ্‌ল। নিঃসঙ্কোচ আলোচনার অবসর দিয়ে বল্‌লাম—"পূর্ব্বেই তো বলেছি যে, সবাই একরূপ হবে, এমন কথা নাই। তার মাঝে সাধারণের ব্যতিক্রম (exception) থাক্‌তেও পারে। বাঙ্গালীর মাঝে বিবেকানন্দ তেমনি। মনে হয়, বাঙ্গালীর ভিতরে গৌরাঙ্গদেবের অব্য-বহিত পূর্ব্বে উন্মুক্ত ভাবে ও পরে প্রচ্ছন্নভাবে যে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হয়ে ছিল, সেই সকলের সমগ্র প্রকাশেই বিবেকানন্দের উদ্ভব হয়েছিল। যুগের পর যুগ জাতীয় জীবনে যেরূপ সাধনা প্রচলিত থাকে উপযুক্ত সময়ে বিশেষ এক দেহকে আশ্রয় ক'রে সেই সাধনা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য তাই বলে সেই যুগের (prominent বা) প্রধান সাধনাও যে আংশিক ভাবে তার মাঝে না থাক্‌বে এমন নয়,

তাই রামকৃষ্ণের ভক্ত বিবেকানন্দের মাঝে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিরও অভাব ছিল না।"

একজন সমর্থনের স্বরে বলল—"হাঁ, কীর্ত্তনে এক সময়ে দিনরাত তাঁর কেটে যেত।" বললাম,—"হাঁ কল্‌কাতায় গুরু ভাইদের নিয়ে এক-সময়ে কীর্ত্তনে তাঁর দিনরাত জ্ঞান থাকতনা বটে, কিন্তু কোথাও পাবে না যে, তিনি সাধারণ ভক্তের মত দশায় প'ড়ে হাত পা ছুড়েছেন। এমন কি, এই ধরণের দশা তাঁর হয় না ব'লে একদিন ৺রামকৃষ্ণ দেবের কাছে কাতরতা প্রকাশ করাতে তিনি সান্ত্বনার স্বরে বলেছিলেন যে সবার এক পথ নয়, আর দশা হলেই যে সে খুব বড় ভক্ত হয়ে গেল তা নয়। বাস্তবিক পক্ষে এমনও অনেক দেখা যায় যে, ভিতরে ভাব মোটেই নাই; কিন্তু শারীরিক exertion অথবা ঐক্যতান বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যহেতু ক্লান্তি বশতঃ শারীরিক (nerve) বা স্নায়ুপেশীর অবসাদ জনিত একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব আসে, অনেকে ইহাকেই পরম উচ্চাবস্থা ব'লে ভুল করে। পক্ষান্তরে বাইরের দৃষ্টিতে এগুলিকে খুব উচ্চস্থান দিয়ে যাদের এরূপ হয় না, তারা, আপনাদিগ্‌কে হতভাগ্য মনে করে। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই বুঝাযায় যে এই ধরণের দশা-ভাব কেবল মাত্র স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা Nervous debility ভিন্ন আর কিছুই নহে বাস্তবিক যাহাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে দশম দশা বলে, তাহা অনেক উচ্চস্তরের জিনিষ। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জীবনে তা বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। সত্যি যাদের সেই অবস্থা লাভ হয়, তাদের জীবন ধন্য হয়। কারণ, একবার সেই অবস্থালাভের পর যদি আর সে অবস্থা নাও থাকে, তবু তার স্মৃতিতে সাধককে সর্ব্বদা ইষ্টের প্রতি ধাবিত করে। মোট কথা, জীবনে তার একটা স্থায়ী ফল রেখে যাবেই। আর তোমাদের ?"

অনেকেই একটু লজ্জিত হল বুঝ্‌লাম। তাদের সেই লজ্জা বিজড়িত সরল মৌনভাবের মধ্য দিয়া তাদের মুখে সরলতার এক স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটে উঠে আমাকে বিস্মিত করল। তাদের মৌন ভাবকে কুণ্ঠাশূন্য করতে বল্‌লাম—"কিন্তু আমি জানি, সবার না হলেও কেউ কেউ সত্যি প্রাণ উঘারিয়া জীবনের সমস্ত দুর্ব্বলতা সেই একান্ত আপনার পরম শক্তিমানের শ্রীচরণে কীর্ত্তনের সুরের ভেতর দিয়ে নিবেদন করাতে কারু কারু মাঝে সত্যিকার এক স্বর্গীয় ভাবের আবেশ এসেছিল। স্থানটী তখন সত্যি পরম পবিত্র বোধ হয়ে ছিল।"

একটা স্পষ্টবাদী তেজীয়ান ছেলে এগিয়ে ব'সে হেসে বল্‌লে—"মনে কিছু করবেন না, আপনার দু'-দিককার কথায় আমার নিজের কথাটা কোন্‌দিকে বল্‌ব বুঝে উঠতে পার্‌ছিনে।" হেসে জিজ্ঞেস করলাম—"কি রকম ?" সে উত্তর কর্‌ল—"আপনি একবার বল্‌ছেন, দশা-টশা Nervous debility বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, আবার বলছেন, আমাদের কার মাঝে কি দেখে ফেলেছেন। এতে বুঝলাম না যে দশাই কর্‌ব, অথবা দাঁত খিঁচিয়ে সব ভাবকে বিদেয় দিয়ে শক্ত হয়ে থাক্‌ব। আমাদের পক্ষে কোনটা যোগ্য তাই অনুগ্রহ করে বলে দিন।"

স্মিতভাবে বল্‌লাম—"দুটোর একটাকেও নির্দ্দিষ্ট করে বলা চলে না যে এটাই করা উচিৎ—অন্যটা করো না।" হঠাৎ তার দলের একটী বলে উঠল—"তবে কি আসর বুঝে পালা গাইব ? যেমন ইচ্ছে তেমনি ?" সবাই হেসে উঠল। সকলে চুপ কর্‌লে তাদিগকে লক্ষ্য করে বল্‌লাম "দেখ জীবনে আর সব নিয়ে হাসি তামাসা চলে, কিন্তু আধ্যাত্ম-জীবন

নিয়ে কখনও এটী করবে না।" সেই ছেলেটী এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক একটু অপ্রস্তুত হল। তাদের সে ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে না দিয়ে বল্লাম—"অবশ্য তোমরা এখানে যা বলছ, তা তোমাদের সরল প্রাণের বাস্তব স্বভাবের স্ফুরণ ভিন্ন কিছুই নয়। আর তোমাদের এই যে সরল ও (feely) উন্মুক্ত ভাবের উত্তর, তাতে আমি খুসীই হই, কিন্তু এর মাঝে একটী কথা স্মরণ রাখবে যে যার যেমন যোগ্য আসন, তাকে তাই দিতে হয়। নতুবা ভাবের গাম্ভীর্য্য হারিয়ে খেলো হয়ে যায়।"

একটী ছেলে খুব বিনয় সহকারে বল্লে,—"অপরাধ নেবেন না—ধর্ম্মের কথাও গম্ভীর হয়ে বল্‌বার প্রসঙ্গে পাদ্‌রীদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, we are the children of Bliss then why do we not rejoice? —আমরা আনন্দের সন্তান, আনন্দ কর্‌ব না কেন?"

প্রশান্ত ভাবে বল্লাম,—"তা ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আনন্দের মাঝেও সংযম রাখতে হবে। আনন্দের মাঝেও সংযম হারালে চল্‌বে না—কেন না, তাতে সে হবে উচ্ছৃসিত আনন্দ। তার মাঝে আমাদের আবাল্য পরিপুষ্ট ব্যক্তিগত স্বভাবটাই তার সমস্ত নীচতা নিয়ে প্রকাশ পাবে। কাজেই আনন্দ আমরা নিশ্চয়ই কর্‌ব—হাসি আমাদের ফুরাবে না, কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে যে কথাটী বল্‌ব, তার মাঝে উচ্ছ্বাস, বাচালতা বা অসারতার পরিচয় থাক্‌বে কেন? হাসির সঙ্গে বাক্যের সংযম চাই-ই।"

"তাহলে আর খোলা প্রাণে কথা বলা যায় না" —মন্তব্য হল। উত্তর কর্‌লাম,—"প্রাণ যদি খোলাই থাকে, তবে শিক্ষার কালে এই অভ্যাসগুলি যাতে গঠিত হয়, সেজন্য একটু স্নেহের তিরস্কারও কি তোমরা প্রিয়জনের কাছ থেকে পেতে অস্বীকার কর্‌বে? প্রিয়জন তো আর রাস্তার লোক নয়।"

অধিকাংশই সমস্বরে বলে উঠল—"না, না, ঠিক কথাই বলেছেন উনি—" আমি বলে চল্লাম—"হাঁ যে কথা হচ্ছিল—যার ভিতরে যে ভাব, কোনও অবস্থায় তার কপট ব্যবহার না করে, সরল উদার ভাবে যার ভিতর হতে যেরূপ ভাব আস্‌বে সে প্রধানতঃ সেইরূপই কর্‌বে। কিন্তু সকলের পক্ষেই আপনভাব বিশেষ পুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার মাঝে সংরক্ষণের চেষ্টা কর্‌বে। —বাহিরে ছড়াতে যাবে না, বা দেবে না। আপনভাবে যতই নিজের ভিতর চাপতে চেষ্টা কর্‌বে, ততই তা ক্রমশঃ গাঢ় হবে। জ্ঞান বা প্রেম যা'ই হোক্, পুষ্ট না হতেই যদি প্রচার হতে সুরু হয়, তবে শীঘ্রই সে ভাব ভিতর থেকে শুকিয়ে যায় অর্থাৎ তার বিলোপ ঘটে। সুতরাং কীর্ত্তনাদিতে যদি কোন ভক্তের বাস্তবিকই প্রকৃত ভাবের উদয় হয়, তবে যতদূর সাধ্য প্রথমতঃ চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর যে ভাগ্যবান্ বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে স্বর্গীয়ভাবে বিভোর হন, তাঁর কথা আলাদা—তাঁর বাহিরের আচরণ সাধারণের অননুকরণীয়। তিনি সাধারণের বহু উর্দ্ধে। কিন্তু সাবধান, লোকের কাছে প্রথমেই ভক্ত বা জ্ঞানী সাজতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করো না। আজ তবে এই পর্য্যন্ত।"

রঘুনাথ দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পানিহাটী গ্রাম হইতে রঘুনাথ আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নিত্যানন্দের কৃপায় তিনি তথায় অন্তরঙ্গগণ সহ 'সহজ ভজনানন্দের যে অমৃত-ময় আস্বাদ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন, তাহার তুলনায়. সংসার-সুখ তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ প্রতিভাত হওয়ায় তিনি এবার আর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিলেন ; স্নেহভাজন পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহার স্নেহপ্রবণ পিতামাতার চিত্তে কঠোর ভাবে আঘাত করিলেও, তাঁহারা রঘুর এই ব্যবস্থায় বিশেষ আপত্তি করিলেন না, কারণ তাঁহা-দের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, পুত্রকে আর তাঁহারা কোন প্রকারেই সংসারাসক্ত করিতে পারিবেন না, পরন্তু তাহার ইচ্ছানুযায়ী আচরণাদি করিয়াও যদি সে বর্ত্তমানে তাঁহাদের নয়নানন্দ হইয়া শুধু গৃহে অবস্থান করে, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই মনোবৃত্তির অধীন হইয়া তাঁহারা রঘুর এই আচরণে বাধা দিলেন না, তবে যাহাতে সে আর কোন প্রকারেই গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রক্ষী ও সেবক নিযুক্ত করিলেন, পালা-ক্রমে দিবারাত্রি তাহারা রঘুকে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

রঘুর মনে শান্তি নাই, চোখে তাঁহার ঘুম নাই, অহর্নিশ কেবল তাঁহার চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন-মোহন রূপ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে ছুটিয়া যাইতে না পারিয়া তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তাঁহার হৃদয়ের কথা কেহ বুঝে না, মর্ম্মের ব্যথা কেহ অনুভব করে না, সকলেই স্বার্থ ও মোহের বজ্র বাঁধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিতে চায়, তাহাতেই যেন তাহাদের আনন্দ ; এমনি স্বার্থপর এ সংসার !

সংসারের এই নিষ্ঠুর ভালবাসা রঘুনাথকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, কেমন করিয়া এই মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি মুক্তির মহামিলন ক্ষেত্রে উপনীত হইবেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে গৌড়বাসী গৌরভক্তগণের নীলাচলে প্রভুর চরণ দর্শন জন্য যাইবার সময় উপস্থিত হইল, প্রতি বারেই তাঁহারা রথযাত্রার সময় এই ভাবে মিলিয়া মিশিয়া জগন্মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠাইয়া নীলাচলে গমন করেন, এবারেও সেই আনন্দ-ক্ষণ সমুপস্থিত। রঘুনাথ একবার মনে করিলেন, যে কোন প্রকারেই হউক এই যাত্রীর দলে মিশিয়া তিনি নীলাচলে গমন করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি তাঁহাদের সহিত যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। কারণ যাত্রীরা যে পথ দিয়া গমন করেন, সে পথ সর্ব্বজনবিদিত। আর বহু লোক সঙ্গে থাকিলে পিতা অতি অনায়াসে সন্ধান পাইয়া ধরিয়া লইয়া আসিতে পারেন। সুতরাং তিনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

যাত্রীরা চলিয়া গেলেন, রঘু একান্ত মনে পলা-য়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির জানেন যে অবশ্যই তিনি একদিন এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু সে যে কত দিনে তাহা

তাঁহার অগোচর। যাহা হউক প্রভু স্বয়ং বলিয়াছিলেন—তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে কোন প্রকারেই আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না, সময় হইলে আপনি ছুটিয়া যাইবার কৌশল বা উপায় তাঁহার মধ্যে স্ফুর্ত্ত হইবে, শুধু এই ভরসায় তিনি সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দৈবক্রমে একদিন সে সুযোগ মিলিল। এক দিবস রঘুনাথ বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন, প্রহরীগণও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় প্রায় সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল, প্রভাত হইতে আর মাত্র চারি দণ্ড অবশিষ্ট আছে, এমন সময় যদুনন্দন আচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি রঘুনাথের কুলগুরু এবং অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য। আচার্য্যের আজ্ঞায় মহাপ্রভুকে তিনি স্বয়ং ভগবান্ রূপে মান্য করেন। স্বীয় কুলগুরুকে অঙ্গনে সমুপস্থিত দেখিয়া রঘুনাথ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যদুনন্দনের এক শিষ্য তাঁহার ঠাকুর সেবা করিত, কয়েক দিন হইল সে এই সেবাকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই শিষ্যটী রঘুর বিশেষ অনুগত, তাই তিনি রঘুকে অনুরোধ করিলেন, যদি বলিয়া কহিয়া তাহাকে পুনরায় সেবায় নিযুক্ত করাইতে পারেন, কারণ ব্রাহ্মণ সেবক পাওয়া বড়ই দুষ্কর, বিশেষ পূজোপলক্ষে প্রাতেই তাহাকে না হইলেই চলিবে না, সেই জন্য তিনি রঘুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেই পূজারীর বাটীর অভিমুখে চলিলেন। রক্ষকেরা মনে করিল, যখন স্বয়ং আচার্য্যপ্রভুর সহিত রঘুনাথ যাইতেছেন, তখন আর আশঙ্কা কি? এই মনে করিয়া রক্ষকেরা সারা রাত্রির পর রাত্রিশেষে একটু চক্ষু মুদিল, অমনি তাহারা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

এদিকে দুই জনে কথা বার্ত্তা বলিতে বলিতে আচার্য্য ঠাকুরের বাড়ীর দিকে চলিলেন, আচার্য্যের বাড়ী ছাড়াইয়া কিয়দ্দুরে পূজারীর বাড়ী। আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর নিকটে আসিয়া রঘুনাথ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—"আপনি গৃহে গমন করুন, আমি পূজারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সব ঠিক-ঠাক করিয়া আসিতেছি, আপনার আর অনর্থক তথায় যাইবার প্রয়োজন কি?" আচার্য্য মহাশয় সরল প্রকৃতির লোক। রঘুনাথের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রঘু এখন একা, রঘু এখন নিঃসঙ্গ। তখনও প্রভাত হয় নাই, রাত্রির আঁধার সেই বিদায়ের বেলা যেন আরও বেশী করিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি তখনও সুষুপ্তির কোলে নিমগ্ন; এই বিবিক্তাবস্থায় রঘুর মনে একটী ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—"যে গৃহত্যাগের সুযোগ তিনি এতদিন ধরিয়া খুঁজিয়া আসিতেছিলেন, সেই সুযোগ যে আজ স্বতঃই উপস্থিত! এখন না আছে সেবক, না আছে রক্ষক, না আছে অপর কোন প্রতিবন্ধক। এই অবস্থায় এই সুযোগে নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করিতে না পারিলে এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কখনও মিলিবে বলিয়া ভরসা হয় না। অতএব তদভিমুখেই প্রস্থান করি।"

যেই এই ভাব তাঁহার অন্তরের মাঝে জাগিল, অমনি তিনি পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। যদিও নীলাচলধাম সপ্তগ্রাম হইতে ঠিক দক্ষিণদিকে অবস্থিত, তথাপি তিনি পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়াই ছুটিলেন; ইহার উদ্দেশ্য, যাহাতে আর রঘুর গন্তব্য পথের সন্ধান আর কেহ জানিতে না পারে। রঘুর সর্ব্বদাই ভয়, পাছে এখনি তাঁহার অনুপস্থিতির সংবাদ অবগত হইয়া পিতৃদেব লোকজন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ধরিতে আসেন! এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি বার বার পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া

চাহিতে লাগিলেন এবং পথ ছাড়িয়া উপপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্তরে আর তাঁহার কোন চিন্তা নাই, তিনি শুধু শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করিয়া গ্রাম্য পথ ছাড়িয়া বন্য পথ ধরিয়া চলিলেন। রাজপুত্র তিনি, আশৈশব ধনিককুল-সুলভ ভোগবিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত তিনি, এবম্বপ্রকার পদব্রজে গমন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ কষ্টকর, তথাপি এই কষ্টকে তিনি সাদরে বরণ করিয়া অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ চলিবার উপক্রম করিলেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, মিথ্যা ছল অবলম্বনে এই যে রঘুর গৃহত্যাগ ইহা কি সমীচীন হইল? গুরুকে আশ্বাস বাণী দিয়া, তাঁহার বিশ্বাস-হন্তারক হইয়া এই যে রঘুর নীলাচল গমন, ইহা কি শাস্ত্রানুমোদিত? ইহার উত্তরে আমরা বলি—যেক্ষেত্রে গৃহত্যাগই জীবনের প্রথম কাম্য, অথচ তাহাতে বাধা অনেক, এমন কি সরল ব্যবহারে যে স্থান হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে ছল অবলম্বনে কোন দোষ হয় না। আমরা জানি, যাঁহারাই প্রবৃত্তি মার্গ সংসার ছাড়িয়া, নিবৃত্তির পথে আসিয়াছেন—তাঁহাদের অধিকাংশকেই এই ছলের শরণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে; আচার্য্যপ্রবর শঙ্করও ইহা হইতে বাদ পড়েন নাই।—আর কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া এই ছল অবলম্বন করেন না, শ্রীভগবান্ যাহাকে সংসার হইতে টানিয়া লন, তাহার মাঝে স্বতঃই এই সুযোগ—এই ছল সঞ্জাত হয়। রঘুরও যে আজ এই সুযোগ ঘটিল এবং এই ছলের স্ফূর্ত্তি হইল, ইহার একমাত্র হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা। প্রভু তো স্বয়ংই রঘুকে বলিয়াছিলেন—

বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥

আজ রঘুর সে সুযোগ ঘটিয়াছে, তিনি দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া একান্তমনে চৈতন্যচরণ স্মরণপূর্ব্বক পথ ছাড়িয়া উপপথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিবার সময় তিনি কতবার আছাড় পড়িয়াছেন, কতবার হুঁচুট খাইয়াছেন, কত বার তাঁহার কোমল দেহ ও কোমল চরণ হইতে শোণিত পাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবু তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন— একান্ত মনে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকিতেছেন—"ওগো দেবতা! আমার এই প্রয়াণ যেন সার্থক প্রয়াণ হয়, আর যেন ধৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে না হয় প্রভু!" এই ভাবে বিভাবিত হইয়া রঘুনাথ জল, জঙ্গল, তৃণ, কণ্টক ও বালুকা-ভূমি প্রভৃতির উপর দিয়া উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠিত ভাবে ধাবমান হইলেন। দেহের ক্লান্তির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধার দিকে লক্ষ্য নাই, পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে, সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ভাবে একদিনে তিনি ১৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন। রাজপুত্র তিনি, পথ চলিতে অনভ্যস্ত তিনি, তথাপি একদিনে তিনি যে এই পঞ্চদশ ক্রোশ পথ কেমন করিয়া অতিক্রম করিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়! প্রাণে কিরূপ আবেগের সঞ্চার হইল যে অতুল রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং অপ্সরাসম ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া এই ত্যাগের পথে আসিবার সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহাও উপলব্ধব্য! যাহা হউক সন্ধ্যাকালে তিনি এক গোপ-বাথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সহৃদয় গোপ তাঁহাকে উপবাসী ও ক্লান্ত দেখিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিতে দিল, রঘুনাথ দুগ্ধ পান করিয়া সেই রাত্রি তথায়ই যাপন করিলেন।

এদিকে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই রঘুনাথের প্রহরীরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রঘুনাথ তখনও মণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই দেখিয়া তাহারা ভীত

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, অমনি তাহাদের একজন আচার্য্যপ্রভুর বাড়ীর অভিমুখে ছুটিল। যদুনন্দন রক্ষীর মুখে রঘুর বার্ত্তা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সে কি! সে তো বহুক্ষণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে! তবে সে কি আবার পলাইল?"

রঘুর এই পলায়ন সংবাদ অচির মধ্যেই ঘরে-বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। যে পথ দিয়া রঘু বার বার পলাইয়া যাইতেন সেই সমস্ত পথে বহু দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলিল, দক্ষিণ দিকে পল্লীতে পল্লীতে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করা হইল কিন্তু সবই বিফল! কোথাও রঘুর সন্ধান পাওয়া গেল না, এমন কি কেহ যে রঘুকে আজ প্রাতে দেখিয়াছে এরূপ কথাও কেহ বলিতে পারিল না। আর পারিবেই বা কিরূপে? রঘু যে এবার পথ ছাড়িয়া পূর্ব্ব দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম—সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাস মনে করিলেন—গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর সন্দর্শনে নীলাচলে গমন করিতেছেন, সম্ভবতঃ রঘুনাথ যে কোন প্রকারে হউক সেই দলে মিশিয়াছে। ভক্তগণ যে পথে যাইতেন, সকলেই সে পথের সন্ধান অবগত ছিলেন; তাই তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া নীলাচল যাত্রীদের অগ্রণী তাঁহার সুপরিচিত শ্রীযুক্ত শিবানন্দ সেন মহাশয়ের নামে অতি বিনয় সহকারে এই মর্ম্মে একখানা পত্র লিখিলেন যে—তাঁহার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ গৌরাঙ্গ-প্রেমে পাগল হইয়া গৃহ-পরিজন ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার অভাবে গৃহে হাহাকার উপস্থিত, প্রেরিত দশ জন লোকের সহিত যেন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পাগল ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের সকলের শান্তির বিধান করেন।

পত্র লইয়া দশ জন লোক তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইল। তাহারা ঝাঁকড়া পর্য্যন্ত গিয়া নীলাচল-যাত্রীদিগের সাক্ষাৎ পাইল এবং শিবানন্দ সেনের হস্তে গোবর্দ্ধন-লিখিত পত্র প্রদান করিল, এই পত্র পাইয়া শিবানন্দ অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলেন; তিনি প্রেরিত লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে আসে নাই, এমন কি পথে কোন দিন তাহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎও হয় নাই। লোকগুলি নিরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিল। রঘুনাথের পিতা মাতা এই সংবাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, পতিগত প্রাণা বালিকা বধূ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পাড়া-প্রতিবেশীগণ সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে রঘুনাথ প্রথম রাত্রি গোপবাথানে কাটাইয়া অতি প্রত্যূষেই আবার গন্তব্য পথে রওনা হইলেন। এবার আর তিনি পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন না, দিক পরিবর্ত্তন করিয়া সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ আর তাঁহার ধরা পড়িবার ভয় নাই, পথ ছাড়িয়া বিপথ ধরিয়া এত দূরে চলিয়া আসিয়াছেন যে সে পথের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিয়া যে তিনি এখন ধীর গতিতে পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন তাহা নহে, কারণ যদিও আর তাঁহার ধরা পড়িবার ভয় নাই, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন মোহন রূপ তাঁহার চিত্তে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। তিনি উন্মত্তের মত দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন,—পথের প্রয়োজন নাই, পথ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, ভোজনের আকাঙ্ক্ষা নাই, বিশ্রামের অপেক্ষা নাই, ক্রমাগত

তিনি নীলাচল লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ১১ দিন পরে তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এই ভাবে চলিতে চলিতে দ্বাদশ দিনে তাঁহার চিরাভীপ্সীত ক্ষেত্র লাভ হইল। এই পথের বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে॥

* * *

ছত্র ভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি চৈতন্য চরণ প্রাপ্ত্যে মন॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ পান।
যবে যেই মিলে তাতে রাখে নিজ প্রাণ॥
বারো দিনে চলি গেল শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন॥

ধন্য রঘুনাথ দাসের তীব্র সংসার বৈরাগ্য! ধন্য তাঁহার যোগিজনদুর্ল্লভ তিতিক্ষা! এই ত্যাগ বৈরাগ্যের অমূল্য আভরণে বিভূষিত না হইলে কি তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা করামলকবৎ লাভ করিতে পারিতেন— না ভুবনবিখ্যাত গোস্বামী ষটকের অন্যতম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্ত-জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেন? যাহা হউক আজ বহু দিন পরে রঘুর আশা ফলবতী হইল, তিনি আজ বহু ভাগ্য ফলে পুরুষোত্তমধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আনন্দে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে, পুনঃ পুনঃ দেহ পুলককণ্টকিত হইতেছে, আর ক্ষণকাল পরেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের চির আরাধ্য দেবতার চরণ দর্শন করিবেন—এই কথা স্মরণ করিয়া রঘু তন্ময় হইয়া পথ বাহিয়া চলিলেন। পথ চলিয়াছেন চৈতন্য নাই, গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসারও অপেক্ষা নাই, কোন্ অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে যেন তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ ছুটিয়া চলিয়াছেন। সহসা তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল, বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তিনি দেখিলেন সম্মুখেই তাঁহার হৃদয়ের দেবতা ভক্ত সঙ্গে সমাসীন। এই দৃশ্যে রঘুর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি দূর হইতেই ভক্তিবিগলিত ভাবে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। রঘু আজ ধন্য হইলেন—সাধনায় তাঁহার সিদ্ধি হইল। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দত্ত রঘুনাথকে দূর হইতে প্রণত হইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই সেই রঘুনাথ আসিয়াছে।" অমনি মহাপ্রভু সাদরে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন, রঘু প্রভুর আদেশে তখন অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

হে নাথ হে প্রভো ওহে করুণা নিধান।
কৃপা করি শ্রীচরণে দাও মোরে স্থান॥
অনাথ অধম মুঞি অতি দীন হীন।
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন॥ (ভক্তমাল)

কি সুন্দর আর্ত্তি! কি সুন্দর আত্মসমর্পণ! কোটিপতি পিতার সন্তান তিনি, অতুল রাজ্যসম্পদের উত্তরাধিকারী তিনি, তিনি আজ ভূলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে অনাথ অধম দীনাতিদীন ভাবিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বাস্তবিকই যত দিন পর্য্যন্ত নিজেকে "সকল রকমে কাঙ্গাল" বলিয়া বুঝিতে না পারা যায়, তত দিন পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ হয় না; যত দিন পর্য্যন্ত অহমিকার উচ্চশির অবনমিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের কৃপাবারি বর্ষিত হয় না।

শ্রীভগবানের দুইটী নাম বড় মধুর! একটী "অনাথ শরণ" অপরটী "দীন তারণ"। 'অনাথ' বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই; আর 'দীন' বলিতে বুঝি যাহার আপনার বলিতে কিছু নাই। অর্থাৎ ধনজনশূন্য

দরিদ্রকেই আমরা অনাথ—দীনদরিদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম রাজ্যে উপরিউক্ত শব্দ দুটীর অর্থ অতীব গূঢ়ত্ব ব্যঞ্জক। এ পক্ষে—যাঁহার সকলই আছে, অথচ অনিত্য বোধে যিনি তাঁহাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য পুরুষ শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণে ব্যাকুল, তিনিই অনাথ, আর যাঁহার সকলই আছে অথচ—"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি তাহার খানিক"—এই খানিকের কাঙ্গাল, তিনিই দীন; এবম্বিধ অনাথকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দেন বলিয়া শ্রীভগবান্ 'অনাথ শরণ', এবম্বিধ দীনকে বিষয়-বিষ হইতে পরিত্রাণ করেন বলিয়া তিনি "দীন তারণ"। আজ প্রকৃতই রঘু আপনাকে অনাথ বলিয়া বুঝিয়াছেন, দীন হীন বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাই অনাথ শরণ দীন তারণ প্রভু তদীয় চরণে নিপতিত রঘুকে ভূমি হইতে তুলিয়া কৃপাতিশয্যে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন—সংসার তাপদগ্ধ রঘু মহাপ্রভুর প্রেমময় অঙ্গ স্পর্শে অবশ হইয়া পড়িলেন। যে অঙ্গ-সঙ্গ লাভের জন্য এত প্রচেষ্টা—এত সাধনা—এত বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম, তাহা আজ পূর্ণ হইল, সিদ্ধ হইল।

রঘুনাথ যে প্রভুর অতি ভালবাসার পাত্র, তাঁহার পার্ষদগণেরও অতি সুপরিচিত, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত মুকুন্দ দত্তের উক্তি হইতেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায়। কারণ রঘুনাথকে দেখিয়াই "এই সেই রঘুনাথ আসিয়াছে" এই প্রকার উক্তি অপরিচিতের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব পর নহে, এবং রঘু মহাপ্রভুর ভালবাসার পাত্র না হইলে মুকুন্দ দত্তের এই কথা শুনিয়াই তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে আপনার নিকট ডাকিতেনও না। যাহা হউক মহাপ্রভুর আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া রঘুনাথ উপস্থিত ভক্তবৃন্দের প্রত্যেকের চরণ বন্দনা করিলেন, প্রত্যেকেই উঠিয়া উঠিয়া প্রেমবিগলিত ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

মহাপ্রভু বলিলেন—

"রঘুনাথ! কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্ত হৈতে॥

তুমি এতদিন বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলে, কত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলে। কামিনী কাঞ্চনের অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে আপনাকে উদ্ধার করা অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিলে, কিন্তু দেখ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তির প্রভাব কিরূপ! যে ঐশ্বর্য্যের জন্য আপামর সাধারণ শত-বার জন্ম গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত, তুমি সেই ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া আসিলে, —যে সৌন্দর্য্যপিপাসায় সাধারণ লোক পাগল, তুমি সেই সৌন্দর্য্যের মোহ নিমেষে কাটাইয়া আসিলে! ধন্য শ্রীকৃষ্ণ, ধন্য তাঁহার আকর্ষণী শক্তি!"

রঘুনাথ একথার উত্তরে মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন—ওগো দেবতা! আমি কৃষ্ণ জানি না, বিষ্ণু জানি না, আমি জানি তোমার কৃপার প্রবল আকর্ষণে আমায় ঘর ছাড়াইয়াছে, তোমার ভুবনমোহন রূপ আমায় সংসার ভুলাইয়াছে, এই আমি জানি, এই আমি মানি। চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়—

রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাঢ়িল আমা, এই আমি মানি॥

মহাপ্রভু আবার বলিলেন—"রঘুনাথ! তোমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই আমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে অগ্রজের ন্যায় গণ্য করিতেন, তিনিও ইঁহাদিগকে আপন সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এই সম্পর্কানুযায়ী ইঁহারা আমার আজা, এই আজা সম্বন্ধাবলম্বনে আমি পরিহাস করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে ভক্তগণ সমক্ষে দু'একটী কথা বলিতেছি, শুন।

ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়া।
"সুখ" করি মানে বিষয় বিষের মহা পীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥

হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারশীল, সৎক্রিয়াশীল, ব্রাহ্মণগণের পরম সহায়, বৈষ্ণবধর্ম্মের বাহ্যাচারী। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? উঁহারা পরম বিষয়ী, বিষয় রূপ বিষ্ঠা গর্ত্তের কৃমিকীট সদৃশ, এই বিষয় বিষের মহাপীড়াকে তাঁহারা 'মহা সুখ' বলিয়া মনে করেন, বিষয়-সুখ হইতে কোটী গুণে গুণিত প্রভূত উন্নততর সুখ যে বিষয় ত্যাগে আছে তাহা তাঁহাদের অগোচর। উঁহাদের যতই সদ্‌গুণ থাকুক না কেন, যতই সদাচার থাকুক না কেন উঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, কারণ সংসারাসক্তি বৈষ্ণবের পরিচায়ক নহে. সংসার-বিরক্তিই তাঁহাদের অলঙ্কার। যিনি যতই অনাসক্ত ভাবে সংসারভোগ করিবার প্রয়াস পান না কেন,—বিষয়ের এমনি স্বভাব— অলক্ষিতে তাহা বিষয়ীর চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে মহা অন্ধ করিয়া ফেলে, তাহা দ্বারা এমন কর্ম্ম করায় যাহতে ভব বন্ধন মুক্ত না হইয়া আরও দৃঢ়তর রূপে সংবদ্ধ হয়। যাহা হউক, রঘুনাথ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই বিষয়রূপ মহা বিষকুণ্ড হইতে উদ্ধার পাইয়াছ, তোমার অতুল সৌভাগ্য! যে বিষয়-বিষের কণামাত্র আস্বাদে জীব আপনা ভুলিয়া যায়—প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়—

সেই বিষয় হইতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা॥

যাহা হউক, রঘুনাথ এখন সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চিত্তের গ্লানিমা মুছিয়া গিয়াছে, সংসারাগুণে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তাঁহার আধার এখন শুদ্ধ আধারে পরিণত হইয়াছে। এই প্রকার গ্লানিমারহিত বিশুদ্ধ আধারই প্রেম-বীজবপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, এই বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ উপ্ত হইলে অচির কাল মধ্যে তাহা ফলফুলে পরিশোভিত মহামহীরুহে পরিণত হইয়া বিশ্ববাসীর সংসার জ্বালা দূরীভূত করিবে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া দয়াল ঠাকুর আমার কৃপা-বিগলিত চিত্তে আপনার দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপ দামোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"স্বরূপ! রঘুনাথ আজ সকল ছাড়িয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহার আর আপনার বলিতে কেহ নাই সবই তার ঠাকুর। তার এই আত্মদান আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। সে এখন আমার। আমার এই অতি আপনার বস্তুটীকে আজ তোমার হাতে সঁপিয়া দিলাম, তুমি ইহাকে আমার অভীপ্সীত সাধন-ভজন পন্থায় পরিচালিত করিয়া ইহাকে মানুষ করিয়া তোল, ব্রজের নিগূঢ় রসসিঞ্চনে ইহার দেহ-মন-প্রাণ সঞ্জীবীত কর, অচিরকাল মধ্যেই যেন আমি ইহার মধ্যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। তুমি আজ হইতে ইহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিও, ভৃত্যের ন্যায় ইহার সেবা গ্রহণ করিও। আমার নিকট এ পর্য্যন্ত তিনটী* রঘুনাথ আসিয়া জুটিয়াছে, কাজেই আজ হইতে এই রঘুনাথের নাম **স্বরূপের রঘুনাথ** হইল, অতঃপর ইনি 'স্বরূপের রঘুনাথ' নামেই অভিহিত হইবেন।" এই বলিয়া দয়াল ঠাকুর আমার রঘুনাথের হাত ধরিয়া তাহাকে স্বরূপের হাতে সঁপিয়া দিলেন। স্বরূপও "তথাস্তু" বলিয়া রঘুনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তমণ্ডলী রঘুনাথের সৌভাগ্য দেখিয়া গগনকম্পী জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। (ক্রমশঃ)

* (১) ভট্ট রঘুনাথ (২) বৈদ্য রঘুনাথ (৩) দাস রঘুনাথ। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথ পুরী, রঘুনাথ তীর্থ ও দ্বিজ রঘুনাথ নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা বদরীনাথ হতে ফিরবার সময় দুই দল হয়ে পড়ি—একদল কর্ণপ্রয়াগ হতে রামনগরের পথে যাই, অন্য দল কর্ণপ্রয়াগ হতে রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ হয়ে হরিদ্বারে যায়। সুতরাং দুই দিকেরই পথের বিবরণ আমরা বিস্তৃতরূপে জান্‌তে পারি। ধীরে ধীরে সে সব পথের বিবরণ সবিস্তারে জানাব যাতে যাত্রীদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

হরিদ্বার হতে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত চটির নাম ও দূরত্ব যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী যাবার পূর্ব্বেই পাঠকদের জানিয়েছি এবং দেবপ্রয়াগ হতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত চটীর নাম ও দূরত্ব ত্রিযুগী নারায়ণে থাকার সময় পাঠকদের জানিয়েছি। এখন শুধু পথের বিবরণ এবং বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানাব।

দেবপ্রয়াগ হতে ভাগিরথী গঙ্গার নিকট বিদায় নিয়ে (কারণ এর পর আর কেদার বদরীর পথে ভাগিরথী গঙ্গা পাওয়া যায় না) অলকানন্দা গঙ্গার বাম তীর দিয়ে ক্রমে অগ্রসর হলে দুই মাইল দূরে

গোবিন্দ কুটী
২ মাইল

গোবিন্দ কুটী নামক চটী পাওয়া যায়। কেহ কেহ একে আনন্দ-চটীও বলে থাকেন। বেশ কলার বাগান আছে বটে! এখানে একটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। এখান হতে সমতল পথে চলে ৩ মাইল যাবার পর

সীতা কুটী
৩ মাইল

সীতা কুটী নামক একটী ছোট্ট চটী পাওয়া যায়। এখানেও থাকার তেমন সুবিধা নাই, কারণ দেবপ্রয়াগ নিকটে থাকায় অনেক যাত্রীই প্রায় এসব স্থানে থাকে না।

রাণীবাগ
৩ মাইল

সীতা কুটী হতে ৩ মাইল যাবার পর **রাণীবাগ চটী।** এ চটীটি বেশ বড় চটী, থাকার সুবিধা বেশ আছে। এখানে ১৫ জন দোকানদার আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পার্শ্বেই পরিষ্কার দুটী জলের ঝরণা বিদ্যমান। রাণীবাগ আস্‌তে বেশ চড়াই করে আস্‌তে হয়। এখানকার কলার বাগান দেখবার উপযুক্ত বটে!

রাণীবাগ চটী হতে ১॥ মাইল পথ যাবার পর একটি সরকারী বাংলা পাওয়া যায়। সেখান হতে

রামপুর চটী
৩ মাইল

আরও ১॥ মাইল পথ যাবার পর **রামপুর চটী।** সে চটীটি বেশ বড়। অনেকগুলি বড় বড় ঘর সংযুক্ত দোকানদার আছে। মোটামুটি পাহাড়ীর সব রকম খাবারের জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। জল খাবারের জিনিষ বেশ মিলে। খেলেই হল! পার্শ্বেই পরিষ্কার জলের ঝরণা। রামপুরের নিকট একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য ঝরণা প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। সেই স্রোতের বাম পার্শ্ব দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি পাকা সেতু পার হতে হয়। অল্পক্ষণ পরেই একটি বিস্তৃত উপত্যকা পাওয়া যায়।

রামপুর হতে **ভীল্ল কেদার** ৪ মাইল, পথগুলি বাংলা দেশের গ্রাম্য পথের মতই বটে! —অতি সুন্দর! ঢুংঢম নামীয় একটি পার্ব্বত্য নদী এসে এখানে অলকানন্দায় আত্মসমর্পণ করাতে

ভীল্ল কেদার
৪ মাইল

এস্থানের অন্য নাম **ঢুংডম প্রয়াগ।** ঢুংঢম নামীয় পার্ব্বত্য নদীটির অন্য নাম ভীলগঙ্গা। ঢুংঢম নদীর সঙ্গমস্থানে লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি পুল বিদ্যমান। তারই পাশে শ্রীশ্রীবিল্বকেদার শিবালয়। এর অপর পারে (অলকানন্দার পশ্চিম পারে) টিহরী মহারাজ কীর্ত্তিসাহা স্বনাম ধন্য করার জন্য নিজের নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম কীর্ত্তিনগর। শ্রীনগর হতে টিহরী যেতে উক্ত কীর্ত্তিনগর হয়ে যেতে হয়। কীর্ত্তিনগর বেশ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও অতি সুন্দর স্থান বটে।

নিকটে যে মূর্ত্তিগুলি দেখা যায়, স্থানীয় পাণ্ডাগণ তাহাকে নারায়ণ ও কালীমূর্ত্তি বলে থাকেন, তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তিকে কিন্তু অনেকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলে অনুমান করেন। দ্রষ্টব্য মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অতি পুরাতন একটি শিবলিঙ্গ, মেঝের উপর ক্ষোদিত চরণ চিহ্ন (কেহ বলেন চরণ চিহ্নটি শিবের, কেহ বলেন অর্জ্জুনের)। অলকানন্দার ওপারে মার্কেণ্ডেয় গঙ্গা নামে একটি প্রখর জলস্রোত এসে অলকানন্দায় মিশেছে। কিম্বদন্তী যে মার্কেণ্ডেয় ঋষি ঐ সঙ্গম স্থানে বসে কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সোমবারযুক্ত অমাবস্যাতে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তাই সোমবারে অমাবস্যা হলে এখানে খুব ধুমধাম হয়ে থাকে।

এই স্থানেই অর্জ্জুন মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করে, পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৩৭।৩৮।৩৯।৪০ অধ্যায়ে উক্ত কিরাত ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তথাপি পাঠকদের অবগতির জন্য মোটামুটি জানাচ্ছি।………যখন পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে বাস করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় দেবতাদের নিকট হতে দিব্য অস্ত্রাদি লাভ করে তাঁরা বিশেষ শক্তিশালী হন। কিছুদিন পর অর্জ্জুন সশস্ত্র হিমালয়ের ভিতর প্রবেশ করে, এই সুমনোরম স্থানটি নির্ব্বাচনান্তে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। অনেক দিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করলে পর শিবজী ভগবান অর্জ্জুনের পরীক্ষার্থ কিরাতবেশে এসে উপস্থিত হন। সঙ্গে জগন্মাতা ভগবতী ও তস্যা সহচরীগণ সকলে কিরাত রমণী বেশে এসে উপস্থিত হয়ে শিবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যত্নবান হন। যেখানে অর্জ্জুন তপস্যা করিতেছিলেন, এঁরা সেখানে এসে হাজির হন। ঠিক সেই সময় মূক নামক এক দানব বরাহরূপ ধারণ করে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, বরাহ শিকার ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, তদুপরি আত্মরক্ষার জন্য অর্জ্জুন বরাহকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। কিরাতগণও বরাহের মাংস অতি আনন্দের সহিত উদরস্থ করে থাকেন। সুতরাং এ সুযোগ উপেক্ষা করে কিরাতরূপী ছদ্মবেশী শিবজী মহাশয়ও বাণ নিক্ষেপ করেন। দুইটি বাণই একসঙ্গে বরাহরূপী দানবের অঙ্গে বিদ্ধ হওয়ায় দানব নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমরধামের যাত্রী হয়।

তখন অর্জ্জুনের সঙ্গে কিরাতরূপী শিবের ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়। অর্জ্জুন বলেন আমি আগে বাণ ত্যাগ করে বরাহ শিকার করেছি, তুমি কেন আমার শিকারের উপর বাণ ত্যাগ করলে? এটা তোমার বিশেষ অন্যায় তথা ক্ষাত্রধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কিরাতও ঠিক ঐরূপ বলে অর্জ্জুনের অন্যায় প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। কথায় কথা বেড়ে গেল—অন্তে চরমে যেয়ে পৌছিল। অগত্যা উভয়ে উভয়কে এ গর্হিত কার্য্যের জন্য শাস্তি দিতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন—ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, উভয়ের যুদ্ধে ধরণী কম্পমান! অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে আহত হয়েও কিন্তু কিরাত বিচলিত না হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ায়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জ্জুনের

সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র ফুরাইয়া গেলে, অগত্যা উভয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিরাত কর্তৃক অর্জ্জুন ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে অনেকক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটায়ে চেতনা হবার পর, মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে মহাদেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন। অগত্যা কি করেন? কিরাতের সঙ্গে ত যুদ্ধে হেরে গেলেন। এবার শিবের কৃপা ভিন্ন কিরাতকে জয় করা দুঃসাধ্য বুঝে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মৃণ্ময় শিবের মস্তকে মাল্য দিবার পর দেখতে পান, উক্ত মাল্য মহাদেবের শিরোদেশে শোভা পাইতেছে। তখন অর্জ্জুন বুঝ্‌লেন, মহাদেবই কিরাত বেশে তার সঙ্গে এত গোলমাল করেছেন। তখন অর্জ্জুন শত্রুতা ভুলে যেয়ে ভক্তিভরে কিরাতের পদপ্রান্তে আপন দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করেন তথা না জেনে যে অপরাধ করেছেন তজ্জন্য বার বার ক্ষমাপ্রার্থী হন। পশুপতি ক্ষমা করে হাস্‌তে হাস্‌তে তাকে আলিঙ্গন করেন এবং অতি প্রসন্ন চিত্তে মন্ত্রসহ পাশুপত অস্ত্র দান করেন। পশুপতি এই স্থানে ভীল বেশ ধারণ করেছিলেন বলে, এর নাম ভীল্ল কেদার হয়েছে।

স্কন্দ পুরাণের কেদারখণ্ডের উত্তর ভাগের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত আছে খাণ্ডব ও অলকানন্দার সঙ্গমে **শিবপ্রয়াগ** অবস্থিত। এখানে ভক্তি পূর্ব্বক স্নান করে শিবের আরাধনা করলে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভীল্ল কেদারের অন্য নাম শিবপ্রয়াগ।

ভীল্ল কেদার হতে রওনা হয়ে খানিক দূর যাবার পরই দুইটী রাস্তার সংযোগ স্থান এসে পড়ে। এখান হতে একটি রাস্তা টিহরি পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই টিহরী রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই অলকানন্দা মিলে। অলকানন্দার উপর একটু ঝোলা পুলে পার হয়ে কীর্ত্তিনগর দিয়ে টিহরী যেতে হয়। পাঠকগণ এ রাস্তাটি ত্যাগ করে অন্য পথে চলুন। ঐ রাস্তাটি বামদিকে রেখে ভীল্ল কেদার হতে আড়াই মাইল যাবার পর **কমলেশ্বর** চটী পাওয়া যায়। এটীও খুব পুরাণ জায়গা—একেও শ্রীনগরের মধ্যেই ধরে থাকে। এখানে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীকমলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে সীধা পথে ১॥ মাইল যাবার পর প্রসিদ্ধ স্থান **শ্রীনগর** পাওয়া যায়।

কমলেশ্বর ২॥ মাইল

শ্রীনগর ১॥ মাইল

এ শ্রীনগরটী কিন্তু কাশ্মীররাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর নয়, এটী প্রাচীন গাড়োয়াল রাজাদের রাজধানী ছিল, টিহরীর ইতিহাস বর্ণন কালে এই শ্রীনগরের ইতিহাস বলেছি। পুরাতন শ্রীনগর সহর ১৮৯৪খৃষ্টাব্দের বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে। লালসাঙ্গা বা চামেলী হতে ৪ মাইল উপরে বাবলা চটী। এই চটীর খানিক উপরে বিরহী নামীয় একটি পার্ব্বত্য নদী এসে অলকানন্দায় মিশেছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে উক্ত নদীর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত চূড়া ধসে যেয়ে অলকানন্দার সঙ্গম স্থলের অতি নিকটে বিরহী গঙ্গার মুখ বন্ধ হয়ে ২০।২৫ মাইল হ্রদের সৃষ্টি হয়। উক্ত হ্রদের নাম গোণাহ্রদ হয়। ধীরে ধীরে বিরহী গঙ্গাতে এত জল জমে যায় যে, হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা ঐ মুখ ভেঙ্গে প্রবল বন্যা হয়। সেই বন্যার প্রবল স্রোতে শ্রীনগর সহরটি ভেসে যায়। শুধু শ্রীনগর সহরটিই নয়, সে বন্যায় উত্তরাখণ্ড তথা হৃষিকেশ ও হরিদ্বারের যে সর্ব্বনাশ তথা ক্ষতি হয়েছিল, তা' শত বৎসরেও পূর্ণ হবে না। যদি সুবিধা হয়, এর বিস্তৃত বিবরণ পরে পাঠকদের জানাব। শুধু কমলেশ্বর শিবমন্দিরটী পুরাতনের সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড়ায়ে আছে। পূর্ব্বে যে স্থানে রাজধানী ছিল আজকাল সেখানে কৃষিক্ষেত্র বিদ্যমান।

শ্রীনগর সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৭০৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বর্ত্তমানে শ্রীনগর ইংরেজ রাজার অধীন—অতি সুন্দর শ্রীসম্পন্ন সহর। এখানে পাঁচটী সিদ্ধপীঠ, বড় বাজার, ধর্ম্মশালা, ডাকবাংলা, সদাব্রত, পাঠশালা, হাইস্কুল, সংস্কৃত বিদ্যালয়, টেলিগ্রাফ আফিস, পোষ্টাফিস, দাতব্য ঔষধালয়, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, বাবা কালী কম্বলী বালার ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, খ্রীষ্টান মিশনারীদের আস্তানা, ওদের স্কুল, নানাপ্রকার খাদ্য, তথা জামা, কাপড়, কম্বল, জুতা, ছাতি আদি প্রয়োজনীয় জিনিষাদি ভরা অনেক দোকান, শ্রীশ্রীশঙ্কর নাথ ও শ্রীশ্রীকমলেশ্বর শিবের মঠ বিদ্যমান।

বৃটিশ গাড়োয়ালের হেড্ কোয়াটার **পৌড়ী** এখানে হতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। পৌড়ীতে ডিপুটী কমিশনারের আফিস, সরকারী অনেক বড় বড় আফিস সেনানিবাস, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, বাংলা, বড় বাজার প্রভৃতি আছে। এই স্থান দিয়ে একটি সর্টকাট রাস্তা কোটদ্বার রেলষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়েছে। গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ লোকই এই পথ হিমালয়ে প্রবেশ করে থাকে। পৌড়ীর জলবায়ু মুসুরীর মত খুব স্বাস্থ্যকর।

পৌড়ী
৮ মাইল

শ্রীনগরের পথগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ গাছ রোপিত থাকায় অতি চিত্তবিনোদনকারী। রাস্তার দুই পার্শ্বের বাড়ীগুলি প্রায় সবই দ্বিতল—নিচের তলে দোকান ও উপরের তলে যাত্রীদের আড্ডার স্থান। এ সব দোকানে জুতা, ছাতা, কম্বল, অয়েলক্লথ, নানা প্রকার কাপড়, মসল্লা, আচার, প্রভৃতি পাওয়া যায়। হিমালয়ের ভিতরে এ দিকটায় এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর বটে।

এর পূর্ব্বে যে কমলেশ্বর চটীতে কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কথা বলে এসেছি, পূর্ব্বে ঐ দিকটাতেই শ্রীনগর সহর ছিল। পরে বন্যায় ভেসে সহর নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আজ কাল এ দিকে সরে এসেছে। উক্ত কমলেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মঠ ও গদী ছিল বলে পাণ্ডারা বলে থাকেন। প্রবাদ যে বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বন্ধ্যা জননীগণ সন্তান কামনা করে ঘীয়ের প্রদীপ নিয়ে চারিদিকে অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি জেগে থাকলে তথা প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হলে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে সন্তান জন্মে থাকে।

পুরাকালে নারদমুনি মোহিত হয়ে এই স্থানেই বানরমুখ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ইতিবৃত্ত সজাগ রাখার জন্য নারদ মুনির তথা বানরের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অলকানন্দার অপর পারে কালিকা দেবীর যজ্ঞ বেদীতে পূর্ব্বে নরবলি হত। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য দেব সেই রাক্ষসী মূর্ত্তি বিশিষ্ট পাথর খানা (যাহাকে লোকে কালিকাদেবী বলে পূজা করিত তথা য়ার সম্মুখে নরবলি দিত) অলকানন্দায় বিসর্জ্জন দিয়ে না জানি কত অনন্ত লোককে অপমৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করেছেন। সেই হতে নরবলিও বন্ধ হয়ে গেছে।

এখান হতে একটি পথ বর্ত্তমান গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী টীহরী পর্য্যন্ত গিয়েছে। সে পথে যেতে হলে এখান হতে ৪ মাইল দূরে বীর্ত্তিনগর তথা হতে ডাঙ্গচোর ৪ মাইল, সেখান হতে পৌ ১৪ মাইল, পৌ হতে টিহরী ১১ মাইল। মোট ৩৩ মাইল পথ চড়াই উৎরাই আছে। (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

জন্ম মহোৎসব

আগামী ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে কুতুবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেবের শুভ জন্ম মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সাধু, ভক্ত এবং আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। গুরুধামেই সার্ব্বভৌমভাবে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল বিভাগের ভক্তগণেরই উৎসবে যোগদান বাঞ্ছনীয়। উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ গুরুধামে পদার্পণ করিবেন।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন

আমরা মিশনের ১৯৩১ সনের কার্য্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। মিশন প্রচার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, ও সেবা-বিভাগ এই তিনটী বিভাগ খুলিয়া নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মিশনের উদ্যম ও কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। মিশনটীকে সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এখনো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আশা করি দেশবাসী ইহার প্রতি অবহিত হইবেন।

অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসবে সাহায্য প্রাপ্তি

[সারস্বত মঠে]

শ্রীঅন্নদাচরণ মাইতি ... ... ১০৲
শ্রীঅমরনাথ মণ্ডল ৷৷০
শ্রীযামিনীভূষণ দাস ৷০
শ্রীকেনারাম মণ্ডল ৷০
শ্রীগোষ্ঠবিহারী মণ্ডল ৷৷০
শ্রীননীগোপাল মাইতি ৷০
শ্রীগুরুচরণ দাস ৷৷০
শ্রীজ্ঞানদাচরণ মাইতি ৷০
শ্রীকুমুদবান্ধব মাইতি ... ... ১৲

[পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে]

শ্রীরাধানাথ দে ... ... ২৲
শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ ... ... ১৲
শ্রীদীনবন্ধু দে ... ... ১৲
শ্রীচারুচন্দ্র আচার্য্য ৷৷০
শ্রীবামাচরণ চক্রবর্ত্তী ৷৷০
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বণিক ৷৷০
শ্রীশশিকুমার চৌং ৷৷০
শ্রীরাসবিহারী চৌং ৷৷০
শ্রীনবীনচন্দ্র চৌং ৷০
শ্রীশরৎচন্দ্র চৌং ৷০
শ্রীরমেশচন্দ্র ধর ৷০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বণিক ৶০
শ্রীযামিনীরঞ্জন রায় ৵০
শ্রীমোহনবাঁশী আচার্য্য ৵০
শ্রীচন্দ্রকুমার নাথ ... ... ১৲
শ্রীক্ষীরোদবাসিনী চৌং ... ... ২৲
শ্রীনর্ম্মদাকুমার সেন ... ... ১৲
শ্রীসারদা চক্রবর্ত্তী ... ... ১৲
ঐ স্ত্রী ... ... ১৲
শ্রীবৈকুণ্ঠ নমঃ ... ... ১৲
শ্রীনরেশচন্দ্র ধর ... ... ১৲
শ্রীযোগেশ দাস ... ... ১৲
শ্রীবিপিন সাহা ... ... ১৲
শ্রীগোলকচন্দ্র দে ৷০
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ৷৷০
শ্রীগৌরচাঁদ চক্রবর্ত্তী ৷৷০

২৫শ বর্ষ — শ্রাবণ—১৩৩৯ — ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৬৭ — ৪র্থ সংখ্যা

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্

অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো,
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥

—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতে মহত্তর আত্মা প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। বিগত-শোক সাধক ঈশ্বর প্রসাদে অথবা ধাতুপ্রসাদের গুণে সেই অকাম ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন।

ভগবান্ মানুষের হৃদয়েই অবস্থিত আছেন, কিন্তু ভ্রান্ত মানুষ সেই অন্তর্দেবতাকে বাহিরে খুঁজিয়া মরে। অন্তরের ধনকে বাহিরে খুঁজে বলিয়াই মানুষ বহুদিন গত হইলেও তাঁহার দর্শন পায় না।

ভগবানকে লাভ করার দুইটী উপায়— এক হইল তাঁহারই কৃপা বা প্রসাদ, আর এক হইল নিজের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করা। তাঁহার কৃপা তো থাকা চাই-ই, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহেরও সুপ্রসন্ন অবস্থা আনিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ থাকে বলিয়াই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। সর্ব্ব বৃত্তিকে প্রশান্ত করিতে পারিলেই, ভগবদ-নুগ্রহ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আত্মচেষ্টা এবং তাঁহার কৃপা উভয়েরই প্রয়োজন। কেবল ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যদি তিনি কৃপা করিয়া সাধককে দশন না দেন। সুতরাং সকল সাধনার উপরেও কথা আছে—তাহা আর কিছু নয়, তাঁহারই কৃপা। আবার শুধু তাঁহার কৃপা হইলেই বা কি হইবে—সেই কৃপা তো উপলব্ধি করা চাই, হৃদয়ে সেই কৃপাকে তো ধারণ করিয়া রাখা চাই? এই জন্যই চাই ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিশুদ্ধি। তাঁহাকে দর্শন করা তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ, আবার তাঁহার মহিমা দর্শন করিতে হইলে, যে করণ দিয়া মহিমা দর্শন করিব, তাহার বিশুদ্ধি হওয়া চাই। তাঁহার মহিমা দর্শন করিব কি দিয়া? এই হৃদয়-মন-বুদ্ধি দিয়াই তো? সুতরাং করণের মাঝে মালিন্য থাকিলে, দর্শনের তো কোন সার্থকতা হইবে না।

ধাতু যাহাতে উগ্র না হয়, তাহার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধাতু প্রসন্ন থাকিলে ইন্দ্রিয়সমূহ স্থির-অচঞ্চল থাকে, আর অচঞ্চল ইন্দ্রিয়ই ভগবদ্দর্শনের প্রধান সহায়। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার দরুণ ধাতুর সাম্যাবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এই জন্যই ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদিগকে কেবল বাহিরের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। একমাত্র ধাতুপ্রসাদের গুণেই মানুষ দেবতাপদবাচ্য হয়। আবার ধাতুকে অবিচলিত, অবিক্ষুব্ধ রাখিতে পারে না বলিয়াই—মানুষই পশুতে পরিণত হয়। সুতরাং ভগবদ্দর্শন করিতে হইলে ধাতু যাহাতে সুপ্রসন্ন থাকে, সেই বিষয়ে সবিশেষ প্রযত্ন রাখিতে হইবে। ধাতুকে সাম্য রাখিতে হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনেই ধাতু প্রসন্ন থাকে, আর ব্রহ্মচারীই একমাত্র ভগবদ্দর্শনের শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম অধিকারী।

ভগবান্‌কে দর্শন করিতে হইলে আরও একটী স্বাভাবিক গুণ থাকা চাই —সে আর কিছুই নয়, বিগতশোক হওয়া। শোকে-মোহে অভিভূত জীব ভগবৎকরুণা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদ প্রথমেই বলিয়াছেন, ঈশ্বর দর্শনাভিলাষীকে বিগতশোক হইতে হইবে। শোকে-মোহে অভিভূত হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে, এখনো তোমার ভিতর সাত্ত্বিক উদ্দীপনার সঞ্চার হয় নাই। তুমি এখনও তামসিকতার রাজ্যের অধিবাসী। তামসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে পারিলে তবেই ভগবৎকৃপা উপলব্ধির অধিকারী হইতে পারিবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, নিজের চেষ্টার কতখানি প্রয়োজন। তোমার নিজের চেষ্টাতেই তোমাকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে, সেইখান হইতেই ভগবান হাত বাড়াইয়া তোমাকে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইবেন। প্রাথমিক চেষ্টা যদি তুমি নিজে না কর, তাহা হইলে উন্নতির কোন আশা নাই।

শোকে-মোহে মানুষের জ্ঞান থাকে না, আর অজ্ঞানী কোন দিন ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করিতে পারে না। কাজেই সাধনার প্রথমাবস্থাতেই তোমাকে বিগতশোক হইয়া যাইতে হইবে।

নিজের চেষ্টায় বিগতশোক হওয়া চাই, ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা থাকা চাই, তবেই তোমার জীবন সার্থক জীবনে পরিণত হইবে। তাঁহার কৃপা উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, মানুষের অভিমান, গর্ব্ব কিছুতেই বিদূরিত হয় না। এত কিছু জানিয়াও যে জ্ঞানীর বিন্দুমাত্র গর্ব্ব বা অভিমান আসে না—তাহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা ভগবৎ কৃপা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শুধু নিয়ম প্রতিপালন বা বিরাগী হইলেই জীবন সার্থক হইল না, যদি না ভগবানের কৃপায় তোমার হৃদয় সকল দিক্ হইতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ভগবদ্দর্শন বা কৃপা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহারা যেন মর্ত্ত্য-জগতের মানুষ থাকেন না, দিব্যধামের জ্যোতির্ম্ময় প্রেরণায় সর্ব্বদার দরুণ সমুজ্জ্বল থাকেন তাঁহারা। তাঁহাদের উদ্দীপ্ত জীবনের মহিমাতেই আবার শত শত জীবনও ধন্য হইয়া যায়।

অলক্ষ্যে থাকিয়া ভগবান জীবকে কত ভাবে কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু জীবের তো তাহা উপলব্ধি করার ক্ষমতা নাই। কৃপা লাভ করিয়াও অনেকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার কারণ নিজেরই আধারের মালিন্য। অটুট ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরভিমানীর ভাব লইয়া ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই নিজের চেষ্টারও সাফল্য হইল বলিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, আবার কৃপাময় পরমেশ্বরের কৃপা লাভে তোমার এই জীবনই দিব্য-জীবনে পরিণত হইবে।

গীতার যোগ

গীতা কখনো কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা করেন নাই, কেন না গীতার আদর্শ অনেকটা বৈদান্তিকের জীবনের আদর্শের মত। বৈদান্তিক যেমন আনন্দের দরুণ কর্ম্মকে ভয় করেন নাই, গীতাকারও তেমনি বলিয়াছেন যে কৌশল পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম করিয়াও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। সুতরাং 'কর্ম্ম বন্ধনের কারণ' গীতাকার এমন কথা বলেন নাই। গীতার যোগ কথাটীর আসল তাৎপর্য্যই হইল **"কৌশল"**। অর্থাৎ কর্ম্মের কৌশল জানিয়া যদি কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে এমনি মজা যে, কর্ম্মও করিতেছি সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আস্বাদনও পাইতেছি। কৌশল বা সঙ্কেত না জানিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই, মানুষকে বন্ধন দশায় জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। গীতাকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই **যোগ** কথাটীর উপর খুব জোর দিয়াছেন। বৈদান্তিকের মত গীতাকারও কর্ম্মকে ভয়ের চক্ষে দেখেন নাই, বরঞ্চ কর্ম্মের কৌশল জানা আছে বলিয়া কর্ম্ম করিয়াও তিনি নির্ভীকভাবেই অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবনেও কর্ম্মের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদিও আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করি।" স্বেচ্ছায় এইরূপভাবে কর্ম্মকে বরণ করিয়া লইতে পারে কাহারা? যাহারা জানে, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের অতীত ভূমিতেই বিচরণ করা সম্ভবপর। আর কিছু না, কর্ম্মের **কৌশলটী** জানা থাকা চাই। ব্যূহে প্রবেশ করিয়া আবার ব্যূহ হইতে বহির্গত হইবার পন্থাও জানা থাকা চাই। এই কৌশলটী জানা ছিল না বলিয়াই অভিমন্যুর জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইল। আমরাও নানা কর্ম্ম করি, কিন্তু কর্ম্মের ভিতরে থাকিয়াও কোন্ কৌশলে কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত থাকা যায় তাহা জানি না। এইজন্যই কর্ম্ম করিয়া কেবল আমাদের জীবন অধঃপতনের দিকেই প্রধাবিত হয়। আর

কৌশল জানি না বলিয়াই আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, কর্ম্ম মানুষের পক্ষে বন্ধনের কারণ। সুতরাং কর্ম্মত্যাগেই মানুষের মুক্তি! এই দুর্ব্বল ভাবে যখন দেশটাকে পাইয়া বসিল, তখনই দেশের দুর্গতি। তখন প্রকৃত যোগী দেশে ছিলেন না, যিনি নির্ভীক ভাবে বলিতে পারেন—আশ্বাস প্রদান করিতে পারেন যে, "কর্ম্ম কখনো মানুষকে বন্ধনদশায় ফেলাইতে পারে না, কর্ম্ম করিয়াও মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। তোমরা নিশ্চিন্তে কর্ম্ম করিয়া যাও।" যোগকে তখনকার মানুষ অন্য অর্থে বুঝিয়াছিলেন। অথচ যোগের সহজ সরল অর্থটা যে **'কৌশল'** এই কথাটা তখন কেহ বুঝে নাই। তখন প্রকৃত যোগীর সংখ্যা খুবই বিরল ছিল। সুতরাং সর্ব্বত্রই ভয়ের প্রাবল্যই বেশী ছিল। সাপের মন্ত্র যাহাদের জানা আছে, তাহারা যেমন সাপকে ভয় করে না, তেমনি কর্ম্মের কৌশল যাহাদের জানা আছে তাহারাও কর্ম্মকে ভয় করে না। যোগের আসল তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারাতেই মানুষের ভিতর ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা ঢুকিল। তখন কেবল সর্ব্ববিষয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই গৌরবের বিষয় রূপে পরিণত হইল। দুর্ব্বলতার দরুণ ধর্ম্মের মাঝেও গলদ প্রবেশ করিল। সবাই নামে কর্ম্মত্যাগী হইলেন বটে কিন্তু কর্ম্মের সংস্কারের তাড়নায় কর্ম্ম না করুন অপকর্ম্ম করিয়া সময় নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দেশের এই দুর্দ্দশাই দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি বজ্রনির্ঘোষে কর্ম্মের সুখ্যাতিই করিতে লাগিলেন। তিনি বাস্তবিকই যোগী ছিলেন, নিজের জীবন দিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যোগের আসল অর্থ কি? নিজের জীবনটা কর্ম্মময়। কিন্তু কর্ম্ম কখনো তাঁহার জীবনের আনন্দ কিম্বা জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে নাই। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকেই প্রকৃত কর্ম্মযোগী বলা যায়। তিনি নিজের জীবন দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে **কর্ম্মযোগ অর্থে কর্ম্মত্যাগ নয়, কৌশল পূর্ব্বক কর্ম্ম করা।**

দেশ হইতে এই দুর্ব্বল ভাবকে বিদূরিত করিবার দরুণ শ্রীকৃষ্ণকে কম লড়াই করিতে হয় নাই। তিনি দেখিলেন শুধু কথায় মানুষের মন হইতে এই দুর্ব্বল ধারণাকে কখনো বিতাড়িত করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং তিনি প্রথমে নিজে যোগপথ অবলম্বন করিলেন, যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মের কৌশল বা সঙ্কেত জানিয়া তখন তিনি নিজেই আসিয়া সংসাররূপ সংগ্রামের সারথী সাজিয়া বসিলেন। কর্ম্মকে ভয় করিলে কখনো তিনি কর্ম্মময় জীবনের সারথী বা দিশারী হইতে পারিতেন না। যোগের এই নিগূঢ় তাৎপর্য্যটা অর্থাৎ কৌশলটা জানা থাকিলেই কর্ম্ম বিভীষিকার বস্তু হইতে পারে না। বৈদিক যুগেও এই কর্ম্ম বিভীষিকার আভাস কোথায়ও দেখিতে পাই না। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্যই হইল এই—"মানুষ কর্ম্ম করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিবার বাসনা করিবে।" এই তো ঠিক খাঁটী কথা! মানুষকে কি কখনো কর্ম্মে বন্ধন করিতে পারে? মাঝে কোথা হইতে জানি না মানুষের ভিতর এই দুর্ব্বল কুসংস্কার প্রবেশ করিল, তাই যেটা গৌরবের বিষয় ছিল অর্থাৎ কর্ম্মময় জীবন, সেটাকেই মানুষ বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উদ্দেশ্য লইয়াই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই জ্ঞানোৎপত্তির হেতু বটে, তথাপি কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। উভয়ই অবস্থাভেদে মুক্তি-সাধক। আদর্শ ধরিতে গেলে, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। আর শ্রীকৃষ্ণতো অর্জ্জুনকে আদর্শের কথাই বলিতেছেন কিনা! সুতরাং কর্ম্ম-ত্যাগ হইতে কর্ম্মযোগের যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহাই বলিলেন। জ্ঞানী-অজ্ঞানী উভয়েরই কর্ম্ম আছে। অজ্ঞানীর কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, আর জ্ঞানীর কর্ম্ম জগৎহিতের দরুণ। আর জ্ঞানী কর্ম্মের কৌশল জানিয়া ফেলিয়াছেন কি না, তাই জ্ঞানীর কাছে কর্ম্ম বিভীষিকার বস্তু নয়, বরঞ্চ জ্ঞানী কর্ম্ম করিয়া সুখ পান, আনন্দ পান, কেন না তাহাতে যে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই, নিছক পরোপকারই সাধিত হয় তাঁহা দ্বারা।

সর্ব্বত্রই যখন অধিকারীভেদ রহিয়াছে, তখন আদর্শ নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও খুব চিন্তা করিয়া করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ তো সহজ মানুষ ছিলেন না, কিসে জগতের প্রকৃত হিত হইবে, বিশেষতঃ সেই যুগে সে সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি দেখিলেন দুর্ব্বলতায়, জুজুর ভয়ে মানুষ জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে, সে অবস্থায় মানুষকে কর্ম্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা ছাড়া কল্যাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই তিনি কর্ম্মযোগকেই আদর্শরূপে প্রচার করিলেন। চিত্তে কুসংস্কার এবং মালিন্য লইয়াই জ্ঞানীর ভাণ করার চেয়ে, কর্ম্মী হইয়া আস্তে আস্তে চিত্ত শুদ্ধি করিয়া প্রকৃত জ্ঞানীর আসন অধিকার করাই শ্রেয়ঃ। তাহাতে নিজের কল্যাণ, জগতেরও কল্যাণ হয়।

তাহার পর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুর্ব্বলতা কোন দিন ধর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম-ত্যাগ অনায়াসে হওয়াই এক কথা, আর মনে মনে কর্ম্মের ভয় পোষণ করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করাই অন্য কথা। শ্রীকৃষ্ণ এই দুর্ব্বলতাকেই তাড়াইতে চাহিলেন, দুর্ব্বলতায় মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে, জ্ঞানহীন করিয়া দেয়। মানুষ যদি শক্তিশালী হয়, সর্ব্ব কুসংস্কার হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ভিতর ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ভাবের স্বতঃ স্ফুরণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বুঝিলেন মানুষের প্রাণটাই মরিয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র কেবল ভয় আর দুর্ব্বলতা। সুতরাং সংস্কার করিতে হইলে প্রথমেই মানুষের প্রাণে বলিষ্ঠ চিন্তা, বলিষ্ঠ ভাব বা বলিষ্ঠ আদর্শই সংক্রমণ করিতে হইবে। শক্তিশালী জাতির ধর্ম্মও শক্তিসম্পন্ন। বৈদিক যুগের ঋষিদের অনুভূতির বাণী পাই উপনিষদে; উপনিষদ পড়িলে প্রাণটা যেন আনন্দে, উদ্দীপনায় নাচিতে থাকে, উপনিষদে কোথায়ও তো কর্ম্মত্যাগের কথা খুঁজিয়া পাই না। উপনিষদের যুগের সেই সরল-সহজ ভাবটাই আনিবার দরুণ শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া-ছিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্মকে লাভ করিবার একমাত্র অধিকারীই হইল শক্তি-সম্পন্ন মানব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" —এই কথাটী প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াই সেই আদর্শে তিনি বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বলতাকে কখনো তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। দুর্ব্বলতায় মানুষকে যত দূর নীচে নামাইয়া আনিবার আনিতে পারে। এইজন্যই প্রথমেই যখন অর্জ্জুনের হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন-কে দুর্ব্বলতার দরুণ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন মনে করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কাছ হইতে সহানুভূতি পাইবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আদর্শ পুরুষ কিনা, তাই কোনরূপ দুর্ব্বলতাকেই তো তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। হোক্ না অতীব প্রিয় সে, কিন্তু প্রিয় জনের দুর্ব্বলতা কি আর দুর্ব্বলতা

নয়? দুর্ব্বলতায় মানুষকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। শক্তিশালী অর্থাৎ যাঁহা'র প্রাণে কোনরূপ দুর্ব্বলতা নাই, কুসংস্কার নাই, সে যদি একটা ভুলও করে, তাহা হইলে আবার সেই ভুল সংশোধন করিবার ক্ষমতা বা শক্তিও সে নিজের ভিতর হইতেই খুঁজিয়া পায়। কিন্তু দুর্ব্বলের তো কোন শক্তি নাই। সুতরাং নিজের জীবন দিয়ে, বাণী দিয়ে সকল সময় মানুষকে উদ্বুদ্ধ-চেতন-সচেষ্ট রাখিবার দরুণই যত্নপর হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতা খানা পড়িতে বসিলে দেখা যায়, ভিতরটা কতখানি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে গীতার বাণীতে।

কৌশল অর্থটিই হইল যোগের সার্ব্বভৌম অর্থ। কিন্তু যোগ বলিতে আজ কাল লোকের মনে অন্য-রূপ ধারণা। গীতার এক একটী অধ্যায়কে এক এক যোগ (কৌশল) বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। ইহারও বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সঙ্কেত বা কৌশল জানা না থাকিলেই মানুষ সহজ একটা পথকেও উৎকট বলিয়া ধারণা করিয়া বসে। যোগ বলিতে আজ কাল মানুষের মনে প্রথমেই একটা আজগুবি ধারণা আসিয়া পড়ে। অথচ কৌশল জানিলে যে যোগের মাঝে কোন উৎকট-রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা মানুষ কিছুতেই বুঝিতে চায় না। প্রত্যেক কাজেরই কৌশল জানা না থাকিলে সবই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই যে যোগ বা কৌশল ইহা খুব অল্প লোকেই জানিতে পারে, এইজন্যই সবাই গুরু সাজিতে পারে না। কৌশল বা সঙ্কেত জিনিষটাই গুপ্ত—গুরুর কাছ হইতে সাক্ষাৎ শিক্ষা লাভ না করিলে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। কালের বশে যে যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একটী শ্লোকেই তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

—এইরূপে ক্ষত্রিয় পরম্পরা প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ! ইদানীং কাল বশে সেই যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে যোগের সঙ্কেত জানিতে পারিয়াছিলেন, তাই আবার পরের শ্লোকেই বলিতেছেন।—

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥

—তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই জন্যই আজ আবার সেই পুরাতন যোগের গুপ্ত-রহস্য তোমার কাছে ব্যক্ত করিতেছি। এই শ্লোকটী দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়—যোগের আসল অর্থ কি? কাল-বশে মানুষ যোগের অর্থাৎ যোগপথের কৌশলটী ভুলিয়া গিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বহু কষ্টে যোগের সেই গুপ্ত-রহস্য বা কৌশলটী আবিষ্কার করেন। শ্রীকৃষ্ণ নূতন করিয়া যোগপথ আবিষ্কার করেন নাই, সেই পুরাতন যোগেরই কৌশলটী মাত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন। যোগ জিনিষটী বহু পুরাতন, হিরণ্যগর্ভ ছিলেন তাহার আদি প্রবক্তা, কিন্তু অধিকারীর অভাবে বা চর্চ্চার অভাবে ভারত হইতে এমন অনেক বিদ্যাই লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বিদ্যা যে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে তাহা নয়, প্রত্যেক পথেরই রক্ষক স্বরূপ ২।১ জন মহাত্মা আছেন, খুঁজিলেই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। আর সংস্কার জিনিষটা তো কিছুতেই লোপ পাওয়ার জিনিষ নয়। সুতরাং লুপ্ত বিদ্যাও কালে আবার প্রকট হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরাতন যোগপথেরই কৌশল জানিতে পারিয়াছিলেন। আর কৌশল জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াও কর্ম্মের গ্লানিতে অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া

অর্জ্জুনকে কর্ম্মের মন্ত্রে অমন আত্মহারা ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

যোগ কথাটীর আর একটী অর্থ হচ্ছে বল! এই জন্যই যোগের পথ ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া। তবে কিনা বলের সঙ্গে সঙ্গে কৌশলটী জানা না থাকিলে শুধু বল দিয়াও কোন কাজ হয় না। যোগের কৌশল এবং বল—এই দুইটী জিনিষ থাকিলেই প্রকৃত যোগী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের মাঝে আমরা এই দুইটী জিনিষই দেখিতে পাই। শুধু কৌশল জানা থাকিলেই বা কি হইবে, যদি ভিতরে বল না থাকে?

গীতার যোগের অর্থ খুবই ব্যাপক—কিন্তু যোগ কথাটী আসিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থেই দাঁড়াইয়াছে। যোগ বলিতেই মানুষ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, ভাবে যোগের অধিকারী হওয়া সাধারণ মানুষের কাজ নয় —সুতরাং ওই পথকে নমস্কার। অথচ যোগ কথাটার মাঝেই যে কত বড় একটা ফাঁকি রহিয়াছে তাহা কেহই ধরিতে পারে না। যোগ না বলিয়া যদি যোগকে কর্ম্মের কৌশল বলা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় যোগকে মানুষ এত ভয় করিত না আসলে যোগ কথাটার একমাত্র অর্থই যে ওই।

কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারিলেই যোগী হওয়া গেল। তাহা না হইলে কর্ম্মকে ভয় করিয়া যাঁহারা নির্জ্জনবাসী, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যোগীপদবাচ্য হইতে পারেন না। এক সময়ে আসল যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, অর্থাৎ যোগের প্রত্যক্ষ উপদেষ্টার অভাব হইয়াছিল, সেই জন্যই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, দুঃখের কারণ এই এক রব উঠিল। এই ভাবই যখন মানুষের মনে প্রবল হইয়া উঠিল, তখন মানুষ সংসার ত্যাগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিল। ক্রমশঃ এই দুর্ব্বলতার দরুণই সমাজকে ভাঙ্গিয়া মানুষ গিরি-গুহাবাসী হইতে লাগিল। দু'চার জন যে এই পথে সত্যের আলোক পায় নাই, তাহা বলিতেছিনা কিন্তু এই দুর্ব্বল মনোভাবের দরুণ অনেকেরই গতি হইল অন্ধতম রাজ্যে। সত্যের সন্ধান পাইলে মানুষের বাহিরে ভিতরে যে সব লক্ষণ বা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মুখ চোখ দেখিয়া সেইরূপ কিছু আশার সঞ্চার হয় নাই। অন্ধকারে তলাইয়া যাওয়া—এই যেন এক বাতিকে পাইয়া বসিল মানুষকে। সাময়িক কর্ম্মত্যাগ করাটা দোষের কিছু নয়—inaction is the basis of actin, এ কথাটা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিকই খাঁটী। ইহার মূলে কর্ম্মত্যাগের ভাব যদিও থাকে, তাহা হইলেও ভীতু কর্ম্মত্যাগীর ভাবের সঙ্গে ইহার রাত্র দিন পার্থক্য। সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে, দলকে দলই যদি গৃহত্যাগী হয়, তাহা হইলে একটা আশ্রমই যে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম যখন দেশে সজীব ছিল—তখন এই সামঞ্জস্য জিনিষটীর অভাব হয় নাই কখনো। সাধু হওয়াটা তখন একটা বাতিক ছিল না, বাস্তবিকই যাহাদের প্রাণে মোক্ষলাভের বাসনা প্রবল হইত, অথচ কোন দিকে অর্থাৎ শক্তিতে, সামর্থ্যে, বলে, বীর্য্যে যাঁহাদের ন্যূনতা ছিল না, তাঁহারাই সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বন করিতেন। এই জন্যই সন্ন্যাসাশ্রমেও তখন এত গলদ প্রবেশ করে নাই। এখন তো উপায় না থাকিলেই সাধুর ভেক ধরা এক সহজ কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এমন এক সময় ছিল, যখন বাস্তবিকই প্রকৃত উপদেষ্টার অভাব ছিল না, তাঁহারাই সকল মানবের জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। সাধন-প্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের বাণী কখনো ব্যর্থ হইত না। কিন্তু এখন আসল জিনিষেরই অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে

কাহাকে প্রকৃত পথের বার্ত্তা বলিয়া দিবে ? চর্চ্চা জিনিষটার তো খুবই অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জানা না থাকিলেও, ভণ্ডামী করিবার লোকের অভাব নাই।

গীতার মাঝে সব রকম উপদেশই আছে বটে ; কিন্তু ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কোনরূপ দুর্ব্বলতাকেই গীতা প্রশ্রয় দেয় নাই। এইজন্যই গীতার প্রথমেই অর্জ্জুনের দুর্ব্বলতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মম অথচ নির্ভীক ভাবে তাহাকে তিরস্কার করেন। Weakness is sin—এই কথাটী কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। গীতাশাস্ত্র দুর্ব্বলতার উপর মুদ্গর বিশেষ। গীতাকারের জীবনের স্বতঃস্ফুর্ত্ত—উচ্ছসিত বাণীতে প্রত্যেককেই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, জীবনে কোনরূপ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। জীবনের উন্নতির পথে ইহা এক মহা বিঘ্ন। মানুষকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচ্যুত করে দুর্ব্বলতা, আর কিছুই নয়। জীবনকে অবসন্ন করিয়া দেয় যাহা, তাহাকে নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গীতার যোগ মানুষকে সকল দিক দিয়া পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিবারই প্রয়াসী। সুতরাং যোগ কথাটীর ব্যাপক অর্থাৎ নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিলে—একদেশদর্শিতা সহজেই অসিয়া পড়ে। এক কথায় বলিতে গেলে গীতার যোগ আর কিছুই নয়—**"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"**

সংশয়-ভঞ্জন

দেহ-মন-বুদ্ধির সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি দ্বারা সত্যলাভ সম্ভবপর কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমাদের সহজ বুদ্ধিই বলিয়া দেয়, এই প্রশ্নের উত্তর positive হওয়াই উচিৎ। কিন্তু এর মাঝেও একটা কথা আছে। দেহ-মন-বুদ্ধির স্বভাব কি, তাহা আমাদের জানা আছে কি ? আমাদের 'প্রকৃতি' কি ? প্রকৃতির সমস্ত রহস্যই আমরা বুঝি না, তাই তাহাকেও জড়া-প্রকৃতি, চিন্ময়ী-প্রকৃতি ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত করি। গীতাতেও পাইয়াছ, ভগবানের দুইটী প্রকৃতি—পরা আর অপরা। অপরা প্রকৃতিই সাংখ্যের জড়া-প্রকৃতি। দেহ-মন-বুদ্ধির পরিণতি এই অপরা প্রকৃতির অনুবর্ত্তনেও হইতে পারে। সে পথ অসঙ্গতও নয়, অবৈজ্ঞানিকও নয়। কিন্তু মানুষের মাঝে পরা প্রকৃতির একটা demand আছে। এই পরা প্রকৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"জীবভূতা"। অর্থাৎ এই খানেই মানুষের মনুষ্যত্ব—জগতের ধৃতিশক্তি এই পরা প্রকৃতির মাঝেই। পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির মাঝে একটা আপাতবিরোধ দেখা যায়, দুইয়ের মাঝে সামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারিলে জীবন সহজ হইবে না। অপরা প্রকৃতির পথ বহুযুগ বিস্তৃত। লক্ষ বৎসরের evolutionএ তুমি তথা কথিত 'সহজ' ভাবে চরম সত্যে পৌছিতে পার, একথা যুক্তিযুক্তও বটে। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে নিহিত প্রাণশক্তি তোমাকে এতদিন wait করিতে দিবে না। তুমি চাহিবে এই লক্ষ বৎসরের মেয়াদকে যত পার কমাইয়া আনিতে। তখনই সাধনবাদ বা নিরোধবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই

হয়। অপরা প্রকৃতির ইঙ্গিতে পরিচালিত মন-বুদ্ধি অশুদ্ধ, আর পরা প্রকৃতির সহায়ে তাহার বিশুদ্ধি—এই কথাগুলি তখনই আসিয়া পড়ে। কথাগুলি সত্য। জীবনে নিরোধ প্রয়োজন। কিন্তু অপরা প্রকৃতির নিরোধ করিতে গিয়া আমরা প্রাণেরই নিরোধ করিয়া বসি—এই বাড়াবাড়িটা নিষ্প্রয়োজন এবং অনিষ্টকর।

সাধনা দুই তরফ হইতে হইতে পারে। তুমি সারাজীবন ধরিয়া কেবল অপরা প্রকৃতিকে deny করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে পার—এটা negative, আবার এমন হইতে পারে যে, তুমি পরা প্রকৃতির অনুশীলন দ্বারা, অর্থাৎ শুদ্ধ সত্য সুন্দরের ধ্যান দ্বারা অসত্য ও অসুন্দরকে পরাভূত করিতে পার, এটা positive সাধনা। এতে কোন জোরাজুরি নাই—ইহাই হইল সহজ সরল পন্থা। উপনিষদ্ এই positive সাধনার বাণীই প্রচার করিতেছেন। এ বাণী original sinকে স্বীকার করে না। সয়তান তাড়ানের বাতিক নাই, কিন্তু ভগবানের উপাসনার আকুলতা তাহার আছে। আলো জ্বালিলে অন্ধকার আপনা হইতে চলিয়া যাইবে, অতএব অন্ধকারকে লাঠি না মারিয়া আলো জ্বালাও। সহজ জীবন বলিতে আমি এই ভাবে পরা প্রকৃতির আরাধনাকেই বুঝি। দেহ মিথ্যা, মন মিথ্যা, বুদ্ধি মিথ্যা—এ কথা বলি না, বলি, তাঁহার আলোতে সবই সুন্দর। ভাগবত দেহ আছে, ভাগবত মন আছে, ভাগবত বুদ্ধিও আছে। সর্ব্বদা অস্তিমন্ত্রের উপাসক হও—বল "ওম্"। ব্রহ্ম বা বৃহতের উপাসনা কর। ক্ষুদ্রতা আপনা হইতে চলিয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির সকল রহস্য মানুষ জানিতে বা বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার সঙ্গে জোরাজুরি করিয়া কোন লাভ নাই। আর মানুষ তাহাতে অনর্থক হয়রান্ হয় শুধু। এর চেয়ে সহজ সরল পন্থাও আছে। উপনিষদের প্রত্যেক বাণীতেই দেখিবে, দিব্য জ্যোতির কথা, দিব্য আলোর কথাই রহিয়াছে। উপনিষদের মাঝে কোথায়ও অন্ধকারের কথা নাই। এইজন্য কি জগতে অন্ধকার নাই, তমঃ নাই? থাকিলেও উপনিষদ সেই দিকে বড় নজরই দেয় নাই। উপনিষদ দেখেছে, মানুষ যদি সত্যের সন্ধান পায়, তাহা হইলে অসত্যের প্রভাব হইতে আপনি নিস্তার পাইবে। সুতরাং মানুষকে আনন্দের বাণীতে, সত্যের জগন্ময় দীপ্তিতে উদ্বুদ্ধ-প্রদীপ্ত করিয়া তুলাই হইল আসল কাজ। উপনিষদের মাঝে কোথায়ও কৃচ্ছ্র-সাধনের কথা নাই। সর্ব্বত্রই সহজ সরল পন্থার কথাই উল্লিখিত রহিয়াছে।

নিরোধ প্রয়োজন এ কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু প্রাণকে নিস্তেজ করিয়া নয়। প্রাণ মরিয়া গেলে সবই পণ্ড হইয়া যাইবে। সুতরাং সহজ পন্থা থাকিতে কেন অনর্থক জটিল পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সময় নষ্ট করা শুধু! প্রাণের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মুখ্য প্রাণের শক্তিই যদি স্তিমিত হইয়া আসে, তাহা হইলে জীবনে কোন দিন উন্নতির আশা নাই। সকলের ধাত সমান নয়। অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কৃচ্ছ্র তায় সকলের মন বসিতে চায় না, সেই জন্যই কি বলিতে হইবে তাহাদের জীবন ব্যর্থ? এ সব নেহাৎ অকেজো কথা। অন্ততঃ আমি এই সব কথার তাৎপর্য্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

অনেক সময় মানুষ আসল লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহিরের কতকগুলি নিয়ম কানুনের উপরই ঝোঁক দিয়া বসে বেশী। তাহাতে যে চিত্তের উৎকর্ষ হয় তাহা নহে। চিত্তেরই যদি উৎকর্ষ না হইল, তাহা হইলে জীবনের উন্নতি হইল বলি

কেমন করিয়া? নিরোধ প্রয়োজন, কিন্তু কেবল নিরোধ করিয়াই যে আমরা সকল শত্রুর হাত হইতে রেহাই পাইব এমন আশা করাও বৃথা। বরঞ্চ সে স্থলে প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা কাজ হয় বেশী। কেবল সংগ্রাম করিয়াও জয় লাভ করা যায় না, অনেক সময় মিতালীরও প্রয়োজন হয়। বরঞ্চ মৈত্রীভাবে অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয় বেশী।

অনেক কথাই তোমাকে বলিবার ছিল, আজ এই পর্য্যন্তই। মোট কথা এই কথাটী স্মরণ রাখিও যে, ভণ্ডামী না করিয়া নিজের ধাত এবং রুচি বুঝিয়া যে কোন সাধনাই কর না কেন, তাহাতেই জীবন ক্রমশঃ উন্নত হইবে। প্রাণটাকে সর্ব্বদাই উৎফুল্ল রাখিতে হইবে। প্রাণ মরিয়া গেলে, জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। প্রাণহীন জীবনে মৌলিক আবিষ্কার অসম্ভব। বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিও। সকলের এক পথ নয়। দল বাঁধিলেই ধর্ম্ম হয় না—প্রত্যেকের নিজের উপরই প্রত্যেকের নিজের জীবনের উন্নতি নির্ভর করে। দেখাদেখি ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ—ইহা অপরের অনুকরণে হয় না। কৃচ্ছ্রতা না করিলেই যে ধর্ম্ম হইবে না, তাহার কোন মানে নাই, আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিলেই যে ধর্ম্ম হইবে, সে আশা করাও বৃথা। সুতরাং মধ্য পন্থা অবলম্বনই সব চেয়ে শ্রেয়ঃ।

অপরা প্রকৃতি মানুষের আছে, থাকিবেও; কিন্তু তাহার কবল হইতে নিস্তার পাইতে হইলে কেবল তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও চলিবে না। 'প্রভাব' কথাটা আমি খুব স্বীকার করি। পরা প্রকৃতিরও একটা প্রভাব রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইলে, তাহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, অপরা প্রকৃতি আপনিই মাথা হেঁট করিবে। বল সর্ব্বত্র প্রযুজ্য নয়—কৌশল সব চেয়ে বড় জিনিষ। কৌশল না জানিয়া গাধার মত খাটিলেই যে ফল পাওয়া যাইবে, তাহার কোন মানে নাই। অনেক সময় কৌশল না জানা থাকার দরুণ শ্রম অনর্থক পণ্ড হয়।

বুদ্ধদেব শত্রুকে পরাজয় করিবার খুব সহজ উপায় বলিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহার নাম "প্রতিপক্ষভাবনা"। অপরা প্রকৃতির তাড়না তোমার মাঝে খুব বেশী। আচ্ছা, হইতে থাকুক, তুমি তাহার সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া পরা প্রকৃতির ধ্যান কর। সময়ে দেখিবে, বিনা বিবাদে তোমার কার্য্যোদ্ধার হইয়া গিয়াছে।

যাহা বলিলাম, আশা করি, ইহাতেই তোমার মনের সংশয়-ভঞ্জন হইবে। অন্যবারে এ সম্বন্ধে আরো কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

রাজযোগ*

১ অবতরণিকা

রাজযোগ বিজ্ঞান সমূহের অন্যতম। এই বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দর্শন সম্বন্ধীয় মনের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যও গড়ে ওঠে। সকল দেশের আচার্য্যেরাই এক বাক্যে বলে গেছেন, "সত্য আমরা দেখেছি ও জানি।" যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, "আমাদের প্রচারিত সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।" এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগলব্ধ।

সংজ্ঞা (অর্থাৎ সাধারণ চেতনা) বা স্মৃতি জীবনের সীমারেখা হতে পারে না, যদিও বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান তাই বলে থাকে। এ ছাড়াও একটা অতীন্দ্রিয় ভূমি আছে। সেখানে আর সুষুপ্তিতে কোনো ইন্দ্রিয়ের কাজ হয় না, কিন্তু এই দুটোর মাঝে আবার আকাশ পাতাল তফাৎ—যেমন জানা আর না জানা। **যোগ পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা, আর সুষুপ্তি অজ্ঞানের অবস্থা।**

মন জ্ঞানভূমি আর তার নিম্নস্তরে কাজ করে। আমরা যাকে 'জানা' বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা অংশ মাত্র। একটুখানি জ্ঞান নিয়ে আমাদের এই 'আমি', আর তার চারিদিকে বিরাট অজ্ঞান। এই 'আমির' ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি।

কার্য্য সাধারণতঃ জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই ভূমি থেকেই হয়। যোগীদের আর একটা ভূমি আছে, সেটা হল জ্ঞানাতীত। এই জ্ঞানাতীত ভূমি হচ্ছে সর্ব্বকালে, সর্ব্ব দেশে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস। সহজাত জ্ঞানের (Instinct) যত বিকাশ হবে, (অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি যত কম খাটাতে হবে) তত আমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব। **জ্ঞানাতীত অবস্থায় কোনও ভুল হয় না।** কিন্তু সহজাত জ্ঞানের পূর্ণতা হলেও সেটা যেন যন্ত্রবৎ হয়ে যায়, কেন না তাতে জ্ঞানের ক্রিয়া থাকে না। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থানকেই "ভাবমুখে থাকা" বলে। যোগীরা বলেন, এই ভূমিতে যাবার শক্তি সব মানুষেরই আছে। আর কালে সকলেই এই ভূমিতে পৌছায়।

২ যোগের উদ্দেশ্য

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস। অন্তর্নিহিত সত্তাকে সকলেই জান্‌তে পারে। যদি ভগবান্ থাকেন, তবে তাঁকে উপলব্ধি কর্‌তে হবে। যদি আত্মা থাকেন, তাঁকে দর্শন ও অনুভব কর্‌তে হবে। **আত্মবস্তুকে জান্‌বার একমাত্র উপায় দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করা।** চিত্তের চঞ্চলতা সম্পূর্ণরূপে নিরোধ কর্‌তে পার্‌লেই আমাদের দেহের নাশ হয়। এই দেহটাকে তৈরী কর্‌তে কোটী কোটী বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে যে, সেই প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা এই দেহ প্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্য যে জীবনের পূর্ণতা লাভ করা, তা ভুলে গেছি। আমরা ভাবি, এই দেহটাকে তৈরী করাই বুঝি

*স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় class-notes হইতে সঙ্কলিত। পাঠকদিগের সুবিধার জন্ত আলোচনাটী ধারাবাহিক রূপে সাজাইয়া কোথায়ও কোথায়ও কিছু যোজনাও করা হইয়াছে। আঃ দঃ সঃ।

আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।—এরই নাম মায়া। এই মায়া আমাদের ভাঙ্‌তে হবে, মনকে মূল লক্ষ্যের দিকে ফেরাতে হবে। **আর উপলব্ধি করতে হবে, আমরা দেহ নই—দেহই আমাদের ভৃত্য।** মনকে দেহ হতে আলাদা করে দেখতে শেখ—ভাব এটা দেহ নয়। এই জড় দেহটাতে আমরা চৈতন্য ও প্রাণ প্রতিবিম্বিত করে ভাবি, এ দেহটা বুঝি চেতন আর সত্য। আমরা এতকাল ধরে এই খোলসটা পরে এসেছি যে, আমরা ভুলে গেছি যে আমরা এই খোলস নই। **দেহ একটা যন্ত্র মাত্র; আমাদের দাস—প্রভু নয়, ইচ্ছামত এই দেহটাকে ফেলে দিতে পারা যায়।** যোগ এরই উপায় শিক্ষা দেয়। মনঃশক্তিকে আয়ত্ত করে যে কোনও বিষয়ে সমগ্রভাবে তাদের নিয়োগ করাই যোগের উদ্দেশ্য। **যোগের শিক্ষা, জড়কে কি করে দাস করে রাখা যায়, কারণ তার তাই থাকা উচিত। যে ইন্দ্রিয়ের অধীন, সেই সংসারী—সেই দাস।** যোগী ছাড়া আর সকলেই দাসবিশেষ। মুক্তি লাভের জন্য বন্ধনের পর বন্ধন কেটে ফেল্‌তে হবে।

নীতিপরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ কর্‌তে হবে, তা না হলে আমাদের কর্ম্ম-সমূহকে আমরা কিছুতেই অধীনে আন্‌তে পার্‌ব না। নীতির শিক্ষাসমূহকে কি করে কর্ম্মে পরিণত কর্‌তে পারা যায়, যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য।

আর যোগের উদ্দেশ্য জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করিয়ে দেওয়া। কেমন করে?—

—২০খ

আত্মাকে জড় বলে জান্‌লে চল্‌বে না, তার যথার্থ স্বরূপ জান্‌তে হবে। আমরা আত্মাকে দেহ বলে ভাব্‌ছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও চিন্তা থেকেও পৃথক্ করে ফেল্‌তে হবে, তবেই আমরা উপলব্ধি কর্‌ব যে আমরা অমৃতস্বরূপ। যা কিছু পরিবর্ত্তন, সব কার্য্য-কারণ নিয়ে; আর যা পরিবর্ত্তনশীল, তাই নশ্বর। সুতরাং দেহ বা মন অবিনাশী হতে পারে না, কেন না তারা চির পরিবর্ত্তনশীল। যা অপরিবর্ত্তনীয়, তাই অবিনাশী, কেন না তার ওপর কেউ ক্রিয়া কর্‌তে পারে না। পূর্ব্বে সত্যস্বরূপ ছিলাম না, এখন হলুম—এ নয়; **চিরকালই আমরা সত্যস্বরূপ।** আমাদের কাজ হচ্ছে, যে অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, তাকে কেবল সরিয়ে দেওয়া। যোগ তারই পথ।

৩ সাধকের লক্ষণ

যাঁরা সাধক—মুমুক্ষু, তাঁদের তিনটি জিনিষ দরকার।—

(১) **ইহলোকের ও পরলোকের ভোগবাসনা ছাড়তে হবে।** চাইতে হবে কেবল সত্য—কেবল সত্য। ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারাই আমাদের মৃত্যু। লক্ষের মধ্যে একজন বল্‌তে পারে, "এই সংসার পার হয়ে আমি ভগবানের কাছে যাব।" সত্যের সামনে দাঁড়াতে পারে, এমন লোক খুব কম। কিন্তু তবুও আমাদের কোন কিছু কর্‌তে হলে সত্যের জন্য মর্‌তেও প্রস্তুত থাক্‌তে হবে।

(২) সত্য আর ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার জন্য **তীব্র আকাঙ্ক্ষা** চাই। যে মানুষ জলে ডুবেছে সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি ব্যাকুল হও, তেমনি তীব্রভাবে তাঁকে চাও।

(৩) এই দুটী বিষয় সাধককে শিখতে হবে। —(ক) মনকে বহির্মুখী হতে না দেওয়া। (খ)—মনকে অন্তর্মুখী করে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা। (গ) প্রতিবাদ না করে সব জিনিষ সহ্য করা। (ঘ) তাঁকেই চাইতে হবে, আর কিছু নয়; আপাত-মনোরম বিষয় যেন তোমায় না ঠকাতে পারে। সব ত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই চাও। (ঙ) কোনো একটা জিনিষ নাও, নিয়ে সদসৎ বিচার কর, সমাধান না করে ছেড়ো না। আমরা সত্যকে জানতে চাই, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে নয়; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি পশুর ধর্ম্ম, মানুষ কখনও তাই নিয়ে থাকতে পারে না। মানুষ মননশীল; মৃত্যুকে সে যত দিন না জয় করে, যত দিন না আলোকের সন্ধান পায়, তত দিন সে যুদ্ধ করবেই। (চ) সর্ব্বদা নিজের স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল। ক্রমাগত 'আমি ছোট', 'আমি ছোট' এই ভেবে নিজকে ছোট করে ফেলো না। যত দিন না ভগবানের সঙ্গে অভেদজ্ঞান হচ্ছে, তত দিন তুমি আসলে যা, তাই ভাব।

এই সাধন-নিষ্ঠা ব্যতীত ফললাভ সুদূরপরাহত।

অত্যাহারী বা অনাহারী, নিদ্রালু বা নিদ্রাহীন যোগী হতে পারে না। অজ্ঞান, বিকল্প (চলচ্চিত্ততা), পরশ্রীকাতরতা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি—এই কয়টী যোগাভ্যাসের পরম অন্তরায়। বৃথা বাক্য একেবারে ত্যাগ কর, যদি বাজে বক, তাহলে যোগী হতে পারবে না। **সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও নির্ভীক থাকবে।**

যোগীর পক্ষে এই তিনটী বিশেষ প্রয়োজনীয়।—

(১) **দেহ ও মনের পবিত্রতা।** সব রকমের মলিনতা, যা মনকে নীচে নামিয়ে দেয়, যোগী তা পরিত্যাগ করবে।

(২) **ধৈর্য্য।** প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য্য দর্শনাদি হবে; তারপর সে সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে সব চাইতে বিপদের সময়; কিন্তু ধরে থাকা চাই। ধৈর্য্য থাকলে শেষ কালে সত্যলাভ হবেই।

(৩) **অধ্যবসায়।** বিপদ, আপদ, অসুখ-বিসুখ— সব সময় অধ্যবসায়শীল হও। একটী দিনও সাধন ভজন বাদ দিও না।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।—অকপট হৃদয়ে যোগাভ্যাস করলে মনের পর্দ্দা একটার পর একটা সরে যায়, আর নব নব সত্যের প্রকাশ হয়। ধীরে ধীরে আমরা যেন নূতন জগতের সন্ধান পাই, যেন আমাদের ভিতর নব নব শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার! মাঝ রাস্তায় যেন থেমে না যাই। হীরের খনি আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে, কাচের জলুষ যেন আমাদের চোখে ধাঁধাঁ না লাগিয়ে দেয়। বিপথে যেও না, **কোনো শক্তি বা সিদ্ধাই চেও না।** অলৌকিক শক্তি এলে তাদের মনে করবে বিপথ। তোমায় যেন তারা লুব্ধ করে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। তাদের দূর করে দিয়ে, তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য ভগবান, তাঁকেই ধরে থাকবে।

সৎচিন্তা করবে। আমরা যা চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎচিন্তা মনের সকল মলিনতাকে পুড়িয়ে ফেলে। **যে সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে, তা গুরু ছাড়া আর কাউকে বলবে না।**

৪ যোগের আটটি অঙ্গ

রাজযোগের নাম অষ্টাঙ্গযোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি।—

(১) **যম**।—যোগের এই অঙ্গটী সব চেয়ে দরকারী। সারাজীবনকে এ নিয়ন্ত্রিত করে। এ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত।— (ক) অহিংসা—কায়মনোবাক্যে হিংসা না করা ; (খ) অস্তেয়—কায়মনোবাক্য লোভ না করা ; (গ) ব্রহ্মচর্য্য—কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা ; (ঘ) সত্য—কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া; (ঙ) অপ্রতিগ্রহ—কায়মনোবাক্য মিতাচারী হওয়া।

(২) **নিয়ম**। এও পাঁচভাগে বিভক্ত।—(ক) শৌচ—দেহ ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা; (খ) সন্তোষ—নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া ও পারিপার্শ্বিকদ্বারা বিচলিত না হওয়া (গ) স্বাধ্যায়—জপকরা ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করা; (ঘ) তপস্যা—সহ্যমত শরীর ও মনকে পীড়া দেওয়া—ব্রত নিয়মাদি পালন করা; (ঙ) ঈশ্বর প্রণিধান—ভগবানে আত্ম সমর্পণ করা।

(৩) **আসন**। মেরুদণ্ডের উপর জোর না দিয়ে মাথা ঋজুভাবে রাখা।

(৪) **প্রাণায়াম**। প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযম।

(৫) **প্রত্যাহার**। মনকে বহির্ম্মুখী হতে না দিয়ে অন্তর্ম্মুখী করে কোন জিনিষ বুঝ্‌বার জন্য বারংবার বিচার।

(৬) **ধারণা**। কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

(৭) **ধ্যান**। কোনো এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

(৮) **সমাধি**। জ্ঞানালোকপ্রপ্তি—আমাদের সাধনার লক্ষ্য।

যম ও নিয়ম সারাজীবন ধরে আমাদের অভ্যাস কর্‌তে হবে। জোঁক যেমন একটা ঘাস দৃঢ়ভাবে ধরে তবে আর একটী ছেড়ে দেয়, তেমনি উপরের ধাপে উঠ্‌বার আগে নীচের ধাপটাকে আমাদের বেশ আয়ত্ত কর্‌তে হবে।

অন্যান্য অঙ্গগুলির আলোচনা কর্‌বার পূর্ব্বে দেহ, প্রাণ ও মনের তত্ত্ব আমাদের জানা দরকার। আগে দেহ ও প্রাণের তত্ত্ব আলোচনা করা যাক্।

৫ প্রাণতত্ত্ব

রাজযোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম। তার প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রাণের নিয়মন। প্রাণ কি করে চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়ে যায়, রাজযোগে তা বলা আছে। প্রাণ প্রথম ফুস্‌ফুসে বায়ুরূপে, তারপর ফুস্‌ফুস্ থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে রক্ত প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে এবং সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ করে। **মানুষের ইচ্ছাশক্তি দেহের ওপর যেমন ক্রিয়া কর্‌তে পারে, তেমনি দেহের ক্রিয়াও ইচ্ছা শক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে পারে।** আমাদের ইচ্ছাশক্তি বড়ই দুর্ব্বল, আমরা এতই বদ্ধ যে, সেই শক্তিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি কর্‌তে পারি না। অধিকাংশ কার্য্যের প্রেরণা আমাদের বাইর থেকে আসে, কহিঃপ্রকৃতি আমাদের অন্তরের সাম্যভাব নষ্ট করে, কিন্তু আমরা তার সাম্যভাব নষ্ট কর্‌তে পারি না (যা নাকি আমাদের পারা উচিত) কিন্তু এ সবই ভুল। **বহিঃপ্রকৃতির চাইতে বেশী শক্তি সত্য সত্যই আমাদের ভিতরে আছে।**

যাঁরা নিজেদের ভিতর চিন্তারাজ্যকে জয় করেছেন, তাঁরাই খুব বড় সাধু, তাঁরাই আচার্য্য। তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী। দুর্গের উচ্চ চূড়ায় আবদ্ধ কোনও মন্ত্রীকে তাঁর স্ত্রী গুবরে পোকা, মধু, রেশমের সূতা, দড়ি ও কাছি দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। এই রূপকে সুন্দর ভাবে

দেখানো হয়েছে প্রাণের নিয়মন থেকে কি করে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় করা যায়। এই প্রাণের সাহায্যেই একটার পর একটা শক্তি আয়ত্ত করে আমরা একাগ্রতারূপ রজ্জু ধরবো, আর সেই রজ্জুর সাহায্যে দেহকারাগার থেকে উদ্ধার হয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ করব। মুক্তি লাভ করে তার সাধনগুলি আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

৬ দেহতত্ত্ব

দুটী শক্তি প্রবাহ মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ড বয়ে তার শেষভাগে পরস্পরকে অতিক্রম করে ফের মস্তিষ্কে ফিরে যায়। এর একটীর নাম সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা। পিঙ্গলা মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধ থেকে মেরুদণ্ডের বাঁ দিকে মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে আবার মেরুর নীচে ৪ এর অর্দ্ধেকের মত আকারে আর একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে যায়। অন্য শক্তি-প্রবাহটীর নাম চন্দ্রনাড়ী বা ইড়া। এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উল্টো এবং "৪" এর অপরার্দ্ধ আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে "৪" এই রকম হলেও এর নীচের দিকটা ওপরের দিকের চাইতে অনেক লম্বা। এই দুটো প্রবাহ দিন রাত দেহের সর্ব্বাংশে শক্তি-সঞ্চার করছে। অবশিষ্ট শক্তি সুষুম্নার অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে—সাধারণ ভাষায় স্নায়বিক কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে। ইড়া ও পিঙ্গলার গতি মৃত দেহে দেখা যায় না, কিন্তু জীবিত শরীরেই এদের ক্রিয়া হয়। আমরা সাধারণতঃ তাদের ক্রিয়া টেরই পাই না। কিন্তু একাগ্র মনেরদ্বারা এদের প্রত্যক্ষ করা যায়। যোগীরা যে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না ও চক্র-গুলিকে অনুভবই করেন তা নয়, এদের দেখতেও পান। এরা প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ম্ময়।

এই ইড়া পিঙ্গলার প্রবাহ শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে জড়িত। সেই জন্য শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়মিত করতে পারলে সমস্তটা দেহকেই আয়ত্ত করা যায়। কঠোপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া আর বিষয়কে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আত্মা হচ্ছেন সেই রথের রথী। সারথি যদি বুদ্ধি-সহায়ে ঘোড়াকে সংযত করতে না পারে, তা হলে কখনো লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না। দুষ্টাশ্বের মত ইন্দ্রিয়গুলো রথকে যেখানে খুসী টেনে নিয়ে গিয়ে রথীকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু এই দুটী শক্তি-প্রবাহ (ইড়া ও পিঙ্গলা) দুষ্টাশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগামস্বরূপ। সারথিকে এদের দমন করাই চাই। জগতের বড় বড় আচার্য্য মাত্রেই যোগী ছিলেন এবং ইড়া ও পিঙ্গলাকে তাঁরা সম্পূর্ণ বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ দুটীকে যোগীরা মেরুর তলদেশে সংযত করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই ইড়া ও পিঙ্গলার প্রবাহ জ্ঞানপ্রবাহে পরিণত হয়। যোগী ছাড়া কারো এ হতে পারে না।

ইড়া ও পিঙ্গলার মাঝে সুষুম্না। সুষুম্না একটী সূক্ষ্ম, জ্যোতির্ম্ময়, প্রাণময়, সূত্রাকারে পথ, মেরু-দণ্ডের ভিতর দিয়ে চলেছে। একে যোগমার্গ বা ব্রহ্মমার্গও বলে। কুণ্ডলিনীকে এই পথ দিয়ে জাগাতে হবে। যোগীদের ভাষায় সুষুম্নার দুটা দিক দুটা পদ্মের সঙ্গে জোড়া রয়েছে। নীচের দিকে কুণ্ডলিনীর ত্রিকোণ চক্র যে-পদ্মের ভিতর, তার ভিতর; আর ওপরের দিক ব্রহ্মরন্ধ্রে। এই দুটীর মাঝখানে আরও পাঁচটী চক্র আছে। প্রথম—মূলাধার (গুহ্যদ্বারের উপরে), দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গমূলে), তৃতীয়—মণিপুর (নাভিতে), চতুর্থ—অনাহত (হৃদয়ে), পঞ্চম—বিশুদ্ধ (কণ্ঠে), ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র (ভ্রূ মধ্যে), সপ্তম—সহস্রার (মাথার ওপরে)।

মূলাধার চক্র অতি প্রয়োজনীয়। এই জায়গাটাই হচ্ছে যৌন-শক্তির (sexual energy) আধার। একটা ত্রিকোণ স্থানে একটী ছোট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, যোগীরা এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই নিদ্রিত সাপই **কুণ্ডলিনী**; এর ঘুম ভাঙ্গানোই হচ্ছে সমস্ত রাজযোগের উদ্দেশ্য।

কামচর্চ্চা হতে যে যৌনশক্তির আবির্ভাব হয়, তাকে উর্দ্ধ দিকে মনুষ্য শরীরের মহাবিদ্যুতাধার মস্তিষ্কে চালাতে পারলে সেখানে তা সঞ্চিত হয়ে ওজঃ বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সমস্ত সৎ চিন্তা, সমস্ত প্রার্থনা ওই কাম শক্তিকে ওজে পরিণত করতে সাহায্য করে, আর তাই থেকে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিও লাভ করি। এই ওজঃই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, আর একমাত্র মনুষ্য-শরীরেই এই শক্তি-সঞ্চয় করা সম্ভব। **যিনি সমস্ত কামশক্তিকে ওজে পরিণত করতে পেরেছেন, তিনি দেবতা। তাঁর কথার অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় নূতন জগতের সৃষ্টি।**

যোগীরা মনে মনে কল্পনা করেন যে, এই কুণ্ডলিনী সুষুম্নার পথে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ করে সহস্রারে উপস্থিত হন। কামশক্তি, যা হচ্ছে মানুষের শরীরের সার অংশ, সেটা যদি ওজঃ শক্তিতে পরিণত না হয়, তাহলে স্ত্রীলোকই বল আর পুরুষই বল, কেউ ধর্ম্মলাভ করতে পারে না।

কোনো শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না, তবে তাকে ঠিক ঠিক পথে নিয়োজিত করা যেতে পারে। সেই জন্য যে অদ্ভুত শক্তি আমাদের হাতে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, তারপর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে ঐ শক্তিকে পাশব না হতে দিয়ে দেবময় করে ফেলতে হবে। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে **পবিত্রতাই সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি।** বিশেষতঃ রাজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা চাই, তা সে বিয়েই করুক আর নাই করুক। দেহের আসল শক্তি যদি সে বৃথা নষ্ট করে দেয়, তাহলে কখনো ধর্ম্মলাভ করতে পারবে না। ইতিহাস বলে, বড় বড় দ্রষ্টাপুরুষেরাই হয় সাধু-সন্ন্যাসী, নতুবা বিবাহিত হয়েও তাঁরা ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। **পবিত্রাত্মারাই কেবল ভগবানের দর্শন পায়।**

৭ মনের তত্ত্ব

দেহ আর প্রাণ সম্বন্ধে বলা হল। এখন মন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

মনকে সংযত করবার আগে, মন কি তা জানতে হবে। **মন জড়েরই একটু সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র।** যদিও মন সূক্ষ্মতর জড় বিশেষ, তবুও এ দেহ নয়, আত্মাও নয়। দেহটা হচ্ছে মনের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমরা দেহ-মনের অতীত, অনন্ত, অপরিবর্ত্তনশীল, সাক্ষীস্বরূপ আত্মা। দেহটা চিন্তারসের দানা (crystallized form)। চিন্তাগুলো যেন ছবি—আমরা তাদের তৈরী করি না—প্রকৃতির প্রেরণায় তারা আমাদের মাঝে আসছে যাচ্ছে। **আমরা যে মাঝে মাঝে দেহজ্ঞান হারিয়ে ফেলি, তাতেই প্রমাণ হয়, মন আর দেহ আলাদা আলাদা।** ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে এনে আমরা ইচ্ছামত এই অবস্থা লাভের জন্য অভ্যাস করতে পারি। এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে সমস্ত জগৎ আমাদের অধীন। কারণ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে যে সব বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছায়, তাই নিয়ে

জগৎ। স্বাধীনতাই উচ্চ জীবনের চিহ্ন। ইন্দ্রিয়-বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হবে।

বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে দুইভাগে যোগীরা ভাগ করেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্ম্মেন্দ্রিয়, অথবা জ্ঞান আর কর্ম্ম। মন হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়। যোগী হওয়ার প্রথম ধাপ ইন্দ্রিয়ের বাইরে যাওয়া, দ্বিতীয় ধাপ—মনোজিৎ হওয়া।

মনের চারটী স্তর।—(১) চিন্তাশক্তি। একে সংযত না করায় এর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; সংযত করলে তাই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে ওঠে। (২) বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি (তাকে বোধি-শক্তিও বলা যায়)। (৩) অহঙ্কার বা 'আমি'-জ্ঞান। (৪) চিত্ত বা স্মৃতি। এইটাই হল সকল বৃত্তির আধার। এ যেন সমুদ্র, আর বৃত্তিগুলি তারই তরঙ্গ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গের জন্য অস্পষ্ট বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আত্মার প্রতিবিম্বও তেমনি মন-স্তরঙ্গের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মত হয়, তখনই তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই। তেমনি চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত হয়, তখনই আত্মদর্শন ঘটে।

৮ যোগের সাধনা

এখন সাধনার কথা বলা যাক্। রাজযোগের আটটী অঙ্গের মধ্যে যম ও নিয়মের কথা আগেই বলা হয়েছে—এরা সাধকের আজীবন সহচর। এখন অন্যান্য অঙ্গের কথা বলা হবে।

আসন

সাধন-ভজনের সব চেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ। সে সময় দেহ ও মন খুব প্রশান্ত থাকে, চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই প্রাবল্য থাকে না। যদি সে সময় না পার, তাহলে ঘুমোতে যাবার আগে ও ঘুমিয়ে ওঠার পর অভ্যাস করবে। দেহ খুবপরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, আর যতদূর সম্ভব একলা থাকবে।

আসন নাতি-উচ্চ হওয়া উচিত। প্রথম কুশাসন, তার পর অজিন, তার উপর পট্টবস্ত্র বিছাবে। কম্বল বিছালেও চলে। হেলান দেবার জায়গা না থাকাই ভাল। আর আসনটা যেন না নড়ে।

স্নানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে, অর্থাৎ মনে করবে যেন আমি পাহাড়ের মত অটল, কোনো কিছুই আমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের ওপর জোর না দিয়ে ঘাড় ও মাথা ঋজুভাবে রাখবে। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়েই সব প্রক্রিয়া হয়, কাজেই এর ক্ষতিকারক কোনো কিছু যেন না ঘটে।

পায়ের আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে সমস্ত দেহকে স্থির করবে। এই স্থির ভাবটী মনে মনে চিন্তা করা চাই। তাতে যদি প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করা দরকার মনে হয় তো তা করবে।

মাথায় না পৌছানো পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের প্রতি অঙ্গ স্থির করে আনবে, যাতে কোনো অঙ্গ বাদ না যায়। তার পর সমস্ত দেহটীকে স্থির করে রাখবে। তখন ভাববে, **সত্য লাভ করবার জন্যই ভগবান তোমার এই দেহ দিয়েছেন। একে আশ্রয় করেই সংসার-সমুদ্রের পর-পারে সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে।** এইটা করা হয়ে গেলে দুই নাক দিয়ে

দীর্ঘশ্বাস নেবে, তার পর দুই নাক দিয়েই তা ফেলে দেবে। তার পর যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে পার, নিশ্বাস না নিয়ে থাকবে। এই রকম চার বার করা হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেবে এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। গায়ত্রী মন্ত্র বা "অসতো মা সদ্গময়" ইত্যাদি মন্ত্রটী ১০।১৫ বার জপ ও তার অর্থ চিন্তা করবে।

সুষুম্না ও মূলাধারের ধ্যান

তার পর সুষুম্না ধ্যান করা প্রয়োজন। যদি ভাব চক্ষে কখনো তার দর্শন পাও, তাহলে তারই ধ্যান করা সব চাইতে ভাল। বহুক্ষণ এই ধ্যান করবে।

তার পর মূলাধারের ধ্যান করবে। চোখ বন্ধ করে তার ছবি (রক্তবর্ণ ত্রিকোণ একটী ক্ষেত্র) মনে মনে স্পষ্ট কল্পনা করবে। ভাব, তার চারি পাশে আগুণের শিখা, আর বিদ্যুদ্বর্ণা কুণ্ডলিনী তার মাঝখানে ঘুমিয়ে আছেন। ধ্যানে যখন এই কুণ্ডলিনীকে মূলাধারে স্পষ্ট দেখ্তে পাবে, তখন তাঁকে জাগাবার জন্য শ্বাস বন্ধ করে কুম্ভক করে যোনিমুদ্রা যোগে মূলাধারকে আকুঞ্চিত করবে, আর ভাব্বে—কুম্ভকদ্বারা রুদ্ধ বাতাস অথবা যোনি-মুদ্রার সেই আকুঞ্চনীশক্তি সবলে কুণ্ডলিনীর মস্তকে আঘাত করছে, আর সেই আঘাতে কুণ্ডলিনী জেগে উঠ্ছেন। **যার কল্পনাশক্তি যত বেশী, সে ফলও তত শিগগীর পায়, আর তার কুণ্ডলিনীও তত শিগগীর জাগেন। যতদিন না তিনি জাগেন, ততদিন ভাব যে তিনি জেগেছেন।**

প্রাণায়াম

তার পর প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের এই কৌশলটী কুণ্ডলিনী ধ্যানের আগে প্রথম অভ্যাস করে নেওয়া উচিৎ। সুন্দর অভ্যাস হয়ে গেলে তার পর এই প্রাণায়ামের সাহায্যেই কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে চক্রে চক্রে তুলে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে আগে কুণ্ডলিনী ধ্যান, তার পর প্রাণায়াম, তার পর প্রত্যাহার ইত্যাদি। আর একটু অগ্রসর হলে পর প্রাণায়ামসহ কুণ্ডলিনী উত্থাপন।

প্রাণায়ামের তিনটী অঙ্গ—(১) পূরক বা শ্বাস গ্রহণ; (২) কুম্ভক বা শ্বাসরোধ; (৩) রেচক বা শ্বাসত্যাগ। প্রাণায়াম একটা ছন্দের তালে তালে করতে হবে। তার সহজ উপায় হচ্ছে গণনা করা। তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মত হয়ে পড়ে, তাই গণনার নির্দ্ধারিত সংখ্যায় আমরা পবিত্র ওঁ মাত্র জপ করব।

প্রাণায়াম এই ভাবে অভ্যাস করবে।—ডান নাকে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে চার বার ওঁ জপ করতে করতে বাম নাকে ধীরে ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে নাও (পূরক); তার পর তর্জ্জনীর দ্বারা বাম নাক চেপে ধরে দুটী নাকই বন্ধ করে মাথা-টীকে বুকের উপর অবনমিত রেখে (মেরুদণ্ড কিন্তু সোজাই থাক্বে) মনে মনে আটবার ওঁ জপ করতে করতে শ্বাস রোধ করে রাখ (কুম্ভক); তার পর মাথা ফের সোজা করে বুড়ো আঙ্গুল ডান নাক থেকে উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে ৪ বার ওঁ জপ করতে করতে শ্বাস ফেল (রেচক)। যখন শ্বাস ফেলা হয়ে যাবে, তখন ফুস্ফুস্ থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দেবার জন্য পেট সঙ্কুচিত করবে। (ক)

তার পর বাম নাক বন্ধ করে ৪ বার ওঁ জপ্তে জপ্তে ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে। পরে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাকও চেপে ধরে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাসরোধ করে আট বার

ওঁ জপ করবে। তার পর আবার মাথা সোজা করে বাম নাক খুলে দিয়ে ৪ বার ওঁ জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। সেই সময় আগের মত পেট সঙ্কুচিত করা চাই। (খ)

এই রকম দুবারে একটী প্রাণায়াম হল ('ক' আর 'খ' মিলিয়ে)। প্রথম প্রথম দুটী করে প্রাণায়াম করবে। এক সপ্তাহ এই রকম অভ্যাস কর, তার পর ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসরোধ, শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের জপ সংখ্যাও বাড়াতে হবে। অর্থাৎ যদি দুটী প্রাণায়াম কর, তা'হলে পূরকের সময় ছয় বার, কুম্ভকের সময় ১২ বার, আর রেচকের সময় ৬ বার ওঁ জপ করবে। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা আমরা আরো বেশী পবিত্র, নির্ম্মল ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হব। প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস করে শিষ্য গুরুকে জানাবে।

প্রাণায়াম ভাবনা সহকারে করা উচিত। পূরকের সময় ভাববে, সমস্ত বিশ্ব-শক্তিকে তুমি আকর্ষণ করে নিজের মাঝে নিয়ে আসছ। কুম্ভকের সময় ভাববে, সেই শক্তি জ্যোতিঃ হয়ে তোমার বুক আলো করে আছে। আবার রেচকের সময় ভাববে, সেই শক্তি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। তুমিই সেই শক্তি স্বরূপ।

এই রকম প্রাণায়াম অভ্যাস হলে পর তার সহায়ে কুণ্ডলিনীকেও জাগানো যায়। আসনে বসে দেহ স্থির কর, প্রার্থনা কর, তারপর সুষুম্না ধ্যান কর, কুণ্ডলিনীর ধ্যান কর। তারপর প্রাণায়াম সহায়ে কুণ্ডলিনীকে জাগাও। কেমন ক'রে তা বলছি।—

ইড়া ও পিঙ্গলার গতিকে একটা নূতন দিকে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ সুষুম্নার মুখ খুলে দিয়ে তাদের একটা নূতন রাস্তা দেখিয়ে দিতে হবে। যখন সুষুম্নার মধ্য দিয়ে তাদের গতি সহস্রার পর্য্যন্ত পৌছাবে, তখন কিছুক্ষণের জন্য দেহজ্ঞান একেবারে চলে যাবে। ধ্যানে ইড়া ও পিঙ্গলার গতি অনুভব করবার চেষ্টা করে জোর করে তাদের সুষুম্নার পথে চালাতে চেষ্টা কর। এতে কাজ খুব শিগ্‌গির শিগ্‌গির হবে। প্রাণায়াম করবার সময় কুম্ভক করে যোনিমুদ্রা করলেই ইড়া-পিঙ্গলার শক্তিপ্রবাহ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঠেলে নিয়ে সুষুম্নার পথ দিয়ে সহস্রারের দিকে উঠে যাবে। এই সময় প্রাণায়াম মন্ত্রের একটু পরিবর্ত্তন দরকার। রেচক-পূরকের সময় তখন 'ওঁ' জপ করবে, আর কুম্ভকের সময় "হুঁ" মন্ত্র জপ করবে। কুম্ভকের সময় মনে মনে কল্পনা করবে, সেই ধৃত নিঃশ্বাস বারম্বার কুণ্ডলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তার দ্বারা তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন।

কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে চক্রে চক্রে সহস্রারে তুলে নিলেই ক্রমে সমাধি হবে। এই এক রকম সাধনা। এটী কর্ম্মযোগের অনুকূল। আর এক রকম সাধনা —জ্ঞানযোগের সাধনা। তাতে প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসকে নিয়মিত করে তারপর প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান অবলম্বন করে সমাধিতে পৌছান। তার কথাই এখন বলা হচ্ছে।

প্রত্যাহার

এখন প্রত্যাহার। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "যে যে-রাস্তা দিয়েই যাক্, আমার কাছেই পৌছাবে।" প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে কোনো বিশেষ বস্তুতে একত্রীভূত করবার চেষ্টা। এর পূর্ব্বে শ্বাসকে নিয়মিত করে নিতে হবে। এও এক রকম প্রাণায়াম। যখন বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন ডান নাক দিয়ে শ্বাস পড়বে

তখন কাজের সময়, **যখন দুই নাক দিয়েই পড়বে তখন ধ্যানের সময়।** যখন দেহ-মন শান্ত হয়ে আসবে আর দুই নাক দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। বুড়ো আঙ্গুল ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন ধরে শ্বাস রোধ করার পর কেবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঐ রকম করা যেতে পারে। আগে লক্ষ্য করে দেখ, কোন্ নাক দিয়ে শ্বাস বইছে। ধর ডান নাকে শ্বাস বইছে। তাহলে 'অনামিকা' দ্বারা বাঁ নাক চেপে ধরে ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়। কয়েকবার এই রকম করতে করতেই দেখবে, দু'নাকে সমানে শ্বাস বইছে।

তার পর প্রত্যাহারের কাজ। চঞ্চল মনকে পাকড়াও করে তার ঘাড় ধরে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে তাকে বেঁধে রাখতে হবে। এই রকম বার বার করতে হবে। মনকে স্থির করবার সব চাইতে সোজা উপায়, একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে যেখানে সে ভেসে যেতে চায়, সেখানে খানিকক্ষণের জন্য তাকে ভেসে যেতে দাও। কেবল তার ওপর নজর রাখ, আর সে কি ভাবে, তাই দেখ। সর্ব্বদা মনে রাখবে, **"আমি দ্রষ্টা সাক্ষিবৎ মনের ভাসা ডোবা দেখ্‌ছি; আমি মন নই, মন থেকে আমি সম্পূর্ণ পৃথক।"** জাগ্রত ভূমিতে আমরা যেমন দেখতে পাই যে একটা লোক আসছে, তেমনি এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর আমরা দেখতে পাব যে চিন্তাগুলো আসছে। কি করে চিন্তাগুলো উঠ্‌ছে, আর আমরা কিই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাও বুঝ্‌তে পারব। যখন আমরা মন থেকে আত্মাকে অর্থাৎ নিজকে তফাৎ করতে পারব, যখন আমরা বুঝতে পারব যে আমরা আর আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ, তখনই বুঝ্‌তে হবে, ঐ অবস্থায় আমরা পৌছেছি। **চিন্তাগুলো তোমাদের পেয়ে না বসে; সর্ব্বদা তাদের পাশ কাটাবে, তাহলেই তারা আপনি বিলীন হয়ে যাবে।** যেই কোনও চিন্তার ওপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি দেখবে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তাকে জোর করে বন্ধ করবার চেষ্টা করো না, কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। **প্রথম প্রথম জোর করে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা করলেও কোনও ফল হয় না। অভ্যাসে মনের নিরোধ আপনিই হবে।**

ভাব, মন যেন একটা নিস্তরঙ্গ হ্রদ—চিন্তাগুলো তার বুদ্‌বুদ— উঠছে আর তার বুকে লয় হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলোকে রুদ্ধ করবার কোনো চেষ্টা করো না, কল্পনাচক্ষে কেবল দেখে যাও, কেমন করে তারা ভেসে চল্‌ছে। একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন তরঙ্গ ওঠে, তার পর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তার উৎপত্তিও তত কমে আসে, তেমনি মনকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিলে তার বৃত্তের পরিধি যত বেড়ে যাবে, মনোবৃত্তির নানা সৃষ্টিও তত কমে আসবে। কিন্তু আমরা ঠিক এর উল্টো উপায় অবলম্বন করব। প্রথমে একটা বড় চিন্তার বৃত্ত থেকে আরম্ভ করে সেটাকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির করে রাখতে হবে। এই ভাবে খুব দৃঢ় বদ্ধ হয়ে থাকবে —"আমি মন নই—আমি দেখছি যে আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য

করছি।" এই রকম চিন্তা করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে একত্ববোধ তা প্রত্যহই কমে আসবে, তার পর মন থেকে নিজকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলতে পারবে। অবশেষে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে যে মন ও তুমি এক নও। এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার চাকর। তাকে ইচ্ছামত তুমি বশীভূত করতে পারবে।

সমস্ত চিন্তা বর্জ্জন করে মনকে খালি রাখবে; যখনই কোনো চিন্তা মনে উঠবে, তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবে। এই করতে গেলে দেহরূপ জড় বস্তুকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বাস্তবিক মানুষের সমস্ত জীবনই ঐ অবস্থা আনবার একটী অবিরাম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধারণা

তার পর ধারণা। মনটী এমনি করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে হৃদয়ে অথবা ভ্রূ মধ্যে অথবা সহস্রারে জ্যোতির ধ্যান কর। জ্যোতিঃ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতীক। যোগীরা তা দেখতে পান। কখন কখন আমরা এমন মুখ দেখতে পাই যেন জ্যোতিঃ দিয়ে ঘেরা। ভাব চক্ষে ইষ্ট মূর্ত্তি হয়ত আমাদের সামনে আসতে পারেন, তাঁকে সহজেই প্রতীক স্বরূপ নিয়ে আমরা মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করতে পারি।

যদিও আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই কাজ করি, কিন্তু তার অধিকাংশই হচ্ছে চোখের কাজ। এমন কি চিন্তাগুলি পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক ছবি। ছবি ছাড়া যেন চিন্তাই করা যায় না। চিন্তার সঙ্গে রূপের এই রকম অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ আছে বলেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ অথবা শুধু জ্যোতিঃ চিন্তা করতে বলা হয়। এ গুলি প্রথম প্রথম কল্পনা বটে, কিন্তু চিন্তার ফলে ক্রমে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। যোগের সময় এমনি করে জ্যোতির্ম্ময় কল্পনাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, কল্পনা যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকের কল্পনা ধারায় বৈশিষ্ট্য আছে, **তোমার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, সেইটাই কর, সেইটাই তোমার সোজা হবে।**

ধ্যান ও সমাধি

তার পর ধ্যান। জ্যোতিঃ ক্রমে ভাবে রূপান্তরিত হয়। এই ভাবগুলির অনুসরণ কর—তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও। যখন ভাবও স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করবে। এই হচ্ছে তুরীয় অবস্থা বা **সমাধি**। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তার অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও।

উপসংহার

স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের অনুশীলন দরকার। সকলেই কিন্তু এক কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হবে। জগৎ রহস্যের ব্যাখ্যা আমাদের মাঝেই আছে। পাথরের পতন বাইরে হল, কিন্তু "মাধ্যাকর্ষণ" আবিষ্কার করবার শক্তি আমাদের ভিতরেই ছিল, বাইরে নয়। **অনর্থের সৃষ্টি আমরা নিজেরাই করি।** আমরা যা, তাই বাহিরে দেখি, কেন না জগৎটা আমাদের আয়নায় মত। এই ছোট দেহটা আমাদের সৃষ্ট একখানি ছোট আয়না, কিন্তু সারাটা বিশ্ব হচ্ছে আমাদের শরীর। সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে আমরা মরি না বা কাকেও মারতে পারি না, কারণ সে যে আমিই। আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই—কেবল জগৎকে

তখন কাজের সময়, **যখন দুই নাক দিয়েই পড়বে তখন ধ্যানের সময়।** যখন দেহ-মন শান্ত হয়ে আসবে আর দুই নাক দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। বুড়ো আঙুল ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন ধরে শ্বাস রোধ করার পর কেবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঐ রকম করা যেতে পারে। আগে লক্ষ্য করে দেখ, কোন্ নাক দিয়ে শ্বাস বইছে। ধর ডান নাকে শ্বাস বইছে। তাহলে 'অনামিকা' দ্বারা বাঁ নাক চেপে ধরে ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়। কয়েকবার এই রকম করতে করতেই দেখবে, দু'নাকে সমানে শ্বাস বইছে।

তার পর প্রত্যাহারের কাজ। চঞ্চল মনকে পাকড়াও করে তার ঘাড় ধরে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে তাকে বেঁধে রাখতে হবে। এই রকম বার বার করতে হবে। মনকে স্থির করবার সব চাইতে সোজা উপায়, একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে যেখানে সে ভেসে যেতে চায়, সেখানে খানিকক্ষণের জন্য তাকে ভেসে যেতে দাও। কেবল তার ওপর নজর রাখ, আর সে কি ভাবে, তাই দেখ। সর্ব্বদা মনে রাখবে, **"আমি দ্রষ্টা সাক্ষিবৎ মনের ভাসা ডোবা দেখছি; আমি মন নই, মন থেকে আমি সম্পূর্ণ পৃথক।"** জাগ্রত ভূমিতে আমরা যেমন দেখতে পাই যে একটা লোক আসছে, তেমনি এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর আমরা দেখতে পাব যে চিন্তাগুলো আসছে। কি করে চিন্তাগুলো উঠছে, আর আমরা কিই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাও বুঝতে পারব। যখন আমরা মন থেকে আত্মাকে অর্থাৎ নিজকে তফাৎ করতে পারব, যখন আমরা বুঝতে পারব যে আমরা আর আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ, তখনই বুঝতে হবে, ঐ অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি। **চিন্তাগুলো তোমাদের পেয়ে না বসে; সর্ব্বদা তাদের পাশ কাটাবে, তাহলেই তারা আপনি বিলীন হয়ে যাবে।** যেই কোনও চিন্তার ওপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি দেখবে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তাকে জোর করে বন্ধ করবার চেষ্টা করো না, কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। **প্রথম প্রথম জোর করে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা করলেও কোনও ফল হয় না। অভ্যাসে মনের নিরোধ আপনিই হবে।**

ভাব, মন যেন একটা নিস্তরঙ্গ হ্রদ—চিন্তাগুলো তার বুদ্‌বুদ— উঠছে আর তার বুকে লয় হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলোকে রুদ্ধ করবার কোনো চেষ্টা করো না, কল্পনাচক্ষে কেবল দেখে যাও, কেমন করে তারা ভেসে চল্‌ছে। একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন তরঙ্গ ওঠে, তার পর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তার উৎপত্তিও তত কমে আসে, তেমনি মনকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিলে তার বৃত্তের পরিধি যত বেড়ে যাবে, মনোবৃত্তির নানা সৃষ্টিও তত কমে আসবে। কিন্তু আমরা ঠিক এর উল্টো উপায় অবলম্বন করব। প্রথমে একটা বড় চিন্তার বৃত্ত থেকে আরম্ভ করে সেটাকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির করে রাখতে হবে। এই ভাবে খুব দৃঢ় বদ্ধ হয়ে থাকবে —"আমি মন নই—আমি দেখছি যে আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য

করছি।" এই রকম চিন্তা করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে একত্ববোধ তা প্রত্যহই কমে আসবে, তার পর মন থেকে নিজকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলতে পারবে। অবশেষে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে যে মন ও তুমি এক নও। এটা যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার চাকর। তাকে ইচ্ছামত তুমি বশীভূত করতে পারবে।

সমস্ত চিন্তা বর্জ্জন করে মনকে খালি রাখবে; যখনই কোনো চিন্তা মনে উঠবে, তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবে। এই করতে গেলে দেহরূপ জড় বস্তুকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বাস্তবিক মানুষের সমস্ত জীবনই ঐ অবস্থা আনবার একটী অবিরাম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধারণা

তার পর ধারণা। মনটী এমনি করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে হৃদয়ে অথবা ভ্রূ মধ্যে অথবা সহস্রারে জ্যোতির ধ্যান কর। জ্যোতিঃ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতীক। যোগীরা তা দেখতে পান। কখন কখন আমরা এমন মুখ দেখতে পাই যেন জ্যোতিঃ দিয়ে ঘেরা। ভাব চক্ষে ইষ্ট মূর্ত্তি হয়ত আমাদের সামনে আসতে পারেন, তাঁকে সহজেই প্রতীক স্বরূপ নিয়ে আমরা মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করতে পারি।

যদিও আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই কাজ করি, কিন্তু তার অধিকাংশই হচ্ছে চোখের কাজ। এমন কি চিন্তাগুলি পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক ছবি। ছবি ছাড়া যেন চিন্তাই করা যায় না। চিন্তার সঙ্গে রূপের এই রকম অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ আছে বলেই জ্যোতির্ম্ময় রূপ অথবা শুধু জ্যোতিঃ চিন্তা করতে বলা হয়। এ গুলি প্রথম প্রথম কল্পনা বটে, কিন্তু চিন্তার ফলে ক্রমে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। যোগের সময় এমনি করে জ্যোতির্ম্ময় কল্পনাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, কল্পনা যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকের কল্পনা ধারায় বৈশিষ্ট্য আছে, **তোমার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, সেইটাই কর, সেইটাই তোমার সোজা হবে।**

ধ্যান ও সমাধি

তার পর ধ্যান। জ্যোতিঃ ক্রমে ভাবে রূপান্তরিত হয়। এই ভাবগুলির অনুসরণ কর—তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও। যখন ভাবও স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করবে। এই হচ্ছে তুরীয় অবস্থা বা **সমাধি।** ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তার অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও।

উপসংহার

স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের অনুশীলন দরকার। সকলেই কিন্তু এক কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হবে। জগৎ রহস্যের ব্যাখ্যা আমাদের মাঝেই আছে। পাথরের পতন বাইরে হল, কিন্তু "মাধ্যাকর্ষণ" আবিষ্কার করবার শক্তি আমাদের ভিতরেই ছিল, বাইরে নয়। **অনর্থের সৃষ্টি আমরা নিজেরাই করি।** আমরা যা, তাই বাহিরে দেখি, কেন না জগৎটা আমাদের আয়নায় মত। এই ছোট দেহটা আমাদের সৃষ্ট একখানি ছোট আয়না, কিন্তু সারাটা বিশ্ব হচ্ছে আমাদের শরীর। সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তা করলে বুঝতে পারবো যে আমরা মরি না বা কাকেও মারতে পারি না, কারণ সে যে আমিই। আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই—কেবল জগৎকে

ভালবেসে যাওয়া উচিত। **"সারাটা বিশ্ব আমার শরীর। নিখিল স্বাস্থ্য, নিখিল আনন্দ আমারই, কারণ সবই যে বিশ্বের ভিতর। আমিই বিশ্ব"- এই ভাবে বিভোর হয়ে যাও।** আয়নার ওপর যা প্রতিফলিত হচ্ছে সে সব আয়নারই কাজ, তা শেষে বুঝ্‌তে পারব। যদিও আমাদের ছোট তরঙ্গের মত বোধ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সকলের পশ্চাতেই এক বিরাট্ সিন্ধু। সেই জন্য আমরা সকলেই এক। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ থাক্‌তে পারে না।

বল্‌বে, "আমিই সচ্চিদানন্দ, এ তো কল্পনা। **সমস্ত ধারণা ও চিন্তার মূলে কল্পনা।** কল্পনাকে ঠিক ঠিক নিয়োজিত কর্‌তে পার্‌লে তা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। কল্পনা যুক্তির রাজ্য (অর্থাৎ এই স্থূল জগৎটা) ছাড়িয়ে যায়, আর সেই আলোকেই আমাদের সর্ব্বত্র নিয়ে যেতে পারে। প্রেরণা আমাদের ভিতর থেকেই ওঠে। মহৎ গুণের দ্বারা আমাদের মনকে সেই প্রেরণার উপযোগী কর্‌তে হবে। কোনো সিদ্ধাই বা শক্তি চেও না। **প্রেমই একমাত্র শক্তি যা চিরকাল থাকে, আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।** যারা রাজযোগের সাহায্যে ভগবানের কাছে আস্‌তে চায়, তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে খুব সবল হতে হবে। আলো দেখে পা ফেল।

আমাদের আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্। তাঁকেই ধ্যান কর। বহু জীবনব্যাপী কর্ম্মের ফলে আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন। "এক প্রদীপ থেকে যেমন আর এক প্রদীপ জলে ওঠে"—এ কথা বৌদ্ধেরা বলেন, প্রদীপ আলাদা কিন্তু আলো সেই একই। কেবল সেই চিরন্তনকে খোঁজ, যাঁর সন্ধান পেলে আমাদের চির বিশ্রাম লাভ। পূর্ণকে যদি লাভ করা যায়, তবে চেষ্টা আর কিসের জন্য থাক্‌বে? পূর্ণকে লাভ কর্‌লে আমরা চিরকালের জন্য মুক্ত হলুম, অমরত্ব লাভ কর্‌লুম। **আমরাই পূর্ণ সৎ, আমরাই পূর্ণ চিৎ, পূর্ণ আনন্দ।**

ওম্—ওম্—ওম্

পুরুষকারের কথা

পুরুষকারের চরমেই মানুষ কৃপা উপলব্ধি করিতে পারে, ভগবৎশক্তিই যে পুরুষকারের প্রবর্ত্তক তখন সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহার পূর্ব্বে কৃপার কথা তাহার নিকট অনাদৃত, অবজ্ঞাত।

যতদিন পর্য্যন্ত অহঙ্কারের উচ্চশির অবনমিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরের উপর দৃষ্টি নিপতিত হয় না; যতদিন পর্য্যন্ত আপন ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আত্ম কর্ত্তৃত্বের অভিমান বিনষ্ট হয় না। যতদিন মানুষের আপন নির্বাধ ইচ্ছাক্রমে কার্য্যাদি সুসম্পাদিত হয়, ততদিন সে মনে করে, আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, 'কোঽন্যোস্তি সদৃশো ময়া'? অদ্য এই লাভ হইল, এই অভীষ্ট বস্তুও পরে পাইব, এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার হইবে, আমি এই শত্রুকে

বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি সর্ব্বশক্তিশালী, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে?—শ্রীভগবান্ এবম্বিধ দাম্ভিক ব্যক্তিদিগকে "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বরং বল, দর্প, কাম, ক্রোধের বশীভূত হইয়া ভগবানের নামে জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের উক্তি—'প্রত্যক্ষভাবে আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা; আমি ছাড়া স্বতন্ত্র কর্ত্তা কোথায়? যাহা কিছু করি, আমিই করি; যাহা কিছু দেখি, আমিই দেখি; যাহা কিছু শুনি, আমিই শুনি; অনর্থক অপর একজন অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অলক্ষ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আত্মার অবমাননা করিতে যাই কেন?'—ইহাদের যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। ইহারা নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া প্রকৃতির পারবশ্য স্বীকার করিয়াছে, কাম ক্রোধ মোহের ক্রীড়নক হইয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে, কাঁদিতেছে, তথাপি বলিতেছে আমরা কর্ত্তা! খরস্রোতা স্রোতস্বতীর বিপুল আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছে যে তৃণ খণ্ড, সে মনে করিতেছে, আমি আবার কার বশ?—আমি আত্মশক্তিতে স্বেচ্ছায় ছুটিয়া চলিয়াছি আমার অভীপ্সিত স্থানে!

শ্রীভগবানের অমোঘ বিধানে অহংভাবাপন্ন এই সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এবং যে যে যোনিতে তাহাদের জন্ম হয়, তত্তদ্ভাবভাবিত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ তদপেক্ষা আরও অধমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ প্রকৃতি পরতন্ত্রতা। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, ঈশ্বরের শরণাগত না হইয়া প্রকৃতির বশে অবশের মত—স্রোতবেগচালিত তৃণখণ্ডের মত ছুটিয়া চলিয়াছে অধোন্নতির কোন্ নিম্নতম সাগরের পানে!

কেন এমন হয়? কেন জীব এইভাবে মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়? ইহার একমাত্র হেতু অবিবেক। বিবেকহীন হইয়া সে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে; সে যে প্রকৃতি হইতে পৃথক সত্ত্বাশীল, এ অনুভবশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে; সে যে সমগ্র কর্ম্ম, ভোগ প্রভৃতি হইতে বিবিক্ত, নির্ব্বিকার চিদংশ পুরুষ তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; এই বিস্মৃতির ফলেই তাহার এবম্বিধ বিকৃতি। এই বিকারকেই সে নিজের স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতেছে; যে ভাবে তাহার প্রকৃতির পরিণাম ঘটিতেছে, সেই ভাবে তাহারও পরিণতি ঘটিতেছে; প্রকৃতির মালিন্যের সহ একীভূত হইয়া সেও মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন স্তরে নামিয়া পড়িতেছে; যে যত মূঢ় অবিবেকী, অহঙ্কারীরূপে পরিণত হইতেছে, সে ততই মনে করিতেছে আমিই কর্ত্তা, আমিই নিয়ন্তা; মহামায়ার এমনি মায়া! কাহারও যদি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে তাহার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে, বরং যে তাহার নিকট এই সত্য প্রকাশ করে, সে-ই তাহার নিকট বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ—

'সাচ্চা বলেতো মারে লাঠী ঝুটা জগৎ ভুলায়'

এই দাঁড়াইয়া গিয়াছে আজ কালকার জগতের নীতি; তাই অধুনা সত্যের স্থলে মিথ্যা, ত্যাগের স্থলে ভোগ, বৈরাগ্যের স্থলে আসক্তি আসিয়া সমাজ-দেহকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহা সত্য তাহাই বর্ত্তমানে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, আর যাহা মিথ্যা তাহাই সত্যের আসন গ্রহণ করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মিথ্যা যতই সত্যের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সত্য

ভালবেসে যাওয়া উচিত। **"সারাটা বিশ্ব আমার শরীর। নিখিল স্বাস্থ্য, নিখিল আনন্দ আমারই, কারণ সবই যে বিশ্বের ভিতর। আমিই বিশ্ব"- এই ভাবে বিভোর হয়ে যাও।** আয়নার ওপর যা প্রতিফলিত হচ্ছে সে সব আয়নারই কাজ, তা শেষে বুঝ্‌তে পারব। যদিও আমাদের ছোট তরঙ্গের মত বোধ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সকলের পশ্চাতেই এক বিরাট্‌ সিন্ধু। সেই জন্য আমরা সকলেই এক। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ থাক্‌তে পারে না।

বল্‌বে, "আমিই সচ্চিদানন্দ, এ তো কল্পনা। **সমস্ত ধারণা ও চিন্তার মূলে কল্পনা।** কল্পনাকে ঠিক ঠিক নিয়োজিত কর্‌তে পার্‌লে তা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। কল্পনা যুক্তির রাজ্য (অর্থাৎ এই স্থূল জগৎটা) ছাড়িয়ে যায়, আর সেই আলোকেই আমাদের সর্ব্বত্র নিয়ে যেতে পারে। প্রেরণা আমাদের ভিতর থেকেই ওঠে। মহৎ গুণের দ্বারা আমাদের মনকে সেই প্রেরণার উপযোগী কর্‌তে হবে।

কোনো সিদ্ধাই বা শক্তি চেও না। **প্রেমই একমাত্র শক্তি যা চিরকাল থাকে, আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।** যারা রাজযোগের সাহায্যে ভগবানের কাছে আস্‌তে চায়, তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে খুব সবল হতে হবে। আলো দেখে পা ফেল।

আমাদের আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্‌। তাঁকেই ধ্যান কর। বহু জীবনব্যাপী কর্ম্মের ফলে আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন। "এক প্রদীপ থেকে যেমন আর এক প্রদীপ জ্বলে ওঠে"—এ কথা বৌদ্ধেরা বলেন, প্রদীপ আলাদা কিন্তু আলো সেই একই। কেবল সেই চিরন্তনকে খোঁজ, যাঁর সন্ধান পেলে আমাদের চির বিশ্রাম লাভ। পূর্ণকে যদি লাভ করা যায়, তবে চেষ্টা আর কিসের জন্য থাক্‌বে? পূর্ণকে লাভ কর্‌লে আমরা চিরকালের জন্য মুক্ত হলুম, অমরত্ব লাভ কর্‌লুম। **আমরাই পূর্ণ সৎ, আমরাই পূর্ণ চিৎ, পূর্ণ আনন্দ।**

ওম্‌—ওম্‌—ওম্‌

পুরুষকারের কথা

পুরুষকারের চরমেই মানুষ কৃপা উপলব্ধি করিতে পারে, ভগবৎশক্তিই যে পুরুষকারের প্রবর্ত্তক তখন সে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহার পূর্ব্বে কৃপার কথা তাহার নিকট অনাদৃত, অবজ্ঞাত।

যতদিন পর্য্যন্ত অহঙ্কারের উচ্চশির অবনমিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরের উপর দৃষ্টি নিপতিত হয় না; যতদিন পর্য্যন্ত আপন ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আত্ম কর্ত্তৃত্বের অভিমান বিনষ্ট হয় না। যতদিন মানুষের আপন নির্বাধ ইচ্ছাক্রমে কার্য্যাদি সুসম্পাদিত হয়, ততদিন সে মনে করে, আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, 'কোঽন্যোস্তি সদৃশো ময়া'? অদ্য এই লাভ হইল, এই অভীষ্ট বস্তুও পরে পাইব, এই ধন আমার আছে, এই ধন আমার হইবে, আমি এই শত্রুকে

বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি সর্ব্বশক্তিশালী, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে?—শ্রীভগবান্ এবম্বিধ দাম্ভিক ব্যক্তিদিগকে "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বরং বল, দর্প, কাম, ক্রোধের বশীভূত হইয়া ভগবানের নামে জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের উক্তি—'প্রত্যক্ষভাবে আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা; আমি ছাড়া স্বতন্ত্র কর্ত্তা কোথায়? যাহা কিছু করি, আমিই করি; যাহা কিছু দেখি, আমিই দেখি; যাহা কিছু শুনি, আমিই শুনি; অনর্থক অপর একজন অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অলক্ষ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আত্মার অবমাননা করিতে যাই কেন?'—ইহাদের যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। ইহারা নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া প্রকৃতির পারবশ্য স্বীকার করিয়াছে, কাম ক্রোধ মোহের ক্রীড়নক হইয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে, কাঁদিতেছে, তথাপি বলিতেছে আমরা কর্ত্তা! খরস্রোতা স্রোতস্বতীর বিপুল আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছে যে তৃণ খণ্ড, সে মনে করিতেছে, আমি আবার কার বশ?—আমি আত্মশক্তিতে স্বেচ্ছায় ছুটিয়া চলিয়াছি আমার অভীপ্সিত স্থানে!

শ্রীভগবানের অমোঘ বিধানে অহংভাবাপন্ন এই সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অসুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এবং যে যে যোনিতে তাহাদের জন্ম হয়, তত্তদ্ভাবভাবিত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ তদপেক্ষা আরও অধমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র কারণ প্রকৃতি পরতন্ত্রতা। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, ঈশ্বরের শরণাগত না হইয়া প্রকৃতির বশে অবশের মত—স্রোতবেগচালিত তৃণখণ্ডের মত ছুটিয়া চলিয়াছে অধোন্নতির কোন্ নিম্নতম সাগরের পানে!

কেন এমন হয়? কেন জীব এইভাবে মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়? ইহার একমাত্র হেতু অবিবেক। বিবেকহীন হইয়া সে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে; সে যে প্রকৃতি হইতে পৃথক সত্তাশীল, এ অনুভবশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে; সে যে সমগ্র কর্ম্ম, ভোগ প্রভৃতি হইতে বিবিক্ত, নির্ব্বিকার চিদংশ পুরুষ তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; এই বিস্মৃতির ফলেই তাহার এবম্বিধ বিকৃতি। এই বিকারকেই সে নিজের স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতেছে; যে ভাবে তাহার প্রকৃতির পরিণাম ঘটিতেছে, সেই ভাবে তাহারও পরিণতি ঘটিতেছে; প্রকৃতির মালিন্যের সহ একীভূত হইয়া সেও মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া নিম্ন স্তরে নামিয়া পড়িতেছে; যে যত মূঢ় অবিবেকী, অহঙ্কারীরূপে পরিণত হইতেছে, সে ততই মনে করিতেছে আমিই কর্ত্তা, আমিই নিয়ন্তা; মহামায়ার এমনি মায়া! কাহারও যদি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে তাহার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে, বরং যে তাহার নিকট এই সত্য প্রকাশ করে, সে-ই তাহার নিকট বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ—

'সাচ্চা বলেতো মারে লাঠী ঝুটা জগৎ ভুলায়'

এই দাঁড়াইয়া গিয়াছে আজ কালকার জগতের নীতি; তাই অধুনা সত্যের স্থলে মিথ্যা, ত্যাগের স্থলে ভোগ, বৈরাগ্যের স্থলে আসক্তি আসিয়া সমাজদেহকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহা সত্য তাহাই বর্ত্তমানে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, আর যাহা মিথ্যা তাহাই সত্যের আসন গ্রহণ করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মিথ্যা যতই সত্যের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সত্য

ততই দূর হইতে দূরে, আরও দূরে সরিয়া যাই-তেছে। এই মিথ্যার আঁধার ঘুচাইয়া সত্যের আলোক ফুটাইয়া তুলিতে পারেন একমাত্র সংযমী, এই মিথ্যার মায়া কাটাইয়া সত্যের আসনে প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারেন একমাত্র মুনি! তাই সত্য-স্বরূপ বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥*

আত্মজ্ঞানহীন প্রাণিগণের পক্ষে যাহা রাত্রিস্বরূপ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন, এবং যে বিষয়নিষ্ঠাতে সর্ব্বভূত জাগরিত থাকে, তাহা আত্মদর্শী মননশীল মুনির পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। অর্থাৎ বিষয়ী ব্যক্তি যে চরম ও পরম সত্যকে মিথ্যা —অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেয়, জিতেন্দ্রিয় মননশীল ব্যক্তি তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং তাহারা (বিষয়ী ব্যক্তি) যাহাকে চরম ও পরম সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে, বিবেকী ব্যক্তি তাহাকে মিথ্যা ও তুচ্ছ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকেন।

এখানেই সাধনজগতের একটী নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। এই সত্যলাভের অধিকারী কে? না সংযমী—মুনি! এই সত্য লাভের উপায় কি? না সংযম—মনন! যিনি সংযমপরায়ণ নহেন, মুক্তি লাভের আশা তাঁহার দুরাশা; যিনি মননশীল নহেন, সত্য লাভের প্রয়াস তাঁহার বিড়ম্বনা। বহু দিনের অভ্যাসে, বহু দিনের সংস্কারে পুরুষ প্রকৃতির গুণরাজির সহিত এমনি ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে সহজে তাহাদের কবল হইতে নিস্তার পাওয়া জীবের পক্ষে অসম্ভব। তবে উপায়?—

"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।"

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে, পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় এই গুণ সমূহের কবল হইতে নিজকে উদ্ধার করিতে হইবে।

—২২ক

এই পৌনঃপুনিক অভ্যাসের নামই সাধনা, আর যিনি সাধনার পরপারে গিয়াছেন তিনিই সংযমী, তিনিই মুনি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এই তিনটী গুণ নির্ব্বিকার দেহীকে দেহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্যে **সত্ত্বগুণ** নির্ম্মল, এ জন্য উহা প্রকাশক ও উপদ্রবশূন্য, উহা জীবকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তিদ্বারা নিবদ্ধ করিয়া রাখে, অর্থাৎ আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, এইরূপ মনোধর্ম্মে জীবকে যোজনা করে। তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে জাত অনুরঞ্জনাত্মক **রজোগুণ** জীবকে কর্ম্মাসক্তিদ্বারা আবদ্ধ করে, আর অজ্ঞান-জাত জীবের ভ্রান্তিজনক **তমোগুণ** জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা আবদ্ধ করে। এই তিনটী গুণই জীবের বন্ধনের কারণ; ইহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বর্ণ শৃঙ্খল, রজোগুণ রৌপ্য শৃঙ্খল, এবং তমোগুণ লৌহ শৃঙ্খল সদৃশ। সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করিয়া রাখে। যখন পুরুষের (জীবের) প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান জন্মে, যখন প্রকৃতিই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্রী বলিয়া জীবের দৃঢ় ধারণার উদয় হয়, তখন "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" এই ভাবে ভাবিত জীব ত্রিগুণাতীত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান করে। তখনই তাহার—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।"

হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং সর্ব্ব সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়। এবম্ভূত অবস্থাপ্রাপ্ত দেহী দেহোৎপত্তির বীজ স্বরূপ এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া এবং জন্ম মৃত্যু জরারূপ মহা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে।

এই পরমানন্দ লাভই জীবের চরম লক্ষ্য, কিন্তু সে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে পরিচালিত হইয়া চরম

লক্ষ্য হইতে দূরে আরও দূরে সরিয়া পড়িতেছে। অতএব যে যতখানি দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ততখানি উদ্যম উৎসাহ সহযোগে আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাইয়া আত্মোদ্ধারের প্রযত্ন করিতে হইবে। এই সাধনা আরম্ভ করিলে সাধককে যে কত বাধা কত বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই, বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ সাধকের চিত্তকে বল পূর্ব্বক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে কত প্রয়াস পাইবে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; সত্যের বিজয় নিশান উড়াইয়া, ধৈর্য্যের বর্ম্ম পরিধান করিয়া, সংযমের শাণিত অসি হস্তে এই মহা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। জীব এতদিন যাহার পায়ে নিজের নিজত্ব পর্য্যন্ত বিকাইয়াছিল, তাহাকেই এখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া যাইবে, আর আত্মশক্তির অফুরন্ত তেজঃ প্রভাবে তাহার প্রত্যেক আঘাতই ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বিবেক সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, যত দিন পর্য্যন্ত আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষকে রূপ, রস, গন্ধের মোহন বাঁধনে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে আত্মবশে আনয়নের চেষ্টা করিবেই, পুনঃ পুনঃ স্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার স্বতঃপ্রদীপ্ত জ্ঞানকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিবেই এবং স্বরূপ হইতে চ্যুত করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইবেই।—অতএব এই নরকের দ্বারস্বরূপ কাম-ক্রোধ-লোভ-জননী রজোগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে হীনবল করিয়া আপন গৌরবে আপনি অধিষ্ঠিত হইতে হইলে শাস্ত্র-বিধানোক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, আত্মচেষ্টার পৌনঃপুনিক প্রয়োগ করিয়া আত্মমুক্তিসাধন করিতে হইবে। এই যে আত্মচেষ্টা, এই যে সাধনা, ইহারই নাম **পুরুষকার।** নতুবা এতদিন যে 'পুরুষ' প্রকৃতির পারবশ্য স্বীকার করিয়া তাহারই ক্রীড়নক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত হারাইয়া দর্পাহঙ্কারে পুরুষকারের বড়াই করিতেছিল, তাহা পুরুষকার নহে, তাহা **প্রকৃতিকার।** যখনই দেখিব তুমি আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছ, আত্ম লাভের প্রয়াস পাইতেছ, আত্ম প্রাপ্তির উপায়ীভূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখনই বুঝিব তুমি পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়াছ, শোক-মোহ-ভ্রান্তি-ক্লীবতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া—আত্মচেষ্টার অনুবর্ত্তন করিতেছ। যখনই তোমার মাঝে এই পুরুষকারের আবির্ভাব ঘটিবে, তখনই বুঝিব তুমি প্রকৃতির কবল হইতে উদ্ধার পাইবার অধিকারী হইয়াছ। এই পুরুষকারকেই শাস্ত্রকারগণ "আত্ম-কৃপা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আত্মকৃপা না হইলে পুরুষকারের উদ্বোধন হয় না, আবার পুরুষকারের উদ্বোধন না হইলে 'ভগবৎ কৃপা' লাভের অধিকারী হওয়া যায় না, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্ববাদিসম্মত মত। অতএব হে বীর! জাগাও তোমার আত্মশক্তি, এই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্ত হও তুমি প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে। ভয় নাই, তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী; তোমার ক্ষুদ্র শক্তিকে কুক্ষিগত করিয়া রহিয়াছে যে মহাশক্তি, সেই শক্তির কথা স্মরণ করিলেই তোমার সমস্ত অবসাদ সমস্ত জড়তা দূরে পলায়ন করিবে, তুমি নিত্য নব বলে বলীয়ান্ হইয়া শত্রু সংহারে সমর্থ হইবে। আবার স্মরণ করাইয়া দেই, এই আত্ম শক্তিকে ক্ষুদ্র অহমিকার শক্তি বলিয়া যেন মনে না হয়, ক্ষণে ক্ষণে বিজয়ের বিজয় সৌধ নিরীক্ষণ করিয়া যেন অহঙ্কারে অভিমানে চিত্ত ফুলিয়া না উঠে, তাহা হইলে কিন্তু পতন অবশ্যম্ভাবী! এই পুরুষকারের

পথে চলিতে চলিতে যখন আত্মশক্তির ন্যূনতা বুঝিতে পারিবে, যখন পদে পদে তোমার আত্ম-শক্তির হীনতা দেখিতে পাইবে, তখনই একটু আত্মস্থ হইও; তাহা হইলেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবে যে, তোমার সমগ্র শক্তির নিয়ন্তা, সমগ্র শক্তির আধারীভূত এক মহাশক্তি তাঁহার অনন্ত সত্তায় সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন, এই পুরুষোত্তমের শক্তিকণা পাইয়াই তোমার পুরুষকার সার্থক হইয়াছে, আর তখনই তুমি তোমার ক্ষুদ্র শক্তিকে মহাশক্তির সহিত অভেদে চিন্তা করিও, আত্ম সত্তা সেই মহান্ সত্তায় মিলাইয়া দিও, তাহা হইলেই দেখিবে, তোমার ক্ষুদ্র শক্তি মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছে, ক্ষুদ্র জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানে বিলীন হইয়াছে।—

বাস্তবিকই প্রকৃতির অনল বাহু হইতে উদ্ধার পাওয়া ক্ষুদ্রশক্তি পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, যদি সে না মহাশক্তি মহেশ্বরের কৃপাকণা প্রাপ্ত হয়। যখন সাধক আত্মচেষ্টার চরমে উপস্থিত হয়, যখন সে আপনার শক্তি সামর্থ্য সমস্ত প্রয়োগ করিয়া নিঃস্ব হয়, তখনই ভগবৎশক্তি বা ভগবৎকৃপা নামিয়া আসিয়া সাধকের সমগ্র সাধনাকে সফল ও সার্থক করিয়া দেয়। যাহারা কেবলমাত্র পুরুষ-কারের সাহায্যেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চায়, তাহারা যেমন ভ্রান্ত, আবার যাহারা কেবল নিশ্চেষ্ট হইয়া সাধনা না করিয়া শুধু কৃপার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে, তাহারাও তেমনি মুগ্ধ। পুরুষকাররূপ সাধনের প্রজ্বলিত অনল শিখায় দহিয়া দহিয়া চিত্তকে বিমল করিতে হইবে, আত্ম-সামর্থ্যের চরম শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে, তবেই সাধকের সাধনাকে সিদ্ধ করিয়া নামিয়া আসিবে সিদ্ধি, আত্মশক্তিকে জয়যুক্ত করিয়া নামিয়া আসিবে ঋদ্ধি।

আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি যেমন ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে, তেমনি জাগতিক সিদ্ধি নির্ভর করে প্রকৃতির কৃপার উপর। তাই আজ দেখিতেছি, যাহারা জড়া প্রকৃতির উপাসক, ইহ সংসারে তাহারা সিদ্ধি-ঋদ্ধি লাভ করিয়া মরজগতে ঈশ্বরত্বের অভিনয় করিতেছে, আবার যাহারা ভগ-বদভিমুখী হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহারা অমর জগতের মহাপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ ইহ জগতে নিঃস্ব অনাদৃত হইয়া দুঃখের দহনে জলিয়া পুড়িয়াও আধার শুদ্ধি করিতেছে। যাহারা প্রবৃত্তির সাধক তাহারা বহির্ম্মুখ, যাহারা নিবৃত্তির সাধক তাহারা অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ হওয়াই ভারতের সাধনা, অতএব স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপাত মনোরম পরধর্ম্মের অনুসরণ ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। যদি ভারতের কোন দিন উন্নতি সম্ভবপর হয় তবে তাহার চিরানুষ্ঠিত চির-প্রবর্ত্তিত এই নিবৃত্তি মার্গের সাধনে,—স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে।

যাহা হউক এতাবৎ যতদূর আলোচিত হইল তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে প্রকৃতির অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া পরম পুরুষে আত্ম-নিবেদনরূপ কর্ম্মই প্রকৃত পুরুষকার, আর সেই পুরুষকারকে সার্থক করিয়া তুলে ভগবৎকৃপা। নিষ্কাম কর্ম্ম, বিবেকজ্ঞান এবং ভগভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনের সমন্বয় ঘটিলেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আপন মায়া সরাইয়া লন, জীবকে আর তাহার অধীন না রাখিয়া আপনি তাহার অধীন হন। তখন পুরুষ স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া পরম পুরুষের প্রেম সাগরে চিরতরে নিমগ্ন হইয়া যান, চিরতরে তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণার লয় হইয়া যায়; ইহাই শান্তি, ইহাই মুক্তি, ইহাই নির্ব্বাণ!

শ্রাবণে

আজি শ্রাবণের ঘন বরষায়—
চিত্ত কাহার আগমনাভাসে ভরিয়া উঠিল ভরসায় ?
কাহার করুণা পড়িল ঝরিয়া
বরষা-স্নিগ্ধ লাবণী মাখিয়া
কাহার মাধুরী প্লাবিয়া বিশ্বে মাধুরিমা ছবি দরশায় ?

আজি শ্রাবণ-মেঘল-গগনে—
পূর্ণ ইন্দু কেন রে ভাতিল রজত বিমল কিরণে ?
কেন রে আজিকে আলো ও ছায়ায়
রচিল শূন্যে এ কোন্ মায়ায়—
কেন বা বিশ্ব দুলিয়া উঠিল বিপুল দোদুল দোলনে ॥

আসিল কি তবে নামিয়া—
বিশ্বপরাণ ত্রাণ শকতি মায়ার কুক্ষি ভেদিয়া ?
জীব দুঃখ কাতর নয়নে
ঝর ঝর ধারা ঝরে অনুক্ষণে
করুণা গলিত হাসিতে কি তার জ্যোৎস্না উঠিল ফুটিয়া ?

ওগো সত্য এসেছে নামি—
মিথ্যা জগৎ ভ্রান্তি ঘুচাতে জেগেছে অন্তর্য্যামী।
ছুটাতে মোহ জাগাতে প্রাণ
টুটাতে ভ্রান্তি ফুটাতে জ্ঞান
রূপের মাঝারে জাগিয়া উঠেছে অরূপের রূপ খানি ॥

লহ লহ বরি তারে—
ভাসিয়া যে জন দুঃখহরণ তপ্ত নয়নাসারে—
ত্রিতাপদগ্ধ অন্তরে তব
ফুটাইতে হাসি স্নিগ্ধ অভিনব
অমৃতের বাণী বহিয়া আজিকে এনেছে তোমার দ্বারে-
(ওগো) বরণ করিয়া লহ না তাহারে ভকতি কুসুম হারে ॥

শিলং পাহাড়ে

"আজ চল Crinoline fallsটা দেখে, তারপর পাইন্ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যে নির্জ্জন-নিস্তব্ধ রাস্তা গিয়েছে সে পথে কিছুদূর বেড়িয়ে আসি। শিলং-এর এ দুটো জিনিষ আমার কাছে খুব ভাল লাগে যোগেশ! falls আর নির্জ্জন যায়গাগুলো। Falls এর অনবরত গুম্‌গুম্ শব্দ মনের বিভিন্নমুখী চিন্তা বা ভাবকে একমুখী করে দেয়, চিত্ত স্থির কর্‌তে হলে যে কোন একটা fallsএর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাক্‌লেই তার উপকারিতা বুঝতে পার্‌বে। বাজে গল্প আর আড্ডা না দিয়ে রোজই একবার শিলংএর এই solitary placeগুলো দিয়ে একবার বেড়িয়ে গেলে, আর fallsএর কাছে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে গেলে, দেখতে পাবে নিজের ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এক জায়গায় একটা কথা পেয়েছিলাম, হঠাৎ তা মনে হল—It is through your own soul that the voice of God speaks to you. কলরবের মাঝে আমরা ভগবানের বাণী কিম্বা প্রত্যাদেশের মর্ম্ম কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, চিত্ত যত স্থির হয় ভগবানের বাণীও নিজের মাঝে তত স্পষ্ট উপলব্ধি কর্‌তে পারা যায়। নির্জ্জন জায়গা মানুষ খুঁজে কেন? না, নির্জ্জন জায়গায় আত্মার মাঝে তাঁরই বাণী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তখন সেই বাণী কিম্বা উপদেশ অনুসারে চল্‌লে, জীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। এ সব শুধু মুখের কথা নয়, আজ ২।৩ দিন ধরে বেড়াতে এসে আমি বেশ উপলব্ধি কর্‌ছি এ সব। কাজেই তোকেও বল্‌ছি, সাংসারিক কর্ত্তব্য তো আছেই, মাঝে মাঝে একটু সময় করে এ সব জায়গায় এসে free lifeটাকেও enjoy করে যেতে হয়। আমাদের জীবনটা যেন শত বাঁধনে জর্জ্জরিত, এ থেকে যেন আমাদের কোন দিন নিষ্কৃতি হবে না। কিন্তু নির্জ্জন জায়গায় বেড়াতে বের হলে, কিম্বা fallsএর ধারে গেলে—আমাদের সত্যিকার জীবনের একটু আধটু পরিচয় পেতে পারি আমরা। এটা কোন বিশেষ কঠিন কাজ নয় —একটু ইচ্ছা থাক্‌লেই হ'ল। অন্য জায়গা থেকে শুধু শিলংএর scenery দেখবার দরুণ কত লোক আসে, আর তোদের এত সুযোগ-সুবিধা, তোরা থাকিস্ ঘরের জানালা বন্ধ করে বসে? যাক্, বেড়াতে তোর কিছু interest আছে দেখে আমি খুবই সুখী হলাম। তোকে নিয়ে রোজই একবার বেড়াতে বের হব। যাক্, আমাদের পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ফেরা যাক্। আমি বল্‌ছিলাম, চিত্ত স্থির কর্‌তে হলে এ সব solitary placeএ রোজ একবার করে বেড়িয়ে যেতে হয়। একটু চিন্তাশীলতা থাকাও চাই, তা না হলে নির্জ্জনে বেড়াতে গিয়ে অনেকেই সাত-সতের, আবোল-তাবোল চিন্তা নিয়েই সময়ের অপব্যবহার করে। আমি বলি ভাল সঙ্গী পেলে দু'জনে বিচিত্র প্রসঙ্গ করে বেড়াতে বের হলেও মন্দ হয় না। যাক্, আমি যতদিন আছি, ততদিন তো তোর কোন অসুবিধাই হবে না। দেখ্ যোগেশ, মুনি-ঋষিরা যে পূর্ব্বে পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াত তারও একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। আর কিছু

না, প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে মানসিক উন্নতির কত খানি সাহায্য করে তা তুই বুঝিস্? নির্জ্জনতার একটা মহান্ প্রভাব আছে, আর কিছু না হোক্, মনটাকে বাজে চিন্তার কবল হতে উদ্ধার করে, চিন্তায় উদাস করে দেয়। সাময়িক যেন মনটা কত উৰ্দ্ধ দিকে উঠে যায়। সকল জটিলতা কোথায় যেন নিমেষের তরে বিলোপ হয়ে যায়।"

যোগেশ।—সাধুদা, চল্‌তে চল্‌তে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। এখন চলুন এমন একটা জায়গায় উঠব যেখান থেকে সমস্ত শিলং সহরটারই একটা nice view পেতে পারেন। বেলা এখনো যথেষ্ট আছে। আস্তে আস্তে চলুন পাহাড়ের গা কেটে যে রাস্তা করা হয়েছে, তা দিয়ে ক্রমশঃ আমরা উপরে গিয়ে উঠি।

"হাঁ, ঠিক্ বলেছিস্ যোগেশ! আমি এমনি ২।১ দিন বেড়িয়েছি বটে, কিন্তু উপরে উঠে শিলংএর দৃশ্যটা কেমন দেখা যায় তা তো কোন দিন দেখি নি। ব্যস্, আর কোন কথা নাই—এখন চল এ পথ থেকে ফিরা যাক্—উপরে গিয়ে কিরূপ দৃশ্য দেখা যায়, তাই দেখি। কিন্তু বেলা তো বোধ হয় শেষ হয়ে এল প্রায়, তাতে কি সব ভাল দেখা যাবে?"

যোগেশ।—সাধুদা, এ সময় আসায় আপনি দুটা দৃশ্যই উপভোগ কর্‌তে পার্‌বেন। Electric light জল্‌বার আগে দেখবেন একরূপ দৃশ্য, আর light জল্‌লেই দেখবেন অন্যরূপ। অনেক উপরেই ত উঠলাম, ঐ যে উঁচু পরিষ্কার যায়গাটুকু আছে—চলুন ওখানে গিয়ে বসি। সেখান থেকে সব সুন্দর দেখাবে। আশে-পাশে দেখুন অনেকেই সান্ধ্য-ভ্রমণে এসে পাহাড়ের উপরে উঠে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ কর্‌ছে। দূরে দেখুন কতকগুলো খাসিয়া মেয়েও বসে বসে হাওয়া খাচ্ছে। ওদের ঘর এত উঁচুতেই। দেখুন পাহাড়ের মাথা কেটে কেটে, কেমন সুন্দর আলুর ক্ষেত করেছে। যে সব খাসিয়া এখনো শিলং সহরে নামে নি, ওরাই যেন কতকটা ভাল আছে, সহরে যে সব খাসিয়া আছে, ওরা দেখাদেখি বেশ ভোগ-বিলাস কর্‌তে শিখে ফেলেছে। তা ওদের কোন দোষ দিই না আমি।

"বাঃ, তাইতো রে যোগেশ, অমন সুন্দর দৃশ্য তো আমি দেখি নি। সমস্ত শিলং সহরটাই তো বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। টীনের ঘরগুলোকে কত ছোট এবং কতই না সুন্দর দেখাচ্ছে। ওই যে লাল রং দেওয়া টীনের ঘরগুলো আর wallগুলো তার সাদা চুণকাম করা বেশ এক সারিতে সাজানো—এরূপ যে কয় সারিই দেখছি, ও সব কি?"

যোগেশ।—ও সব হল, $\frac{1}{10}$ এবং $\frac{2}{8}$ Regiment এর ঘর।

"এখানে উঠে আমার কত কথাই যে মনে আস্‌ছে তোকে আর কি বল্‌ব?"

যোগেশ।—হাঁ সাধুদা, আমি তো আপনার সঙ্গে এসেছি দুটো কথা শুন্‌বার দরুণই। কোন দিন তো এরূপ সুন্দর কথা শুনি নি, আজ যেন এ সব কথা শুনে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

"দেখ্ যোগেশ, বেশী উঁচুতে উঠলেই বেদান্তের ভাব এসে পড়ে। সম্মুখের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন—"I am the monarch of all I survey!" আবার মনে হচ্ছে—আমিই তো সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সম্মুখের যত কিছু দৃশ্য সবই যেন আমি! আমার এই ক্ষুদ্র দেহটা যেন—সেই ব্যাপ্ত আমির মাঝেই একটা ক্ষুদ্র বিন্দু। কত আনন্দ যে পাচ্ছি। আমি যে কত বৃহৎ—উঁচু জায়গায় উঠলেই তার অনুভূতি আসে। নির্ব্বাণ কথাটারও প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি তা আজ বুঝতে পেরেছি। Nirvana is extinction of the ego-limitations,

but not of all possibility of manifestation, since it can be possessed even in the body. তাইতো ক্ষুদ্র-অহংকে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়াই হল জীবমুক্তি! আমাকে আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত করে দিলাম, আবার তারই মাঝে দেখতে পাচ্ছি—আমারই মত কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের অধিষ্ঠান। আমার ক্ষুদ্র অহং এর বিনাশ হল বটে, কিন্তু তাতেই আমার ব্যাপ্তি বোধ জেগে উঠল। ব্যাপ্তিজ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ দেখতে পাচ্ছি—আমার অনন্ত বিস্তৃত ব্যাপ্তির মাঝে কতই না অসংখ্য কোটী জীব খদ্যোতের মত জ্বল্‌ছে। কাজেই মনে হচ্ছে—ব্রহ্মও সত্য, জীবও সত্য। বৃহতের—ভূমার যেমন মূল্য আছে, অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র যে, তারও একটা value আছে। জগতের কোন কিছুই useless নয়। আমাদের অন্ধদৃষ্টি দিয়ে অর্থাৎ দৃষ্টি বহুদূর ব্যাপ্ত নয় বলেই, আমরা নিক্তির ওজনে কথা বলি। কিন্তু আসলে যে ব্যাপার তা নয়। বিবেকানন্দ বোধ হয় এইজন্যই আমাদের এই calculating egoটাকে মেরে ফেল্‌বার দরুণ এত জোর দিয়েছেন। বেদান্তের মতে স্বর্গ কি? The Vedantic heavens are states of light and the soul's expansion. নিজকে যত ব্যাপ্ত করে দিতে পার, ততই মুক্তির আস্বাদন পাবে। আমাদের মরণ কিসে, আমরা বদ্ধ হই কিসে—নিজকে ছোট ভাবি বলে। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

"এই যে হঠাৎ electric lightগুলো জ্বলে উঠল। বাঃ, উপর থেকে কি সুন্দর না দেখায়! জগতে যখন কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন, তখন যেমন তাঁর প্রভাবে এক সঙ্গে অনেকের ভিতর দিব্য জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এ-ও যেন তেমনি। আধার বিশুদ্ধ হলে, এমন করেই এক সঙ্গে শত শত জীব পূর্ণজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমি বলি, ভগবান আছেন কি নাই, তুই নাস্তিক কিম্বা আস্তিকই হয়ে থাকিস্, তাতে কি? আমি বলি ভিতরটাকে শুদ্ধ-স্বচ্ছ করে তোল, তারপর ভগবৎ মহিমা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তা আপনি উপলব্ধি করতে পার্‌বি।

"বেশী উপরে উঠ্‌লে সব একাকার হয়ে যায় না। এই তো দেখ, আমরা পাহাড়ের কত উঁচুতে উঠেছি, তবু electric lightএর প্রত্যেকটীকে কি স্পষ্ট দেখাচ্ছে। অনেকের ধারণা শেষ পর্য্যন্ত বৈচিত্র্য থাক্‌বে না, আমি বলি তার উল্টো। প্রত্যেকটী light প্রত্যেকটীর পূর্ণতা নিয়েই সুন্দর। সব একাকার হয়ে গেলে সকল প্রয়োজন কি সিদ্ধ হত? প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা, অথচ প্রত্যেকেই সমান দীপ্তি নিয়ে জ্বল্‌ছে। সাংখ্যের বহুপুরুষের কথা মনে হচ্ছে। অনন্ত কোটী মুক্ত জীব রয়েছে। সকলের উপরে উঠলে তাই আরও ভাল করে দেখা যায়, বুঝা যায়। সব একাকার হয়ে গেলে কি জগতের অমন সৌন্দর্য্য থাক্‌ত? জগতে বৈচিত্র্য আছে বলেই জগৎ মানুষের কাছে এক ঘেয়ে ঠেক্‌ছে না। জগৎ মানেই হল চঞ্চলতা; এই চঞ্চলতাই একদিকে অনন্তরূপের, অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কর্‌ছে। শুধু অচঞ্চলকে নিয়ে কি হত—তার সঙ্গে যদি চঞ্চলতা না থাক্‌ত?

"এই যে পাহাড়ে উঠেছি, এ তো স্থূল-শরীর নিয়ে। কিন্তু স্থূল শরীর নিয়ে তো আর সব জায়গায় উঠা যাবে না? পরিবর্ত্তন করতে হবে মনটার। এই দেহ দেহের জায়গাতেই পড়ে থাকবে, মনটা উঠে যাবে উচ্চস্তরে। মন যত উন্নত স্তরে উঠবে, জগৎ রহস্য বুঝতেও ততই আয়াস হবে। মানুষ যত নীচে পড়ে থ'কে, ততই মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। উপরে

উঠলে বৈচিত্র্য থাকে, কিন্তু ভেদ থাকে না। মনটাকে ঠিক করে ফেল্‌তে পার্‌লে, এই জগতে থেকেও মুক্তির আস্বাদন অনুভব করা যায়। "By deponting the physical life one does not disappear out of the movement, but only passes into some other general state of consciousness than material universe." কাজেই মনটাকে যত উর্দ্ধ-ভূমিতে রাখতে পারিস্ তারই চেষ্টা কর্। দেখ্, এ সব জায়গায় আস্‌লে মনেরও কত পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। এখানে এসে আজ যেন আমার ভিতরের ফোয়ারা খুলে গিয়েছে। কত কথাই মনে আস্‌ছে ; থাক্ সব কথা তো বুঝবি না, কাজেই নিজেই আজ নিজের উপলব্ধিতে বিভোর হয়ে থাক্‌ব। আর সন্ধ্যাও হয়ে এল, এখন ঘরের দিকে ফিরে যেতে হবে, সুতরাং পাহাড়ের উপর আর দেরী না করে চল এবার নীচে নেমে যাই। আজ যে আনন্দ পেয়ে গেলাম, তাতে একটা আকর্ষণ জন্মে গেল। যে কয়দিন শিলং আছি, তোকে নিয়ে রোজই একবার করে বেড়াতে বের হব।

"চেয়ে দেখ্ fog আস্‌ছে, আর দেরী করা চল্‌বে না ; এ দিকে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে, শিলংএর ঠাণ্ডা বাতাস হয়ত শরীরের পক্ষে অনিষ্টকরও হতে পারে। আমি—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" এর পক্ষপাতী। সুতরাং শরীরটার দিকেও নজর রাখতে হবে। কোন বিষয়েই উপক্ষাকে আমি কল্যাণকর বলে মনে করি না। আজ এই পর্য্যন্তই, কাল বেড়াতে এসে তোকে বাকী অনুভূতিগুলির কথা বল্‌ব।"

যোগেশ।—সাধুদা! আমরা তো প্রায়ই শিলং পাহাড়ে বেড়াতে বের হই। কিন্তু আমাদের মনে তো এ সব উচ্চ ভাব খেলে না। আপনার ভিতর কি করে এ সব ভাব খেলে ?"

"দেখ্ যোগেশ!—মনটাকে পরিষ্কার রাখলে কত কিছু উন্নত ভাবই এসে মাথায় খেলে। এ সব বড় শক্ত কথা নয়। সংসারে আছিস্, বড়ই কঠিন কথা বটে, কিন্তু তোর প্রাণে যখন একটা আকুলতা আছে, তখন সাংসারিক বন্ধনে তোকে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পার্‌বে না। আশীর্ব্বাদ করি, তোর ভিতরটাও দিব্যানুভূতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক্।"

বিচিত্র-প্রসঙ্গ

মুক্তির দুটী পথ। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব, আর তা না হলে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে জগৎ বিমুখ হয়ে 'কেবল' হয়ে থাকা। শক্তি ধর সকলের সঙ্গে সংমিশ্রণ করেও আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চল্‌তে পারে, দুর্ব্বল তা পারে না। সুতরাং অধিকারী বুঝে পথেরও বিভিন্নতা রয়েছে।

সাধারণ মানবের প্রকৃতির সঙ্গে নিদারুণ বিরোধ ; কারণ প্রকৃতি মানুষকে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে চলে। এইজন্যই প্রকৃতিবিমুখ হয়ে থাকাই কোন কোন মানবের জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রকৃতির অধঃস্রোতের প্রবল আকর্ষণে নিজের বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর

হবে না বলেই, কেউ কেউ পূর্ব্ব হতেই সাবধান হয়ে চলেন, অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেই তাঁরা চলেন, এবং ক্রমে তাঁদের মনে অসহযোগের পন্থাটাই আদর্শ বলে সুদৃঢ় হতে থাকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বা উচ্ছৃঙ্খল ভাবের চেয়ে এ ভাব শত গুণে শ্রেয়ঃ।

প্রকৃতি দুই অংশে বিভক্তা, পরা এবং অপরা। পরা প্রকৃতির সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে ভাব করতে গেলে প্রকৃতির অধঃস্রোতেই তলিয়ে যেতে হবে। এ দিক দিয়ে সাংখ্য বাদীর বিবেক-জ্ঞানকে শত মুখে প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না। যথার্থতঃ বলতে গেলে তাদের বিবেকজ্ঞানের লক্ষ্যও তাই। কয়জন মানুষ পরা প্রকৃতির সন্ধান পেয়ে দিব্য জীবন লাভ করেছেন? অধিকাংশ মানুষই প্রকৃতির অধঃস্রোতের দিকেই দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে প্রকৃতি-বিমুখ হয়ে থাকাই বরং কল্যাণকর। মানুষ প্রশ্ন করে থাকে, দূরে সরে গেলেই কি প্রকৃতির চিন্তা হতে মানুষ নিষ্কৃতি পায়? মানুষের মনে কি সেই সংস্কার নাই? তার উত্তরে বলব—মানুষের মনে অসংখ্য কামনা-বাসনা জাগে, কিন্তু ইন্ধন না পাওয়ায় দু'দিন পর দেখি তাদের সত্তাই নাই। সুতরাং প্রকৃতির আকর্ষণে সাময়িক হয়ত মানুষের মন বিচলিত হয়েও থাকে, কিন্তু কামনার ইন্ধন না পেয়ে কামনা আপনি মরে যায়। সুতরাং বিবেক-জ্ঞান মানুষকে মহা-বিপদ হতে রক্ষা করে বই কি? পরা প্রকৃতির সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত—আত্মরক্ষার দরুণ প্রকৃতিবিমুখ হয়ে থাকাতে কল্যাণ বই অকল্যাণ হয় না। মূলে সংযম এবং তপস্যা না থাকিলে, সহজ জীবনে গলদ না এসেই পারে না। কাজেই বৈদান্তিকের সহজ জীবনও যাদের আদর্শ তাদেরও বলে রাখি, মূলে সাংখ্যের বিবেকজ্ঞান অপ্রতিহত না থাকলে, লীলা করতে গিয়ে কিম্বা লীলা দেখতে গিয়ে আত্ম-বৈশিষ্ট্য হারানো কিম্বা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। আমাকে আমি ঠিক বুঝতে না পেরে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ না করে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করতে গেলে, প্রকৃতি কখনো কল্যাণের পথে উন্নত হতে সাহায্য করবে না। কেন না মানুষ বুঝে, প্রকৃতির লীলারও তারতম্য হয়ে থাকে। বিবেক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের কাছে প্রকৃতি অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি লজ্জাবনতমুখী হয়ে ফিরে আসে। কেন না প্রকৃতির আধিপত্য সেখানে কিছুতেই যে খাটবে না, একথা প্রকৃতি বেশ বুঝে। কিন্তু ভ্রান্ত মানবের উপর অপরা প্রকৃতির একচ্ছত্র আধিপত্য। শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন পুরুষের কাছে অপরা প্রকৃতি কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। কেন না অপরা প্রকৃতির দিকে তো তাঁর বিন্দু মাত্র আকর্ষণ নাই। অপরা প্রকৃতিকে জয় করে তাঁরা পরা প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছেন। এইজন্যই তাঁদের মন কিছুতেই নিম্নাভিমুখী হতে পারে না। একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র আছে, তা থেকে মন নিম্নে আর কিছুতেই আসে না।

আত্মবোধকে নিষ্প্রভ ক'রে জাগতিক আনন্দে যারা উন্মত্ত, তাদের চেয়ে তীব্র স্বাতন্ত্র্য বোধ নিয়ে যারা সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক তাহাদের শতগুণে বড় মনে করা উচিত। নিজের সম্বন্ধে নিবিড় অনুভূতি লাভ না করে, নিজেকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করে দিয়েও কোন লাভ নাই। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হয়েছে—আত্মানং বিদ্ধি, আগে নিজেকে ভাল করে জেনে নাও; একটা সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়ে নাও, তারপর যা খুসি তা করো। তখন কোন কিছুতেই আত্মানুভূতিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। আগে জীবনের কেন্দ্র পেয়ে নাও

তারপর পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ো। কেন্দ্রহীন জীবনের কোন মূল্য নাই। সাংখ্য বাদীর বিশেষ লক্ষ্যই হল জীবনের এই কেন্দ্রকে আবিষ্কার করা। এইজন্যই কেন্দ্রস্বরূপ "আত্মাকে" বা "আমি"কে যে সব আবরণ এসে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে সব আবরণকে এরূপ বিদ্বেষের চক্ষে দেখে থাকেন সাংখ্যবাদী। এদিক দিয়ে সাংখ্যবাদীকে নির্ম্মম বলা যেতে পারে। কিন্তু নির্ম্মমতায় যেখানে আত্মানুভূতির সাহায্য করে, সেখানে নির্ম্মমতাকেই যে বরণ করে নিতে হবে! আত্মীয় হয়েও যে অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কি প্রয়োজন?

আগে নিজের মাঝেই নিজকে পেতে হবে, তারপর বিশ্বময় ব্যাপ্তিবোধ। উপনিষদেও আছে "যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্ব-ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।" আগে নিজের মাঝে বা আত্মার মাঝে সব দেখতে হবে। তার পরে হল বাহিরের সকল বস্তুতে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা। উপনিষদের বাণীতেও আগে সংযমেরই ইঙ্গিত কর্‌ছেন। যা দেখছি, তাই-ই আমি—এ বলে তো শান্তি আস্‌ছে না। সুতরাং "আমি"র জ্ঞানকেই পাকা করে নিতে হবে। সাংখ্য আমাদের আত্মার নিবিড় অনুভূতি পাওয়ার দিকেই যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সাংখ্যই আমাদের অন্তর্ম্মুখী করলেন এসে। বাইরের জগৎ যে ভিতরেরই প্রতিবিম্ব মাত্র—এ কথা বুঝতে পেরেছি আমরা সাংখ্যবাদীর কাছ থেকেই। অন্তর্জ্জগতের সন্ধান দিয়েছেন সাংখ্যবাদী।

অন্তরের ধনকে বৃথা আমরা বাইরে খুঁজে মরছিলাম, সাংখ্য আমাদের সে পণ্ডশ্রম হতে নিষ্কৃতি দিলেন। প্রকৃতির রহস্য জান্‌বার দরুণ আমাদের দৃষ্টি বাইরের দিকেই সম্প্রসারিত ছিল, আমরা মনে করেছিলাম, বাইর থেকেই আমরা প্রকৃতির রহস্য বুঝতে পার্‌ব। কিন্তু প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই যে সমাধিগম্য—এ কথা এসে সাংখ্যই আমাদের প্রথম বলে দিলেন। অর্থাৎ বাইরে যাকে খুঁজে মরছি, তার সাক্ষাৎকার পেতে হলে যে আমাদের অন্তর্দ্দর্শী হতে হবে—এ কথাটা সাংখ্যবাদীরই উক্তি। বিবেকজ্ঞানে ক্রমশঃই আমাদের অন্তর রাজ্যের দিকেই নিয়ে চলেছে। "ভাল-মন্দ, সু-কু সবই আমি"—এটাও বৈদান্তিকের উক্তি বটে, কিন্তু এ কথা যিনি বলেন, তাঁর ভিতর সু-টাই দেখা যায়, কু আর দেখা যায় না; এখানেই মস্ত বড় পরীক্ষা! দিব্য-জীবনের সন্ধান যারা না পেয়েছে, তারা যদিও পরাপ্রকৃতি—অপরাপ্রকৃতিকে এক চক্ষেই দেখে বলে প্রকাশ করে, তবুও তারা অপরা প্রকৃতিদ্বারাই সতত প্রতারিত হয়ে থাকে।

চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার কর্‌লে সাংখ্যবাদীর এই প্রকৃতি-বিমুখীনতাকে দুর্ব্বলতা বলা সঙ্গত নয়। অপরা প্রকৃতির উপরই সাংখ্য-বাদীর বিদ্বেষ—পরা প্রকৃতির উপর নয়।

আমি বৃহৎ বলেই যেমন সামান্য ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতা আমায় স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না, তেমনি আমার 'আত্মজ্ঞান' সুদৃঢ় বলেই কোনরূপ ক্ষুদ্রতা এসে আমায় স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। নিজে বড় হয়ে গেলে, তুচ্ছতা তুচ্ছতার জায়গায়ই পড়ে থাকে, তাতে যে বড় হয়, তার কিছু আসে যায় না। আর যদি তত বড়ই না হওয়া গেল, তা হলেও দুঃখের কোন কারণ নাই, নিজকে বাঁচাবার দরুণ না হয় একটু দূরে সরে থাকা গেল। প্রকৃতির অধঃস্রোতে তলিয়ে যাওয়ার চেয়ে সাংখ্যবাদীর আত্মরক্ষার পথ শতগুণে শ্রেয়ঃ। জগতের কারও সঙ্গে যার বিরোধ নাই, তিনি পরা প্রকৃতির সন্ধানই পেয়েছেন, প্রকৃতির অধঃস্রোতে তলিয়ে যাবার বিন্দুমাত্র ভয় তাঁর

মনে নেই। সকলের সঙ্গে মিশলেও তাঁর আত্ম-বৈশিষ্ট্য কোথায়ও লোপ পায় না। সংযত হ'তে না পারলে প্রলোভনের আকর্ষণের বস্তুর সঙ্গে অবাধ মিলামিশাতে নিজের ক্ষতিরই বেশী সম্ভাবনা। মুখের উদারতায় চিত্তের যে মালিন্য, তা বিদূরিত হয় না; এই জন্যই অনেক সহজ-বাদীর অধঃপতন দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যেতে হয়।

সাধনার পরিপাকাবস্থাই সহজাবস্থা। সাধনা-হীন জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা—সহজাবস্থা নয়। নিজের সংযমশক্তিদ্বারাই অপরের মাঝেও পরা প্রকৃতির উদ্বোধন হয়। তখন অবাধ মেলামেশা তত ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু অপরা প্রকৃতির কবল হ'তে যেখানে কেউই মুক্ত নয়, সেখানে অবাধ সম্মিলনে পতন অবশ্যম্ভাবী।

গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায়, সাংখ্য-বাদীর জগতের প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই, নিজকে জানার দরুণই তার এত অফুরন্ত আকুলতা আর উদ্বেগ। আত্মাকে জানতে না পারলে, জগৎ জ্ঞানে আমার কি আসবে যাবে? মূলতত্ত্ব অবগত না হ'তে পারলে, শাখা-প্রশাখা দিয়ে কি হবে? সাংখ্যবাদী নিজের উপরই পীড়ন করছেন। নিজকে না জেনে জগতের সঙ্গে মিতালী করলেই বা কি হবে? এ জায়গাতেই সাংখ্যবাদীর মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে। আর অন্তরের এই অনির্ব্বাণ আকুলতা এবং বৈরাগ্যের প্রভাবেই সাংখ্যবাদীর কাছে অপরা প্রকৃতির দৌরাত্ম্য একদম লোপ পেয়ে গিয়েছে। আলোচনা করলে সাংখ্য-বেদান্ত উভয়েরই দোষ-গুণ ধরা পড়ে। মুখে মুখে বেদান্তের বড় বড় বুলি আওড়ানোর চেয়ে, নির্ব্বিকার উদাসীনের ভাব দেখানোর চেয়ে, ভিতরে বৈরাগ্যের তীব্র আগুণ প্রজ্বলিত করে জগতের সব কিছুকে যাচাই করে নেওয়া যেমন পৌরুষের কাজ, তেমনি আত্মোন্নতিরও শ্রেষ্ঠ পন্থা। না বুঝে, যাচাই না করে, নির্ব্বিবাদে যে সাংখ্যবাদী কিছু গ্রহণ করেন নাই, তাতে সাংখ্যবাদীর কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হয়নি কিছু। একরোখা ভাবে যে অনেকসময় ক্ষতি না করে, ভুল না হয় তা নয়, কিন্তু ভিতরে স্বাধীনতা এবং একাগ্রতার শক্তি থাকলে সে ভুল আপনি সংশোধিত হয়ে যায়। সকলকে যাচাই করে নেবার সাহস সকলের মাঝে নাই। সকলের সঙ্গে non-co-operation করে 'কেবল' হয়ে থাকাও কম মনের জোরের কাজ নয়। সাংখ্যবাদী ভিতরে একটা সুদৃঢ় ভিত্তি পায় বলেই জগৎ একদিকে আর সে একদিকে—তাতে তার বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। মিথ্যা থেকে সত্যকে বাছাই করে নিতে হলে, বিবেকজ্ঞান আর মনের বল এমনি থাকা চাই। ভাল মন্দের অতীত যিনি, তিনি এই জগতের আদর্শ নন, কেন না তাঁকে যে মানুষ ধরতেই পারবে না। ভাল মন্দের বিবেক-জ্ঞান যাঁর ভিতর আছে, যিনি মন্দকে ছেড়ে ভাল-কেই গ্রহণ করেন, তিনিই জগতের আদর্শ। কপিল মুনিকে এইজন্যই বোধ হয় আদিগুরুর আসন দেওয়া হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, সাংখ্য-পন্থা অবলম্বন ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিবেকজ্ঞানেই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা।

যাক্, আজ এই পর্য্যন্তই—এ নিয়ে আর্য্যদের আরও আলোচনা হবে।

রঘুনাথ দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে যে স্বরূপের হস্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিলেন, সেই স্বরূপের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্বরূপের পূর্ব্বাশ্রমীয় নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, জন্মস্থান নবদ্বীপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই তিনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু সে অতি গোপনে। তাই তিনি যে প্রভুর একজন অথবা বিশেষ একজন তাহা তখন কেহ জানিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাঘটিত যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট বড় শত শত ভক্তের নাম উল্লেখ করা আছে, কিন্তু পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের পর লক্ষ লক্ষ মহাজনের পদ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল একটীতে পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়—তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পুরুষোত্তম আচার্য্য অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। যথা :—

পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
গুরু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে লোক সেবা নাহি জানে॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ-প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করেন পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদরসম আর নাহি মহামতি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁহার উপর অভিমান করিয়া যেখানে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত নাই, এমন বারাণসী নগরীতে গিয়া স্বামী চৈতন্যানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর। অতঃপর তিনি স্বরূপ দামোদর নামেই পরিচিত।

অভিমান বশেই তিনি মহাপ্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার চিত্ত তাঁহাতেই সমর্পিত। কাজেই তিনি আর বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না, লোক মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল প্রস্থিতির সংবাদ পাইয়াই তিনি নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর আমরা স্বরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্য-লীলা পর্য্যন্ত তাঁহার সহচররূপে পাই। এই স্বরূপ চিরদিন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন, চিরদিন শয়নে-জাগরণে, সুখে-দুঃখে, প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি দাস-রূপে প্রভুর সেবা করিতেন, সখারূপে তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইতেন, মাতারূপে তাঁহাকে পালন করিতেন। প্রভুকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন,

শয্যায় শয়ন করাইতেন ও নানা রূপে রক্ষা করিতেন। প্রতি মুহূর্ত্তে সেবার নিমিত্ত স্বরূপের প্রয়োজন হইত, আর প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে পাওয়া যাইত।

প্রভু কৃষ্ণবিরহে কি মিলনে, যে ভাবে বিভাবিত হইতেন, অমনি স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া আপন মনোব্যথা ব্যক্ত করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রাধাভাবে বিভাবিত হইতেন, তখন স্বরূপকে তিনি ললিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এইজন্য বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহাকে ললিতার প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রভু ও স্বরূপ দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া এক চিত্ত হইয়া প্রেমের নিবিড় মালঞ্চে দ্বাদশ বর্ষ বিচরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রোদয়নাটক স্বরূপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন-

অহো রস ফলবান কৃষ্ণ ভগবান্।
তার রসাচার্য্য ভাব হইতে মূর্ত্তিমান॥
সন্ন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া।
অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপাযুক্ত হইয়া॥
সর্ব্বলোক দামোদর স্বরূপ বলেন।
প্রেম হইতে অপৃথক্ তাঁহারে মানেন॥

প্রভু গদ্‌গদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা তাহা বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। সে অপ্রাকৃত ভাষা, সে অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর, সে অপ্রাকৃত ভাব, সে অপ্রাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী, সেই দুর্ল্লভ প্রেম-সুধা, যাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল, তাহা ভোগ করিবার প্রধান অধিকারী স্বরূপ।

প্রভু দ্বাদশ বর্ষ গোপনে এই সমুদয় ব্রজের রস নিঙ্গড়াইয়া সুধা বাহির করিলেন, স্বরূপ সেই সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহা চিরদিনের তরে সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন।

—২৩খ

এই রসের চর্চ্চা জনতার মধ্যে হইত না, তাহা অতি গোপনে গম্ভীরায় রুদ্ধ দুয়ারে নিশীথে সম্পাদিত হইত। এই রস চর্চ্চা—এই সমুদয় অপ্রাকৃত ভাব, স্বরূপ তদীয় কড়চা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলেন, আর সঙ্গীতদ্বারা উহার জীবন্ত রূপ প্রদান করিলেন। স্বরূপ যদি দ্বাদশ বর্ষ মহাপ্রভুর সহিত বাস না করিতেন, তাহা হইলে প্রভু যে এত দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিত না। স্বরূপের সম্বন্ধে আর বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন, শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে, মহাপ্রভুর অবতারে মাত্র যে সাড়ে তিন জন পাত্র ছিলেন, স্বরূপ তাঁহাদেরই অন্যতম বা প্রধানতম। এই স্বরূপ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, তাহা স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক এ হেন স্বরূপের হস্তে রঘুনাথ প্রভু-কর্ত্তৃক সমর্পিত হইলেন। কাজেই রঘুনাথ যে অতীব সৌভাগ্যশালী তাহা বলাই বাহুল্য। পিতার সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রে বর্ত্তায়, সেইরূপ গুরুর আধ্যাত্মিক সম্পদ্ শিষ্যে সঞ্চারিত হয়—ইহা সাধন জগতের নিগূঢ় সত্য-বাণী। অতএব রঘুনাথও যে স্বরূপের যাবতীয় সম্পদের অধিকারী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি?—

স্বরূপের হস্তে সমর্পণান্তর রঘুর দেহের উপর মহাপ্রভুর দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি রঘুনাথের পথক্লান্ত ক্ষীণ কলেবর দেখিয়া গোবিন্দ দাসকে বলিলেন—"গোবিন্দ! অনাহারে ও পথশ্রমে রঘুনাথ বড়ই ক্লেশ পাইয়াছে। কয়েক দিন পর্য্যন্ত ইহার সন্তর্পণের জন্য তোমাকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে যথাসময়ে রঘুনাথ প্রসাদাদি পায়, তুমি সে বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখিও।" অতঃপর রঘুনাথকে বলিলেন—"রঘুনাথ! সমুদ্রে গিয়া স্নান করিয়া আইস, তদনন্তর জগন্নাথ দর্শন করিয়া এখানে

আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিও।" এই বলিয়া মহাপ্রভু মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এই কৃপা দেখিয়া ভক্তমাত্রেই রঘুনাথের ভাগ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রঘুনাথ মহাপ্রভুর আদেশক্রমে সমুদ্রে স্নান করিয়া আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন, অতঃপর গোবিন্দের নিকট পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তারপর—

প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল॥
এই মত রহে তেঁহো স্বরূপ চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তারে দিল পঞ্চ দিনে॥

রঘুনাথ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের আদর্শ,—রঘুনাথ তীব্র বৈরাগ্যের ঘন প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,—সহজে প্রাপ্ত—অপরের আনীত প্রসাদ অলসের মত আহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? গোবিন্দ দাসের দ্বারা আনীত প্রসাদ পাঁচ দিন গ্রহণ করিয়া রঘুনাথ মনে করিলেন—ত্যাগী বৈরাগীর পক্ষে এ প্রকার আচরণ শোভা পায় না। তাঁহার উদরের পরিতৃপ্তির জন্য একজন পরম ভক্তের শ্রম ও সময়ের অপব্যয় হইবে কেন? তাই রঘুনাথ ষষ্ঠ দিন হইতে গোবিন্দের আনীত প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া অতি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের নিয়মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিষ্কিঞ্চণগণ উদরের তৃপ্তির জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত করেন না। শ্রীক্ষেত্রবাসী এই শ্রেণীর ভক্তেরা সারাদিন ভজনানন্দে ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদিতে নিরত থাকিয়া রাত্রি দশ দণ্ড পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলী দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সেবকগণ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে সিংহদ্বারে কোন নিষ্কিঞ্চন অযাচক ভাবে প্রসাদের নিমিত্ত দণ্ডায়মান আছেন কি না তাহা দেখিয়া পরে পসারীর নিকট অবশিষ্ট প্রসাদান্ন রাখিয়া যাইতেন। কোন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত প্রসাদে বঞ্চিত না হয়, এ বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। রঘুনাথ ষষ্ঠ দিন হইতে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন, সন্ধ্যার পরে পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিতেন, রাত্রি দশ দণ্ডের পরে সিংহদ্বারে অযাচক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকগণ দয়াপরবশ হইয়া যে প্রসাদ দান করিতেন, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন। রঘুনাথ এই বৈরাগ্যপ্রধান নিষ্কিঞ্চনগণের আদর্শস্থানীয় হইলেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্যের পরম আদর্শ, নিরন্তর ভজনানন্দ পরায়ণ। যিনি যত ত্যাগী, মহাপ্রভুর তিনি তত অন্তরঙ্গ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ত্যাগের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি—

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্॥

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দের মুখে রঘুনাথের এই অযাচক বৃত্তির কথা শুনিতে পাইয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন—

"ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিব সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন ধারণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

এই যে মহাপ্রভুর উপদেশ, ইহা সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ত্যাগ পন্থী জনগণের জন্য। শুধু বৈষ্ণব বলিয়া নহে, যে কোন পন্থাবলম্বী হউন না কেন তাঁহাদিগকে এই উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেই হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও বলিয়া গিয়া-

ছেন—"ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।" শিশ্নোদরপরায়ণের যে কৃষ্ণ লাভ বা সত্যলাভ বা আত্মলাভ কিছুই হয় না, তাহা সর্ব্ব শাস্ত্র, সর্ব্ব মহাপুরুষ জলদ গম্ভীরস্বরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সহজ ভজনের দোহাই দিয়া ত্যাগ-ভোগের সমাবেশ ঘটাইতে চান, যাঁহারা কৃচ্ছ্রতাকে—ইন্দ্রিয়সংযমকে শাস্ত্রের অবাস্তর উপদেশ বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর এই অমূল্য উপদেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। মহাপ্রভুর যে কোন আচরণের উপর লক্ষ্য করুন, যে কোন উপদেশের উপর দৃষ্টিপাত করুন, কোথাও এতটুকু সংযমশিথিলতার ভাব পাইবেন না, সর্ব্বত্রই তাঁহার কঠোর নিয়ম। তথাকথিত গৌর পদাঙ্কানুসরণকারী বৈষ্ণবগণ এই উপদেশবাণী সতত স্মরণ রাখিয়া যদি ধ্যানমজ্জিত তাপসের ন্যায় এই সাধনায় বিভোর হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধনার বলে সমগ্র জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শুধু মুখে বৈষ্ণব বলিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না,—কার্য্যে-আচরণে সর্ব্বাবস্থায় বৈষ্ণবতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, সর্ব্বত্র এই নিয়মাধীনে চলিতে হইবে, তাহা হইলেই বুঝিব তিনি বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ রঘুনাথের জীবন কঠোর বৈরাগ্যধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ। এই আদর্শ অনুকরণ করিয়া যিনি আত্মজীবন গঠনে সমর্থ হইবেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই বৈরাগী, তিনিই ত্যাগী।

যাহা হউক শ্রীমৎ রঘুনাথ এইরূপে প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে নীলাচলে বাস করিয়া অযাচকবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভজনানন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভজনের পিপাসা উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল। যদিও রঘুনাথ দিবারাত্র সাধন ভজন লইয়াই পড়িয়া থাকিতেন, তথাপি তাঁহার মনে হইত যেন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এখনও স্থির হয় নাই, এখনও বুঝি তাঁহার সাধন পন্থা নির্ব্বাচিত হয় নাই। রঘুর মনের বাসনা একবার স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী উপদেশবাণী শ্রবণ করেন, তাহা হইলেই যেন তিনি কৃতার্থ হন, তাহা হইলেই যেন তাঁহার সব হইয়া যায়। কিন্তু রঘুনাথ শঙ্কা বশতঃই হউক অথবা প্রগল্ভতা বিবেচনা করিয়াই হউক নিজে মহাপ্রভুর সমক্ষে কোন দিন কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, হয় স্বরূপ নতুবা গোবিন্দের দ্বারা কহাইয়া তাহা সম্পাদন করিতেন। এ ক্ষেত্রেও হইল তাই। যখন রঘুর প্রাণে এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাব আসিয়া পড়িল, অথবা আপনার লক্ষ্য ও সাধন সম্বন্ধে যখন তাঁহার প্রাণে একটা প্রবল পিপাসা জাগিয়া উঠিল, তখন একদিন তিনি স্বরূপকে ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন—"আজ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে কেন তিনি আমাকে ঘর ছাড়াইলেন, আমার কর্ত্তব্যই বা কি?—এই সমস্ত উপদেশ আমি প্রভুর শ্রীমুখ হইতে শুনিতে চাই।"—শিষ্যবৎসল স্বরূপ অবসর মত মহাপ্রভুর চরণে রঘুর এই আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশ্য রঘুও সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপের কথার উত্তরে রঘুকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন—"রঘুনাথ! তুমি নিজের বিষয়ে এত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছ কেন? স্বরূপকে যখন তোমার উপদেষ্টা করিয়াছি, তখন তোমার আর চিন্তা কি? সাধ্যসাধনতত্ত্ব তাঁহার নিকটে শিখিবে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি সাধ্যসাধনতত্ত্ব স্বরূপ যত জানে, আমিও তত জানি না। তথাপি আমার উপদেশ শুনিতেই যদি তোমার এত আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, যদি আমার আজ্ঞাপালনেই এতাদৃশী শ্রদ্ধার উদয়

হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ কর, বলিতেছি :—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীমদ্‌রঘুনাথকে মহাপ্রভু সংক্ষেপে এই উপদেশ দিয়া বলিলেন—"সংক্ষেপে আমি তোমাকে এই সার-তত্ত্বোপদেশ বলিলাম, স্বরূপের নিকট ইহার বিস্তার জানিয়া লইও।"

প্রভু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন—

সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥

সাধ্য সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দান সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদরের বিশিষ্টতা অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে। বল্লভাচার্য্যের নিকট মহাপ্রভু কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"শ্রীস্বরূপদামোদরের নিকট আমি ব্রজের মধুর রসতত্ত্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছি। স্বরূপ দামোদর মূর্ত্তিমান্ প্রেম রস, আমি তাঁহার নিকট ব্রজের অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি।"—হইতে পারে এই উক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তের উচ্চাসন দানের জন্য, তথাপি স্বরূপ দামোদর যে প্রকৃতই রসতত্ত্ববেত্তা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই স্বরূপের হস্তেই মহাপ্রভু রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার আর পৃথকভাবে রঘুকে কোন উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি পাছে কিছু না বলিলে রঘুনাথ মনে ব্যথা পান, এইজন্য সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিলেন।—এক্ষণে এই কয়টী কথার বিস্তার করিলেই আমরা ইহার মধ্যে সাধকের উপযোগী সমস্ত বস্তুই আহরণ করিতে সমর্থ হইব।

মহাপ্রভুর প্রথম উপদেশই হইতেছে—গ্রাম্য বার্ত্তা শুনিবে না, গ্রাম্য বার্ত্তা কহিবে না।—এই গ্রাম্য বার্ত্তা শব্দের অর্থ বিষয় বার্ত্তা। বিষয় বার্ত্তা শ্রবণে, বিষয় বার্ত্তা কথনে চিত্ত বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে, অন্তঃকরণ মলিনতা প্রাপ্ত হয়—অতএব ইহা সাধন-পথের মহা বিঘ্ন স্বরূপ, অতএব ইহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

অলঙ্কার শাস্ত্রে "গ্রাম্য" শব্দের আরও একটী অর্থ আছে, যথা—"অশ্লীলামঙ্গলঘৃণ্যবদর্থং গ্রাম্যমুচ্যতে।" অশ্লীলতা ব্যঞ্জক, অমঙ্গল ব্যঞ্জক এবং ঘৃণা ব্যঞ্জক শব্দার্থই 'গ্রাম্য' নামে অভিহিত। এই ত্রিতয় সমন্বিত 'গ্রাম্য বার্ত্তা' সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। শ্রীমদ্ ভাগবতেও লিখিত আছে—

গ্রাম্য গীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্ মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ॥
নৃত্যবাদিত্র গীতানি জুষন্ গ্রাম্যানি যোষিতাম্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ॥

বনচর যতি কখনও গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবেন না, এই গীত শ্রবণে যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা তাঁহারা ব্যাধ গীত মোহিত বদ্ধ মৃগের নিকটেই শিক্ষা করিবেন। উদাহরণ স্বরূপে বলিতেছেন—হরিণীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীদিগের গ্রাম্য গীত, বাদিত্র ও নৃত্য উপভোগ করিয়া তাহাদিগের বশতাপন্ন ও ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভুও সেই উপদেশের প্রতিধ্বনিস্বরূপে বলিলেন—"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।" মোটের উপর ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত যাবতীয় প্রসঙ্গই বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার কথাই মহাপ্রভু এই কথাদ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় উপদেশ—"ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না।" তিনি অতি সংক্ষেপে এই কথাদ্বারা সংসারত্যাগী বৈরাগীদের ইন্দ্রিয় বিলাস ভোগের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতও এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনোরসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্ বুদ্ধি মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥
ইন্দ্রিয়ানি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে॥
তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো নস্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবৎ জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥

অসদ্ বুদ্ধি ব্যক্তি প্রমাথিনী জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদনে বিমোহিত হইয়া বড়িশদ্বারা মীনের ন্যায় মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা রসনা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়-কেই শীঘ্র জয় করিতে পারেন। নিরাহার ব্যক্তির উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করে, সে পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না; রসনা জয় করিলে সকল ইন্দ্রিয়ই জয় করা হইল। অতএব ইন্দ্রিয় জয়ের নিমিত্ত রসনা জয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আবার ইন্দ্রিয় জয় না করিতে পারিলে সমস্ত সাধন ভজন বিফল, ইহাই শাস্ত্রের সার উপদেশ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎ কল্যাণার্থে সংক্ষেপে উপদেশ করিলেন—

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।"

তাঁহার তৃতীয় উপদেশ হইতেছে—"তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি। কি প্রকারে ভগবানের নাম করিলে প্রেমোদ্ভব হয়, এই শ্লোক তাহারই সাধন মন্ত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই শ্লোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে স্বরূপ ও রামানন্দকে বলিয়াছেন—

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
গ্রীষ্ম বর্ষা সহে আনেরে করয়ে পোষণ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে এই কথাগুলিই অতি সংক্ষেপে বলিলেন—"অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।" এই নাম করিতে করিতেই প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রেমের সঞ্চার হইলেই তখন যথার্থ ভজন আরম্ভ হয়। এই ভজন গোপীভাবে ভজন—অন্তরঙ্গ ভজন। অতঃপর তাই প্রভু কৃপা করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমদ্ রঘুনাথকে এই ভজনের সঙ্কেত উপদেশ করিলেন। যথা—

"ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"

এই ভজনের সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ উপদেশ—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্।
তত্তৎকথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

শরীরদ্বারা যদি ব্রজে বাস সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মনদ্বারা ব্রজে বাস করা কর্ত্তব্য। পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ, তদভাবে মনসাপীতি"—অর্থাৎ শরীরদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে বাস না ঘটিলে আমি ব্রজে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতেছি মনে এই চিন্তা করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ভজন কি? না কোন গোপীর অনুগ হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা পরিচর্য্যা করা। এই ভাবে ভাবিত হইয়া সাধন করিলে সাধকের অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ হইয়া থাকে।

যাহা হউক শ্রীমন্মহাপ্রভু সংক্ষিপ্ত হইলেও অতি নিগূঢ় ভাবব্যঞ্জক এই কয়টী উপদেশ রঘুকে প্রদান করিলেন। রঘুনাথ এই সংক্ষিপ্ত উপদেশেই কৃত কৃতার্থ হইলেন, তিনি ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভুও সাদরে তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—এবং পুনরায় তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥

অতঃপর রঘুনাথ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট অন্তরঙ্গ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তরঙ্গ সেবায় যে বিমল প্রেমানন্দ রসের সঞ্চার হয়, রঘুনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আনন্দ-চিন্ময় রসে সম্পুষ্ট হইয়া উঠিলেন। (ক্রমশঃ)

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পার্ব্বত্য সহর মাত্রেই জলকষ্ট বেশ!—এখানেও তাই, জল দূরে। দুটী ঝরণা আছে বটে, তাতে জলের কষ্ট দূর হয় না। শুনছি আজ কাল এখানে কলের জলের ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে যে হাসপাতালটী বিদ্যমান, সেটী সদাব্রত ফণ্ড হতে ১৫০০০৲ টাকায় প্রথম স্থাপিত হয়। গাড়োয়াল রাজ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ কতকগুলি গ্রামের রাজস্ব সর্ব্ব সাধারণের উপকারের জন্য দান করেছিলেন, তাকেই সদাব্রত ফণ্ড বলে। ঐ সদাব্রত ফণ্ড হতে কতক দেব সেবায়, কতক মন্দির সংস্কারাদিতে এবং কতক দরিদ্র যাত্রীদের সেবায় ব্যয় হয়ে থাকে।

এখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মন্দির তথা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির বিদ্যমান। যাঁরা বদরী নারায়ণ পর্য্যন্ত যেতে অসমর্থ, তাঁরা এখানেই লক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন করে ঘরে ফেরেন। পাণ্ডাগণ বলেন, এখানে লক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন কর্‌লেই, বদরী নারায়ণ দর্শনের ফল লাভ হয়ে থাকে। মন্দিরের সামনে গরুড় দেবের একটি মূর্ত্তি আছে।

পূর্ব্বে বলেছি, এই শ্রীনগরে গাড়োয়াল রাজাদের রাজধানী ছিল। বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত তথা স্কন্দ পুরাণে এই স্থান নাগ, হুন, কিরাতাদি দ্বারা অধ্যুষিত কেদারখণ্ড নামে অভিহিত ছিল। বর্ত্তমান রাজবংশ শালিবাহনের বংশধর বলে পরিচয় দেয়। স্কন্দ পুরাণের উত্তর ভাগের কেদারখণ্ডের প্রথম অধ্যায় হতে পনর অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ কর্‌লে এর পুরাবৃত্ত জানা যায়। এর প্রাচীন নাম শ্রীক্ষেত্র ছিল।

টিহরী হতে তিন মাইল যাবার পর **শিরকোট** চটী পাওয়া যায়। এ চটীটি বিশেষ বড় নয়,—থাকারও বিশেষ সুবিধা নাই, অগত্যা শ্রীমধুসূদন কর্‌তেই হয়।

শিরকোট
৩ মাইল

এখান হতে আরও দুই মাইল যাওয়ার পর **সুকরতা** চটী পাওয়া যায়। চটীটি অলকানন্দার তীরে অবস্থিত। এখানে অনেক কলাবাগান আছে। এখান হতে ক্রমোচ্চ পথে চলবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের দৃশ্যে মন-প্রাণ বিমোহিত হয়ে যায়।

সুকরতা
২ মাইল

এখান হতে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী **মহারাজ চটী** বা **সুস্থা** চটী পাওয়া যায়। এখানে জলের ঝরণা বেশ সুন্দর ও অনেকগুলি লহরদ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জল সিঞ্চন হয়ে থাকে।

মহারাজ চটী
বা সুস্থা চটী
১॥ মাইল

এখান হতে বরাবর চলে এক মাইল যাবার পর **ভট্টিসেরা** চটী পাওয়া যায়। এ স্থানে কয়েকটি দ্বিতল বিশিষ্ট বেশ বড় বড় চটী পাওয়া যায়। পার্শ্বেই সুন্দর জলের ঝরণা। একটি ছোট ডাকঘর তথা পানচাকী বিদ্যমান। এখান হতে চড়াই আরম্ভ হয়।

ভট্টিসেরা
১ মাইল

ক্রমোচ্চ চড়াই পথে আড়াই মাইল যাবার পর **ছটী খাল** নামীয় একটি ছোট্ট চটী পাওয়া যায়। এখানে একটি সরকারী বাংলা আছে। আজ কাল নাকি এখান হতে চটী

ছটী খাল
২॥ মাইল

উঠে গেছে। এখান হতে দুই মাইল পথ উৎরাই করার পর **খাঙ্করা চটী**।

খাঙ্করা
২ মাইল

এখানে পরিষ্কার জলের ঝরণা ও অনেকগুলি বেশ ভাল চটী আছে; দুধ যথেষ্ট মিলে। নিকটেই 'পট্টবতী' নদী অবস্থিত। পট্টবতী নদীর উপর সেতুদ্বারা পার হয়ে এক মাইল চড়াই করে আবার এক মাইল উৎরাই করার পর **নরকোটা** চটী। এখানে শ্রীশ্রীকালিকাদেবী বিদ্যমান। এ স্থানের নাম নরকোটা, তথা কালিকাদেবীর মন্দির বিদ্যমান থাকায় মনে হয়, পূর্ব্বে এক সময় কাপালিকগণ অনেক নরকে কেটে "স্বাহঃ" করেছিলেন বলে বোধ হয় এর নাম নরকোটা। বর্ত্তমানে এখানে দেবী নাই। ১৮৯৪ সনের বন্যায় তাঁর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। এখানে ৪।৫টি চটী, আহার্য্য ও জলখাবারের দোকান তথা পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে।

নরকোটা
২ মাইল

এখান হতে ক্রমোচ্চ সামান্য চড়াই পথে অল্প দূর উঠেই, উৎরাইয়ের মুখে গরুড় মহারাজের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাঁকে প্রণাম পূজাদি করে সাধারণ উৎরাই ও সমতল পথে চলে তিন মাইল পর **গুলাবরায় চটী।** নিকটেই সুন্দর জলের ঝরণা, এবং পাশের আম ও কলার বাগানে পথিকদের আনন্দ বর্দ্ধন করে থাকে, এখানে কয়েকটী চটী আছে। আহারীর জিনিষাদি মোটামুটি পাওয়া যায়, এখান হতে সিধা পথে দুই মাইল যাবার পর **রুদ্রে প্রয়াগ।** রুদ্র প্রয়াগের নিকট, অলকানন্দার উপর একটি লৌহ সেতু পার হতে হয়। রুদ্র প্রয়াগ একটি জংশন। এখান হতে একটি পথ গুপ্তকাশী হয়ে কেদারনাথ গিয়েছে। অন্য একটি পথ কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, চামেলী বা লালসাঙ্গা হয়ে বদরী নাথ গিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ হরিদ্বার হতে ৯৬ মাইল। এখান হতে কেদার নাথ ৪৮ মাইল, বদরীনাথ ৮৭ মাইল। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৯১২ ফুট উচ্চে অবস্থিত। অলকানন্দা বদরীনাথের উপর "সত্য-পথ" হতে জন্ম নিয়ে বদরীনাথ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, যোশীমঠ, লালসাঙ্গা বা চামেলী, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ এবং এই রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে দেবপ্রয়াগে যেয়ে ভাগিরথী গঙ্গাতে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়েছে। মন্দাকিনী গঙ্গা কেদারনাথের উপরিস্থিত চির-তুষারাবৃত স্বর্গারোহণ শিখর হতে জন্ম নিয়ে এখানে এসে অলকানন্দায় মিশে চির মুক্তির জন্য নিজের নাম লুপ্ত করে দিয়েছে। এটী অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল।

গুলাবরায়
৩ মাইল

রুদ্র প্রয়াগ
২ মাইল

পর্ব্বতকর্ত্তিত সোপনাবলী অতিক্রম করে সঙ্গমস্থলে উপনীত হতে হয়। সঙ্গম স্থানের ঠিক উপরেই শ্রীশ্রীরুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। কিম্বদন্তী যে মহর্ষি নারদ এখানে কঠোর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রুদ্রপ্রয়াগ কেদারখণ্ডের অন্তর্গত পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে অন্যতম। অন্য চার প্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগ আমরা পূর্ব্বেই হয়ে এসেছি। উপরে কর্ণ প্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ বিদ্যমান আছে। পাঠকদের ক্রমশঃ সে সব স্থানের বিবরণ পরে জানাব। এখানে পাঠশালা, তারঘর ডাকঘর, সরকারী বাংলা, সদাব্রত, সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। কেদারনাথ ও বদরীনাথ যাবার এই সঙ্গম স্থান। অলকানন্দার ধার দিয়ে বদরীনাথ ও মন্দকিনীর ধার দিয়ে কেদারনাথ যেতে হয়। এখান হতে গুপ্তকাশী ২৪ মাইল, কেদারনাথের ঠিক অর্দ্ধেক রাস্তা। আমি এখন পাঠকদের গুপ্তকাশীর পথের বিবরণ জানাব, কারণ আমরা

এখন গুপ্তকাশীতে আছি। বিশেষতঃ প্রত্যেক যাত্রীই প্রথমে গুপ্তকাশী হয়ে বদরীনাথ যেয়ে থাকেন, গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত পথের বিবরণ টুকু জানতে পারলেই, পাঠকগণের কেদারনাথের পথের বিবরণ পূর্ণরূপে জানা হয়ে যাবে। পরে যখন বদরীর পথে যাব, তখন বদরীর পথের বিবরণ সবিস্তার জানাব। প্রত্যেক যাত্রীকেই গুপ্তকাশী, ত্রিযুগীনাথ, কেদারনাথ দর্শন করে বদরীনাথ যাওয়া বিধি। না গেলে ফল সম্বন্ধে গোলযোগ হয়ে যায়। শাস্ত্রের প্রমাণ এইরূপ যথা :—

ততঃ কেদার ভবনং গচ্ছেৎ পাপাপুনত্তয়ে।
কেদারনাথং সংপূজ্য—গৃহীতাজ্ঞাং ততঃ সুধীঃ॥
কার্য্যং বদরীকেশস্য দর্শনং শুভদায়কম্।
অকৃত্বা দর্শনং বৈশ্য কেদারস্যাঘনাশিনঃ॥
যো গচ্ছেদ্বদরীং তস্য যাত্রা নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ॥
* * * * * (কেদারখণ্ড)

সঙ্গম স্থলে শ্রীশ্রীরুদ্রনাথ, নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর মহাদেব ও অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন ভগবান ত্রিপুরারি ভক্ত চুড়ামণি দেবর্ষি নারদকে এখানেই সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সর্ব্বদা হরিগুণ গানে মত্ত রেখেছিলেন। মোটের উপর নারদজীর সঙ্গে এ স্থানের বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। গয়রাজার যজ্ঞে পরশুরাম অসন্তুষ্ট হয়ে দুই লক্ষ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম-রাক্ষস যোনি প্রাপ্তের জন্য অভিসম্পাত দেন; সেই দুই লক্ষ ব্রাহ্মণ এই প্রয়াগে স্নান করে শাপমুক্ত হয়েছিলেন।

'মন্দাকিনী গঙ্গার বামপার্শ্ব স্থিত উৎকট চড়াই উৎরাই পথে ৪½ মাইল আসার পর **ছতোলী** চটী। নিকটেই একটি ঝরণা, তা ছাড়া চটীটিও বেশ বড় চটী, ১২।১৪ জন চটীবালা আছে। এখানে থাকার বেশ সুবিধা। এখান হতে দেড় মাইল দূরে **মঠিয়ানা** চটী। এখানেও ১০।১২ জন দোকানদার, জলেরও বেশ সুবিধা। অনেক লোক এখানেও আড্ডা নিয়ে থাকে। এখান হতে এক মাইল দূরে **রামপুর চটী।** এখানে ত্রিপুরেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন। ৮।১০টী দোকান আছে। এখান হতে চার মাইল দূরে **অগস্ত্যমুনি** চটী।

(ছতোলী ৪॥ মাইল)
(মঠিয়ানা ১॥ মাইল)
(রামপুর ১ মাইল)
(অগস্ত্যমুনি ৫ মাইল)

চটীটি মন্দাকিনীর বাম কূলে অবস্থিত। অগস্ত্যমুনি এখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে স্থানটি তাঁর নাম চিরজীবি রাখার জন্য তাঁর নামেই বিখ্যাত হয়ে নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করছে। ১০।১২টি অশ্বত্থ গাছ বেশ বেদী বাঁধান। এ ছাড়া ধর্ম্মশালা, সংস্কৃত বিদ্যালয়, নারদ ও গণেশের মূর্ত্তি, ডাকঘর, অগস্ত্যমুনি তথা শৃঙ্গীমুনির মূর্ত্তি, নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি, নবগ্রহের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীগণের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। স্থানটী বেশ ভাল। প্রাঙ্গনের মধ্যে একটি ছোট স্তম্ভ। মন্দির হতে আধ মাইল দূরে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি বিদ্যমান। তার চেয়ে আরও দূরে কতকগুলি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশালা, সদাব্রত ও রুদ্রাক্ষের গাছ আছে।

এখান হতে আড়াই মাইল দূরে **সৌড়ী চটী।** নিকটে মন্দাকিনীর তীরে বাগানের ভিতর কলাগাছ ও পেয়ারা গাছের মধ্যে শিবমন্দির বিরাজিত। একটী পানচাক্কীও আছে। জায়গাটী বেশ সজীব—বাংলা দেশের মত। এখান হতে সমতল ভূমির উপর দিয়ে মন্দাকিনী গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে হয়। সামনেই চন্দ্রা নদী। একটি

(সৌড়ী চটী ২॥ মাইল)

সাধারণ পুলের উপর দিয়ে পার হতে হয়। সৌড়ী হতে দেড় মাইল দূরে **চন্দ্রাপুরী চটী।** নদীর নাম অনুসারে চটীর নাম হয়েছে।

চন্দ্রাপুরী ১॥ মাইল

স্থানটি সুরম্য। আম পেয়ারা কলাগাছে স্থানটিকে মনোরম করে রেখেছে। অশ্বত্থ ও বটগাছ দুটী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে যমলার্জ্জুন বৃক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চন্দ্রানদীটিও যেয়ে মন্দাকিনী নদীতে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়েছে। পার্শ্বেই শিবদুর্গার মন্দির। এখানের শিবের নাম চন্দ্রশেখর ভৈরব। অনেকগুলি চটী আছে, পানচাক্কীও আছে।

চন্দ্রাপুরী চটী হতে সমতল পথে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করলে **ভৌরী** চটী পাওয়া যায়। এখানে প্রায়ই লোক বাস করে না। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এখানে তপস্যা করেছিলেন। ভীমজীকে দর্শন করতে হয়। বলরামের মন্দির তথা ধর্ম্মশালাও আছে। এই ভৌরী চটী হতে ৩॥ মাইল দূরে **কুণ্ড চটী** অবস্থিত। এখানে কয়েক জন দোকানদার আছে। দেখার মত বিশেষ কিছুই নাই। এখান হতে আবার চড়াই আরম্ভ হয়। ২ মাইল চড়াই করার পর **গুপ্তকাশী।** গুপ্তকাশীর বিস্তৃত বিবরণ পাঠকদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি। গুপ্তকাশী হতে লালসাঙ্গা বা চামেলী জংশন ৩০ মাইল। লালসাঙ্গায় পৌছে বদরীনাথ যাবার পথ পাব—যে পথটি রুদ্রপ্রয়াগ হতে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ হয়ে লালসাঙ্গায় যেয়ে মিশেছে। সে পথের বিবরণ পরে জানাব।

ভৌরী চটী ৩॥ মাইল

কণ্ড চটী ৩॥ মাইল

গুপ্তকাশী ২ মাইল

—২৪শ

১৫ই আষাঢ় ৩০শে জুন বৃহস্পতিবার

প্রাতে মণিকর্ণিকাকুণ্ডে স্নান করে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় ফুল বেলপাতা চাপিয়ে প্রণাম প্রদক্ষিণ করে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে গুপ্তকাশী হতে বের হলাম। আজ আমাদের বের হতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কোন ক্ষতি নাই; কেন না আজ উখীমঠে যেয়ে থাকবো সঙ্কল্প ছিল। গুপ্তকাশী হতে উখীমঠে মাত্র আড়াই মাইল পথ কিন্তু চড়াই উৎরাই খুব। চামেলী বা লালসোঙ্গা ৩০ মাইল, বেশ মাইলষ্টোন আছে। গুপ্তকাশী হতে খাড়া উৎরাই পথে ১½ মাইল উৎরাই করে মন্দাকিনীর পারে ঝোলাপুলের পাশে পৌছলাম। যাঁরা কেদারনাথ হতে বরাবর উখীমঠে আসেন এবং গুপ্তকাশী যান না, তাঁরা গুপ্তকাশীর আগের চটী নালা চটী হতে খাড়া ২ মাইল উৎরাই করে এখানে এসে পৌছেন—যেখানে আমরা এসে পৌছেছি। কিন্তু নালা চটী হতে আসার চটীটি যদিও উৎরাই বটে, কিন্তু ভাল রাস্তা, ক্রমনিম্ন পথে আসতে হয়। গুপ্তকাশী হতে আসতে খাড়া উৎরাই করতে হয়, তাতে বেশ কষ্ট হয়। এ স্থানটি একটি জংশন বললেও চলে। এই মন্দাকিনীর পার হতে দুই দিকের অভ্রভেদী পর্ব্বত মালার দৃশ্যে তথা নিম্নস্থ মন্দাকিনীর খাদ দেখলে মাথা ঘুরে যায়—প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়—যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ দুইদিকে অভ্রভেদী পাহাড় দণ্ডায়মান, অথচ মন্দাকিনীর নীচে একদম চাপা—হাওয়া বেশী চলে না। মন্দাকিনী গঙ্গার উপর পূর্ব্বে যে সেতু ছিল, সেটী খুবই খারাপ ছিল। পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট একটি পাকা ঝোলা পুল (Suspension Bridge) তৈরী করে দিয়ে যাত্রীদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়েছেন। পুলটী ২৪৯ ফুট লম্বা, পুলের উপর চলবার সময় দুলে।

সে সময় মন্দাকিনীর জলের খেলা দেখতে বেশ আনন্দ লাগে। পুলটি পার হয়ে আবার খাড়া চড়াই করে যেমন ভাবে উৎরাই করে এসেছি, তেমনি ভাবে খাড়া চড়াই করে ১½ মাইল যাবার পর উখীমঠে পৌছলাম। এই চড়াইয়ের পথে একটা বিষয় দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে মনিরাম নামীয় যে কুলীটি ছিল, সে আমাদের পূর্ব্বে এই চড়াইয়ের অর্দ্ধেক পথে উঠে, বোঝাটি নামিয়ে, গুপ্তকাশীর দিকে দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে গান করছিল। এতদিন বেচারা আমাদের সঙ্গে থাকলেও কিন্তু তাকে কখনও গান করতে শুনি নাই।

উখীমঠ
২॥ মাইল

উখীমঠ গুপ্তকাশীর মতই পর্ব্বতের কোলে পরম রমণীয় স্থানে অবস্থিত। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই সারিবদ্ধ দ্বিতল গৃহ—নিম্নতলে দোকান, তাতে নানাপ্রকার কাপড়াদি, শুকনো মেওয়া আদি, এবং পার্ব্বত্য জিনিষাদি প্রায় সবই পাওয়া যায়। গুপ্ত-কাশীর মত এ স্থানটিও বেশ জমকাল, একেও পাহাড়ীরা সহর বলে থাকে। আমরা আজ উপরের তলে না উঠে, নীচের তলেই একটি ঘরে জায়গা ঠিক করে নিলাম। ঝরণায় তাড়াতাড়ি স্নান করে মন্দিরে দেবতা দর্শনের জন্য বের হয়ে পড়লাম। অতি নিকটেই চারি দিকে ঘেরা অনেকটা কেল্লার মত স্থানে কেদারনাথের রাওল মহাশয়ের মঠবাড়ী অবস্থিত। মঠবাড়ীতে প্রবেশের ফটকটি খুব জমকাল—বেশ বড় তথা নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত; দেখবার যোগ্য বটে! ফটকটার সমস্তই কাঠের তৈরী, তার উপর লাল ও কাল বর্ণের হাতিবালা কার্ণিশগুলি দর্শকের প্রাণে আনন্দ উৎপন্ন করে থাকে। ফটকটি পার হয়েই প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলাম। প্রাঙ্গনের চারিদিকে বিশিষ্ট যাত্রীদের থাকার ঘর—ধর্ম্মশালা নয়! সেই প্রাঙ্গনের মাঝখানে মন্দির। মন্দিরের মধ্যে মহারাজা মান্ধাতা এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ওঁকারে-শ্বর শিবের মূর্ত্তি বিরাজিত। ওঁকারেশ্বর মূর্ত্তির পাশে আরও অনেক মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। অন্য একটি কুঠরীতে অনিরুদ্ধ ও উষার মূর্ত্তি। বাণ রাজার কন্যা উষা অনিরুদ্ধের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় করে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু আজ কাল তাঁদের উভয়ের মূর্ত্তি এখানে নিয়মিতরূপে পূজিত হয়ে আসছে। অন্যস্থানে পঞ্চমুখ কেদারের মূর্ত্তি, অর্থাৎ শ্রীশ্রীকেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, মধ্যমেশ্বর ও কল্পেশ্বরের মূর্ত্তি বিরাজিত। এ ছাড়া শ্রীশ্রীগঙ্গা দেবী, প্রদ্যুম্ন মহারাজার মূর্ত্তি, কুন্তী, দ্রৌপদী, চিত্র-রেখা, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, চারি যুগের কালী, পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। উক্ত পঞ্চ কেদারের মূর্ত্তির মধ্যে দুইটী মুখ স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং তিনটি মুখ রৌপ্য নির্ম্মিত। প্রাঙ্গনের পশ্চিম দিকের একটি সংকীর্ণ পথের ভিতর দিয়ে খানিক দূর যেয়ে মহান্ত মহা-রাজের গদী পেলাম। রাওল মহারাজ উপস্থিত না থাকায় গদীতে শুধু তস্য প্রকাণ্ড 'তাকিয়া'ই সে স্থান অধিকার করে বিরাজিত আছেন। রাওল মহাশয় কেদারনাথের, শুধু কেদারনাথের নয়—পঞ্চ কেদার, ত্রিযুগীনাথ, গুপ্তকাশী ও এই উখী মঠের মালিক। শীতকালে উক্ত পঞ্চ কেদারের মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, তখন এখান হতেই উক্ত পঞ্চ কেদারের উদ্দেশ্যে পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পূর্ব্বেই বলেছি, এই উখী মঠকে পাহাড়ীরা সহর বলে থাকে। এখানে পোষ্টাফিস, পুলিশ ষ্টেশন, দাতব্য ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকান, হাঁসপাতালের পার্শ্বে একটি পরিস্কৃত জলের কুণ্ড, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাওল মহারাজগণের

সমাধিমন্দির, স্কুল, পাঠশালা আছে। কথিত আছে, পুরাকালে এখানেই বাণাসুরের বাসস্থান ছিল। এখানকার দোকানদারগুলি খুব খারাপ। যারা সদাব্রত নেয়, তাদের ত চটীতে জায়গা দেয়ই না, অধিকন্তু তাদের নিকট কাঠ বিক্রী না করায় তাদের প্রায় অভুক্ত থাকৃতে হয়। নিকটে জঙ্গল না থাকায়, তথা অত্যধিক বৃষ্টির জন্য সে সব যাত্রীদের (যারা সদাব্রতে চলে) বিশেষ কষ্ট হয়। আবার যারা তাদের নিকট কাঠ বিক্রী করে থাকে, তাদের নিকট অত্যন্ত বেশী দাম নিয়ে নেয়, যাতে তাদের অন্য জিনিষ বিক্রীর দরুণ যে লাভ হত, তা উঠে আসে। বাবা কালী কম্বলী বালার তরফ হতে সদাব্রতধারীদের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। চটীর পার্শ্বেই একটি বেশ ভাল ঝরণা আছে, আমরা সেই ঝরণায় অনেকে কাপড়াদি পরিষ্কার করে নিলাম।

স্থানটি অতি সুন্দর বলে তথা গুপ্তকাশীর চেয়েও আমাদের কাছে ভাল মনে হওয়ায়, আজ আমরা মাত্র আড়াই মাইল এলেও, এখানেই থাকা স্থির করে নিলাম। বিকেল বেলা হাসপাতাল পর্য্যন্ত বেড়াতে যাই। হাঁসপাতালটি ছোট—একদম সহরের বাইরে খোলা জায়গায় অবস্থিত—স্থানটি বেশ ভাল। সন্ধ্যেবেলা পুনরায় মন্দিরে যেয়ে আরতি দর্শন করে আসি। আমরা যখন বিকেলে হাঁসপাতালের সামনে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দেখতে পেলাম তার সামনা দিয়ে একটি ঝরণা গোছের অতি ক্ষুদ্র নালা, আর সেই নালাতে অপর্য্যাপ্ত কচু গাছ। তা দেখতে পেয়ে আমরা অনেকগুলি কচু গাছ তুলে আনি। কচুগাছগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিল। সেই কচুশাক দিয়ে আজ রাত্রিবেলা পরিতোষের সহিত সঙ্গীয় সকলে ভাত রুটীর সদ্ব্যবহার করলাম। স্থানীয় লোক কচুশাক খায় না—তারা জানে ঐটী বিষাক্ত গাছ। আমরা যখন খাচ্ছিলাম, তখন তারা অবাক হয়ে দেখছিল।

পঞ্চ কেদারের মধ্যে দ্বিতীয় কেদার **শ্রীশ্রী মধ্যমেশ্বর** দর্শন করতে হলে এখান হতেই যেতে হবে। কিন্তু উক্ত পথে কোন চটী বা ঘর নাই। কেউ কেউ বলেন, পথে মনসুনা, রাংসী, গোণ্ডার নামক তিনটী গ্রাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে খাবার, থাকার কোন বন্দোবস্ত নাই। —খাবার জিনিষাদি সব সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

মধ্যমেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণন

স্থানীয় লোকও একটি সঙ্গে রাখা দরকার—যে মধ্যমেশ্বরের রাস্তা জানে। উখীমঠ হতে ঈশান কোণে ১৮ মাইল দূরে (কারও কারও মতে ৩০ মাইল) মধ্যমেশ্বর বিরাজিত আছেন। শীতকালে সে মন্দিরও বন্ধ হয়ে থাকে, তখন এখান হতে উদ্দেশ্যেই পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। মধ্যমেশ্বরও জীবগণের সর্ব্ব পাপ নাশ করে জীবগণকে শিবলোক প্রাপ্ত করিয়ে দিয়ে থাকে বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে।

> কেদারং মধ্যমং তুঙ্গং তথা রুদ্রালয়ং প্রিয়ম্।
> কল্পকং চ মহাদেবি সর্ব্ব পাপ প্রণাশনম্ ॥

হে মহাদেবি ! কেদারনাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, প্রিয় রুদ্রনাথ এবং কল্পনাথ সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশকারী।

> যস্যা দর্শনমাত্রেণ নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
> সরস্বত্যাং নরঃ স্নাতো ন চ ভূয়োঽভিজায়তে ॥

মধ্যমেশ্বরের অবস্থিতা সরস্বতী গঙ্গার দর্শন মাত্রেই যাত্রী পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং যে যাত্রী ঐ সরস্বতী গঙ্গাতে স্নান করে, সে জন্মের হাত হতে মুক্তি লাভ করে থাকে।

> শতবংশ্যাঃ পরাঃ পূর্ব্বে শতাবংশ্যা মহেশ্বরি।
> মাতৃবংশ্যাঃ শতং চৈব তথা শ্বশুরবংশকাঃ ॥
> তারিতাঃ পিতরস্তৈর্হিমোরাৎ সংসার সাগরাৎ।
> বৈরত্র পিণ্ডদানাদ্যাঃ ক্রিয়াদিবিকৃতাঃ প্রিয়ে ॥

হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি এই তীর্থে পিণ্ডদানাদি করবে, সে ব্যক্তির শত পুরুষ পূর্ব্ব এবং শত পুরুষ উত্তর (পিছে) এবং মাতৃবংশ তথা শ্বশুরবংশের পিতৃপুরুষগণ ঘোর সংসারসমুদ্র হতে মুক্তিলাভ করে থাকে।

মধ্যমেশ্বর ক্ষেত্রে: হি গোপিতং ভুবনত্রয়ে।
তস্য বৈ দর্শনান্মর্ত্ত্যো নাকপৃষ্ঠে বসেদ্বিভুঃ ॥

ত্রিলোকের গুপ্তস্থানে মধ্যমেশ্বর তীর্থ বিদ্যমান, তার দর্শনমাত্রেই মানব বিভু হয়ে স্বর্গে গমন করে থাকে।

* * *

কথানি

বেদবেদাঙ্গে পারঙ্গত এক ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে বাস করতেন। তিনি রূপবান্, গুণবান্, নিষ্ঠাবান্, দয়াবান্, চতুর তথা পুণ্যকর্ম্মে পারঙ্গত ছিলেন। তিনি পিতৃপুরুষগণের মুক্তির উদ্দেশ্যে মধ্যমেশ্বর দর্শন করতে বিধি অনুসারে যাত্রা করেন। যাবার সময় পথে যত তীর্থ, দেবদেবী, মুনীঋষি পেয়েছিলেন, প্রত্যেককে প্রণাম, পূজা, প্রদক্ষিণ আদি করে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে পরমপুণ্যভাবে শ্রীশ্রীমধ্যমেশ্বরের জপ ও ধ্যান করতে করতে যাত্রা করেন। শাস্ত্রে লেখা আছে যারা পবিত্র না হয়ে মধ্যমেশ্বর যাত্রা করে, তাদের উপর অকস্মাৎ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়ে থাকে। যথা—

অশুচির্যোঽভিগচ্ছেৎ তৎক্ষেত্রে মধ্যমেশ্বরে।
অকস্মাদ্বৃষ্টিপাতো চৈ করকাহিনসংযুতঃ ॥
বজ্রপাতাদিকং চৈব জায়তে নৈব সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥

উক্ত ব্রাহ্মণ বিশেস পবিত্রভাবে মধ্যমেশ্বরে পৌছে তিন দিন নিরাহার তথা রাত্রি জাগরণ করে একাসনে মধ্যমেশ্বরের ধ্যান করেন; চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে উঠে ভক্তিপূর্ব্বক মধ্যমেশ্বরকে প্রণাম করে সরস্বতী নদীতে (এখানে সরস্বতী নদী আছে) স্নান করে বিধিপূর্ব্বক পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন। পরে ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ ও মধ্যমেশ্বরের প্রণাম ও নারিকেল আদি দ্রব্যে পূজন করতঃ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের যথাসাধ্য দক্ষিণাদি দিয়ে ঘরের দিকে রওনা হন। পথে এক অদ্ভুত আকৃতিধারী কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রহ্মরাক্ষসকে দেখে ব্রাহ্মণ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে যান এবং নিজের রক্ষার জন্য ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু উক্ত তপোযুক্ত মুক্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন করেই রাক্ষসের পাপের চতুর্থাংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং মোহ হতে মুক্ত হয়ে যায়। মোহ মুক্ত হয়ে জ্ঞান উদয় হওয়ায় রাক্ষস ব্রাহ্মণকে বার বার প্রণাম করে নানা প্রকার স্তুতি করে বলে যে আজ আপনার দর্শনে আমার মোহ ছুটে গেছে—পাতক নষ্ট হয়ে গেছে, আমি আপনার কৃপায় শিবলোক প্রাপ্ত হব। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কোন্ পাপের জন্য রাক্ষস হয়েছ, তোমার শরীরে এরূপ ব্যাধিই বা হয়েছে কেন? এখন আবার বলছ আমার দর্শনেই তুমি পাপমুক্ত হয়েছ, এ সবের কারণ কি? বিস্তার করে আমায় সব বল।"

রাক্ষস উত্তর করল, "আমি পূর্ব্বে বেদ বেদাঙ্গ পারঙ্গত ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং নানা প্রকার অপকর্ম্মের ফলে পাঁচ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ কষ্টভোগ করছিলাম। কিন্তু আপনার দর্শনেই পাপমুক্ত হয়ে গেছি।" এইরূপ বলবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মরাক্ষস ক্ষণকালের মধ্যেই ঐ শরীর ত্যাগ করে দিব্য শরীর, ত্রিশূল ও অর্দ্ধ চন্দ্রমা শিরে ধারণ করে কৈলাসে গমন করেন। ব্রাহ্মণ তার ঐরূপ দিব্যভাব হওয়ায় আশ্চর্য্য হয়ে মুখে আঙ্গুল দিয়ে ভাবতে থাকেন, অহো! এ তীর্থের এমন মাহাত্ম্য? এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, রাজত্ব, পুত্রাদিগেরও স্নেহ ত্যাগ করে মধ্যমেশ্বরের দর্শন করতে যাওয়া উচিত। (ক্রমশঃ)

২৫শ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩৯ | ১ম খণ্ড
সমষ্টি সং ২৬৮ | | ৫ম সংখ্যা

অমৃতাস্তে ভবন্তি

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন—
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুরূপে তাঁহার রূপ প্রতিভাত হয় না, চক্ষুদ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যাহারা তাঁহাকে হৃদয় ও মনদ্বারা হৃদিস্থিত বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি রূপের লীলা! আকাশের গায়ে নীলিম রূপ, সূর্য্য-চন্দ্রের বুকে জ্যোতির্ম্ময় রূপ, বৃক্ষলতার কোলে শ্যামল রূপ, সর্ব্বত্র রূপেরই চটুল নৃত্যভঙ্গী। কামিনীর কমনীয় সৌন্দর্য্যে,

শিশুর স্মিত স্নিগ্ধ হাস্যে এই রূপেরই খেলা। এই রূপ দেখিয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, এই ক্ষণিকের আবেশেই অবশের মত আত্মদান করিয়া বসি।

যে রূপ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, সে রূপ কি দৃশ্য বস্তুর স্বকীয় রূপ, অথবা কোন অদৃশ্য রূপীর বিভূতি ? ইহার উত্তরে সত্যদর্শী বলিবেন—যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু তোমার দৃশ্যের মধ্যে পড়িতেছে, সবই অনন্তের সান্ত রূপ, অব্যক্তের ব্যক্ত রূপ। ওই শোন, বৈদিক ঋষির কণ্ঠ মথিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য অমৃত বাণী—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

এই বিশ্ব জুড়িয়া তাঁহারই রূপের লীলা-বিলাস ; দৃশ্য বস্তু মাত্রেই তাঁহার ব্যক্ত রূপ—তাঁহার বিভূতি ! কিন্তু এই রূপই তাঁহার শেষ নয়, এই রূপের অতীত স্বরূপেই তাঁহার অখণ্ড অরূপ রূপ বিরাজিত। আর সেই রূপই নিত্য, সত্য, শাশ্বত। তাহারই একাংশে এই খণ্ডিত রূপের ক্ষণিক প্রকাশ। তিনি স্ব স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও মায়াবলে পরিদৃশ্যমান এই জীবজগৎরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। এই দৃশ্য রূপে তাঁহার অনন্ত রূপের আভাস মাত্র পাওয়া যায়, প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই ঋষি বলিলেন—"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য।"

যাঁহার রূপের আভাস মাত্র লইয়া এই জগৎ জগৎরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মোহন আকর্ষণে জীবমাত্রকে আকৃষ্ট করিতেছে, সে যে নিজে কত সুন্দর, কত মধুর, তাহার কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। তাই সেই অনন্ত রূপের প্রস্রবণকে দূরে সরাইয়া জগতের ক্ষণিক রূপে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিনিয়তই আমরা আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিয়া বসি।

এই দৃশ্য রূপের অন্তরালেই তাঁর অরূপ রূপ চির বিরাজিত। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে এ রূপ দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। কেন না, এই চক্ষু দুইটী এমন ভাবে নির্ম্মিত যে ইহা দ্বারা শুধু বহির্জ্জগতেরই রূপ দেখা যায়, অন্তর্জ্জগতের সন্ধান সে দিতে পারে না। এই চক্ষুদ্বারা আমরা যাহা কিছু দেখি সবই খণ্ডিত,—খণ্ডের মাঝে অখণ্ডসত্তা দেখিবার উপযোগী সে নয়। কাজেই এই

জড় চক্ষু দিয়া চিন্ময়ের রূপ দেখিবার কল্পনাও আকাশ কুসুম! তাই ঋষি বলিলেন—"ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।"

তবে তাঁহাকে দেখিবার উপায়? তাহার উত্তরে সত্যদর্শী বলিবেন—তাঁহাকে দেখিবে কেমন করিয়া? ক্ষুদ্র অক্ষিগোলকে তাঁহার অনন্তরূপ ধরা পড়িবে কেন? যাঁহার কণাশক্তি পাইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের দর্শনেন্দ্রিয়ত্ব সার্থক হইয়াছে, তাহার শক্তি কি যে সে তোমাকে সেই শক্তিমূলের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়? বাহিরের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভরসা ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাকে বুক দিয়া হৃদয় দিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে; ইন্দ্রিয়বর্গের বহির্ম্মুখীনতাবৃত্তি নিরোধ করিয়া তাহাদিগকে অন্তরাভিমুখে প্রেরণ করিতে হইবে—তাহা হইলেই সেই এককেন্দ্রীভূত মনে—অন্তঃকরণে তাঁহার রূপের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে।

তিনি বাহিরে নন, তিনি তোমার অন্তরে; তিনি দৃশ্যরূপে নন, তিনি তোমার অনুভূতি রূপে। ভিতর ছাড়িয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছ বলিয়া, দ্রষ্টাকে ছাড়িয়া দৃশ্যে মজিয়াছ বলিয়া তিনি দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। এই বহির্ম্মুখী ভাব পরিত্যাগ করিয়া একবার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া যাও, দেখিবে তোমার আমিত্বকে কুক্ষিগত করিয়া তিনি তোমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। এই ভাবে তাঁহাকে হৃদিস্থিত বলিয়া জানিতে পারিলে, বুঝিতে পারিলে, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিলে, আর তোমার জানার কিছু থাকিবে না, পাওয়ার কিছু থাকিবে না; তুমি মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। তাই ঋষি বলিলেন- "হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনম্।"

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, দেখি শুধু মৃত্যুরই লীলা—পরিবর্ত্তনেরই প্রলয় নর্ত্তন। কাল যাহা দেখিয়াছি আজ তাহা নাই, আজ যাহা দেখিতেছি কাল তাহা থাকিবে না। এই জগৎ যে নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল! এই নিরন্তর ঘূর্ণায়মান কালের চক্রতলে পড়িয়া জীব কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে, কখনও বিভীষিকা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছে, কখনও বা আশার ক্ষীণালোকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। জীব স্ব-রূপে আত্মসমর্পণ না করিয়া বি-রূপের মাঝে ডুবিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার বুকের উপরে মৃত্যুর এই তাণ্ডব নর্ত্তন।

—নতুবা প্রকৃত পক্ষে সে অমৃতের সন্তান, অমৃত! যদি এই পরিদৃশ্যমান বি-রূপ ছাড়িয়া সে আবার স্বরূপের দিকে প্রধাবিত হয়, বাহিরের আশা ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ত্যাগ করিয়া নিষ্কলুষ হৃদয়ে শুদ্ধান্তঃকরণে সেই অরূপকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সে আবার অমৃত হইয়া যাইবে।

এই অমৃত স্বরূপত্বই জীবের স্বভাব;—এই অমৃত স্বরূপকে জানিতে পারিলেই অমর হওয়া যায়। তাঁহাকে জানা নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিয়া নয়, স্বার্থপঙ্কিল নীচ আমিকে রাখিয়া নয়,—এই সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া। কারণ ব্যক্তিত্ব বা আমিত্ব থাকিতে সমগ্রভাবে তাঁহাকে জানা যায় না। লবণপুত্তলিকা কি স্বীয় সামর্থ্যে সমুদ্র পরিমাপ করিতে সক্ষম হয়? কাজেই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে এই চিন্ময় সমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে, তাহা হইলেই তোমার স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে।

এই স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের একমাত্র পন্থা—তদ্‌গতচিত্ত হইয়া মন দিয়া তাঁহাকে জানা—হৃদয় দিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা। তাঁহাকে জানিলেই—তাঁহাকে উপলব্ধি করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর পাইলেই তাহা হওয়া যায়। তাই ঋষি বলিয়া উঠিলেন—যাহারা তাঁহাকে হৃদিস্থিত আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করে, তাহারা অমৃত হইয়া যায়—**"এবং যে বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"**

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

লোকে তাঁকে মহাপুরুষ বলে থাকে। তিনি নাকি বহু দিন ধরে বহুতর কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে বর্ত্তমান কালাবধি সনাতন ধর্ম্মের যত প্রকার সাধন-পন্থা উদ্ঘাটিত হয়েছে, শাস্ত্র-বিধানানুযায়ী নিজেকে সে সকল পন্থায় পরিচালিত ক'রে সর্ব্ব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন; সত্য বস্তু লাভ করেছেন। তাঁর নিজের আর জানবার কিছু বাকী নাই, পাবার কিছু বাকী নাই; তাই তিনি এখন 'গুরু' হয়ে আপন জীবনে উপলব্ধ সত্য আপামর সাধারণের মাঝে বিতরণ করছেন।

আমি তাঁকে উৎকট তপস্বী বা যোগীরূপে পাই নি, অলৌকিক সিদ্ধাইপূর্ণ শক্তিশালী সাধুরূপে পাই নি, পেয়েছি অতি সহজ মানুষরূপে, ছায়া মায়ার আবর্ত্তনের পরপারে অবস্থিত সত্য গুরু রূপে; তাই আজ অতি সহজ ভাবে তাঁর সম্বন্ধে অতি সহজ এবং অতি সত্য কয়েকটা কথা বলব।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বছরের কথা, যখন তিনি প্রথম গুরুগিরির ভার নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তখন দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়, ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা সাধারণের কাছে উপেক্ষিত—অনাদৃত। ভোগের আপাতঃ মনোরম দৃশ্যেই সকলে মুগ্ধ, হঠাৎ একদিনে বড় লোক হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় লুব্ধ। এই পরিদৃশ্যমান রূপ-রস-স্পর্শময় আনন্দের হাট থেকে কেমন ক'রে রূপ রসের যোগান পাওয়া যায় অতি সহজে, তাই ছিল তখনকার অধিকাংশের মতি। দেশের অবস্থা [illegible] এই [illegible] সেই সময়ই নেমে এলেন তিনি [illegible] থেকে এই [illegible] গুরুগিরির ভার নিয়ে। তিনি দেখলেন—দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থায় যদি তিনি ত্যাগ বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করেন, জগৎকে অনিত্য প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পান, তাহলে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষবে না; আর যদি কোন লোক তাঁর কাছে না-ই আসে, তাহ'লেই বা তাঁর উপলব্ধ সত্য সাধারণের মাঝে বিলাবেন কেমন ক'রে? তাই তিনি একটা উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি যে সমস্ত সাধন ভজন করেছিলেন, তাদেরই অবান্তর ফলস্বরূপ তাঁর যে সকল অলৌকিক শক্তি লাভ হয়েছিল, তিনি সেই সমস্ত শক্তিকে এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে লাগলেন। তাঁর অলৌকিক তপঃ শক্তি প্রভাবে কত নির্ধন ধনের সন্ধান পেল, কত নিঃসন্তান সন্তান লাভ করল, কত জটিল রোগজড়িত ব্যক্তি রোগ মুক্ত হ'ল; এই ভাবে তিনি দেশে একজন বড় সাধু ব'লে পরিচিত হ'লেন।

এই ভাবেই তাঁর দিন যেতে লাগল; ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই তাঁর কাছে অভীপ্সিত বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করতে লাগল, তিনিও তাদের যথেপ্সিত সাধনের ব্যবস্থা করতে থাকলেন। তিনি কাম-কামনা কলুষিত চিত্ত মানবের ঐহিক সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা এত বেশী প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাদের কাছে নিত্য বস্তু প্রসঙ্গোত্থাপনের অবকাশই পেয়ে উঠলেন না। হঠাৎ একদিন তাঁর গুরুদেব তাঁর নিকট প্রকাশিত হয়ে বললেন—"তোমাকে আমি ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণের জন্য বিশেষরূপে ভারার্পণ ক'রে এ দেশে

পাঠালাম, আর তুমি অবিদ্যা বিতরণ ক'রে বাঁধনের উপর বাঁধন কষ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছ? দূর ক'রে দাও এ সমস্ত অবস্তর মায়া, অবান্তর সিদ্ধাই! সত্যের যে নির্ম্মল জ্যোতি তোমার অন্তরে ফুটে উঠেছে, তারই প্রভায় তুমি কাম-কলুষিত চিত্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবের মোহ-অন্ধকার নাশ কর। কোন শক্তির তোয়াক্কা রেখো না, স্তুতি নিন্দার পারবশ্য স্বীকার ক'রো না, ব্রহ্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্ব্ব সাধারণ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ কর।"

* * *

তার পর কত বর্ষ অতীত হয়ে গিয়েছে, তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে স্তুতি নিন্দার কত প্রলয় প্লাবন বয়ে গিয়েছে, ক্ষীণ মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত কত সত্য মিথ্যার ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়েছে, তিনি কিন্তু অচল, অটল, নির্ব্বিকার। পূর্ব্বে যেমনটী ছিলেন তেমনটীই আছেন, দ্বন্দ্বের অভিঘাত তাঁর প্রশান্তিকে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করতে পারে নি। সেই সে দিন—যেদিন তাঁর গুরুদেব আবির্ভূত হয়ে উপযুক্ত শিষ্যকে মহান্ কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, সে দিন থেকে তিনি সমানভাবে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করে যাচ্ছেন। আগে যেমন মানুষ শুধু তাঁর কাছে ঐহিক ভোগ সুখ লাভের জন্য গতায়াত করত, তার পর থেকে তারা তেমনি ভাবে পারত্রিক সুখ এবং চরম শান্তি লাভের আশায় তাঁর শরণাপন্ন হ'তে লাগ্‌ল। এখন দিনের পর দিন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে এই শ্রেণীর লোকই।

যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে জগতে, তখনই সমাজে তিনটী দলের সৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাই। একদল স্বপক্ষ, একদল বিপক্ষ, একদল নিরপেক্ষ। স্বপক্ষের স্তুতিতে এবং বিপক্ষের নিন্দায় মুখরিত সমাজে নিরপেক্ষের অস্তিত্ব সহজে অনুমিত হয় না, কাজেই সাধারণতঃ লোক সমাজকে স্তাবক ও নিন্দক এই দুই শ্রেণীতেই ভাগ করা হ'য়ে থাকে। যখনই কোন মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব প্রকট হয়ে পড়েছে, তখনই একদল তাঁর মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছে, অপর দল হিংসাদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে তাঁর অটল সিংহাসন থেকে তাঁকে নামিয়ে আন্‌বার প্রচেষ্টা করেছে। যীশু বল, মহম্মদ বল, শ্রীকৃষ্ণ বল, শঙ্কর বল, শ্রীচৈতন্য বল কেউই এঁদের হাত থেকে রেহাই পান নি। তাঁদের জীবিতাবস্থায়ই এই অসুরকুলের আবির্ভাব ঘটেছিল, তার পর তাঁদের তিরোধানের পর সমগ্র জগৎ তাঁদের মহত্ত্বের গৌরবে মুগ্ধ হয়ে, তাঁদের মহাপুরুষত্ব স্বীকার করে নিয়ে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ নয়নাসারে বক্ষস্থল অভিসিঞ্চিত করছে।—এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের আদর বোঝে না। আমিও আজ যে মহাপুরুষের প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছি, তিনিও এই চিরন্তন নিয়ম থেকে অব্যাহতি পান নি। তাই দেখি তাঁর জীবনের পাশাপাশি দুই দলের বিপরীত অভিমত এবং মনোভাবের স্রোত সমান তালে বয়ে চলেছে। এক দল যেমন তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর পূজা করতে কুণ্ঠা বোধ করছে না, অপর দল তেমনি তাঁর সাধুত্বেও সন্দিহান হয়ে নানা বিরূপভাব প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এই যে তাঁর সম্মুখে দ্বন্দ্বের লীলাভিনয় চলেছে, এতে তাঁর চিত্তের বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ উপস্থিত করতে পারছে না, তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে সবই হজম ক'রে যাচ্ছেন।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥

গীতার এই [illegible] ভাবটী [illegible] মাঝে [illegible]

না দেখ্‌তে পেলে হয়ত আমার এ দম্ভাহঙ্কারের উচ্চ শির তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ত না, হয়ত আমার নিখিল দোষান্বেষী চিত্ত তাঁকে মহাপুরুষ বলে মেনে নিত না।

এখন আর তিনি কোন শক্তির বিকাশ করেন না, অলৌকি বিভূতিও প্রকাশ করেন না; তথাপি তাঁর মোহন আকর্ষণে তাঁর পায়ে ছুটে আস্‌ছে কত ত্রিতাপদগ্ধ জীব চির শান্তি পাবার আশায়। জীবনে একবার যে তাঁর সঙ্গ লাভ করেছে, একবার যে তাঁর অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ ক'রেছে, সে আর তাঁকে কোন দিন ভুল্‌তে পার্‌বে না। তাঁকে ভুল্‌তে পার্‌বেনা তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে নয়—তাঁর মাঝে পূর্ণ মানুষের সন্ধান পেয়ে।—সমুন্নত তাঁর দেহ, কমনীয় তাঁর কান্তি, স্নিগ্ধ তাঁর আলাপ, মধুর তাঁর চাহনি, স্নেহমাখা তাঁর ব্যবহার। ক্ষান্তি-মৈত্রী-করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন সদার তরে তাঁর অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়্‌ছে। এমন মানুষের মত মানুষ পেয়ে কার না ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়? তাই কোন্ সুশুভলগনে জানিনা তাঁর দেখা পেয়ে আমিও তাঁকে ভাল বেসে ফেলেছি। জানি না এ ভালবাসা সত্য না মায়া, কায়া না ছায়া!

তখন আমি কিশোর, যৌবনে তখনও পদার্পণ করিনি, বিদ্যালয়ের অধ্যার্থী মাত্র; সেই সময় তাঁর নাম শুন্‌লাম, নাম শুনে তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌ল, মনে হল—

"নামের পরশে যার ঐছন করিল গো সাক্ষাৎ দরশে কিবা হয়।"

কিন্তু তখন তাঁর কোন পরিচয় জানি না, তাঁর অবস্থিতি স্থানও আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, শুধু শুনেছি তিনি একজন সাধুপুরুষ। তার পর মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় একদিন তাঁর এক[illegible]ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমার হাতে পড়্‌ল, তাতে তাঁর ছবি [illegible] আনি মুগ্ধ হলাম, পুস্তক[illegible] পাঠ [illegible] পড়ে তদনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করার জন্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ কর্‌লাম। কিন্তু প্রতিপদে বাধা পেয়ে, প্রতি-কর্ম্মানুষ্ঠানে কটাক্ষের আভাস পেয়ে চিত্তটা বিষিয়ে উঠ্‌ল; আমি ছুট্‌লাম সেই পুস্তকলিখিত ঠিকানায় সেই মহাপুরুষের সন্ধানে। কত দিন পরে, কত অনাহার অনিদ্রায় কষ্ট স্বীকার করে এক দিন বাস্তবিকই এসে পৌছলাম তাঁর শ্রীচরণমূলে; আমার শ্রম সার্থক হল, জীবন ধন্য হল। মনে কর্‌লাম আর ঘরে ফির্‌ব না, আমার এ ক্ষুদ্র জীবন মহাপুরুষের কাজে উৎসর্গ করে মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর্‌ব। কিন্তু সংসারের প্রবল আকর্ষণ জোর করেই যেন আবার আমায় সংসারে টেনে নিয়ে গেল, আমি আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতেই তাদের অনুগমন কর্‌তে বাধ্য হলাম।

* * *

সংসারে ফির্‌লাম বটে, কিন্তু তাঁকে ভুল্‌লাম না, ভুল্‌তে পার্‌লাম না। অহর্নিশ তাঁর প্রোজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার নয়নের সম্মুখে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল, অহর্নিশ তাঁর অমৃতনিস্যন্দী বাণী আমার শ্রবণে ঝঙ্কৃত হতে লাগ্‌ল, অহর্নিশ তাঁর মধুময়ী স্মৃতি আমার স্মৃতিপটে উদিত হতে থাক্‌ল। কিন্তু জগতের নিয়ম—চির দিন সমানে যায় না। তাই সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে আমিও ক্রমশঃ সংসারভাবে বেশী আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লাম, ক্রমশঃ তাঁর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

এই ভাবে দু'বছর কেটে গেল, হঠাৎ একদিন চমক ভাঙ্গল, তাঁর জন্যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল, আমি ছুটলাম তাঁর শ্রীচরণে। আশ্চর্য্য! এত দিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা শুনা নাই, কোন চিঠি পত্রের আদান প্রদান নাই, তবু তিনি আমায় চিন্‌লেন, আদর ক'রে কথা বল্‌লেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি এখন কি করব?" তিনি বললেন—"তুমি যে কি করবে, তা আমি বলে দেব না, নিজেই তুমি তা ঠিক করবে, ঠিক ক'রে আমায় বলবে যে আমি এই পন্থা ঠিক করেছি; তখন আমি তোমার নির্ব্বাচিত পন্থাতেই তোমাকে পরিচালিত করব। যদি গৃহস্থ ভাবেই জীবন যাপন করতে চাও, তবে সেই ভাবের শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে তোমাকে আদর্শ গৃহী হবার পন্থা দেখিয়ে দেব; আর যদি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ক'রে জীবন অতিবাহিত করতে চাও, তাহলে সেই ভাবে তোমাকে গঠিত ক'রে তুলব। যে কোন পন্থা অবলম্বন কর না কেন, ঠিক ঠিক ভাবে চলতে পারলে উভয় পথেই সমান গতি লাভ হয়ে থাকে। এখন পন্থানির্ব্বাচনের ভার তোমার উপর। আমি উভয় পথেই তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

প্রকৃত পক্ষে তখন আমার চিত্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের দোদুল দোলায় প্রতিনিয়তই দুলছিল, দুটী পন্থার কোন একটী পন্থাকে আমি বিশেষভাবে আপনার ক'রে নিতে পারিনি, তাই আমার ওপরেই তিনি আমার পন্থা নির্ব্বাচনের ভারার্পণ করলেন, নিজ হতে কিছু বললেন না।

আসার সময় তিনি বললেন—"আমি এখন প্রায় সব সময়ে এখানেই থাকব, তুমি ত এ জায়গা থেকে অতি নিকটেই আছ, কাজেই সময় ও সুযোগমত মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।"

তাঁর এই স্নেহ-মধুর আহ্বান, এই অমায়িক ভালবাসার আকর্ষণ, ধূলিজাল সমাচ্ছন্ন সাংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও ভুলতে পারিনি, উপেক্ষা করতে পারিনি; তাই মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেছি, তাঁর অমৃতময়ী উপদেশ শ্রবণ করে এসেছি।—

একবার তিনি বললেন—"আজ কাল দেশের যেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে ধর্ম্মের অতি ক্ষুদ্র আচরণও ঘরে-বাইরে উপহাসের জিনিষ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে; অভিভাবকগণ হয় ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন প্রচেষ্টাকে ভণ্ডামী বুজরকী বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন, নতুবা ছেলে সাধু হয়ে যাবে এই ভয়ে শাসনের কঠোর দণ্ড পরিচালনা করছেন; আর যারা সহপাঠী বন্ধু শ্রেণীর তারা বন্ধুকে প্রচলিত পথের ব্যতিক্রমী জেনে "মহাসাধু" নামে অভিহিত করছে। এই অবস্থায় পড়ে—যাদের এ দিকে একটু আস্থাও আছে, তারাও পিছিয়ে পড়ছে। এখন উপায়?—উপায় হচ্ছে যত দূর সম্ভব বাইরের সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে ভেতরে ভেতরে নিজে প্রস্তুত হওয়া, আপন সাধন ভজনের অনুকূল অবস্থা লাভের জন্যে শ্রীভগবানের নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করা। ভগবচ্চরণে সরল ভাবে প্রার্থনা জানান সর্ব্বপ্রকার সাধকের পক্ষেই সমান উপযোগী।"

কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ভাবে আমি এখন দৈনন্দিন জীবন যাপন করব? আমার প্রতিকূল অবস্থার কথা তো আর আপনার অজানা নাই?"

তিনি বললেন—"আমি পূর্ব্বেই বলেছি, বাইরের সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে তোমায় চলতে হবে। খুব ভোরে ভগবানের নাম স্মরণ করে ঘুম থেকে উঠবে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই প্রার্থনা করবে—'ওগো দেবতা! কর্ম্মময় সংসার আমার সম্মুখে, কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘনীয় আহ্বানে এখনই আমাকে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে; তুমি বল দিও প্রাণে, বল দিও মনে, বল দিও দেহে; যেন নিষ্কলুষভাবে কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন ক'রে যেতে পারি, কর্ম্মের জটিলাবর্ত্তে পড়েও যেন তোমায়

ভুলে না যাই।' পূর্ব্বকালে আমাদের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ কর্‌বার সময় সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করে উঠবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কালের কুটীল প্রভাবে এখন সে সব লোপ পেয়ে গিয়েছে। যাক্ তুমি তোমার মনের ভাব প্রাণের ব্যাকুলতায় মণ্ডিত করে তাঁর পায়ে নিবেদন ক'রো, তাহলেই কাজ হবে। যে ভাষা দিয়েই তুমি তাঁর জয় গান কর না কেন, তার অন্তর্নিহিত ভাবটুকুই তাঁর কাছে পৌছাবে, ভাষা নয়; কারণ তিনি যে ভাবগ্রাহী! তার পর সমস্ত দিন তুমি তোমার কর্ত্তব্য ক'রে যেও, কর্ত্তব্যের যাতে ক্রটী না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখো; কেউ যেন তোমায় আচরণে ব্যবহারে মর্ম্ম পীড়া না পায়, আবার অপরের কোনরূপ কুটীল ব্যবহারও যেন তোমার চিত্তকে উদ্বেলিত কর্‌তে না পারে। সত্যকে অঙ্গের ভূষণ ক'রো, সংযমকে প্রাণের সহচর ক'রে নিও, সরলতাকে মনের স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করবার চেষ্টা ক'রো। যদি বাধা আসে, যদি বিঘ্ন আসে, আকুল প্রাণে 'জয় মা' অথবা 'জয় গুরু' মহা নাম উচ্চারণ ক'রো, প্রাণে বল পাবে, হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব হবে।—তার পর দিনশেষে—সমগ্র দিবসব্যাপী কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবসানে—শয্যা গ্রহণের সময় সমস্ত দিনের কার্য্যাবলী মনে মনে পর্য্যালোচনা ক'রো; দেখো কোথায় তোমার ক্রটী হয়েছে, কোথায় বিচ্যুতি ঘটেছে। তার পর সে সমস্ত আত্মকৃত ক্রটীর জন্যে তাঁর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ব'লো—'ওগো প্রভু! অপরিণতমস্তিষ্ক চঞ্চলমতি আমি, কর্ম্মের মাঝে চেষ্টা সত্বেও আজ এতগুলি ক্রটী হয়ে গিয়েছে; তুমি শক্তি দিও প্রভু, যেন তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে আমি সমস্ত [illegible] অতিক্রম কর্‌তে সক্ষম হই, ভবিষ্যতে যেন আর সে সকলের পুনরাবর্ত্তন না হয়।'—তার পর যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণ মনে মনে তাঁরই মূর্ত্তি চিন্তা ক'রো, তাঁরই নাম জপ ক'রো, অন্য কোন চিন্তা যেন চিত্তকে অধিকার করে না বসে।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা কর্‌ব আমি, কোন্ নামের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌ব?"

তিনি বল্‌লেন—"ভগবানের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ; যে যে-রূপেই তাঁকে চিন্তা করুক না কেন, যে যে-নামেই তাঁকে ডাকুক না কেন, সকল নাম সকল রূপ একই বস্তুকে লক্ষ্য কর্‌ছে বলে চরমে সকলের একই গতি, পার্থক্য কোন নাই। সকল নাম—সকল রূপের অন্তরালের তাঁর শাশ্বতী অরূপ রূপ বিরাজিত, কাজেই যে কোন নাম-রূপ অবলম্বন কর্‌লেই তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। কাজেই যার যে নামে রুচি হয়, যার যে মূর্ত্তি ভাল লাগে, সে সেই নাম রূপের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বে। এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই যে অমুক নাম বা অমুক মূর্ত্তিই অবলম্বন কর্‌তে হবে। তবে যে নাম-রূপ অবলম্বন কর্‌বে, তাতে যেন দৃঢ় নিষ্ঠা থাকে; নিষ্ঠা না থাক্‌লে আজ এ নামের আশ্রয়, কাল ও নামের আশ্রয়, এতে কোন ফল হয় না। এইজন্যেই সনাতন ধর্ম্মের প্রথম এবং প্রধান উপদেশ হচ্ছে ইষ্টনিষ্ঠা।"

আমি বল্‌লাম—"তাঁর কোন দৈবী মূর্ত্তির চিন্তা না করে মানুষী মূর্ত্তির চিন্তা কর্‌তে পারি কি না?"

তিনি বল্‌লেন—"হাঁ, সচ্ছন্দে পার্‌বে; তিনি তো মানুষ হয়েও মানুষের সঙ্গে মানুষ লীলা করে গিয়েছেন, কাজেই তাঁর দৈবী মূর্ত্তির চিন্তা আর মানুষী মূর্ত্তির চিন্তা উভয়েই সমফলপ্রদ হবে।"

আমি বল্‌লাম—"কোন মহাপুরুষকে তাঁর আসনে বসিয়ে পূজা কর্‌তে পারি কি না?"

তিনি বল্লেন—"তাও পারবে, কারণ মহাপুরুষের মাঝেও তাঁরই প্রকাশ, মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব পুরুষোত্তমের সত্তা ভিন্ন কিছুই নয়। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যে কোন মহাপুরুষেরই অনুধ্যান কর না কেন, যেন শুধু তাঁর বাইরের খোলসটা নিয়েই পড়ে থেকো না; তিনি যে সারসত্য জগতে প্রচার ক'রেছেন, আর সে সত্য লাভের যে পন্থা প্রকটিত ক'রে গেছেন, সেই পন্থায় চ'লে সেই সত্য লাভের প্রচেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁর যথার্থ স্মৃতিতর্পণ; নতুবা শুধু বাহ্যিক ভাবে তাঁর প্রতিকৃতির পূজা ক'রে, তিন সন্ধ্যা ধূপারতি আর চিনি কলার ভোগ লাগালেই কিছু একটা হয়ে যায় না, যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতে হয়। মোটের উপর আমি বাহ্যিক সাধনের চেয়ে আন্তর সাধনের উপর জোর দিতে বলি বেশী, কারণ তাতেই আত্মার মুক্তি সাধিত হয়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"মুক্তি কি?"

তিনি বল্লেন—"সকল দুঃখের অবসান এবং সুখ লাভ। সাধনার তারতম্যানুসারে আবার এই সুখ লাভেরও তারতম্য ঘটে থাকে, তাই আমাদের শাস্ত্রে মুক্তিরও প্রকার ভেদ রয়েছে। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি কর্ম্মজ; আর নির্ব্বাণ মুক্তি জ্ঞানজ। প্রথম চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে দ্বৈত জ্ঞানের লোপ হয় না, কাজেই আত্যন্তিক দুঃখেরও সম্যক্ নিবৃত্তি হয় না, আর দুঃখের লেশাভাস থাকলেও তাকে চরমতম মুক্তি কেমন্ ক'রে বলব? ধর একজনের স্বর্গলোকে গতি হয়েছে; স্বর্গ যে অফুরন্ত আনন্দের স্থান তা তো তোমাদের অজানা নাই, কিন্তু সুখ সেখানের অপর্য্যাপ্ত হ'লেও আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী তার ভোগের তারতম্য হয়ে থাকে; কাজেই পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্গগত জীব ইন্দ্রকে ইন্দ্রাণীসহ নন্দন কাননে বিহার করতে দেখে জ্বলে পুড়ে মরে; ভাবে, আমি যদি ঐ রকম সুখী হ'তাম! তাহলেই দেখ স্বর্গে গিয়েও তার যন্ত্রণার অবসান হ'ল না, বাসনাবিষে সে জর্জ্জরিত হ'তে থাকল। ঐ চার প্রকার মুক্তির সকল গুলিরই প্রায় এই রকম দশা, কোন না কোন দোষ সংস্পৃষ্ট বটেই; তবে চরমতম মুক্তি হচ্ছে নির্ব্বাণ মুক্তি। সে মুক্তিতে বাসনার লেশ নাই, কামনার গন্ধ নাই, দুঃখের পরশ নাই, আছে শুধু অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, আর অনন্ত আনন্দ! আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী অথচ প্রতি বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট, চৈতন্যময় আত্মাও তেমনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অথচ সকলিতেই অনুপ্রবিষ্ট। আকাশ যেমন যুগপৎ ঘট বা গৃহাদির অন্তর্ব্বহিঃ সমাচ্ছন্ন করে থাকলেও তদন্তর্গত হয়ে ঘটাকাশ বা গৃহাকাশরূপে প্রতিভাত হচ্ছে, তেমনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত মহান্ চৈতন্যময় আত্মাও সমস্ত বিশ্বের অন্তর্ব্বহিঃ সমাচ্ছন্ন করে প্রতি জীব-ঘটে জীবরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। আসলে ঘটাকাশ বা গৃহাকাশ যেমন অনন্ত আকাশ হতে পৃথক নয়, তেমনি জীবচৈতন্যও ব্রহ্মচৈতন্য হতে পৃথক নয়, একই পদার্থ। যে বস্তু ঘটাকাশকে অনন্ত আকাশ থেকে পৃথক্ করে রেখেছে তা হচ্ছে ঘট-দেহ, তেমনি যে বস্তু জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হতে পৃথক্ করে রেখেছে তা হচ্ছে জীবের অজ্ঞান বা দেহাত্মবোধ। এই দেহাত্মবোধের বিলোপ সাধন করতে পারলেই জীব যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই হয়ে যায়। অর্থাৎ সে তখন বুঝতে পারে—'এত দিন যে 'আমি'কে আমি একটী ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডস্থ বলে মনে করছিলাম, সেই 'আমি'ই যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে চরাচরে বিরাজিত রয়েছে! আমার আবার সীমা কোথায়? আমারই সত্তায় সকলে সত্তাবান্, আমি আছি তাই সকলে আছে। আমিই মানুষ, আমিই দেবতা,

আমিই ঈশ্বর, আমিই ব্রহ্ম।' যখন জীব এই জ্ঞানে উপস্থিত হয়, তখন তার কি আর কোন কামনা বাসনা থাকে? সে দেখে যে, সে-ই বিভিন্ন-রূপে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বস্তু ভোগ করছে; ভোক্তাও সে, ভোগ্যও সে, ভোগও সে। কারণ সে ছাড়া যে আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। সকলেই যখন তার সত্তায় সত্তাবান্, তখন কার ভোগ দেখে সে আর হিংসা করবে, কার সুখ দেখে ঈর্ষ্যায় সে জলে পুড়ে মরবে?

"অনেকে মনে করে নির্ব্বাণ অর্থে নিবে যাওয়া। তারা বলে—আমাদের যদি দেহেন্দ্রিয়ই না থাক্‌ল, তবে আমরা সুখ ভোগ করব কি দিয়ে? অমন নির্ব্বাণ অর্থাৎ নিবে যেতে আমরা চাই না। তারা বুঝতে পাবে না যে, যখন আমরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি, যখন আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কেমন ক'রে সুখ ভোগ করি, আনন্দ লাভ করি? ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দেহ-মন যে আমাদের আনন্দ লাভের মস্ত অন্তরায়, তা তারা বুঝে উঠতে পারে না। তারা চায় মৃত দিয়ে অমৃত আস্বাদন করতে, গণ্ডূষে সমুদ্র উদরসাৎ করতে। কিন্তু তাও কি কখনও সম্ভবপর? তাই বেদান্তের উপদেশ—নিজের স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করে দিতে হবে, যা নাকি অজ্ঞানসম্ভূত কাল্পনিক সৃষ্টি সেই মিথ্যা বোধের অবসান ঘটাতে হবে, তাহলেই তার ফলে অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়ে জীব জীবিতাবস্থায় জীবন্মুক্তি আর দেহান্তে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে কৃত কৃতার্থ হয়ে যাবে। আর চাওয়ার কিছু থাকবে না, পাওয়ার কিছু থাকবে না। এই মুক্তিই চরমতম মুক্তি, চরমতম লাভ, চরমতম শান্তি।"

* * *

আর একবার তিনি বললেন—"দেখ, মানুষ আজ কাল এমন ইহকাল সর্ব্বস্ব হয়ে পড়েছে যে, পরকালের চিন্তা পর্য্যন্ত তারা করে না, পরলোক যে আছে এ বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত অনেকে হারিয়ে ফেলেছে। এক এক জনের আয়ুতো মাত্র ৫০।৬০ বড়জোর ১০০ বছর। অনন্ত কালের তুলনায় যা নাকি কিছুই নয়। তথাপি তারা এ জগতে নিত্য বাস করতে এসেছে এই ভাবে বিভাবিত হয়ে ঐহিক কর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন ক'রে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ক'রে আপন প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পায়, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বিত্ত সম্পদ্ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বোঝে না যে একদিন সকলেই নিঃসম্বলে সব ত্যাগ করে কোন্ এক অজানা দেশে চলে যেতে হবে। যাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারের জিনিষ, তাঁরই অক্ষয় ভাণ্ডারে সব পড়ে থাকবে, মাঝখানে শুধু অহমিকার দাপটে সকলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা মাত্র। নিত্য চোখের সাম্নে কত লোককে মরতে দেখ্‌ছে, অথচ মনে করছে আমরা মরব না, আমরা এখানের স্থায়ী বাসীন্দা; এমনি আশ্চর্য্য!

* * *

তাঁর উপদেশে ক্রমশঃ আমার চিত্ত ত্যাগের দিকে ঝুঁকে পড়ল, অবসর মত সংসার থেকে বেরিয়ে পড়ব মনে মনে এই যুক্তি পোষণ করতে লগেলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাকে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবার উদ্যোগ আয়োজন চল্‌ছে, শীঘ্রই নাকি সে কাজ সম্পন্ন হবে। আমি চঞ্চল হয়ে পড়লাম; যা নাকি আমার চিরাভীপ্সিত পন্থা, বিবাহ যে তার কণ্টকস্বরূপ! আমি কেমন করে এই কণ্টককে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়ে দীর্ঘ জীবন বেয়ে চলব?—সংসার-ত্যাগে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে ছুট্‌লাম আমি এক নিঃশ্বাসে তাঁর শ্রীচরণোপান্তে।

সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত তরঙ্গমালা সমাকুল নীলিম অম্বুনিধি, পশ্চাতে ভুক্তি-মুক্তির সমন্বয় ক্ষেত্র

পুরুষোত্তম ধাম। এই উভয়ের সীমা রেখায় বালুকাময় বেলাভূমে বসে আমি আর তিনি।

তিনি বল্‌লেন—"কেন এসেছ?"

আমি বল্‌লাম—"গৃহত্যাগের অনুমতি নিতে। আপনিই তো বলেছিলেন পন্থাদ্বয়ের একটীকে দৃঢ়রূপে নির্ব্বাচন ক'রে আপনার পায়ে নিবেদন কর্‌তে; তার পর নাকি আপনি আমাকে সেই পথেই পরিচালনা কর্‌বেন। তাই আজ এসেছি সকলের আশা ছেড়ে নিবৃত্তি পথের পথিক হতে; অনুমতি করুন আশ্রমে চলে যাই, আপনার আশ্রম-কার্য্যে আমার জীবন উৎসর্গ করি।"

তিনি বল্‌লেন—"আমার ইচ্ছা, আরও দুটা বছর থেকে তার পর যেও। কারণ যে line ধরেছ, তাতো আর মাত্র দু'বছর হলেই complete হবে, কাজেই একটা দিক শেষ করে যাওয়াই ভাল, আর তাতে আশ্রমের কাজও বেশী হবে।"

আমি বল্‌লাম—"কিন্তু আমি যে আর থাক্‌তে পারি না, আমাকে সংসার বন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ কর্‌বার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন চল্‌ছে, আর অল্প কয়েকটা দিন থাক্‌লেই আমাকে বেঁধে ফেল্‌বে; বিবাহ করে একবার বাঁধা প'ড়ে গেলে কি আর তা থেকে মুক্ত হতে পারব?"

তিনি—বল্‌লেন—"তাহলে আমি আর নিষেধ করি না, তোমাকে আশ্রমে যেতে অনুমতি দিচ্ছি। দেখ, তোমার মনের ভাব তো তোমার অভিভাবকেরা সকলেই জানেন, তুমি যে বরাবর বিবাহের বিরোধী, তাও তাঁরা অবগত আছেন, তথাপি মহামায়ার এমনি মায়া যে তাঁরা এতদিন যে পথে চলে যে পন্থার অনুসরণ ক'রে এসেছেন—সে পন্থার জটিলতা এবং দুঃখাতিশয়তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেও—সেই পন্থাতেই আবার সন্তানকেও পরিচালনা কর্‌বার প্রয়াসী হচ্ছেন। জগতেরই নিয়ম এই, দোষ দিব কার? অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং ব্যাসদেব—যিনি বেদবিভাগকর্ত্তা, মহাভারত পুরাণেতিহাসের রচয়িতা মহামুনি, তিনিও স্বীয় পুত্র শুকদেবের গৃহত্যাগ সময়ে মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে সংসারী কর্‌বার জন্যে বহুবিধ প্রচেষ্টা করেছিলেন।"

অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে সংসার ত্যাগের অনুমতি পাওয়ায় চিত্ত আনন্দে ভরে উঠল, এত দিনে যে সংসার-মায়া কাটাতে পার্‌লাম এই চিন্তায় আমার মাঝে মুক্তির হিল্লোল খেলে গেল। তবে তাঁর একখানা যোগের বই পড়ে আমার ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তিনি হঠ-যোগের প্রণালীতেই তাঁর অনুবর্ত্তীদের পরিচালনা করেন, অথচ এই কয়েক বৎসর চেষ্টা ক'রেও একটা মুদ্রা বা প্রাণায়াম ঠিক্ ঠিক্ ভাবে অভ্যাস কর্‌তে পারিনি, খুবই কঠিন লেগেছে, তাই যোগসাধনভীতচিত্ত আমি তাঁকে সসঙ্কোচে বল্‌লাম—"আমি কিন্তু যোগ টোগ কিছু কর্‌তে পারব না।"

তিনি হেসে বল্‌লেন—"তা কেন কর্‌তে হবে? যোগ টোগ কি আর বাঙ্গালীর সাজে? বাঙ্গালীর দেহ মন কি আর যোগ সাধনের উপযোগী? বাঙ্গালা হচ্ছে প্রেমের দেশ, প্রেমের সাধনায় বাঙ্গালী যত সহজে সিদ্ধিলাভ কর্‌বে, অন্য কোন সাধনায় এত সহজে তা পার্‌বে না। বাঙ্গালার মানুষই যে প্রেমের উপদানে গড়া; এ দেশের মাটীতে প্রেম, জলে প্রেম, আকাশে প্রেম, বাতাসে প্রেম। প্রেমই বাঙ্গালী সাধনা, প্রেমই বাঙ্গালীর সাধ্য। তাই ভারতের অপরাপর স্থানে জ্ঞানের অবতার কর্ম্মের অবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নেমে এসেছিলেন এই বাঙ্গালারই মাটীতে; তাই প্রেমধন বাঙ্গালীর নিজস্ব। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ী পন্থাতে চল্‌লেই

এই প্রেম লাভ হয়ে থাকে। আমার নির্দ্দিষ্ট পন্থাও তাই, এই ত্রয়ীরই সমাহার। ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হয়ে শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে কর্ম্ম ক'রে যাওয়াই হচ্ছে আশ্রমের সাধনা।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

এই হচ্ছে আমার উপদেশ। এই পন্থায় চল্‌লে বুঝতে পারবে, এই কর্ম্মার্পণের মাঝে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে কেমন ক'রে জ্ঞান আর ভক্তি। এই জ্ঞান-ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই হচ্ছে প্রেম।"

একটু থেমে তিনি বল্‌লেন—"এখন তো বেশ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সংসার ছেড়ে চলছ, কিন্তু যতই দিন যাবে, ততই এই উদ্দীপনার ভাব কমে আসবে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের তীব্রতাও মৃদু হয়ে আসবে, অথচ পশ্চাতে থাক্‌বে তখনও তোমার পরিজন বর্গের প্রবল আকর্ষণ। এই আকর্ষণের প্রবল টানে যেন নিজকে হারিয়ে ফেলো না, যা পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছ, তার দিকে যেন আর ফিরে চেও না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দৃঢ় সংকল্প ক'রে যাও—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।' দেহ রেণু রেণু হয়ে খসে পড়ে যাক্, তথাপি আর ঘরে ফিরব না, শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত সঙ্কল্পসিদ্ধির দরুণ অনলস ভাবে খেটে যাব, এই পণ ক'রে গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। ত্যাগের পথ সহজ নয়, কত বাধা কত বিঘ্ন এর সাম্নে এসে পড়বে তার ইয়ত্তা আছে কি? তাই এই পথকে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' ক্ষুরের ধারের মত এই পথ সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ন, একটু এদিক ওদিক হলেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে, অতএব পথিক সাবধান!

* * *

অনেক দিন হল ঘর ছেড়ে এসেছি;—এই ত্যাগের পথে এসে তাঁর শেষের সকল উপদেশ, সকল বক্তব্যেরই সত্যতা প্রত্যক্ষ ক'রেছি। স্থূলভাবে সংসারের কত অভিযান আমার ওপর দিয়ে হয়ে গিয়েছে, সূক্ষ্মভাবেও কত আকর্ষণ আমাকে এ পথ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে, তথাপি আমি সকল অবস্থাতেই অচল অটল থাকতে পেরেছি শুধু তাঁর একটী কথায়—

"মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ।"
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

সাংসারিক আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পেয়ে মনের আনন্দে যখন পথ বয়ে চল্‌ছিলাম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের আকর্ষণী-রেখাটুকুরও যখন আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন সহসা একদিন এই পথের —"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"র রূপ আমার প্রত্যক্ষ হল, আমি পথভ্রষ্ট হলাম। পথহারা হয়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার তীব্রতম আঘাত অনুভব ক'রে, নিঃশেষে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে পাঠালাম। সে দিনের সেই দুর্দ্দিনে তাঁর যে অভয়বাণী আমাকে আমার পথে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল, সে বাণী আর জীবনে ভুল্‌ব না, বুঝি ভুল্‌তে পার্‌ব না—কারণ সেই আশ্বাস বাক্যই যে আমার জীবন-পথের সম্বল। তিনি লিখলেন—

"তোমার পত্র পেয়ে মর্ম্মাহত হলাম। আমার ও দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য, তাই যে ডাল ধরছি, সেই ডালই ভেঙ্গে পড়ছে। তোমার চিঠিখানা বেশ তত্ত্বপূর্ণ, অথচ তোমার মত যুবককেও যে অবিদ্যা খেলার পুতুল করতে পারে তা আমার ধারণার অতীত। অবশ্য তোমাদের মত বয়সে প্রবৃত্তি এবং ভাবপ্রবণতা খুবই প্রবল সন্দেহ নাই। আমি জানি তোমরা দেব সন্তান, কোন অভাব ছিল না, স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তিমার্গ সংসার ছেড়ে এসেছ, আজীবন প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হবে, কিন্তু প্রবৃত্তির

স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিবে, এ আমি জান্‌তাম না। তথাপি আমি তোমাকে আশ্বাস ও সাহস দিচ্ছি। তুমিও মানুষ, মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী, মুনিঋষিদেরও পদস্খলন হয়, বালকে পড়তে পড়তেই হাঁট্‌তে শেখে। তাই এবারের অপরাধ আমি সরলভাবে ক্ষমা ক'রে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি। এবারের পতনে যেন তোমার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতের জন্যে বেশী রকম সাবধান হও। যে আত্মগ্লানি এবং অনুতাপ পূর্ণ পত্র দিয়েছ, তা অহর্নিশ প্রাণে জাগ্রত রাখ, তোমার মঙ্গল হবে। যে উদ্দেশ্যে পিতা মাতা প্রভৃতিকে কাঁদিয়ে ঘর ছেড়ে এসেছ, তা সার্থক কর্‌তে আবার কৃত সঙ্কল্প হও। যদি আশ্রমে থেকে সঙ্কল্প সিদ্ধ হবার বিঘ্ন মনে কর, তবে যথা ইচ্ছা চলে যাও, কিন্তু আত্মহত্যার চিন্তাও মনে স্থান দিও না। আত্মহত্যায় কোন উন্নতি হবে না, বরং তা আরও নরকের দিকে টেনে নিবে। সুতরাং জীবিত থেকে দারুণ দুঃখ কষ্টে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যায় সে আশা সুদূরপরাহত। আমার ইচ্ছা তুমি আশ্রমে থেকেই প্রবৃত্তি জয় কর এবং আত্ম গঠন করে আমার কার্য্যে আত্ম নিয়োগ কর। এতে বাইরের নিন্দা গ্লানিও একদিন ধুয়ে যাবে। কিছু দিন ধৈর্য্যের সহিত এই সব সহ্য কর। আর নিতান্ত যদি আশ্রমে থাক্‌তে না পার, আমার চিঠিতে বল না পাও, তবে কোন কারণ জানিয়ে আশ্রম ত্যাগ করে নিভৃতে তপস্যা করগে। চিত্ত শুদ্ধি হলে আবার আমার আশ্রম কার্য্যে যোগদান করো। * * * তবে আমার মতে তুমি যেখানে আছ, সেইখান থেকেই তোমার ধৈর্য্য সহকারে আত্ম গঠন করা কর্ত্তব্য। আমি এখনও বিশ্বাস করি, তুমি নিশ্চয় একদিন অবিদ্যাকে জয় কর্‌তে পারবে। যাক্ এ সম্বন্ধে আর বেশী লিখব না, বেশ ধীর ও স্থির ভাবে চিন্তা করে যা কর্ত্তব্য বোধ কর, তাই করো। তুমি আশ্রমে থাক বা অন্যত্র যাও, আমি গুরুরূপে তোমার মঙ্গল চিন্তা কর্‌ব, আশীর্ব্বাদ কর্‌ব। কিন্তু সাবধান !! হঠকারিতা বশতঃ কোন কাজ করো না। ভেবে চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করো। বাইরেও অনেক বিপদ, বহু প্রলোভন, আশ্রম তদপেক্ষা অনেকটা নিরাপদ। আশীর্ব্বাদ করি তোমার চিত্তে দৃঢ়তা, প্রাণে শক্তি এবং হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চাত হোক্, তুমি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হও।"

এ চিঠি পেয়ে আমি আবার আমার হৃতরাজ্য ফিরে পেলাম, হৃদয়ে অসীম বল এল, কৃতজ্ঞতায় চিত্ত আপ্লুত হয়ে গেল। জগতের লোক যাকে পথভ্রষ্ট বলে ঘৃণায় দূরে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল, মহাপুরুষ তাকে আদর করে তার অঙ্গের ধূলা কাদা ঝেড়ে আপন কোলে তুলে নিলেন। এই তো মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব, বিশেষের বিশেষত্ব ! নইলে ত্রিতাপদগ্ধ জীব তাঁকে অধম তারণ পতিত পাবন বলে অভিহিত কর্‌বে কেন ?

* * *

কিছু দিন বেশ নির্ব্বিঘ্নে চল্‌ল, বেশ মনের আনন্দেই তাঁর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় চল্‌তে লাগলাম ; কিন্তু তার পর আস্তে আস্তে অতি ধীরে যেন সব অস্পষ্ট হয়ে আস্‌তে লাগল, আমি পথ হারিয়ে ফেল্‌লাম, লক্ষ্য চ্যুত হয়ে পড়লাম। এই দুর্গম সময়ে পথের দুর্গমতায় "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"র সত্যতা আমার প্রত্যক্ষ হল—আমি তাঁকে আমার আন্তররূপ এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিয়ে একখান বিস্তৃত চিঠি দিলাম ; তার মর্ম্ম এই—

"দেবতা ! আমি জীবনের লক্ষ্য ভুলে গেছি, পথও হারিয়ে ফেলেছি, অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে

এখন বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কবির ভাষায়-বর্ত্তমানে আমি—"কুটীল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া আছি পড়িয়া হে।"—তুমি আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দাও, পথ দেখিয়ে দাও, সে পথে কি গান গেয়ে যাব, তাও স্মরণ করিয়ে দাও। জীবনের লক্ষ্য শান্তি কি মুক্তি, তার পথ জ্ঞান কি ভক্তি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, কোন্ পথে গেলে আমি লক্ষ্যে পৌছাতে পারব তাও জানি না, দয়া করে সব বুঝিয়ে দাও দেবতা! আমি মোহে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি, অজ্ঞানে দৃষ্টি আবৃত করে ফেলেছে, আমার সাধনপন্থা-কি ভুলে গেছি, তাই বার বার তোমার পায়ে নতি জানিয়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনের স্বরে স্বর মিশিয়ে বল্‌ছি—

কার্পণ্য দোষোপহতঃ স্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

* * *

এই চিঠির উত্তর আর কাগজে কলমে পাই নি, পেয়েছিলাম সাক্ষাৎভাবে তাঁর শ্রীমুখ থেকে। তিনি বল্‌লেন—"জীবনের গতি দ্বন্দ্বময়, সুখদুঃখ নিত্য সঙ্গী, কামক্রোধাদি জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি, যথাসম্ভব বৃত্তিগুলিকে স্ববশে আন্‌বার চেষ্টা করতে হবে, তাদের বিভীষিকায় ভয় পেলে চল্‌বে না। জীবনের লক্ষ্য সত্যলাভ, সেই সত্যলাভের চিরন্তন পন্থা দুটী। একটী কঠোর সন্ন্যাসযোগ অপরটী ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা। সন্ন্যাস যোগাবলম্বনে সত্যলাভের আশা সুদূরপরাহত, সাধারণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। সহজ এবং সরল পন্থা হচ্ছে সেবার পথ। শ্রীগুরু বহু সাধন ভজন করে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লাভ করেন, এক মাত্র সর্ব্বাবচ্ছেদে তাঁর সেবা দ্বারাই শিষ্য সে সমস্ত আয়ত্ত করতে পারে, আর চরমে শ্রীগুরুর সমান গতি লাভে সক্ষম হয়।"

মহাপুরুষ দয়াপরবশ হয়ে আমায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয়ে সত্যের যে আলোক সম্পাত করলেন, তাতে আমার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে গেল। আমি পথ দেখতে পেলাম, লক্ষ্য আমার স্থির হল।

তারপর পথে আর তেমন কোন বিঘ্ন পাই নি, সহজ সরলানন্দে পথ বেয়ে চলেছি—তাঁরই নামের জয় উচ্চারণ করতে করতে।

এরই মধ্যে একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা ঠাকুর! জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য যে সত্য বস্তু—তাকে লাভ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি কারো মনে জেগে থাকে, অথচ তার উপায় স্বরূপ কোন সাধন ভজনের অনুষ্ঠান করতে সে অপারগ হয়, তাহলে তার উপায়?

আমার মনের অব্যক্ত ভাব বুঝতে পেরেই যেন তিনি বল্‌লেন—"উপায় হচ্ছে নির্ভরতা। শ্রীগুরুর উপর যথার্থভাবে নির্ভর করতে পারলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়ে থাকে, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। যদি তোমার কোন সাধন ভজনে প্রবৃত্তি না থেকে থাকে, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে আমার উপর নির্ভর কর, আমার উপর সব ভার ছেড়ে দাও, সর্ব্বাবচ্ছেদে আমারই শরণাপন্ন হও, আমায় একটু ভালবাস, তাহলেই সব হবে। **মামেকং শরণং ব্রজ।**"

* * *

বর্ত্তমানে তাঁর এই অভয় আশ্বাস বাণীই আমার জীবন পথের দীপিকা, একমাত্র অবলম্বন; তাই তাঁর সেই বাণী স্মরণ করে তাঁকে একটু নির্ভর করবার চেষ্টা করছি, তাঁকে একটু ভালবাস্‌বার প্রয়াস পাচ্ছি, তাঁকে কেমন করে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারি, তারই উপায় চিন্তা করছি।—তিনি সহজ মানুষ, সহজেই তিনি সন্তুষ্ট; শক্তির কোন ধার ধারেন না, বুজরুকীর কোন তোয়াক্কা রাখেন না. সত্য জগতের [illegible] [illegible] মিথ্যা প্রবঞ্চনা

তাঁর কাছে নাই। তিনি সত্য স্বরূপ, সত্যই তাঁর স্বরূপ, পেয়েছিও আমি তাঁকে ঠিক সত্য স্বরূপ গুরুরূপে। আজ তাঁর এই পুণ্য জন্ম তিথিতে তাঁর মধুময়ী স্মৃতি স্মৃতিপথে উদিত হয়ে আমাকে বিহ্বল করে তুল্ছে, তাঁর স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বলিত আস্য আমার নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে আমাকে আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি যে আমাকে কেমন করে ধীরে ধীরে মিথ্যা হ'তে সত্যে, অন্ধকার হ'তে আলোকে নিয়ে চলেছেন, সেই সমস্ত কথা স্মরণ করে আমার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্ছে, তাই আজ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রেম কারুণ্য-কণ্ঠে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বার বার বল্ছি—

তোমারই রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারই আসন হৃদয়-পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো॥

—— × ——

শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি

অতীতের কোন্ এক রুদ্ধদ্বার তমিস্র কারায়
শৃঙ্খলিতা ভীত চিতা জননীর অঙ্ক আলোকিয়া
এসেছিলে হে দেবতা নামি এই পঙ্কিল ধরায়
সেই স্মৃতি মুহু আজি স্মৃতিপটে উঠিছে জাগিয়া॥

দেখিলাম সেই দিন বৃন্দাবনে আনন্দের খনি
নন্দিয়া সকলে তুমি ভাসাইয়া আনন্দ-সায়রে
স্মিত হাসি বিকীরিয়া নন্দকুল নীলকান্ত মণি
যশস্বিনী করিলে হে স্নেহময়ী যশোদা মায়েরে॥

দেখিলাম তার পর ননীচোরে মায়ের বন্ধনে
দেখিলাম অনায়াসে ক্রীড়াচ্ছলে অর্জ্জুন ভঞ্জন
পুতনার কোলে দেখি শুনিলাম আকুল ক্রন্দনে
হেরিলাম মুহূর্ত্তে সে মায়াবিনী রাক্ষসী নিধন॥

তার পর হেরিলাম সখা সাথে গোপালের বেশে
অসুর সংহারি বনে করিবারে সুখে গোচারণ
হেরিলাম গিরিধরি রক্ষিবারে ব্রজে ইন্দ্র রোষে
ঝম্প দিয়া বিষহ্রদে দুষ্টনাগে করিতে দমন॥

হেরিনু কিশোর তোমা রাসকুঞ্জে কালিন্দী পুলিনে
শুনিনু বাজিতে সেথা মনোচোরা আকর্ষণী বাঁশী
দেখিনু তখনি প্রিয় প্রেমরূপ মহা আকর্ষণে
অবোধ আভীরাবৃন্দে ঘর ছাড়া করিতে উদাসী॥

সহসা একি এ দেখি নির্দয় পাষাণের সম
চলি গেলে নিষ্পেষিয়া গোপী-চিত্ত দূর মথুরায়
নিধনি কংসেরে সেথা হলে রাজা ওগো প্রিয়তম
হেথা 'কোথা কানু' বলি গোপবালা কাঁদিয়া বেড়ায়॥

হেরিলাম সিন্ধু মাঝে বিরচিয়া দ্বারকা নগরী
যদুকুল ধুরন্ধর বীরদর্পে কাঁপায়ে মেদিনী
হইলে সম্রাট তুমি বিনাশিয়া যদুকুল অরি
সহস্র মহিষীসহ যাপিলে হে দিবস যামিনী॥

সহসা পশিল কর্ণে মেঘমন্দ্র পাঞ্চজন্য নাদ
সহসা হেরিনু তোমা কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন-সারথি
মোহ ভ্রান্তি বিনাশিয়া দূর করি গ্লানি অবসাদ
ঝঙ্কৃত হইল সেথা শান্তিদাত্রী গীতামৃত-গীতি॥

আজিও বাজিছে কর্ণে সে মধুর বীণার ঝঙ্কার
আজিও স্মরণে রাজে সে সুন্দর শ্যামল মূরতি
আজিও পড়িছে মনে রাস ক্রীড়া মধু পূর্ণিমার
আজিও আসিছে ধীরে শিশু তব সকল স্মিরিতি॥

আজি তব জন্ম দিনে মনে পড়ে অতীতের কথা
কত স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে মনোমাঝে জাগে অনিবার
সখারূপে কান্তরূপে গুরুরূপে এসেছিলে হেথা
সে সকল কথা স্মরি চিত্ত আজি করে হাহাকার॥

যেই যুগ সন্ধিক্ষণে ক্ষাত্রবীর্য্য নাশিয়া ধরায়
এসেছিলে হে দেবতা প্রেমরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপিতে
আজি দেখ সেই যুগ আসিয়াছে ফিরি পুনরায়
ধর্ম্মবেশে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে মহীতে॥

এস তবে ত্বরা করি ধর্ম্মহীন জগতে নামিয়া
মিথ্যার কুহেলী মায়া মুহূর্ত্তেই হোক্ অবসান
অজ্ঞান নাশিয়া পুনঃ সত্যজ্যোতি উঠুক ফুটিয়া
বিশ্ব জুড়ি গীত হোক্ আজি তব আগমনী গান॥

—— ——

বসুধৈব কুটুম্বকম্

—:*॰॰*:—

বিশ্ব-প্রকৃতিকে যদি আমার বলে মনে করি, তাহলে আর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করা চলে না। বৈদান্তিক সমস্ত প্রকৃতিকে সেই চক্ষেই দেখছেন। জগতের সঙ্গে যে তাঁর কোন বিরোধ নাই, কারও প্রতি যে তিনি কটাক্ষ করেন না, তার একমাত্র কারণ, তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিজেরই বিকাশ বলে ভালবাসেন। প্রকৃতি-জয়ের নিগূঢ় সঙ্কেত এই ভালবাসার মাঝেই রয়েছে। সুতরাং জগৎকে, মানুষকে, যত ভালবাস্‌তে পারব, মানুষের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে বিরোধও তত কমে আস্‌বে। তখন হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে থাক্‌বে।

কিন্তু ভালবাসার মাঝেও গলদ এসে পড়ে। যেখানে গলদ সেখানেই অজ্ঞতা রয়েছে। ভালবাসা যদি আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সে ভালবাসার কোন মূল্যই নাই। আমি যাকে আপন বলে মনে করে নিয়েছি, তার উপর তো কোনরূপ অত্যাচার কর্‌বার পথ থাকে না—কেন না সে আর আমি যে এক। ভালবাসা জিনিষটার আস্বাদন পাওয়া যায়—এই অদ্বৈত-তত্ত্বে। কিন্তু মানুষ ভুল করে বসে এই জায়গাতেই। Ties of relation যেখানে রয়েছে, সেখানে কোন খারাপ ভাব আস্‌তেই পারে না। এই সম্বন্ধদ্বারাই মানুষ মানুষ হতে পেরেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তোমার পরিবারে মা, বোন ইত্যাদি রয়েছে, তাদের প্রতি কি তুমি একটা অন্যায় ভাব পোষণ কর্‌তে পার? নিশ্চয়ই নয়। কেন? না, তারা তোমার আত্মীয়, তাদের রক্তের সঙ্গে তোমার রক্তের যোগ রয়েছে—তারা তোমার আপন। তেমনি বিশ্ব-জগৎকে যদি তুমি আপন বলে মনে কর্‌তে পার, শুধু মনে করা নয়, আপনার করে নিতে পার, তাহলে আর বিরোধ হবে কার সঙ্গে? নারী-পুরুষকে যদি আপনার ভাই-বোনরূপে দেখ, তাহলে তাদের প্রতি তোমার খারাপ ভাব আস্‌বে কেমন করে? অনাত্মীয়ের উপরই অনেক সময় খারাপ ভাব আসে, কিন্তু আত্মীয়ের প্রতি কোন দিন খারাপ ভাব আসে না। তাহলেই দেখছ, সম্বন্ধ ছেড়ে কোন কল্যাণ নাই। জগতের সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন কর, তাহলেই দেখবে, তোমার হৃদয় কত উন্নত হয়, কত তুচ্ছ বিষয় থেকে উপরে উঠে যাও তুমি।

বেদান্ত সেই সহজ পথই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। গোটা জগৎটাই তাঁর পরমাত্মীয়—কারও সঙ্গে তাঁর বিরোধ নাই। যা কিছু দেখছেন তিনি, সবই তাঁর আত্মার বিকাশ বলে তিনি মনে করেন। সুতরাং বিরোধ হবে তাঁর কার সঙ্গে? জগতের সবাই যদি তাঁর মিত্রই হয়ে গেল, তাহলে আর তো বিরোধ বলে কোন একটা কথাই উঠতে পারে না!

আর সব দর্শনের মাঝেই প্রকৃতি-বিরূপতার ভাবটা খুবই প্রবল, কিন্তু বৈদান্তিকের মাঝে তা নাই। জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর্‌লেই

যে মানুষ শাশ্বত শান্তির অধিকারী হতে পারে, তার কোন মানে নাই। অনাত্মীয় বলে যাদের আমরা অবজ্ঞা করি, তারাই শেষে আমাদের প্রশান্তিকে শত্রুবেশে এসে ধ্বংস করে দিয়ে যায়। কাজেই হিংসা-দ্বেষ, পরকে অনাত্মীয় বিবেচনা করা, ঠিক ঠিক কল্যাণের পথ নয়। ঋষিযুগে এই মধুর আত্মীয়তার ভাবই দেখি বেশী; গাছ পালা, পশু পাখী সকলের সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয়তা। গাছে তখন কথা কইত, পশু তখন হিংস্র ছিল না, এর কারণ কি? না ঋষিদের ভিতর বিদ্বেষ বলে কোন একটা জিনিষ ছিল না। ঋষিদের তপোবনের বর্ণনায় আমরা প্রকৃতি-প্রীতির বেশ সুন্দর বর্ণনা পাই। কবি কালিদাস শকুন্তলার যে চিত্র এঁকেছেন তা কি মনোরম! আশ্রমের লতা-পাতা, হরিণ সবই তাঁর কত আপনার। শকুন্তলার হৃদয়ের ভালবাসা, এই সামান্য গাছ পালার ভিতরও সঞ্চারিত হয়েছিল। এই ভালবাসা, এই স্নেহ কি বন্ধন? এ দ্বারা মানুষের জীবনের উন্নতির ব্যাঘাত হয় কি? আমার তো মনে হয়, না। জগতের সঙ্গে এই আত্মীয়তার ভাব পোষণ করে চলাকে তো আমি কোন দিক দিয়ে অকল্যাণকর বলে মনে করতে পারি না। ভালবাসায় যে মানুষের সকল বৃত্তির তর্পণ হয়ে যায়। বৈদান্তিক জগৎকে ভালবেসেই তো এত সহজে এবং অনায়াসে জগতের ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছেন। বৈদান্তিকের কাছে গেলে তুমি এই একটী মাত্র উপদেশ পাবে. যে—**"জগতের সকলকে ভালবাসতে শিখ।"** তাহলেই দেখবে এই জগৎ কত মধুর, তোমার যাত্রা-পথে তখন তোমার কত সঙ্গী পাবে।

ঋষিদের মাঝে এই মৈত্রীর ভাবটাই প্রবল। ঋষিদের দর্শন যে উপনিষদ, তার মাঝে কোন বিদ্বেষের কথা পাবে না। অন্তরে-বাহিরে তাঁদের সমান অনুভূতি। বাহিরটাকে আত্মারই বিকাশ বলে ধরে নিয়ে এই বহির্জগতেরও কত প্রশংসা করে গিয়েছেন তাঁরা। এর পরেকার দর্শনের মাঝেই পাই বিরোধের কথা, বিদ্বেষের কথা, বিশ্লেষণের কথা। তা না হলে বৈদিক যুগে এ সব ভাব আদৌ ছিল না। জগতের কেউ তাঁদের শত্রু ছিল না বলেই, জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবার দরুণ তাঁদের ভিতর আকুলতা জাগে নি, তাঁদের আকুলতা একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভের দরুণ, আত্মার ব্যাপ্তিবোধের দরুণ। বাইরে-ভিতরে এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবার দরুণ তাঁদের ভিতর কি অসীম আকুলতা! বহির্জগৎকে তাঁরা অবহেলা করে বাদ দিয়ে যান নি—ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং বলে বিশ্ব-জগৎকেই তাঁর বিকাশ বলে তাঁরা মনে করতেন। জগৎ যদি ঈশ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহলে জগতে আর ঈশতে তো কোন পার্থক্যই থাকে না। এখানে তো বর্জ্জনের কোন কথাই উঠতে পারে না। কেন না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়ই যে তিনি—তিনিই যে জগতের সকলকে স্নেহদ্বারা, ভালবাসা দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। জগৎটাকে দেখলে যে তাঁরই কথা মনে পড়ে। উপনিষদে আছে, "জগৎ সৃষ্টি করে, তিনি নিগূঢ় ভাবে এই জগতেই বর্ত্তমান।" মানুষ এ কথাটা ভুলে গিয়েই জগৎ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।

যারা তোমাকে দুঃখ দেয়, যাদের তুমি শত্রু বলে মনে কর, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করে নাও। তাহলেই দেখবে—শত্রু জয় কত সহজ, কত সরল। আমাদের প্রত্যেকের প্রাণ এক সূত্রে গ্রথিত—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সবারই। সুতরাং আমাদের জীবনটা কোন মতেই সম্বন্ধবিহীন হতে পারে না। পশুর মাঝে এই সম্বন্ধ বোধটা সুপ্ত; তুমি যদি তাকে

ভালবাস, তাহলে তার ভিতরকার সুপ্ত ভালবাসাও জেগে উঠবে। তাদের ভিতর ভালবাসা নাই এ কথা বল্‌তে পার না তুমি। পশু যে হিংস্র হয়েছে —তার দরুণ মানুষকেও আমি দায়ী মনে করি। কেন না পশুকে দেখলে মানুষ ঘৃণা করে, শত্রু মনে করে। পশুর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করি, কিম্বা মনোভাব পোষণ করি বলেই, পশু আমাদের কাছে হিংস্র, পর, ভয়ের বস্তু। কিন্তু ঋষির তপোবনে—পশুর মাঝেও হিংসা ভাব দেখি না, এর কারণ কি? না, ঋষি তাঁর অন্তরের ভালবাসা দিয়ে পশুর ভিতরের যে সুপ্ত ভালবাসা তাকে জাগ্রত করে তুলেছেন। স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা সকল প্রাণীর ভিতরই আছে—চেতন মানুষের কাজ হল, তাদের সে দিকেই উদ্বুদ্ধ সচেতন করে তোলা। পর করে রাখা, জগতে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করাটা কোন কৃতিত্বের কাজ নয়।

জীবনে যাঁরা গভীর অনুভূতি পেয়েছেন, তাঁদের ভিতরই এই সাম্য উদার দৃষ্টি এসে পড়েছে। তখন মনে হয়, জগতের কোন কিছুই তুচ্ছ নয়, অবজ্ঞার বিষয় নয়—সকলেরই একটা বিশেষ অর্থ আছে, সেই অর্থের সঙ্গে প্রত্যেকের জীবনের অর্থই মিলে যায়। বুদ্ধদেব একটা ছাগ শিশুর দরুণ প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন, কেন না মানুষের প্রাণে এবং তার প্রাণে কোন পার্থক্য আছে বলে তিনি মনে করতে পারেন নি। তাঁর কাছে একটী মানুষের জীবনের যে মূল্য, একটী ছাগ শিশুর মূল্যও তাই। মানুষ বড় হলে তার আর কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায় না—তিনি দরদী হয়ে উঠেন, এই একমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভেদ বাহিরে; যতই অন্তরের দিকে আমরা তলিয়ে যেতে পারব, ততই দেখব, আমাদের জীবনের সঙ্গে একটা সামান্য ধূলিকণারও কি আশ্চর্য্য মিল। ঋষিদের জীবনে তাঁরা এই গভীর অনুভূতিই পেয়েছিলেন, এইজন্যই পার্থিব রজকেও তাঁরা মধুময় বলে গিয়েছেন।

আর কিছু না, মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছ যখন, তখন এই সম্বন্ধ-সূত্র আবিষ্কার করে নেওয়াটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ তুমি বৈদান্তিক হয়ে উঠ, জগৎময় তোমারই ব্যাপ্তি এই অনুভবে সিদ্ধ হও। তখন দেখবে, বাইরের ভেদে তোমার অন্তরের উজ্জ্বল অনুভূতিকে নিষ্প্রভ করতে পারছে না। জীবনে একবার যাঁরা এই সুদৃঢ় অনুভূতি পেয়েছেন, তাঁদের কথার জোর কত! ঋষিদের বাণীতে এইজন্যই এত সহজে আমরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। তাঁদের কথা যেন কথা নয়—এক একটী প্রাণের টুক্‌রা! প্রাণকে স্পর্শ করে, প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়, এর দরুণই তো?

লড়াই করাটা জয়ের লক্ষণ নয়—তাতে আত্মশক্তিরই দৈন্য প্রকাশ পায়। আত্মবলে যাঁদের নিষ্ঠা নাই, বাইরের লড়াইয়ের প্রতি তাদের ঝোঁক অত্যন্ত বেশী। আজ কালকার মানুষ ভিতরে দুর্ব্বল, এইজন্যই বাইরের আড়ম্বর দিয়ে ভিতরের দুর্ব্বলতাকে ঢাকবার তাদের অমন নিদারুণ প্রচেষ্টা। আত্মশক্তি দ্বারা, মৈত্রীভাবদ্বারা কি জগতের বিরুদ্ধ ভাবকে দমন করা যায় না? শত্রু তো আমরাই সৃষ্টি করি। আবার লড়াই করি আমরাই —এ-ও এক মজার ব্যাপার!

ভারতের বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্ম্মুখীনতা। পরকে সংশোধন করতে পরকে নির্য্যাতন করবার কোন প্রয়োজনই হয় না, যত চাবুক নিজকেই মারা প্রয়োজন। আর কিছুই না, মহৎ প্রভাব দ্বারাই মানুষের জীবন রূপান্তরিত হয়ে যায়। অপরের কল্যাণের দরুণ, সংশোধনের দরুণ, তোমার নিজকেই মহাব্রত অবলম্বন করতে হবে। পরের দিকে চেয়ে থাক্‌লে, পরে দোষ অনুসন্ধানকারী হলে, জীবন মহৎ হবে না।

জগতের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করাই হল আসল কাজ। তাতে শত্রু বলে কোন কথাই থাকবে না; আর যদিই না থাকে তাহলে তো অন্ততঃ তোমার কাছে নয়। শত্রু জয়ের সঙ্কেত বৈদান্তিকের কাছ থেকে গিয়ে শিখে এসো। জগতের যা কিছু, ভাল-মন্দ, সু-কু সব তোমার বলেই মনে কর। নিজের প্রতি যেমন সহিষ্ণু, পরের প্রতিও তেমনি হয়ে যাও। নিজের দোষ মানুষ দেখে না কেন—না, তা যে নিজের। কাজেই পরের অন্যায় দেখলে উত্তেজিত হয়ে উঠো না; নিজের বলে তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে। আমাদের যত পাপ, যত গলদ, তার দরুণ যদি ভগবান্ দু'কথা না বলতেন, তা হলে বোধ হয় আমাদের পুঞ্জীভূত গলদ কোন কিছুতেই অপসারিত হত না।

তপস্যা চাই, কিন্তু সে তপস্যা কারও উপর রাগ করে নয়। আমরা অনেক সময় অপরের উপর রাগ করে নিজকে পীড়ন করি—এ ঠিক পন্থা নয়। জগতের কল্যাণের দরুণও তপস্যা করা যায়। ভোলানাথ চক্ষু মুদ্রিত করে তপস্যায় নিমগ্ন—কারও উপর রাগ করে নয়, জগতের কল্যাণের দরুণ। কাজেই কোন ক্ষোভ নিয়ে নয়, স্বার্থ নিয়ে নয়, আত্মোন্নতির দরুণ, জগৎ হিতের দরুণ তপস্যা করতে শেখ, সেই তপস্যার মাঝে কোন উগ্রতা থাকবে না, বরঞ্চ তাতে চিত্তে প্রশান্তি এনে দেবে।

শত্রু পরাজয় করতে হলে, দৈহিক বলের চেয়ে উন্নত মানসিক চিন্তারই প্রয়োজন বেশী। যেমন ধর, কাম একটা আমাদের দুর্নিবার বৃত্তি—তাকে যদি দমন করতে হয়, তাহলে শুধু শারীরিক কসরৎ-এই কিছু হবে না—অন্তরের পবিত্রতা যাতে আসে, অর্থাৎ উন্নত চিন্তা নিয়ে তোমায় থাকতে হবে। অবশ্য বাহিরের আসন মুদ্রার যে কোন উপকারিতা নাই, অমন কথা বলছি না, কিন্তু আসলে যদি মনটাই ঠিক না হল, তাহলে কি হবে? একমাত্র দৈহিক বল দ্বারা ইন্দ্রিয়কে নির্জ্জিত করা সম্ভবপর নয়—যদি তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বলের সংযোগ না হয়।

মানুষ যখন সত্যের সন্ধান পায়, তখন তার ভিতর থেকে ভেদ জিনিষটা একদম লোপ পেয়ে যায়। সত্যের কাছে তো নারী-পুরুষের কোন ভেদ নাই। বুদ্ধদেব যখন সত্যের সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর ভিতরও একাকার করবার একটা ইচ্ছা দেখা দিল। নারী-পুরুষে তিনি ভেদ রাখতে চাইলেন না, কেন না তিনি নিজে যে কোন ভেদ দেখতে পান নি। এ ভাবে এক একবার এক এক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন, আর জগৎ থেকে ভেদ জিনিষটার লোপ করে দিয়ে যান। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেও এমনি করে ভেদ জিনিষটা তুলে দিলেন। অনুভূতি জিনিষটা বাইরে ভিতরে সমান কি না, তাই অন্তরের ভেদাতীত ভাবকে বাইরেও তাঁরা প্রয়োগ করে তার সত্যতা পরীক্ষা করে গিয়েছেন।

যথার্থ সত্যের সন্ধান না পেয়েই ভেদ তুলে দিতে যাই বলে আমাদের এই দুর্দ্দশা! তা না হলে সত্যিকার ভাবে কোথায়ও কোন বিভ্রাটের সৃষ্টি করে না। ঋষিরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নারী-দেরও সমান অধিকার দিয়েছিলেন, কেন না নারী সম্বন্ধে তো তাঁরা কোন দুর্ব্বল ধারণা পোষণ করতেন না। নিজেরই দুর্ব্বলতা সংক্রামিত হয়ে গিয়ে অপরের দুর্ব্বলতাকে জাগিয়ে তুলে। কিন্তু ঋষিরা তো কোন দিকে দুর্ব্বল ছিলেন না, তাই দুর্ব্বল ধারণা, দুর্ব্বল চিন্তা তাঁদের মনে স্থান পেত না কিছুতেই। অধিগত করে নেবার একটা

আশ্চর্য্য শক্তি ছিল তাঁদের। এইজন্যই ভালকে যেমন তাঁরা গ্রহণ করেছেন, মন্দের আবেদনও তেমনি অগ্রাহ্য করেন নি। অগ্রাহ্য করেন নি এই বলে যে, আত্মশক্তি-দ্বারা মন্দকেও ভাল করে নেওয়া যাবে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের ছিল; কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা দেখিয়েছেনও তাই।

অনেকেই পর হয়ে থাকল, এটা আমার নিজেরই শক্তির দৈন্য। জগতে যাদের শত্রু বেশী, তাদের আত্মশক্তি নিশ্চয়ই কম। সাংখ্য, পাতঞ্জল ইত্যাদি দর্শনকে যে বেদান্ত দর্শনের নীচে স্থান দেওয়া হয়েছে এইজন্যই। বৈদান্তিকের ন্যায় তাদের ভিতর বিগতভীর ভাবটা খুবই কম। সাংখ্য রইলেন প্রকৃতির দিকে মুখ ফিরিয়ে, পাতঞ্জল দর্শন তো চোখ বুজে ধ্যানেই নিমগ্ন; কিন্তু জগতের দিকে, প্রকৃতির দিকে মুখে মুখে তাকিয়েছেন একমাত্র বৈদান্তিক। কাজেই বৈদান্তিককেই সাবাস দেওয়া উচিত নয় কি? পুরস্কার দিতে হলে বৈদান্তিকেরই প্রথম পুরস্কার প্রাপ্য—তার পর অন্যান্য দর্শনের দাবী। কেন না আর যে কোন দর্শনই হোক্ না, প্রত্যেকের মাঝেই কোন না কোন দিক দিয়ে একটু দুর্ব্বলতা থেকে গিয়েছেই। আদর্শ নিয়েই কথা হচ্ছে। সুতরাং বেদান্ত দর্শনের ন্যায় এত বড় আদর্শ আর কোন দর্শনেই নাই। অন্যান্য দর্শনও যে জীবনে light না দিয়েছে তা নয়, কিন্তু বেদান্ত দর্শনের light আর অন্যান্য দর্শনের light, এ যেন steamer এর search light আর জোনাকী পোকা। বৈদান্তিকের নিজের জীবন যেমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, অপরের জীবনকেও তিনি তেমনি করে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। অন্যান্য দর্শনের এত দূর ব্যাপ্তিবোধ নাই।

বৈদান্তিকের ভালবাসার মাঝে কোন মোহ নাই —কেন না বৈদান্তিক তো আত্মাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেন না। আত্মপ্রীতির দরুণই জগৎ প্রীতি। সুতরাং তাতে তো মোহ থাক্‌তেই পারে না। বৈদান্তিকের লক্ষ্য আত্মা—তাই বৈদান্তিকের দৃষ্টির কাছে দেহ যেন আড়ালে পড়ে যায়। স্থূল ভালবাসাতেও যে বৈদান্তিক আটকা পড়েন না, তার একমাত্র কারণ ইহাই। সাধারণ মানুষের কাছে দেহটাই বড় আত্মার কোন খোঁজ খবরই নাই। এইজন্যই সাধারণ লোকের দেহ নিয়ে এত কাড়াকাড়ি। অথচ দেহটা যে আদতেই ফাঁকি —অর্থাৎ দেহ যে চিরস্থায়ী নয়, এ কথাও কিন্তু মানুষ জানে। অথচ যত আকর্ষণ— শুধু এই জড়পিণ্ড দেহটার প্রতিই। দেহ সুন্দর, দেহ চিন্ময়, যদি তার ভিতর দিয়ে ভগবানেরই দ্যুতি প্রকাশ পায়। আর দেহকে যে ভালবাসি, দেহের সৌন্দর্য্যে যে মুগ্ধ হয়ে যায় মানুষ, তার কারণও এই যে দেহের মাঝেই আত্মার বসতি।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

জগতের এই দীপ্তি, এই সৌন্দর্য্যের আকর কোথায়?—আত্মাতে। আত্মারই সৌন্দর্য্যের, রূপের ছটা দেহের বাইরে—ভিতরে প্রকাশ পাচ্ছে। এই যে উজ্জ্বল নক্ষত্র, উজ্জ্বল সূর্য্য—এরা কি? এরা তো জড়পিণ্ড মাত্র, কিন্তু কার দীপ্তিতে তারা দীপ্তিবন্ত হয়ে উঠেছে? তিনি কি—না আত্মা! আত্মাই হলেন সকল সৌন্দর্য্যের নিদান। এই আত্মা যাঁর ভিতর যত জাগ্রত—তিনিই তত সুন্দর। বৈদান্তিক বাইরে-ভিতরে এই আত্মা-কেই প্রত্যক্ষ কর্‌ছেন—এইজন্যই তো তাঁর জীবনে এত আনন্দের প্লাবন! তাঁর আনন্দ দেখে আমরাও আনন্দিত হয়ে উঠি।

আত্মাকে ভালবেসে কেউ কোন দিন মোহে পড়ে নি, মোহে পড়েছে মানুষ দেহকে ভালবেসে।

অস্থরের আধিপত্য এই স্থূলের উপরই, আত্মাকে অস্থর স্পর্শ করতে পারে না। আত্মাকে আড়ালে রেখে মানুষ যতই স্থূলের দিকে নেমে পড়ে, ততই মানুষের অশান্তি, আর তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্য জাতির প্রাণেও যে আজ অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠেছে, তারও একমাত্র কারণ আত্মবিমুখীনতা। আত্মার চেয়ে দেহকে তারা বড় মনে করে নিয়েছে।

বৈদান্তিকের কাছে অবশ্য দেহ আর আত্মাতে কোন পার্থক্য নাই। কেন না আত্মশক্তির প্রভাবেই বৈদান্তিকের দেহ ভাগবত দেহে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আমাদেরও জীবনের আদর্শ এই হওয়া চাই। আত্মার ব্যাপ্তিতে সবকে আপনার করে নিতে হবে। শত্রু বলছ কাকে—তাতে যে তোমারই বদনাম। তাকেও আপনার করে নাও। দূর থেকে, কাছে গিয়ে, যে ভাবে পার তাকে নিজের আপন জন করে নাও। শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ব-মৈত্রীর ভাবই স্থায়ী হবে।—জগতের কেউ যে কারও শত্রু নয়—আমাদের জীবন যে এক সূত্রে গ্রথিত—এ কথাটা বুঝলেই পরম শান্তি—চরম উন্নতি হয়ে গেল।

———(০)———

তীর্থ-রেণু।

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

সবাই তোমায় ঘৃণা করে, বিদ্রূপ করে? তুমি যখন সামনা দিয়ে চলে যাও, তখন ওরা তোমার পানে তাকিয়ে আবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চাপা হাসি হাসে? তুমি কুৎসিৎ, তুমি বেখাপ্পা, তুমি অদ্ভুত, যাতে তুমি হাত দাও তাই ভেঙ্গে যায়,—তাই কি ওরা তোমায় ঘৃণা করে? —আর তুমিও জান, এ সব সত্যি কথা? ঘরের কোণে মুখটুকু গুঁজে পড়ে পড়ে তুমি কি ভাব, তোমার কথা কেউ ভাবে না, যদিও বা কেউ ভাবে তো সে শুধু অবজ্ঞা ভরে? —বাছা, একজন আছে জেনো, সে যে কেবল তোমার কথাই ভাবে তা নয়, তোমাকে ছাড়া তার এক দণ্ড চলে না।

তুমি কি জগতে একা? পাপে কলঙ্কিত তুমি? তোমার বুকে কি কোনো লোমহর্ষণ রহস্য লুকানো আছে, যা একদিন বেরিয়ে পড়বেই জান, অথচ আজ তাকে খুলে বলতে তোমার সাহসে কুলায় না? তোমার মুখখানা কি এমনি বিকৃত যে স্নিগ্ধ চোখে কেউ তোমার পানে তাকায় না? প্রাণহর ব্যাধি কি তোমায় আক্রমণ করেছে? গভীর নিশীথে ওই ব্যাধির করাল স্পর্শ কি তোমায় সন্ত্রস্ত করে তোলে? দুপ্রহরে, রৌদ্রের খরদীপ্তিতে পথিক যখন আনন্দে পথ চলে, ওপারের ছায়াময় আহ্বান কি তখন তোমার বুকে এসে পৌঁছায়? কামের দুর্নিবার তাড়নায় কি তুমি জর্জ্জরিত, অথচ মুখ ফুটে তা বলবার তোমার উপায় নাই? তার দংশনে তুমি কি উন্মত্তপ্রায়—কোন্ দিন যে লোকের সামনে

তোমার মুখোস খসিয়ে ফেলে, সেই আতঙ্কে কি তুমি দিশেহারা? —বাছা, একজন তোমার আছে জেনো, যে তোমার সব বোঝে। বেফাঁস হবার কিছুই নাই, বেফাঁস করবারও কেউ নাই—সবই তো সহজ-সরল! তোমার জীবনের, দেহের, মনের, প্রবৃত্তির প্রত্যেকটী কণিকা তাঁরই প্রশান্ত ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তাদের খেলা যখন সাঙ্গ হবে, সেই সর্ব্বদর্শী তেমনি প্রশান্ত ভাবে তাদের অপসারিত করবেন। এখানে সংস্কারান্ধতা নাই, দুর্ব্বলতা নাই, হাম্-বড়া ভাব নাই, কোনও ভেদ দৃষ্টিই নাই! তুমি মহাজনের কুক্ষিগত; তোমার এই মুহূর্ত্তের কার্য্য ও ভাবনা বিশ্বেরই কার্য্য ও ভাবনা বলে জেনো। তুমি যাই হও না কেন, যা-ই কর না কেন, একজন তাঁর স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি নিয়ে তোমার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন, তিনি সব বোঝেন। আজ সে দৃষ্টির সামনে তুমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছ। কিন্তু এক জন্ম বা শত জন্মের সাধনায় যদি সেই দৃষ্টির সাম্‌নে অবিচলিত থেকে তুমিও তাঁর পানে অমনি করে তাকাতে শেখ, তাহলে দেখ্‌বে, অন্তরের যত ভীতি, ছলনা, কুশ্রীতা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে! তখন আর তুমি জগতে নিঃসঙ্গ থাকবে না—তুমি হবে তখন দুনিয়ার বাদ্‌শা! বন্ধু, তোমার আত্মস্বরূপ এই আমিত্বের মায়াকে প্রতি মুহূর্ত্তে অতিক্রম করে যাচ্ছেন; যা কিছু তোমার কাছে কলুষ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তা হতে তিনি একান্ত ব্যতিরিক্ত। এই আত্মস্বরূপের পানেই তুমি ছুটে চলেছ, একদিন তাঁর মাঝেই তুমি লীন হবে। ভয় করো না—ওই যে তিনি! তোমার সমস্ত ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলার মাঝে, জীবন ভরা আঁধারের এলোমেলো গোলকধাঁধাঁর ওপারে রয়েছেন তিনি—সব তিনি দেখছেন, নিঃশব্দে সব চয়ন করছেন, পরিচালনা করছেন, ব্যবস্থা করছেন। তিনিই সর্ব্বেশ্বর। দৈব বলে যদি কিছু থেকে থাকে সে পাপ; কিন্তু দৈবই যে নাই। আত্মস্বরূপ দৈবকে কুক্ষিগত করে বন্দী করেছেন, আর তোমার জীবনের সমস্ত ভাল মন্দকে তিনি লুব্ধ দৃষ্টিতে কবলিত করে জীর্ণ কর্‌ছেন—কিন্তু তবুও তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না।

*

মানুষের যত পেশা, যত কাজের ঝুঁকি সবই তার বেঁচে থাকবার অজুহাত মাত্র। এ নিয়ে যে মানুষ কথা বল্‌তে যায়, তাইতে প্রমাণ হয় শুধু বাঁচার আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে মানুষের লজ্জা বোধ হয়। বাস্তবিক জড়ের দাস হয়ে বেঁচে থাকা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু যিনি সত্য জীবন যাপন করছেন, বাঁচার কোনও অজুহাতই তাঁকে পাড়তে হয় না। তাঁর কোনও কর্ত্তব্যের বন্ধন নাই—কারু খাতক নন তিনি।

ওগো মরণ, আমায় হাত ধরে নিয়ে চল। আমি ধূলিকণার সাথে মিশে থাক্‌ব, চাঁদের কিরণে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে প্রাণ পাব, নিতি নিশীথ সমুদ্রের বেলাধ্বনিতে মুখরিত হব। যাদের আমি ভালবাসি তাদের অধরে আমি হব সঞ্জীবন সমীরণ স্পর্শ, নির্ঝরিণীর শীতল ধারা। অদেখা হয়ে আমি জগৎময় ঘুরে বেড়াব। আমি পাহাড়ের লঘু হাওয়া। আমায় দুয়ার হতে ফিরিয়ে দিও না। আমার অতৃপ্ত বাসনা আজ তৃপ্ত হয়েছে—আবার এ বাসনা বুঝি কোনও কালেই তৃপ্ত হবার নয়। আমি চলেছি—চলেছি—কেবল চলেছি।...... পাহাড় হতে সন্তর্পণে নেমে এলাম মহানগরীর বুকে—অভিনব আমি, সর্ব্বতোব্যাপ্ত আমি—পথে পথে বয়ে চলেছি—ওই ছেলেটাকে ছুঁয়ে গেলাম—ওই মেয়েটাকে ছুঁলাম—এইবার তোমাকে—কই গো কই, আমার তৃপ্তি হল কই! আমি খুঁজে ফিরেছি একবে

—তাই সবার মাঝে নিজকে আজ বিলিয়ে দিলাম। অসঙ্গের সঙ্গী হব সাধ ছিল, তাই সবার সঙ্গী আমি আজ! তৃণাদপি তুচ্ছ যে, আমায় সে জানে না, তাকে আমি সবার চেয়ে ভাল করে জানি, সবার চেয়ে বেশী ভালবাসি। ওরে আকাশ, ওরে বাতাস! সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠ তোরা—ওরে জাগ্—জাগ্।……

হে ধরিত্রী, কি মমতাময়ী তুমি আমার প্রতি! মুমূর্ষুর চোখে তোমার সুষমার মত আজ আমার চোখে ফুটে উঠল তোমার রূপ।………আইনের শিকল খসে পড়েছে, গণ্ডীর বাঁধন ছিঁড়ে গেছে—দেশ-কালের ব্যবধান দূর হয়ে গেছে—আর আমায় রুদ্ধ ঘরে আটকে রাখ্তে পারবে না তো! ……অগণিত নর-নারীর বাঁকা ভুরুর তোরণ দুয়ার আজ আমার সম্মুখে খোলা—নূতন অমরাবতীর আবির্ভাব আমার চোখের সম্মুখে—তাই থমকে দাঁড়িয়ে আছি!……

আজ সারাদিন আমরা এক সাথে চল্‌ব। আমাদের মাথার উপর সবিতৃমণ্ডল আবর্ত্তিত হবে। পথের পাশে আমাদের ছায়া লুটিয়ে পড়বে। শীতের রৌদ্র পাহাড় হতে নিয়ে আসবে আমাদের মাঝে কত অপরূপ সিদ্ধির দ্যোতনা। সন্ধ্যা আমাদের নূতন রাজ্যে পৌছিয়ে দেবে। চির বুভুক্ষিত প্রেমের বেদনা নিয়ে আমরা রাতের কোলে একসাথে ঘুমিয়ে পড়ব—আবার ভোরে উঠেই আমাদের যাত্রা সুরু হবে। পথ আমাদের যেখানেই নিয়ে যাক্ না কেন—হোক্ সে সজনে বা নির্জ্জনে,—কিছুকেই আমরা মন্দ-বল্‌ব না। পথের শেষ হোক্, এ কথাও আমরা বল্‌ব না—কোথায় যে শেষ, তাও খুঁজ্‌ব না; সব কিছুর শেষ হবে আমাদের মাঝেই। —এই আমার কাজ। …আজ হতে আমাদের পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না—পাশ দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে যে মুহূর্ত্তগুলি, তাদেরই হবে পরিবর্ত্তন। আমাদের ভেট দিয়ে নতজানু হয়ে প্রণাম করে তারা সরে যাবে।………সিংহাসনে সমাসীন রাজ্যেশ্বরের ঐশ্বর্য্যে এই মহিমার আভাস সূচিত হয়েছিল; পুরাণ কাহিণীতে, অমরাবতীর পরিকল্পনায় আত্মার এই চিরন্তনী প্রশান্তির অস্ফুট স্বপ্নমাত্র। সংসারে নর-নারীর পরিণয়ে এরই একটুখানি রেশ। হে তুমুল ঝটিকা! হে করালিনী তমিস্রা! তোমাদের আদি অন্ত আমরা দেখেছি!……দূর হও! বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছ পাহাড়ের ওপর দিয়ে তুমি—তোমার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে! —কিন্তু আমি জানি, হেলায় তোমাদের গতিকে পরাভূত করতে পারি আমি—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কোথায়? দেখে নিও, আমার রথযুগে তোমাদের যুক্ত করে অনন্ত আকাশে দুর্দ্দম বেগে বিজয় গর্ব্বে হাঁকিয়ে চল্‌বো যে!……

পূর্ণতার দরুণ মাথা খুঁড়ে মরো না ভাই; এমন দিন আস্‌ছে যেদিন তোমার সবই হবে পূর্ণ। তুমি কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ বলে তোমার পথ আট্‌কে থাকবে না। তোমার মূর্খতা বা ছেঁড়া কাঁথায় তোমায় ছাপিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। তোমার দৈন্যকে, তোমার গর্ব্বকে পরাভূত করে অকুণ্ঠ চরণে তুমি এগিয়ে চল্‌বে—চল্‌তে চল্‌তে তাদের পানে এক নজর চেয়ে দেখ্‌বে শুধু। পাণ্ডিত্য আর চাতুর্য্য যদি তোমাকে অজস্র সিদ্ধি এনে দিয়ে থাকে তো মূর্খতা আর বোকামীতেও তোমায় তাই এনে দেবে, কিম্বা তার চেয়েও বেশী কিছু!……

আত্মানুসন্ধান হতে তোমায় বিরত হতে বলছি না। বরং জানি, আত্মস্বরূপকে খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমার বিশ্রাম নাই। ধন-দৌলত, মান-যশ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, এ যদি চাও তো কিছুক্ষণের জন্য এসব হয়ত ভালও লাগ্‌বে। কিন্তু তবুও এর চেয়ে

বড় কিছু তোমায় চাইতেই হবে। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, সাধুতায় যদি আত্মস্বরূপকে খোঁজ, কিছু-ক্ষণের জন্য তাও ভাল লাগ্‌বে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কিছু তোমার চাই!

সৌর কিরণের অজস্র চুম্বন, সমীরণ হিল্লোলের অফুরন্ত সোহাগ আমার'পরে! বিদেহ আত্মার মুক্তির আস্বাদ আমার মাঝে! পূর্ণ কাম আমি! সভ্যতার বালাই দূরে গেছে—আমি অকুতোভয়। লঘু পদক্ষেপে চলেছি অনন্তের পথে, জীবন রহস্য আমার করতলগত! সুরভি ফল, অন্ন-পান, শ্যামা-তরুলতা—সবার অধরে আমার চুম্বন!······মহা-শক্তি অপ্রতিহত গতিতে নিয়ে চলেছেন সমুখ পানে।······ওহোঃ! —পেছনে ওই ব্রহ্মাণ্ড ভস্মী-ভূত, ওই সত্যস্বরূপের অজর রশ্মি—বিশ্বগ্রাসী অনলের লেলিহান দীপ্তশিখা—অনির্ব্বাণ বহ্নিজ্বালা! এসো বন্ধু, অট্টহাসিতে মহাকাশ কাঁপিয়ে তুলি, আর সেই হাসির তরঙ্গে নূতন সৃষ্টি স্পন্দিত হয়ে উঠুক!···প্রিয়ার আঁখিপাতে, শত্রুর কমনীয় কান্তিতে এ যে তোমারই আত্মস্বরূপের দ্যুতি! —আনন্দম্—আনন্দম্! অবিরাম আনন্দ—অফুরন্ত হাসি!······

লোকমত আর দেশাচারের দাস হয়ে ছিলাম—আর দাস হয়ে ছিলাম বিদ্যা আর অবিদ্যার, সুরা আর নারীর, পবিত্রতার আর কলুষের। একটা খোলস ছেড়ে এসেছি তো আর একটা রয়েছে—সেটা ছেড়েছি তো আরও একটা—তারপরেও একটা! দীর্ঘ পথ—কাল দীর্ঘতর। মুসড়ে পড়ো না। আমার কণ্ঠস্বর কি বহুদূর হতে ভেসে আস্‌ছে? —মুসড়ে পড়ো না! এই যে আমি এগিয়ে এসেছি, দুহাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরেছি, আমার উদ্যত অধরের পানে তোমায় টেনে আন্‌ছি। তোমার অধরে যে প্রতিশ্রুতির ছাপ আজ এঁকে দিলাম, তা তো মুছে যাবার নয়!······ আমি সবার কাছে—সবার বুকে। আমায় কেউ খোঁজে না—আমিই সবাইকে খুঁজে এগিয়ে যাই।

তোমার প্রাণ যখন চাইবে না শিল্পের আড়ম্বর, বাক্যের চাতুরী, বেশ-ভূষা বা আচার-বিচারের রকমারী, দুর্লভ বা মহামূল্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা যখন তোমায় একেবারে ছেড়ে যাবে—তখন বল্‌ব "ধন্য তুমি!"

জননীর জীবন অনুচ্চারিত সামগাথা, মাতৃদেহ বিশ্বাত্মার মন্দির।

গ্রীষ্মকাল তোমার সাধনায় কেটেছে কি? শীত-কাল তাহলে মধুর হবে।

পাপ, অবনতি—এসবের সার্থকতা কি? এরা যেন দর্পণের মত। বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে এরা তোমার আত্মস্বরূপের পরিচয় দিচ্ছে। জ্ঞানীর কাছে সবই দর্পণ—কারু মাঝে সুন্দরের প্রতিচ্ছায়া, কারু মাঝে বা বিকারের প্রতিফলন।

সভ্যতাভিমানী জাতিরাই জাতিভেদগ্রস্ত, জাতির নাগপাশে আবদ্ধ তারা। প্রকৃতির মুক্তক্ষেত্র হতে তারা নির্ব্বাসিত। স্বভাবসুন্দর সুরভি জীবন ছেড়ে বৈঠকখানার বদ্ধ বায়ুতে, অন্ধ কারার অন্ধ তমে তারা ঢুকেছে। উদার বিশ্ব হতে দূরে তারা, সমস্ত সৃষ্টির অপাঙ্‌ক্তেয়, তরু-লতা পশু-পাখীর আত্মীয়তা হতে বিযুক্ত। এমনি করে তারা ভারতের ব্রাহ্মণের মত হয়ে আছে। মান-সম্ভ্রম আর ইজ্জতই হচ্ছে সমাজের যত জঞ্জাল। হাম্‌বড়ার বড়াই করেই তারা নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে, মুক্ত স্রোতকে খণ্ডিত করে বদ্ধ ডোবায় পরিণত কর্‌ছে।

দুঃখবাদ যদি জগতের বর্ত্তমান অবস্থা ও সভ্যতার দুর্দ্দশার তীব্র সমালোচনা হয় তো তাকে দোষ দিই না, কিন্তু দুঃখবাদ থেকে যদি নৈরাশ্য আর অতৃপ্তির

উদ্ভব হয় তো তাকে ভাল বলি না। তেমনি সুখবাদ যদি নিদারুণ দুর্বিপাকের মাঝেও আমাদের আনন্দে থাকতে শিখায় তো ভালই। কিন্তু তা যদি কালের কলুষের প্রশ্রয় দেয় তো এর মত দুর্দ্দৈব আর কি হতে পারে?

স্বপ্নবিভোল পথিক! সামনে তাকাও! ওই যে তোমার সম্মুখে শুভ্র দীপ্তি! পাগল হয়েছ? ওগো, ভাল করে চেয়ে দেখ—ওই বিস্ফারিত দুটী চোখ, দেখতে পাচ্ছ না কি? ওই যে উন্নত অঙ্গুলির সতর্ক সঙ্কেত! তুচ্ছ ছায়ামূর্ত্তি নয় ও, তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল নয় ও—ওই যে তিনি!

সভ্যতার অর্থ কি? —কর্ম্মব্যস্ততার ভাণ করে মানুষ ছুটে চলেছে—অথচ করছে না কিছুই! চারদিকে রব উঠেছে—"সময় যে নাই, সময় যে নাই।" কাজও কিছুই হচ্ছে না! মানুষ তার বহুমূল্য সময় ও শক্তির অপব্যবহার করছে কেবল ভোগবিলাস দিয়ে নিজকে বাঁধবার জন্য, অজস্র উপকরণের জালে নিজকে বন্দী করবার জন্য! "তৃষিতা নারী যেমন পুরুষের সঙ্গলালসায় উন্মুখ হয়ে থাকে, তেমনি আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে স্বভাবের স্বেচ্ছাচার ও বলাৎকারের জন্যও উন্মুখ হয়ে আছি, যাতে এই (সভ্যতারূপিণী) বন্ধ্যাস্ত্রের হাত হতে মুক্তি পাই!"

… …সেই শান্ত দৃষ্টি—কি সরল, স্বচ্ছ, নিরাকাঙ্ক্ষ! কোনও কিছু চায় নি, কিছুর ওপরই দাবী করে নি বলেই ও দৃষ্টি আমায় সব দিয়েছে। তার মাঝে ছট্‌ফটানী ছিল না, খিঁচুনী ছিল না, অহমিকার জঞ্জাল ছিল না, উৎকট মুখভঙ্গী, বাঁকা কথার ঝাঁঝ ছিল না—সে দৃষ্টি বাধাবন্ধহীন, নির্ম্মুক্ত!

বিজ্ঞানের যত উর্ণজাল, শাস্ত্রের নজীর আর সিদ্ধান্ত, সম্পত্তির দখলী স্বত্ব, পোটলাপুঁটুলীর যত দাবী দাওয়া—সবাইকে বলি, "তফাৎ।"

হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতেও রাজী আছি—এই মুহূর্ত্তে যদি অজানা সুদূরের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়, তাতেও রাজী আছি—একটুও ইতস্ততঃ করব না। ……নারী যেমন পুরুষকে কামনা করে, তেমনি তোমায় চাইছি—বুকের কাছে আরও নিবিড় করে তোমায় চেপে ধরব, তোমার অধরের সমস্ত মধু শুষে নেব, তোমার দেহের সঙ্গোপন অমৃতধারায় অভিষিক্ত হব, তোমার তেজকে ধারণ করব হে সত্যস্বরূপ!— "আহমজানি গর্ভধম্ আত্মমজাসি গর্ভধম্!"

(ক্রমশঃ)

—×—

নিদ্রা জয়

'আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে হলে শরীরটাকে বেশ লঘু, জড়ত্বহীন করতে হবে। তামসিক বৃত্তিতে আমাদের স্বরূপ আবৃত থাকে। ঘুমও একটা তামসিক বৃত্তি, একটু সচেতন হলেই ঘুম আমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে। ঘুমের মাঝে জাগ্রত থাকতে পারলেই তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলে। ঘুমকে জয় করতে হলেই আগে ভাল করে জেনে নিতে হবে ঘুম কি? একটু তলিয়ে দেখলে বা চিন্তা করলে আমরা এমন অনেক কিছু ভয় বা বিভীষিকার হাত থেকেই পরিত্রাণ পেতে পারি।

পাতঞ্জল-দর্শন ঘুমকে কি বল্‌ছেন, তাই একবার আলোচনা করে দেখা যাক্ ।—

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা—

অভাব বা অজ্ঞানকে অবলম্বন করে যে মনোবৃত্তি উদিত হয়ে থাকে, সেই মনোবৃত্তির নামই নিদ্রা বা সুষুপ্তি। অজ্ঞানের ধর্ম্মই হল—সবকে আচ্ছন্ন করে রাখা, অস্পষ্ট করে তোলা। অজ্ঞান হল অন্ধকার—আর জ্ঞান হল আলোক, জ্যোতিঃ। জ্ঞানীর স্বভাবতঃই নিদ্রা জয় হয়ে গিয়েছে, কেন না তাঁদের চিত্ত সর্ব্বদাই এক উজ্জ্বল অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত, কোন সময়ের দরুণ অজ্ঞান বা তামসিক ভাব এসে তাঁদের চিত্তকে মলিন বা আচ্ছন্ন করতে পারে না। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর পার্থক্য এই জায়গাতেই। যোগের মানেই হল সর্ব্ব বৃত্তি নিরোধ। সুতরাং ঘুমকেও জয় করে ফেল্‌তে হবে, কেন না ঘুম বা নিদ্রাও তো একটা বৃত্তি ! এই বৃত্তি অজেয় থেকে গেলে তো সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ হ'ল না। কাজেই পাতঞ্জলের মতে ঘুমরূপ বৃত্তিবিশেষকেও জয় করে ফেল্‌তে হবে।

ঘুম আসে কেন, তাই ভেবে দেখতে হবে। ঘুম আসে অভাব-প্রত্যয়কে অবলম্বন করে। সুতরাং সর্ব্বদার দরুণ যদি চিত্ত সজাগ থাকে, পূর্ণ থাকে, তাহলে আর ঘুম আস্‌তে পারবে না। কোন ভাব বা চিন্তাই যখন থাকে না, তখনই আমাদের ঘুম এসে পড়ে। কিন্তু সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ হয়ে গেলে এ জগৎ অন্ধকার হয়ে যায় বটে, কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ তখন বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। সেই অন্তর্জ্জগতের দিব্য প্রেরণায়, দিব্য অনুভূতিতে চিত্ত তখন তন্ময় হয়ে থাকে। এই যে তন্ময় অবস্থা—এ তো তামসিক অবস্থা নয়! কেন না তমের ধর্ম্মই হল চিত্তকে মলিন করা, কিন্তু সে সময় তো চিত্তে বিন্দুমাত্র মালিন্যও এসে স্পর্শ করতে পারে না।

পরিণাম দুদিকেই স্বাভাবিক; অধঃ পরিণাম, ঊর্দ্ধ পরিণাম। মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁরা এই অধঃপরিণামের বহু ঊর্দ্ধে। অধোমুখী বৃত্তিগুলোর প্রতাপ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিবিক্ত। কিন্তু সাধারণ মানব অধোমুখী বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। এইজন্যই তাদের তামসিক বৃত্তির দৌরাত্ম্যই অত্যন্ত বেশী। সাধকের জীবন যে সংগ্রামের জীবন, তা এর দরুণই। সাধককে কিছু দূর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তারপর সব যখন বশে এসে পড়ে, তখন তাঁরা ঊর্দ্ধ পরিণামের দিকে অনায়াসে জীবনকে পরিচালিত করতে পারেন। তখন আর কারও সঙ্গে বিরোধ থাকে না, অথচ দুষ্ট শক্তির প্রভাবেও তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে না। এরই নাম **দিব্য-জীবন** — অর্থাৎ **জীবনের মোড়কে অধোমুখী না করে ঊর্দ্ধমুখী করে দেওয়া।**

ঘুমকে জয় করা বড়ই কঠিন, কেন না চিত্তের মালিন্যের দরুণ কোন ভাবকেই আমরা স্থায়ী এবং সুস্পষ্ট করে তুল্‌তে পারি না। এইজন্যই চিত্তে সাময়িক সাত্ত্বিক ভাবের দীপ্তি দেখা দিলেও আবার যেই অন্ধকার সেই অন্ধকার এসেই আমাদের গ্রাস করে বসে। ঘুম যে আমাদের এত বেশী, তার একমাত্র কারণই হল এই।

তাহলে ঘুমকে জয় করার উপায় কি? উপায় আর কিছুই নয়—তামসিক ভাবের সঙ্গে দেহে-মনে-প্রাণে অসহযোগ করা। তামসিকতা, জড়তা লোপ পেয়ে গেলেই যে কোন একটা ভাবকে অন্তরের মাঝে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ উজ্জ্বল রাখা সম্ভবপর হবে। আর তা সম্ভব হলেই ঘুমও বিদূরিত হয়ে যাবে। কোন ভাবকে ধরে রাখতে পারি না বলেই ঘুমে আমাদের তামসিকতার রাজ্যে নিয়ে

যায়। তা না হলে ঘুমও এক উপভোগের বিষয় হয়ে ওঠে। আমাদের অধিকাংশের ঘুমই তামসিক ঘুম। কেন না ঘুমের পূর্ব্বে কোন একটা সাত্ত্বিক ভাবকে আমরা ধরে রাখতে পারি না। বিছানায় পড়ি, আর আবোল-তাবোল বিশৃঙ্খল চিন্তা এসে আমাদের ঘিরে বসে—এই চিন্তা নিয়েই হয়ত ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়ি, আর এইজন্যই ঘুমের মাঝেও সাপ-বেঙ্ কত কিছুই দেখি। ঘুমের পূর্ব্বে সকল চিন্তাকে নিরোধ করে, একটী কি দু'টী সাত্ত্বিক চিন্তা বা ভাবকে অবলম্বন করে ঘুমাতে পারলে, সেই ঘুম সাত্ত্বিক ঘুমে পরিণত হয়। অর্থাৎ দেহের ঘুম যেমনি স্বাভাবিক তেমনি হয়, কিন্তু ঘুমের পূর্ব্বে যে ভাবটী ছিল, ঘুমিয়েও দেখা যায় আমি সেই ভাব নিয়েই যেন আছি। এইরূপ সাত্ত্বিক ঘুম হলে—ঘুম থেকে উঠে শরীর বেশ হাল্কা, মনটা বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে।

ক্লান্তিটা দেহের—আত্মার নয়। কিন্তু আমরা একটার ধর্ম্ম আর একটাতে আরোপ করি। সাধারণতঃ দৈহিক ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মাকেও ক্লান্ত বলে মনে করি। এইজন্যই দেহের ঘুমের বা বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও ঢলে পড়েন। সাক্ষী—চেতা, কেবল নির্গুণ পুরুষের সন্ধান আমরা এইজন্যই পাই না।

সাধারণ মানুষের ঘুমের পূর্ব্বে সব অন্ধকার হয়ে যায়, কিন্তু যাঁরা একটু উন্নত, তাঁদের ঘুম আসার পূর্ব্বে একটা উজ্জ্বল জগৎ চোখের সম্মুখে একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটে ওঠে। তাঁরা ঘুমান বটে, কিন্তু তাঁদের ঘুম অভাব-প্রত্যয়কে অবলম্বন করে আসে না। ঘুমের মাঝে জেগে থাকা তাঁদের পক্ষে আরও সহজ। দেহ-মন-প্রাণ যখন দৈনন্দিন কর্ম্মের উত্তেজনায় ক্লান্ত-অবশ হয়ে পড়ে, তখন একটা উজ্জ্বল ভাবকে অবলম্বন করে থাকাতে তাঁদের আনন্দ আরও বেশী হয়।

ঘুমকে জয় করতে হলে, সাংখ্যের বিবেক জ্ঞানেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিবেকজ্ঞান থাকলে, ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে নিজকে আর ঢলে পড়তে হয় না। বৃত্তির সঙ্গে একাকার হয়ে আছি বলেই তো আমাদের এত দুঃখ, এত অশান্তি! বৃত্তির তরঙ্গের দ্রষ্টা হয়ে যেতে পারলে স্বরূপে অবস্থান করা হ'ল। ঘুমকে জয় করতে হলে সর্ব্বদার দরুণ যেমন একটা ভাবকে হৃদয়ে উজ্জ্বল রাখা প্রয়োজন, তেমনি তীব্র বিবেকজ্ঞানেরও প্রয়োজন। বিবেক-জ্ঞান থাকে না বলেই আমাদের ঘুম আসে—অর্থাৎ ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে সদা জাগ্রত আত্মাও আবিষ্ট হয়ে পড়েন। ঘুমের পূর্ব্বে বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে একটী কি দু'টী সাত্ত্বিক ভাবকে উজ্জ্বল করতে হবে, যেন ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে একটা স্পষ্টোজ্জ্বল অনুভূতির স্মৃতি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। ঘুম আসুক—আর দেহের ঘুম বা ক্লান্তি আসা স্বাভাবিক, কিন্তু ঘুমের মাঝে যেন তামসিকতা না আসতে পারে। অর্থাৎ ঘুমে যেন অবশ হয়ে না পড়ি। ঘুমরূপ বৃত্তি-টাও আমার করায়ত্ত হওয়া চাই। ঘুম আসুক, আস্তে আস্তে দেহ-মন-প্রাণ ক্লান্তি অপনোদনের দরুণ এলিয়ে পড়ুক, কিন্তু আমার "**আমি**" যেন অরুণোদয়ের মত উজ্জ্বল দীপ্তিতে ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। নিদ্রাজয়ের তাৎপর্য্য ইহাই।

দিবসে আমরা হাতে পায়েই কাজ করি বেশী, রাত্রে মনটাকে নিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনন্ত রহস্যের সন্ধানে বের হতে হবে। ঘুম যে কি জিনিষ, অজ্ঞান যে কি জিনিষ তাও আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে।

বিবেকজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্ব বিষয় হতে অসংস্পৃষ্ট রাখতে হবে, তাহলেই দেহ যখন এলিয়ে

পড়বে, আত্মা তখন পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে জেগে উঠবেন। আমাদের হয় কিন্তু উল্টো, দেহের ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও নিঃঝুম হয়ে পড়েন। এরই নাম তামসিক নিদ্রা। এই নিদ্রাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেই, উপনিষদের ভাষায়—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" অন্ধতম লোকে গতি হয়ে থাকে। অবিদ্যার হাত থেকে, অজ্ঞানের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি পেতে হবে। অজ্ঞান দূর করতে হলেই জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে তুলতে হবে। অন্ধকারকে শত লাঠি মারলেও অন্ধকার বিদূরিত হয় না—অন্ধকারকে বিতাড়িত করবার একমাত্র উপায় হল জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বালিত করে তোলা। চিন্তা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না, কিন্তু ইচ্ছা করলে মানুষ চিন্তাকে reduce করে দিতেও পারে। দুটী একটী চিন্তাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারলেই হল। শয়নে স্বপনে কোন সময়ই যেন সেই চিন্তা থেকে বিরতি না আসে।

অলস ভাবে দিব্য প্রেরণায় ব্যাঘাত জন্মায়। এইজন্যই সর্ব্বদা ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত হয়ে চলতে হবে। ঘুমাতে হবে আর মনে করতে হবে, এই ঘুম যে দিয়েছেন বিধাতা তারও একটা মহান্ উদ্দেশ্য আছে। বাইরের শত্রু যখন নিদ্রিত, তখন আমরা অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে পারি। দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে, তা পড়ুক, কিন্তু আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বিশ্ব-জগৎ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখনও একজন চির-জাগ্রত পুরুষ বসে বসে জগতের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন। তিনি সর্ব্বজীবের সুষুপ্তির দ্রষ্টা। আমাদের সাধনা হল সেই দ্রষ্টার সঙ্গে ঐক্য অনুভব করা, তাহলেই ব্যষ্টি-সমষ্টির সুষুপ্তির জ্ঞান আমাদের মাঝে ফুটে উঠবে।

অতিরিক্ত পরিশ্রম কমাতে হবে। তা না হলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও আড়ষ্ট হয়ে পড়েন। যাতে ভিতরটা সর্ব্বদার দরুণ সাত্ত্বিক-প্রেরণায় ভরপূর থাকে, তারই চেষ্টা করতে হবে! শরীরটা দিব্য প্রেরণার আধারে পরিণত করতে হলে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—(১) **ঘুমটা যথাসাধ্য কমাতে হবে।** (২) **আহার সম্বন্ধে খুব সংযমী হওয়া চাই—মুখরোচক জিনিষ যা সাত্ত্বিক নয়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে।** (৩) **চিন্তার সংখ্যা কমাতে হবে।** (৪) **দুটী একটী সাত্ত্বিক ভাবকে অবলম্বন করেই তন্ময় হয়ে থাকতে হবে।** (৫) **অন্তর-বাহিরের শৌচের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।** এই কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করে চললেই—ঘুম জয় হয়ে যাবে।

জীবনের স্তর

—ঃ(*)ঃ—

জীবনটা কি ? জীবনটা সত্যের প্রকাশ, শক্তির প্রকাশ, সুন্দরের প্রকাশ। পরিপূর্ণ জ্ঞান আর পরিপূর্ণ প্রেম—এই হতেই জীবনের সার্থকতা। বৈচিত্র্য আছে জীবনে ; কিন্তু সে বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্যের সূত্রে গেঁথে নেওয়াই জীবনের সাধনা। তোমার মাঝে যা কিছুর প্রকাশ হচ্ছে, তারই একটা সর্ব্বসমঞ্জস তাৎপর্য্য আছে ; সেই তাৎপর্য্যটুকু বুঝে নেওয়াই জ্ঞান। আর বুঝে নিয়ে সেই রহস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রেম ; অথবা সেই রহস্যময় উপলব্ধিকে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করাই প্রেম। জীবন জ্ঞান আর প্রেমে পরিপূর্ণ।

তোমাকে নিয়েই তো জীবন ? আচ্ছা, আগে দেখ দেখি, তুমি কে ? তোমার মাঝে প্রথমেই দুটী ভাগ দেখ্‌তে পাচ্ছ, একটী জড় আর একটী চেতনা। যেমন ধর, তোমার দেহ, আর তোমার মন। দেহের যা ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম তার বিপরীত। দেহের আয়তন আছে, আকার আছে, মনের আয়তন নাই, আকার নাই। দেহটা একটা জায়গা জুড়ে থাকে, মনটা ছড়িয়ে পড়তে পারে আবার এক জায়গায় গুটিয়েও থাকৃতে পারে। মনটা যদি দেহটার দিকে না তাকায়, তাহলে দেহটা অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, যেমন ধ্যানে অথবা ঘুমে। কিন্তু দেহটাকে সঙ্গে না নিয়েও মন পূর্ণবেগে চল্‌তে পারে। দেহের একটা অংশ যদি কেটে ফেল, অম্‌নি সেটা তোমার পর হয়ে গেল ; কাটা আঙ্গুলটা মাটীতে পড়লেই সেটা আর তোমার কেউ নয়। কিন্তু তোমার মনকে তো এমনি করে কাটা যায় না, ছেঁড়া যায় না, টুকরো টুকরো করা যায় না। এমনি করে ভাবলে দেখ্‌বে, তোমার মাঝে দুটী বিপরীত তত্ত্বের সমন্বয় হয়েছে—একটী দেহ বা জড়, আর একটী মন বা চেতনা। একটাকে ধরে তোমার বহির্জ্জগৎ আর একটাকে ধরে তোমার অন্তর্জ্জগৎ।

তাহলে প্রথমেই আমরা জীবনের দুটী স্তর পেলাম—একটী স্তর **জড়** বা দেহকে নিয়ে ; আর একটী স্তর মন বা আত্মা বা **চেতনা**কে নিয়ে।

এর মাঝে একটা কথা আছে। দেখ, তোমার দেহ যে উপাদানে গঠিত, সে উপাদানগুলো তো জগতে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তুমি ভাত খাও, রুটী খাও, দুধ খাও, ওইগুলিই তো তোমার দেহে রূপান্তরিত হয় ? তোমার পেটে যদি খানিকটা দুধ ঢেলে দিই, অমনি কতকগুলি যন্ত্রের ক্রিয়া হতে থাক্‌বে,—ফলে তোমার রক্তবৃদ্ধি হবে, শক্তি বাড়বে, চেহারা খুল্‌বে, মাথা ভাল হবে ইত্যাদি কত কি! অথচ ওই দুধটা যদি একটা বোতলে ঢেলে রাখ্‌তাম, তাহলে সেটা যেমন তেমনই থাক্‌ত, বোতলটার তাতে কোনো রূপান্তর হত না। তাহলে দেখা যায়, দেহটাও জড়, বোতলটাও জড়, দুধটাও জড় ; কিন্তু দেহের ভিতর গিয়ে দুধটার এমন কতকগুলি রূপান্তর হয়, যাতে সেটা দেহের সামিল হয়ে যায়, আর তাতে **মনেরও পরিবর্ত্তন হয়** (যেমন দুধ খেলে ক্ষুধার বোধ চলে যায়, তৃপ্তি হয়, স্মৃতিশক্তি বাড়ে ইত্যাদি)। তাহলেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, জড় আর চেতনার মাঝামাঝি একটা শক্তি আছে, যাতে জড়ের সঙ্গে চেতনাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। এই

শক্তিকে বলি **প্রাণ।** প্রাণটা শক্তি। শক্তি কি, তা বোঝানো যায় না; শক্তিকে ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, কিন্তু তার কাজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তুমি একটা ঢিল ছুঁড়লে। তোমার হাত থেকে একটা কিছু গিয়ে তো ওই ঢেলাটাকে সচল করেছে? কিন্তু সেটা কি, তা কি বল্‌তে পার? যে গতিশক্তি তোমার হাতের মাঝে আট্‌কা ছিল, তা ওই ঢেলাটার মাঝে গিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌ল, অমনি ঢেলাটা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কিসে যে ঢেলাটাকে ঠেলে নিয়ে গেল, তা চোখে দেখা গেল না। এইটা হচ্ছে শক্তি—এইটা হচ্ছে প্রাণ।

তাহলেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, জীবনে তিনটী তত্ত্বের ক্রিয়া হচ্ছে—প্রথমতঃ **জড়,** দ্বিতীয়তঃ **প্রাণ,** তৃতীয়তঃ **চেতনা।** বুঝবার সুবিধা হবে বলে আমরা তিনটী তত্ত্ব দাঁড় করালাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে গেলে মূলতঃ একটী তত্ত্বই রয়েছে জগতে, সে হচ্ছে চেতনা; জড় আর প্রাণ তারই অভিব্যক্তি। কিন্তু একথা বুঝ্‌তে হলে বিচার দ্বারা সংস্কার দূর কর্‌তে হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত কর্‌তে হয়। সে আলোচনা আমরা পরে কর্‌ব। আপাততঃ এই জেনে রাখলাম, আমার জীবনের মূলে তিনটী principle, জড়, প্রাণ ও চেতনা। এখন এই তিনটী দিয়েই আমার আমিত্বকে বুঝে দেখ্‌তে হ'বে।

এখন আর একটা বিষয় লক্ষ্য কর্‌তে হবে। তত্ত্ব কথাটাকে এখন আমরা একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর্‌ব। জড় আর চেতনাকে বল্‌ব তত্ত্ব, আর প্রাণকে বল্‌ব শক্তি। ও দুটীকে তত্ত্ব বল্‌ব এই হিসাবে—ওরা যেন passive হয়ে পড়ে আছে, জগৎময় যেন ওরা ছড়িয়ে আছে। আর প্রাণ এসে সেগুলোকে নেড়ে-চেড়ে, এটার সঙ্গে ওটাকে জুড়ে দিয়ে নিত্য নূতন ভাঙ্গা-গড়া কর্‌ছে। একবার জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ, সব জায়গায় এই জড় আর চেতনাকে নিয়ে প্রাণের খেলা। ধর, এখানে খানিকটা গোবর পড়ে আছে। গোবরটা জড়; জড় হলেও তৈরী হয়েছিল কিন্তু প্রাণশক্তি দিয়ে, কেননা মরা গরুর পেটে ঘাস গেলে তা কখনো গোবর হয় না, কিম্বা গরুটা মরে গেলেও তার পেট থেকে আপনা হতে গোবর বেরিয়ে আসে না। যাক্‌, গোবরটা অমনি পড়ে আছে। চিরকাল পড়ে থাক্‌বে, মনে কর? কিছুতেই নয়। প্রাণশক্তির ক্রিয়া অনবরত হচ্ছে ওর মাঝে। কিছুদিন পর দেখ্‌বে ওটা পচে গিয়ে ওর মাঝে পোকা কিল্‌বিল্‌ কর্‌ছে; কিম্বা ওটা সার হয়ে ফুলবাগানে ফুলগাছে শক্তি সঞ্চার কর্‌ছে, ওই গোবরটাই ফুল হয়ে ফুটছে। গোবরটা যখন পোকা হল, তখন সেই পোকার মাঝে **চেতনার আবির্ভাব হল।** এইটুকু বিশেষ করে খেয়াল কর্‌তে হবে। ছিল জড়, প্রাণ এসে তাকে নাড়তে-চাড়তে বানিয়ে দিল চেতনা!

অদ্ভুত এই প্রাণের ক্রিয়া! কোথায় প্রাণ নেই, বল দেখি? যেখানেই পরিবর্ত্তন, সেখানেই প্রাণ, সেখানেই শক্তি! Mechanical change, physical change, chemical change, biological change—change এর নানা নাম দিয়েছি; কিন্তু তত্ত্বতঃ একটা থেকে আর একটাকে পৃথক্ করি কি দিয়ে? গাছটাই প্রাণবন্ত, আর পাথরটা নয়? পাথরটাতে কোনও change হচ্ছে না? physical change, chemical change আল্‌বৎ হচ্ছে। Biological change হচ্ছে না বল্‌বে। কিন্তু biological change টা মূলতঃ কি? Physical আর chemical change এর রকমফের বই তো নয়। জড়ের dissolution আছে, propagation নাই, কিন্তু প্রাণীর individuality বজায় রেখে

propagation আছে, এই বল্‌তে পার। কিন্তু কথাটা তাহলে idea র জগতে চলে গেল। Biological Evolution আর Cosmical Evolution মূলতঃ Ideal Evolution ছাড়া আর কি? মোট কথা, জড় আর প্রাণকে তফাৎ রাখা বড় কঠিন। প্রাচীন যুগের মানব যে জড়ের মূলেও দেবশক্তির কল্পনা করত, সেটা শুধু ছেলেমানুষী নয়। Will আর Idea—এই দিয়ে প্রাণকে তুমি monopolise কর্‌তে পার না। Expansion of will and Expansion of Ideaতে গোটা জগৎটাই প্রাণময় হয়ে ওঠে, চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। তফাৎ শুধু দেখি কালে। নইলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে অগণিত গিরিপর্ব্বতের উত্থান-পতন আর একটা কীটের propagation—universal will আর ideaর দিক থেকে যাচাই করলে দুটোতে তফাৎ কি?

যাক্, এখন যা বল্‌ছিলাম, তাই বলি। আমরা দেখেছি, প্রাণের লীলায় তথাকথিত জড়েও চেতনার আবির্ভাব হয়। এই চেতনার বিশেষ লক্ষণ কি?—চেতনার বিশেষ লক্ষণই হচ্ছে—সে **নিজের খুসীমত কিছু কর্‌তে চায়।** ধর, ওই গোবরটা আর তা থেকে উৎপন্ন পোকাগুলো! গোবরটা যেখানে পড়ে ছিল, পড়েই ছিল; রোদে শুকিয়েছে, তবুও ছায়া খোঁজেনি; বৃষ্টিতে ভিজে গলে যাচ্ছে, তবুও একটা ছাতা খোঁজেনি। কিন্তু যখনি সেটা পোকা হল, তখন দেখ, তার একটা নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পেল। পোকাটাকে যদি রোদে ফেলে রাখ, সে থাক্‌তে চাইবে না, পালাবে; জলে ডুবিয়ে দাও, ছটফট্ কর্‌বে; গুবরে পোকাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ, দড়ি কেটে পালাবে। এই সবই শক্তির ক্রিয়া বটে, কিন্তু এগুলো স্বাধীন ক্রিয়া, স্বেচ্ছামত ক্রিয়া; চেতনার ধর্ম্মই হচ্ছে—**আপন ইচ্ছামত কাজ করা।** এই চেতনা যার ভিতর যত পরিপুষ্ট, সে তত আপন খুসী মত চলে। তার নিজের একটা লক্ষ্য আছে, জেদ আছে, তাকে দশের সামিল করে রাখা শক্ত! মোট কথা ইচ্ছাশক্তির প্রকাশই চেতনার ধর্ম্ম বলা যেতে পারে।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, জগৎ জুড়ে জড়-বস্তু সব ছড়ানো রয়েছে। প্রাণ এসে সে গুলোকে নেড়ে চেড়ে চৈতন্যময় জীবে রূপান্তরিত কর্‌ছে, আর সেই জীবগুলো নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে মহা লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে—হাস্‌ছে, কাঁদছে, মারছে, মরছে কত কি!

গোটা জগৎটাকেই তাহলে আমরা তিনটা ভূমিকা থেকে দেখতে পারি। বল্‌তে পারি, (১) **সমস্তটা জগৎই জড়পরমাণুর সমষ্টি মাত্র;** অথবা (২) **সমস্তটা জগৎই প্রাণশক্তির স্পন্দন মাত্র;** অথবা (৩) **সমস্তটা জগৎই চেতনাময়ী ইচ্ছাশক্তির বিকাশ মাত্র।**

এই তিনটাই কিন্তু জগৎটাকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা হতে দেখা। আসলে এই তিনটাকে মিলিয়ে তবে পরিপূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ মিল্‌বে; এর যে কোনো একটাকে নিয়ে পড়ে থাক্‌লেই চল্‌বে না!

জগৎটা যদি এই হয়, তাহলে আমাদের জীবনটাও তাই। **দেহের** দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, আমি কতকগুলি জড়পরমাণুর সমষ্টি; **প্রাণের** দিক দিয়ে তাকিয়ে বল্‌ছি, আমি বিভিন্নমুখী শক্তি-সম্পাদনের সামঞ্জস্য মাত্র; আবার আত্মার দিক দিয়ে তাকিয়ে বল্‌ছি, আমি **চেতনাময়ী**

ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। আসলে কিন্তু আমি তিনটাই।

এই তিনটী ভূমিকার এক একটীকে বড় করে নিয়ে জীবনের এক এক রকম আদর্শ তৈরী হয়েছে। যারা দেহটাকে বড় করে নিয়েছে, তারা বলে এই দেহটারই উন্নতি সাধন কর। এরাই সংসারের পৌণে যোল আনা লোক। এদের যত চেষ্টা, যত চিন্তা, যত ভয়, যত ভাবনা. সবার মূলে শুধু এই দেহটা। সংসারীর সমাজ বল, শিক্ষা বল, ধর্ম্ম বল, সব শুধু এই দেহটাকে নিয়ে। একেই বলে **জড়বাদ**। এই জড়বাদের দর্শন আছে, বিজ্ঞান আছে, নীতি আছে। জড়বাদের দর্শন বলে, জড়পরমাণুর সমষ্টিই জগৎ, জড়ের Evolution হতেই চেতনার উদ্ভব, মস্তিষ্কের পরমাণুস্পন্দনই মন। জড়-বিজ্ঞান যা বল্‌ছে, যা কর্‌ছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ; দেহটাকে আরামে রাখবার জন্য এতখানি চেষ্টা মানুষের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত আর হয়নি। আর জড়বাদের নীতি বা ধর্ম্ম কি বলে, তা যদি জানতে চাও, তাহলে একবার আমাদের দেশের দিকে তাকাও—এমন দেহসর্ব্বস্ব ধর্ম্ম আর দেহসর্ব্বস্ব নীতির জুড়ি আর কোথায়ও পাবে না। দেহ নিয়ে জীবনের সুরু, অতএব দেহ নিয়ে ধর্ম্ম ও নীতিসাধনারও সুরু হবে সে কথা জানি। কিন্তু দেহতেই যখন জীবনের পর্য্যবসান নয়, তখন তাতেই ধর্ম্মসাধনারও পর্য্যবসান কি করে হবে, তা বুঝ্‌তে পারি না।

যারা প্রাণটাকে বড় করে নিয়েছে, তারা বলে, প্রাণবন্ত হও, শক্তির প্রকাশ কর, দেখাও যে তুমি কিছু করতে পার। চাই কেবল কাজ—কাজ—কাজ! নিজের জন্য খাট—পরের জন্য খাট। কেবল অফুরন্ত কাজ—নূতন সৃষ্টি—নূতন উন্মাদনা! এটাকেই বলে **কর্ম্মবাদ** যা **শক্তিবাদেরই** practical aspect. আমাদের দেশে আজকাল এই কর্ম্মবাদের বড় আদর। দেশ থেকে জড়বাদ যতই উঠে যাচ্ছে, ততই কর্ম্মবাদের আদর হচ্ছে। কাজ কর্‌বার প্রেরণা—নিজের জন্য হোক্, পরের জন্য হোক্, কেবল খাটা—কেবল খাটা—এই একটা ভাব ফুটে উঠ্‌ছে দিন দিন। দেশের প্রাণ জেগে উঠ্‌ছে, তাই মানুষ নূতন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছে। মানুষকে যদি মানুষ করে তুল্‌তে চাও, তাহলে এই কর্ম্মবাদের প্রেরণা তাদের ভিতর জাগিয়ে তোল। বিপদ্-আপদ্ তুচ্ছ করে নূতন পথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ুক। প্রাণের আলোতে যারা পথ চল্‌তে চায়, জড়বাদীর গঞ্জনা তাদের নিত্যসহচর, সে তো জানা কথা। জড়বাদী চায় আয়েসের রাস্তা, বাঁধাপথের একচুল এদিক্-ওদিক্ চল্‌তে তার ভয়, কি জানি কিসে থেকে আবার কি হয়! অভিনবকে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য তার মর্‌বার সাহস কোথায়? আর যে মর্‌তে ডরায়, সে কি বাঁচ্‌তে জানে? ভুলকে যে ডরায়, সে কি শিখ্‌তে পারে কিছু? বাঁধা গৎ যে আওড়ায়, সে কি স্রষ্টা কবি, সে কি দ্রষ্টা মনীষী?

কিন্তু এই কর্ম্মবাদই জীবন সম্বন্ধে চরম কথা নয়। দেহের চেয়ে প্রাণ বড়; কিন্তু প্রাণের চেয়েও চিন্তা বড়, মন বড়, ইচ্ছা বড়, আত্মা বড়। যদি চিন্তা না থাকে, মন না থাকে, ইচ্ছাশক্তি না থাকে, আত্মা না থাকে, প্রাণের স্পন্দন আবার থেমে যায়। ধর, ওই যে ঢেলাটা তুমি ছুঁড়লে, মূলে যদি তোমার ছুঁড়বার **ইচ্ছা** না থাক্‌ত, তাহলে শক্তির প্রকাশ হত না। **ইচ্ছা** যতবার চাড় দিচ্ছে, ততবার শক্তির প্রকাশ হচ্ছে; তুমি যতবার **ইচ্ছা** কর্‌ছ, ততবারই ঢেল ছুঁড়ছ। আবার ইচ্ছাকে জীবন্ত করে তোলে ভাবনা বা thought force. অন্তরে একটা কিছুর **উপলব্ধি** না পেলে কখনও

ইচ্ছা জাগে না। সে উপলব্ধি হয় সৌন্দর্য্যের, নয়ত যথাতথ্যতার (harmony)। একটীর মূলে আনন্দশক্তির প্রেরণা, আর একটীর মূলে চিৎশক্তির প্রেরণা। The moment you realise a beauty or a synthesis, it bursts into will. ইচ্ছাশক্তির এই genesis প্রাচীনেরা জান্‌তেন, তাই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া (emotionএর দিক দিয়ে আরও বলা উচিত—ভাব-ইচ্ছা-ক্রিয়া), এই পরম্পরাতে তাঁরা জীবনের শক্তিগুলিকে বিন্যস্ত করেছিলেন। আধুনিক মনোবিদের Theory of Ideo-motor activityর মূলেও এই কথা।

কাজেই দেখ, শক্তিকে সক্রিয় রাখতে হলে তার পেছনে চাই মনের জোর, ইচ্ছাশক্তির জোর, ideaর জোর অথবা **আত্মার জোর।** প্রাণ তরঙ্গায়িত, বিক্ষিপ্ত; তাকে একমুখী করছে ইচ্ছা বা ভাবনা; আর অমনি মহাশক্তি জেগে উঠছে সেখানে। এলোমেলো ভাবেও শক্তির ক্রিয়া হতে পারে; আমাদের দেশে অনেকটা হচ্ছেও তাই। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্র করলে তার তেজে সমস্ত জড়তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শক্তিকে গুছিয়ে আন্‌তে পারে কে? আত্মা বা thought force, will powerএ যার বিকাশ।

একটা মানুষের উদাহরণই ধর। আজ কালকার যুগে গান্ধীর জীবনটা almost a superhuman phenomenon. গান্ধীর আত্ম কথা হয়ত অনেকেই পড়েছ। তাতে দেখি, মূলতঃ তাঁর জীবনে কোনও অসাধারণত্বই ছিল না। সাধারণ মানুষের অনেক দুর্ব্বলতাই তাঁর ছিল। কিন্তু সবার মূলে একটী জিনিষ ছিল—তাঁর আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠা। তাঁর সত্যনিষ্ঠা বল্‌তে এই বুঝি, একটা ideaকে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে পারতেন। Directly হোক্, indirectly হোক্, এই tenacity of ideas তাঁর will powerকে এত develop করেছে যে আজ he is one of the world-forces. এটা কেন হয়? —যদি আত্মাকেই সবার কেন্দ্র বলে ধরি, একমাত্র আত্মাই সত্য এই উপলব্ধি যদি আমার মাঝে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তাহলে আমার সঙ্গে সবার যোগ হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। ব্যষ্টি ইচ্ছা তখন স্বভাবতঃই সমষ্টি ইচ্ছার প্রতীকরূপে প্রকাশ পাবে। ব্যক্তির জীবনে যে ভাব তখন ফুটবে, তা হবে বিশ্বেরই আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত রূপ। জগতে যাঁরাই যুগপ্রবর্ত্তক বলে খ্যাত, তাঁদের সবারই জীবনে এমনি একটা terra firmaর সন্ধান পাওয়া যায়। পারিপার্শ্বিকের ভেদ বশতঃ তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হলেও মূলতঃ তা আত্মারই শক্তি, আর সে শক্তির পরিচয় হচ্ছে সত্যনিষ্ঠায়, tenacity of the willএ।

এই হচ্ছে **আত্মবাদ।** হয় একটা idea, নয় একটা emotionকে আঁকড়ে ধরতে হবে, আর তার কাছে সব কিছুকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। সেই ideaই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিরূপে তোমার মাঝে বিকশিত হয়ে উঠবে, আর সেই ইচ্ছার আকর্ষণে নূতন আকারে জড় সংহত হবে। এই হচ্ছে অভিনবের সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টিই জীবনের পূর্ণতা।

জড়বাদী চায় ভোগ, কর্ম্মবাদী চায় শক্তির প্রকাশ, আর আত্মবাদী চায় ধ্যান। তিনটাই জগতে চিরকাল আছে, চিরকাল থাক্‌বেই। শুধু Idealএর দিক থেকে নয়, Evolutionএর দিক থেকেও জগৎটাকে দেখতে হবে—সেইটাই হচ্ছে শক্তিমন্ত পুরুষের দেখা। Idealএর দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই তিনটী আদর্শের মাঝে উনিশ-বিশ আছেই এবং থাক্‌বেও। কিন্তু Evolutionএর

দিক দিয়ে দেখতে গেলে জড়বাদ বা কর্ম্মবাদকে একদম পুঁছে ফেলে আত্মবাদের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। গাছে সব কটাই পরিণত ফল থাকে না, কুঁড়িও থাকে, ফুলও থাকে, অপুষ্ট ফলও থাকে। যদি আত্মবাদীর কোন কর্ম্ম থাকে তো সে হচ্ছে লোক-হিতার্থে তাপ প্রয়োগ—সমালোচনা নয়, গালি গলাজ নয়, জবরদস্তি নয়। ওগুলো পরের বেলায় শোভা পায় না। নিজের উপরই জোর খাটানো ভাল। কিন্তু আমরা করি ঠিক উল্‌টো। নিজের বেলায় tolerationএর অন্ত থাকে না, যত ঝাঁঝ পরকে ভাল করবার বেলায়।

বাইরটার সমালোচনার বদভ্যাস যদি ছেড়ে দিয়ে থাক তো এইবার নিজের ভিতরের সমালোচনায় লাগ। দেখ, তুমি কোন্ স্তরে আছ—দেহবাদে, না শক্তিবাদে, না আত্মবাদে। যেখানেই থাক না কেন, আত্মবাদে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার চেষ্টা করতে হবে; ওই হচ্ছে আদত ভূমি। দেহ থেকে আত্মার উদ্ভব—জড়বাদের এই দৃষ্টি হচ্ছে to balance a pyramid on a point. উল্‌টো বিচার কর—আত্মা হতে দেহের উদ্ভব। শুদ্ধ ভাব বা Pure Idea, Pure Form তোমার চিন্তার উপজীব্য হোক। দেহটা নিয়ে টিকে থাকা বা কর্ম্মে উদ্দণ্ড হয়ে ওঠা, কোনটাই শোভা পায় না, যদি শুদ্ধ ভাবনার শক্তি পেছনে না থাকে। স্থূল জগতে বিদ্যুতের যে স্থান, অন্তর্জগতে, তোমার "আমিত্বের" বিকাশে জেনো চিন্তার সেই স্থান। বিদ্যুৎ সর্ব্বত্র—বিদ্যুৎ মহাশক্তির আধার, বিদ্যুৎ আলোর প্রস্রবণ; অথচ বিদ্যুৎ সব চেয়ে সূক্ষ্ম শক্তি। চিন্তাও বিদ্যুতের মত। যত সূক্ষ্ম হবে, যত দেহবুদ্ধি, কর্ম্মবুদ্ধি কম হবে, চিন্তার শক্তি তত বাড়বে—আশ্চর্য্য এই চিন্তাতে দেহ ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করা ততই সহজ হবে। বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় কি করে জান? মাঝে একটা চুম্বকপিণ্ড থাকে, তাকে ঘিরে একটা লৌহচক্র আবর্ত্তিত হতে থাকে—তাইতে বিদ্যুতের স্রোত বইতে থাকে। তোমার কূটস্থ চৈতন্যে—যেখানে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, সমস্ত মতলববাজী, সমস্ত বিক্ষোভের বিরতি—সেইখানে চুম্বকধর্ম্মী এক পুরুষ আছেন; তিনিই কৃষ্ণ, সব কিছুকে আকর্ষণ করছেন। তাঁকে ঘিরে চিন্তাচক্র প্রবর্ত্তিত হোক্। "যৎ করোষি, যদশ্নাসি" সব তাঁতে সমর্পণ কর। বিদ্যুৎ সৃষ্টি হবে—সেই বিদ্যুতে লক্ষ যোজন দূরে আলো জ্বলে উঠবে, তোমার প্রাণের কথা বেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে, মহাশক্তির প্লাবন বয়ে যাবে। সবাই তোমরা এক একটী Dynamo—মহাবিদ্যুতের আধার। পরকে magnetise করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আগে নিজকে magnetise কর, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে সবাইকে আত্মস্বরূপে ভাবনা কর—শক্তির প্রকাশ সহজ এবং অব্যর্থ হবে।

রঘুনাথ দাস

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নীলাচলযাত্রী গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলচন্দ্রের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই রওনা হইয়াছিলেন, তাহার পর রঘুনাথ গৃহ হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু রঘুনাথ অতি দ্রুতগতিতে অবিশ্রান্তভাবে পথ চলিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত যাত্রীদের বহুপূর্ব্বেই তিনি পুরুষোত্তম ধামে আগমন করেন।

তাহার পরে ইতিমধ্যে রঘুনাথসম্পর্কিত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা যথাসময়ে পাঠক-বর্গকে উপহার দিয়াছি। যাহা হউক রথযাত্রারও আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও শিবানন্দ সেন প্রমুখ ভক্তবৃন্দ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, —স্বয়ং মহাপ্রভু অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, যে রঘুনাথের সম্পর্কে তাঁহারা বিন্দুবিসর্গ জানেন না বলিয়া গোবর্দ্ধনপ্রেরিত লোকদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই রঘুনাথ ইতিমধ্যে নীলা-চলে আগমন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া স্বানন্দে স্বরূপের আশ্রয়ে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তাঁহারা সকলেই রঘুর মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য রঘুকে আপন কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বহু সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃপাশীর্ব্বাদ করিলেন, শিবানন্দ সেন তাঁহাকে পাইয়া সাহ্লাদে পথের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"রঘুনাথ! এবার তুমি সংসারকে অসম্ভাবিত রূপে ফাঁকি দিয়াছ। তুমি তো বহুবারই পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু কোনবারই সফলকাম হইতে পার নাই; এবার তোমার সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। তুমি গৃহ হইতে পলায়ন করিলে পর তোমার পিতা চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে নীলাচল যাত্রী-দের সহিত অবশ্যই তুমি আছ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একখান পত্র সহযোগে দশ জন লোককে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহারা ঝাঁকড়ায় আসিয়া আমাদের সাক্ষাৎ পায়। কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে না দেখিয়া এবং আমরাও তোমার আগমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবগত হইয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহার পর হইতে আমরা সমস্ত রাস্তাই তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে তোমাকে যথা-স্থানে সমুপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীগৌরাঙ্গচরণে তোমার চিত্ত সর্ব্বদাই লগ্ন থাকুক।"—

রঘুনাথ এই আশীর্ব্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, তিনি একে একে সমাগত সকল ভক্তেরই চরণ বন্দনা করিলেন।

মহাপ্রভুর একটী রীতি ছিল, রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলে তিনি তাঁহাদের সহ শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতেন, রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন, আর চারি মাস ধরিয়া নানাস্থানে বনভোজন করিয়া বেড়াইতেন। এবারেও তাহাই হইল। রঘুনাথ মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মার্জ্জন, রথাগ্রে নর্ত্তন ও আনন্দময় বনভোজন সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন এবং আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইভাবে চারি মাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া ভক্তগণ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ অবগত হইয়া গোবর্দ্ধন দাস শিবানন্দ সেনের নিকট একজন লোক প্রেরণ করিলেন, উদ্দেশ্য রঘুনাথের কোন সংবাদ অবগত আছেন কি না! প্রেরিত লোক যথাসময়ে শিবানন্দের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! নীলাচলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণোপান্তে একজন নবীন বৈরাগীকে দেখিয়াছেন কি? সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণসন্নিধানেই ছুটিয়াছে, তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাহার সহিত কি মহাশয়ের আলাপ পরিচয় হইয়াছে?

শিবানন্দ বলিলেন—"হাঁ, তিনি মহাপ্রভুর সন্নি-ধানেই আছেন। তাঁহাকে কে না চিনে? তিনি

যদিও অল্পদিন হইল নীলাচলে গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও ভজন নিষ্ঠতার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তথায় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আপনার দ্বিতীয়-স্বরূপ স্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। রঘুনাথ প্রভুর ভক্তগণের প্রাণতুল্য। রাত্রি দিন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকেন, ক্ষণমাত্রও প্রভুর চরণ ছাড়া হন না। তিনি অতি কঠোর বৈরাগ্যাবলম্বী, অশন বসনের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই, কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া জীবন-ধারণ করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া তিনি দশ দণ্ড রাত্রির পরে সিংহদ্বারে প্রসাদের জন্য দাঁড়াইয়া থাকেন; দয়া করিয়া কেহ কিছু দিলে ভক্ষণ করেন, নতুবা উপবাসী রহিয়াই ভজনানন্দে বিভোর থাকেন।"

শিবানন্দ প্রমুখাৎ রঘুনাথের এই প্রকার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া প্রেরিত ব্যক্তি স্তম্ভিত হইলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথের জনক-জননীর নিকট রঘুনাথসম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। যে রঘুনাথ আবাল্য ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত, যে রঘুনাথ কোটীপতি পিতার সন্তান, সেই রঘুনাথ আজ কি না ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিতেছে? এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদে পিতা-মাতার প্রাণ কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? তাঁহারা পুত্রের জন্য অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং যাহাতে সে আহারের ক্লেশ না পায় তজ্জন্য দুইজন ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণকে চারিশত মুদ্রাসহ নীলাচল অভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তাহারা যেন পথে শিবানন্দ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পথের বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া লইয়া যায়। উক্ত ভৃত্যদ্বয় ও ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধনের আদেশে শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করাতে শিবানন্দ বলিলেন—"নীলাচলের পথ তোমাদের অপরিচিত, বিশেষতঃ অর্থাদি সঙ্গে লইয়া মাত্র তিনজনের পক্ষে এই দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। অতএব এখন তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। আগামী সন যখন আমরা সকলে মিলিয়া নীলাচলে গমন করিব, তখন তোমরা আমাদের অনুগমন করিও।"

শিবানন্দের প্রস্তাবানুযায়ী সে-বার তাহারা ফিরিয়া আসিল; পরে রথ যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে চারি শত মুদ্রা সহ অপরাপর ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে গমন করিল।

উক্ত ভৃত্যদ্বয় এবং ব্রাহ্মণটী রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার আদেশ জানাইয়া বলিল—যে, যাহাতে রঘুনাথের কোন প্রকার ক্লেশ না হয় সে দিকে তাহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। আহারের সময় আহার যোগাইবে, বিশ্রামের সময় সেবা শুশ্রূষা করিবে। তদুত্তরে রঘুনাথ বলিলেন—অর্থে আমার কি প্রয়োজন? আমি বৈরাগী হইয়াছি, ভিক্ষান্ন দ্বারাই উদর পূরণ আমার ধর্ম্ম। আমিত আমার এ ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারি না! আর সেবাশুশ্রূষার কথা বলিতেছ? —মহাপ্রভুর উপদেশ—

> "বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা
> কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।"

অতএব আমি তোমাদের প্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য অথবা সেবা শুশ্রূষা কিছুই গ্রহণ করিতে পারিব না, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

রঘুনাথের এই প্রত্যাখানেও তাহারা ফিরিয়া গেল না; যে কোন প্রকারে হউক এই অর্থ রঘুর উদ্দেশ্যেই ব্যয় করিতে তাহারা কৃতসঙ্কল্প। তাহারা পরামর্শ করিল—এমনি প্রত্যক্ষভাবে রঘুনাথ

—২৯খ

কিছুতেই এ অর্থের কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না সত্য, কিন্তু যদি ইহা দ্বারা মহাপ্রভুর ভোগের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে প্রসাদস্বরূপ রঘুনাথ অবশ্যই উৎকৃষ্ট ভোজ্যাদি গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব তাহাই হউক। এই বিবেচনা করিয়া তাহারা রঘুর নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং প্রতি মাসে দুইবার করিয়া মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে মাত্র মাসে আটপণ কৌড়ি ব্যয়িত হইতে লাগিল। চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়—

তবে রঘুনাথে করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁঞি করে এতেক গ্রহণ ॥

এইভাবে রঘুনাথ দুই বর্ষ ধরিয়া মহাপ্রভুকে প্রতি মাসে দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া ভোগ দিলেন। অবশেষে কি জানি কি বিবেচনা করিয়া তিনি ইহা ছাড়িয়া দিলেন। পর পর দুইমাস নিমন্ত্রণ না পাইয়া মহাপ্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বরূপ! রঘুনাথ আমায় নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিল কেন?"

স্বরূপ বলিলেন—"ঠাকুর! রঘুনাথ আপন মনে বিচার করিয়া দেখিল, বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া নিমন্ত্রণ করায় প্রভুর মন বোধ হয় প্রসন্ন হয় না, এমন কি নিজেরই চিত্ত ইহাতে নির্ম্মল হয় না। প্রত্যুত: ইহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা মাত্রই ফল,— অথচ প্রতিষ্ঠা বৈরাগীর পক্ষে শূকরীবিষ্ঠার সদৃশ। সে আরও বলে—আমি মূর্খ; মূর্খের উপরোধে মাত্র প্রভু এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; তাহা না করিলে পাছে আমি দুঃখিত হই, শুধু এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার অন্যায় আব্দার মানিয়া চলেন, ইহার অন্য কোন হেতু নাই। এখন বুঝিতেছি উহা অন্যায়, সুতরাং এই অসঙ্গত কার্য্য ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।—এইরূপ বিচার করিয়াই রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিয়াছে।"

স্বরূপের মুখে মহাপ্রভু রঘুনাথের এই প্রকার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—"রঘু ঠিকই বলিয়াছে, কারণ—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল ॥"

মহাপ্রভুর এই উপদেশগুলি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। বিষয়ীর অন্ন খাইলে কেমন করিয়া ভোক্তার চিত্ত মলিন হয়, তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব জড় বিজ্ঞানের বোধাতীত হইলেও, ভারতীয় ঋষিগণ সে সমস্ত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া স্পষ্টভাবে তাহার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে—"যো যস্য অন্নমশ্নাতি, স তস্য পাপভুক্ ভবেৎ"—অর্থাৎ যে যাহার অন্ন প্রতিগ্রহ করে, সে তাহার পাপভাগী হয়। কেন না অন্নকে আশ্রয় করিয়াই পাপ বর্ত্তমান থাকে এবং এই অন্নই যে আমাদের প্রাণ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মোটের উপর এই সমস্তের একমাত্র হেতু গুণসংক্রমণ। পুষ্প হইতে যেমন প্রতিনিয়ত সৌরভ বহির্গত হয়, পূতিগন্ধ বিশিষ্ট গলিত অঙ্গ হইতে যেমন অবিরত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তেমনি প্রতি জীবের শরীর ও মন হইতে সূক্ষ্ম গুণরাজি বাহিরে বিকীর্ণ হয়। এইজন্যই দেখা যায়, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন লোকের সঙ্গ করিলে চিত্ত সাত্ত্বিক ভাবে পূরিত হইয়া উঠে, আবার রাজস বা তামস ভাবাপন্ন লোকের সঙ্গ করিলে চিত্ত তত্তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া পড়ে। অতএব বিষয়ীর

প্রদত্ত অর্থমাত্র দ্বারা সংগৃহীত ভোজ্য দ্রব্যেও সূক্ষ্মভাবে দাতার মানস ক্রিয়া বা গুণের ক্রিয়া সঞ্চারিত হয়। ইহা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব, কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে এ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। যাঁহার চিত্তযন্ত্র যত পরিষ্কার, যত sensitive, তিনি ততই এই তত্ত্বের সহিত বেশী করিয়া পরিচিত হইবার অধিকারী, নতুবা স্থূলভাবে তর্কদ্বারা এ তত্ত্বের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে অসামঞ্জস্য এবং অসংলগ্ন ভাবই প্রত্যক্ষ হইবে। এই গুণসংক্রমণ ক্রিয়ার দৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপরই হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত। নতুবা ইহার অন্য কোন কারণ নাই। শ্রীভগবদ্ বাক্যও তাই—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

অতএব যাঁহারা হিন্দুদিগের জাতিভেদপ্রথাকে ব্রাহ্মণের স্বার্থপর ব্যবস্থা অথবা অজ্ঞানতার পরিচয় বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে ইহার মূল তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এ বিষয়ে একটু ধীরভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

(ক্রমশঃ)

পথিক

Blindly কোন কিছুই follow করো না। সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে বিবিধ পীড়নে পীড়িত হও—তবু যেন অসত্যের পথে পা দিও না। বজ্রদৃঢ় বিশ্বাসে তোমাদের অস্থি-মজ্জাও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় হয়ে উঠুক! একটা মহৎ সঙ্কল্পের সিদ্ধির দরুণ—এই তুচ্ছ প্রাণটা গেলই—তাতেই বা ক্ষতি কি? এম্‌নিও তো মর্‌তে হবে একদিন—সে তো প্রাকৃতিক নিয়ম! আর এ হল মরণকে বরণ করে নেওয়া। বীরের মত হৃদয়কে শক্ত কর, ফুলের মত পবিত্র সৌন্দর্য্য ফুটে উঠুক তোমাদের মাঝে, তবে না বুঝ্‌ব তোমরা যথার্থই সত্যের পথে চলেছ।

কেবল বুঝ্‌লে হল না—কার্য্যে পরিণত করতে হবে! শুধু বুঝার মাঝে অনেকখানি দুর্ব্বলতাও থেকে যায়, তাতে সাহস পরীক্ষা হয় না। ভাবকে যাঁরা বাস্তবে পরিণত করেছেন, তাঁরা অসীম সাহসী। লোকনিন্দা, লোকভয়ের প্রতি তাঁদের ভ্রূক্ষেপও নাই! Realisation বলে একটা কথা আছে। শুধু ভাবুকতায় মানুষের ভিতর জোর আসে না। Vision is not sufficient! সুতরাং ভাবুকতার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কর্ম্মীও হতে হবে। দায় হলেই লেঠা, তা না হলে কর্ম্মকে স্বেচ্ছায় যে বরণ করে নিয়েছে—সে তো জীবন্মুক্ত! Weakness is sin—এ কথাটা সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম নাই।

পাতঞ্জলে পেয়েছ না?— "তীব্রসংবেগানাম্ আসন্নঃ।" যাঁদের ভিতর তীব্র সংবেগ এসেছে—মানুষ হতে পেরেছেন তাঁরাই! তা বলে emotion-টাকেই আমি চরম বল্‌তে চাই না—সঙ্গে সঙ্গে Regulative powerটাও থাকা চাই। Motive power আর Regulative power দুটোই থাকা চাই। সংবেগকে শ্রদ্ধা এবং বীর্য্য দ্বারা পরিচালিত করতে হবে। এ গুলো হল Rational Elements.

হৃদয়টাকে উদার কর, তাহলেই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেলে। অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা আর তোমায় ছাপিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না তখন। দ্রষ্টা হতে পার্‌লেই তো সব কিছুর লেঠাই চুকে গেল! কেমন—তা নয় কি?

প্রত্যেকের জীবনেরই একটা mission আছে। নিবিড় ভাবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাঝে সেই mission টা কি, তা ভাল করে বুঝে নাও। একজনের জীবনের আদর্শ আর একজনের জীবনের ভাব এবং বাস্তবতার সঙ্গে না-ও মিল্‌তে পারে। তাতে কি? পাঁচ ফুলের সাজিতে—পাঁচ রকম ফুল থাকাই তো সৌন্দর্য্য! আমি তোমাদের ভিতর সেই সৌন্দর্য্যকেই দেখ্‌তে চাই। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বুঝ্‌তে পার্‌লে, তখন আর কোন বিরোধ থাকে না। কাজের মত কাজ কর্‌তে না পার্‌লে, বেঁচে থাকাতেই লাভ?

আমার দুঃখ হয়, তোমাদের নিছক আচ্ছন্ন-ভাবুকতার দরুণ। আমার ভাবনার সঙ্গে কি বাস্তবতার কোন লেশ নাই? তা হলে সত্য সঙ্কল্পের অর্থ কি? ব্রহ্ম মনে কর্‌লেন আমি বহু হব, আর অম্‌নি তিনি বহু হয়ে গেলেন—এরই বা মানে কি? এ কথাটা কি আজ্‌গুবী? আমার কথায় সায় দিয়ে চল্‌তে বলি না তোমাদের—কিন্তু তোমরা বিচারপরায়ণ হও। ভাব এবং বাস্তবতার মাঝখানটাই হল দ্বন্দ্বের সেতু। ভাব থেকে বাস্তবে নেমে আস্‌তে যেমন সঙ্কট, তেমনি বাস্তব থেকে ভাবরাজ্যে যাওয়াও কঠিন! কঠিন বলে কি তোমরা শ্রান্ত পথিকের মত ক্লান্ত—অবসন্ন হয়ে বসে পড়বে? ধর্ম্ম তো যুবকেরই! "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।"

উত্তেজিত কর্‌বার দরুণ তোমাদের আমি এ কথাগুলো বল্‌ছি না। কেন না আমি জানি, উত্তেজনার পর অবসাদ আস্‌বে, তখন আমায় তোমরা গালি দেবে। আমি চাই তোমাদের উদ্দীপ্ত করে তুল্‌তে। তোমাদের ভিতরটা আলোতে, জ্যোতির প্লাবনে ভেসে যাক্‌। তখন তোমরা আমায় যা বল্‌বার বলো।

"উৎসর্গ" কথাটার মাঝে একটা মহান্‌ ভাব রয়েছে। সঙ্কল্প সিদ্ধির দরুণ জীবনকে উৎসর্গ কর্‌তে পার তোমরা? ধর্ম্ম অনুভূতির জিনিষ। ধর্ম্ম লাভ কর্‌লে, তার একটা বিকাশ দেখা দেবে। বসে বসে অলসের মত ডিমে তা' দেওয়া সম্ভবপর হবে না। তখন তোমরা দিব্য-জীবন, দিব্য-কর্ম্মের সন্ধান পাবে। শ্রীকৃষ্ণ এই দিব্য-জীবনের সন্ধানই পেয়েছিলেন—তাই তাঁর কর্ম্মও দিব্য। গীতাতে আছে, তাঁর জন্ম-কর্ম্ম সবই দিব্য।

নীচের দিকের আকর্ষণের একটা সীমা আছে—তা পার হয়ে গেলেই আর তোমায় কিছুতে টলাতে পার্‌বে না। কিন্তু উর্দ্ধ জগতের আকর্ষণের সীমা নাই। যতই উপরে উঠ্‌বে, ততই দেখ্‌বে উপর থেকে কে জানি তোমায় টান্‌ছে। কে বল্‌ছে, আধ্যাত্মিক জীবন নীরস? রস বৈ সঃ—এর উপাসক যাঁরা—তাঁদের জীবন যে নিত্য নূতন আনন্দের প্লাবনে ভেসে চল্‌ছে! বিরতি কোথায় তাঁদের? তাঁদের জীবনে অনন্ত আবেগ—অনন্ত উন্নতির পথের যাত্রী তাঁরা। জীবনে কোন দিন সাধনার ইতি হবে না এ কথা জেনো। তোমাদের ভিতর এমন অনেকেই আছ, যারা মনে কর, সিদ্ধি লাভ হয়ে গেলেই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। আমি বলি, সমাধিই চরম অবস্থা নয়। সমাধিকে ভঙ্গ করে জগৎ হিতার্থে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন, সমাধির পরও তাঁদের সাধনার দরকার হয়। এত সহজেই কি সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় মনে কর? মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের জীবনটা কি? জীবনভরা কি আকুলতাই না দেখিয়ে গেলেন তিনি! এই

আকুলতা আসে কেন? পূর্ণাবতারের জীবনেও এই আজীবন ব্যাপী সাধনা দেখি কেন? সুতরাং জীবনের কোথায়ও শেষ নাই। সেই একমেবা-দ্বিতীয়মেরই অনন্ত বিকাশ দেখ্‌তে পাবে, যতই তোমরা নিজের মাঝে তলিয়ে যাবে।

এই যে তোমাদের ভিতর এত মতভেদ, এত অসামঞ্জস্য—এর কারণ আর কিছুই নয়—একমাত্র কারণ তোমরা আত্মজ্ঞানহীন। তোমরা জীবনের স্তর ভেদ করে অনন্ত জীবনের সন্ধান পাও নি, তাই ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি, ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি তোমাদের এত লোভ, এত অসংযমী তোমরা। কোন মতেই নিস্তার নাই, যে পর্য্যন্ত তোমরা আত্মজ্ঞান লাভ না কর্‌ছ।

আমার শেষ কথা,—সংস্কারবর্জ্জিত হও, চিত্তকে উদার কর, দেখবে আধ্যাত্মিক জীবনের মাঝেও কি মাধুর্য্য ফুটে উঠে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই যে একসূত্রে গ্রথিত—এক স্তর থেকেই যে আমাদের জীবনের বিকাশ, তখন তা বেশ ভাল করে বুঝতে পার্‌বে। আজ এ পর্য্যন্তই।

———×———

হিমাচলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আমরা মধ্যমেশ্বরে যাবার কোন চেষ্টা করি নাই। পথ দুর্গম বিধায় এবং কোন যাত্রীই সে দিকে যায় না বলে আমরাও সে সঙ্কল্প স্থগিত রেখেছিলাম।

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডের উত্তর ভাগের ২৪ অধ্যায়ে উক্ত আছে, সূর্য্য বংশীয় রাজা যুবানাশ্বরের পুত্র রাজা মান্ধাতা এই স্থানে তপস্যা করে সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন। পরে এটী (উখী মঠ) রাজা মান্ধাতার রাজধানীরূপে পরিণত হয়ে যায়। হাস-পাতালটীর সামনে যে কুণ্ড আছে তাকে নলকুণ্ড বলে। ওখানে স্নান করলে জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়ে থাকে বলে শাস্ত্রের উক্তি।

এখানে জিনিষপত্রের দাম সবই উত্তর কাশীর মত। দুধ দই খুব পাওয়া যায়।

১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, **শুক্রবার**—উখী মঠ হতে খুব সকালে বের হয়ে ক্রমোচ্চ পথে এক মাইল চড়াই করার পর **মাধব** চটী পেলাম। এখানে সামান্য ২।৩খানা ঘর ব্যতীত বিশেষ অন্য কিছুই নাই। কিন্তু দুধ যথেষ্ট মিলে। আমরা আবার সেখান হতে বের হয়ে ক্রমোচ্চ চড়াই কর্‌তে লাগলাম। ২½ মাইল চড়াই করে **গণেশ** চটীতে যেয়ে পৌছি। এখানেও উপ-রোক্ত মাধব চটীর মত সামান্য ৩।৪ খানা ঘর আছে—থাকা সুবিধাজনক নয়। দুধ যথেষ্ট! গত কাল উখী মঠে আসার সময় সেই যে মন্দাকিনীর উপরিস্থিত পুল পার হয়েই চড়াই কর্‌তে আরম্ভ করেছি, সে চড়াই এখানে শেষ হল। এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ক্রমোচ্চ পথে চড়াই করে এসেছি।

মাধব চটী
১ মাইল

গণেশ চটী
২৮ মাইল

এখান হতে আবার উৎরাই আরম্ভ হল। ক্রমনিম্ন পথে উৎরাই করে ¾ মাইল যাবার পর **সিরোলী বা ব্রহ্মচটী** পেলাম। এ চটীটি উপরোক্ত দুটী চটী হতেও ছোট এবং খারাপ! সুতরাং আমরা এখানেও না থেমে আবার উৎরাই করতে লাগলাম। এক মাইল উৎরাই করে **দুর্গাচটী** বা **গোয়ালিয়াবগর** চটী পেলাম। এর পাশ দিয়েই **আকাশগঙ্গা** নদী প্রচণ্ড স্রোত নিয়ে মন্দাকিনীতে মিশবার জন্য আকুল বেগে ছুট্ছে। আকাশগঙ্গা তুঙ্গনাথের পাদদেশ হতে জন্ম নিয়েছে। এটীও পবিত্র নদী তথা এতেও পূর্ব্বপুরুষদের মুক্তির আশায় পিণ্ডাদি দান করতে হয়। আমরা তুঙ্গনাথে পৌছে এর জন্মস্থানের কুণ্ডে সে কাজ করেছিলাম। এখানকার জলের খেলা অতি সুন্দর! জলের খেলা যেখানেই সুন্দর দেখেছি, সেইখানেই থাকার জন্য জানি না কেন প্রাণ উতালা হয়ে উঠেছে। সঙ্গীয় প্রায় সকলেই আমাদের ফেলে চলে গেছেন। শরীরও বিশেষ সুস্থ ছিল না, জল দেখে মনও চল্ছিল না, সুতরাং এবেলা এখানেই থাকা স্থির হয়ে গেল। যাঁরা আগে চলে গেছেন, বিকেল বেলা শিগ্গীর বের হয়ে যেয়ে তাঁদের ধরব, এই আশাতেই এখানে থাক্লাম।

সিরোলী বা ব্রহ্মচটী ৸ মাইল

গোয়ালিয়াবগর বা দুর্গাচটী—১ মাইল

এই দুর্গাচটী হতে ক্রমোচ্চ চড়াই, পরে উৎকট চড়াই একদম তুঙ্গনাথ পর্য্যন্ত। আবার তুঙ্গনাথ হতে উৎকট উৎরাই, পরে ক্রমনিম্ন উৎরাই মণ্ডলচটী পর্য্যন্ত। আজ আমরা তিন দল হয়ে পড়েছি। চিদানন্দজী ও ছোট মা চোপতা চটী পর্য্যন্ত চলে গেছেন, সারদা ভায়া ও পাগলী মার দল পোথীবাসা পর্য্যন্ত চলে গেছেন, বাকী কয়জন দুপুরে এখানে থাক্লাম। হরিদাস ভায়া আমাদের ছেড়ে যেত না। ভায়া আমাদের সঙ্গেই আছে। এখানে তাড়াতাড়ি পাক করে খেয়ে নিলাম। দুধ যথেষ্ট— তিন আনা সের। ভৈষা ঘি ২৲ টাকা, গাওয়া ঘি ১৸০ আনা সের। গাওয়া ঘি সস্তা পাওয়ায় আমরা দেড় সের ঘি কিনে একটী লোটা ভরে নিলাম। দই ।০ আনা, চাউল ৵০ আনা, ডাল সখোষা ৵০ আনা, কোন তরি-তরকারী মিলে না। আমরা গত কাল খেয়েও অনেকগুলি কচুশাক উদ্বৃত্ত হওয়ায় ঘাড়ে করে সেগুলি এনেছিলাম। আজ দুপুরে সেগুলি খুব আনন্দের সহিত খাওয়া গেল।

সঙ্গীয় অনেকেই চলে যাবার জন্য, দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই, বিশ্রাম না করে আকাশগঙ্গা নদীর উপর কাঠের পুল পার হয়ে ভীষণ রৌদ্রের মধ্যে খাড়া উৎকট চড়াই করতে লাগ্লাম। এই এক মাইল চড়াই করতে আমাদের খুব কষ্ট হল। একদিকে অত্যধিক রোদ, অন্যদিকে ভূরিভোজনের পর রওনা, তার উপর আবার আমার শরীর অসুস্থ, এর উপর আবার খাড়া উৎকট চড়াই করতে হচ্ছে; সুতরাং খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হলেও কিন্তু ধীরে ধীরে এক মাইল চড়াই করে **ডেরা চটী** পেলাম। ডেরাচটীতেও কয়েক জন দোকানদার আছে। আমরা আশা করেছিলাম, ডেরা চটীতে আমাদের সঙ্গীয় সকলকে পাব। এখানে তাদের না পাওয়ায় তখনই বের হয়ে আধ মাইল চড়াই করে **গোকুল চটী** পেলাম। এখানেও তারা কেউ নাই। চটীটি বড় নয়। তাদের সঙ্গে মিলবার জন্য প্রাণ আই ঢাই করছে। তাই প্রচণ্ড রোদের তাপে ঝলসে গেলেও সেই রৌদ্রের মধ্যেই আবার চড়াই করতে লাগলাম। চারিদিকে ঘোর

ডেরা চটী ১ মাইল

গোকুল চটী ॥ মাইল

অরণ্য। সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। ১½ মাইল চড়াই করে যাওয়ার পর **পৌথীবাসা** নামক একটী খুব বড় চটী পেলাম। এখানে সারদা ভায়া ও পাগলী মার দল বসে বসে আমাদের কথা ভাবছে, তথা মনে মনে আমাদের সপিণ্ডীকরণ করছে। সারদা ভায়া আমাদের খুবই ভালবাসতো, এখনও বাসে। আমাদের না দেখলেই তার প্রাণে দুঃখ হত, তথা অভিমানও হত খুব। তাই সে অভিমান ভরে দুই চারটী বকুনী দিয়ে দিল। আমরা সে সব পুষ্পবৃষ্টি মনে করে সহাস্য বদনে তাড়িয়ে দিলাম। তার বকুনীতে আনন্দও হত বেশ! বেচারা বড্ড সাদা লোক।

পৌথীবাসা
১½ মাইল

এখানেও কিন্তু চিদানন্দ দা' ও ছোট মা নাই, তারা দুজনে এদের ছেড়ে সামনের চটীতে চোপতাতে চলে গেছেন। দুপুরে অত্যধিক গরম পড়াতে বুঝেছিলাম, বিকেলে নিশ্চয়ই প্রবল বৃষ্টি হবে। হলও তাই। আমরা আসার পরই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হল; সুতরাং আমাদের বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে গিয়ে চিদানন্দ দা'দের সঙ্গে মিলতে পারলাম না—এখানেই থাকতে হল! এখানে অপর্য্যাপ্ত দুধ মিলে। চটীগুলি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে-তকতকে। জলের বন্দোবস্ত বেশ ভাল। সামনের চটী চোপতায় কিন্তু জলকষ্ট খুব বেশী! তার চেয়ে এখানে থাকা ভাল। রাত্রে এখানে খুব শীত পড়েছিল। আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা, বাঙ্গলায় কত ধুমধাম—আর এখানে একদম চুপ! রথযাত্রা কাকে বলে এরা জানে না মোটেই। আমরা রথযাত্রার কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা' রথস্থ ভগবানই জানেন।

আজ আমাদের ৭½ মাইল আসা হয়েছে—তাতেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দিকটা ঘন বন-জঙ্গলে আবৃত, তার ভিতর দিয়ে আসতে হয়।

১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, শনিবার—সমস্ত রাত অনবরত মুষলধারে বারি বর্ষণ করেও যেন বরুণদেবের আক্রোশ কমে নাই। সকালে উঠে দেখি, আকাশ দেবতা মুখখানা ম্লান তথা গম্ভীর করে বসে আছেন। কখন তার রাগ শান্ত হবে বুঝা ভার! এরূপ অবস্থায় যাব কি যাব না চিন্তা করতে করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অগত্যা বের হওয়াই স্থির করে বের হয়ে পড়লাম। আজকের সমস্ত পথই চড়াই। আমরা বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্রমোচ্চ চড়াই করে ১½মাইল যাবার পর **দেবের ভিটা** নামক চটী পেলাম।

দেবেরভিটা
১½ মাইল

এখানে মাত্র ৪টী চটী, জায়গা ছোট, ভাল না, থাকার উপযুক্ত নয়। আবার রওনা হলাম, এর আগেই মন্দগতিতে বারি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে—বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলেছি। চারিদিকের ঘন বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্রমোচ্চ পথে চড়াই করে ½ মাইল যেয়ে **বানিয়াকুণ্ড** নামক চটী পেলাম। এ চটীটিও খুব ছোট—সুবিধাজনক নয়। সেখান হতে আবার বের হয়ে ক্রমোচ্চ চড়াই করতে লাগলাম। বন-জঙ্গল আমাদের ত্যাগ করে নাই। ক্রমোচ্চ পথে চড়াই করে ১½ মাইল যাবার পর **চোপতা** চটী পেলাম।

বানিয়াকুণ্ড
½ মাইল

এ চটীটি খুব উচ্চস্থানে অবস্থিত। আমরা বানিয়াকুণ্ড ছাড়ার পর হতে প্রবল জোরে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। তখন বরুণ দেবের কৃপা খুব অনুভব কচ্ছিলাম। আমরা চোপতা চটীতে পৌছবার

চোপতা
১। মাইল

সাথে সাথেই আমাদের সমুদয় জিনিষ এমন ভাবে ভিজে গেল যে, খুব ভাবনা হয়েছিল, জামা কাপড়ের জন্য না জানি কত কষ্ট হবে! কষ্ট হয়েছিলও বটে খুব !! কুলির পিঠের বোঝাটাও ভিজে একসা হয়ে গেল। এখানেও যথেষ্ট শীত! তুঙ্গনাথে ত দারুণ শীত !! আমরা শুধু চিদানন্দজীর সঙ্গে মিলবার জন্যই এরূপ প্রবল বৃষ্টিতে রওনা হয়েছি; নতুবা আকাশের দেবতা যখন মুখ গম্ভীর করে বিচার কচ্ছিলেন কি করা উচিত, আমরাও তদ্রূপ মুখ গম্ভীর করে পৌথীবাসাতেই আড্ডা জমিয়ে বুঝিয়ে দিতাম, তার রাগের কতটুকু ধার ধারি! উপায় কি? ভ্রাতৃপ্রেম এতটা কষ্ট করেও টেনে এনেছে। কিন্তু এখানে এসে আর পা সর্‌ল না। অগত্যা সকলের মতানুযায়ী এখানেই থাকা স্থির হয়ে গেল—থাক্‌লাম এখানেই। আজ মাত্র ৩৳ মাইল পথ চড়াই করে এসেছি। এরপর তুঙ্গনাথ ধাম—সে পথটুকু ভীষণ কঠিন চড়াই, তথা সেখানে শীতও খুব বেশী! হিমালয়ে যতগুলি তীর্থ এ দিক্‌টায় আছে—তুঙ্গনাথ সব চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। সে সব খবর পরে বল্‌ব। আজ সমস্ত দিনে আর আকাশ দেব জানি না কেন, তার কোপদৃষ্টি শান্ত না করে অনবরতই নিজের রাগ জাহির কচ্ছিলেন।

এখানে পৌছে জানতে পেলাম চিদানন্দ দাদা তথা ছোট মা কাল রাতে এখানেই ছিলেন। আজ এক পাণ্ডা মহারাজকে বলে সকালে তুঙ্গনাথে চলে গেছেন। ছোট মা ত চিদানন্দ দাদার এত ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাকে ছেড়ে মোটেই থাকৃতে চাইতেন না—চলতেনও তারই সঙ্গে, যদিওবা চিদানন্দজী অনেক সময় তাকে বারণ করতো বটে! কিন্তু সে মান্‌তো না। পাগলী মাও চিদানন্দ দাদার বেশ ভক্ত হয়েছিলেন, তিনি বৃষ্টিতে ভিজেই তার সঙ্গে মিল্‌বার জন্য তুঙ্গনাথে রওনা হয়ে গেলেন। তার সঙ্গে দাদার কম্বলখানা পাঠিয়ে দিলাম।

এই চোপতা চটী এমন সুন্দর স্থানে তথা এত উচ্চে অবস্থিত যে, এখান হইতে দুর্গা চটী পর্য্যন্ত সমুদয় চটীগুলি বেশ সুন্দর ভাবে দেখতে পেলাম। বৃষ্টি না থাক্‌লে এখান হতে দুর্গা চটীর শোভা না জানি কত সুন্দর দেখাত! এখানে জলের কষ্ট খুব বেশী, দূরে একটী সাধারণ ঝরণা হতে ঝির ঝির করে জল পড়ছে। কেদারনাথে মেঘের খেলা সেইরূপই চিত্তবিনোদকারী। চিদানন্দ দাদা তুঙ্গনাথে যে পাণ্ডাটিকে এখানে আমাদের খবর দিবার জন্য রেখে গিয়েছিলেন, তিনিও এইরূপ ঝড় বৃষ্টিতে আমাদের যেতে মানা করলেন। এখানে গোয়ালিয়র মহারাজের ধর্ম্মশালা, অহল্যা বাঈয়ের ধর্ম্মশালা, কালী কম্বলী বালার ধর্ম্মশালা ও আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে। জলকষ্ট না থাক্‌লে জায়গাটি মন্দ নয়। এখান হতে দুর্গা চটী পর্য্যন্ত স্তর স্তর সজ্জিত বৃক্ষরাজির অপূর্ব্ব শোভা দেখে কি যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে প্রাণ উতলে উঠে। এখানে জিনিষাদি খুব মহার্ঘ, চাউল ১৲ টাকা, ঘি ২৷৹ টাকা সখোসা ডাল ৸৹ আনা, আটা ৷৹ আনা সের। অপরিমাণ জঙ্গল থাকা সত্বেও কাঠ মহার্ঘ। সমস্ত দিনে ত বৃষ্টি থামেই নাই, রাতে বরং তার প্রকোপ আরও বাড়ল। এ চটীতে খাবারের জিনিষ এত খারাপ যে, ভাল ডাল পর্য্যন্ত পেলাম না—তরিতরকারী ত মোটেই নাই—আলু পর্য্যন্ত পাওরা গেল না। অগত্যা হরিদাস ভায়ার ইচ্ছানুসারে পলান্ন খাওয়া গেল। ভায়া আমার খুব ভাল পাচক। ঠাকুরের সঙ্গে থেকে থেকে খুব ভাল পাক করতে পারতো। পলান্নের জন্য ঘিয়ের বেশী দরকার। ঘি ত আমাদের সঙ্গেই আছে। তা ছাড়া প্রতি দিন

আমরা যে পরিমাণ ঘি খাই, তাতে পলান্ন খাওয়া ত সাধারণ ব্যাপার! অন্য একজন দোকানদারের নিকট হতে অনেক তোষামোদ করে—শুধু তোষামোদ করে নয়, তাকে খানিকটা গণোরিয়ার ঔষধ* দিয়ে, বার আনা সের হিসাবে বেশন কিনে আনলাম, বেশনের তরকারী ও পলান্নদ্বারা অতি আনন্দের সহিত উদরের তৃপ্তি সাধন করা গেল খাবার সময় অনবরত চিদানন্দ দাদার কথা মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

---

*হিমালয়ের ভিতর প্রায় প্রত্যেক লোকেরই গণোরিয়া আছে। শুনতে পাই গরমির ব্যারামও কম নয়। এরূপ ঠাণ্ডা প্রদেশে বিশেষতঃ পুণ্য ভূমিতে গণোরিয়ার প্রকোপ কেন যে এত বেশী বুঝে উঠা ভার। শুনতে পাই, তারা অত্যন্ত ব্যভিচারী, বিশেষতঃ পাহাড়ীয়া-গণোরিয়া অতি খারাপ রোগ। যার একবার হয়েছে তার জীবনখানা মাটী। তবে নিয়মিতরূপে, শুদ্ধ ভাবে থেকে নীচের ঔষধটা অনেক দিন ব্যবহার করলে বিশ্বাস আছে, ঐ কুৎসিৎ ব্যাধি হতে মুক্ত হতে পারেন। বেনে দোকানে হজরত বোর বা হজরত ভীল নামীয় কুলের মত এক প্রকার পাথর পাওয়া যায়। চাউল ২ তোলা পরিমাণ আধ পোয়া জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, (বেশী সময় ভিজিয়ে রাখলে আরও ভাল) সেই জলদ্বারা উক্ত হজরত বোর একটা পাথরে ধীরে ধীরে ঘষলে চন্দনের মত হয়, সেই চন্দনের মত জিনিষটুকু উক্ত জলের সহিত মিশিয়ে সেব্য। যদি কাঁজির সঙ্গে ঘষে নেওয়া যায় তাহলে আরও বেশী উপকার হবে। দিনে একবার, দরকার হলে ২ বারও সেবন করা যেতে পারে। প্রাতে খালি পেটে খাওয়াই বেশী লাভ দায়ক। এতে যে কোন প্রকার মেহ, প্রমেহ, গণোরিয়া, শ্বেত প্রদর, প্রস্রাব জ্বালা, পাথুরী, সোম রোগ আদি ব্যাধি ভাল হয়ে যাবে। কলিকাতার বেনে দোকানে চার টাকা সের কিনতে পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে অনেক ছিল, বিলিয়েছিও অনেক।—লেখক

সংবাদ ও মন্তব্য

[জন্মোৎসব]

বিগত ৩১শে শ্রাবণ ঝুলনপূর্ণিমা তিথিতে কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের সার্ব্বভৌম জন্ম মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্বয়ং এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরতি, বেদপাঠ, ব্রহ্মনাম যজ্ঞ ও নগর সঙ্কীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। পূজান্তে কীর্ত্তনাদির পর সমাগত ভক্তমণ্ডলী যজ্ঞীয় তিলক ধারণ ও লুচিমিষ্টান্নাদি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমের সেবকগণ এবং নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, পাবনা জেলা ও সুদূর বিহার প্রদেশের সমস্তিপুর ও জমসেদপুর হইতে ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বহু ভক্ত দর্শনার্থে আসিয়া ইহাতে যোগদান করেন।

সন্ধ্যা ৭টার পর শ্রীমৎ জিতেন ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন, অতঃপর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র

সেন, তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তাগণ আদর্শ গৃহস্থ জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং উৎসব সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। ইহাতে গুরুধামের আয়-ব্যয়ের একটী হিসাবও পঠিত হয়। অবশেষে রাত্রি ৯॥ টার সময় সভা পতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উক্ত তিথিতে বগুড়া উত্তর-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমেও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শুভ জন্মোৎসব এবং আশ্রমের ১৩শ ও ১৪শ বার্ষিক উৎসব যথা-রীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরত্রিক, পাঠ ও কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভোগান্তে দ্বিপ্রহরের পর দুই শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ কবিয়াছিলেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় আশ্রম প্রাঙ্গনে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বগুড়া সহরের হাকিম, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, শিক্ষক, পণ্ডিত, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণ যোগ-দান করেন। এই সভার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বগুড়া মিসনারীর পাদ্রী সাহেব (Rev. H. W. Cover.) তাঁহার সহধর্ম্মিনী ও সহকর্ম্মীগণ সহ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ এম. এ, বি, এল এর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি, এল এর সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা জজ (Add Dist Judge) মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার চক্রবর্ত্তী এম, এ, চতুস্তীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা গান ও স্তোত্র পাঠান্তে শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ রায় পুরাতন আর্য্য-দর্পণ হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। শ্রোতৃবৃন্দ সাগ্রহে এবং সোৎকর্ণে ইহা শুনিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীমৎ শক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী আশ্রমের দুই বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে, ক্রমান্বয়ে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দাশ, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল, শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ, বি, এল, এবং মৌলভী রহিমবক্স মিঞা—প্রমুখ বক্তাগণ আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া এক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাব সুন্দর কণ্ঠে ও ওজস্বিনী ভাষায় সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ কি—এবং সেই আদর্শ প্রচার কল্পে সারস্বত সঙ্ঘ কি করিতেছেন এই সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে ইহার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

এতদ্ব্যতীত গীতালদহ, আলোকঝারী প্রভৃতি সঙ্ঘ হইতেও জন্মোৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জগৎপুর, রাজপুর ও ঘরিসাব হইতে আমরা যে সব বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রেরকগণের ঐকান্তিক অনুরোধে সেগুলি অবিকল পত্রস্থ করিলাম :—

(১)

এবার (১৩৩৯ বাং ৩১শে শ্রাবণ) শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শুভ জন্ম তিথির উৎসব অত্র শ্রীহট্ট জেলান্বিত জগৎপুর গ্রামেও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, জপ ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যথাশক্তি সম্পন্ন করিয়া উৎসব সাঙ্গ করা হইয়াছে। জন্ম-তিথির উৎসব যদিও সার্ব্বভৌম ভাবে একমাত্র শ্রীগুরুধামেই করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি এখানে "জগৎপুর সারস্বত সঙ্ঘ" নাম দিয়া একটী সঙ্ঘ গঠন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এবং এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যের

স্মরণীয় দিনটী উক্ত শুভ জন্ম তিথিকেই করার অভিপ্রায়ে এবম্প্রকার বিশেষ অনুষ্ঠান করা হইল।

উক্ত সঙ্ঘের সাপ্তাহিক বৈঠক যদিও প্রতি বৃহস্পতিবারেই বিধি-পালনের মত করা হয়, তবুও উৎসবের দিনে বিশেষ অধিবেশন করতঃ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হইল।

১। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্যকে সঙ্ঘের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীমান্ সুখলাল গোপকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হইল।

২। সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যকেই নিয়মিত চাঁদা ও মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতঃ বিভাগীয় আশ্রমের সাহায্য করিতে হইবে।

৩। আর্য্য-দর্পণের বহুল প্রচারে যত্নবান হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মহদুদ্দেশ্যের আনুকূল্য বিধান করতঃ পরোক্ষ ভাবে শ্রীগুরু শুশ্রূষার ভার প্রত্যেক শিষ্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

জগৎপুর সারস্বত সঙ্ঘ
১৩৩৯ বাং ৫ই ভাদ্র।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য,
সম্পাদক।

(২)

গত ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রাজপুর সারস্বত সঙ্ঘে (রংপুর) শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবাস উপলক্ষে পূর্ব্বের সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তনানন্দে কাটিয়া যায়। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, গীতা-চণ্ডী পাঠ, পূজা, আরতি ও ভোগক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাহার পর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অন্যূন ২৫০ জন প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ভক্তগণ লইয়া একটী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণও যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ রাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বর্ম্মা সরকার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত একটী অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার পর হরিণচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সিংহ সঙ্ঘের উন্নতি ও বিভাগীয় আশ্রমের সাহায্য কল্পে মুষ্টিভিক্ষা ও মাসিক চাঁদা সংগ্রহ সম্বন্ধে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর রতিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পূর্ব্বোক্ত বক্তার উক্তি সমর্থন করিয়া সংঘের জমি ও গৃহ প্রভৃতির প্রদাতা পবিত্রাত্মা পরলোকগত ৺আনন্দমোহন বর্ম্মার সদ্গতি কামনা করিয়া একটী শোক সূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত সভায় সংঘ পরিচালনের জন্য একটী মণ্ডলী গঠিত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহানন্দ সিংহ ইহার সভাপতি, শ্রীমৎ রমণদাস ব্রহ্মচারী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বর্ম্মা ইহার সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

সন্ধ্যার পর যথানিয়মে আরতি, স্তোত্রপাঠ, কীর্ত্তন ও ৺হরির লুট দিয়া উৎসব সমাপ্ত করা হয়।

রাজপুর সারস্বত সঙ্ঘ
২রা ভাদ্র, ১৩৩৯।

শ্রীরমণদাস ব্রহ্মচারী,
সম্পাদক।

(৩)

বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা "ঘরিসার শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত সংঘ" (ফরিদপুর) হইতে জানাইতেছি যে ৩১শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে অত্র স্থানে আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের ফটো বড় একখানা চৌকির উপর স্থাপন পূর্ব্বক উহা কাগজ ও নানাবিধ পুষ্পদ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। সকাল বেলা হইতে গ্রামস্থ বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলে একত্রিত হইয়া উৎসব-কার্য্যের আয়োজন করিতেছিলেন। স্তোত্র বন্দনা দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা বেলা ১টার সময় সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় হইতে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উপস্থিত হইতে থাকে এবং বেলা ৪ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পণ্ডিতসার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার, অন্যান্য শিক্ষক, ডাক্তার, মোক্তার ও অন্যান্য ভদ্রলোক সকল উপস্থিত ছিলেন। হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর্য্য-দর্পণ পাঠ করেন। তৎপর কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সুগায়ক শ্রীযুত মাখনলাল দর্জ্জি মহাশয় কীর্ত্তন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন। রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন শেষ ও প্রসাদ বিতরণ হয়। উক্ত সভায় মহিলাও প্রায় ৫০ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ ও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের জয়ধ্বনি করিয়া মনের আনন্দে বাড়ী চলিয়া যান।

পোঃ পণ্ডিতসার (ফরিদপুর)
১লা ভাদ্র, ১৩৩৯।

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
ঘরিসার শ্রীশ্রীনিগমানন্দ
সারস্বত সংঘের ভক্তবৃন্দ।

সাহায্য প্রাপ্তি

[শ্রীশ্রীগুরুধামে জন্মোৎসব উপলক্ষে]

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ... ... ২৫৲
পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ... ... ৫৲
দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ... ... ৫৲
উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ... ... ৫৲
পূর্ব্ব বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ... ... ৫৲
মধ্য বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম ... ... ৫৲
জোড় পাকড়ী আশ্রম ... ... ৫৲

নদীয়া—শ্রীযুক্তা:—রামব্রহ্ম পাল ১৲, তারাপদ বিশ্বাস ১৲, প্রিয়নাথ ভৌমিক ২৲, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস ১৲, রাজকৃষ্ণ পাল ১৲, রামকৃষ্ণ পাল ১৲, পঞ্চানন পাল ১৲, শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২৲, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ১৲ **চট্টগ্রাম**—শ্রীযুক্তাঃ হেমন্তকুমার ঘোষ ৩৲, সত্যচরণ গাঙ্গুলী ১৲, প্রসন্নকুমার দাস· উকিল ১৲, প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার ১৲, বিধুভূষণ কর্ম্মকার ১৲, নগেনবালা কর্ম্মকার ১৲, গগনতারা কর্ম্মকার ।০, প্রেমলতা কর্ম্মকার ৵০, অখিলচন্দ্র কর্ম্মকার ।০, ভারতেশ্বরী কর্ম্মকার ৵০, **কুমিল্লা** ও **শ্রীহট্ট**—শ্রীযুক্তাঃ গগনচন্দ্র দেব ২৲, রাধানাথ দে ১৲, অশ্বিনীকুমার আদিত্য ॥০, অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য ১৲, বিহারীমোহন শর্ম্মা ১৲, মহিমচন্দ্র চৌধুরী ১৲, সহদেব কুমার নাথ ১৲, যোগেন্দ্রচন্দ্র ধর ১৲, ব্রজবাসী কুরী ১৲, রমেশচন্দ্র কুরী ১৲, বনবিহারী কুরী ॥০, সত্যবান কুরী ॥০, ভুবনজয় কুরী ॥০, নবদ্বীপ কুরী ॥০, দক্ষিণারঞ্জন কুরী ॥০, নন্দকুমার কুরী ॥০ **২৪ পরগণা**—শ্রীযুক্তাঃ প্রিয়নাথ মণ্ডল ১৲, ভুবনেশ্বর বানার্জ্জি ২৲, জ্ঞানদানন্দ ভাদুড়ী ১৲, আশুতোষ দাস ১৲, **হাওড়া**—শ্রীযুক্তাঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস ২৲, ফণিভূষণ মিত্র ২৲, অমলকুমার মুখার্জ্জি ২৲, **বগুড়া**—শ্রীযুক্তাঃ জানকীমোহন চৌধুরী ১৲, হরপ্রসাদ রায় ১৲, সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ১৲, গোবিন্দ পূততুণ্ড ॥০, ললিতচন্দ্র গুহ ১৲, হরিনাথ কর ॥০, **কুচবিহার** ও **ধুবড়ী**—শ্রীযুক্তা নবীনচন্দ্র রায় ১৲, নিশারাণী বর্ম্মা ১৲, রামচন্দ্র রায় ১৲, কান্দুরা বর্ম্মা ।০, ভোলানাথ রায় ।০, মহিমচন্দ্র রায় ॥০, নিবারণচন্দ্র রায়৵০, বিন্দুচরণ দাস ২৲। **ঢাকা** ও **ফরিদপুর**—শ্রীযুক্তাঃ রাখালচন্দ্র পাল পতিসার সংঘ ২৲, নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ২৲, নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় ২৲, শচীনাথ সাহা ১৲। **মেদিনীপুর**—শ্রীযুক্তাঃ প্রবোধ ব্রহ্মচারী ২৲, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ধূনিডাঙ্গা সংঘ ২৲, গন্ধেশচন্দ্র চৌধুরী খড়া সংঘ ৪।০, রামপদ পাল ২।০, মহেন্দ্রনাথ মাইতী ২৲, মন্মথনাথ বসু ২৲, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইতী ২৲, সারদাপ্রসাদ পট্টনায়ক ২৲, ভীমাচরণ বসু ২৲, শরৎচন্দ্র বানার্জ্জি ১৲, বিধুভূষণ মাইতী ১৲, পুষ্পরাণী দেবী ১৲, বসন্তকুমার পানিগ্রাহী ১৲, লক্ষ্মীনারায়ণ পাত্র ১৲, আনন্দ নগর সারস্বত সংঘ ২৲, বড়গোদা সারস্বত সংঘ ৫৲, মৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৲। **বর্দ্ধমান** ও **বীরভূম**—শ্রীযুক্তাঃ নলিনীমোহন বানার্জ্জি ২৲, সচ্চিদানন্দ সাহা ৫৲, উচালন সংঘ ৪।৵০, পঞ্চানন ঘোষ ২৲। **ময়মনসিংহ** ও **পাবনা**—শ্রীযুক্তাঃ যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্যামাচরণ সিংহ ১৲, রজনীকান্ত কুরী ৫৲। **যশোহর** ও **খুলনা**—শ্রীযুক্তাঃ হরষিতচন্দ্র রায় ১৲, সরোজকুমার মুখার্জ্জি২৲

(ক্রমশঃ)

২৫শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২৬৯

আশ্বিন—১৩৩৯

১ম খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী-স্তোত্রম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

মহাস্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,
নিধায়ান্যত্রৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবত মুখে।
তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়তে সদয়ং
নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্ ॥

তোমার চরণপদ্মে করি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন,
দেবতা সমক্ষে আমি করিয়াছি শরণ গ্রহণ।
তবু যদি চিত্ত তব মোর প্রতি না হয় সদয়,
লম্বোদর-জননি গো! বল কার লইব আশ্রয়?

অয়ঃস্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীম্,
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘ মিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিন মন্তর্মম যদি,
ত্বয়ি প্রেম্নাসক্তং কথমিব ন জায়তে বিমলম্॥

স্পর্শমণি স্পর্শে যথা লৌহ হয় ত্বরিতে কাঞ্চন,
পথ-বারি গঙ্গা স্রোতে মিলি হয় পবিত্র যেমন।
তেমতি যদিও মোর পাপে চিত্ত বিমলিন অতি,—
আসক্ত তোমার প্রেমে শুদ্ধ কেন না হবে সম্প্রতি ?

ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্তদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরুতৎ॥

বাঞ্ছিত ফলেরই লাভ হয় শুধু হ'তে অন্য জন,
তুমি কিন্তু ক'রে থাক আশাতীত ফল বিতরণ।
ব্রহ্মাদি প্রাচীন গণও বলে থাকে ইহা গো ঈশানি !
অতএব কর মোর চিত্তে তোমা লগ্ন দিন যামী॥

স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-
ত্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধর বিলাসৌঘশিখরম্।
মুকুন্দ ব্রহ্মেন্দ্র প্রভৃতি পরিবারং বিজয়তে,
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবন মহারাজ গৃহিণি॥

উজ্জ্বল স্ফটিক ভিত্তি, যেথা তব প্রতিবিম্ব পড়ে,
চঞ্চল চন্দ্রমাকর বিস্ফুরিত যাহার শিখরে,
পরিবাররূপে রাজে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র-দেবচয়।
হোক্ তব বিশ্বেশ্বরি ! হেন রম্য ভবনের জয়॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ,
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃত করপুট সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনীধরাধীশ তনয়ে,
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা॥

কৈলাসে নিবাস তব ব্রহ্মা-আদি স্তুতি পরায়ণ,
কুটুম্ব ত্রিলোকবাসী করগত সিদ্ধি অগণন।
মহেশ প্রাণেশ তব ওগো নগ-অধিরাজ বালা,
কোথাও নাহিক তব সৌভাগ্যের বিন্দুমাত্র তুলা॥

বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগ নিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা॥

বাহন বিবৃদ্ধ বৃষ, ভক্ষ্য বিষ, পরিধেয় আশা, *
শ্মশান ক্রীড়ার ভূমি, অহিকুল অতুলন ভূষা।
সমগ্র জগতে আছে স্মরারির সামগ্রী এ জানা,
হে জননি! এ ঐশ্বর্য্য তোমারই গো সৌভাগ্য মহিমা॥

অশেষ ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ,
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হলাহলমখিলভূগোল কৃপয়া,
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরাজি সংহরণে স্বাভাবিক মতি,
শ্মশানে শ্মশানে বাস, ভস্মলিপ্ত অঙ্গ পশুপতি।
তবু বিশ্বে করি কৃপা কণ্ঠে সে যে ধরে হলাহল,
হে কল্যাণি! বুঝি মনে এ তোমার সঙ্গতিরই ফল॥

---

* আশা=দিক্

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,
ভীত্যৈবাসীৎ গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে।
তদেতস্যাঃ স্তাম্যদ্ বদন কমলং বীক্ষ্য কৃপয়া,
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজ শিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥

অতুল সৌন্দর্য্য তব হেরি ওগো নগেন্দ্র-নন্দিনি !
মহাভীত হয়ে ধরে জলময়ী তনু মন্দাকিনী।
দেখি তবে বিমলিন মুখপদ্ম গিরিশ তাহার,
কৃপা করি শিরে স্থান দিয়া করে সম্মান বিস্তার ॥

বিশাল শ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণ-ঘুসৃণ-
প্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গ সলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংশূন্নিজকরৈঃ,
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাম্ ॥

সুন্দর চন্দন রস, মৃগমদ কুঙ্কুম কুসুমে,
মিশ্রিত-আকীর্ণ তব স্নান জল ওগো হররমে !
তোমার চরণধূলি নিজহাতে করি আহরণ,
স্বর্গের কামিনীবৃন্দে সৃষ্টি কর্ত্তা করেন সৃজন ॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিত-লতাভিঃ পরিবৃতে,
স্ফুরন্নানাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে,
স্মরেদ্‌যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিত পীড়াপসরতি ॥

পুষ্পিত লতায় ভরা হংস-অলি মুখরিত মাসে,
মলয়-দোলিত-জল-সরোবরে পদ্ম যবে হাসে।
সে মধু বসন্তে তুমি সখীসহ কর ওগো ক্রীড়া,
যে স্মরে এ ভাবে তোমা দূর হয় তার জ্বর-পীড়া ॥

বোধন

—::(०)::—

বোধন কার? —নিদ্রিত জীবের, না চৈতন্যময়ী জগজ্জননী মায়ের! জাগাব কাকে? —নিজকে না যিনি জেগেই আছেন তাঁকে! আমি তো দেখ্‌ছি, জাগাতে হবে আমাকেই; আমার চেতনা যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, চৈতন্যময়ী মাকে তো প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌ব তখনই। মা তো জেগেই আছেন, সন্তানের কল্যাণের দরুণ মা নিশিদিন ব্যাকুলা, নিদ্রিত জীব তো তা বুঝতে পারে না। মা যখন কৃপা করে সকল বন্ধন উন্মোচন করে দেন, জীব তখন সকল তত্ত্বেরই সন্ধান পায়। ওরে মূর্খ! মাকে আবার জাগাবে কি! নিজকে জাগা। মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে কে? তুই—না চৈতন্যময়ী জগদ্ধাত্রী মা? তাই বল্‌ছি, এ বোধন মায়ের নয়—তোরই। তুই জেগে উঠ—তাহলেই দেখতে পাবি—কে জাগ্রত, আর কে নিদ্রিত!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চৈতনেত্যভিধীয়তে!

সর্ব্বভূতে যিনি চৈতন্যরূপিণী, তাঁকে আবার জাগানো কি? তিনি তো জেগেই আছেন। বোধন মায়ের নয়—বোধন আমারই। মাগো! তোমার মোহ-নিদ্রাভিভূত সন্তানের প্রতি একবার করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আর কত কাল এমনি করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাব মা! কত জন্ম জন্মই তো এমনি করে কেটে গিয়েছে—কৈ তুমি তো আমার চেতনাতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠনি! সন্তানের প্রতি যে তোমার করুণার সঞ্জীবনী শক্তি নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে, তা কেমন করে স্বীকার করি মা?

তুমি যদি চৈতন্যময়ীই হয়ে থাক, তাহলে আমার চেতনাতে তোমাকে খুঁজে পাই না কেন মা? মানুষ বলে, বোধন করে ৺মাকে জাগাতে হয়। আমি বলি, একমাস আগে থেকে যে মায়ের নাম সঙ্কীর্ত্তন—এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—মোহাভিভূত জীবের প্রাণে চেতনা সঞ্চার। নাম কর্‌তে কর্‌তে যদি প্রাণে উদ্দীপনা জাগে, তাহলেই চৈতন্যময়ী জগজ্জনীর বিদ্যুন্ময় দীপ্তি চিত্তের মাঝে ঝলক্‌ দিয়ে উঠবে। বাস্তবিকই তো মায়ের কি অপার করুণা! মায়ের স্মৃতি যাতে অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে—তার দরুণই তো এই বোধনের প্রথা।

মাগো! তোমার চেতনা হৃদয়ে জাগরূক থাকে না বলেই তো এত লাঞ্ছনা—এত যাতনা ভোগ করি। তোমা ছাড়া হই যখন, তখনই তো জীবনে অসুরের প্রভাব! দুঃখের অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়েই বুঝি তুমি এমনি করে সন্তানকে কাছ ছাড়া কর, আবার স্নেহ-বিগলিত চিত্তে তুমিই করুণা করে বুকের কাছে টেনে তুলে নাও তোমার সন্তানকে। তবে আর আমার ভয়ই বা কিসের—আক্ষেপই বা করি কিসের দরুণ?

শুধু আমার নয়, জাতির প্রাণে ভাল করে চেতনা সঞ্চার কর মা! তোমাকে ভুলেই যে আমাদের এই দুর্গতির সূত্রপাত—এ তো আর বুঝতে বাকী নেই? জড়ত্বে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—দুঃখের তীব্র দহনে সেই জড়ত্ব মুছে যাক্‌। সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক্‌, জড়ত্বের ভস্মরাশির স্তূপ হতে শক্তি রূপে, চেতনা রূপে তুমি আমাদের মাঝে ফুটে উঠ। তুমি যে আছ, মুখেই শুধু বলি, এর প্রমাণ দেবার বেলায়

লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। তুমি যার মাঝে, যে জাতির প্রাণে রয়েছ—সেই মানব, সেই জাতি এমন করে জড়ত্বে তলিয়ে যায় কেমন করে মা! তাই বলি মা, তুমি আমাদের কাছ ছাড়া করেছ অনেক দিন হল। আমাদের শক্তি নাই—তুমি নিজে কৃপা করে আমাদের প্রাণে শক্তি-সঞ্চার কর মা, আমাদের চেতনার দীপ্তি দিগন্ত প্রসারিত হোক্। কোন কিছুতেই যেন পরাঙ্মুখ হতে না হয় আমাদের। বাঙ্গালীর গৌরব—বাঙ্গালী মাতৃ-সাধক জাতি। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতাই কি তোমার সন্তানের পরিচয় মা? আজ যে শক্তির জাগরণ দেখ্‌ছি—এতে তো আতঙ্ক হয়, তোমার যুবক সন্তানেরা যেন শক্তি পেয়ে তোমাকে ভুলে গিয়েছে, তাই শক্তি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করে উঠতে পার্‌ছে না। তাহলে তারা তোমার করুণা পেয়েছে—এ কথা বলি কি করে মা? যারা তোমার কৃপা পেয়েছে—তারা অমন চঞ্চল হবে কেন—তাদের প্রাণে জাতি-বিদ্বেষের অগ্নিই বা প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে কেন? সবই যখন তোমারই সন্তান মা, তখন তো জগৎময় এক ভ্রাতৃত্ব বোধ ছাড়া আর কিছুই জাগতে পারে না। যারা তোমার শক্তি লাভ করেছে—তারা এমন বিদ্বেষী হবে কেন? তুমি যাদের শক্তি দাও—শক্তি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তো সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান কর।

মাগো! দিশেহারা, অকূল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে তোমার সন্তানেরা, তাতেও কি তোমার করুণা হয় না? লক্ষ্যভ্রষ্ট উত্তেজিত সন্তানের প্রাণে তুমি প্রশান্তিরূপে জাগ্রত হও মা! শক্তি পেয়ে যদি উন্মত্ততাই এসে গেল—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানই না থাক্‌ল, তাহলে সেই শক্তিতে লাভ? আর বাস্তবিকই কি সেই শক্তির মূল কেন্দ্র তুমি? প্রাণে যেন এ কথাটা কিছুতেই সায় দেয় না। তোমার শক্তি পেয়ে যারা তোমায় ভুলে নি মা, তাদের প্রতি পদ-বিক্ষেপটাই যে তোমারই ইঙ্গিতে পরিচালিত! তারা অমন উত্তেজিত—ক্ষুব্ধ হবে কেন? বোধনের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে—সকল প্রকার উত্তেজনা দূর হয়ে যাক্। জাতির নির্দ্দেশ তুমিই বলে দিয়ে যাও—আমরা স্থির-ধীর হয়ে তারই সাধনা করি। উত্তেজনাতেই তো চেতনা অমন করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তাই তো উত্তেজনায় অবসাদের পর মর্ম্মান্তিক দৈন্য দেখা দেয়। জড়ত্বে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকা—এ যে কি নিদারুণ কষ্ট, এ যে কি নিদারুণ অভিশাপ তা আর বল্‌বার নয়!

জাতিকে জাগ্রত করে, পথের সঙ্কেতও তুমিই বলে দিয়ে যাও মা! তা না হলে হঠাৎ জড়ত্ব ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে যে কুম্ভকর্ণের ন্যায় দিশেহারা হয়ে প্রলয় কাণ্ডই বাধিয়ে বস্‌বে জাতি। তাতে তো জাতির কল্যাণ নাই মা! তাই জাতির জাগরণের সময় যেন তুমি আড়াল হয়ে না পড় মা! তুমি যদি চেতনাতে সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাক, তাহলে আর শক্তিতে গর্ব্বান্ধ করে তুল্‌তে পার্‌বে না আমাদের, শক্তির অপব্যবহারও তাহলে আর হবে না। জাগরণের লক্ষণ সর্ব্বত্রই প্রতিভাত হচ্ছে, কিন্তু আশঙ্কাও হয় এত কালের জড়ত্ব ভঙ্গের পর, শক্তির অনুভবে আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে না পড়ি!

শক্তি দাও, কিন্তু শক্তির আতিশয্যে যেন পাগল হয়ে না উঠি, উন্মাদনা যেন না আসে। এইজন্যই তো বল্‌তে চাই, দুর্ব্বল জাতির প্রাণে তিল তিল করে শক্তি-সঞ্চয় কর মা। তুমি অফুরন্ত শক্তি ঢেলে দিলেই বা কি হবে, যদি সেই শক্তি ধারণ কর্‌বার যোগ্যতা না থাকে? অনেকেই বলে জাতির প্রাণে তুমি জাগ্রতা হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমার যেন মনে হয় জাতীয় জীবনে এখনো অনেক খানি শুদ্ধি

বা নিষ্ঠার অভাব, তাই শক্তির অপব্যবহারও হচ্ছে অনেক। তুমি ঠিক ঠিক জাগ্রতা হলে, তখন আর কি এত উচ্ছৃঙ্খলতা থাক্‌তে পারে? কেননা শক্তি যার, শক্তি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও যে তারই। তুমি কি আর আমাদের লোকের কাছে অপদস্থ কর্‌তে চাও? শক্তির অপব্যবহার—এতে যে তোমারই দুর্নাম মা! তাই বলি জাতির প্রাণে তুমি জীবভূতা ধৃতি-শক্তিরূপে দেখা দাও। অটল-বীর্য্য, অটল নিষ্ঠা জেগে উঠুক জাতির প্রাণে। কোন হুজুগ নয়, জাতি বিদ্বেষ নয়—তোমার কল্যাণময় শক্তির প্রভাবেই জাতির সকল দিকের দৈন্য ঘুচে যাবে—এ আমার খুবই বিশ্বাস। জীবনের উন্নতি লম্ফ ঝম্ফে হয় না, তিল তিল করেই জীবনের উন্নতি। কথাটা ব্যষ্টি-সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই খাটে। আমাদের বুদ্ধিকে প্রলয়ঙ্করী করে তুলো না মা—তুমি আমাদের বুদ্ধিতেও প্রতিভাত হও! তুমি যেখানে অস্পষ্ট, তোমার বোধ যেখানে উজ্জ্বল নয়, সেখানেই তো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। আমাদের চেতনাতে তুমি নিয়ত বিরাজ কর মা! শক্তির প্রকাশ কি মা উচ্ছৃঙ্খলতাতেই? তোমার কি আর শান্ত রূপ নেই মা? "যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।" আমরা তোমার কল্যাণময় রূপ দর্শনেরই ভিখারী! লোকে বলে নারীদের মাঝেও তুমি শক্তিরূপে জেগে উঠেছ। কিন্তু শক্তির বিকাশে কি নারী হৃদয় হতে কমনীয়তা, স্নেহ, দয়া-মায়া সবই লোপ পেয়ে যাবে মা? এরই নাম কি শক্তির বিকাশ? তাই জাগরণের কথাতে যেমন আশ্বাস পাই, তেমনি আতঙ্কও উপস্থিত হয়। শক্তির প্রলয়ঙ্করী রূপও আছে—কিন্তু ভারতের মানব তা দেখতে চায় না। ভারতের সন্তান শক্তি-প্রয়াসী, সমন্বয়বাদী—তারা প্রলয় চায় না, চায় সৃষ্টি রক্ষা। তাই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের করাল রূপ দেখে ভাল পান নি—তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণের শান্তমূর্ত্তিই ছিল মনোরম। আজ চারিদিকেই শক্তির অপব্যয়—শক্তির অপব্যবহার দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাতে মনে হয়, আমাদের চেতনাতে এখনো মালিন্য রয়েছে যথেষ্ট। তুমি যে কি, তা এখনো আমরা বুঝে উঠতে পারি নি। তোমার আসল রূপের সন্ধান এখনো আমরা পাই নি।

তুমি যখন যথার্থ রূপে আবির্ভূত হবে মা, তখন আমাদের মাঝে সকল শক্তিরই স্ফূরণ হবে। সর্ব্বসমঞ্জসা শক্তিই তো আদর্শ! বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তি-সামর্থ্যে কোথায়ও দৈন্য আর থাক্‌বে না। কেবল একদিকের শক্তি-উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেই অনেক অসামঞ্জস্যের সূত্রপাত হয়, আমরা তো সেই শক্তির অভিলাষী নই। তুমি যদি আমাদের মাঝে জাগই, তাহলে আমাদের সকল দৈন্যকে পূর্ণ করেই জাগ্রতা হও মা, একদিকের শক্তি-জাগরণের কোন মূল্য নাই। শক্তির উগ্রতা দেখে, অপব্যবহার দেখে—প্রাণ তো উদ্বুদ্ধ হয় না আমার কিছুতেই। নিছক প্রতিহিংসা দ্বারা মুষ্টিমেয় লোক কি কর্‌তে পারে মা? ভেবে দেখেছি, তুমি এখনো জাতির মাঝে উদিত হও নি, তাহলে তো শক্তির সামঞ্জস্যই দেখা দিত। সর্ব্বভূতে সকল শক্তিরূপেই তো দেখা দিবে মা, তাহলেই না বুঝি তুমি পরিপূর্ণ রূপে মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হয়েছ? তুমি চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণা-রূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতি-রূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, ভ্রান্তিরূপে—সকল শক্তিতেই তো দেখা দিবে মা! আমাদের জন্ম সার্থক হবে সেইদিনই মা! আমরা তোমার এই নিখিল শক্তির ব্যাপ্ত রূপ দর্শনেরই প্রয়াসী! "ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমো নমঃ"—আমরা তোমাকে

ব্যাপ্তিরূপেই নমস্কার করি।

নিদ্রিত জাতি জেগে উঠুক—কিন্তু মতিচ্ছন্ন করো না মা আমাদের। তোমার করুণায় যেন আমাদের দৃষ্টি অন্ধ না হয় কখনো। আমরা যে শক্তির উপাসক—শক্তির সদ্ব্যবহারেই যেন তা প্রমাণিত হয়। ক্ষণিক উত্তেজনা তোমার করুণা নয়—তোমার অভিশাপ! আমরা যেন তোমার অভিশাপের ভাগী না হই। "যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব নঃ সর্ব্বাপদঃ হন্তি।"—আমরা তারই উপাসক।

তোমার ভর্ত্তা যে হতে চায়—সেই তো অসুর! অজ্ঞানী বলেই তো তোমার কাছে থেকে ধার করা শক্তি নিয়ে আবার তোমাকেই অস্বীকার কর্‌তে চায় মা! আমরা তোমার সন্তান—এ সম্বন্ধের চেয়ে আর বড় সম্বন্ধ কি আছে মা? তুমি জীবভূতা পরাপ্রকৃতিরূপে আমাদের ধারণ করে রয়েছ মা—এই আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি, মায়ে ছেলের সহজ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে অস্বীকার করে যারা চায় তোমার উপর প্রভুত্ব কর্‌তে, তুমি তাঁদের প্রতি হেসে বল—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

—তুমি তো জানই সন্তানের সকল ক্ষমতা। সন্তানের গর্ব্বান্ধ ভাব দেখে তোমার হাসি ছাড়া আর কিই বা আস্‌বে? মায়ের সঙ্গে আবার সন্তানের যুদ্ধ! এ-ও ভাবি, তোমার শক্তিরই না কি বিক্রম, যাদের তুমি করুণা কর, তারাই বুঝি অমন গর্ব্বান্ধ হয়ে ওঠে! কই তুমি তো সকল শক্তি ধারণ করেও স্নেহময়ী জগজ্জননীই। মাগো! সকল শক্তিকে ধারণ করেও যেমন তোমার কোন উগ্রতা নাই, আমাদেরও শক্তি দিয়ে তেমনি নিরভিমানী, নিরলস কর্ম্মী করে তোল। কাজ কর্‌তে চাই, কিন্তু কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমার স্নেহ করুণার ধারা নিয়ত বর্ষিত হতে থাকে। আমি যেন বুঝি—আমার সকল প্রচেষ্টার মূলই তুমি!

তোমাকে বোধন কর্‌তে গিয়ে আমারই চেতনা জাগ্রত হচ্ছে মা! আমি দেখছি, অঘোর ঘুমে আমিই ছিলাম, চেতনার এক স্তরে আরোহণ কর্‌ছি, আর তোমার দিব্যরূপ দর্শনে বিস্মিত —অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের কত কাছে, কেমন জাগ্রত রূপেই রয়েছ মা! আমাদের বুদ্ধির জড়তায়, চেতনার আবরণের দরুণই তো তোমায় দেখতে পাই না। জড়ত্ব সংস্কার যখন নিঃশেষে মুছে যাবে মা, তখনই বোধ হয় তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণময় রূপের দর্শন পাব। বোধনে যখন বসেছি —ক্রমে ক্রমে আমার চেতনায় তুমি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিবেই। এ আমার গর্ব্ব—এ আমার সান্ত্বনা —এ আমার প্রাণের জোর!

—জয় মা আনন্দময়ী—

সঙ্ঘশক্তি

—ঃ(*)ঃ—

তোমরা অনেক দিনই আমায় সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরুণ অনুরোধ করিয়াছ, দুই একবার এই সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু বলিয়াছিও—আজ আবার সেই সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলিতে চাই।

'সঙ্ঘশক্তিঃকলৌ যুগে'—বলিয়া একটী প্রসিদ্ধ বচন আছে। কতবারই আমি তাহা তোমাদের বলিয়াছি। কলিযুগে মানুষ দেহে-মনে-প্রাণে দুর্ব্বল —একা একটা মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবার মত অটুট অগ্নিময় বীর্য্য আছে এমন লোক খুবই বিরল। তাই দশজনে মিলিয়া মিশিয়া সম্মিলিত শক্তিদ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার কথা বলা হইয়াছে। একটা প্রবাদ বাক্য আছে—"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ!" দশজনে মিলিয়া মিশিয়া যাহা করি, তাহাতে হার হইলেও লজ্জার কোন কথা নাই। যাক্, যাহা বলিতেছিলাম। কলির মানুষ স্বল্পায়ু, দুর্ব্বল, তা বলিয়া কি দুর্ব্বল মানুষের প্রতি ভগবান নিষ্করুণ? তাহা কখনই নয়। এই-জন্যই কলিযুগের দরুণ ভগবান্ এই সঙ্ঘশক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

এক লক্ষ্য বা ইষ্টসিদ্ধির দরুণ যখন সকলের প্রাণে সমভাবে আকুলতা জাগে, পরস্পরের মন-বুদ্ধির বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ তখনই কেবল সঙ্ঘবদ্ধ বা সম্মিলিত হইতে পারে। সেই সম্মিলিত শক্তির অমিতপ্রভাবেই যত কিছু অসাধ্য সাধন হইয়াছে জগতে।

আসল কথা হইল একজোট হওয়া নিয়ে। কোন একটা বিশিষ্ট ভাবের দরুণ বা সেই ভাব যাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ মূর্ত্ত, তাঁহাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়াই সঙ্ঘের সৃষ্টি। সুতরাং কোন কিছুর দরুণ প্রাণের টান হওয়া চাই—আর সেই টান প্রত্যেকের মাঝে যত তীব্র হয়, সঙ্ঘশক্তিও ততই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। রামকৃষ্ণদেবের দেহ-রক্ষার পরে বিবেকানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের প্রাণে এই তীব্র আকুলতার অগ্নিশিখাই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পরই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয়। সকলের প্রাণেই যখন অশরীরী ঠাকুরের ভাবের বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল, তখনই সেই ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার দরুণ আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের প্রাণেই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবেকানন্দ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন এইজন্যই,—আর তাঁহাদের এত সহজে ত্যাগ-বৈরাগ্য নিয়া সম্মিলিত হইবার প্রধান কারণও ছিল এই যে, পরমহংসদেবকে সকলেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। এই প্রাণের টানেই সঙ্ঘ সৃষ্টি। তোমরাও যে মঠে আসিয়াছ তাহার একমাত্র কারণ—ঠাকুরের প্রতি তোমাদের আন্তরিক টান জন্মিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের সেই অদৃশ্য শক্তিই তোমাদের একদিন ঘর ছাড়া করিয়া-ছিল। একদিন মা-বাপ-ভাই-বোনের মমতা বিস-র্জ্জন দিতে পারিয়াছিলে তোমরা সেই শক্তির জোরেই। এই মূল্যবান্ কথাটী তোমরা কখনই ভুলিয়া যাইও না।

তাহা হইলে কথা এই দাঁড়াইল যে, সংযত বা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার মূলে থাকা চাই আকর্ষণ বা প্রাণের টান। সেই প্রাণের টান আবার সকলেরই একমুখী হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, তাহা-

দের ত্যাগ-সংযম-তপস্যা সবই এক ইষ্টসিদ্ধির দরুণ। যুক্তি-বিচার-সংশয় এই সব তখন দূরে পলায়ন করিবে। সঙ্ঘব্রতীদের প্রতিজ্ঞা হইবে এই যে, "আমরা তর্ক বুঝি না, যুক্তি বুঝি না, সকলের প্রাণ একত্র করিয়া আমরা জীবনে এই বিশিষ্ট ভাবকে বা তাঁহার ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চাই। ইহার দরুণ যাহা করিতে হয়, তাহার দরুণই আমরা প্রস্তুত।" এই কয়টী সহজ কথাই সঙ্ঘসেবীদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া চাই।

সঙ্ঘ গঠন করিয়া তোলা বড় শক্ত কাজ, সঙ্ঘ-সৃষ্টি হয় আপনা হইতেই। অর্থাৎ কাহারও না কাহারও নীরব সাধনার অমোঘ প্রভাব কতকগুলি প্রাণকে স্বভাবতঃই উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, যদি বাস্তবিকই তাহা সত্যিকার সাধনা হইয়া থাকে। মহৎ সঙ্কল্প করাও কঠিন কাজ; যাঁহাদের সঙ্কল্প মহৎ, প্রাণে আকুল ইচ্ছা রহিয়াছে মহৎ কার্য্য সম্পাদনের, তাঁহাদের সেই মহতী ইচ্ছা সম্পূরণের দরুণ আপনা হইতেই কতকগুলি ত্যাগী-সংযমী যুবকের প্রাণে সাড়া পড়িয়া যায়। এই উন্মাদনা বুকে করিয়াই সকল সঙ্ঘব্রতীর সম্মিলন। প্রাণের টানে কত অজানা প্রদেশ হইতেই না তোমরা আসিয়া মঠে সম্মিলিত হইয়াছ—একবার ভাবিয়া দেখিও তো?

আবেগ-আকুলতার সঙ্গে সঙ্গে সত্যনিষ্ঠাও থাকা চাই, তাহা না হইলে সঙ্ঘ বেশীদিন টিকে না। অর্থাৎ প্রথম যে আকুলতা লইয়া, যাঁহাকে ভালবাসিয়া, আত্মসমর্পণ-যজ্ঞে জীবনকে আহুতি দিয়াছিলে, সেই প্রথমকার ভাব যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, সেই দিকে তোমাদের লক্ষ্য থাকা চাই। সত্যনিষ্ঠা থাকিলে আবেগ ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে না—এই কথাটীও তোমরা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবে।

সঙ্ঘসেবীদের বিশিষ্ট ইচ্ছার লয় হইয়া যায়। সকলেই ঠাকুরের—ইষ্টের ইচ্ছাকেই বরণ করিয়া লয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যথার্থ লোকহিতের বা মহৎ কার্য্য সম্পাদনের প্রেরণা ভগবান সকলের ভিতর দেন না। একজনের জীবনে হয়ত সেই প্রেরণা আসে—দশজন তাহাকেই সিদ্ধ করিয়া তুলিবার দরুণ যত্নবান্ হয়। সঙ্ঘসেবীদের জীবন স্বাভাবিকই সমর্পিত জীবন। একটী প্রাণের মহৎ সঙ্কল্পকে সিদ্ধ করিয়া তুলিবার দরুণ শত শত প্রাণে উন্মাদনা আসে। যাহাদের ভিতর সেই উন্মাদনা, সেই তীব্র ব্যাকুলতা আসে, তাহারাই সঙ্ঘকে রূপ দিবার এক একটী যোগ্য আধার। নিজের ইচ্ছাকে রূপ দানে গৌরব নয়—অপরের মহৎ ইচ্ছাকে জীবন দিয়া যাহারা সফল করিতে পারে—তাহাদের জীবনই প্রকৃত গৌরবের।

এই জায়গাতেই ব্যক্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় অনেকেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। অপরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা—ইহা তো দাসত্ব! কেন আমার নিজের কি একটা স্বাধীন ইচ্ছা নাই? অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। গীতার ভাষায় ইহাদিগকে বলা যায়, "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" প্রকৃত পক্ষে জগতে এই সব লোক কোনদিনই একটা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তুলিতে পারে না। ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার যাহাদের ভিতর প্রবল, তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বোধটা নিজের কাছেই জাগ্রত—অন্যের কাছে সেই ব্যক্তিত্বের কোন মহিমাই নাই। বুদ্ধ-শঙ্কর-গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণদেব—ইঁহাদের মত লোক খুব কমই জন্মায়। যাঁহাদের ব্যক্তিত্বের মহিমায় জগৎ শুদ্ধ লোক বিস্মিত—মুগ্ধ, তাঁহারাও কিন্তু নিজের ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গেই বিলয় করিয়া দিয়াছেন। নিজের অহঙ্কার বলিয়া কোন জিনিষ তাঁহাদের নাই। গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবনের দৈন্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

যাঁহার জীবন গোড়া হইতেই ভাগবত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ—তাঁহার ভিতরও কিরূপ নিরহঙ্কার এবং দৈন্যের ভাব! তাঁহাদের মুখেও ব্যক্তিত্ব লয়ের কথাই শুনিতে পাই। যাহাদের আধার শুদ্ধ নয়, চিত্তের মালিন্য এখনো দূরীভূত হয় নাই—তাহাদের মুখেই শুনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছার কথা এবং ব্যক্তিত্বের কথা। ভগবানের সঙ্গে যাহাদের জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ না হইয়াছে—তাহাদের মুখে কখনই এইরূপ কথা শোভা পায় না। আর বাস্তবিকই যাঁহারা ভগবানের করুণা উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহাদের ভিতর অহং বলিয়া কোন জিনিষই থাকিত পারে না। সঙ্কল্প করিয়া কেহই মহাপুরুষ হইতে পারে না। কামনাশূন্য হইতে না পারিলে ভগবানের করুণা লাভের আশা করা বৃথা। এই যে অনেকের ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব বলিয়া চিৎকার—ইহাও তো একটা বড় রকমের কামনা। যাঁহারা নিজেকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলয় করিয়া দিতে পারিয়াছেন—জগৎ শুদ্ধ লোক তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব দ্বারাই উদ্বুদ্ধ এবং প্রভাবিত। এইজন্যই বলিয়াছিলাম—বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ জগতে খুব কমই জন্মান।

যোগের পন্থা—লয়ের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলি না বলিয়াই আমাদের জীবনে এত দুর্গতি। তাহা না হইলে ভগবানের এক মহান ইচ্ছাই জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেই ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া চলিলে, জগতে এত অশান্তির সৃষ্টি হইত না কখনও। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ইচ্ছা দ্বারা সেই মহান্ ইচ্ছাকে আমরা বাধা প্রদান করি। জীবনের উন্নতির পক্ষে বড় বাধাই হইল—এই "অহং"। পদে পদে ইহাকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে হইবে। আমাদের জীবন হইবে যন্ত্র বিশেষ—তাহাতে ভগবানের কল্যাণময় ইচ্ছার সঙ্গীতই কেবল বাজিতে থাকিবে।

যোগই হইল চরম লক্ষ্য—সাধনা যোগবিঘ্ন মাত্র দূর করা। লয়ের মাঝেই যে সৃষ্টির বীজ সঙ্গোপিত! ইহা কি কেহ কখনো অস্বীকার করিতে পারিবে? আমার তো মনে হয় জ্ঞান হইলে মানুষ এই কথটাই ভাল করিয়া বুঝে যে—যোগাযোগেই আমাদের জীবনের পূর্ণ পরিণতি। কেহ হইতে কেহই বিচ্ছিন্ন নয়।

নিজের জীবনের কতটুকু আমরা বুঝি?—কোন্ ইচ্ছা মহৎ, শুভ-অশুভ কি, তাহা বুঝিবার মত দিব্য দৃষ্টি সাধারণের মাঝে কোথায় রহিয়াছে? ইহা হইতে মহাপুরুষদের নির্দ্দেশে চলা সব চেয়ে কল্যাণকর নয় কি? ইহাতে দাসত্বের কোন অপমান নাই। আর দাসত্ব করিয়াও যদি আত্মার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দাসত্ব বরণ করিয়া লওয়াই উচিত। পূর্ব্বের ঋষি-বালকেরা গুরুসেবার যাবতীয় কর্ম্মকেই আত্মসাক্ষাৎকারের অঙ্গ বা সাধনা বলিয়াই মনে করিত—এইজন্যই ঋষি-বালক সত্যকামকে যখন তাঁহার গুরুদেব গো-চারণের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে নাই। তিনি সানন্দচিত্তে গুরুর আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। আসল কথা হইল দুর্ব্বলতা—অথচ বেমালুম তাহা অস্বীকার! এত প্রশ্ন—সংশয় জাগার মূলেও রহিয়াছে দুর্ব্বলতা বা শ্রদ্ধা-নিষ্ঠার অভাব। উপনিষদেই দেখিতে পাই নচিকেতার শ্রদ্ধা কিরূপ আশ্চর্য্য ধরণের! পিতৃদেবের মুখ হইতে অনিচ্ছাকৃত যে বাণী বাহির হইয়াছিল, তাহাকে পালন করিবার দরুণও নচিকেতার কি অদ্ভুত নিষ্ঠা! এই শ্রদ্ধার দ্বারাই নচিকেতার জীবনের, এমন কি মর্ত্ত্যবাসী মানব-মনের এক বড় প্রশ্নেরই সমাধান

পাওয়া গেল। শ্রদ্ধা জাগিলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় বা ঘটনা অবলম্বনেই মানুষ সত্য বস্তুর সন্ধান পায়। আত্মপ্রচার যাহাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিত্বের উপর জোর দেয় তাহারাই বেশী, আর আত্মসাক্ষাৎকার যাহাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিত্বকে লয় করিয়া দিবার দরুণই তাহাদের আত্যন্তিক প্রচেষ্টা। উন্নতি-অবনতি পরিণাম দেখিয়াই বিচার করা যায়।

সংঘসেবীদের মাঝে ইষ্টপ্রীতি বা ইষ্টের ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প যতদিন অক্ষুণ্ন থাকে, ততদিন সংঘে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় না। কিন্তু সংঘের মাঝে যখন স্বার্থপরতা দেখা দেয়, ইষ্টের অভিপ্রায় হইতে যখন নিজের ইচ্ছাটাই বড় হইয়া উঠে,— সংঘের অধঃপতনের সুরু হয় তখনই। চোখের সম্মুখে কত উদীয়মান সংঘেরই অধঃপতন এমনি করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতে বৌদ্ধ-সংঘে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি —কেননা বুদ্ধদেবের বাণী এবং আদেশ পালনই ছিল ভিক্ষুদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের অবর্ত্তমানে যখন অনেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, তখনই আস্তে আস্তে সংঘের জোর কমিয়া আসিতে লাগিল। এই মঠেই আমি কত গুরুগতপ্রাণ সেবক দেখিয়াছি— গুরুবাক্যকে তাঁহারা যথাযথ ভাবে অবিচারে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন কোন অংশেই তোমাদের জীবনের চেয়ে কম উন্নত নয়। তোমাদের সংঘে যখন ব্যক্তিত্বের উন্মেষ দেখা দিল, তখন হইতেই তোমাদের সংঘ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; জীবনের যিনি একমাত্র ধ্রুবতারা, তাঁহার কথারও সমালোচনা আরম্ভ করিল অনেকেই। যাক্, তাহাতে কিছু যায় আসে নাই,—মাঝখানে মাত্র একটা বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। আবার যেই শান্তি সেই শান্তিই ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন তোমাদের সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে, যদি তোমরা সংঘ চাও—ঠাকুরের ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে চাও, তাহা হইলে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে তোমাদের। যাহাদের ভিতর তীব্র ব্যক্তিত্ব বোধ—অর্থাৎ ঠাকুরের ইচ্ছার সঙ্গে যাহাদের মনের মিল বা খাপ খায় না, তাহারা ঠাকুরকে বলিয়া, সংঘের শক্তির অপচয় যাহাতে না হয়, সেইভাবে সরিয়া পড়িও। সংঘের মাঝে বিক্ষোভের সৃষ্টি করাও অন্যায়। সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার শক্তি যাহার নাই, অথচ ব্যক্তিত্ব বোধ যাহার অত্যন্ত তীব্র, তাহার পক্ষে সংঘে না থাকাই সব চেয়ে কল্যাণকর।

বিক্ষোভের সময় পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতিকে জাগরিত করিয়া বিচার করিও। কি লক্ষ্য নিয়া, কাহার আকর্ষণে একদিন তোমরা এই নির্জ্জন অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলে, সেই কথাটীও স্মরণ করিও। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেই বুঝিবে—আর তোমাদের ভিতর সেই দিব্য-প্রেরণার ঝঙ্কার নাই।

দেহে-মনে-প্রাণে তোমরা দুর্ব্বল—তোমরা কেন, কলির মানুষই! সুতরাং আলাদা আলাদা ভাবে তোমরা কি মহৎ কার্য্য করিবে? সম্মিলিত শক্তি-দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি—সে গৌরব একার নয়, সকলেই তো তাহার অংশীদার। নাম হোক যশ হোক— সঙ্ঘেরই হইবে।

যথার্থ মহৎ সঙ্কল্প যেমন খুব কম লোকের প্রাণেই জাগে, তেমনি সেই সঙ্কল্পকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার আধারও জগতে দুর্লভ। সঙ্কল্প সিদ্ধির দরুণ স্বার্থত্যাগই হইল প্রধান। নিজস্ব বলিয়া তখন কোন কিছুই থাকিবে না। সঙ্ঘ-সেবীরা জীবন্মুক্ত—নিজের জীবনের ক্ষুদ্র ইচ্ছার চেয়ে ভাগবত ইচ্ছাকে রূপ দিবার আকুলতাই তাহাদের বেশী। জগতে দেখাও যায়, পরিচালকের নেতৃত্বেই সকলে পরিচালিত হয়। নেতা একমাত্র ভগবান্

--আমাদের জীবন সেই পরিচালকের ইচ্ছারই বাহন। যাহারা উল্টো ভাবে, তাহাদের জীবনই সর্ব্বাগ্রে বিনাশ পায়। মহাপুরুষদের জীবনে ভগবৎ শক্তির বিকাশ পায়, সেইজন্যই তাঁহাদের নির্দ্দেশে চলিলে জীবনের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। কর্ত্তার ভাব বা অহঙ্কারের ভাব যাহাদের ভিতর প্রবল, তাহারা নিজেই নিজের কর্ত্তা, আর কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি জন্মায় না তাহাদের।

দুর্ব্বল মানুষের মস্তিষ্কে কল্পনা আসে বেশী; যাহারা এই কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত, তাহারা সত্য পথের সন্ধান জানিতে পারে না। অনেকেই সেই অস্পষ্ট ধারণার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়ে, তখন যদি কেহ জীবনের লক্ষ্য বলিয়াও দেয়, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস আসে না। কি করিতে হইবে, আমাদের শক্তি কতখানি—এ সব কিছুই জানি না, সুতরাং শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কলির জীবের আর দ্বিতীয় গতি নাই।—

আধার শুদ্ধ করা—ইহা বড়ই কঠিন কাজ। আধার বিশুদ্ধ হইলে ভগবৎশক্তির ক্রিয়া তাহাতে আপনিই হয়। তখন আর ব্যক্তিত্বের দরুণ উৎকণ্ঠিত হইতে হয় না, কত ব্যক্তি আসিয়া তখন সেই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হয়। কাজেই তোমরা নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া, নিজের সঙ্কীর্ণ ইচ্ছাকে বলিদান করিয়া, সঙ্ঘাধিপতির শুভ-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার দরুণ জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হও।

সঙ্ঘে যে দিন হইতে প্রবেশ করিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমাদের নব-জীবনের সূত্রপাত। নিজকে, নিজের সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে না পারিলে, সেই অব্যর্থ শক্তির ক্রিয়া অবাধে তোমাদের মাঝে লীলায়িত মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারিবে না। তোমাদের জীবন যেন সেই মহতী বিদ্যুৎ শক্তির আধার। নিজকে যত শুদ্ধ-স্বচ্ছ করিয়া তুলিতে পারিবে—ততই সেই একই বিদ্যুৎ শক্তি তোমাদের প্রত্যেকের মাঝে বিশিষ্ট-ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিবে—ইহাই তো ব্যক্তিত্ব! বিশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়া একই বিদ্যুৎ শক্তির দিব্য আলো। কল্পনাতেও কি আনন্দ পাওয়া যায়! তোমরা নিজকে ভুলিয়া যাও —নিজের অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দাও, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে—তোমাদের জীবনে প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের ইচ্ছা যে কত মহৎ এবং কত বৈচিত্র্যময়, তখনই তাহা বুঝিতে পারিবে। ঠাকুরও তোমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যই দেখিতে চান—ভেদ নয়, তোমরা ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও। মন একাগ্র হইলে, যাহার ভিতর যে বীজ, যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহারই দিব্য-স্ফুরণ হইবে। তোমরা সঙ্ঘ-সেবীরা—সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার দিকেই মন-প্রাণ ঢালিয়া দাও, তাহা হইলেই দেখিবে সঙ্ঘে শক্তি-সঞ্চার হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের জীবনও অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের সুষমায় মণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ এই পর্য্যন্তই। তোমরা যখন কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন সঙ্ঘ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মায়ের রূপ

—::(০)::—
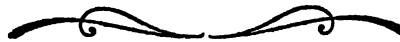
দশভুজা মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সাধকের চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল; স্বীয় সাধন প্রভাবে এবং মায়ের কৃপায় মায়ের যে অতুল রূপ তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় মাটী দিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গঠনের প্রয়াস যে বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নয়—এই সত্য অমৃত বাণী তাঁহার কণ্ঠ মথিয়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

আমার এমন মাকে কে সং সাজালে বল্ তাই শুনি,
মা যে শম্ভুরমণী সংসার-সংশয়-সংহারকারিণী!

ওগো! আমার অমন মাকে এমন করিয়া সং কে সাজাইল? মাটীর গণ্ডীতে ফেলিয়া চিন্ময়ীকে মৃণ্ময়ী করার প্রয়াস কে পাইল? মাকে আমার জান কি? মা যে শম্ভুরমণী! শম্ভু—শিব—যিনি নির্ব্বিকার ত্রিগুণাতীত পুরুষ, তাঁরও যে তিনি আনন্দপ্রদায়িনী! অর্থাৎ শিবের যে কেবলানন্দ-স্বরূপ, তা' ওই মায়েরই সত্তা, মায়ের সত্তাতেই তিনি সচ্চিদানন্দময়—আর মা আমার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী! একাধারে তিনি নির্গুণা আবার সগুণা। সমস্ত গুণ, সমস্ত রূপ তাঁহাতে লীন হয় বলিয়া তিনি নির্গুণা, আবার তাঁর অধীনে থাকিয়া গুণরাজি ক্রিয়াশীল হয় বলিয়া তিনি সগুণা। এই ত্রিগুণেই জগৎ সৃষ্টি; এই ত্রিগুণের দ্বারাই আবৃত হইয়া জীব স্ব স্বরূপ ভুলিয়া মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যদি কোন প্রকারে জীব এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারে, তাহা হইলেই মায়ের সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হয়,—মায়ের ছেলে মায়ের কোলে স্থান পায়। কিন্তু এই গুণময়ী মায়া অতিক্রমের উপায় কি?—মা-ই আবার গীতামুখে বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" যে নাকি সচ্চিদানন্দরূপিণী মায়ের শরণাগত হইয়া আকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকে, তাঁহার জন্য পাগল হয়, তিনিই তাহার মোহভ্রান্তি ঘুচাইয়া সংসার-সংশয় নাশ করিয়া দেন,—তাই তো মা আমার সংসার-সংশয়-সংহারকারিণী!

কি বলিলে? কুম্ভকারে এ মূর্ত্তি গড়িয়াছে? মূর্খ কুম্ভকার! তাহার সামর্থ্য কতটুকু যে, সে মায়ের মূর্ত্তি গড়িবে?—

স্বয়ং স্বয়ম্ভু যার স্বরূপ গঠিতে নারে,
সে শম্ভুদারারে গড়া কুম্ভকারে কি পারে?

যাঁহাদের স্রষ্টা কেহ নাই, যাঁহারা আপনা আপনি হইয়াছেন, অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছামাত্রেই যাঁহাদের বিকাশ, এমন যে স্বয়ম্ভু স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তাঁহারাও মায়ের স্বরূপ গড়িতে পারেন না, মানুষ তো কোন্ ছার? স্বরূপ গঠনের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেছ? স্বরূপ গঠনের অর্থ হইতেছে স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া,—প্রাকৃত নির্ম্মাণ নয়। যাঁহারা গুণা-ধিষ্ঠিত দেবতা—গুণের অধীন ন'ন, তাঁহারাও যখন মায়ের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করিতে পারেন না, তখন যে নাকি গুণাধীন, গুণময়, এমন কুম্ভকার কেমন করিয়া তাঁহার রূপ গড়িবে? বাতুলতা নয় কি?

বাঃ কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি ভুবনমোহিনী রূপ! এ যে চিন্ময়ীর আমার অপরূপ আনন্দ বিলাস!—রূপের মাঝে অরূপার অবতরণ! বলিতে পার তোমরা—

ঐ ভুবনমোহিনী বামাটী কে?

নাঃ নাঃ এ তো চিন্ময়ী নয়, এ যে মৃণ্ময়ী! ওগো আমার চিন্ময়ী মাকে এমন মৃণ্ময়ী করিয়া কে গড়িল, অখণ্ডকে কে খণ্ড করিয়া ফেলিল, 'চিৎ' এর স্থানে কে 'মৃৎ' আনিয়া জুটাইল?—

অঙ্গে দিল উহার বা মাটী কে!

শুধু কি চিন্ময়ীকে আমার মৃণ্ময়ী করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা তো নয়! তাহার উপর দেখি মায়ের রূপ ফলাইতে আবার কাহারা রং এর তুলি বুলাইয়াছে—

তুলিতে মায়ের স্বরূপ তুলিতে কার সাধ না জানি?

জানি না এ সাধ কাহার হইয়াছে?—মূর্খতা আর কাকে বলে? প্রাকৃত রং দিয়া মায়ের অপ্রাকৃত রং ফুটাইবে? কূপমণ্ডুক সমুদ্রের পরিমাপ করিবে?

..অথবা উহাদেরই বা দোষ কি?—

রং এর পুতুলী ওরা কি দিবে আর রং বই!

উহারা যে রংএর পুতুল, উহারা যে স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপ হইয়াছে, মাকে ভুলিয়া মায়ায় মজিয়াছে, উহারা যে মাটী দিয়া ঘর পাতিয়াছে, কাজে মাটী ছাড়া আর কি দিয়া মায়ের মূর্ত্তি গড়িবে?—উহারা যে রং ফলান চোখে জগতের বিকৃত রূপ দেখিতেছে, কাজেই রং ছাড়া আর কি দিয়া মায়ের রং ফুটাইবে? —মায়ের রং কেমন জান?—

'রং' বীজে রং মায়ের রং কি উহারি ওই!

মায়ের রং রংবীজে নিহিত, আর এই 'রং' হইতেছে বহ্নি বীজ। এই বহ্নিবীজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তবে মায়ের রং এর আভাস চিত্ত-ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিবে,—রং এর তুলিতে তাহা ফুটিবে না। ......ছি ছি! মূর্খ! ওই কি মায়ের রূপ? মাকে আমার চেন কি?—

মা যে আমার ওঁকাররূপিণী!

অ—উ—ম—, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিগুণের সমাহার—সংলীন অবস্থাই মায়ের যথার্থ রূপ। তাই মা আমার ওঁকাররূপিণী! *

মা কোথায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? কোথায় গেলে মাকে পাওয়া যাইবে তাই শুধাইতেছ? ওই যে তোমার সম্মুখে জীব-জগৎ রূপে মা আমার বিরাজিতা রহিয়াছেন! দেখ ভাল করিয়া দেখ, জগৎকে আর জগৎ রূপে দেখিও না—মা রূপে দেখ—

জগজ্জোড়া মা আমার জগতেরই গায়ে গা,
জগতেরই গায়ে আবার জগন্ময়ী ঢালে গো—

মা যে আমার জগৎ জুড়িয়া আছেন, জগতের গায়েই মায়ের গা, জগতের রূপ মায়েরই রূপ, মায়ের রূপ ছাড়া আর জগতের সতন্ত্র সত্তা কোথায়? আবার দেখ জগতেরই গায়ে মা গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ওতঃপ্রোত ভাবে জগতের অন্তর্ব্বহিঃ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন।—তবু খুঁজিতেছ মা কই? ওই শোন বৈদিক ঋষির বজ্রনির্ঘোষবাণী—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি!" আরও শুনিবে?

জগতেরই প্রাণে প্রাণ জগতেরই কাণে কাণ—

চৈতন্যরূপিণী মা আমার চৈতন্যরূপে জগৎ জুড়িয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন। প্রাণরূপিণী মা আমার প্রাণরূপে ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং" স্বরূপিণী মা আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব গুণে আভাসিত হইতেছেন। তাঁহার প্রাণের আভাস পাইয়াই না জগৎ প্রাণময়, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের আভাস পাইয়াই না জগৎ ইন্দ্রিয়ময়! অথবা বেশী করিয়া তাঁর পরিচয় কি দিব?—এই যে পূর্ব্বে বলিলাম নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ—সেই

---

* অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥ —মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

জগৎও তাঁর একাংশে স্থিত মাত্র।—তাঁর আসল রূপ অমৃত—জড় চক্ষুর অগোচর—অবাঙ্মানসগোচরম্! তাঁর সেই শাশ্বত রূপকেই—

তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ মন্ত্র তাই ঘোষে অমনি।

তোমরা যাহাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া থাক, তা ওই মা; তোমরা যাহাকে "সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু'ণশ্চ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাক, তা ওই মা! মা-ই যে চরম ও পরম তত্ত্ব। তাহা হইলেই দেখ, জগৎরূপেও তিনি, আবার জগদতীত রূপেও তিনি। "মা যে আমার বিশ্বরূপা রূপ বর্জ্জিতা অরূপা।" মা যে আমার কত সুন্দর তা তুমি ধারণায়ও আনিতে পারিবে না। চোখে তুমি যত কিছু সুন্দর জিনিষ দেখ, তার চেয়েও বহু বহু গুণে তিনি সুন্দর, কল্পনায় তুমি যত সুন্দর রূপই অঙ্কিত কর না কেন, তার চেয়েও তিনি সুন্দর। তাঁর রূপ যে কোটী সূর্য্য সমপ্রভ, কোটী চন্দ্র সুশীতল। —তাইতো বলিতেছি—

চাঁদে না মিলিবে ওরূপ না মিলিবে তপনে,
না মিলিবে তারকায় তরল তড়িৎ হুতাশনে—

তোমরা যাহাকে সুধাকর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাক, যাহার কমনীয় সৌন্দর্য্যে তোমরা মুগ্ধ হও, সেই চাঁদেও মায়ের আমার রূপের কণা খুঁজিয়া পাইবে না; তোমরা যাহাকে জ্যোতির আকর সহস্রাংশু বলিয়া আখ্যা দিয়া থাক, সেই সূর্য্যেও তাঁর রূপের সন্ধান মিলিবে না।—নক্ষত্রের জ্যোতিতে তাঁর রূপের প্রকাশ নয়, তরল তড়িতে তাঁর রূপের সম্যক্ বিকাশ নয়, গলিত হুতাশনে তাঁর অচিন্ত্য রূপ নিবদ্ধ নয়। এক কথায়—আকাশস্থিত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে যে রূপ, তাহা মায়ের রূপেরই আংশিক স্ফুরণ মাত্র। শোন তাই আবার বলি—

মা যে আমার সকল রূপের খনি।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু রূপময় দেখিতেছ, যাহা কিছু জ্যোতির্ম্ময় দেখিতেছ, সকলেরই আদি প্রস্রবণ আমার মা! মায়েরই রূপের কণিকা লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী ব্যষ্টি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, মায়েরই রূপের আভাস লইয়া এক একটী জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্ম্ময় রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।—

পেয়ে মায়ের রূপের আভা আকাশ পথে প্রকাশ রবি,
তাঁরই আভা পেয়ে আবার খেলায় শীতল চাঁদের ছবি।

ওই যে আকাশপথে যাহার প্রকাশ দেখিতে পাইতেছ, ওই যে জগচ্চক্ষু বলিয়া যাহার কত প্রশংসা করিতেছ, ওই যে যাহার খর দীপ্ত জ্যোতিতে তোমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে, সেই রবিকে কি তোমরা স্বয়ং প্রদীপ্ত বলিয়া মনে কর? না গো না! মায়ের রূপের আভা লইয়াই উহার এত অহঙ্কার। অথচ সে মায়ের আসল রূপের কণিকাও পায় নাই, রূপের আভাস মাত্র পাইয়াছে। আবার ওই যে সুধাকর বলিয়া যাহার রূপ-গুণ বর্ণনায় তোমরা শত মুখ, যাহার শীতলতায় তোমাদের দেহ-দাহ প্রশমিত হয় বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাক, সেই শশধর তার এই স্নিগ্ধতা কোথা হইতে পাইল জান কি? সে ওই মায়েরই দান; মায়ের স্নিগ্ধতার আভাস পাইয়াই, মায়ের অতুল স্নেহামৃতের বিন্দু-কণা পাইয়াই ইন্দু অমন সুন্দর হইয়াছে,—তাই তো ওই বিন্দুর আকর্ষণেই আবার মর্ত্ত্যসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে! শুধু কি সূর্য্য-চন্দ্রই মায়ের রূপের আভাস পাইয়া সূর্য্য-চন্দ্র রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর আর সকলেই স্বতন্ত্র? না না, এই জীবজগৎ, তুমি আমি, যাহা কিছু দেখিতেছ শুনিতেছ, সবই মায়ের ব্যষ্টি রূপ!—

তাঁরই কণা কেনা জানি কীট-পতঙ্গ তুমি আমি
জগৎ জুড়ে মায়ের খেলা অনন্ত লীলারূপিণী!

গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, নদী-সাগর, পাহাড়-পর্ব্বত

যাহা কিছু দেখিতেছ—এই যাবতীয় দৃশ্যরূপে তিনি; আবার অনন্ত 'আমি' যে দ্রষ্টারূপে এই চরাচর পরিদর্শন করিতেছে, তাও তিনি। আমি যখন দেখিতেছি, তখন কেবল আমিই দ্রষ্টা আর সকলে দৃশ্য; আবার তেমনি তুমি যখন দেখিতেছ, তখন তুমিই দ্রষ্টা আর সকলে তোমার দৃশ্য। এইভাবে দ্রষ্টা-দৃশ্য, আমি-তুমি রূপে মা-ই আমার অনন্ত আকারে অনন্ত লীলা প্রকট করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ছাড়া আর আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? তিনিই যে আমাদের একমাত্র জনয়িত্রী, পালয়িত্রী, সংহর্ত্রী! তাঁহা হইতেই আমরা ব্যষ্টিরূপে অনন্ত "আমি" হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছি, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছি, আবার অন্তিমে তাঁহাতেই সংলীন হইয়া যাইব। বৈদিক ঋষির 'তজ্জলান্'—বেদান্তসূত্রের "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—সবই এই সত্যেরই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

ব্যষ্টি-বোধে খণ্ডিত জীব আমরা, সমষ্টি অখণ্ড জ্ঞান না আসা পর্য্যন্ত, মায়ের দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অভাব মিটিবে না, স্বভাব ফুটিবে না। অতএব এই খণ্ডিত রূপের স্থানে অখণ্ড রূপ গড়িতে হইবে, ব্যষ্টির স্থানে সমষ্টিতে আত্মাহুতি দিতে হইবে, মায়ের সন্তানকে মায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। মায়ের যদি দেখা পাইতে চাও, যদি তাঁহাতে তোমার তুমিত্ব বিসর্জ্জন দিতে চাও, তাহা হইলে অন্তরে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা সমস্ত তাঁহাতে অর্পণ কর। কাদায় এ মূর্ত্তি গড়িলে চলিবে না, কাঁদায় তাহা গড়িতে হইবে; বাহির দিয়া তাঁহার রূপ গড়া যায় না, ভিতর দিয়া—হৃদয় দিয়া তাহা গড়িতে হইবে। মায়ের মূর্ত্তি গঠনের উপাদান কি জান?—

> **বিবেক হাঁপর সাধন অগ্নি হৃদয়রূপ কটরায়**
> **হ্রীংকার হেমের কাঁতি গাল প্রেম সোহাগায়**
> **মা গঠনের কেবল এই উপাদান জানি।**

সোনা দিয়া কোন অলঙ্কার গড়িতে হইলে যেমন প্রথমে তাহাকে সোহাগা সহযোগে কোন পাত্রে রাখিয়া আগুনের উপর গলাইতে হয়, তাহা হইলেই যেমন তাহার খাদ দূরীভূত হইয়া খাঁটিস্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি তোমাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-স্বরূপিণীকে জাগাইতে হইলে, হৃদয়রূপ পাত্রে হ্রীং বীজা মাকে প্রেম-সোহাগার সহযোগে সংস্থাপন করিয়া সাধনার আগুন প্রজ্বালিত করিতে হইবে; আবার সেই আগুনকে সর্ব্বদার দরুণ প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য বিবেক-হাঁপরের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ হাঁপর পরিচালিত বায়ুর শক্তিতে যেমন বাহিরের অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিবেক-শক্তি সহায়ে সাধনার তীব্রতাকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে; তাহা হইলেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণীর যথার্থ রূপ তোমার অন্তরে ফুটিয়া উঠিবে। মায়ের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, মাকে জানিতে হইলে, মাকে পাইতে হইলে চাই শুধু বিবেক-জ্ঞান, উদার হৃদয় আর অকৃত্রিম প্রেম। এই ত্রয়ীর সমাহারেই, এই তিন উপাদানের সাহায্যেই মায়ের স্বরূপ গড়িয়া উঠে, অন্য কোন প্রকারে তাহা সম্পাদিত হয় না।

এখন "হ্রীং" বীজের অর্থ এবং তাহার সাধনোপায় মা যাহা স্বয়ং শ্রীমুখে গীতামুখে * বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি শুন। —হ্রীং—হ্+র্+ঈ+ং। হকার স্থূল দেহ, রকার সূক্ষ্ম দেহ, ঈকার কারণ দেহ এবং তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপিণী মা-ই বিন্দুরূপে অবস্থিতা। ব্রহ্মস্বরূপিণী মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইলে সাধককে সমস্ত বিষয়-বাসনা হইতে নিরাকাঙ্ক্ষ, ক্রোধাদি দোষ পরিশূন্য এবং মৎসরবিহীন হইয়া প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা নাসাভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাণ ও

* দেবী গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৪১—৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন পূর্ব্বক অকপট ভক্তি-সহকারে নির্জ্জন স্থানে বৈশ্বানরাত্মক হকার বাচ্য স্থূল দেহকে রকার বাচ্য সূক্ষ্ম দেহে বিলীন করিতে হইবে, অনন্তর তৈজসাত্মক রকার বাচ্য সূক্ষ্ম দেহকে ঈকার বাচ্য কারণ দেহে বিলীন করিয়া প্রাজ্ঞাত্মক ঈকার বাচ্য কারণ দেহকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিতে হইবে; পরে বাচ্যবাচক ভাববিহীন, দ্বৈতবর্জ্জিত অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী মাকে চৈতন্যাগ্নি দীপ-শিখার মধ্যে ভাবনা করিতে হইবে। এই প্রকার সাধনার দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান ও তদীয় কার্য্যাবলীর বিনাশ ঘটিবে এবং তখন মায়ের শুধু চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। তারপর যদি তোমার মায়ের মূর্ত্তি গড়িবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে—

ভক্তি স্নেহ দ্রব্য মাখি ধ্যানরূপ জ্ঞানের ছাঁচে
শ্রদ্ধা অনুরাগে ঢাল হৃদয়ে যে হেম আছে,

স্বর্ণকারেরা যেমন যথেপ্সিত ছাঁচে স্নেহদ্রব্য মাখিয়া তাহাতে গালিত স্বর্ণ ঢালিয়া আপনাদের ইচ্ছানুরূপ আকার সমন্বিত অলঙ্কার গড়িয়া তোলে, সেইরূপ তুমিও যদি নিরাকার নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপিণীর আকার গড়িতে চাও, অরূপাকে রূপের মাঝে নামাইয়া আনিতে চাও, অমূর্ত্তাকে মূর্ত্তি দিতে চাও, তাহা হইলে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী—মনোবৃত্তি অনুযায়ী ধ্যানের ছাঁচে ভক্তিরূপ স্নেহদ্রব্য মাখিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ভরে হৃদিস্থিত গালিত হেম ঢালিয়া দাও, অর্থাৎ যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপিণীর স্বরূপ তোমার হৃদয়ের মাঝে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ধ্যানযোগে বিলোড়ন করিয়া স্বীয় মানসিক কল্পনা-নুযায়ী তাঁহারই একটী মনোময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া লও, তাহা হইলে সেই মূর্ত্তিই হইবে প্রকৃত মায়ের মূর্ত্তি, চিন্ময়ী মূর্ত্তি।—

হবে তখন প্রেমানন্দে মাখা ব্রহ্মময়ীর মূর্ত্তি দেখা
গোবিন্দের বাসনা কেবল ঐ রূপের ভিখারিণী !!

তখন তোমার অনিত্য সংসারের মায়া ছুটিয়া যাইবে, প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইবে, মায়ের যথার্থ মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। মা যে আমার ব্রহ্মময়ী একথা ভুলিলে চলিবে না। এ স্থলে বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় নহে, প্রাচুর্য্যার্থেও নহে—স্বরূপার্থে। মা আমার ব্রহ্মময়ী অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী—পরব্রহ্ম-স্বরূপত্বই তাঁহার স্বরূপ! স্বরূপলক্ষণায় তিনি নির্গুণা, আবার তটস্থায় তিনি সগুণা। আমরা গুণের মাঝে পড়িয়া আছি, তাই এই গুণের মাঝেই তাঁহার নির্গুণ রূপ ফুটাইতে চাই, রূপের মাঝেই অরূপার দর্শন পাইতে চাই। আমরা যে নিজেরাই আকৃতিধারী! কাজেই মা আকারের মাঝে না আসিলে তাঁহাকে ধরিব কেমন করিয়া? তাই আজ এই পুণ্যক্ষণে তোমায় ডাকিতেছি, এস মা! মনোময়ী মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়-মন্দিরে নিত্য বিরাজ কর, আমরা যে তোমার ঐ রূপেরই কাঙ্গাল! আমরা তোমাকে মৃণ্ময়ী রূপে চাই না, চাই চিন্ময়ী রূপে; জড়রূপে চাই না, চাই চৈতন্য-রূপিণী রূপে; এস গো চৈতন্যস্বরূপিণী চৈতন্যা-ধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের—তোমার যথার্থ মাতৃ-স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তোমার স্বরূপচ্যুত সন্তান-গণকে তোমার কোলে তুলিয়া লও, তোমার স্নেহ-বক্ষে স্থান দান করিয়া তাহাদিগকে নিত্য জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তোল। জয় মা!

কুণ্ডলিনী-শক্তি

—:(*):—

শক্তি থাক্‌লেই হল না, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ইচ্ছা-শক্তিও থাকা চাই। Motive power এবং regulative power এই দুটো শক্তি থাক্‌লেই মানুষ ঠিক প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নীত হতে পারে। পশুর motive power আছে, কিন্তু regulative power নাই। শক্তিকে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার কর্‌বার শক্তি এবং বুদ্ধি পশুর মাঝে নাই—তারা চলে হুজুগে। তা না হলে, পশুর ভিতর যে শক্তি রয়েছে, তা যদি তারা কাজে লাগাতে পার্‌ত, তাহলে তারা কত অদ্ভুত কাজ করে ফেল্‌তে পার্‌ত। কিন্তু পশুর মাঝে তো চৈতন্য জিনিষটা খুবই সুপ্ত ভাবে আছে, তাই শক্তি থাক্‌লেও, শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে তারা নিতান্ত অজ্ঞ। কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব এই জায়গাতেই—তারা শক্তি এবং শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। তাদের শক্তি এবং ইচ্ছা-শক্তি দুটোই রয়েছে। শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে পরিচালনা করেই মানুষ কত আশ্চর্য্যজনক কাজ করে ফেলে। সৃষ্ট জীবের মাঝে মানুষই যে প্রধান, তার কারণও হল এই।

যোগীরা বলেন, মূলাধারে কুণ্ডলিনী (অর্থাৎ অনন্ত শক্তির আধার) নিদ্রিতা আছেন, তাঁকে জাগিয়ে তোলাই হ'ল আসল কাজ। জাগিয়ে তোলাতেও ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন এবং তিনি জেগে উঠলে তাঁকে প্রকৃত পথে পরিচালিত কর্‌তে হলেও ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ ঈড়া এবং পিঙ্গলার কথাই জানে, কিন্তু শক্তিকে ঊর্দ্ধবাহী কর্‌তে হলেই সুষুম্না মার্গের দ্বার খুলে দিতে হবে। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়েই যেন তাঁর শক্তিকে ঊর্দ্ধমুখী করে দেবার পথে কোনরূপ বিঘ্ন না পান, তার দরুণ সুষুম্নার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিতে হয়। এই সুষুম্না বা spinal cordএর ভিতর দিয়ে যখন শক্তির প্রবাহ চল্‌তে থাকে, তখন মানুষ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করে। সেই আনন্দের সঙ্গে জাগতিক কোন আনন্দেরই তুলনা হতে পারে না। এক একটী কেন্দ্র বা পদ্মকে অতিক্রম করে সাধক যখন মস্তিষ্ক কেন্দ্রে বা সহস্রারে এসে উপনীত হ'ন, তখন দেহ আর আত্মা যে সম্পূর্ণ আলাদা তাঁদের এই জ্ঞান দৃঢ়-নিশ্চিত হয়ে যায়—মুক্তির আস্বাদনও তাঁরা তখনই পেয়ে থাকেন। যোগীদের সমস্ত প্রচেষ্টা হল, কি করে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রতা করে এই সুষুম্না-বিবর দিয়ে শক্তিকে মস্তিষ্কে নিয়ে পৌছান যায়। সাধারণ মানবের শক্তি নিম্নগামী, তারা ঊর্দ্ধগামী শক্তির কোন সন্ধানই জানে না। এইজন্যই সাধারণ মানুষের মন, পরমহংসদেবের ভাষায় বল্‌তে গেলে লিঙ্গ, গুহ্য এবং নাভিতেই পড়ে থাকে, আর যোগীদের মন এই তিনটী স্থানের ঊর্দ্ধেই সর্ব্বদা বিরাজিত। মন যাদের নীচে পড়ে থাকে, তাদের কাজও তেমনি।

শক্তি কিন্তু সবার ভিতরই আছে, কিন্তু সেই শক্তির প্রয়োগ নিয়েই হচ্ছে আসল কথা। কুণ্ডলিনী অনন্ত শক্তির আধার—এই আধারটী প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান, কিন্তু অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতে পারে কয়জন মানুষ? সুতরাং শক্তি থাক্‌লেই হল না, শক্তিকে জাগিয়ে তুলে, সুনিয়ন্ত্রিত কর্‌লে তবেই তা দিয়ে অসীম কাজ করে যাওয়া সম্ভবপর হয়। যত বড় বড় কর্ম্মী জন্মেছেন এই জগতে, তাঁরা এই

কুণ্ডলিনী শক্তিকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন, তা না হলে এক জীবনে এত কর্ম্ম করা অসম্ভব। কাজেই কুণ্ডলিনী উত্থাপন প্রণালী জান্‌তে পারাই হল আসল কাজ।

কুণ্ডলিনী যখন উর্দ্ধমুখী হয়, তখন সাধকের অনুভূতিও সূক্ষ্ম এবং তীব্র শক্তিসম্পন্ন হয়। কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধমুখী শক্তিই মানুষের জীবনকে ভাগবত জীবনে পরিণত করে। জগতে দুটো শক্তিই ক্রিয়া কর্‌ছে—কিম্বা শেষ অবস্থায় দেখা যায় দুটো শক্তিতে কোন ভেদ নাই—সব এক, কেবল প্রয়োগের পার্থক্য নিয়েই ভেদের সৃষ্টি। সাধারণ মানুষের শক্তি উর্দ্ধ-চক্র হতে নিম্ন চক্রেই অবতরণ করে। শক্তিকে উর্দ্ধমুখী করার সঙ্কেত সাধারণ মানুষের জানা নেই। তবে যে অনেক সময় অনেক সাধারণ মানবও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে বসে, তার কারণ একাগ্রতার ফলে অজ্ঞাতসারে তাদের কুণ্ডলিনী শক্তিই উর্দ্ধমুখী হয়। কুণ্ডলিনীর এই উর্দ্ধমুখী জাগরণের ফলে, সাধারণ মানবও অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করে ফেলে। সাধারণ মানব আর যোগীদের মাঝে পার্থক্য হল এই যে, যোগীরা consciously কুণ্ডলিনী শক্তিকে Sushumna canalএর ভিতর দিয়ে উর্দ্ধমুখী প্রবাহিত কর্‌তে পারে। অভ্যাস এবং ইচ্ছা শক্তির ফলেই তারা শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে। দু'দিন একদিন চেষ্টার ফলে শক্তি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসে না। বহু দিনের অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ফলেই শক্তি বশে আসে।

শক্তি জিনিষটা কিন্তু আসলে এক—কিন্তু সেই শক্তির ব্যবহার এক একজন এক একরূপে কর্‌ছে। পশুর মাঝে যে শক্তির বিকাশ—তাও শক্তিই, কিন্তু পাশবিক শক্তি। সাধু মহাপুরুষদের মাঝে যে শক্তির বিকাশ তাও শক্তিই—কিন্তু সে হল দৈবী-শক্তি। সুতরাং আসল কথা হল শক্তির ব্যবহার নিয়ে। কামও একটা শক্তি বিশেষ, মানুষের ভিতর যখন কাম জাগ্রত হয়, তখন আর মানুষের জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সাধকেরা এই কাম-শক্তিকেই প্রেম-শক্তিরূপে পরিণত করে নিতে পারেন। যে শক্তি চক্রের পর চক্রে অবতরণ করে নীচে নেমে আসে, সেই শক্তিকেই ইচ্ছাশক্তির বলে এবং পূর্ণ চেতনা থাকার দরুণ, তাঁরা উর্দ্ধমুখী করে দিতে পারেন। যোগীরা যে ভোগ না করেন—তা নয়, তবে ভোগে তাঁদের কখনও স্খলন হয় না। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণের—"অন্তরবরুদ্ধ সৌরতের" কথা। ইহা এই কামশক্তিকে উর্দ্ধমুখী করে তোলারই নিগূঢ় সঙ্কেত! মানুষ ভোগ চায়, কিন্তু এমনি অসহিষ্ণু যে সেই ভোগ যাতে স্থায়ী হয় তার দিকে তাদের মোটেই লক্ষ্য নাই! যোগীরা সংযত হয়ে দীর্ঘকাল এবং স্থায়ী সূক্ষ্মভোগের আনন্দই লাভ করেন। অসংযমী মানুষের চিত্ত সহজেই টলে যায়, শক্তির উদ্বোধনে তারা অন্ধ হয়ে পড়ে—তাই শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার তারা কিছুতেই করে উঠতে পারে না।

চরম জ্ঞান এবং উর্দ্ধ-প্রতিষ্ঠ আনন্দ বা চেতনা লাভ কর্‌তে হলে, কুণ্ডলিনী উত্থাপন ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হতে পারে অনেক উপায়েই—(১) **ঈশ্বরের প্রতি তীব্র অনুরাগে,** (২) **কোনও সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষের কৃপায়,** (৩) **অথবা দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচার শক্তি বা বিশ্লেষণ বুদ্ধির ফলে।** যা হোক্, যেখানেই শক্তির বিশেষ বিকাশ—সেখানেই মনে কর্‌তে হবে কুণ্ডলিনী সুষুম্না বিবর দিয়ে কিছুদূর উর্দ্ধে উঠেছেনই। দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ

অর্জ্জুনকেও এই উপদেশই দিয়েছেন :—

যদ্‌যদ্বিভূতি মৎ সত্ত্বংশ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্ ॥

এই তেজ—এই শক্তি আর কিছুই নয়—কুণ্ডলিনী ছাড়া। এই কুণ্ডলিনীর জাগরণেই মানুষ অসীম ক্ষমতাশালী হতে পারে। মানুষ তপ করে, জপ করে, ধ্যান-ধারণা করে ভগবানের কৃপা উপলব্ধি করে, আসলে এই কৃপা উপলব্ধির হেতু কি তা জানে না। অনন্ত শক্তির আধার কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণই যে কৃপা উপলব্ধির একমাত্র হেতু, তা মানুষ বুঝতে পারে না। ধ্যানে-ভগবদারাধনায় মানুষ সাড়া পায়—এর অর্থ আর কিছুই নয়—চিত্তের একাগ্রতার ফলে তার নিজের মাঝেই যে অনন্ত শক্তির আধার রূপে কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিত-রূপে বিরাজমানা, তারই আংশিক জাগরণ বা বিকাশ হয়। মানুষ মনে করে, না জানি এর মাঝে কোন্ অলৌকিক রহস্য রয়েছে! একটু অন্তর্ম্মুখী হলেই কিন্তু মানুষ সকল তত্ত্বের মীমাংসা নিজের মাঝেই খুঁজে পায়। আসল কথা হল মনটাকে একাগ্র করা, এবং সেই একাগ্রতার ফলেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

শক্তি প্রসঙ্গে সিংহবাহিনী দশভুজা মা দুর্গার কথা মনে হচ্ছে। সিংহের পিঠে চড়ে মা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন—এর মানে কি? না সিংহই হ'ল শক্তির-প্রতীক, সেই শক্তিকে পায়ের তলে রেখে অর্থাৎ নিজের বশে রেখেই মা শত্রুদেব সঙ্গে লড়াই করছেন। শক্তিকে স্ববশে রেখেই এরূপ কার্য্য সম্ভবপর। কাজেই শক্তি থাক্‌লেই হল না, সেই শক্তির জাগরণ চাই, আবার সেই জাগ্রত-শক্তিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করাও চাই।

দু'রকমেই বিপদ—শক্তি যখন ঘুমিয়ে থাকে অর্থাৎ অনন্ত শক্তির আধারভূতা কুলকুণ্ডলিনী যখন মানুষের ভিতর নিদ্রিতা থাকেন, তখন মানুষ কিছুই নয়—আবার সেই শক্তি জাগ্রতা হলে মানুষ যখন সংযম শক্তির অভাবে তাকে সুপথে অর্থাৎ মেরুদণ্ড দিয়ে উর্দ্ধমুখী করে চালাতে না পারে, তখনও এক বিপদ। কাজেই শক্তির **জাগরণ** এবং **নিয়ন্ত্রণ** দুদিকেই বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। শক্তির উদ্বোধন হলেই বা কি হবে, যদি সে শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত না করা যায়!

যৌবন কালটাই শক্তির বিকাশের সময়। মানুষের জীবনের উন্নতি-অবনতিও এই সময়েই—অর্থাৎ যৌবনে মানুষ শক্তিকে ভাল-মন্দ যে দিকে পরিচালিত করবে, মানুষের ভাগ্যও সেই ভাবেই গঠিত হয়ে উঠবে। যৌবনে শক্তির আতিশয্যে মানুষ দিশেহারা—অন্ধ হয়ে পড়ে, তাই শক্তির অপব্যবহারও যৌবনেই হয় বেশী। ভগবান্ করুণা করে যে শক্তি ঢেলে দেন, সেই শক্তির অপব্যবহারের মতন আর পাপ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই শক্তির আতিশয্যে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ হয়ে পড়ে। শক্তি পাবার দরুণ মানুষ কামনা করে, কিন্তু শক্তিকে ধারণা করে রাখাও যে কত বড় কঠিন কাজ, তা আর বল্‌বার নয়। শক্তি পেয়ে শক্তির অপব্যবহারের কথাই শুনি বেশী, কয়জন শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে? শক্তি-প্রবাহকে উর্দ্ধমুখী পরিচালিত করা কি সহজ কথা? শক্তির আতিশয্যে মানুষ দেবতাও হয়, আবার অসুরও হয়ে উঠে। মধু-কৈটভ দুই দৈত্যের মাঝে কি আর শক্তির বিকাশ হয় নি? এই শক্তির আতিশয্যেই তারা উচ্ছৃঙ্খল বা বাহির্ম্মুখী হয়ে পড়ল—কি করবে কি না করবে আর ভেবে পায় নি।

শক্তি-ধারণেই সংবেগের সৃষ্টি হয়। শক্তিকে যাঁরা ধারণ করতে পারেন, শক্তির আতিশয্য বলে কোন জিনিষ আর থাকে না তাঁদের কাছে। শক্তি-

ধারী সেই মহাপুরুষদের বাক্যে-আচরণে এই জন্যই শত শত মানুষ নিমেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সাধারণের কথায় সে শক্তি নাই—কেননা তারা তো শক্তি-ধারণের সঙ্কেত জানে না। শক্তিকে ধারণা করে যাঁরা সেই শক্তির স্রোতকে ঊর্দ্ধমুখী ফিরিয়ে দিতে পারেন, জগতে বড় বড় কাজ তাঁদের দিয়েই হয়। দৈত্যের মত বাইরের লাফালাফি থাকে না তাঁদের—শক্তির বিদ্যুন্ময় প্রবাহে তাঁদের অন্তরই মথিত হতে থাকে। এই শক্তিকে হজম করা সহজ কথা নয়। পরমহংসদেব কতদিন—কতরাত্র এই শক্তিকে আয়ত্তে আন্‌বার দরুণই বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে (অর্থাৎ শক্তি-প্রবাহ যখন ঊর্দ্ধমুখী হয়) মানুষের জগৎ জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়—অন্তরটাই তখন জেগে উঠে বেশী করে। শক্তির ঊর্দ্ধমুখী প্রবাহে যে কি তীব্র আনন্দানুভূতি আসে তা আর বল্‌বার নয়। এক একটা চক্রে যখন মন উঠে—তখন জগদনুভূতিও এক একরূপে দেখা দেয়। জগৎ জগৎই থাকে, কিন্তু যোগীর তখন দিব্য-দৃষ্টি খুলে যায়—প্রত্যেক জিনিষেরই তাত্ত্বিক রূপ প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে।

দেহের মাঝে যেটা বিদ্যুৎশক্তি, তাই হল স্থুলবায়ুর সূক্ষ্মরূপ। এই বায়ুকেই জয় করতে হবে, তাহলেই মন স্থির হয়ে আস্‌বে। কুলকুণ্ডলিনীর যখন ঊর্দ্ধগতি হ'ত, পরমহংসদেব বল্‌তেন মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে তখন যেন তর্‌বর্ করে কি একটা বেয়ে উঠত। বায়ুর ঊর্দ্ধগতিতেই এরূপ অনুভব হ'ত। অনেক দিন অভ্যাসের ফলেই বায়ুকে নিজের আয়ত্তাধীনে আনা যায়। তখন চক্রে চক্রে মনকে ধারণা করা বড় কঠিন বলে কিছু মনে হয় না। আমাদের সাধারণের মন তো একজায়গায় বস্‌তেই চায় না, তাকে স্বেচ্ছায় ঊর্দ্ধমুখী করা তো এক কঠিন ব্যাপারই। কিন্তু নিয়ত অভ্যাসের ফলে বায়ুকে ধারণা কর্‌বার শক্তি জন্মে যায় যোগীদের। যোগীদের সাধনার আসল লক্ষ্যই হল শক্তিকে জাগ্রত করা এবং সেই জাগ্রত শক্তিকে স্ববশে রেখে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করা।

শক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের লক্ষণই হ'ল কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ আরম্ভ হলেই বুঝতে হবে শক্তির অন্তর্ম্মুখীন বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। শক্তির বহির্বিকাশে অনেকেই জীবনের আসল লক্ষ্য হারিয়ে বসে। শক্তি-বিকাশের আসল লক্ষ্যই যে হল মনুষ্যত্ব লাভ করা, সে-দিকে আর মানুষের মন থাকে না, তখন মানুষ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এইজন্যই পরমহংসদেব মায়ের কাছে প্রার্থনা কর্‌তেন, "মা আমার মন যেন অষ্টঐশ্বর্য্যের দিকে ধাবিত না হয়, আমি বিভূতিও চাই না, আমি চাই তোর পদে শুদ্ধাভক্তি।"

ভারতের ঋষি শক্তির এই অন্তর্ম্মুখীন বিকাশের দরুণই ব্যাকুল! অন্তর্ম্মুখী শক্তিতেই মানুষের জীবনে রূপান্তর আসে। যে-শক্তির বহির্বিকাশে মানুষ এত মুগ্ধ-বিস্মিত-অভিভূত হয়ে পড়ে, সেই শক্তির অন্তর্ম্মুখী বিকাশ যে আরও কত সুন্দর, কত পবিত্র, কত অনাবিল, তার খবর তো মানুষ জানে না। এইজন্যই মানুষ অন্তরের চেয়ে বাইরের দিকেই ঝুঁকে প'ড়ে বেশী।

শক্তি জাগরণের সময় সচেতন-সতর্ক থাক্‌তে হবে। শক্তির অপপ্রয়োগে জীবনের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়ে যায়। তা না হলে যৌবন কালটা কতই না সুন্দর! কিন্তু সুন্দরের অমর্য্যাদাও মানুষ এই যৌবনকালেই করে থাকে। যৌবনে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, তাকে সংরক্ষণ কর্‌তে হলে দেহে-মনে-প্রাণে পবিত্র হওয়া চাই। আর মনে

রাখতে হবে যে দেহ-মনের পবিত্রতা আন্‌তে হলে জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির স্রোতকে উর্দ্ধমুখী কর্‌তেই হবে। জীবনটাকে পরিচালিত কর্‌তে হবে উর্দ্ধমুখী প্রেরণা দ্বারা। যা ভাব্‌ব, যা কর্‌ব, সবই যেন উর্দ্ধগামী চেতনায় থেকে কর্‌তে পারি—তাহলেই আর কোন গণ্ডগোলের সূত্রপাত হবে না তাতে।

মানুষ খেয়ে-ঘুমিয়েই কাল কাটায়, আসল যেখানে জোর দেওয়া প্রয়োজন, সেদিকে মানুষের মোটেই লক্ষ্য নাই। বোধন বল্‌তে—নিদ্রিতা কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তোলাই বুঝায়। সব শক্তিই মানুষের ভিতর সুপ্ত, নিজের ভিতর তীব্র সংবেগের সৃষ্টি ক'রে সেই সুপ্ত শক্তিকেই জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। মানুষ হতে হলে, কাজের মত কাজ কর্‌তে হলে জগতে—নিজের অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌তেই হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। শক্তির আধার মানুষের ভিতরে রয়েছে—অথচ শক্তি খুঁজে ম'রে মানুষ বাইরে। দিব্য-জীবন লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই—এক-মাত্র কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ ছাড়া। কুলকুণ্ডলিনী যখন জেগে উঠবেন, তখন তাঁকে সুষুম্না মার্গ দিয়ে উর্দ্ধমুখী পথটা দেখিয়ে দিতে হবে, তাহলেই মন আর কিছুতেই নীচে নেমে আস্‌বে না—মনকে সর্ব্বদার দরুণ উর্দ্ধ-প্রতিষ্ঠ-চেতনায় বিধৃত করে রাখতে পার্‌লেই তো আর কোন ভয় নাই। তখন যে দিব্য-জীবন লাভ হয়ে যাবে, মর্ত্ত্যজগতেই অমৃতের আস্বাদন পাবে।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ

——::(*)::——

জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন যিনি, জগৎ যাঁহাতে বিধৃত—তিনি হইলেন পরা-প্রকৃতি। অথচ অপরা-প্রকৃতিকেই কিন্তু আমরা জগতের কারণ বলিয়া মনে করি। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-ছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

জগতের ধৃতি-শক্তি পরা-প্রকৃতির মাঝেই রহিয়াছে। অষ্টবিধ অপরা-প্রকৃতি—জড়া প্রকৃতি, তাহারা সংসার বন্ধনের হেতু—এইজন্যই তাহাদিগকে নিকৃষ্টা বা অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরা প্রকৃতি ভগবানেরই অংশভূতা, সেই পরা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি। ভগবানের যত কিছু কাজ এই পরা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

—সূত্রে নিবদ্ধ মণিগণের ন্যায় এই সমুদয় জীব-জগৎ ভগবানের পরা-প্রকৃতিতেই গ্রথিত-আশ্রিত। সুতরাং আমাদের জীবনের মূল সূত্র হইল পরা-

প্রকৃতি। আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি সেই পরা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই—যিনি জীবভূতা। শ্বাস-প্রশ্বাস এই সব স্থুল অবলম্বন, আমাদের প্রাণ নিহিত রহিয়াছে পরা-প্রকৃতির মাঝেই। জীব যখন সেই পরা-প্রকৃতির সন্ধান পায়, তখনই আসল প্রাণ লাভ করে। সমস্ত জগতের ধৃতি-শক্তি এই পরা-প্রকৃতির মাঝেই নিহিত। প্রাণ বল পাওয়া যায়, যদি আমরা সেই পরা-প্রকৃতি বা জগতের আদি-জননীর পদাশ্রয় করিতে পারি। শুধু আমাকে নয়, জগৎকেই যিনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই তো আমাদের আদর্শ জননী !

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

তিনি যখন প্রসন্না হন, তখন মুক্তির জন্য বরদাত্রী হন। জীবের মুক্তিলাভের উপায় একমাত্র তাঁহারই কৃপা বা করুণা। সমস্ত শক্তি বা বীর্য্যের আকরই হইলেন—পরা-প্রকৃতি ! জীবনে শক্তি লাভ করিতে হইলে বীর হইতে হইলে, তাঁহার কাছেই আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ অপরা-প্রকৃতির কাছেই আত্ম সমর্পণ করি—এই-জন্যই কেবলই যাতনা ভোগ করিতে হয় আমাদের। পরা-প্রকৃতির কৃপা লাভ করিতে পারিলে—এই স্থুল রক্ত মাংসের দেহই ভাগবত দেহে পরিণত হয়। অপরা-প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হই বলিয়াই, আমাদের জীবনের কোন মূল্য নাই।

আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই হইল আশ্রয় লাভ করা। ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ মহা সিন্ধুতে বিলীন হইয়া যাইবে। এখন আশ্রয় লাভ করিতে গিয়া—পরা-প্রকৃতির স্থলে, অপরা-প্রকৃতিতে আশ্রয় করিলেই পতনের আশঙ্কা। স্থুল আশ্রয় যাহারা অবলম্বন করে, তাহাদের মাঝেও যে মাঝে মাঝে পতন দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ আশ্রয়ের অপরা-প্রকৃতিকে তাহারা সম্যক্ উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্যই আশ্রয় লাভ করিয়াও অনেকের জীবনে বিকৃতি দেখা দেয়। কৃপার কথা আলাদা। কিন্তু স্বচেষ্টায় যাহাদিগকে পরা-প্রকৃতির আশ্রয় লইতে হয়, তাহাদিগের কতখানি সংযম এবং ত্যাগের শক্তি থাকা দরকার তাহা আর বলিবার নয়।

জীবনকে পরা-প্রকৃতির নির্দ্দেশে পরিচালিত করিতে পারিলেই সকল দিকে কল্যাণ। কিন্তু এই পরা-প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া খুবই দুষ্কর। গীতা-তেই এক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই অনাদি—সুতরাং সমাধিগম্য। বহির্দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগের কোন সন্ধানই মিলে না। জগতের ধৃতি শক্তি যাঁহার মাঝে নিহিত—তিনি জগতের উর্দ্ধে বর্ত্তমান। তাঁহাকে পাইতে হইলে জগতের উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে হইবে।

বীর্য্যের মাঝেই—অটুট ধৃতি শক্তি। যিনি জগদ্ধাত্রী তিনি অক্ষত বীর্য্যশালিনী। তাঁহার কাছ থেকে সেই ধৃতি শক্তি লাভের উপায়ই জানিয়া লইতে হইবে আমাদের। সব সহিতে জগৎকে বুকে ধারণ করিয়া রাখা বড় সহজ কথা নয়—ইহা অপরা-প্রকৃতির কাজ নয়। অপরা-প্রকৃতি তো দুর্ব্বলা। তাহার মাঝে সেই প্রাণ শক্তি কোথায় ? জীব তাহাকে আশ্রয় করিয়া কেবলই তো দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু পরা-প্রকৃতির কৃপা লাভ করিতে পারিলে—অমিত বিক্রমে এই মানুষই হুঙ্কার দিয়া উঠে। মানুষ যদি তাহার পরা-প্রকৃতির সন্ধান পায়, তাহা হইলে এই জগতে মানুষ না করিতে পারে কি ?

অপরা-প্রকৃতি তো জড়, তাহার মাঝে প্রাণ-সঞ্চারের ক্ষমতা কোথা? প্রাণ-শক্তি নিহিত রহিয়াছে পরা-প্রকৃতির মাঝেই। কাজেই পরা-প্রকৃতির কৃপা লাভ করিতে পারিলে ভিতরে আপনি

প্রাণের সঞ্চার হয়। জগতের আদি জননীর সন্তান দুর্ব্বল নয়—কাপুরুষ নয়। আমাদের জীবন-সূত্র যে পরা-প্রকৃতির সঙ্গে সংযোজিত—এই উপলব্ধি নিজের মাঝে লাভ করিতে পারিলেই, তখন আর জীবনে দুঃখ-দৈন্য-আর্ত্তনাদ কিছুই থাকে না। ঋষিরা সেই আদি-জননী আদ্যা-প্রকৃতি বা পরা-প্রকৃতির কৃপা উপলব্ধিতেই এত উদ্দীপ্ত, এত বীর্য্যশালী! আমরাও ঋষির বংশধর, আমা-দিগকেও সেই ধৃতি শক্তি, সেই বীর্য্য লাভ করিতে হইবে।

জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিতে হইলে যে কত-খানি প্রাণ শক্তির প্রয়োজন, তাহা আর বলিবার নয়। এই চাঞ্চল্যের নৃত্য নীরবে বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারা সহজ কথা নয়। জননী বলিয়াই ইহা সম্ভব। অফুরন্ত প্রাণ শক্তি রহিয়াছে বলিয়াই —পরা-প্রকৃতি কিছুতেই বিচলিত হ'ন না। অক্ষম সন্তানের সকল দোষই মা স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আমরা নিশ্চিন্ত-নির্ভয় হইতে পারি কখন? যখন আমাদের আদি-জননী কোলে স্থান দেন। তাহা না হইলে অপরা-প্রকৃতির কবলে পড়িয়া আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা জীবন লইয়া গর্ব্ব করি—কিন্তু সমগ্র-মানবের জীবনই যে পরা প্রকৃতি দ্বারাই গ্রথিত! জীবনের বহির্বিকাশে আমরা লক্ষ্যহারা হইয়া পড়ি, তাই প্রাণ শক্তিও ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসে আমাদের।

নারীর আদর্শ—এই পরা-প্রকৃতি, যিনি জীবভূতা; সমগ্র জগৎকেই যিনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাণ-শক্তি সেই পরা-প্রকৃতির মাঝেই বর্ত্তমান। আমাদিগকে শক্তি লাভ করিতে হইবে সেই পরা-প্রকৃতির কাছ থেকেই। জগতের সমগ্র ধৃতিশক্তি যাঁহার মাঝে বর্ত্তমান, তিনি কোমলা বা স্নেহপ্রবণাই নন শুধু—প্রয়োজন পড়িলে বীর্য্য বা শক্তি প্রকাশেও ন্যূনতা দেখা যায় না তাঁহার। এই তো ঠিক আদর্শ জননী! এই আদর্শ জননীর সন্তান কেমন করিয়া ভীরু বা কাপুরুষ হইতে পারে? পরা-প্রকৃতি হইতে যে অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির সঞ্চার হয়, সন্তান কি করিয়া দুর্ব্বল হইতে পারে? দুঃখ-দৈন্য সব যে পেছনে পড়িয়া থাকে—মা যে সন্তানের প্রাণে অহরহঃই প্রাণ শক্তির সঞ্চার করিয়া দেন। আজ মায়ের পূজা—কিন্তু মাকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে আমরা কাহার সন্তান—এই কথাটী প্রাণের মাঝে আলোড়িত করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতের সন্তান সেই আদি জননী, জীবভূতা, পরা-প্রকৃতিরই সন্তান—সুতরাং. অপরা-প্রকৃতির কবলে সাময়িক কবলিত হইয়া থাকিলেও আবার সেই বীর্য্য, সেই ত্যাগ, সেই সংযম শক্তি জাগিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা যে দুর্ব্বলা মায়ের সন্তান নই—আমাদের মায়ের পরিচয়—"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ!"

পূজার চিঠি

—:(*):—

শক্তির কথা বল্‌তে গেলেই ভাই সাধনার কথা মনে পড়ে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে স্বাধীনতার কথা, যা আমাদের আত্মার চিরন্তন স্বভাব। শক্তি শব্দের মূল ধাতুটা তো জান? তার অর্থই হচ্ছে সম্ভাব্যতা—creative energy. কিসের সম্ভাব্যতা? নানা দর্শন নানাভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। সাংখ্য শক্তিকে বলেছেন 'প্রকৃতি' আর তার অর্থ করেছেন "প্রকরোতি সর্ব্বং!" প্রকৃতি বল্‌তে তিনি passivity বোঝান নি, বুঝিয়েছেন fullness of activity. যোগ আরও একটু এগিয়ে বল্‌ছেন, "সর্ব্বং সর্ব্বং ভবতি"—চাই কেবল 'আবরণ ভেদ'—তোমার মাঝেই সব আছে, যা ফুটিয়ে তুল্‌তে চাও, সংযম-শক্তি দ্বারা ইতর বৃত্তির নিরোধ করে সেই দিক্‌টার আবরণ ঘুচিয়ে দাও, নিশ্চয় তা ফুটে উঠবে, কেন না "সর্ব্বং সর্ব্বং ভবতি।" এই হচ্ছে প্রকৃতির আইন, আত্মার মহিমা! উপনিষদও বল্‌ছেন, "সর্ব্বমিদমাত্মৈবাভূৎ" আত্মাই এই সব হয়েছেন। শক্তির এই স্বাতন্ত্র্য দেখে বৈদান্তিক বলে উঠলেন, "বলিহারি! এই তো মায়া!" মায়া অর্থ কি?—দ্রষ্টার নির্ব্বিকার ভাব আর শক্তির স্বাতন্ত্র্য—এই দুটী মিলালেই মায়া। মায়া খণ্ডবুদ্ধির পরাজয়; ন্যায়ের যুক্তি দিয়ে যে বুদ্ধি কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলা খুঁজে বেড়ায়, তার পরাভব এই মায়ায়। বাস্তবিক এই জগৎটা বিচিত্র মায়া বই আর কি? আর সেই মায়ায় আত্মারামের কি উল্লাস! এই আনন্দই প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় স্বরূপ—সৃষ্টির দ্যোতনা, কর্ম্মের প্রেরণা এই আনন্দের মাঝেই!

তোমার খণ্ডবুদ্ধি দিয়ে নয় ভাই, বাধাবন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত সংস্কারহীন বিরাট হৃদয় দিয়ে, বেদের ভাষায় যে হৃদয় "কবির্মনীষী"—একাধারে ক্রান্তদর্শী (intuitive or synthetic) ও মননশীল (intellective or analytic) সেই বিরাট হৃদয় নিয়ে একবার জগতের পানে চেয়ে দেখ—এ জগৎ স্বাতন্ত্র্যের লীলাভূমি, স্বাধীনতার রঙ্গপীঠ। The divine Will is evolving itself in endless ways. "অমনটী না হয়ে এমনটী কেন হল না"—এ আমাদের ছেলেমানুষী ভাই! আমাদের ইচ্ছার পরাভবেই তো তাঁর শক্তির পরিচয়! খণ্ড ইচ্ছাতেই পরাধীনতা—অখণ্ড বিরাট ইচ্ছা যে স্বাধীন! "Our wills are ours to make them thine!" চূর্ণ হয়ে যাক বাসনার বিক্ষোভ, অথবা পূর্ণ হোক্ তার আকৃতি—দ্রষ্টার কাছে দুই-ই কি তুল্যমূল্য নয়? —কি চাই জগতে বল তো? যা চেয়েছিলাম, তা হল না বলে দুঃখ করব? হয় নি যে, তাতেই তাঁর ইচ্ছার জয় হয়েছে—তাইতে তাঁর শক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেয়েছি। অথবা যাই চেয়েছি তাই পেয়েছি। —সে-ও তাঁরই ইচ্ছার জয়—তাঁরই শক্তির অক্ষুণ্ণ প্রকাশ! দুই-ই আনন্দ—কেবল আনন্দ—কেবল অফুরন্ত স্বাধীনতা! ভাই, তোমার-আমার স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? গরুর খুঁটী-বাঁধা দড়ির স্বাধীনতা তো? —ভুলে যাও। ভুলে যাও ক্ষুদ্রের অভিমান—বিরাটে আত্মবিসর্জ্জন দাও —নির্ব্বাণ সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। তারপরও যদি 'আমি'র রেশটুকু থাকে তো চরম পরাভবে অনুভব কর তাঁরই স্বাধীনতা আর তোমার দাস্য, তাঁরই শক্তি আর তোমার দৈন্য, তাঁরই জীবন আর

তোমার মরণ। শক্তির চরম আস্বাদন এই জেনো —আমিত্বের নয়, জীবত্বের বিসর্জ্জনে শিবত্বের প্রতিষ্ঠা!

খণ্ড ইচ্ছার জয়কেই আমরা সাধারণতঃ শক্তির পরিচয় বলে মনে করি। সাধুত্বের সাধনাতেও দেখি তাই। অসাধারণ একটা কিছু ঘটিয়ে যিনি তাক্ লাগাতে পারেন, তিনিই আমাদের কাছে শক্তিশালী সাধু। সাধনার সময়ও আমরা চাই শক্তির এই খণ্ডিত উন্মেষ অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয় শক্তিরই পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন। এ সবই শক্তির পরিচয় স্বীকার করি, কিন্তু এর মূলে জ্ঞান কোথায়? —অন্তরের উল্লাস কোথায়? লীলারস আস্বাদনের চমৎকারিত্ব কোথায়?

আমিত্বের বিসর্জ্জনে শক্তির প্রকাশ, এ কথা বল্‌লাম বলে মনে করো না ভাই, আমি passivity-কেই তোমাদের জীবনে বড় করে নিতে বলেছি! আমিত্বের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে আমিত্বের প্রতিষ্ঠা। বিসর্জ্জনের পর যে প্রতিষ্ঠা তা নয়, প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতাই তোমায় বিসর্জ্জনের প্রেরণা দেবে। তোমার জীবনও সেই মহাশক্তিরই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত, সুতরাং মূলতঃ তার মাঝে একটা সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা, একটা প্রকাশের ব্যাকুলতা আছেই। কোন্ সত্য তোমার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সব সময়ে হয়ত ধর্‌তে পার না। সেইটী ধর্‌বার জন্যই চাই বিবেক, চাই বৈরাগ্য। একজন গান গাইছে, তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে বাজাবে। সুরের যে কোনও পর্দ্দাকে খেয়াল-খুসীতে চেপে ধর্‌লেই harmonyর সৃষ্টি হয় না। একটা পর্দ্দাকে ছুঁয়ে যদি দেখ, গায়কের গানের সঙ্গে মিল্‌ছে না, অমনি তাকে ছেড়ে আবার আর একটা পর্দ্দা ধর্‌তে হবে। মিল্‌ছে কি না মিল্‌ছে, এইটুকু বুঝবার জন্য যে অবধান, তারই নাম বিবেক; আর না মিল্‌লেই তাকে ছেড়ে দেবার নাম বৈরাগ্য। এমনি বিবেক আর বৈরাগ্য দিয়ে জীবনের আদর্শের যাচাই কর্‌তে কর্‌তে যেই দেখ্‌বে ঠিক পর্দ্দাতে হাত পড়েছে, অমনি তাতে একান্ত ভাবে চিত্ত সমাধান করাই হল আমিত্বের প্রতিষ্ঠা! এই প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করেই বিসর্জ্জনের সাধনা। প্রতিষ্ঠা অনুরাগের নিশানা; তার মূলে রয়েছে বিসর্জ্জন বা বৈরাগ্য।

এমনি করে বেসুরা আমিটাকে বর্জ্জন করে যদি খাঁটী আমিটীর সাক্ষাৎ একবার পাও, তাহলে আর জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, পাওয়ার আর কিছু বাকী থাকে না। অন্তর দিয়ে তখন পাওয়ার সুরু হয়, বাইরে তার প্রকাশ কতটুকু সে অবান্তর। যারা বহির্ম্মুখ, তারা বাইরের প্রকাশ দিয়ে অন্তঃশক্তির যাচাই কর্‌তে চায় বলেই বারবার বিচারে ভুল করে। "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—সত্যি কথাই বটে, কিন্তু সে জয় অন্তরে না বাইরে, কি করে বুঝব? যুধিষ্ঠিরের জীবনে, সীতার জীবনে, খৃষ্টের জীবনে বাইরের জয় কতটুকু দেখা দিয়েছিল? তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা পরাভূত বলেই তাঁদের শক্তিহীন ভাব্‌তে পারি না। অন্তর তাঁদের পরাভূত হয়েছিল কি? আর আজ লক্ষকোটী মানবের হৃদয়ে কার আসন? দুর্য্যোধনের, না যুধিষ্ঠিরের? রাবণের, না সীতার? Judas Isacriot এর না Jesus Christ এর? সত্যদর্শীর শক্তির পরিচয় তাই এক জীবনেই হয় ত পাওয়া যায় না, কেন না তাঁদের জীবন যুগবিস্তৃত, বহু জীবনের সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ তাঁরা, অথবা অনাগত সঙ্ঘসিদ্ধির সূচনা তাঁরা।

এই কথাটী যদি বুঝতে পার, তাহলে অন্তঃ-শক্তিকে passivity বলে আর ভুল করবে না। আত্মবিসর্জ্জন মহাশক্তিরই উন্মেষের নিশানা; আর আত্মবিসর্জ্জনের মূলে আছে আত্ম-দর্শন! এই আত্মদর্শনে, in its fiinding out of one's life's

mission. অন্তরের সমস্ত জড়ত্ব ভস্মীভূত হয়ে যাবে, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা অন্তরে বহ্নিশিখার মত জলে উঠবে। একবার নিজকে চিনে নিতে হবে, নইলে শক্তি ফুটবে কেন? বোধ হয় গল্প শু'নছ, একটা সিংহের বাচ্চা ভেড়ার পালে পড়ে ভেড়া বনে গিয়েছিল। আর একটা সিংহ যখন তাকে ঘাড়ে ধরে নদীর কাছে এনে জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বল্‌ল, "এই দেখ, তুইও যা, আমিও তা! আর এই ভেড়ার মাংস—একটুখানি মুখে দিয়ে দেখ দেখি।" তখন সে-ও হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"অহং সিংহোঽস্মি" বলে। হয়ত আজন্মপোষিত ভেড়ার সংস্কার তারপরও তাকে অনেক বার ভুল পথে চালাতে চেয়েছ, কিন্তু **সামান্যতঃ আত্মদর্শনের** পর আর সে ভুল তার স্থায়ী হবার অবকাশ পায় নি। **বিশেষ আত্মদর্শনের** জন্য তখন সে তার পূর্ব্বতন ভেড়া সংস্কারগুলি সমূলে বিসর্জ্জন দিতে কখনও কার্পণ্য করে নি। সামান্যতঃ আত্মদর্শনে প্রতিষ্ঠিত যে আত্মবিসর্জ্জন, তাইতে অন্তরে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। এটুকু না হলে আত্মসমর্পণে হয় অতৃপ্তি, নয় যে জড়ত্ব নিয়ে আসে, তা বোধ হয় তোমার অজানা নাই।

আমার আমিটুকুকে ছাড়া, সে কি সহজ কথা? চিরকাল কেঁদে মরছি আমার বাসনা-কামনাকে জয়ী করবার জন্য। আজ বাসনা ছাড় বল্‌লেই তা ছাড়তে পারব কেন? বিষয়ী তাই কামনা ত্যাগ বল্‌তে মরণের ভয়ে আঁৎকে ওঠে। বাসনার পরিবর্জ্জনে অন্তঃশক্তির বিকাশ একথা সে মানবে কেন? তাই বলি, জ্ঞানের উন্মেষ ছাড়া বাসনা ত্যাগ কখনো সম্ভবপর হতে পারে না। যদি বুঝি, এই ক্ষুদ্র কামনা ছাড়লে পর এই মহতী সিদ্ধি আমার করায়ত্ত হবে, তাহলেই বাসনা ত্যাগ করতে পারি। এইজন্যই বলি, ধর্ম্মের negative দিক্‌টা দেখাবার আগে মানুষকে তার positive দিক্‌টা বোঝাও। এমন কেউ নাই জগতে যে বীর্য্য চায় না, দীপ্তি চায় না, আনন্দ চায় না। ওই কথাগুলি বারবার বল—নিজকেও ওই ভাবনায় ভাবিত কর। আগুন জ্বালাও অন্তরে, তারপর ইন্ধনের মত বাসনা-কামনাগুলোকে সেই আগুনে আহুতি দাও—আগুনের আরও জোর হবে। হয় মানুষকে জ্ঞান দাও, নয়ত প্রেম দাও—আত্মসমর্পণ সহজ হবে, আত্মবিসর্জ্জনে তার এতটুকু কাতরতা থাকবে না, শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ তাকে আকুল করে তুলবে।

ওই যে "সামান্যতঃ আত্মদর্শনের" কথা বলেছিলাম, ওটা আর কিছু নয়—পতঞ্জলির প্রাতিভ জ্ঞানের মত জ্ঞানের বা প্রেমের এক ঝলক। ওইটুকু হল গুরু-শিষ্যের মাঝে magnetism—ওইটুকু প্রাণের পরশ। প্রাণের কোন philosophy নাই তা জান? It is spontaneity, ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, ওর আইন গড়া যায় না। ওই প্রাণই মায়া, ওই প্রাণই সৃজনী শক্তি। যেখানে আত্মবিসর্জ্জন, সেখানে ওই প্রাণের খেলা। সমর্পণকে philosophy করে তুলো না, বা আত্মসমর্পণের আইন জারী করতে যেও না। তাহলে প্রাণটুকু পালিয়ে যাবে, যা থাকবে তা কেবল অন্তরে ধোঁয়ার সৃষ্টি করবে, কখনো আগুন জ্বালিয়ে তুলবে না।

গুরু-শিষ্যের মাঝে সমর্পণের মহিমা অনায়াস হয়ে ফুটে ওঠে, আর শক্তিরও স্ফুরণ হয় সেখানেই। কিন্তু জেনো, সমর্পণ উভয়তঃ। অর্থাৎ গুরুকেও শিষ্যে আত্মনিবেদন করতে হয়, আর শিষ্যকেও গুরুতে আত্মনিবেদন করতে হয়। যে-কোনও তরফে অহমিকা থাকলে প্রেম থাকে না, আর প্রেম

না থাক্‌লেই আত্মসমর্পণের philosophy বা technique এর কথা শুনতে পাই, অন্তরের ধন হাটের বেশাতি হয়ে দাঁড়ায়। গুরু-শিষ্যের ভালবাসা স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার চেয়েও গভীর। এ যুগে একটা মস্ত বড় creative energyর বিকাশ আমরা দেখ্‌লাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে! কি গভীর ভালবাসা, ভেবে দেখ দেখি। শুধু বিবেকানন্দের সমর্পণের কথাটাই ভেবো না, রামকৃষ্ণের আত্ম-বিসর্জ্জনের দিকেও তাকিয়ে দেখো! মহিমজ্ঞানের ওকালতী যারা করছে, তারা ভালবাসে নি কখনো; তারা দাম্ভিক,—প্রেমিক নয়।

একেই বলি মনের মানুষ! "মনের মানুষ হয় যে জনা আঁখির কোণে যায় যে চেনা।" সে মানুষকে দেখলে পরেই, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ"—হৃদয়ের গ্রন্থি টুটে যায়, বুক এলিয়ে পড়ে, আর কোনও সংশয় থাকে না। এই নিঃসংশয় এলিয়ে পড়াতেই সামান্যতঃ আত্মদর্শন ঘটে। ভাই, আধারভেদে জীবনের mission এর যতই তারতম্য কর না কেন, সবার মূলে কিন্তু এক কথা—সেই সচ্চিদানন্দে এলিয়ে পড়া, আর যদি ফিরে আস তো এ জগৎটাকে বুকে জড়িয়ে ধরা। সামান্যতঃ আত্ম-দর্শনে ভিতরে এই সচ্চিদানন্দেরই স্ফুরণ হয়। বিশেষ দর্শনে তাকে আয়ত্ত করি—তখন যত কসরৎ, যত সাধনা! আত্মসমর্পণে সিদ্ধি—কিন্তু জান্‌বে, তার ওই নিশানা—সমর্পণের আগে সামান্যতঃ দর্শন ঘট্‌বে। শ্রীমতী শ্যামনাম শুনেই যেমন আত্মহারা হয়েছিলেন, তেমনি আত্মহারা ভাব আস্‌বে, পলকের দর্শনে জেনে নেব, চিরকাল ধরে তুমি আমার, আমি তোমার!

এরপর আর কামনা ত্যাগে বেগ পেতে হয় না। যদি চাইবার আর কিছুই না থাকে, অথচ অনুভব করি, প্রতি পলে আমার অন্তরের চিরন্তন চাওয়ার সার্থকতা ঘট্‌ছে, তাহলেই পাই তাঁর শক্তির পরিচয়, আর আমার আনন্দময় স্বভাবের স্ফুরণ। দৃষ্টি তখন স্বভাবতঃই অন্তর্ম্মুখী হয়ে পড়ে, সাক্ষী চেতার ভাব আপনি জেগে ওঠে, মায়ার এক অভিনব অর্থ প্রাণে ভেসে ওঠে। আমার এই চোখ হয় সেই বিশ্বতশ্চক্ষুরই চোখ, সেই চোখ দিয়ে আমিই দেখি আমার অনন্ত-সম্ভাব্যতার স্ফুরণ, আর আমাকে কেন্দ্র করে জগতের যত ভালমন্দের আবর্ত্তন। বাইরের বিচার তখন কাণা হয়ে যায়, জীবন-মরণ একাকার হয়ে যায়—আমার এই অহং তাঁর অহং-এ পরিণত হয়ে অনন্ত স্বাধীনতার আস্বাদনে প্রাণে অমৃতধারা বইয়ে দেয়—জগতের পানে তাকিয়ে কেবলি মনে হয়—ভালবাসি, সবাইকে ভালবাসি—আমার আমিকেই সবার মাঝে যে পাই!

দেখ, আগের কথাটা আর শেষের কথাটা সবারই সুন্দর। বিপদ যত মাঝখানে।—সাধনার পথে যখন পা বাড়াই, তখন কত সুন্দর কথাই না শুন্‌তে পাই, আশায়-আনন্দে প্রাণ নেচে ওঠে। যার ভাগ্যে সাধনায় সিদ্ধি মিলে, সে-ও তো সেই চির সুন্দরকেই পায়। কিন্তু মাঝখানে ভাগ্যের বিবর্ত্তনে কি ফ্যাসাদই না এসে জোটে। কর্ম্ম বিপাকে আদর্শের সৌন্দর্য্য মলিন হয়ে যায়, অন্তরের যত পঙ্কিল ভাবগুলিই শুধু প্রকট হয়ে পড়ে যে তাই নয়, দিন দিন তারাই যেন জোর ধরে ওঠে। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হতে পারে না, যদি সে কর্ম্মের মূলে জ্ঞান না থাকে। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।" কিন্তু জ্ঞান ফোটে কার?—"নাশান্তঃ না সমাহিতঃ।" অশান্ত, অসমাহিত থাক্‌লে জ্ঞান ফুট্‌বে না। চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করি কি করে? তার কোন royal road নাই।—একমাত্র উত্তর—"অভ্যাসেন হি, বৈরাগ্যেণ চ।" কর্ম্মের মাঝেও বিরাগ থাকা চাই—কর্ম্মকে এড়াবার

দরুণ apathetic ভাব চাই; আর চাই সুন্দরকে আয়ত্ত করবার দরুণ ধ্যানকুশলতা, পুনঃ পুনঃ চিত্ত-সমাধানের জন্য অভ্যাস যোগ। সমর্পণের সাধনা-তেও ওই কথা—"যৎ করোষি যদশ্নাসি,······তৎ কুরুষ মদর্পণম্।" "যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্।" কাকে সমর্পণ করছি, সেটী স্মরণে থাকা চাই। এ তো কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া নয় যে একদিন সাক্ষী সাবুদ ডেকে এনে দলিল সম্পাদন করে রেজেষ্ট্রী করে দিলেই হল! প্রতি পলে পলে স্মরণ—প্রতি শ্বাসে শ্বাসে জপ—"নাহং নাহং—ত্বমেব—ত্বমেব।" সে তুমি কেমন, তা-ও আস্বাদন করবার, অনুভব করবার অবিরত প্রয়াস চাই। আর বৈরাগ্য দিয়ে চিত্তকে বিষয় স্পর্শ হতে বিবিক্ত রাখা—যাতে সব চূর্ণ হয়ে গেলেও চিত্তে একটুকু না দাগ লাগে। এতখানি যদি হয়, তাহলে সহজ জীবনও সুন্দর হতে পারে। কিন্তু ভাই, আমাদের সে সাত মণ তেলও পোড়ে না, রাধাও নাচে না। সহজ জীবন আমাদের একেবারেই সহজ হয়ে যায়। তাই সমর্পণ নিয়ে আসে জড়তা; লোভ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলিই দিন দিন কেবল প্রবল হতে থাকে। পাশব বৃত্তিই যেখানে প্রবল, শক্তির স্ফুরণ সেখানে অসম্ভব।

শেষের কথা এই বলি ভাই, স্থৈর্য্যে শক্তি। তোমার মাঝে যদি কিছু থাকে তো স্থির হলেই তা বুঝতে পারবে। অস্থির বলেই না নিজের সম্ভাব্য-তার দৌড় বুঝতে পারছি না, তাই এটায় সেটায় জোট পাকিয়ে জীবন একটা জঞ্জাল হয়ে উঠছে। কি ধ্যান করব, কি ভাবব, তা-ও যদি না বুঝে উঠতে পার তো সব ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মনটাকে ফাঁকা করবার অভ্যাস কর। তবে কিনা অমনি ফাঁকা নয়, আকাশের মত বিরাট ফাঁকা—সে ফাঁকা সার্ব্বাধার। এম্নি করে ভূমিকা তৈরী কর। সেই ভূমিকাতেই তোমার জীবনের আলেখ্য ফুটে উঠবে। কি করতে হবে না হবে অন্তর হতেই তার নির্দ্দেশ পাবে, আর সে নির্দ্দেশ হবে শুধু স্বপনের খেয়াল নয়, মহাশক্তির প্রেরণা থাকবে তার পেছনে! শক্তির সাধনা স্থৈর্য্যেরই সাধনা; সৃষ্টিরও তাই সঙ্কেত!

শক্তির ভাববিহ্বল সাধনাও আছে। আজ তার কথা কিছুই বলব না। প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি, আত্মদর্শন। স্থির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ কর। ও যে passivity নয়, তা আগেই বলেছি। শক্তিকে নিরোধরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর। সমস্ত energy centralised হোক্। মৈত্রীভাবনা দ্বারা চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর কর। তাহলে জগতের সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়িয়ে যে তাৎপর্য্য রয়েছে, তা তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত হবে। তোমার এই আত্ম-প্রকাশকে অধিষ্ঠান করে যদি ভাবের উন্মেষ হয়, তাহলে তার মাঝে আর প্রমাদ থাকবে না। অতএব ভাববিহ্বলতাকে দূরে রেখে আত্মদর্শনের বীর্য্যময়ী সাধনাকেই আজ শক্তি-সাধনারূপে গ্রহণ কর। মহাশক্তি তোমার সহায় হোন।

মায়ের আবির্ভাব

—:(*):—

একটী সুপ্রাচীন কাহিনী। পুরাতন হইলেও তাহা আমাদের কাছে চিরনূতন। পৌনঃপুনিক আলোচনায় ইহাতে আলঙ্কারিকের পুনরুক্তি দোষ ঘটে না, বরং বৈদান্তিকের নিদিধ্যাসনের ফল লাভ হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে আমাদেরই দেশে সুরথ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটীল প্রভাবে—নিয়ত ঘূর্ণায়মান জগচ্চক্রের কঠোর আবর্ত্তনে তিনি সামান্য কতকগুলি অসভ্য শূকরখাদক যবনের হস্তে পরাজিত হইলেন, বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট অমাত্যগণ শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া তদীয় রাজধানীর কোষাগার ও সৈন্যসামন্তাদি হস্তগত করিল, তাই বাধ্য হইয়া অপহৃতাধিপত্য সুরথ মৃগয়াব্যপদেশে অশ্বারোহণপূর্ব্বক একাকী গহন বনে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু হায়! বনে গিয়াও তিনি শান্তি পাইলেন না, বনে গিয়াও দুশ্চিন্তার হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা, প্রাণোপম আত্মীয়স্বজনের কথা—সবই ধীরে ধীরে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ-বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। যাহারা তাঁহার বিপদে অন্যকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহারা একটী মুখের কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেও বিমুখ হইয়াছে, যাহারা তাঁহাকে উৎসবান্তে বাসি ফুলের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিতেও কষ্ট বোধ করে নাই, সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুর স্বার্থপর আত্মীয়স্বজনদেরই মায়ায়, তাহাদেরই বিরহে তিনি ব্যথিত ও জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"যে রাজ্য পুরুষপরম্পরাক্রমে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছে, আমিও একদিন যে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলাম, জানি না আমার সেই প্রিয়তম রাজ্য আমার অভাবে আমার অসচ্চরিত্র দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যগণ ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছে কি না! জানি না সতত মদস্রাবী সপ্রধান (মাহুত সহিত) মহাবল হস্তী আমার শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইয়া কীদৃশ ভোগ্য লাভ করিতেছে! অহো দুঃখ! যাহারা আমার প্রসাদে পারিতোষিক, ধন ও আহার্য্য লাভ করিয়া নিত্য আমার সেবা করিত, আজ কি না তাহারা দীনভাবে অন্য ভূপতির অনুসরণ করিতেছে—পরিচর্য্যা করিতেছে! আমি অত্যন্ত কষ্ট সহকারে যে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছি, হায় অদৃষ্ট! আজ কি না আমার সেই সঞ্চিত ধনরাশি দ্যূতমদ্যপ্রভৃতি অধর্ম্ম বিষয়ে ব্যয়পরায়ণ মদীয় অমাত্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে!........."

এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে কত কথাই যে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই, কত অতীত সুখের কাহিনী তাঁহার অন্তরে জাগরূক হইল তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। তিনি অতি দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দিগন্তের পানে চাহিয়া রহিলেন শুধু!

একদিন দুইদিন নয়, দিনের পর দিন এই সমস্ত চিন্তা তাঁহার চিত্তকে মথিত করিয়া ফিরিতে লাগিল, দিনের পর দিন তিনি অধিক হইতে অধিকতর মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে

লাগিলেন। এইভাবে চিন্তাকুলিত চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একটী বৈশ্যজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

বৈশ্যকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এ-ও যেন আমারই দশাগ্রস্ত, যেন আমারই মত হৃতসর্ব্বস্ব ও স্বজন বঞ্চিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাই সেই বিপদের বন্ধু, সমব্যথী আত্মোপম বনচারীকে দেখিয়া, হৃদয়ের গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার মানসে তাঁহাকে অতি আপনার জনের মত সমীপে আহ্বান করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনাকে যেন শোকাকুল এবং দুশ্চিন্তাপরায়ণ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি? হে মহাভাগ! আপনি আপনার যাবতীয় ঘটনা সরল ভাবে আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

সেই বৈশ্য ভূপতির প্রণয়ভাষিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আমার নাম সমাধি, জাতিতে আমি বৈশ্য। ধনসম্পন্ন বংশে আমার জন্ম। কিন্তু অসাধুবৃত্ত পুত্র-কলত্রগণ ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া এক্ষণে আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে। তাই ধন-সম্পত্তিবিহীন—আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব পরিত্যক্ত আমি দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি এখন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুত্র-কলত্র ও বন্ধুগণের কুশলাকুশল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতেছি না। আমার পুত্রাদি এখন কুশলে কি অকুশলে কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা সদ্বৃত্তিসম্পন্ন কিম্বা অসদ্বৃত্তি-পরায়ণ হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।

বৈশ্যের এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"আপনি ধনলুব্ধ যে পুত্র-ভার্য্যাদি দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছেন, আবার তাহাদেরই প্রতি আপনার মন স্নেহপ্রবণ হইতেছে কেন? কেন আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি প্রধাবিত হইতেছে? ইহা যে সম্পূর্ণ বিপরীতাত্মক!"

বৈশ্য উত্তর করিলেন—"আপনি আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা অতীব সত্য। কিন্তু কি করিব, আমার চিত্ত যে কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না। যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ, পতিভক্তি ও স্বজন প্রেম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে নিরাকৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃকরণ প্রেমপ্রবণই হইতেছে। হে মহামতে রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমিও বুঝিতেছি। তথাপি কেন যে সেই গুণরহিত বন্ধুবর্গের প্রতি আমার চিত্ত প্রেমাসক্ত হইতেছে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহাদের নিমিত্ত আমার নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে, চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। কই, সেই প্রীতিরহিত বন্ধুগণের প্রতি আমার চিত্ত তো কিছুতেই মমতা-বিহীন হইতেছে না! অতএব এখন আমি কি করিব? কি করিলে আমার এই মোহভ্রান্তির বিনাশ ঘটিবে, তাহা আমায় বলুন।"—

রাজা বলিলেন—"হে মহামতে! আপনার যে দশা, আমারও সেই দশা। আপনার মত আমিও স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, অমাত্য প্রভৃতি দ্বারা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত! তথাপি আমার চিত্তও ঠিক আপনারই মত সেই অকৃতজ্ঞদের প্রতিই আবার স্নেহসমাকুল হইতেছে। —আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, কেন এমন হইতেছে। আচ্ছা চলুন—সন্নিকটেই মহামুনি মেধসের আশ্রম। আশ্রমাধিষ্ঠাতা পরম জ্ঞানী; বুঝিয়া শুনিয়াও লোকের মনে কেন এমন অন্যায় মায়ার সঞ্চার হয়, বুঝিয়া শুনিয়াও কেন লোক এ টান ছিঁড়িতে পারে না, বুঝিয়া শুনিয়াও কেন মানুষ স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ

করিয়' লয়, সব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখি তিনি কি বলেন, দেখি তাঁর উপদেশে—তাঁর কাছে জ্ঞান পাইয়া আমাদের এই মোহ দূর হয় কি না!"

অতঃপর সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুরথ ও বৈশ্যকুল-তিলক সমাধি, উভয়ে মিলিয়া মেধস মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে যথানিয়মে মুনির পাদ-বন্দনাদি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মুনিবর তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নৃপতিপ্রবর যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগবন্! মূর্খলোকে যে প্রকার বিষয়াসক্তিদ্বারা পরিমুগ্ধ হয়, জ্ঞানবান্ হইয়াও আমি সেই প্রকার রাজ্যে এবং নিখিল স্বামাত্যাদি রাজ্যাঙ্গ বিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট হইতেছি, ইহার কারণ কি? আবার দেখুন, আমার ন্যায় এই বৈশ্যও পুত্রাদিদ্বারা নিরাকৃত, স্ত্রী ও ভৃত্যগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এবং স্বজনদ্বারা সংত্যক্ত হইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে অতিশয় প্রেমবান্ হই-তেছে। ইনি এবং আমি উভয়েই বিষয়ের দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াও মমত্বদ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখভাগী হইতেছি। যাহারা আমাদিগকে পায়ের কণ্টকের ন্যায় দূর করিয়া দিয়াছে, যাহারা আমাদের শত্রুর বশানুগ হইয়া আমাদের প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছে,—আমরা জ্ঞানহীন নই, আমাদের জ্ঞান আছে, সকলই বুঝিতে পারিতেছি—তথাপি কেন এ আকর্ষণ—কেন এ মোহের ছলনা? হে মহাভাগ! যাহারা বিবেক রহিত, তাহাদিগেরই এই মোহ সম্ভবে, কিন্তু আমরা জ্ঞানী হইয়াও কি হেতু মুগ্ধ হইতেছি, আপনি ইহার কারণ বলুন।"

মহামুনি মেধস বলিলেন—"হে মহাভাগ! এ সংসারে সমস্ত প্রাণীরই রূপ রসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় সমূহ পৃথক্ পৃথক্ জীবের নিকট পৃথক্ পৃথক্ রূপে জ্ঞান-গম্য হইয়া থাকে। দেখ, যেমন কোন কোন প্রাণী (পেচকাদি) দিবসে অন্ধ, কোন কোন প্রাণী (কাক প্রভৃতি) রাত্রিতে অন্ধ, কোন কোন প্রাণী (কিঞ্চলুক—কেঁচো) দিবা রাত্রে দৃষ্টিশক্তিহীন, আবার কোন কোন প্রাণী দিবা বা রাত্রিতে তুল্য দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, সেইরূপ স্বপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে (সংসারা-সক্ত) জীব মাত্রেই চিরকালই অন্ধ আছে, তাহারা কদাপি সেই তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না, আবার আত্মরাজ্যে বিচরণশীল মুনিগণ বাহ্য রাজ্যে অন্ধ, বহির্ভাব কিছুই তাঁহাদের অনুভূত হয় না; আর যাঁহারা আত্মরাজ্যে উপনীত হইয়া পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দিন-রাত্রি, অন্তররাজ্য ও বহিঃ রাজ্য এই উভয়েই তুল্যরূপে এক পরমাত্ম সত্তাই উপলব্ধি করেন, সুতরাং তাঁহারা তুল্যদৃষ্টি সম্পন্ন।—

"তুমি বলিতেছ তোমার জ্ঞান আছে। হায় রাজন্! উহা কি প্রকৃত জ্ঞান? ঐ জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে না, উহা মাত্র বিষয় জ্ঞান। কেবল মনুষ্য কেন, পশু-পক্ষী, মৃগ-মৎস্য প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং তোমার মতে তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। অর্থাৎ আহার বিহারাদি বাহ্য বিষয়ে মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি সকলেই এক প্রকার জ্ঞান বিশিষ্ট। তথাপি ঐ দেখ জ্ঞান সত্ত্বেও পক্ষীরা স্বকীয় ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহ বশতঃ আদর সহকারে শাবক-গণের চঞ্চুপুটে তণ্ডুলকণা নিক্ষেপ করিতেছে। হে মনুজব্যাঘ্র সুরথ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, মনুষ্যগণ প্রত্যুপকার লোভে লুব্ধ হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহ প্রবণ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ দেখ পশু পক্ষী প্রভৃতির সন্তান-সন্ততি বৎসর বৎসর জন্মিয়া থাকে, বৎসর বৎসর তাহারা জনক জননীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়, পশু পক্ষীগণ নিত্য ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও, কোন লাভের

প্রত্যাশার সম্পূর্ণ অভাব সন্দর্শন করিয়াও তাহারা প্রতিনিয়ত সন্তান পালনে তৎপর। মোহান্ধ মনুষ্যগণের দশাও তাই। তুমি যে আত্ম পরিজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ, আবার তাহাদেরই জন্য যে তোমার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাও সেই একই কারণ হইতে উদ্ভূত। সমস্ত বিশ্বই যে একই শৃঙ্খলে বাঁধা!

"আচ্ছা রাজন্! কেন এমন হয় জান কি?—তুমি মনে করিতে পার, পুত্রদারাদিদ্বারা যখন প্রকৃত সুখ সম্পাদিত হয় না, তখন কেন মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ অনর্থ হেতু মোহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুঃখ সাগরে নিপতিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই স্বাধীন ভাবে আপনার অমঙ্গল কামনা করে না, কিন্তু যিনি জগতের স্থিতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই মহামায়ার প্রভাবেই প্রাণিগণ মোহ-হ্রদে মমতাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানাতীতা মহামায়া বলদ্বারা জ্ঞান আকর্ষণ ও হরণ করিয়া জীবকে সম্মুগ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপ করিয়াই তিনি এই জগৎ স্থির রাখিয়াছেন, নতুবা কে কাহার, কাহার জন্য কি? সর্ব্বদা আত্মহিতানুসন্ধায়ী মানবকেও যে মহামায়া এতাদৃশী দুর্গতি প্রদান করেন, তাহাতে তুমি বিচলিত হইও না। কারণ অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি জগৎপতি হরি, তিনিও এই মহামায়ারদ্বারা বশীকৃত রহিয়াছেন। ইনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তির নিয়ন্ত্রী, ইঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য। ইনি জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক সম্মুগ্ধ করিয়া রাখেন। ইঁহাদ্বারাই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রসূত হয়, ইনি প্রসন্না হইলেই লোকের মুক্তি দাত্রী হন। এই মহামায়া যেমন সংসার গর্ত্তে নিপাত কর্ত্রী, তেমনি ইনিই আবার তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপা, ইঁহার শক্তিদ্বারাই মানব তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়; সুতরাং ইনিই মুক্তির হেতুভূতা নিত্য বস্তু, ইনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।"

মহামুনি মেধসের কথা শুনিয়া রাজার চিত্ত ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেল, মা-কে জানিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাই তিনি ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তিনি কেমন করিয়া উৎপন্না হইলেন, তাঁহার কর্ম্মই বা কিরূপ? হে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ! তিনি কিরূপ স্বভাববিশিষ্টা, অর্থাৎ নিত্যা না অনিত্যা? তাঁহার স্বরূপ কি? আমি আপনার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।"

ভক্তি কারুণ্যকণ্ঠে ঋষি বলিলেন—"রাজন্! তাঁহাকে আর দূর দূরান্তরে খুঁজিতে হইবে না; তিনি তোমাতে, তিনি আমাতে, তিনি আকাশে বাতাসে আলোতে, তিনি সর্ব্বভূতে; অথবা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তিনি। তিনি নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও তোমার-আমার মত তাঁহার উৎপত্ত্যাদি কিছুই নাই, তথাপি আমার নিকট তাঁহার আবির্ভাব কথা বহু প্রকারে শ্রবণ কর। যদিও তিনি নিত্যা, তথাপি দেববৃন্দের কার্য্য সিদ্ধির দরুণ যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখন তিনি উৎপন্না বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকেন। পরন্তু উহা তাঁহার উৎপত্তি নহে—**আবির্ভাব**, সৃষ্টি নহে—**ব্যক্তি**।

"প্রলয় কালে জগৎ প্রলয়ার্ণবে প্লাবিত হইলে প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যখন অনন্ত শয্যা বিস্তার করিয়া যোগ নিদ্রা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তখন ভগবানের কর্ণমল সম্ভূত দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভ নামক বিখ্যাত অসুরদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াই জগৎ ময় সেই মহাসমুদ্র ওলট পালট করিয়া আস্ফালন ও ভীষণ গর্জ্জন

করিতে লাগিল, অসুরদ্বয়ের এই প্রলয় নর্ত্তনে ও সমুদ্রের সেই প্রচণ্ড আবর্ত্তনে শ্রীবিষ্ণুর নাভিকমলাসীন কমলাসনের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাহারা তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

"স্বয়ং বিষ্ণু হইতে অসুরদ্বয়ের জন্ম হইয়াছে, অতএব বিষ্ণু ভিন্ন কে আর তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু বিষ্ণু এখনও যোগ নিদ্রায় বিভোর, এমন করিয়া যে অসুরদ্বয়ের প্রতাপে মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, তাহাতেও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

"ব্রহ্মা বুঝিলেন, যোগ-নিদ্রাদেবী নিজে যদি বিষ্ণুকে ছাড়িয়া না উঠেন, উঠিয়া যদি তিনি অসুরদ্বয়কে মোহে অভিভূত না করেন, তবে আর উপায় নাই। তাই তিনি শ্রীহরির জাগরণের জন্য হরি-নয়নবিহারিণী তেজঃস্বরূপা বিষ্ণুর বহিরিন্দ্রিয় নিমীলনকারিণী অতুলনীয়া ভগবতী বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী যোগনিদ্রাকে একাগ্রতা সহকারে স্থির চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন।—

"তুমি স্বাহা তুমি স্বধা বষট্‌কার স্বরাত্মিকা তুমি,
সুধা নিত্যাক্ষরা তুমি হ্রস্ব-দীর্ঘ প্লুতস্বরূপিণী।

অর্দ্ধমাত্রা যে বাঞ্জন স্বরহীন নহে উচ্চারিত,
সে-ও তুমি সাবিত্রী গো নিত্যা পূর্ণা শ্রেষ্ঠা জগন্মাতঃ।

ধৃতিশক্তি তুমি বিশ্বে, তুমি সর্ব্ব বিশ্বপ্রসবিনী,
পালয়িত্রী তুমি দেবী, অন্তে তুমি সর্ব্বসংহারিণী।

সৃজনেতে সৃষ্টিরূপা, স্থিতি তুমি বিশ্বের পালনে,
সংহৃতিস্বরূপা তুমি ওগো দেবী সৃষ্টি সংহরণে।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহতী অস্মৃতি,
মহামোহ তুমি দেবী দেবাসুরে একক শকতি।

প্রকৃতি কারণরূপা, গুণত্রয়ে বিশ্ববিকাশিনী,
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি তুমি গো জননী।

শ্রী তুমি, ঈশ্বরী তুমি, বুদ্ধি তুমি সুবোধ লক্ষণা,
লজ্জা-পুষ্টি-তুষ্টি-শান্তি কান্তিরূপা তুমি গো করুণা।

তুমি দেবী খড়্গ শূল শঙ্খ চক্র গদা চাপ ধরা,
ভূশুণ্ডী পরিঘ বাণে তুমি ওগো অতি ভয়ঙ্করা।

সৌম্যা হতে সৌম্যতরা তুমি পুনঃ অতীব সুন্দরী,
পরাপরপরা তুমি, তুমি ওগো পরম-ঈশ্বরী।

সকলের শক্তি তুমি সদসদ্ বিশ্বাত্মরূপিণী,
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা গো স্তবি তোমা কেমনে না জানি।

বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, বিশ্বহন্তা হরি সর্ব্বাধার,
মোহ-নিদ্রা-অভিভূত ওগো দেবী মায়াতে যাঁহার।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ধরিয়াছে তনু যার কটাক্ষ-ইঙ্গিতে,
সেই তোমা বল মাগো কে সমর্থ জগতে স্তবিতে।

তুমি মাতঃ পরিচিতা এইরূপ অসামান্য স্বকীয় প্রভাবে,
মোহমুগ্ধ কর ওই বলদৃপ্ত মহাসুর মধু ও কৈটভে।

জাগ গো জগদীশ্বরী, জাগাও মা ত্বরা বিশ্বেশ্বরে,
বোধের বোধন তাঁর কর মাগো অসুর-সংহারে।"

"ব্রহ্মার এই স্তবে তুষ্ট হইয়া তামসী যোগনিদ্রাদেবী মধু-কৈটভ বধ ও বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তদীয় নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, মন এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া স্বয়ম্ভূব্রহ্মার নয়ন সমক্ষে মহাকালী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন—সেই মূর্ত্তি হইতে ছায়ার ন্যায় মায়ারাশি বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে মধু-কৈটভকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মায়ার প্রভাবে মত্ত মধু-কৈটভ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অধিকতর আস্ফালন করিতে করিতে ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত হইয়া আসিল। এদিকে বিষ্ণু জাগিলেন, জাগিয়া তিনি দেখিলেন যে, সেই একার্ণবে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরদ্বয় রোষ-রক্তনেত্রে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অনন্তর বাহুপ্রহরণ শ্রীভগবানের সহিত মধু-কৈটভের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যুগের পর যুগ পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের এই মহাযুদ্ধ চলিল।"

"মহামায়ার প্রভাবে, মোহে ও গর্ব্বে মধু-কৈটভ আত্মহারা হইয়াছিল, তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল, তাহারা মোহবশে

আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ায় অচিরেই মহাবিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইল; সমগ্র জগৎ প্রশান্ত হইল, ব্রহ্মা আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। এইভাবে ব্রহ্মার স্তবে মধু-কৈটভ বধের জন্য মহামায়ার একবার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, এইভাবে মহামায়া আবির্ভূতা হইয়া ব্রহ্মাকে অসুর-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

—এই বলিয়া ঋষিপ্রবর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার মায়ের আবির্ভাব কাহিনী বলিতে লাগিলেন। মহিষাসুরের প্রবল উৎপীড়নে উৎপীড়িত দেববৃন্দের সমষ্টি শক্তি হইতে মহাশক্তির আবির্ভাবের কথা, শুম্ভনিশুম্ভের অত্যাচারে স্বারাজ্যভ্রষ্ট দেববৃন্দের কাতর প্রার্থনায় কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মায়ের কর্ম্মসমূহের বিবৃতি দিয়া পরিশেষে তিনি বলিলেন —"হে রাজন্! দেবী ভগবতী নিত্যা হইয়াও এই-রূপ জগতে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া জগতের পালন করেন। এই দেবী দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইতেছে, সৃষ্ট হইতেছে, ধ্বস্ত হইতেছে; ইনি ভক্ত-গণের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া তাহাদের আশানুরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ইনি প্রলয় কালে সংহার শক্তি মহাকালী রূপে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। ইনি প্রলয়কালে লোকসংহন্ত্রী, সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, আবার স্থিতিকালে প্রাণিদিগের সংরক্ষয়িত্রী! ইঁহার কখনই উৎপত্তি হয় না, যেহেতু ইনি সনাতনী নিত্যা। অভ্যুদয় সময়ে মানবগণের গৃহে ইনিই লক্ষ্মী, আবার অভাব সময়ে সর্ব্বনাশসাধিকা অলক্ষ্মী-স্বরূপিণী! ইঁহাকে স্তব করিয়া পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলে ইনি বিত্ত পুত্রাদি দান ও ধর্ম্মে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

"হে রাজন্! এই আমি দেবী মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সেই দেবী ভগবতী ঈদৃশী প্রভাবসম্পন্না যে তিনিই প্রবাহরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় সাধন করিয়া এই জগৎ বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ভগবতী বিষ্ণুমায়া-রূপিণী এই দেবী প্রসন্না হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। এই দেবী তোমাকে, ঐ বৈশ্যকে এবং অন্যান্য সমস্ত বিবেকিগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন, করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। হে মহারাজ! তোমরা এই দেবীরই শরণাপন্ন হও, এই দেবীকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর; আরাধনায় ইঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলেই অনায়াসে ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।"

অতীব মমতাবশতঃ রাজ্যাপহরণে দুঃখিত চিত্ত সুরথ এবং বৈশ্য, উভয়ে মেধস মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাভাগ তীব্র ব্রতপরায়ণ সেই ঋষিকে প্রণামান্তর তপস্যার জন্য তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা মহামায়া অম্বিকার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নদীতটে একাগ্র চিত্তে সমাসীন হইয়া সর্ব্বার্থসাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত জপ-পূর্ব্বক তপস্যা এবং দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুষ্প, ধূপ ও হোমাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর কাল সংযতাত্মা হইয়া তাঁহারা দেবীর আরাধনা করিলে জগদ্ধাত্রী দেবী চণ্ডিকা পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া বলিলেন—"হে রাজন্! হে কুলনন্দন বৈশ্য! তোমাদের কঠোর তপস্যায়, তোমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা তোমাদের অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর, কিজন্য তোমরা আমাকে আহ্বান করিয়াছিলে খুলিয়া বল।

রাজা বলিলেন—"মা! যদি নিতান্ত এ অধমের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যেন আমি ইহজন্মেই স্বীয় শক্তিবলে শত্রু সৈন্য

বিনাশ করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে পারি, আর জন্মান্তরে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগে সমর্থ হই।"

বৈশ্য বলিলেন—"মা! সংসারের বিসদৃশ ব্যবহারে আমার চিত্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আর কত কাল এ গোলকধাঁধায় ঘুরাইবে মা! "আমি" "আমার" এই ভ্রান্তিজ্ঞান বিলোপ করিয়া তুমি আমায় আত্মজ্ঞান প্রদান কর, যাহাতে আমি অচিরেই পরামুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হই তাহার ব্যবস্থা কর।"

দেবী বলিলেন—"হে রাজন্! অতি অল্পদিনেই তুমি নিজ শক্তিবলে স্বীয় শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আত্মরাজ্য লাভ করিবে, সে রাজ্য হইতে আর কখনও তোমার স্খলন হইবে না। তারপর বর্ত্তমান দেহান্তে সূর্য্যদেব হইতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামক মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। আর হে বৈশ্যপ্রবর সমাধি! তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, এই লও সেই বর। এই বরে তোমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠুক, তুমি অচিরেই মোক্ষের অধিকারী হও।"

এইরূপে জগদ্ধাত্রী দেবী তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিয়া, তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সংস্তুতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

এই তো সুরথের উপাখ্যান, এই তো মায়ের আবির্ভাব কাহিনী! এ কাহিনী কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, অথাপি ইহা পুরাতন হয় নাই; কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারত সন্তানগণ চণ্ডীগ্রন্থে বর্ণিত মায়ের বরাভয়করা স্বরূপের কথা শুনিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহাদের তৃপ্তি মিটে নাই। কত হতাশ প্রাণে এ কাহিনী আশার সঞ্চার করিয়াছে, কত ভীত সন্ত্রস্ত চিত্ত মায়ের অভয়বাণীতে জাগিয়া উঠিয়াছে, কত স্বরাজ্যভ্রষ্ট সন্তান মায়ের কৃপায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ কাহিনীর আলোচনায় চিত্ত বিমল হয়, বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। তাই বর্ষপরে মায়ের এই নিত্য আবির্ভাব তিথিতে আজ আমরা দেখিব, এই উপাখ্যান হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি।

অনেকে এই আখ্যায়িকা ভাগ একেবারে মিথ্যা বা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া ব্যাকরণের তাপে শব্দগুলি গলাইয়া তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিয়া জন সমাজে প্রচার করিতেছেন। তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতেছে, তত্ত্বময়ীর ব্যাখ্যায় মায়ের ভাবময়ী রূপ অন্তরালে সরিয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের মতে সুরথ বলিয়া কোন রাজা ছিলেন না, সমাধি বলিয়া কোন বৈশ্য ছিলেন না, মেধস বলিয়া কোন মুনি ছিলেন না। সে সমস্ত সাধক, সাধনা ও প্রজ্ঞার রূপক। মায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবও কল্পনা, তাহা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরই জাগরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।—এই সমস্ত তাত্ত্বিক ব্যাখার সহিত আমাদের মতান্তর নাই, তবে শুধু এই তত্ত্বই যে সত্য—স্থূল যে মিথ্যা—ভাব যে কল্পনা—এখানেই যত গোলযোগ। ইহার ফলে হইতেছে এই যে, সূক্ষ্ম বিচার শক্তিবিহীন অজ্ঞ জীবের পক্ষে, যোগ সাধনাক্ষম সাধারণ জীবের পক্ষে মায়ের সাক্ষাৎকার যে একেবারেই অসম্ভব তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু আমরা জানি, স্থূলে-সূক্ষ্মে-কারণে সর্ব্বক্ষেত্রেই মায়ের আবির্ভাব সম্ভবপর, কোনটী অতি রঞ্জিত বা অত্যুক্তি নয়। আর সেই আবির্ভাব—সুরথের উপাখ্যানে মেধসের বর্ণনায় আমরা যাহা পুনঃ পুনঃ পাইতেছি, তাহা হইতেছে এই যে, একমাত্র আকুল প্রার্থনা দ্বারাই মহামায়ার কৃপা আকর্ষণ করা যায়, তাহার জন্য

যোগ যাগ তপস্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

যখনই দেবতাগণ বিপদে পড়িয়াছেন, অসুরকুল কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তখনই তাঁহারা সমবেত ভাবে মহামায়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর তখনই মা আমার আরাধকদের ভাবানুযায়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অরিকুল নাশ পূর্ব্বক ভীতত্রস্ত সন্তানগণকে নির্ভয় করিয়াছেন—তাহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ, সকল যুগেই আমরা প্রার্থনারই ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। বাস্তবিকই প্রার্থনা যত শীঘ্র ফলপ্রসূ, এমন বোধ হয় আর কোন সাধন ভজন নয়। প্রার্থনায় হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। তোমার চিত্ত রিপুর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইতেছে, আকুল প্রাণে মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাও, তাহাদের প্রভাব কমিয়া যাইবে; অশান্তির দাবদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছ, প্রাণ উঘারিয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা কর, শান্তির মলয় হিল্লোলে তোমার হৃদয় শীতল হইয়া যাইবে। এ ভাষার চাতুর্য্য নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য। যে কোন সঙ্কট সময়ে শরণাগতের ভাব লইয়া আকুলভাবে প্রার্থনা করিলে ইহার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে সক্ষম হইবে। প্রার্থনার যে কি অমোঘ শক্তি, তাহা আমরা ঋষিদের জীবনে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। মেধসও মায়ের যতবার আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করিলেন সকলেরই মূল হইতেছে প্রার্থনা।—তাহাতে উৎকট তপস্যার বিশেষ আড়ম্বর নাই।

সুরথ-উপাখ্যানের বিশেষ উপদেশ হইতেছে এই যে, এ জগতে কেহ কাহারও নয়, সকলেই স্বার্থের দাস। স্বার্থ হানি হইলে আত্মীয় স্বজন প্রেম প্রীতি বিসর্জ্জন দিতে পারে, পুত্র কন্যা শত্রু হইতে পারে, বন্ধু বান্ধব বুকে ছুরি মারিতে পারে। তথাপি জীব যে এই অনিত্যেরই মায়ায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সংসার মরু মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত মৃগের মত প্রধাবিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ জগৎ স্থিতিকারিণী মহামায়ার অসীম প্রভাব! যিনি যতই নিজেকে বিজ্ঞ বলিয়া আস্ফালন করুন না, যিনি যতই আপনাকে বিবেকী বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়ান না, সকলেই কিন্তু মহামায়ার হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। বাজীকর যেমন করিয়া পুত্তলিকা নাচাইয়া ফিরে, সেইরূপ মহাযোগেশ্বরী মা আমার স্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে জীবকুলকে কখনও কাঁদাইতেছেন, কখনও হাসাই-তেছেন, কখনও নাচাইতেছেন। এই অবিদ্যার আবরণই জীবের জীবত্ব, নতুবা আবরণ হীন জীবের জীবত্ব কোথায়?—সবই যে শিবস্বরূপ!

জীবত্বের নিরসন ও শিবত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই অবিদ্যাকে দূর করিতে হইবে, অজ্ঞানের নির্ব্বাসন ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে হইলে মহামায়ার সন্তুষ্টি বিধান করিতে হইবে। মা আমার প্রার্থনায় যেমন সন্তুষ্টা, তেমন বুঝি আর কিছুতে নন। বিবেক-জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে যে অবিদ্যা, বিদ্যাস্বরূপিণীর প্রার্থনা ভিন্ন তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে কেন? ব্রহ্মার প্রার্থনায় যেমন যোগ নিদ্রা দেবী নিদ্রাভিভূত বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিতেই তিনি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের বিবেক-জ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে মহামায়ার যে অবিদ্যাশক্তি, একমাত্র মানস প্রার্থনা দ্বারা তাহার অন্তরায় ঘটাইতে হইবে, তাহা হইলে স্বতঃই জ্ঞানের উদয় হইবে, আর সেই জ্ঞানে আত্ম-শত্রুরূপে অবস্থিত নিখিল প্রতিকূল অরিবৃন্দ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

আবার দেখিতেছি, তাঁহার নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। সুরথ রাজ্য সমৃদ্ধি চাহিলেন,

তিনি রাজ্য সমৃদ্ধিই পাইলেন; সমাধি তত্ত্বজ্ঞান চাহিলেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞানই পাইলেন। অতএব কি ভোগাভিলাষী, কি মোক্ষাভিলাষী সকলেরই অভীপ্সিত বস্তু রহিয়াছে মায়ের ভাণ্ডারে। প্রেম-সেবোত্তরা গতি-লাভেচ্ছু প্রেমিক ভক্তেরও মায়ের দুয়ার হইতে ফিরিতে হইবে না। ব্রজের আরাধিকা গোপিকাবৃন্দ মায়েরই পূজা করিয়া মায়েরই কৃপায় কৃষ্ণ প্রেমধন লাভ করিয়াছিলেন। অনেক গোঁড়া বৈষ্ণব মায়ের নামে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া থাকেন—তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগেরই আরাধ্য গোপিকাবৃন্দের আচরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। মা কৃপা করিয়া মায়া-যবনিকা সরাইয়া লইবেন যে দিন, সেই দিন তাঁর নিত্য সত্য লীলা বিলাস বা প্রকৃতি পুরুষের রসের রাসলীলা নয়ন গোচর হইবে। কেন না রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব যে মায়েরই ঘনীভূত মাধুর্য্য বিলাস মাত্র, আর মায়িক লীলা ঐশ্বর্য্যে সন্নিবেশিত। যত দিন মায়া-যবনিকা না সরিতেছে, যত দিন মায়ের কৃপা লাভ না করিতেছ, তত দিন লীলা রস আস্বাদন করা আকাশ কুসুম—প্রেম সেবোত্তরা গতি লাভ সুদূর পরাহত!

যে মহামায়া জীবকে মায়ার ঘোরে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি তাহাদিগকে সংসার চক্রতলে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিতেছেন, তিনিই যে আবার প্রসন্না হইলে তাহাদের মুক্তিদাত্রী হন, কোন অবস্থায় এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কি ব্যষ্টিতে কি সমষ্টিতে, কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে, সর্ব্বক্ষেত্রে ইহাই চিরন্তন সত্য। যিনি যতই অহমিকার দাপটে বিশ্ব প্রকম্পিত করুন না কেন, মহামায়ার কৃপা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কি সিদ্ধি, কি ঋদ্ধি, কি ভুক্তি, কি মুক্তি, সবই নির্ভর করে একমাত্র মহামায়ার কৃপার উপর। তাই বলি যদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের বহির্ম্মুখীনতা বৃত্তি সংহৃত করিয়া আত্ম-রাজ্যে—স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও, যদি মায়া নাগিনীর পাশ এড়াইয়া মহামুক্তির অমৃতময় আস্বাদ অনুভব করিতে চাও, তাহা হইলে সকল ভুলিয়া, শরণাগতের ভাব লইয়া কায়মনোপ্রাণে মায়ের চরণে প্রার্থনা কর, আকুল ক্রন্দনে মায়ের অটল সিংহাসন টলাও, মায়ের প্রকৃত সন্তানের মত মায়ের নাম ধরিয়া ডাক, মাকে দেখিবার জন্য পাগল হও; দেখিবে মা ছুটিয়া আসিবেন, আসিয়া তোমার বন্ধন মোচন করিবেন, তোমাকে তাঁহার শান্তিময় বক্ষে টানিয়া লইবেন, জ্ঞান আর প্রেমের স্তন্য পান করাইয়া তোমাকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন; তোমার তুমিত্ব থাকিবে না, ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, সবই বিলয় হইয়া যাইবে মহান্ সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে। তখনই মায়ের যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হইবে, সন্তানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইবে, আর অমনি তুমি মায়ের সন্তান ঋষির সুরে সুরে মিশাইয়া বলিয়া উঠিবে—**নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ!**

আগমনে

—:(*):—

স্নিগ্ধ উজল শারদ প্রাতে
কার হাসি আজি ফুটিল রে,
পুঞ্জীত নিরানন্দ তামস
কার আগমনে ছুটিল রে ?
কে আসিল আজি নামিয়া বিশ্বে
রূপের মাধুরী ছড়ায়ে দৃশ্যে
পদতলে কার চিত্ত মধুপ
গুঞ্জরি আসি লুটিল রে ?

নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত কেন
দীর্ঘ দিবস পরেরে,
হৃদি-সরে কেন ভাব-হিল্লোল
উত্থিত থরে থরে রে ?
বাহির ভিতর আজি একাকার
প্রবাহিত স্বতঃ আনন্দের ধার
উথলি সে ধারা প্লাবিল কেন বা
দ্যুলোক ভূলোক অন্তরে !

চিত্ত-আকাশে ছিল এতদিন
নিরাশ যে মেঘ-লেখারে,
কি জানি কাহার মোহন স্পর্শে
লুপ্ত তাহার রেখারে !
দুঃখের ঘন বরষার ধারে
ঝরিত যে ধারা বাহিরে ভিতরে
জানি না কেন বা আজি হতে আর
পাই না তাদেরও দেখা রে !

বর্ষার পরে বরষের পরে
জননী কি এল নামি রে,
তুরীয় হইতে কারণে সূক্ষ্মে
স্থূলেতে করুণা যাচি রে ?
তাই কি রে আজ বিষাদ ঘুচিল
বিশ্ব প্রকৃতি নয়ন মুছিল
আনন্দের মহা পুলক কম্পনে
হাহাকার গেল থামি রে !

হতাশা দগ্ধ সন্তান যত
এস এস তবে ছুটিরে,
মায়ের রাতুল চরণ পদ্মে
পড় পড় আসি লুটিরে।
যাচ ধর্ম্ম অর্থ, যাচ কাম মোক্ষ
যার যে বাসনা যার যে লক্ষ্য
মায়ের ভাণ্ডার মুক্ত আজিকে
লহ লহ সবে লুঠিরে।

নিষ্কাম—শুধু স্নেহ পিয়াসী
তুমিও এসগো ধীরে,
সুচির-পোষিত মিথ্যা আমির
বজর হানিয়া শিরে।
আমিও যাইব সঙ্গে তোমার
তুমি আমি সব হব একাকার
মায়ের বক্ষে শরণ লইয়া
ভাসিব আনন্দ-নীরে।

কথা-প্রসঙ্গে

"জ্ঞানাঞ্জন দা, আজ অনেক দিন পরে আপনাকে পেলাম, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ কর্‌লাম। আপনাকে পেলে যেন কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছা হয় না; মনে হয় দিন-রাত্রি আপনার উপদেশ বাণী শুনি, দিন-রাত্রি আপনার কথামৃতে ডুবে থাকি। প্রায় এক বচ্ছর হল আপনার সঙ্গে দেখাটা নেই, কাজেই আপনাকে পাবার জন্যে প্রাণটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, আপনার সঙ্গলাভের জন্যে চিত্তে একটা প্রবল পিপাসা জেগে উঠেছিল; যাক্ আজ আপনাকে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এই এক বছরের মধ্যে আমার প্রাণে যে কত প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু আমি এমন জায়গায় পড়ে আছি যে, আর কারো কাছে সে সব প্রসঙ্গ উত্থাপনই করা যায় না। সাধারণতঃ আমাকে যে সব লোকের সঙ্গে কারবার কর্‌তে হয়, তারা বড্ডই বহির্মুখ, এ সব কথার মর্ম্ম বোঝে না, বল্‌লে পরে হেসে উড়িয়ে দেয়। কাজেই তাদের সঙ্গে এ সব বিষয়ের আলোচনা একদম বন্ধ করে দিয়েছি। তাই জম্‌তে জম্‌তে অনেক প্রশ্ন প্রাণের মাঝে জমাট বেঁধে গিয়েছে, এখন আস্তে আস্তে সেগুলি আপনার কাছে বল্‌ব, আপনাকে সেগুলির মীমাংসা করে দিতে হবে জ্ঞানাঞ্জন দা!"

"আচ্ছা ভাই তাই হবে। আমার যতদূর সাধ্য তোমায় বুঝাবার চেষ্টা কর্‌ব। আর এক কথা—একদিনে সব বিষয়ের আলোচনা কর্‌তে গেলে সব খিঁচুড়ী পাকিয়ে যাবে। আমি তো এখন কিছুদিন এখানে আছি, কাজেই রোজ রোজ কিছু কিছু আলোচনা কর্‌লেই চল্‌বে, কি বল? তাহলে আজকে একটা প্রসঙ্গ ধরে আলোচনা আরম্ভ করে দাও।"

"তাহলে জ্ঞানাঞ্জন দা, আর কিছুর আলোচনা না করে আজ মায়ের প্রসঙ্গই করা যাক্। আজ মায়ের বোধন, কাল পূজা; কাজেই মায়ের প্রসঙ্গই বোধ হয় সুপ্রাসঙ্গিক হবে, কি বলেন? মা সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন আমার প্রাণে জেগেছে কিন্তু!"

"বেশ কথা বলেছ প্রিয়ব্রত! মায়ের কথা স্মরণ ক'রে মায়ের নাম নিয়ে মায়েরই প্রসঙ্গ করা যাক্। তবে আমি নিজে থেকে কিছু বল্‌ব না, তুমি প্রশ্ন কর্‌বে, আমি তার উত্তর দিব।"

"তবে তাই হোক্। —আমার প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে মা কে? কাকে আমরা মা মা করি?"

"মা বল্‌তে সাধারণতঃ আমরা বুঝি, যিনি আমাদের জন্মদাত্রী, যিনি আমাদের পালয়িত্রী। ব্যবহারিক জগতে মা বল্‌তে যা বোঝা যায়, তোমার প্রশ্নের "মা"র অর্থও তাই। তবে ব্যবহারিক মা ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যষ্টিজীবের মা, আর তিনি বিশ্বের মা—সমষ্টির মা! তিনি আমাদের জনক-জননী-জননী। বেদান্তের ভাষায় যাকে তোমরা বল—জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

"আমাদের মা তো আমাদের কত স্নেহ-যত্ন করেন, কত আদর-আপ্যায়ন করেন, কিন্তু যিনি বিশ্বজননী তিনি কই তেমন কিছুই তো করেন না! তিনি যে আমাদের স্নেহ করেন, তা বুঝব কেমন ক'রে? তাঁকে তো আমরা দেখতেও পাই না, তবে আর তিনি থাক্‌লেই কি, না থাক্‌লেই বা কি?"

—শঙ্কর

"পাগল আর কি! তিনি যে স্নেহসিন্ধু গো! তাঁর কণা পেয়েই না জাগতিক মায়েরা অত স্নেহময়ী! মায়েদের যে এত স্নেহ দেখ, এত বাৎসল্য প্রেম সন্দর্শন কর, তা আসে কোথা থেকে জান? তার আদি প্রস্রবণ কে বল্‌তে পার? —ওই মা যিনি জগজ্জননী! আলোতে তাঁর প্রেম, বাতাসে তাঁর প্রেম, জলে তাঁর প্রেম, মাটীতে তাঁর প্রেম। আমরা জাগতিক মায়ের স্নেহ কতটুকু পাই? কতক্ষণ তাঁদের আদর-যত্ন লাভ করি? কিন্তু বিশ্বজননী মা সর্ব্বদাই যে আমাদের তাঁর স্নেহময় অঙ্কে স্থান দিয়ে নানা রকমে আদর-যত্ন কর্‌ছেন—নানারকমে ভাল বাস্‌ছেন। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভালবাসি, মা তাই হয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছেন; আবার যা দিয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ কর্‌ব, তিনি আমাদের গ্রহণোপযোগী সেই সেই ইন্দ্রিয়ের রূপ-ও ধারণ করেছেন। তাঁর স্নেহের কি আর সীমা আছে? তোমার যখন যা প্রয়োজন হচ্ছে, হবে বা হতে পারে, তার জন্যে মা সকল সময়েই প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। আর বল্‌ছ—তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না? তাঁকে দেখতে আর দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, দেখ তোমার সম্মুখে—নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ! এই স্থূলরূপে তিনি আমাদের স্থূলের অভাব মিটাচ্ছেন, সূক্ষ্মরূপে সূক্ষ্মের অভাব মিটাচ্ছেন। বাইরের জগৎটা যেমন পঞ্চভূতাত্মক, স্থূল দেহগুলিও তাই। যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁরই স্থূলরূপ হয়ে থাকে, তবে এই দেহগুলিও তো তাঁরই অংশভূত গো! এদের আর পৃথক্ সত্তা কোথায়? আর তোমরা যাকে বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা বলে থাক, অর্থাৎ যা না কি তোমার-আমার আন্তররূপ তা-ও ওই মায়েরই অংশসম্ভূত! অংশই বা বলি কেন? —আমাদের স্মৃতিরূপে, আমাদের বুদ্ধিরূপে, আমাদের তেজরূপে, সর্ব্বরূপে মা আমাদের সেবা কর্‌ছেন। এ সম্পর্কে চণ্ডীবর্ণিত সেই—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু——" এই স্তোত্রাংশটী পড়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝতে পার্‌বে। তোমরা যাকে 'আমি' 'আমি' কর, আসলে তার সবটাই হচ্ছে পেঁয়াজের খোসা—"ধর্‌তে গেলে জ্ঞানের আলো লুকায় গিয়ে ওঁকারে।" —সবই মায়েরই স্বরূপ, মা-ই অনন্ত জগদাকারে বিস্তৃত রয়েছেন।"

"আচ্ছা জ্ঞানাঞ্জন দা, আপনি তো বল্‌ছেন—তিনি নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি! তাহলে এই বিরাট মূর্ত্তি ছাড়া কি তাঁর আর কোন তত্ত্বময়ী বা ভাবময়ী মূর্ত্তি নেই?"

"তা কেন থাক্‌বে না? তুমি কি মনে কর, তুমি তোমার স্থূল দেহেই নিবদ্ধ? স্থূলদেহ ছাড়াও যেমন তোমার সূক্ষ্মদেহ আছে, কারণ দেহ আছে, আবার দেহাতীত অবস্থাও একটা আছে,—তেমনি মায়েরও স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয়, সকল রূপই আছে। যে তাঁকে যে ভাবে দেখতে চায়, সে সেই ভাবেই পায়।"

"জ্ঞানাঞ্জন দা, আমি তো শুনেছি মা মহাশক্তি, নিখিল বিশ্বের মূল কারণ, মূলাতীতা মূলা প্রকৃতি। আর শক্তি বা মূলা প্রকৃতি তো অদৃশ্য, তবে তাঁকে পাওয়া যায় কেমন করে? বড় জোর তাঁকে জানা যায়, তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, এইমাত্র।"

"হাঁ, তুমি যা বল্‌ছ, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও মত তাই। তাঁরা এখন স্বীকার কর্‌ছেন যে জগতের মূলে এক মহতী শক্তি রয়েছে, সে শক্তি থেকেই এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হচ্ছে; জগতের যা কিছু—সহস্রধা বিভক্ত শক্তি নিচয়—সবই সেই মহাশক্তিরই কুক্ষিগত। তাঁরা এই মহাশক্তির অস্তিত্বটুকু জেনেছেন মাত্র, প্রাণে প্রাণে তাঁকে উপলব্ধি করেন নি, চাক্ষুষ ভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পান নি। এর একমাত্র কারণ ভক্তির অভাব, এর

একমাত্র কারণ মহাশক্তিকে ব্যক্তি বলে—উনি এক-জন বলে তাঁকে জান্‌বার আকাঙ্ক্ষার অভাব! কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষি থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের মহাপুরুষেরা পর্য্যন্ত—যেমন ধর ব্রহ্মানন্দ, সর্ব্বানন্দ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বামা-ক্ষেপা প্রভৃতি সকলেই মায়ের সাধনায় ভক্তিবলে মায়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন, তোমার সঙ্গে যেমন করে আমি কথা বল্‌ছি, তেমনি করে কথা কয়েছিলেন। এ আষাঢ়ে গল্প নয়, প্রত্যক্ষ সত্য। এক কথায় বল্‌তে গেলে—শক্তি স্বীকার কর্‌লেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হ'চ্ছেন বিশ্লেষণ বাদী, আর প্রাচ্য সাধকমণ্ডলী হচ্ছেন সংশ্লেষণ বাদী। একপক্ষ নেতি নেতি কর্‌তে কর্‌তে মূলের দিকে এগিয়ে চল্‌ছেন, অপর পক্ষ এককে জেনে মূলকে অবগত হয়ে সব তাঁরই বিকাশ বলে উপলব্ধি কর্‌ছেন। অবশ্য এ তত্ত্বে পৌছাতে আমাদের দেশের মুনি-ঋষিদের কম সময় লাগে নি, কম বেগ পেতে হয় নি। বহুদিনের তপস্যায়, বহুদিনের সাধনায়—তাঁরা এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন,—আর তাঁদের বংশধর আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সমস্ত সাধন সূত্র—সাধন সঙ্কেত অবগত হয়ে এক নিঃশ্বাসে সব হজম করে ফেল্‌ছি। যেমন ধর না—এই ইউক্লিডকে জ্যামিতির একটা সর্ব্ববোধগম্য রূপ দিতে কি বেগই না পেতে হয়েছিল, আর তাঁর পদাঙ্কা-নুসরণকারী আমরা, তৈরী ডাল ভাত তরকারী গেলার মত ফসাফস্ সেগুলো বুঝে যাচ্ছি—কোনই বেগ পেতে হচ্ছে না আমাদের।"

"এখন সব বুঝতে পার্‌লাম জ্ঞানাঞ্জন দা! তবে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই, আমাদের দেশের শারদীয়া পূজার প্রবর্ত্তন করেছেন কে?"

"এর প্রবর্ত্তয়িতা হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু মায়ের স্থূল মূর্ত্তি গড়ে সর্ব্ব প্রথম পূজার প্রবর্ত্তন করেছেন—যা নাকি আমরা চণ্ডীগ্রন্থে পাই—সুরথ আর সমাধি। তাঁরা আহ্বান করেছিলেন, পূজা করেছিলেন মাকে বাসন্তী সপ্তমীতে। আর সেই টাই হচ্ছে প্রাচীন পূজাপদ্ধতি। তার পর রাবণ-বংশ ধ্বংস করার জন্যে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র এই শরতে মায়ের অকাল বোধন করেছিলেন, অথচ এই অকাল বোধনই আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রধান স্থান অধিকার করেছে দেখতে পাই।"

"আচ্ছা জ্ঞানাঞ্জন দা, সুরথের পূর্ব্বে আমাদের দেশে মায়ের কি রকম পূজা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল? তখনও কি তাঁরা মূর্ত্তি গড়ে পূজা কর্‌তেন, না অন্য কোন রকমে?"

"তখন তাঁদের পূজা ছিল প্রার্থনা-মূলক। সুরথের কাছে মেধস মুনি মায়ের আবির্ভাবের যে সমস্ত কাহিনী বলে ছিলেন, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রার্থনা হতে সঞ্জাত। তবে একটী হয়েছিল একটু অন্য ধরণের, দেবতারা মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত—পরাজিত—স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কিছুতেই আর অসুরদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌-ছিলেন না। তখন তাঁরা এর একটা বিহিত কর্‌বার জন্যে যুক্তি করে সকলে এক জায়গায় মিলিত হলেন; তার পর পরস্পর তাঁদের পরিভবের কথা আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে উত্তেজনার বশে তাঁদের শরীর থেকে সর্ব্বলোক চমকপ্রদ ভীষণ তেজ বেরুতে লাগ্‌ল, আর সেই তেজে মা দেবীমূর্ত্তিতে আবি-র্ভূতা হলেন; এই দেবীই শেষে অসুরদের পরাজিত ক'রে দেবতাদের স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই দেবীকেই ধর্‌তে পার সঙ্ঘশক্তির প্রতীক রূপে। আমরা সঙ্ঘ বদ্ধ হয়ে যদি কাজ করি, তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্ঘ শক্তির আবির্ভাব ঘটবে, আর তাইতে যে কাজে আমরা হাত দিতে যাব তাই সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়ে যাবে।"

"তা তো বুঝ্‌লাম জ্ঞানাঞ্জন দা, কিন্তু এই যে মহাশক্তির আবির্ভাব, যাকে আপনি সঙ্ঘশক্তি বলে আখ্যা দিচ্ছেন, তিনি তো তাহলে দেবতাদেরই মিলিত শক্তি, তবে তাঁর আর পৃথক্ অস্তিত্ব কোথা?"

"হাঁ ভাই, আমিও তো বলি, পৃথক্ অস্তিত্ব কোথা? তুমি যেমন বল্‌ছ, দেবতাদের শক্তি নিয়েই তিনি, আমি বল্‌ছি ঠিক তার উল্টো—তাঁর শক্তি নিয়েই দেবতা!—আর শুধু দেবতাই বা বলি কেন, তুমি আমি সবই! ঠিক তোমার মতই প্রশ্ন করেছিল মাকে মহাসুর শুম্ভ। যখন মা আমার অন্যান্য শক্তিদের সহায়ে নিশুম্ভ আর তার সমস্ত সৈন্য সামন্তকে নিহত করলেন, তখন শুম্ভ বলেছিল, —"ওগো দেবি! তুমি না বলেছিলে, তুমি একা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? এখন দেখছি, নিজের বলে আর কুলাল না দেখে আরও দশ জনকে ডেকে নিয়ে কাজ হাসিল করলে—এ তোমার কেমন রীতি?"—তখন মা তার উত্তরে কি বলেছিলেন জান? বলে ছিলেন—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।

রে দুষ্ট! আমি ছাড়া আর জগতে দ্বিতীয় কে আছে? অথবা 'জগতে' বা বলি কেন, আমি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুই যে নেই, জগৎ তো দূরের কথা! আমি যে অদ্বিতীয়! যাদের তুমি পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলে মনে করছ—তারা আমারই বিভূতি, আমারই অংশ। আমিই বহুরূপে—জীবরূপে—জগৎরূপে বিরাজিত রয়েছি।" এই বলে তিনি খণ্ড শক্তিগুলিকে আপন অঙ্গে লীন করে নিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে মহাশক্তির শক্তি ছাড়া পৃথক্ সত্তাশীল স্বতন্ত্র শক্তি আসবে কোথা থেকে? কেনোপনিষদেও এই নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। ব্রহ্ম-শক্তিতে শক্তিমান্ দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে, সেই জয়ে নিজেরা ফুলে উঠলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, আমাদেরই তো এই বিজয়, আমাদেরই তো এই মহিমা! ব্রহ্মস্বরূপিণী মা আমার তাদের মনোভাব বুঝ্‌তে পেরে—তাদের অভিমানের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করবার জন্যে যক্ষরূপে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখে দেবতারা বুঝ্‌তে পারলেন না এই যক্ষ কে? তখন তাঁরা অগ্নিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তিনি কে জেনে আসতে। অগ্নি গিয়ে হাজির হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি? অগ্নি বল্‌লেন—আমি অগ্নি, অথবা আমি জাতবেদা! তিনি বল্‌লেন—তোমার সামর্থ্য কি? অগ্নি বল্‌লেন—আমি সব পুড়িয়ে ফেলতে পারি—আমি সর্ব্বভুক্! তখন তাঁর কাছে একটা খড় ফেলে দিয়ে তিনি বল্‌লেন—আচ্ছা এটা পোড়াও দেখি। অগ্নি আপ্রাণ চেষ্টাতেও সেটাকে পোড়াতে না পেরে লজ্জায় অধোবদন হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে বল্‌লেন—নাঃ বুঝ্‌তে পারলাম না এই যক্ষ যে কে! তার পর তাঁদের নির্দ্দেশে বায়ু গেলেন তাঁর কাছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? বায়ু বল্‌লেন —আমি বায়ু অথবা মাতরিশ্বা। তিনি বল্‌লেন তোমার শক্তি কি? বায়ু বল্‌লেন—দুনিয়ার যত কিছু আমি সব নড়াতে পারি। "আচ্ছা এই খড়কুঁটোটা নড়াও তো?"—বায়ু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, তিনি তাকে একতিলও নড়াতে পারলেন না। শেষে গেলেন তাঁর কাছে ইন্দ্র। ইন্দ্র কাছে যেতেই যক্ষ অন্তর্হিত হলেন, আর সেখানে আবির্ভূতা হলেন সর্ব্বাভরণ ভূষিতা হৈমবতী উমা। কাজেই ইন্দ্র তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন—মা এই যক্ষ কে? মা বল্‌লেন—উনিই ব্রহ্ম—ওঁর বিজয়েই তোমাদের এত দাপাদাপি। তোমাদের শক্তির আর স্বাতন্ত্র্য

কোথায় ? তোমাদের শক্তির মূল ওই ব্রহ্ম।—এই বলে মা আমার ব্রহ্মতত্ত্বেই লীন হয়ে গেলেন। তখন ইন্দ্র জান্‌লেন ওই ব্রহ্ম। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল, তিনি দেবতাদের মাঝে স্বারাজ্য লাভ কর্‌লেন।"

"আচ্ছা জ্ঞানাঞ্জন দা, ব্রহ্ম তো শক্তিমান্, শক্তি তাঁরই আশ্রিতা ; তবে শক্তিকে আর ব্রহ্মস্বরূপিণী বল্‌ছেন কেন ?"

"দেখ প্রিয়ব্রত, শক্তি হ'তে শক্তিমান্‌কে পৃথক্ করা যায় না, আবার শক্তিমান্‌কেও শক্তি হ'তে বিযুক্ত করা যায় না। শক্তিমান্ যেমন শক্তিহীন হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, তেমনি শক্তিও আশ্রয়হীন হ'য়ে থাক্‌তে পারে না, কাজেই উভয়ের স্বরূপই এক, দুইএ মিলে পূর্ণ, এইজন্যই মাকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলা হ'য়ে থাকে। শক্তিমানের উপাসনা কর্‌তে হ'লেও শক্তির সহযোগে কর্‌তে হয়, আবার শক্তির উপাসনা কর্‌তে হ'লেও শক্তিমানের সহযোগে কর্‌তে হয়। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ যুগল উপাসনা, আর তান্ত্রিকের শিববক্ষোবিহারিণী শ্যামার আরাধনা একই সত্য ঘোষণা কর্‌ছে। তবে যাঁরা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাঁদের শক্তি-শক্তিমান্ ব'লে আর পৃথক্ কোন ভাব থাকে না, তাঁরা তুরীয় নির্গুণ অবস্থাটীর অনুধ্যান করেন। এই তুরীয় অবস্থায় শক্তি-শক্তিমানে আর কোনো ভেদই নেই, যেন উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হ'য়ে এক হ'য়ে গিয়েছেন। আবার লীলাচ্ছলে সেই একই দ্বি বা বহু ভাব ধারণ করেছেন, এইটুকু ভাবজ্ঞেয়। একটী সৃষ্টির অতীত অবস্থা, সেটী হচ্ছে সগুণ ; আর একটী সৃষ্টির অবস্থা, সেটী হচ্ছে সগুণ !"

"আচ্ছা জ্ঞানাঞ্জন দা, আপনি তো সগুণ-নির্গুণে বেশ মিলিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর নাকি এ সব কিছুই মানেন নি, তিনি নির্ব্বিশেষ ছাড়া ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবকে মোটেই আমল দেন নি। তিনি বলেছেন—সগুণ ভাবটা নাকি আপেক্ষিক—শক্তি নাকি মায়া !"

"কে বল্‌লে তোমার শঙ্কর শক্তি মান্‌তেন না ? হৈমবতী উমার উপাখ্যান ভাগের ব্যাখ্যা কর্‌তে গিয়েই তো তিনি বল্‌ছেন—মা অর্থাৎ হৈমবতী উমা সর্ব্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমা—যা কিছু সুন্দর আছে জগতে, তার চেয়েও সুন্দরী ; মা আমার হৈমবতী কি না হেমকৃতাভরণবতী, অথবা হিমবানের দুহিতা ব'লেও তিনি হৈমবতী। তিনি—নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্ততে—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত তিনি নিত্য বর্ত্তমানা। অর্থাৎ এই যে সর্ব্বাতিশায়ী করুণা, সৌন্দর্য্য,ঐশ্বর্য্য, প্রেম, মায়া, এই ব্রহ্মের এক পীঠ ; আবার আর এক জ্ঞানরূপী মায়ার রঙ্গপীঠ—এই হচ্ছে ব্রহ্মের আর এক পিঠ। একটা পাতার এক পিঠ হ'তে আর এক পিঠ যেমন পৃথক্ করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম হ'তে উমাকেও পৃথক্ করা যায় না। মোটের উপর এই দুই ভাবে যিনি পূর্ণ তিনিই ব্রহ্ম, আর সেই ব্রহ্মেরই সগুণ-নির্গুণ দুই ভাব !"

"আচ্ছা জ্ঞানাঞ্জন দা, মায়ের উপাসনা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, না নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা ?"

"উপাসনা মাত্রেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, কেন না নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না। কারণ যা দিয়ে উপাসনা কর্‌বে—অর্থাৎ উপাসনার করণ দেহ-মন-প্রাণ সবই যে গুণময়—প্রকৃতিসম্ভূত, কাজেই গুণময় দিয়ে তো আর এর অতীত অবস্থা ধারণা কর্‌তে পারা যায় না ; তাই আমরা যারই উপাসনা করি না কেন, সবই সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। এই সগুণ ব্রহ্মকেই নানা জনে নানা ভাবে উপাসনা কর্‌ছেন। যাঁর যেমনটী ভাল লাগে তিনি সেই ভাবেই ডুবে আছেন। তবে একথা ঠিক যে এক সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম-

—৩৬৫

সম্প্রদায়ই ভগবান্‌কে মা বলে সম্বোধন করে নি—মা বলে মায়ের কাছে সন্তানের মত আব্দার জানায় নি। প্রকৃত পক্ষে বল্‌তে গেলে এটী হিন্দুদের সাধন-জগতের একটী অতি সহজ-সরল সুগম পন্থা-বিক্রিয়া। —প্রাকৃত জগতেই আমরা দেখতে পাই—মা বল্‌তেই যেন প্রাণটা কেমন ক'রে ওঠে, মা বল্‌তেই যেন হৃদয়টা এক পবিত্র ভাবে পরিপূরিত হয়ে যায়। অসদ্‌ভাবের লেশও এই ভাবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষ্‌তে পারে না। কাজেই মাতৃ-ভাবের সাধনায় পতনের আশঙ্কা নেই, বরং তিলে তিলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী! তার ওপর এই সাধনায় মায়ের ওপর সাধকের সন্তানোপযোগী একটা দাবী—একটা আব্দার স্বাভাবিক। এ প্রার্থনা নয়, যাচ্ঞা নয়, হক্! অন্য প্রকার উপাসনার মধ্যে কত রকমের নিয়ম-কানুন থাকৃতে পারে, কত রকম বিধি-নিষেধ থাকৃতে পারে, উপাস্যের নিকট উপা-সকের একটা সন্ত্রাস সঙ্কোচ ভাব থাকৃতে পারে, কিন্তু মাতৃভাবের সাধনায় উপাসক সন্তানের সে সব বালাই নেই। মাকে কি কেউ ভয় করে? ছেলের শত আব্দার যে মা হাসিমুখে সহ্য করেন, তার অত্যাচার-অনাচার সব অবোধ ছেলের অবুদ্ধিপ্রসূত জেনে ক্ষমাই করে যান। মা মা বলে ডাকৃলে যেমন নাকি জাগতিক মায়ের প্রাণ গলে যায়, তেমনি মা মা করে ডাকৃলে বিশ্বেশ্বরীরও প্রাণ গলে যায়, তিনি আত্মহারা পাগলপারা হয়ে ছুটে আসেন সন্তানের ধূলা-কাদা ঝেড়ে তাকে কোলে তুলে নেবার জন্যে।"

"তাহলে আপনার মতে জ্ঞানাঞ্জন দা, একমাত্র ভক্তি দ্বারা মাকে পাওয়া যায়, মায়ের স্নেহ আকর্ষণ করা যায়?"

"হাঁ প্রিয়ব্রত! সাধন মার্গে ভক্তিকে আমি অতি উচ্চস্থান দেই। জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ বলে দুটো কথা প্রচলিত আছে সত্যি, কিন্তু আমার মতে ওগুলি পৃথক্ পৃথক্ পন্থা নয়, একই পন্থার স্তর বিশেষ। জ্ঞান মানে হচ্ছে জানা, আর ভক্তি মানে হচ্ছে ভালবাসা। জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপরই ভক্তির আসন প্রতিষ্ঠিত। যাকে ভালবাস্‌ব—সে কেমন আগে তা জান্‌তে হবে, নতুবা ভালবাসাই যে ফুট্‌তে পারে না, আকর্ষণের সঞ্চারই যে হতে পারে না! আর এই যে ভালবাসা এতে পরকেও আপন ক'রে নেওয়া যায়, আর যিনি আমাদের আপনার হতে আপনার, তিনি আপনার হবেন না?"

"আচ্ছা জ্ঞানাঞ্জন দা, শ্যামা মায়ের যে মূর্ত্তি দেখি—চিত্রপটে বা মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে—তাতে তো তাঁকে দেখে রীতিমত ভয় হয়! এখন এই বিভীষণাকে কেমন করে ভালবাস্‌তে পারা যায় বলুন তো? মা বল্‌তেই একটা স্নেহময়ী প্রেমময়ীর ভাব আমাদের প্রাণে খেলে যায়, কিন্তু শ্যামা মার উলঙ্গিনী বিকটা মূর্ত্তি দেখলে হৃদয়ের ভাব পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়—প্রাণে একটা আতঙ্কের উদয় হয়। এক হাতে তাঁর ছিন্নমুণ্ড, এক হাতে খড়্গ; আর দু'হাতে যদিও কিছুই নেই, তথাপি মনে হয় যেন তিনি শূন্যহস্তেও প্রহার বা সংহারেই উদ্যত রয়েছেন।"

"ঠিক বলেছ প্রিয়ব্রত, ওটী হচ্ছে মায়ের সংহা-রিণী মূর্ত্তি! সংহার কার? সংহার সন্তানের নয়, সন্তানের মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার বিরোধী যে তার—দেবভাব প্রতিকূল দুর্দ্দম অসুরবৃন্দের। যখন বাইরে-ভিতরে শত্রুকুল কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়ে মায়ের সন্তান আকুল প্রাণে মা মা বলে ডাকে, তখনই মা ঐ বিভীষণা মূর্ত্তিতে সাধন-সমরে আবির্ভূতা হয়ে পুত্রকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে আপন বক্ষে টেনে নেন। তাঁর হাতে যে অসি দেখছ তা ঐ

শত্রু নিধনের জন্যে, তাঁর হাতের যে ছিন্নমুণ্ডটা—তা হচ্ছে তারই নিদর্শন, ওতে সন্তান আশ্বস্ত হয়, শত্রুপক্ষ ভয় পায়। আর দুই হাতের এক হাত উত্তোলন করে মা ভীত সন্তানকে অভয় দিচ্ছেন, আর এক হাতে 'স্থিরোভব' বলে যেন বর প্রদান করছেন; তাই তো মা আমার বরাভয়করা! রিপু-কুলের কাছে মা বিভীষণা, কিন্তু সন্তানের কাছে তিনি স্মেরাননা। যে মাকে মা বলে চিনেছে, সে কি মায়ের ঐ রূপ দেখে ভয় পায় প্রিয়ব্রত? বাঘের বাচ্চা কি উগ্রমূর্ত্তি বাঘিনীকে দেখে ভয় পায়? —যে সব সাধক এখনও মায়ার হাত অতিক্রম করতে পারে নি, যারা এখনও অনাত্মভাবের কবলিত রয়েছে, তাদেরই উপাস্য হচ্ছেন ওই বরা-ভয়করা নৃমুণ্ডমালিনী বিভীষণা শ্যামা! মায়ের কৃপায় যেমনি তারা মায়া মুক্ত হয়ে যায়, অমনি তাদের সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলে যায়, নব জীবনে তারা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ মায়ের অমৃত বক্ষে তারা স্থান পায়। তখন না থাকে শত্রু, না থাকে মিত্র, না থাকে সুখ, না থাকে দুঃখ; তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন স্বারাজ্যে—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মরাজ্যে!"

"আজ অনেক বিষয় আপনার কথায় মীমাংসা হয়ে গেল জ্ঞানাঞ্জন দা! প্রকৃতই শক্তি সাধনার উদ্দেশ্য আজ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।"

"শুধু হৃদয়ঙ্গম করলে চলবে না প্রিয়, রীতিমত সাধনায় লেগে পড়। "যৎ করোষি যদশ্নাসি" সবই মায়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদন কর। তোমার নিঃশ্বাস টুকুও যেন বৃথায় না যায়। মায়ের সন্তান আমরা, অমৃতের সন্তান আমরা, আমাদের আর ভয় কিসের, পতন কিসের? আমরা যে সর্ব্বশক্তিময়ীর সন্তান —আমরা যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণীর আদরের দুলাল, এই সত্য ধারণার বজ্রদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত হয়ে সাধন পথে অগ্রসর হও; দেখবে তোমার পথে বিঘ্ন নেই সবই ফুল-দল, দেখবে তোমার পথ কণ্টকাবৃত নয়, কুসুমাস্তৃত! যদি কোন দিন কোন বিঘ্নের সাক্ষাৎ পাও—একান্তমনে মায়ের চরণ স্মরণ ক'রো—তিনিই তোমার যত সাধন-বিঘ্ন অপসারিত করে দেবেন, ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে তোমায় কোলে তুলে নেবেন। শুধু আকুল প্রাণে ডাকা চাই—মা! মা! মা!"

"জ্ঞানাঞ্জন দা, আলোচনা করতে করতে দেখি কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তা আমাদের খেয়ালই নেই! ঐ শুনুন মায়ের মন্দিরে বোধন-আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, চলুন আজ প্রাণের সঙ্গে ভাবের সংযোগ করে বিশ্বেশ্বরীর আরতি দেখিগে, আকুল প্রাণে ব্যাকুল ভাবে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়িগে।"

"চল প্রিয় ব্রত! মায়ের আরতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণ-প্রদীপেও আরতির দীপ জ্বেলে তুলি—আমাদের হৃদয়াসনেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর জয় গানে তন্ময় হই। মায়ের বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানেরও বোধন হয়ে যাক্, তাদেরও বোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক—চোখ ফুটুক্—মাকে মা বলে চিনবার শক্তি ফুটে উঠুক্। —জয় মা!"
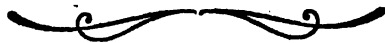
রিপু দমন

দৈত্য-দানার অট্টহাসিতে কাঁপে ওই দশ দিক্,
হে বীরহৃদয় শঙ্কিত তুমি ? ধিক্ তবে শত ধিক্ ।
বক্ষ চিরিয়া রক্ত দানিতে দুর্ব্বল পায় ডর,
মায়ের সম্মান ক্ষুণ্ন দেখিতে চোখে ধারা দরদর্।
হবে না, হবে না কান্নায় কিছু শক্তি চাহি যে আজ
শক্তি বিনা এ শক্তিমানের নারিবে রোধিতে বাজ্।
বজ্র হানিছে যারা আজ বুকে, বজ্রই তারা চায়
বদলে তাহার ফুলমালা দিলে দলি' যাবে দুই পায়।
অন্তরাকাশে দৈত্য-উদয়, তোষামোদ পূজা ছাড়্,
যোগ্যযুদ্ধে পরাজয়ি তারে করে দে হৃদয় বা'র।
এ হৃদিরাজ্যে দেবতা-আসন চিরদিন বেঁধে রাখ্
দশভুজা ওই শক্তিময়ীর পদরেণু গায়ে মাখ্।
শক্তিময়ীর সন্তান তোরা শক্তিই বুকে ধর্
রিপুর তাড়নে দৈত্য-পূজায় মিছেই বহিবে ঝড়্।
হে বীর্য্যবান্ সংহর রিপু, দেবতার হোক জয়,
বীর্য্যেই বটে, নহেরে নিদ্রায় অসুরের পরাজয়।

——×——

সাহায্য প্রাপ্তি

[শ্রীশ্রীগুরুধামে জন্মোৎসব উপলক্ষে]

(ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

পাটনা ও রাঁচি—বিশ্বেশ্বর বসু ২৲, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৲, **দ্বারভাঙ্গা**—গিরীন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি ২৲, **হুগলী**—যতীন্দ্রনাথ হাজরা ১৲, প্রাণকৃষ্ণ সেট ১৲, শীতলচন্দ্র পাত্র ২৲, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৲, বৈদ্যনাথ দেবশর্ম্মা ॥০, নগেন্দ্র রায় ১৲, আশুতোষ পাত্র ১৲, **জম-সেকপুর**—পূর্ণশশী দেব্যা ৩৲, তারাপদ বসাক ২৲, ননীগোপাল সেন গুপ্ত ২৲, ব্রজকিশোর বন্দোপাধ্যায় ১৲, হরিনাথ গুপ্ত ১৲, সতীশচন্দ্র সরকার ১৲, অর্জ্জুনচন্দ্র মেঠা ১৲, জয়ন্তকুমার ঘোষ ১৲, **আসাম**—গিরীশচন্দ্র রুহিদাস ১৲, চুনিরাম রুহিদাস ১৲, তনুদাস তাঁতী ১৲, সন্ন্যাসী পঞ্চানন ১।৴০, যতীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জি ১৲, সুধনী মা ।০, মহেন্দ্রনাথ দাস ডাক্তার ১০৲, **জলপাইগুড়ি**——কুমার গুরুচরণ দেব ২॥০, **বাঁকুড়া**—অবিনাশচন্দ্র চাটার্জ্জি ৫৲, **বালেশ্বর**—কৃষ্ণগোপাল মুখার্জ্জি ১॥০, শ্রীমতী গঙ্গাদেবী ১৲, **সিংহভুম**—সচ্চিদানন্দ ভোগ ৩৲; ভুবনচন্দ্র পাল ১৲।

২৫শ বর্ষ কার্ত্তিক—১৩৩৯ ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৭০ ১ম সংখ্যা

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

জীবনে সত্যেরই জয়—অনৃতের নয়, অসত্যের নয়। তাহা হইলে জীবনের লক্ষ্যই হইল সত্য লাভ করা। জীবন ভরা ভাল-মন্দের ভিতর দিয়া এই সত্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়া লইতে হইবে। সত্যই আমাদের প্রাণ, সত্য হইতেই জ্ঞানের, কর্ম্মের, যোগের উৎস উৎসারিত হইতেছে। আমাদের জীবন এই সত্যকে বাছিয়া লইবার দরুণই।

সত্যের বিকৃত প্রকাশও রহিয়াছে—মানুষ সেই মোহে পড়িয়াই সত্য হইতে প্রবঞ্চিত হয়। এইজন্যই প্রাণে অফুরন্ত আবেগ থাকা চাই, যাহা কেবলই উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিবে তোমায়। সত্য লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলেই, কোন্ এক অদৃশ্যলোক হইতে প্রাণের মাঝে শক্তির ফোয়ারা নামিয়া আসে। জগতে মানুষ কাজের মত কাজ করিয়া যাইতে পারে সেই শক্তির মাহাত্ম্যেই।

আমরা অনেক কিছুই চাই—কিন্তু সত্যকে চাহি না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সত্যকে বাছিয়া লইবার মত অন্তর্দৃষ্টি, সংযম আমাদের মাঝে নাই। যার ভিতর দিয়া সত্যের প্রকাশ, তাহাকেই চরম মনে করিয়া বসি। এম্‌নি করিয়া সত্য পড়িয়া যান বস্তুর আড়ালে। সেই জন্যই সত্যের সেই তীব্র জ্যোতির প্লাবন হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কলুষ-রাশিকে বিদূরিত করিতে পারে না।

ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে আমাদের,—আসল সত্যের সাক্ষাৎকার হয় জীবন-বিনিময়ে। আরামে বসিয়া সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এমন কাহারও নাম শুনা যায় না। প্রাণের আকুলতা লইয়া ভিতরে তীব্র তাপের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই তাপ দ্বারাই সন্তাপহারী ভগবানের দর্শন পাইয়াছে মানুষ।

জয়-পরাজয় বাহিরের কথা নয়, অন্তরই তার সাক্ষী। জগৎ বিরোধী হইক, কেউ তোমার কথা না শুনুক, কিন্তু তোমার সত্যিকার অনুভূতির মূল্য সব চেয়ে বেশী। যাঁহারা মহাপুরুষ হইয়াছেন, এমনি করিয়া জীবনের এক একটী অনুভূতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন তাঁহারা। অনুভূতির বস্তু কোন দিন সন্দেহ সৃষ্টি করে না। সেই জন্যই তাঁহাদের অটুট বিশ্বাসের প্রভাবে, শত শত অবিশ্বাসীর হৃদয়ও মুহূর্ত্তের মাঝে গলিয়া যায়। মহাপ্রভু সেই দৈবীপ্রভাব দ্বারাই জগাই-মাধাইর প্রাণেও সত্যের তীব্র শিখা জ্বালাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জীবন্ত অনুভূতির অমোঘ প্রভাব—সেখানে যুক্তি-বিচার নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, থাকিলেও অনেক পেছনে পড়িয়া থাকে তাহারা, জীবনের মুখ্য তাহারা নয়—তাহাদের প্রয়োজন গৌণ।

জীবনে একটা বড় আদর্শ লইয়া মরাও ভাল—তবু যেন তোমাদের মাঝে দৈনন্দিন তুচ্ছ বিষয়ের স্মৃতিই প্রবল হইয়া না উঠে। সত্যের সন্ধান নিজের মাঝেই পাইবে। ইহার দরুণ বিলাস ত্যাগ করিয়া, নিজকে চাপ দিতে হইবে। জড়ত্ব প্রকৃতির ধর্ম্ম। কেহ কাহারও স্বভাব ছাড়িয়া দিতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্যই সত্যকে আবৃত করিয়া রাখিবার দরুণ কোষের সৃষ্টি। সব কোষকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তবেই সেই চরম সত্যের সন্ধান মিলিবে। সত্যের আভাস পাইয়া সত্য প্রচার করিতে

বসিয়া গেলে, ভবিষ্যতের পরিণাম বড় শুভ-জনক হয় না। এই জন্যই আত্ম প্রচারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আত্মপ্রকাশের দিকে তোমাদের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আত্মপ্রচারের বাতিকে যাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহারা মূলধন শূন্য হইয়া অভ্যাসের বশে অনেক কথা বলিয়া যায়। তাহাদের অপ্রয়োজনীয় ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনীতে একটী মানুষের প্রাণও সত্যের দরুণ ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ।

'সত্যমেব জয়তে'—এই কথাটী কখনো ভুলিয়া যাইও না। জীবনের অনন্ত ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটী বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমরা বিচার করি শুধু বর্ত্তমানের উপর নির্ভর করিয়া, কিন্তু বর্ত্তমান ছাড়া আরও কাল রহিয়াছে। দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া দেখ, সত্যেরই জয়। যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রাণত্যাগের মূলে ছিল সত্য—এইজন্যই আজ এত বৎসর পরও সেই সত্যের মহিমাই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি স্তব্ধ—কেন না জগতের ভাল-মন্দের পরিণাম তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টার একটী বিশেষ লক্ষণ—জীবনের প্রশান্তি; তাঁহাদের ভিতর উদ্বেগ নাই, অশান্তি নাই। সত্য লাভ করিলে তোমাদের ভিতরও সেই প্রশান্তি আসিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সকল সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাওয়া চাই।

মানুষ কত ভাবেই মরে, সত্যের দরুণ প্রাণ দেয় কয়টা মানুষ? এই আত্মত্যাগ যখন বিরল হইয়া উঠে, সত্যের মহিমাও তখন নিষ্প্রভ, কলুষিত হইয়া যায়। এইজন্যই ঋষিদের সুনাম আর যশ লইয়া গর্ব্ব করিলেই তোমাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইল না, প্রাণে আবার সেই ত্যাগ, সেই সত্য-পিপাসা তোমাদের মাঝে জাগ্রত করিয়া তোল। তপস্যা দ্বারা অন্তরকে শোধন করা চাই, তাহা হইলে তোমরাও ঋষিদের দিব্য-জীবন লাভ করিতে পারিবে। সত্যমেব জয়তে—সত্যের জয় বিঘোষিত হউক।

সদ্‌গুরু ও শিষ্য

—:(০):—

গুরু বন্দনা

(১)

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু বিধি মহেশ্বর
গুরুদেব মহেশ্বর শশাঙ্কশেখর,
গুরুই পরম ব্রহ্ম পূর্ণ অবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(২)

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ড অনন্ত এই বিশ্ব চরাচর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি নিত্য নিরন্তর,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরু পদে আমি করি নমস্কার॥

(৩)

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ নরের নয়ন
জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় খুলেন যে জন,
দিব্য চক্ষু ফুটে উঠে প্রসাদে যাঁহার
সেই গুরু পদে আমি করি নমস্কার॥

(৪)

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্থাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন
সমস্ত ব্যাপিয়া সদা আছেন যে জন,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(৫)

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পরম ঈশ্বর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি বিশ্ব চরাচর,
চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(৬)

সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজং।
বেদান্তাম্বুজ সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্র শিরোরত্ন সার
সতত শ্রীপাদ পদ্মে শোভিছে যাঁহার,
বেদান্ত সরোজ ফুটে দরশনে যাঁর
সেই জ্ঞান রবি গুরু পদে নমস্কার॥

(৭)

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

চৈতন্য স্বরূপ শান্ত সত্য সনাতন
ব্যোম তত্ত্বাতীত যিনি, যিনি নিরঞ্জন,
নাদ বিন্দু কলাতীত স্বরূপ যাঁহার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(৮)

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালা বিভূষিতং।
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমাসীন যিনি জ্ঞান ভক্তির আসনে
বিভূষিত যিনি তত্ত্বমালা বিভূষণে,
ভুক্তি মুক্তি লভে নর কৃপায় যাঁহার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(৯)

অনেক জন্মসংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জন্মজন্মান্তর কৃত কর্ম্মের বন্ধন
আত্মজ্ঞান দানে যিনি করেন দাহন,
পরিত্রাণ পায় নর করুণায় যাঁর
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(১০)

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বিন্দুমাত্র পাদোদক পরশিলে যাঁর
নিমেষে শুকায় ভব জলধি অপার,
প্রকাশিত হয় আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সার
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

—৩৭খ

(১১)

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব তুচ্ছ হয় তুলনায় যাঁর
যিনি সর্ব্ব জপ তপ সাধনার সার,
যাঁর তত্ত্ব হতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাহি আর
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

(১২)

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আমার হৃদয়নাথ জগতের গুরু
মম গুরু বিশ্বনাথ বাঞ্ছা কল্পতরু,
মোর অন্তরাত্মা যিনি আত্মা সবাকার
সেই গুরু পদে আমি করি নমস্কার॥

(১৩)

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃপরমদৈবতং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু সকলের আদি অনাদি ঈশ্বর
পরম দেবতা গুরু পূজ্য পরাৎপর,
যাঁহা হতে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাহি আর
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার॥

প্রণাম

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

অতুল আনন্দপ্রদ ব্রহ্মানন্দ জ্যোতিঃ
শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বন্দ্বাতীত চৈতন্য মূরতি,

গগন সদৃশ যিনি ব্যাপ্ত নিরাধার
তত্ত্বমসি আদি বাক্যে নির্দ্দেশ যাঁহার,
এক অদ্বিতীয় যিনি নিত্য নিরমল
সর্ব্বভূত সাক্ষী ভাবাতীত অচঞ্চল,
তুরীয়ে রাজেন গুণত্রয় অতিক্রমি
প্রণমি সে সদ্গুরুর চরণে প্রণমি ॥

নমস্তে গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার সংজ্ঞকং ॥

যিনি সাক্ষাৎ ইষ্টদেব স্বরূপ এবং যাঁহার বাক্য-রূপ অমৃতদ্বারা সংসার বিষের নাশ হয়, সেই গুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।

যে মহানুভব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিতা মায়াকে অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি সেই ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রত্যেক অবস্থাই সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত আছেন, সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাস সর্ব্ব বিষয়ের অভ্যন্তরস্থিত আত্মার বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, সুতরাং যাঁহার নিকট কিছুই জ্ঞেয় নাই, এই বিশাল সৌর মণ্ডলের সর্ব্ব স্থানই যাঁহার জ্ঞানগম্য, যে মহাপুরুষ ঈশ্বরকে নিজ হইতে অভিন্ন দেখিয়া সর্ব্বভূতে সম-জ্ঞান হইয়াছেন, যাঁহার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, যে মহাত্মা কেবল শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে স্বয়ং নির্ব্বাণ অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াও শুদ্ধ জীব সাধারণের মঙ্গলার্থ প্রসন্ন হৃদয়ে শ্রীভগবানের দৈবী-প্রকৃতির সহিত অভিন্ন-ভাবে অবস্থিত আছেন, তিনিই **সদ্‌গুরু** হইবার উপযুক্ত। গীতাতে কথিত আছে—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি মাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাকে সমস্ত জগতের আদি এবং অব্যয় বস্তু জানিয়া অনন্য মনে উপাসনা করিয়া থাকেন। এবম্প্রকার সদ্‌গুরুর বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে ॥
ভাঃ—৩য় স্কন্ধ।

হে মহামুনে! মুক্তসিদ্ধ পুরুষদের মধ্যেও যাঁহারা প্রশান্ত চিত্ত হইয়া নারায়ণ পরায়ণ অর্থাৎ নারায়ণই যাঁহাদের আশ্রয় ও গতি, এরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ, কোটীর মধ্যে কদাপি সেরূপ একজন পাওয়া যায়। পরম পূজনীয় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় এইরূপ জগত্ত্রাতা জীবন্মুক্ত সদ্‌গুরুদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে তিনি অধিকারী আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন যে, ভগবৎ ইচ্ছায় ইঁহারা জগতের হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, কারণ জীবের মঙ্গল সাধনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহারা জীবকে সর্ব্বদা তৎ স্বরূপে অর্থাৎ ভগবান বলিয়া জানেন। গীতায় আছে—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥

এই সদ্‌গুরুর ত্রিকালে কখনও অভাব হয় না। যেমন ইন্দ্রাদি দেবতাগণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, যাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন, সেইরূপ ধর্ম্ম রক্ষা করা, মানবকে বিদ্যাদানে ভগবন্মুখ করা, সহায়তা করা এবং উপযুক্ত অধিকারী মানবকে চিত্ত ও আত্মজ্ঞান প্রসার রূপ দীক্ষা প্রদান করা প্রভৃতি সদ্‌গুরুগণের নিয়ত কার্য্য। এই ভগবদিচ্ছা সাধন জন্য তাঁহারা অনুক্ষণ প্রয়াসী, অতএব সদ্‌গুরু সদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যেরই সংখ্যা অতি বিরল।

কর্ম্ম অভ্যাস, জ্ঞান ও ভক্তিযোগে নিপুণতা লাভ করিবার পর সাধক শিষ্য হইবার যোগ্যপাত্র

হন এবং তখন তাঁহার সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরু স্বয়ংই এইরূপ সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এরূপ কেহ মনে না করেন যে সদ্‌গুরু মনুষ্য সাধারণকে অজ্ঞানে রাখিবার জন্য আপনাকে গুপ্ত রাখিয়াছেন। যেরূপ বিজ্ঞানবিদের বোধগম্য কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বালককে বুঝান যায় না, সেইরূপ শিষ্য হইবার উপযুক্ত গুণ-লক্ষণাদি সম্পন্ন না হইলে জীবের সদ্‌গুরু লাভ হয় না। তাদৃশ অনুপযুক্ত ব্যক্তির গুরুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ ঘটিলেও সে ব্যক্তি তাঁহাকে সদ্‌গুরু বলিয়া চিনিতে পারিবে না।

যেমন চক্ষু না হইলে রূপ দর্শন হয় না, সেইরূপ আনন্দময় কোষের অভিব্যক্তি না হইলে গুরুর গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না।

অধিকারী হইতে হইলে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা সমস্তই শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় নানা পুস্তকে উক্ত হইয়াছে। সেই পন্থানুসারে চলিলে সাধক অবশ্য গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেন। আরও জানা উচিত যে, যে পর্য্যন্ত না তিনি অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন, সে পর্য্যন্ত যতটা সাহায্যের আবশ্যক হয়, গুরু অপ্রকাশ ভাবে থাকিয়া সে সাহায্য করেন। বাহ্যতঃ সাধকের স্থূল শরীর যে সময়ে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে, সেই সময় সাধক সূক্ষ্ম শরীরে প্রায়ই গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই উপদেশ দ্বারা ইহজীবনে উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত সাধক জাগ্রত অবস্থায় এই স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান অনুভব করিতে পারে না, কারণ স্থূল শরীর হইতে পৃথক হইয়া জীবের সংবিৎ সূক্ষ্ম শরীরে যাইবার পূর্ব্বে লয়স্থানে কিঞ্চিৎ কালের জন্য অচেতন হইয়া যায়, আবার ফিরিবার সময়েও এই লয় অবস্থার মধ্য দিয়া জাগ্রত অবস্থায় আসিয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া যাহা কিছু দেখা বা শুনা যায়, তাহা জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ থাকে না, কিন্তু তথাপি তাহার ফল হইতে সাধক বঞ্চিত হন না। অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্ত শুদ্ধ সমাহিত ও একাগ্র হয়, তখন তিনি সচেতন ভাবে সূক্ষ্ম শরীরে যাওয়া আসা করিতে থাকেন। তখন অবশ্য তাঁহার স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান সমস্তই জাগ্রত অবস্থাতে স্মরণ থাকে।

অনেক সাধক নিদ্রিত অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে অথবা অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত কোন ব্যক্তিকে অথবা আপনা হইতে নিম্নাধিকারী ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া সহায়তা করেন।

শিষ্য সাধন কালে অথবা দীক্ষা লাভ করিয়া স্থূল শরীর ত্যাগ করিবার পর অচিরে উচ্চাধিকার পাইবার জন্য স্বর্গের সুখকেও লোকহিতার্থে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। স্বর্গলোকের উচ্চস্তরে সাধক গমন করিয়া স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত অধিকারী শিষ্য তাহা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। এইরূপ করিলে তাঁহার গুরু শীঘ্র তাঁহার কর্ম্মক্ষয় করিবার জন্য মৃত্যুর পর অব্যবহিত কাল মধ্যেই তাঁহার পুনর্জ্জন্মের ব্যবস্থা করেন, এবং অতি শীঘ্র উপযুক্ত স্থানে ও কুলে প্রেরণ করেন। স্বর-লোকে গমন করিলেও সেখানকার আনন্দ ভোগ করিলে যে শক্তি হ্রাস হইত, তাহা হইতে না দিয়া সেই শক্তি অন্য ভাবে এই সংসারের উপকারার্থে উৎসর্গ করেন।

গুরুগণ কেবল উপদেশ দ্বারা মার্গ দেখাইয়া দেন, কিন্তু চলিবার কার্য্য আমাদের নিজেদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়, আর চলিলেই গন্তব্য স্থানের শেষ সীমায় পৌছিতে পারা যায়। কিন্তু অধুনা অনেকেই চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে চাহেন

না। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, পরিশ্রম না করিয়াই মহাত্মা হইয়া যান, ইচ্ছা যে কোন মহাপুরুষ কোন-ক্রমে একেবারেই তাহাদিগকে মহাত্মা বা ঋষিপদে উন্নীত করিয়া দিলে ভাল হয়। যখন মনুষ্য এত অলস হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থায় যদি গুরুগণ প্রকাশ্য ভাবে থাকেন, তবে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের পক্ষে এই সংসারে থাকা কত অসহ্য হইয়া পড়িবে। তাঁহাদের নিকট সকলেই এই প্রার্থনা করিবে যে, তাহাদিগকে একেবারেই পাষণ্ড হইতে মহাত্মা করিয়া দেওয়া হউক, তাহাদের সমস্ত সাংসারিক কাম্য পদার্থ প্রাপ্তি হউক, ব্যাধি ও অন্যান্য দুঃখ হইতে মুক্ত করা হউক। কিন্তু এরূপ করিলে ভগবানের নিয়ম ও জগতের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। এই সকল কারণে অনধিকারী ব্যক্তি হইতে গুপ্ত থাকা সদ্‌গুরুগণের আবশ্যক হইয়া পড়ে। আরও আজ কাল লোকের দুষ্টাচরণের জন্য সংসার এমন অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে যে, পবিত্র মহাত্মা-দের এখনকার অপবিত্র সমাজে থাকা নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে জনসমূহের যতটা উপকার করিতেছেন, আপনাদের পবিত্র গুপ্তস্থানে থাকিয়া তথা হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক উপকার সংসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু আবশ্যক হইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লোক হিতার্থে সাধারণ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, আবার অনেকেই এই ভূলোকে স্থূল শরীরে থাকি-য়াও অপ্রকাশ থাকেন।

গুরু সকলেই একরূপ নহেন, সকলেই সমানা-ধিকারী নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন মহাত্মাকে শরীর ধারণ করা হেতু এই ভূলোকে দেখিতে পাওয়া যাইলেও যথার্থ পক্ষে তাঁহারা উচ্চলোকে থাকেন। স্থূল শরীর তাঁহাদের আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্থূল শরীর আমাদের স্থূল শরীর হইতে গুণগত ভিন্ন; তাঁহাদের শরীর তাঁহা-দের ইচ্ছাধীন এবং তাহাতে পঞ্চভূতের কেবল সূক্ষ্মাংশ বিশেষ আছে; স্থূলভূত তাহাতে অতি অল্প। জিজ্ঞাসুগণ সদ্‌গুরুকে পাইবার জন্য যত উৎসুক থাকেন, গুরু তাঁহাদের নিকট পৌছিবার জন্য এবং জিজ্ঞাসুগণকে সহায়তা করিবার জন্য তদপেক্ষা সহস্র গুণ ব্যগ্র থাকেন। তবে তাঁহাদের নিকটে যাইবার চেষ্টা করা সাধকের কর্ত্তব্য।

কেবল ইচ্ছামাত্র থাকিলে, তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইবার কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিলে, তাঁহা-দিগকে পাওয়া যাইতে পারে না। জিজ্ঞাসু গুরুর দিকে একপদ অগ্রসর হইলে গুরু তাহার দিকে দুইপদ অগ্রসর হইয়া থাকেন। প্রত্যেক মনুষ্যেরই চিরকালের জন্য এক ইষ্টদেব ও সদ্‌গুরু আছেন, জন্ম-জন্মান্তর হইতে প্রচ্ছন্নভাবে সেই গুরু আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্ন করা মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরুরা সংসারে উপযুক্ত শিষ্য পাইবার জন্য সর্ব্বদাই ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু তাদৃশ শিষ্য জগতে অতি দুর্ল্লভ। মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামী বলিয়াছেন :—

"গুরু মিলে বহুত বহুত
চেলা না মিলে এক।"

অর্থাৎ গুরুর কখনই অভাব হয় না, শিষ্যই দুষ্প্রাপ্য। আবার বলিয়াছেন :—

"ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু
চতুর নাম বপু এক।"

অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্ত (অর্থাৎ ভক্তিমান্ শিষ্য) ভগবান্ ও গুরু এই চারিটীর নাম ও দেহ ভেদ হইলেও বস্তুতঃ ইহারা একই বস্তু জানিবে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভক্তিমান্ শিষ্য ও সদ্‌গুরু অভিন্ন। তাঁহারা এমন শিষ্য চান, যাহাদের দ্বারা

সংসারের বিশেষ উপকার সাধিত হয় বা সংসারী লোককে সৎমার্গের দিকে আকর্ষণ করা যায় এবং সনাতন ধর্ম্মের প্রচার হয়, যাহাতে মনুষ্যগণ অজ্ঞানে লিপ্ত হইয়া জীবন বৃথা ক্ষয় না করে—সতত এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা সংসারের জীবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। সাধক যখন শিষ্য হইবার যোগ্য হন, তখন গুরুগণ ক্ষণমাত্রও তাহার নিকট পৌছিতে বিলম্ব করেন না, চুম্বকের ন্যায় তাঁহারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লন

আমরা কিন্তু আমাদের হৃদয়দ্বারকে অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থ পরতা, আলস্য, মলিনতা, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি দ্বারা এমন রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি যে সদ্‌গুরু যদিও সহায়তা করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না; তাঁহার বিমল জ্যোতির দিকে পশ্চাৎ করিয়া রুদ্ধ গুহার ভিতরে অন্ধকারে পড়িয়া থাকি, আর তাঁহাদের চির শান্তিপ্রদ ভাব হইতে বঞ্চিত হই। হৃদয়দ্বার খুলিলেই এবং তাঁহার চরণ কমল প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেই সদ্‌গুরু স্বতঃই অন্তরে আবি-র্ভূত হইবেন। হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করা, অহঙ্কার, স্বার্থ, বিষয়-তৃষ্ণা আলস্যাদি অসদ্‌গুণগুলি পরিত্যাগ করা, আর আর্ত্ত হওয়া অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করা, পরার্থে আত্মোৎসর্গ করা, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ করা, বিচার ও ধ্যান-ধারণা করা, বিশুদ্ধ আচরণের অভ্যাস করা এবং উপাস্য সদ্‌গুরুতে একনিষ্ঠ ও অচল ভক্তিসম্পন্ন হওয়া—এই সকল অনুষ্ঠান করিলে অর্থাৎ কতক পরিমাণে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে সদ্‌গুরু অবশ্যই মিলিবেন, সে বিষয়ে আর অণু-মাত্র সংশয় নাই।

স্বার্থই অনর্থের মূল, আর স্বার্থ ভেদ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা আত্মপর ভেদ ভুলিতে পারিব এবং আন্তরিক ভালবাসার সহিত সর্ব্ব জীবের উপকার সাধনে দৃঢ়ব্রত হইব, ততদিন আমাদের ও মহাত্মাগণের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকিবে, ততদিন আমরা তাঁহাদিগের নিকট সহায়তা লাভ করিবার যোগ্য হইব না। বনে বনে বা পাহাড়ে পাহাড়ে খুঁজিয়া বেড়াইলে সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হয় না। আপনার চিত্তক্ষেত্রে প্রথম সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার হইবে। অতএব সদ্‌গুরুকে আপনার ভিতরেই অনুসন্ধান করা উচিত। ভিতরে চিত্ত চাঞ্চল্য, তৃষ্ণা, স্বার্থপরতা, অজ্ঞানাদিরূপ যে অন্ধকার রহিয়াছে—তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম, পরোপকার, অভ্যাস যোগ আর ভক্তিরূপ সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা নাশ হইলে তৎক্ষণাৎ সদ্‌গুরুর দর্শন হইবে।

সদ্‌গুরুদের এই ইচ্ছা যে, যেমন তাঁহারা সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য নির্ব্বাণ অবস্থায় পূর্ণানন্দ ত্যাগ করিয়া-ছেন, সেই প্রকার যাহারা তাঁহাদের নিকট আসিতে চাহে, তাহারাও যেন সর্ব্ব প্রকারের স্বার্থ কামনা পরিত্যাগ করে, এবং নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার করিয়া দেখায় যে তাহারা সেই সদ্‌গুরুগণের শিষ্য হইবার যোগ্য।

এইরূপ সদ্‌গুরুই রাজবিদ্যা পরাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং কেবল তাঁহাদের দ্বারাই প্রকৃত দীক্ষা সম্ভব। অন্যদ্বারা কদাপি তাহা হইতে পারে না; অতএব যত দিন এরূপ সদ্‌গুরু প্রাপ্তি না হয়, ততদিন আপনাকে তাঁহাদের শিষ্য হইবার অধি-কারী করিবার নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং চিত্তকে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতিই একনিষ্ঠ করিয়া রাখা উচিত। অনধিকারী ব্যক্তির সদ্‌গুরু প্রাপ্তি কদাপি হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়া সদ্‌গুরু শিষ্যকে ত্রিগুণের পারে লইয়া গিয়া উপাস্যের সহিত মিলাইয়া দেন। পুরাকালে যোগ্য শিষ্যেরাই সদ্‌গুরু লাভ করিতেন। বর্ত্তমান কালেও সেইরূপ হইয়া থাকে ও ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এই

নিয়মের কোন কালেই ব্যতিক্রম ঘটে না। যাঁহার সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হয় সেই মনুষ্য ধন্য; দেবতারাও প্রশংসা করিয়া সেই গুরুর মহিমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। সমস্ত বিশ্বেরই উপকার তাঁহার দ্বারা সাধিত হয়। পূজনীয় কবিবর তুলসীদাস তাঁহার শ্রীরাম চরিত মানসে লিখিয়াছেন—

শ্রীগুরুপদনখ মণিগণ জোতি,
সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয় হোতি।
দলন মোহতম শোও প্রকাশু
জড় ভাগ্য উর আহি যাঁসু॥

[আদি পর্ব্ব]

শ্রীগুরুপদনখ মণিগণের জ্যোতিঃ স্মরণ করিলে হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। মোহ-অন্ধকার নষ্ট হইয়া চন্দ্ররূপী জ্যোতির প্রকাশ হয়। যে মানুষের হৃদয়ে এই ধ্যান আসে, সেই মানব ধন্য ও বড়ই ভাগ্যবান্।

(ক্রমশঃ)

সাধনা

মানুষ সব দিতে পারে, পারে না শুধু মনটা দিতে। বাইরের জগতের সব কিছু দেওয়া সহজ, কেন না সে গুলি যদি আপন অধিকারে থাকে তবে একবার বুক বেঁধে তার মায়া ছাড়লেই হল, সে জিনিষ যার কাছে যাবে, তার অধিকারেই থাক্‌বে। জড় বস্তুর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, কাজেই না টেনে আন্‌লে আর আস্‌তে পারে না। কিন্তু মনটা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এটা ইচ্ছা করলেই কিছুতে নিবিষ্ট করা যায় না, কারও প্রতি আপনি আকৃষ্ট না হলে তাকে দেওয়া চলে না। তাই সাধারণ মানুষ মনের দাস; মন তাদের দাস নয়। কাজেই যদি কখনো কোনও সৎ বা অসৎ কার্য্য তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার আসল কর্ত্তা আমরা যাকে আমাদের চোখের সাম্‌নে দেখি, তাকে বলা যায় না। কারণ সেও মনের দাস মাত্র। মন তাকে যে দিকে চালিয়ে নিয়েছে, সে "অনিচ্ছন্নপি" ইচ্ছা না হলেও সেই দিকেই গিয়েছে। কই, ইচ্ছা মাত্রেই তো সে যখন তখন মনের গতি আপন ইচ্ছানুসারে যে কোনও দিকে নিতে পারে না, কাজেই কি ক'রে বলি যে, সে নিজেই তার কর্ত্তা? যে যে বিষয়ের কর্ত্তা, সেই বিষয়ের উপর তার একাধিপত্য থাকে; যদি না থাকে, তবে বল্‌তে হবে, সে সেই বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা নয়। মানুষ যদি ইচ্ছা মাত্রে আপনাকে যে কোন বিষয়ে নিযুক্ত করতে না পারে, তবে বুঝতে হবে, সে তার নিজের সর্ব্বময় কর্ত্তা নয়। এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মানুষ সব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করে বেড়ায়, অথচ সেই মানুষ নিজের কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে পারে না। সব চেয়ে যেটা একান্ত কাছে, একান্ত আপনার, তার উপরই মানুষের কর্ত্তৃত্ব চলে না, অধিকার নাই, অথচ সে যায় অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌তে, সে চায় অপর দেশের হাজার হাজার জনপ্রাণীর কর্ত্তা হতে।

আচ্ছা, মানুষের এত কর্ত্তা হওয়ার সাধ কেন? যে যা নিয়ে রয়েছে তার মাঝে সে বড় হতে চায়, যাদের নিয়ে থাকে, তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারলে খুসী হয়। বৈদান্তিক এক কথায় বল্‌বেন, মানুষের মধ্যে যে বিরাট ব্রহ্মের ভাব প্রসুপ্ত রয়েছে, তারই বশে মানুষ এমনি বড় হতে চায়। ভূমার বীজ তার মাঝে নিহিত রয়েই বৃহতের দিকে যদি এত টান, তবে সে ছোট কাজ ক'রে ছোট হয়ে

যায় কেন? তার মূলে রয়েছে বড় হওয়ার কামনা। যে যখন যে কোনও নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে তখন আর এ কথা ভাবে না যে, এই হীন কাজ জন-সমাজে প্রচারিত হয়ে সে হীন বলে প্রচারিত হবে। বরং ভাবে যে, হীন উপায়ে কার্য্যোদ্ধার হলেও সে সমস্ত লোক-লোচনের অন্তরালে থেকে তার ফলস্বরূপ বাইরে যে লাভটা দেখা যাবে, তাই দিয়ে সে জন-সমাজে বড় বা ভাল বলেই পরিচিত থাক্‌বে। চোর চুরি ক'রে অপরকে তার জাঁক-জমকটাই দেখাতে চায়, কিন্তু কি ক'রে যে সে এই জাঁক্‌জমকের আয়োজনে সমর্থ হল, সেই ধনলাভের উপায়টা লোকলোচনের অন্তরালেই রাখতে চায়। জাঁক দেখিয়ে দশজনের একজন বা দশের সেরাই হতে চায় সে।

বাইরে এই জাঁক দেখানো বা যে কোনও বিষয়ে বড় হওয়াও সোজা কথা নয়, কোনও কিছু আয়ত্ত ক'রে তার উপর কর্তৃত্ব কর্‌তেও কম শক্তির প্রয়োজন হয় না, সেজন্য বহু সাধনা চাই। মানুষের যে ক্ষুদ্র শক্তি, তাতে এ জগতের যে কোনও কিছু আয়ত্ত কর্‌তে হলেই সবখানি প্রাণ দিয়ে সবটুকু শক্তি নিয়োগ কর্‌তে হয়। তাই সকলের শক্তিতে সব কুলোয় না। আপ্রাণ চেষ্টা করেও সবাই এ জন্মে সব হতে পারে না। তাই জগতের যে বিষয়ের উপর যে যতখানি অধিকার স্থাপন কর্‌তে পারে, সবাই তাকে সে বিষয়ে ততখানি উচ্চ আসন দিয়ে থাকে। এই উচ্চ আসনের লোভেই মানুষ না করে এমন কাজ নাই। কিন্তু সব চেয়ে যা একান্ত নিজের, সেই মনটাকে আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌লে মানুষ সব চেয়ে উঁচু আসন দখল কর্‌তে পারে। তাই ভক্ত কবি তুলসীদাস গেয়ে গেছেন—

> রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা হয় জয়ী।
> আপন মন্‌কা জয়ী যোই, সবকা সেরা ওই॥

—রাজা রাজ্য জয় করেন, যোদ্ধা যুদ্ধে জয়ী হয়, (এরা সবাই প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু) যিনি আপন মনকে জয় কর্‌তে পারেন, তিনি সবার শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহ'লে কি হয়, মানুষ বাইরের জৌলস ছাড়তে চায় না। আপন মনের বেগ দমন ক'রে তার কর্ত্তা হলে কি হবে? তার চেয়ে বরং মন যা চায়, তাকে তাই দিয়ে ক্রমশঃ সে যাতে জগতে ধনে-মানে বড় ব'লে পরিচিত হয়, তাই কর—এই হল ভোগবাদীর মত। তাঁরা বলেন, কেবল 'ত্যাগ' 'ত্যাগ' ক'রে মনটাকে নিজের মাঝে গুটিয়ে নিয়ে বাইরের জগৎটাকে তুচ্ছ করাতেই আজ ভারতব সী বিশ্বের দরবারে এত ছোট আসন পেয়েছে। আর বাইরের জগৎটাকে আঁকড়ে ধরেই পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

কথাগুলি আপাততঃ যুক্তিযুক্তই মনে হয়, কিন্তু অনুধাবন করলে বুঝা যাবে যে ভারতের এই হীনাবস্থার কারণ সত্যই ত্যাগ বা সংযম নয়। বরং এখনও যদি গর্ব্ব করার ভারতে কিছু থাকে, তবে তার এই ত্যাগ-সংযম বা আধ্যাত্মিকতাই। তবে তার এই অধঃপতনের কারণ কি? তার কারণ ত্যাগ-সংযম বা আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে ভারতের বর্ত্তমান ভ্রমপূর্ণ ধারণা। ত্যাগ-সংযম বল্‌তে যে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকা নয়, মনকে আয়ত্ত করা অর্থে যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কুঁড়ের বাদ্‌সা হওয়া নয়, একথা অনেকেই বোঝে না। অনেকেই ত্যাগ বল্‌তে সাত্ত্বিকতা ও একাগ্রতার সাধনা—এই অজুহাতে ঘোর তামসিকতা ও নিদ্রা ভাবাপন্ন মহা জড়তায় আবৃত হয়ে পড়েন। আধুনিক অধ্যাত্ম পথের পথিক হাজার হাজার লোক এই পথে গিয়ে দেশ শুদ্ধ লোকের ধারণা উল্টে দিচ্ছেন। যে ত্যাগ-সংযমের পুণ্য মহিমায় দেশে কত অসাধ্য সাধন হয়ে গেছে, আমাদের মত

অনধিকারীর আদর্শে তা আজ সাধারণের কাছে অশ্রদ্ধার বিষয় হয়ে পড়েছে। মনকে আয়ত্ত করে যে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করার শক্তি লাভের পরিবর্ত্তে, কর্ম্মে অদম্য উৎসাহ সঞ্চারের পরিবর্ত্তে মনকে একাগ্র কর্‌তে গিয়ে আমাদের আস্‌ছে মহা-ঘুম, প্রতি কর্ম্মে অক্ষমতা, নিতান্ত নিরুৎসাহ, ঘোর জড়তা, ভয়ানক তমঃ।

কিসে এই অবসাদ দূর হয়—নিস্তেজ মন আবার সতেজ ভাবে পূর্ণ হয়? তমোর পরে রজো গুণের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। স্বাভাবিক ভাবেই তাই দেশে এই তমোর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়েছে। চারদিকে কেবল অসন্তোষ—শুধুই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই অসন্তোষ একদিকে অবশ্য ভাল, কারণ, ভিতরে অভাব বোধ হইলেই তা পূরণের জন্য চাতকের মত তৃষিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ ওঠে এবং ক্রমশঃ ভগবৎকৃপা বর্ষণ হয়ে সমস্ত পূর্ণ হয়। কিন্তু তমোর পরে রজোর যেমন শীঘ্র আবির্ভাব হয়, রজোর পরে সত্ত্বের তেমন হয় না। অনেক সময় রজোর অস্থির ছটফটানির পর আবার একটা ক্লান্তি বা অবসাদ আসে। রজোর পর তমঃ এবং তমোর পর পুনরায় রজঃ; এইভাবেই বহুদিন চলে। তাই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকেই জীব বারবার যাতায়াত করে, তদূর্দ্ধে ক্রমশঃ সত্ত্বের আশ্রয়ে অন্যান্যলোকে অব-স্থানের মত চিত্তবিকাশ ঘটে না। তাই তমোর পরে স্বভাব বশে রজোর আবির্ভাব হলেও, তার মনে পুনরায় তমোর বিকার না ঘটে যাতে সত্ত্বের বিকাশ হতে পারে, সেই চেষ্টা চাই। তমোর পরে স্বাভাবিক ভাবে যে ক্রমশঃ রজঃ এবং সত্ত্ব আস্‌বে, সে সাত্ত্বিক ভাব যে কতদিনে হবে, তার ইয়ত্তা নাই। স্বভাব বশে প্রতি বালুকণার মত আজ যা আপাতদৃষ্টিতে জড়, তাও ক্রমোন্নতির পথে গিয়ে একদিন ব্রহ্মভাবে পূর্ণ হবে। কিন্তু সে যে কত-দিনে হবে, তা নির্দ্দিষ্ট নাই। রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, সবাই খেতে পায় বটে, কিন্তু কেউ বেলা দশটার সময়ে, কেউ বা বেলা চারটার সময়ে। এই বেলা দশটার সময়ে অর্থাৎ শীঘ্র যাতে জীবনের সেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি ঘটে, তারই জন্য চাই সাধনা।

সাধনার সুরু হবে একান্ত আকুলতায়। আকুল-ভাবে চাইলে পরে আজ না হয় কাল আমি সফল-মনোরথ হবই হব। আজ যা আমার একান্ত কাম্য, অথচ নানা প্রতিবন্ধক বশতঃ পাচ্ছি না, আমার মনের একান্ত আকর্ষণে সমস্ত বাধা বিনির্ম্মুক্ত হয়ে কাল তা আমার কাছে আস্‌তে বাধ্য। তাই পাতঞ্জল বলেন, "তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ।" আসন্ন সিদ্ধি হবে কার? যার মনে তীব্র সংবেগ রয়েছে। যে জিনিষটাই চাই না কেন, যদি অমন একান্ত টান থাকে, তবে শত অনুপযুক্ত হউক না কেন, ক্রমশঃ যোগ্যতা আস্‌বেই। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, এমন একান্ত টান রজো এবং সাত্ত্বিক ভাবের লোকের পক্ষেই সম্ভব। তমোগ্রস্ত লোকের মনে এমন তীব্র জ্বালা বা আবেগ আসেই না। সেই জন্য চাই অভাববোধ। অভাববোধ তীব্র হওয়ার জন্যই সাংখ্যাদি যত শাস্ত্রের আলোচনা। মন যতই তমোগ্রস্ত হোক না কেন, তার মধ্যে অভাব বা দুঃখবোধ জাগ্রত হ'লেই তার প্রতীকার চিন্তা স্বাভাবিক। তাই সাংখ্য প্রথমেই বল্‌লেন—দুঃখ-ত্রয়ং-অভিঘাতাৎ-জিজ্ঞাসা। দুঃখত্রয়ের আঘাত থেকেই ক্রমশঃ কিসে তা দূর হবে সেই জিজ্ঞাসা ভিতরে জাগে। এই খানেই তমোর বিনাশ এবং রজোর বিকাশ হতে থাকে। তার পর ক্রমশঃ সত্ত্বের প্রকাশ এবং সর্ব্বশেষে গুণাতীতের অবস্থা আস্‌বে। কিন্তু প্রথমে চাই তমোগ্রস্ত মনকে উদ্বুদ্ধ করা। সাধু-সদালাপ বা সৎ আদর্শের প্রয়ো-জনই মনকে উদ্বুদ্ধ বা সুষ্ঠু পথে পরিচালনার জন্য।

যে ভাবে আমাদের দিন যাচ্ছে, তার মাঝে সে সব সুযোগ সব সময়ে হয় কি?

রামকৃষ্ণদেব তাই বল্‌তেন যে, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থাকৃতে হয়। যেমন দই পাততে হলে দুধকে নির্জ্জনে রাখতে হয়, তবেই সে দুধ জমাট বেঁধে দই হবে, তেমনি মনটাকেও জমাট বাঁধবার দরুণ নির্জ্জনে রাখতে হয়। দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের ভিতরে থেকে মন এমন ভাবে তদাকারকারিত হয়ে যায় যে, তখন মনের উন্নতি-অবনতি বোঝা বড় মুস্কিল হয়। এইজন্যই সংসার থেকে আল্‌গা করে মনটাকে দূরে থেকে দেখবার অভ্যাস চাই। তারপর শুধু দেখ্‌লেই চল্‌বে না, মনটাকে নিজের ইষ্টসিদ্ধির অনুকূলে গঠিত কর্‌বার জন্য একটা ধারাবাহিক প্রণালীতে চলা চাই। দিনতো কাটাচ্ছে সকলেই, সকলেই তো দেহ ধারণের জন্য আহারান্বেষণ, বিশ্রামার্থে নিদ্রা এবং সৃষ্টিধারা বজায় রাখার নৈসর্গিক প্রেরণায় পুত্রাদির মাঝে আত্মপ্রতিবিম্ব রেখে মরে যেতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির এই অধঃস্রোতের বিপরীত দিকে উজান বেয়ে চ'লে কয় জনা? কজনের ভিতর সেই অসাধারণ আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে? যাদের মাঝে জাগে, তারাই বল্‌বে—'এ সব ঐশ্বর্য্যরতন, আমার তোষে না রে মন—' এই গড্ডলিকাপ্রবাহে থেকে তার সুখ হয় না। এর চেয়ে বহু উচ্চে উঠবার দরুণ মন তার হাহাকার করে। তাই মন তার আর দশজন সাংসারিকের মত সংসারের নিত্যকর্ম্ম ঠিক ভাবে করে গেলেও সে তাতে তৃপ্ত হয় না। আধ্যাত্মিক পথে মনকে চালাবার জন্য ভিতরে একটা পৃথক ধারা তাদের চল্‌তেই থাকে। সেই ধারার সঙ্গে এই সাংসারিক কাজের কোনও অবিনা সম্বন্ধ নাই। এই সংসারের কাজের লাভ লোকসানের চেয়ে অন্তরের সেই পথের লাভ লোকসানে তাদের বিঁধে বেশী। তাই মনের উপর আধিপত্য থাকা তাদের একান্ত প্রয়োজন। যে যতটুকু পরিমাণে তা রাখতে পারে, সে তত উঁচুতে চ'লে যায়।

একটা কথা আস্‌তে পারে যে, কর্ম্মই বাসনার মূল, এবং বাসনাই কর্ম্মের মূল, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্ম বশতঃ মনে যে উচ্চ রাজ্যে প্রবেশের ইচ্ছা হয় না, এবং তদনুরূপ বাসনা ভিন্ন তেমন কর্ম্মও আমাদের আসে না। কাজেই এই আবর্ত্তের সীমা কি করে ছাড়ানো যায়? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মই আমাদের সব নয়, অথবা প্রারব্ধের মাঝেও যে শুধুই বন্ধনমূলক অবর কর্ম্মই সঞ্চিত থাকে, তা নয়। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলে এই জন্মে নূতন কর্ম্মের স্থানও রয়েছে এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের মাঝেও আধ্যাত্মিক পথের উন্নতিমূলক কতকগুলি কর্ম্ম থাকেই। কারণ, কোনও মানুষই কেবল পাপ কর্ম্ম করে কোনও জীবন কাটায় না। সৎ এবং অসৎ এই দুইরূপ কর্ম্মই প্রত্যেকের জীবনে অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেই জন্যই শত তমোতে ডুবে থাকৃলেও মাঝে মাঝে প্রাক্তন পুণ্যকর্ম্মের ফলে বিজলীঝলকের মত সকলের মনেই শুভ মুহূর্ত্তে উর্দ্ধজগতের আনন্দ-খেলে যায়। সেইগুলিকে ধরে থাকা চাই। মনের বাঁধন আগাগোড়া সব সময়ে আল্‌গা না রেখে আচার বা অভ্যাসের মাঝ দিয়ে তার উপর একটু একটু কর্ত্তৃত্ব করতে শিখ্‌তে হয়। তবেই এই সব শুভমুহূর্ত্তের ফলগুলি ধরা পড়ে এবং তা বেঁধে রাখারও সামর্থ্য জন্মে। সাধনা বল্‌তে আর কিছু নয়—এই মনকে বাঁধা। তীব্র বৈরাগ্য না-ই থাকৃল, এই আচার বা অভ্যাসই প্রকৃষ্ট সাধনা—সব কিছুর চাবি।

—অর্থ

———::(*)::———

ব্যাস-শুক সংবাদ †

—(:)—

হিমাচল বক্ষে স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী তটে রমণীয় বৃক্ষলতা সমাকুল একটী নিভৃত প্রশান্ত তপোবন। মহাভারত চন্দ্রমা পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আজ ইহারই একান্তে চিন্তাকুলিত চিত্তে উপবিষ্ট। এই তপঃক্ষেত্রে বসিয়া তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বেদবাণীসমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন, দুর্ব্বলাধিকারী ভবিষ্য ভারত সন্তানগণের কল্যাণার্থে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন গৌরব পরিপূরিত কত ইতিহাস পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার যাহাতে তাঁহার মহাদান অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া বিকৃত না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তিনি ত্যাগ-বৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান-ভক্তি সম্পদশালী এক পুত্ররত্নের কামনা করিয়া সর্ব্বলোকবিস্ময়কারী কত প্রচণ্ড তপস্যাও করিয়াছেন! তাহার ফলে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর গর্ভে এক মহাতেজস্বী সন্তানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমান্বয়ে আজ দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইতে চলিল, তাহার বহির্নিক্রান্তি আর ঘটিয়া উঠিতেছে না, মহামুনি ব্যাসদেবের দুঃখের ইহাই একমাত্র কারণ। ব্যাসদেবও ছিলেন গৃহস্থ; পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া তিনি গৃহস্থ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, আপন হাতে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবেন—তাঁহার মহাদান সৎপাত্রে ন্যস্ত করিবেন, এই ছিল তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বহুদিন চলিয়া গেল, আজ কাল করিয়া আর তাঁহার পুত্রমুখ সন্দর্শন ঘটিয়া উঠিতেছে না। তাই তিনি আজ বিষণ্নচিত্তে ব্যাকুল হৃদয়ে স্বীয় কপোলদেশে হস্ত সন্ন্যস্ত করিয়া মহাচিন্তায় নিমগ্ন।

ব্যাস-সহধর্ম্মিণীর গর্ভে যে সন্তান আজ দ্বাদশ বর্ষ অবস্থান করিতেছেন, তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ অসামান্য যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মহা ভাগবত শুকদেব। ব্যাসদেবকে এই প্রকার চিন্তাকুল অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"মহামুনে! দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল, তথাপি আমি বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছি না দেখিয়া আপনি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। চিন্তিত হইবারই কথা; কারণ সাধারণতঃ মনুষ্য সন্তান যে গর্ভাবাসে দশ মাস দশ দিন মাত্র অবস্থান করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, আমি সেস্থলে তাহার বহুগুণ সময় ব্যাপিয়া তথায় অবস্থান করিতেছি। হে মহামুনে! এ অবস্থান আমার স্বেচ্ছাকৃত—দৈবাধীন নহে জানিবেন। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে আমার স্মৃতি বিন্দুমাত্র লোপ পায় নাই, বহু বহু জন্মের ঘটনাবলী জীবন্ত হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আমি পূর্ব্বে ঘোরতর কুম্ভীপাক নরকেও নিপতিত হইয়াছি, কিন্তু এই গর্ভাবাসে আসিয়া যে যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, তাহার শতাংশের একাংশও তথায় ভোগ করি নাই—এ যন্ত্রণা যে চতুরশীতি সহস্র নরককুণ্ডের একত্রীভূত দুঃখ অপেক্ষাও লক্ষগুণ অধিক!"

"জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য, মৃত্যু হইলেই

† যোগোপনিষদ্ বর্ণিত আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত। —লেখক।

জন্ম নিশ্চিত; আবার জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই অব্যক্ত গর্ভযন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী! অতএব আমি এবার এই গর্ভগৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, যাহাতে পুনরায় আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, যত্নসহকারে তাহার উপায় বিধান করিব। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ার এমনি প্রভাব, ভূমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে উহা জীবকে অধিকার করিয়া বসে; তখন তাহার সমস্ত স্মৃতি লোপ পায় স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, অবিদ্যার বশে অবশের মত ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হয়। তাই আমি স্থির করিয়াছি, যদি কোন সময়ে বৈষ্ণবী মায়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে ক্ষণকালের জন্যও অপসৃত হয়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে এই গর্ভ হইতে বহির্গত হইব, নতুবা এই ভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াই সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিব।"

যে পুত্রের মুখ সন্দর্শনের আশায় ব্যাসদেব এতকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, বিষ্ণুমায়া অপসৃত না হইলে সে কদাচ ভূমিষ্ঠ হইবে না, স্বয়ং গর্ভস্থ পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি চিন্তাকুল ও শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুর কৃপা ব্যতীত এ বিষ্ণুমায়া অপসৃত হইবে না এই বিবেচনায় তিনি তখনই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া প্রযত্ন সহকারে বিষ্ণুর আরাধনা পূর্ব্বক যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও জগৎ হইতে মায়ার অধিষ্ঠান তিরোহিত হয়, এই উদ্দেশ্যে আকুল ভাবে তদীয় চরণে প্রার্থনা জানাইলেন। অতঃপর ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাসনা পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে ব্যাসদেব হৃষ্টচিত্তে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে যে ক্ষণে বিষ্ণুমায়া তিরোহিত হইল, সেইক্ষণেই শুকদেব গর্ভ হইতে বাহির হইলেন। দ্বাদশ বর্ষ তাঁহার গর্ভবাসে অতিবাহিত হইয়াছে, কাজেই এখন তিনি কিশোর; তপ্ত কাঞ্চনের মত তাঁর অঙ্গের লাবণ্য, জ্ঞান-প্রেমের অমিয় ধারা বিথারী তাঁর ঢল ঢল দুটী আঁখি, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ব্রহ্মতেজোদ্ভব স্নিগ্ধোজ্জ্বল তাঁর দীপ্তি! ব্যাসদেব এই রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার এতদিনের তপস্যা বুঝি সফল হইল। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ! শুকদেব গর্ভাবাস হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াই অরণ্যাভিমুখে প্রধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন। ব্যাসদেব সদ্যোজাত পুত্রের এই ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। শুকদেব পিতাকে মোহগ্রস্ত লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হে পিতঃ! আমি যে আপনার পুত্র এই জ্ঞানে আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন না, অথবা আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে আপনার স্নেহ-ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তজ্জন্য আমার প্রতি বিদ্বিষ্টও হইবেন না। আপনি সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ তত্ত্বদর্শী ঋষি; যদিও আপনাকে আমার কোন কিছু বলা শোভা পায় না, তথাপি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে আমার কয়েকটী কথা শ্রবণ করুন।

"মুনিবর! এই সংসারে আমি সহস্রবার জন্ম-গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জননী দর্শন করিয়াছি, অসংখ্য জনকের দর্শন পাইয়াছি, এবং অনেকবিধ বান্ধবকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেহ কাহারও স্থায়ী পিতা বা মাতা নহে, কেহ কাহারও স্থায়ী পুত্র বা কন্যা নহে, কেহ কাহারও স্থায়ী শত্রু বা মিত্র নহে। সকলই মায়ার বিজৃম্ভণ, মায়িক জগতের ক্ষণিক দৈহিক সম্বন্ধ মাত্র।

"যেরূপ ঘটগর্ভস্থ জলজন্তু ঘট মধ্যে ঊর্দ্ধোধঃ ক্রমে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই প্রকার আমিও অসংখ্যবার নানাবিধ তির্য্যগ্‌যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক

এই মনুষ্যলোকে গতায়াত করিয়াছি। কখনও মানুষ হইয়াছি, আবার কখনও বা তির্য্যগ্ যোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, এই ভাবে আমার জীবনের উপর দিয়া নানা যোনির লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে। আবার কালবশে অথবা শ্রীগুরু প্রসাদে জানি না এবার পুনরায় এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। বেদাদি শাস্ত্রে এই মনুষ্যলোক স্বর্গ বা অমৃতত্ব লাভের একমাত্র সোপান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি দেবতারাও মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও এই মানুষ-দেহ ধারণ করিতে হইবে। আর আমি সেই দেবদুর্ল্লভ মানুষ-দেহ পাইয়া মুক্তি সাধনে কি বিমুখ হইয়া থাকিব ?

"তাত! পূর্ব্বে আমি সুরধামে অপ্সরোগণ-সেবিত এবং নক্ষত্র, তারকা ও চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মি-মালায় দীপ্তিমন্ত হইয়া অবস্থিত ছিলাম। তথায় গন্ধর্ব্বাপ্সরোবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও পরিষেবিত হইয়া আমি যাবতীয় বাঞ্ছিত ভোগ সকল উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু যখন আমার তপোজনিত পুণ্য ক্ষয় হইল, তখন আমি স্বর্গধাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় কীট, পতঙ্গ ও নানাবিধ তির্য্যগ যোনিতে ক্রমে ক্রমে জন্মগ্রহণ করিলাম। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মার্জ্জার, মহিষ, গো, অশ্ব এবং অন্যান্য দেহধারী প্রাণীরূপেও আমাকে দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে।

"পূর্ব্বে আমি অসংখ্য ঘোরতর নরক মধ্যে পচিয়াছি, মহাবল যমদূতগণ নানাবিধ শস্ত্রদ্বারা আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। আমি ঘোরতর সংসার ভয়ে ভীত ও রোগে-শোকে প্রপীড়িত হইয়া যমদ্বারে নিরন্তর জনন-মরণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। হে মহামুনে! দেহ ধারণ করিলেই দুঃখ কষ্ট অনিবার্য্য; কারণ শরীর অনিত্য, মৃত্যু ইহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, জরামরণ ইহার নিত্য সঙ্গী। সুতরাং এই অসার দেহের পরিচর্য্যা করিয়া কি করিব ?

"আমি এই সচরাচর ত্রিভুবন সমস্তই সন্দর্শন করিয়াছি, আর তাহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে জীব মাত্রেই প্রায়শঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সংসারে নিপতিত হয় এবং সংসার হইতে অন্ধতম নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। পুণ্য ক্ষীণ হইলেই জীব মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়, আবার মর্ত্ত্য সংসার প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাবশে মূঢ়তা প্রাপ্তিরূপ নিম্নগতি তাহার অবশ্যম্ভাবী।

"এ সংসার বিধিকর্ত্তৃক বিরচিত একটী গহন কানন সদৃশ, ইহা মায়ারূপ জালে পরিবেষ্টিত এবং দারুণ মোহরূপ কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। এবম্বিধ সংসারে বিচরণকারী মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সংসার ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক যোজিত যন্ত্রস্বরূপ। ইহা নিরন্তর ক্ষুৎ পিপাসা সমাকুল এবং রোগ, শোক, ভয় ও অনর্থের আকর। অনিত্যই ইহার উপাদান, অভাবই ইহার স্বভাব। যাহারা এই সংসাররূপ গহন কাননে পরিভ্রমণ করিয়া তুচ্ছ আনন্দ লাভের প্রয়াস পায়—তাহারা মূঢ়, যাহারা ইহার মায়াতে ভুলিয়া নিত্য বস্তুর প্রতি অনাদর প্রকাশ করে—তাহারা পশু। হে তাত! যাঁহারা তত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তাঁহারা কিন্তু দূর হইতেই এই সংসাররূপ ঘোর নরক পরিত্যাগ করিয়া পরম ব্রহ্মে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া থাকেন। অতএব হে পিতঃ! মনীষী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন এই সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, তখন আমি এই অসার সংসার পরিহার পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিতেছি বলিয়া আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে, এবং শোকমুক্ত হইয়া আমার অভীপ্সিত পন্থা রোধ করিবার প্রচেষ্টাও আপনার পক্ষে অসমীচীন।"

শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যে তাঁহার সদ্যোজাত পুত্রের মুখে এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিবেন, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এই বিস্ময়ের ভাব কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলে তিনি শুকদেবকে বলিলেন—"হে পুত্র! তোমার সঙ্কল্পিত বিষয় অতিশয় মর্ম্মন্তুদ, তোমার বাক্যাবলী তদপেক্ষা নিষ্ঠুর। তোমার এই অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার আমাদের প্রাণে কি পরিমাণ আঘাত দিতেছে, তাহা তুমি বুঝিবে কেমন করিয়া বৎস! পুত্র না হইলে কেহ পুত্রবাৎসল্যের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারে না, সুতরাং তুমিও আমাদের ব্যথা অনুভব করিতে পারিবে না। পিতা মাতার সেবাই যে পুত্রের পরম ধর্ম্ম তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রের উপদেশ, অথচ তুমি তাহা ব্যর্থ মনে করিয়া সংসার ত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছ, তোমার এ ব্যবহার নিতান্ত অনুপযুক্ত এবং সর্ব্বথা ধর্ম্ম বিগর্হিত। বৎস রে! ওই দেখ, যিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কত আকুল প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিয়াছেন, সেই তোমার জননী তোমার বিসদৃশ আচরণে বিষণ্ণান্তঃকরণে ধূলায় বিলুণ্ঠিত, আর তোমার পিতা —যিনি তোমার মত পুত্ররত্নের আশায় কত দীর্ঘকাল ধরিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছেন—সেই আমি তোমার নির্ম্মম ব্যবহারে তীব্রভাবে মর্ম্মপীড়িত। বৎস রে! পিতা-মাতার প্রাণে দুঃখ-বেদনার সঞ্চার করিয়া কে কোথায় ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিয়াছে বল দেখি? অতএব তুমি তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ কর, পিতা-মাতার সেবায় মন দাও, আদর্শ গৃহস্থ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হও, আমরা তোমার জনক-জননী—কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি তুমি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ কর।"

—৩৭ক

ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন—"পিতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন, তাহা হইলে আমার এই সঙ্কল্পকে নিশ্চয়ই আপনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

"মহারণ্য প্রদেশে বীজপূরক নামে একটী নগর বিদ্যমান আছে। তাহার পশ্চিম পার্শ্বে স্বচ্ছতোয়া মঙ্গলময়ী চন্দ্রাবতী নদী প্রবাহিতা; তাহারই পশ্চিম তীরে এক ভীষণ অরণ্য। পূর্ব্বজন্মে আমি ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই বনে গমন করিতাম এবং মৃগবধ করিয়া তাহা বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতাম। হে পিতঃ! এইরূপে ঐ অরণ্য মধ্যে প্রতিদিন গমন করিতে করিতে ক্রমে আমি সমস্ত বনই পরিভ্রমণ করি। একদিন সেই অরণ্যে বটবৃক্ষমূলস্থ আশ্রমে জনৈক ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্য আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। দেখিলাম, তিনি তদীয় শিষ্যবর্গকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতেছেন। তদ্দর্শনে আমি শ্রদ্ধান্বিত, আনন্দমগ্ন ও হর্ষপূর্ণ হইয়া বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সমস্ত তত্ত্বার্থ শ্রবণ করিলাম। পাপ-পুণ্যের বিচার, মায়া-মোহের কারণ নির্ণয়, বন্ধ-মোক্ষের প্রভেদ, এতৎসমস্তই আমি সেই আচার্য্য[প্রমুখাৎ শুনিতে পাইলাম। বহুদিন ব্যাপী অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালিলে যেমন নিমেষে সে অন্ধকার বিদূরিত হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন দিবার প্রকাশ ঘটে, উক্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া আমারও সেইরূপ অশেষ জন্মকৃত পাপরাশি বিলয়প্রাপ্ত হইল—হৃদয়াকাশে জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইল। আমি তৎক্ষণাৎ শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষান্তরাল হইতে বিনির্গত হইয়া আচার্য্য চরণে সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইলাম। আচার্য্যদেব আমাকে সস্নেহে উঠাইয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন; তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার

ত্রিতাপ দূরে গেল, তাঁহার অমিয় স্পর্শে আমার নব জীবন লাভ হইল। আমি আর গৃহে ফিরিলাম না, সংসার অনিত্য বোধে তদবধি ভিক্ষাভোজী হইয়া গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে তাতঃ! সেই সৎ কর্ম্ম প্রভাবেই আমি ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ লাভের অধিকারী হইয়াছি। সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি এই বর্ত্তমান জন্মে বিদ্যার সহিত যুগপৎ ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। অতএব হে মহামুনে! সংসার-বিতৃষ্ণ আমাকে সংসার প্রলোভনে প্রলোভিত করার প্রয়াস আপনার শোভা পায় না। দেখুন, এই মহাসাগর তুল্য ঘোর সংসারে নরজন্ম দুর্ল্লভ, তাহার উপর আবার সৎকুলে জন্ম সুদুর্ল্লভ; আবার তাহা অপেক্ষা জ্ঞানরত্ন লাভ করা আরও দুর্ল্লভ। বহু পুণ্যফলে এ জীবনে আমার মধ্যে ঐ ত্রয়ীরই সমন্বয় ঘটিয়াছে; অতএব এ শুভ সংযোগ হেলায় না হারাইয়া যাহাতে ইহার সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, সংসার ভুলিয়া যাহাতে পর-ব্রহ্মের ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতে পারি, তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে কি?"

পরাশরনন্দন মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অশেষ শাস্ত্রার্থ পারদর্শী হইয়াও শুকদেবের এই বাক্য শ্রবণে দুরত্যয়া মায়ার অনতিক্রমণীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দুঃখাতিশয্যে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন— "বৎস! জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় প্রস্থান করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তোমার বিরহে—তোমার অদর্শনে যে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। বৎস! যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার বাঞ্ছিত তপো-বনে তপস্যার্থ গমন কর, তাহা হইলে আমি আত্ম হত্যা করিয়া মরিব। তোমার মত পুত্র হারা হইয়া আমার জীবন ধারণে ফল কি?"

ব্যাসদেবকে এই প্রকার অধীর ও ব্যাকুল দেখিয়া শুকদেব জাগতিক সম্বন্ধের অসত্যতা ও নশ্বরতা প্রদর্শনেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— "পিতঃ! জন্মে জন্মে মানুষের সহস্র সহস্র জনক জননী ও শত শত পুত্র কলত্র হইয়া থাকে, সুতরাং কে কাহার বান্ধব? এত লোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর? এখন আমি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্বে জন্মান্তরে আপনিও আমা হইতে জন্ম ধারণ করিয়া-ছিলেন, ইহা আমি সত্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। এই প্রকার মোহ মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পুত্র হইতেও পিতৃগণ জন্ম ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব এ দৈহিক সম্বন্ধের নিত্যতা কোথায়? দেহও যেমন নশ্বর, এ সম্বন্ধও তেমনি নশ্বর। দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আপনি আজ যাহাকে পুত্র বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছেন—সেই আমার এই দেহ কি চিরন্তন? —কই, ইহার পূর্ব্বে তো ইহাকে দেখিতে পান নাই, আবার হয়ত শত বর্ষ পরে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পাইবেন না; তবে আর এ দেহের প্রতি এত মমতা কেন? আপনার পিতা তপোরাশি পরাশর মহা তেজস্বী ছিলেন, তথাপি তিনিও যখন মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হন নাই, তখন আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির আর কথা কি আছে? অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভৃগু, অঙ্গিরা, এই সকল মহাত্মারাও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়া-ছেন, তখন আমার এই অনিত্য দেহ কি এই নিয়মের ব্যতিক্রমী হইয়া নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইবে? মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, মাণ্ডব্য, গালব্য, শাণ্ডিল্য, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, গোপাল, গোলক

প্রভৃতি মুনি ঋষিগণও যখন মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য দেহের গতির কথা কি আছে? যম, যাজ্ঞবল্ক্য, জমদগ্নি, এবং অপরাপর রাজর্ষিবৃন্দও মৃত্যু পথের পথিক হইয়াছেন; যে সকল তপোধন অধঃশিরা, ঊর্দ্ধবাহু, বায়ুভুক্ ও জলমাত্র সেবী হইয়া তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারাও মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, অতএব আমারও এই অনিত্য দেহ যে কাল বশে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? রাজা বেণুধকুমার, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পুরূরবা, রঘু, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, নহুষ, দিলীপ, প্রভৃতি অসংখ্য বিচক্ষণ নরপতি এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলেই মরণ পথের পথিক হইয়াছেন; অন্ধক, মহিষ, কংস, বাণাসুর, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরবৃন্দ এবং ইন্দ্র, বরুণ ও কুবের প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ ইঁহারাও সকলে মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন; যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যমকিঙ্করগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ ইঁহারাও সকলে মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াছেন। মহাতেজা সুগ্রীব, মহাবল বালি, মহাবল হনুমান্, জাম্বুবান্, সুষেণ, অঙ্গদ এবং অন্যান্য মহাবীর কপিবৃন্দও মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছেন। বস্তুতঃ হে মহামুনে! এই চরাচরাত্মক অখিল বহ্মাণ্ডে আমি এমন একটীও প্রাণী নিরীক্ষণ করিতেছি না, যে অমরত্বের গর্ব্ব করিতে পারে! যেদিকে চাহিবেন, দেখিবেন শুধু মৃত্যুরই লীলা—মৃত্যুই সকলের চরম পরিণাম!

"জীবন যে অনিত্য, দেহ যে ক্ষণভঙ্গুর, কাল-বশে সকলকেই যে একদিন মৃত্যুর বশীভূত হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহের কোন হেতু আছে কি? উপরি উক্ত মহাত্মাদের নামোল্লেখই কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নয়? অতএব হে মহামুনে! এই অনিত্য দেহের উপর আসক্তি পরিহার করিয়া হাসিমুখে আমাকে বিদায় প্রদান করুন। সত্য-ধর্ম্মাশ্রয়ে সমুৎপন্ন আমি এখন সংসার-সাগরে ভীত হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গমনে উদ্যত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন অচিরেই আমি সফলকাম ও জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ করিতে পারি।"

এই সমস্ত উপদেশ অতিশয় সারগর্ভ হইলেও পুত্র বিরহাতুর পিতার নিকট অতীব ক্লেশদায়ক সন্দেহ নাই। তাই মহর্ষি ব্যাস শুকদেবের এই সমস্ত কথা শুনিয়া ভাবী পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; বাক্য দ্বারা তাহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কোন প্রকার মোহন আকর্ষণ দ্বারা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারা যায় কি না, তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ অমর-নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(বারান্তরে সমাপ্য)

দৃষ্টিপাতে

—(:০:)—

তুমি যখন হৃদয় খোল,
যায় খুলে মোর সপ্তদ্বার—
বিমুখ হলে তুমি, আমার
সকল জগৎ অন্ধকার।

কেউ দেখে না আমায় তখন
মোর চোখেও সব ধাঁধাঁ—
সকল হাসি লুকায় শুধুই
কেবল সার হয় যে কাঁদা!

বিজ্‌লী সাথে ভাব করে কি
এম্‌নি খেলাও রাত্রি দিন—
আস্‌বে কখন, যখন লুকাও
পাইনে কেন একটু চিন্‌?

জীবন-তরী এই দরিয়ায়,
আস্‌ছে যে ওই ঝড় হাওয়া,
কোথায় তুমি বন্ধু ওগো,
দেখাও বারেক সেই চাওয়া—

যেই আঁখিতে বজ্র সাথে
বিরোধ করেও জাগ্‌বে বল—
সুপ্ত আমার শক্তি, তোমার
দৃষ্টিপাতে হোক্‌ সফল।

মাহেন্দ্রক্ষণে

ধ্বনি রূপ উৎপন্ন করতে পারে। কাজেই মন্ত্রের দ্বারা দেবতার সৃষ্টি করা তো একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। তান্ত্রিকের মন্ত্রের খুব শক্তি আছে। মন্ত্রের ধ্বনিতেই রূপের সৃষ্টি হয়।

* * *

Emotion টাই প্রকৃতি। মেয়েরা চট্ করে যত সহজে মনের কথা বুঝে ফেল্‌তে পারে—পুরুষ তত সহজে পারে না। একটা ২০ বৎসরের মেয়ে আর ছেলেতে রাত দিন পার্থক্য। ছেলে তখন মনোজগতের কি জানে?

* * *

হৃদয়টাকে প্রশস্ত কর, তাহলেই তাতে যে তরঙ্গের বিক্ষোভ উঠবে, তা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে অনন্ত প্রশস্ততার মাঝে বিলীন হয়ে যাবে। নদীতে তরঙ্গ উঠে, কিন্তু নদীর প্রশস্ততার দরুণ তরঙ্গ নদীকে তোলপাড় করে তুল্‌তে পারে না। ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিক্ষোভ বড়ই যাতনা দেয়। মহাপুরুষ হলেও—দুঃখ-কষ্ট থাকে, কিন্তু সেই দুঃখ-কষ্ট তাঁদের মহান্ হৃদয়ের এক কোণে পড়ে থাকে—অর্থাৎ সেই দুঃখ-কষ্ট অতীব তুচ্ছ হয়ে যায় তখন। পরমহংসদেব এইজন্যই তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যের অনুরোধেও—ক্যানসার রোগমুক্তির দরুণ ৺মার নিকট প্রার্থনা করেন নি। বড় হওয়া মানে আর কিছুই নয়—হৃদয়টা প্রশস্ত হয়ে যায় তখন, আর মনটা সংস্কারমুক্ত উন্নত হয়ে যায়।

* * *

খারাপ চিন্তার radiate করবার ক্ষমতা নাই। তুমি যদি খারাপ চিন্তা কর, তাহলে তা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু উচ্চ চিন্তা স্বাভাবিকই radiated হয়—অর্থাৎ তা সমস্ত জগৎময় ছড়িয়ে পড়ে। তমোর ধর্ম্মই হ'ল সংহত হওয়া—আর আলোর ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হয়ে পড়া। খারাপ চিন্তা দূরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু তুমি যদি খারাপ লোকের সঙ্গ কর, তাহলে তার অসৎগুণ তোমার মাঝে সংক্রামিত হয়ে পড়বে। অসৎ লোকের চিন্তায় কিছু করতে পারে না, কিন্তু অসৎ লোকের সঙ্গ বড়ই অনিষ্ট করে। উন্নত চিন্তা দূর থেকেও প্রভাব বিস্তার করে। অজ্ঞাত কোনও প্রদেশের মানবের মনেও—অন্য দেশের কোন মহান্ পুরুষের উচ্চ চিন্তা বিদ্যুতের মত ক্রিয়া করে। চিন্তা যত pure হবে, তার radiating powerও তত বেড়ে যাবে। অসৎ লোকের চিন্তার কোন প্রভাব নাই—কিন্তু অসৎ লোকের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

* * *

World-power বলে একটা কথা আছে, আর তা বাস্তবিকই সত্য। শুদ্ধ আধার পেলে, দেশ কালের অপেক্ষা না করে, সেই শক্তি মানুষের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সত্য লাভ শুধু ভারতের ঋষিরা করেন নি। সব জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ গভীর ভাবে আলোচনা করলে জানা যায়, প্রত্যেক দেশেই আমাদের ঋষিদের মত ঋষি জন্মে ছিলেন।

* * *

Right imaginationএর একটা মূল্য আছে। আর imagination দ্বারাই আমরা অসীম ব্রহ্মকে ধরতে পারি, unlimitedকে ধরতে হলেই ima-

ginationএর দরকার। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা অসীম ব্রহ্মকে কিছুই জান্‌তে বা বুঝ্‌তে পারা যায় না।

* * *

প্রকৃতি যদি আমারই আত্মার বিকাশ হয়, তাহলে তার সঙ্গে fight করার তো কোন প্রয়োজন হয় না। বৈদান্তিক প্রকৃতিকে আত্মারই বিকাশ বলে মনে করেন—এইজন্যই বৈদান্তিকের প্রাণে প্রকৃতিবিদ্বেষ নাই। অন্যান্য সব দর্শনই নিজকে বড় ছোট মনে করে, বৈদান্তিকের 'আমি'র মাঝে সব কিছুরই স্থান আছে।

* * *

মহাপ্রাণের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব কর্‌লেই মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া গেল। মহাপ্রাণের সঙ্গে যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণের যোগাযোগ রয়েছে—এ কথাটা আমরা সব সময় মনে রাখতে পারি না, এইজন্যই মৃত্যুকে এত ভয়ের চোখে দেখি। ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ মহা সিন্ধুতে বিলীন হয়ে গেলে তাতে তো পরম শান্তিই। মহাপ্রাণই মুখ্য প্রাণ—সেই মুখ্য প্রাণের উপাসনা কর্‌লেই মানুষ নির্ভীক হতে পারে।

* * *

আমি সব চেয়ে concentrationকেই উচ্চে স্থান দিই। মনের যে একাগ্রতা বা ইচ্ছাশক্তির জোরে ভগবান্‌কে মানুষ অস্বীকার করে, সেই একাগ্রতাদ্বারাই আবার মানুষ তাঁকে স্বীকারও করে। ইচ্ছাশক্তির জয় গান করি আমি। মনের জোর আর একাগ্রতার শক্তি থাকলে—মানুষ চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেই পার্‌বে।

* * *

জীবনটাকে chaste না কর্‌লে সহজিয়া হওয়া যায় না। অনেক বাঙ্গালী সহজ সাধকেরই এত অধঃপতন এইজন্যই। সহজ সাধক ছিলেন রামকৃষ্ণ। দেহে-মনে-প্রাণে পবিত্রতা রক্ষা কর্‌বার দরুণ কি তপস্যাই না করেছিলেন তিনি!

* * *

"কাম দাবানল—রতি সে শীতল!" এই রতিই ভালবাসা—তাতে ভিতরটা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু কামে মানুষকে দগ্ধ করে। ভালবাসায় মানুষের উজ্জ্বল কান্তি ফুটে ওঠে। মনটা যতই স্থূলে নেমে আসে, ততই বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি। কিন্তু এই স্থূল মূলেরই প্রেরণা—এ কথাটা মনে থাক্‌লে এই স্থূল শরীরও বিদ্যুন্ময় হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব-তান্ত্রিকের কাছে এই স্থূল শরীরেরও বিশেষ মূল্য আছে। ভালবাসা দ্বারা শরীরের প্রত্যেকটা atom রূপান্তরিত হয়ে যায়। দিব্য-জ্ঞান তখনই লাভ হয়।

* * *

শব্দে প্রাণকে বেশী আকর্ষণ করে।

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মন-প্রাণ।

প্রথম শব্দ—তারপর স্পর্শ—তারপর রূপ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনেই পাগল। তারপর রূপে ভাবস্থ! আমরা অনেক সময় বলে থাকি—গানটা শুনে যেন সমস্তটা শরীর-মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বৈষ্ণবেরা একেই সাধুভাষায় কারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত স্নান বলে। স্নানে যেমন আমাদের সর্ব্ব শরীর শীতল এবং ঠাণ্ডা করে দেয়, তেমনি বায়ুর গুণ যে স্পর্শ তাতেও শরীর জুড়িয়ে যায়। এ স্নান বাহ্যিক স্নান নয়। একে দিব্যস্নান বলে, অন্তর সুশীতল করে দেয় এ স্নানে। এখন পূর্ব্বোক্ত পদটীর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আকাশের গুণ শব্দ—প্রথমে আকাশে ধ্বনি হল। সে ধ্বনি বায়ুতে বহন করে শ্রীরাধার কাণে এনে পৌঁছিয়ে দিল।

তাতে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ সে অনুভূতিও হয়ে গেল শ্রীরাধার। তারপর ফুটে উঠল রূপ। চিত্ত যতই সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—তৃপ্তিটাও তত্তই সূক্ষ্ম হয়। একের মাঝেই সব নিহিত। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মাঝেই যে সব দেখতে পেতেন—এর দরুণই তো বংশীধ্বনিতে শ্রীরাধার প্রাণ তন্ময় হয়ে যেত !

* * *

সন্তান হলেই ভালবাসাটা দু'দিকে চলে যায়। তাই গোপীর প্রেমে সন্তান নাই। সন্তান হলেই বাৎসল্য দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভাল-বাসা ছিল, তা খণ্ডিত হয়ে যেত। গোপীদের ভালবাসা একনিষ্ঠ—তাই তাঁদের সন্তান-কামনা নাই। কৃষ্ণপ্রীতিতেই তাঁরা একনিষ্ঠ।

* * *

প্রাণ-সংযমের বেশ সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিবেকানন্দ। প্রাণ-সংযম বল্‌তে বাইরের শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত তালে ফেলানোকেই বুঝায় না। প্রাণ-সংযম কি ? —না অনন্ত প্রাণের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া। একটা grand stream আর তার মাঝে যেন eddy—এই হল জীব। এখন জীব তো সেই grand streamএরই একটা অবস্থা ! কাজেই জীবনকে অনন্ত জীবনে মিশিয়ে দেওয়াই প্রাণ-সংযম।

* * *

কতকগুলো giant-brain আছে—ওরা অল্প সময়ে টক্ করে সব ধরে নিতে পারে। যেমন নেপোলিয়ান ছিলেন—এক মুহূর্ত্তে যুদ্ধের সমস্ত plan তাঁর চোখে ভেসে উঠত। আমাদেরও "প্রাতিভ-জ্ঞান" বলে একটা কথা আছে—কিন্তু তার কি একটা process নাই ? মনটা যদি তন্ময় হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ যখন যা জান্‌তে চাব, তা ছাড়া আর সব যদি স্তিমিত হয়ে যায়, তবেই তো সিদ্ধিলাভ। কাজেই এ তো বড় একটা কঠিন কথা নয়—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা সব আয়ত্ত লাভ করা যায়।

* * *

Reason সবকে পুড়াবে—সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দিবে—সবকে অগ্নিময় করে তুল্‌বে, কিন্তু শুধু পুড়াতে তো শান্তি নাই ! তাই emotion এরও প্রয়োজন। Reason এবং emotion—দুই-ই চাই।

* * *

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Let us sleep over a thing—কারণলোকে চলে যাই। দেহটা তো একটা result (aggregate) কাজেই locality of something. একটু স্থির হলেই এর process জানা যায়। চাই শান্ত-উপাসিত হওয়া, অর্থাৎ নির্ব্বৃত্তিক হওয়া। Processএর ভিতর দিয়েই তো resultএ এসে পৌছেছি—কাজেই process এর সংস্কার আমাদের ভিতরেই আছে। একটু শান্ত হলেই সব ভেসে উঠবে। পূরণের নাম্‌তা যদি আমার জানা থাকে, আর একজন আমায় প্রশ্ন করে ১২৫ কত এর গুণফল ? তাহলে আমি অনায়াসে বলে দিব—তিনটী ৫ এর গুণফলই ১২৫। দেহটা স্থির হলেও তার যে continuity তা আপনি ভেসে ওঠে—অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হয়। বৃত্তিশূন্য হওয়ার দরুণই তো যোগের এত কসরৎ !

* * *

Thought কথাটী thinking process কেও বুঝায়, আবার product of thoughtsকেও বুঝায়। তেমনি সমাধি বল্‌তে process কেও বুঝায়—আবার ফলকেও বুঝায়। এরূপ অনেক কথা

রয়েছে। সমাধি চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায়ও—আবার সমাধি চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফলও।

* * *

বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলের অর্থ কি ? না, relation with the world. কে বলেছে তিনি শূন্যবাদী ? তিনিও সব ছেড়ে ছুড়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জগৎকে ভালবাস্‌তেই হ'ল। বড় হওয়া মানে—সম্বন্ধ-সূত্রটা আবিষ্কার করা। প্রাণের যোগ না থাকলে কি বুদ্ধদেব একটা ছাগ শিশুর দরুণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিলেন ? বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই ব্যাপ্তি বোধটা জাগ্রত হয়।

—x—

রঘুনাথ দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এদিকে রঘুনাথ কিছুদিন পরে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টাটীও ছাড়িয়া দিলেন। ছত্রে যাইয়া ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্যে শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। রঘু কোথায় কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা করেন, ভক্ত-বৎসল মহাপ্রভু প্রায়ই সে সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতেন, অনুসন্ধান করিতেন। তিনি গোবিন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রঘু এখন আর সিংহদ্বারে ভিক্ষার নিমিত্ত অপেক্ষা করে না, ছত্রে গিয়া মাগিয়া খায়। অতঃপর মহাপ্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বরূপ ! রঘু এখন প্রসাদের জন্য সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না কেন ?" স্বরূপ বলিলেন—"সিংহদ্বারে অন্নের জন্য দাঁড়াইয়া লোকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা রঘুনাথ ভাল বলিয়া মনে করে না, তাই সে তথাকার আশা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে মধ্যাহ্ন সময়ে ছত্রে যাইয়া মাগিয়া যাহা কিছু পায়, তাহাতেই শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া বলিলেন—"রঘু অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছে, সিংহদ্বার ছাড়িয়া সে ভালই করিয়াছে, কারণ সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।"

ভিক্ষাবৃত্তির সহিত বেশ্যাচারের কেমন করিয়া তুলনা হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং স্বরচিত একটী শ্লোকে তৎক্ষণাৎ তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। যথা :—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি
অনেন দত্ত ময়মপরঃ।
সমেত্যত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥

অর্থাৎ এই একজন আসিতেছেন, ইনি কিছু দিবেন, ইনি দিয়াছেন, ইনি দিলেন না, আবার আর এক-জন আসিয়া দিবেন। এই প্রকার ব্যবহার যে রাজপথ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেশ্যাগণের কামলম্পট পুরুষদের জন্য প্রতীক্ষা করার সমতুল্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ বৈষ্ণবের পক্ষে এই-রূপ প্রতীক্ষা করা নিতান্তই ক্লেশকর ও অশোভনীয়। তাই আমাদের রঘুনাথও

———সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্ন কালে যাঞা॥
ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর ভরণ।
অন্য কথা নাহি মুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥

এখন আর রঘুনাথ অযথা কতকক্ষণ ধরিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কালক্ষেপ করেন না, ছত্রের যথা-লব্ধ ভিক্ষায় শরীর ধারণের ব্যবস্থা করিয়া তিনি দিবা-নিশি কৃষ্ণ-গুণগানে ব্যাপৃত থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের এতাদৃশ কঠোর বৈরাগ্যা-চরণ ও শুদ্ধা ভক্তিভাব সন্দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ রঘুনাথকে গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জাহার অর্পণ করিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে এই দুই অপূর্ব্ব বস্তু আনিয়া মহাপ্রভুকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন, তিন বৎসর কাল মহাপ্রভু এই অপূর্ব্ব ধন গোবর্দ্ধন শিলাটী কখন মাথায়, কখন নাসায়, কখন চক্ষে, কখনও বা বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইতেন, তাঁহার নয়ন জলে নিরন্তর তাহা পরিসিক্ত হইত। আর যখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে উপক্রম করিতেন, তখনই ঐ গুঞ্জাহার গলদেশে পরিধান করিতেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাপ্রভু মালা ও শিলার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে সেই প্রাণপ্রিয় মালা ও শিলা রঘুনাথকে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"রঘুনাথ! এই শিলা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ; তুমি আগ্রহ সহকারে ইহার সেবা করিবে, সাত্ত্বিক ভাবে ইহার পূজা করিবে, তাহা হইলে অচিরেই তুমি এই সেবা পূজার ফলরূপে কৃষ্ণপ্রেম-ধন প্রাপ্ত হইবে।. এখন সাত্ত্বিক পূজার বিধি শুন।—

এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক পূজা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥"

রঘুনাথ মহাপ্রভু প্রদত্ত এই পুরস্কার পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। স্বরূপ একটী জল রাখিবার কুঁজা, পূজার পিঁড়ি, এবং এক বিতস্তি পরিমিত দুইটী বস্ত্রখণ্ড পূজোপকরণস্বরূপ রঘুনাথকে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তার পর—

আনন্দেতে রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা কালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

তিনি দেখিলেন তাঁহার পূজ্য বস্তুটী শিলা নয়, দ্বিভুজ মুরলীধারী স্বয়ং ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যে শিলা তিন বৎসর কাল শ্রীমন্মহাপ্রভু বক্ষে চক্ষে মাথায় নাসায় ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইতেন, যে শিলা কত দিবস-রজনী তাঁহার প্রেমাশ্রুতে বিধৌত হইয়াছে, সেই শিলা তিনি স্বয়ং রঘুনাথকে শ্রীকৃষ্ণ কলেবররূপে প্রদান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা রঘুনাথের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জল তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥

রঘুনাথ প্রভুর স্বহস্ত প্রদত্ত গোবর্দ্ধন শিলার সেবা পূজা করিয়া আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়া চলিলেন; তাঁহার পূজোপকরণ মাত্র তুলসী মঞ্জরী আর এক গণ্ডূষ জল, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার পরম তৃপ্তি!

এই ভাবে কিছু দিন গেলে পর স্বরূপ রঘুনাথের সেবার জন্য আর একটী উপকরণ সংযোগ করিয়া দিলেন। তিনি রঘুকে প্রতি দিন অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশদ্বারা সেবার আদেশ করিলেন। কিন্তু এদিকে রঘুনাথ তো নিঃস্ব। কাজেই স্বরূপই কৃপা-পূর্ব্বক গোবিন্দদাসের উপর এই খাজা সন্দেশটুকু সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার ভার অর্পণ করিলেন।

মহাপ্রভু গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান কালে রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন—

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম ধন॥

কিন্তু এই মালা ও শিলা দানে ভাবগম্ভীর মহাপ্রভুর ইহা ব্যতীত আর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। শুদ্ধ হৃদয় রঘুনাথের এই মর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি বুঝিলেন—

শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জা মালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে ॥

তিনি বুঝিলেন—গুঞ্জা মালা দিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীরাধার চরণে অর্পণ করিলেন, আর গোবর্দ্ধন শিলা দিয়া ইঙ্গিতে গোবর্দ্ধনে আশ্রয় গ্রহণের আদেশ করিলেন। প্রত্যুতঃ আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে এই কথাগুলির সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিব না।

রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর অতি বলবতী কৃপা ও স্নেহপ্রবণতার পরিচয়—স্বরূপ দামোদরের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ এবং গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান। রঘুনাথ স্বয়ং স্বরচিত চৈতন্যস্তবকল্পতরুতে মহাপ্রভুর এই পরম দয়ার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

মহা সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন শিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥

অর্থাৎ যিনি পতিত আমাকে কৃপা পূর্ব্বক কামিনী-কাঞ্চন হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি প্রীতি-সহকারে কুজন আমাকে আপন বক্ষঃস্থিত গুঞ্জাহার এবং প্রিয়তম গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন।

স্বরূপ দামোদরের চরণোপান্তে অবস্থান করিয়া রঘুনাথ একদিকে যেমন কঠোর বৈরাগ্য ব্রতাচরণের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন, অপর দিকে সেইরূপ ভজন নিষ্ঠারও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অহর্নিশ গৌরাঙ্গ চরণ চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাঁহার বৈরাগ্যের কথা পাষাণের গায়ে খোদিত হইয়া যেন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এখনও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চৈতন্য চরিতামৃতকার সংক্ষেপে তাঁহার এই তীব্র বৈরাগ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড সেহো নহে কোনদিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিণ্ডাকানি কাঁথা বিনু না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন ॥
প্রাণ রক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা যাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ বচন ॥

চরিতামৃত বর্ণিত এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই পাঠক তাঁহার বৈরাগ্যের গুরুত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতঃপর রঘুনাথ ভিক্ষাবৃত্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যে উপায়ে জীবন ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা একাধারে যেমন অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়প্রদ, কোটীপতি পিতার সন্তানের পক্ষে তাহা অচিন্তনীয়!

পুরীর পসারীদিগের মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। তখনও তাহারা সেই প্রকার করিত। তবে দুই তিন দিনেও যে প্রসাদ বিক্রীত হইত না, যাহা পর্য্যুষিত ও দুর্গন্ধসংযুক্ত হইয়া আহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইত, পসারীরা অগত্যা তাহা সিংহদ্বারে গাভীদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দিত। পচা গন্ধে তৈলঙ্গী গাভীগণও সেই পর্য্যুষিত প্রসাদ খাইতে পারিত না। কিন্তু আশ্চর্য্য! রঘুনাথ রাত্রিকালে সেই প্রসাদ ঘরে আনিয়া জল দিয়া ভাল করিয়া ধৌত করিতেন, এবং উহার মধ্য হইতে যে দৃঢ় মাজি ভাত বাহির হইত, তাহাই তিনি একটু লবণ সংযোগে মহাতৃপ্তির সহিত অমৃত তুল্য মনে করিয়া আহার করিতেন।

একদিন স্বরূপ রঘুনাথকে এইরূপ প্রসাদ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া আপনা হইতে যাচিয়া তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করিলেন এবং মহা পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বলিলেন—"রঘুনাথ! তুমি প্রতিদিন একাকী এই অমৃত ভক্ষণ করিতেছ, অথচ আমাদিগকে এ বিষয়ে বিন্দু বিসর্গও জানাও নাই, এ তোমার কেমন রীতি?"

রঘুনাথ যখন আর একদিন এই প্রকার প্রসাদ ধৌত করিতেছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু গোবিন্দ-দাসের মুখে এই সব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া স্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন—

"কাঁহা বস্তু খাও সভে, আমায় না দাও কেনে?"

'আমি শুনিতে পাইলাম, তোমরা অতি অপূর্ব্ব প্রসাদ ভক্ষণ কর, আমিই বা ইহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন?' এই বলিয়া তিনি রঘুর নিকট হইতে এক গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনার মুখে ফেলিয়া দিলেন। স্বরূপও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভু এক গ্রাস মুখে দিয়া আর এক গ্রাস তুলিতে যাইবেন, এমন সময়—

আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতে ত ধরিলা।
তোমার যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা॥

তিনি বলিলেন—"ওগো প্রভু! এ প্রসাদ তোমার যোগ্য নয়, তুমি রাখ। তোমার এ ব্যবহারে ভক্তের প্রাণে যে ব্যথা পায়, তাহা কি বোঝ না?"

মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"কি কহিব—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে সুস্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

এই ভাবে মহাপ্রভু রঘুনাথের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভজনের একনিষ্ঠতায় সন্তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া রঘুনাথকে নানা ভাবে কৃপা করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে লইয়া নানা লীলার বিকাশ করিতে থাকিলেন। এই ভাবে রঘুনাথও শ্রীগৌরাঙ্গের পাদমূলে স্বরূপের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া কঠোর বৈরাগ্য ও ঐকান্তিক ভজন-নিষ্ঠায় নিরত থাকিয়া পরমানন্দে দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ যাপন করিলেন। রঘুনাথ ধন্য যে তিনি স্বরূপের মত গুরু লাভ করিয়াছিলেন, রঘুনাথ ধন্য যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা করামলকবৎ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

—×—

কর্ম্মের পথে

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

—হে হৃষীকেশ, ধর্ম্ম যে কি, তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহাতে যে আমার প্রবৃত্তি হয় না—আবার অধর্ম্ম যে কি, তাহাও ত আমি জানি, কিন্তু তাহাতে তো আমার নিবৃত্তি আসে না! আমার হৃদয়ে থেকে তুমি আমাকে যাতেই নিযুক্ত কর, আমি শুধু তাই করি। (যেমনটী তুমি করাও, তেমনটী আমি করি।)

শুনা যায় কথাটা দুর্য্যোধনের। খুব বড় কথা, গভীরভাবে অনুধাবনের যোগ্য এবং পরম ভরসার কথা। নিজের মনকে নিজে 'বালক' 'অবুঝ' বলে

দয়া করার বা ভোলাবার দুর্ব্বলতা এখানে নাই। ভাল মন্দ বুঝবার পরেও শুধু একমাত্র প্রবল মানসিক শক্তির অভাবে আমরা 'বলাদিব নিয়োজিত' হয়ে অনেক সময়ে অনেক কাজ করে বসি। কুকর্ম্ম বলে কেউ তখন সেই কর্ম্মসহ কর্ম্মকর্ত্তাকে অপাংক্তেয় করে রাখেন, আর কেউ বা অতি সৎ কর্ম্ম বলে প্রশংসা ক'রে যেন তাল গাছের মাথায় তুলে দিয়ে স্বর্গ পাইয়ে দিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু জ্ঞানীর কাছে এই নিন্দা প্রশংসার কোনও মূল্যই নাই। কারণ সাধারণ লোকে যাকে এই উভয় কর্ম্মের কর্ত্তা বলে থাকে, জ্ঞানী তাকে মোটেই কর্ত্তা বলেন না। তিনি জানেন—

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিগুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
> অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

—প্রকৃতির গুণ সমূহ দ্বারা সমস্ত কাজ করা হচ্ছে, অহঙ্কারে বিমুগ্ধ মানব তা না বুঝে 'আমিই কর্ত্তা' এমনি ভেবে থাকে। এমনি ভাবার দরুণই তাকে কর্ম্মের ভাল মন্দ উভয় ফলই ভোগ করতে হয়। যদিও সে শুধু শুভ ফলটাই বাঞ্ছা করে, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় অশুভ কর্ম্মও যখন করে, তখন বাধ্য হয়েই তাকে অশুভ ফলটাও ভোগ করতে হয়। শুভের সময় আমি কর্ত্তা সুতরাং শুভ ফলের ভাগী, আর অশুভ কর্ম্ম করে ফলের ভোগ সময়ে আমি অকর্ত্তা—তা হয় না।

> অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভম্।

সাধারণ অজ্ঞান জীব কুকর্ম্মের ফল ভোগের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে অনেক সময়ে আপন মনকে এই বলে বুঝ দেয় যে, আমি ত আর ইচ্ছা ক'রে কিছু করি নি, ভগবানের দ্বারা বা প্রকৃতিদ্বারা 'বলাদিব নিয়োজিত' হয়েই তো এমনটী করেছি, সুতরাং আমার আর দোষ কি? "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।" আমাকে যা করাচ্ছ তাই করছি। কথাগুলো শুন্‌তেও কিন্তু মন্দ নয়। প্রজ্ঞাবাদ—পণ্ডিতের মত কথাই বটে!

কিন্তু এর মাঝে এক জায়গায় ফাঁক রয়েছে। আপন মনে অনুসন্ধান করলে প্রায় সবাই সেই ফাঁকিটুকু ধরতে পারে। কিন্তু আপন মনকে চোখ ইসারায় বড় দরদের সঙ্গে সেই ফাঁকিটাকে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়। কাজেই মন বেচারী সেই আসল ফাঁকিটা গোপন রেখেই আপনার নির্দ্দোষিতা ও নিয়তির নিষ্ঠুর পরিণামের দুঃখের কাহিনীই গাইতে থাকে। কিন্তু মনের সেই বিনিয়ে কাঁদুনীকে ধমক্ দিয়ে, আপনাকে ও বাইরের জগৎকে ভুলাবার ব্যর্থ চেষ্টাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যদি বীরের মত আপন দুর্ব্বলতা সংশোধনের চেষ্টা করা যায়—তবে সেই জীবনেই হৃষীকেশের যথার্থ কৃপা হয়। এখন সেই ফাঁকটার কথা ধরা যাক্।

মানুষ সাধারণতঃই দুই স্তরের। এক হৃদয়-প্রবণ বা ভাবুক ভক্ত, আর অপর যুক্তি তর্কবাদী। কিন্তু আবার প্রত্যেকের মাঝেই কিছু না কিছু ভাব ও যুক্তি বর্ত্তমান থাকে। তবে যেটা বেশী প্রবল, সেইটে দিয়েই মানুষের স্তর নির্ণয় হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথমে যার ভিতর যেটা স্বভাবসিদ্ধ, সেইটে দিয়েই প্রথম সাধনা সুরু হয়, তার পর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শেষ ভূমিতে জ্ঞান-প্রেমের মধুর ঐক্যতানে জীবনের সঙ্গীত পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই যুক্তি তর্কবাদী জ্ঞানী ও ভাবপ্রবণ ভক্ত উভয়েরই কর্ম্মের ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়। নিছক্ জ্ঞান বা প্রেম নিয়ে কেউ আগাগোড়া জীবন কাটাতে পারে না। তাই কর্ম্ম যখন অপরিহার্য্য, তখন কি ক'রে তা শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ সুখ বা আনন্দের দিকে এগিয়ে যাওয়া

যায়, তা ভাল ক'রে জান্‌তে হবে। "কর্ম্মণোহ্যপি-বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" সেই গহন গতির মাঝে যদি আবার নিজের মনের ফাঁকি থেকে যায়, তবে যে বার বার জন্ম-মৃত্যুর গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে দুঃখের একশেষ হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? তাই বার বার সেই ফাঁকিটার কথাই আস্‌ছে।

সেই ফাঁকিটা হচ্ছে এই যে, আপনার প্রবৃত্তির প্রলোভনে সায় দিয়ে তাকে ভগবানের বা প্রকৃতির কাজ ব'লে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা। জ্ঞানীই হোক্ বা ভক্তই হোক্, আপন মনের নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই না ক'রে, নিজকে সংযত করার প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে যিনিই প্রথম হ'তে পরমহংস সাজেন, তারই পতন হয়েছে। নিজে নিজে প্রবৃত্তির পথে গড়িয়ে যাওয়াই প্রকৃতির বা ভগবানের ইচ্ছা হ'লে উর্দ্ধজগতের প্রেরণা বা গতি একটা থাকৃত না। যদি বল, তাও প্রকৃতিবশেই আস্‌বে—ভগবানের ইচ্ছায় স্বাভাবিক ভাবেই সে প্রেরণা একদিন জাগবে, তবে নিম্নজগতের এই হীন প্রবৃত্তি-জাত কর্ম্মের অশুভ ফল যখন ভোগ কর্‌তে হয়, তখনও আহা-উহু করে অস্থির হ'তে পার্‌বে না। তখনও সানন্দে সে অবস্থাকে বরণ করে নিতে হবে। নিজের মনের এই আনন্দকে অব্যাহত রেখে যদি হাসিমুখে সব সয়ে যেতে পার, তবে বুঝব যে তোমার ভগবন্নির্ভরতা বা প্রকৃতির কাজ জেনে নিরহঙ্কারিতা এসেছে। নতুবা ওসব যুক্তি কেবল পরকে ঠকাবার জন্যই—নিজের অতৃপ্তি দ্বারা নিজেই উহার অসারত্ব বুঝবে।

যে পথেই যাও না কেন, আনন্দের তারতম্য দিয়েই তার progress বুঝতে পার্‌বে। নিষ্কলুষ আনন্দের মত অপবিত্র আনন্দ মানুষকে বেশী সময় তৃপ্ত রাখতে পারে না। অপবিত্র মানেই অপূর্ণ ও অস্থায়ী। যে আনন্দ যত পূর্ণ ও স্থায়ী, তাই তত পবিত্র। পূর্ণ ও অটুট আনন্দ মিলে একমাত্র ব্রহ্ম লাভে বা ভগবান লাভে। আর সে পথে যেতে হলে প্রতিপদে চাই বীর্য্য ও আত্মসংগ্রাম। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' সে পথ। সাধারণে যেখানে অজ্ঞান-মূঢ় হয়ে কোনও দোষই দেখে না, বিবেকী আত্মজ্ঞানী সেখানে বহু দোষ বা আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে প্রবল বাধা সন্দর্শন করেন। এই ভাল-মন্দ বুঝবার জন্য, চিনে বেছে নেবার জন্য, সেই শুভ মঙ্গলের পথে চলার জন্য যেমন চাই একান্ত আগ্রহ, তেমনি চাই শক্তি সঞ্চয়ের প্রার্থনা। এই অশক্তির জন্য নিন্দা বা লজ্জা নাই। মানুষ মাত্রেই অপূর্ণ। বিশেষতঃ এ পথে যতই নিজের অহমিকার ধূম্র কালিমা বিদূরিত হবে, ততই উন্মুক্ত হৃদয়-গগনে শক্তির শুভ্র জ্যোতিঃর স্বপ্রকাশ হবে। এই স্বপ্রকাশ ভিন্ন কিছুতেই তাঁকে প্রকাশিত কর্‌তে পার্‌বে না। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগে-নৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

সেই স্বপ্রকাশ স্বয়ম্ভুকে আপনার মাঝে সন্দর্শন কর্‌তে হলেও চাই কর্ম্ম বা জ্ঞান ভক্তি দ্বারা চিত্তমল বিদূরিত করা। হৃদয়-দর্পণের কালিমা দূরীভূত ক'রে সেই স্বপ্রকাশের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য দুর্ব্বল আমরা তো দূরের কথা, অমিত তেজঃসম্পন্ন ঋষিরা পর্য্যন্ত আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করে গেছেন—

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়,
আবিরাবির্ম্ময়েধি,
রুদ্রং যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

—"ওগো আমায় অসত্যের মাঝ থেকে সত্যের দিকে নিয়ে যাও, আঁধার থেকে জ্যোতিঃতে নিয়ে চল, মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে টেনে নাও, আমার মাঝে আবির্ভূত হও তুমি—ওগো তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তা রুদ্ররূপে আমাকে নিত্য পালন করুক।" রক্ষা কর তোমার রুদ্র রূপকে প্রসন্ন ক'রে। আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার ভীষণ মূর্ত্তিকেই নিয়োজিত কর আমার রক্ষার্থ শাসন কার্য্যে। আমার প্রতি সদয় হয়ে তোমার রুদ্র মূর্ত্তিকে প্রসন্ন কর—কেবল এই নয়। তা কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হেতু তোমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিকে সহ্য কর্‌তে পারব না বলে বল্‌ছি। কিন্তু তুমি যদি সদয়ই হয়ে থাক, তবে তোমার প্রসন্ন মুখকেও রুদ্র করে আমায় শাসন কর—রক্ষা কর। তুমি যদি সদয় থাক, তবে তোমার রুদ্র মূর্ত্তিকেই বা ভয় কি? বরং আমার মধ্যে যে কামনা পিশাচী অহরহঃ আমার রক্ত পান কর্‌ছে, তাকে তুমি তোমার ঐ ভীষণ করাল চামুণ্ডা মূর্ত্তিতেই বিনাশ কর এবং এমনি ক'রে আমাকে রক্ষা কর। তোমার প্রসন্ন বয়ানে আমার ভয় নাই, তাই ছাড়ি ছাড়ি করেও কুপ্রবৃত্তিগুলি ছেড়ে উঠতে পারছি না—তাই আমার উপর প্রসন্ন হয়ে, যাদের সঙ্গে অহরহঃ যুদ্ধ করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ছি সেই আমার শত্রুদিগকে রুদ্র মূর্ত্তিতে বিনাশ ক'রে তুমি আমাকে নিত্য পালন কর প্রভু! তুমি দয়া না করলে আমি যে আমার সাথে আর পারি না।

সংগ্রামে প্রবৃত্ত বীর্য্যবান সাধকের এই হৃদয়-ছেঁড়া আকুল ক্রন্দনে দেবতার আসন না ট'লে পারে না। শক্তির সহস্রধারা আপনি নেমে আসে। এই শক্তিকে প্রসন্ন করে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য মানুষ-রূপে শ্রীভগবান পর্য্যন্ত তাঁর আরাধনা করেছিলেন, তাঁর পূজা করেছিলেন। শুধু একবার দু'বার নয়, যুগে যুগে অজস্ররূপে এমনি শক্তি-আরাধনা, শক্তি-পূজা হয়। সুতরাং এতো দুর্ব্বলতা নয়—বরং সবল হৃদয়ের উন্নততর শক্তি লাভ। জগজ্জোড়া শক্তির কত লীলাই তো চল্‌ছে, তার মাঝে কত জন কত ক্ষুদ্র শক্তির আরাধনায় জীবন পাত কর্‌ছে, তার চেয়ে এই আত্মশক্তি লাভের প্রচেষ্টা বা প্রার্থনা নিন্দার্হ নয় কখনও। কিন্তু চাই একান্ত আকুলতা ও আপ্রাণ চেষ্টা। অন্য শক্তিলাভের কালে মানুষ সমানধর্ম্মী অনেক সাথী হয় ত পায়, এক পথের পথিক পেয়ে দীর্ঘপথ হলেও সুখে-দুঃখে একসঙ্গে চলায় তার বেদনাটা তত হৃদয়বিদ্ধকারী হয় না। কিন্তু এই গহন পথে সাথীও বড় মিলে না, তাই বড় দুঃখ, বড় নিরাশার সম্ভাবনা। তাইতো "দুর্গং-পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কিন্তু তবু চল্‌তে হবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধি নিয়ে। যে পথে চলেছি, এই পথেই আমার অভীষ্ট রয়েছে, ইষ্টসিদ্ধি না হলে সে পথ থেকে বিরত হবো না, তাতে এই জীবন যায় যদি তো যাক্ না, কত শত জন্ম জন্মান্তর তো কত ভাবেই কাটল, এবার না হয় এই নিয়েই কেটে যাক্—আমার এগিয়ে থাকার জন্য পথ তো কম্‌বে! তা ছাড়া এবারেই যে পথ শেষ হবে না, তাই কি নিশ্চয় করে কেউ বলেছে? তবে অন্ততঃ একজন এমন সাথী চাই, যিনি নাকি আমার চেয়ে পথ বেশ ভাল জানেন, এবং সময়ে-অসময়ে আমার ব্যথাতুর ভারাক্রান্ত হৃদয়-মনকে তাঁর পীযূষবাণীর অমোঘ শক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুল্‌তে পারেন—আমাকে নিয়ে চল্‌তে পারেন। তিনিই আমার গুরু! তাঁকে চিন্‌ব কি করে? এ রাজ্যের ভার নিতে পারেন ব'লে যাঁকে অন্তরাত্মা বিশ্বাস করান, প্রতি কথাটী যাঁর শত কঠোর হলেও তোমার কাছে অমিয় মাখানো, হৃদয়ছেঁড়া বাঁধনহারা হয়ে যাঁর

পায়ে প্রাণ তোমার লুটিয়ে পড়তে চায়, তাঁকেই তোমার পথের সাথী প্রাণের গুরু করো—তাতে ঠক্‌লেও ক্ষতি নাই। কারণ, তিনি যা-ই হোন, তোমার ভগবান তাঁর মাঝ দিয়ে তোমার কাছে প্রকট হবেন। মনে থাকে যেন—

"—তার চেয়ে কেহ আপনার নাই, আমি যারে ভালবাসি।"

অতখানি প্রাণের জোর থাক্‌লে আর "পথের কথা বলে দেবে কে আমাকে?"—বলে কাঁদতে হবে না। আমারই প্রাণের একান্ত আকর্ষণে টেনে আন্‌ব আমি আমার একান্ত মনের মানুষকে। আমার এই আকুলতা যদি সত্যিকার বস্তু হয়, তবে সাধ্য কি যে সে আমার পথে এসে ধরা না দিয়ে পারে? এই ভাবে তাঁর দর্শন হয় ত দুর্ঘট হয় না, কিন্তু দুর্ঘট হয় তাঁর বাণীতে হৃদয়ের সব সময়ে একান্ত টান। অনন্যমনা হয়ে সেই অমোঘ বাণীর অনুসরণ দুর্ব্বল হৃদয়ের কর্ম্ম নয়। তাই ভগবন্নির্ভরতা বা শ্রীগুরুতে বিশ্বাস বড় সোজা কথা নয়। যদি বল, তবেই তো, অতখানি সবলতা আমাদের মত দুর্ব্বল অধিকারীর কি হয়? তবেই মরেছ। বেশ জেনো "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আমি কি পার্‌ব—আমার কি হবে? —ইত্যাকার বিনয়বাণী অপরের কাছে নতি স্বীকারের পন্থা হলেও নিজের মনকে এই সংশয়ে আন্দোলিত হতে কিছুতেই দেবে না। জ্ঞান পতঞ্জলি কি বলেছেন? বলেছেন—"ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদ-আলস্য-অবিরতি--ভ্রান্তি-দর্শন--অলব্ধ ভূমিকত্ব--অনবস্থিতানি চিত্তবিক্ষেপাঃ তে অন্তরায়াঃ। ১-৩০।"

চিত্ত বিক্ষেপের কারণ এই অন্তরায়গুলি। তার মাঝে সংশয়ও একটী। বলিষ্ঠ চিত্তের এই একান্ত ইষ্টনিষ্ঠার পরও যদি "জানামাধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ" হয়, তবে বুঝব যে প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ 'বলাদিব নিয়োজিত' হচ্ছে। কিন্তু তবু "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" —অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই মনকে বশে নিতে হবে। "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" ত বটেই, কিন্তু তা বলে কেবল কাঁদলেই তো চল্‌বে না! হৃষীকেশ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বল্‌ছেন, তার জন্যও প্রয়াস চাই। তবু যদি না হয়, তবেই জ্ঞানী বল্‌বেন "প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—প্রকৃতি করাচ্ছে, নিগ্রহে কি কর্‌বে?" ভক্তও বল্‌বেন—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—যা করাচ্ছ, তাই কর্‌ছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংগ্রাম দ্বারা ততখানি জ্ঞান বা ভক্তির স্তরে উন্নত হওয়া চাই, তবেই তাঁর কৃপা হবে—নতুবা নয়।

ভালবাসার কথা

—(:০:)—

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ ভালবাসাতে জীবনের উন্নতি হয় কি না? উন্নতি-অবনতি বুঝিবার আগে ভালবাসা কি জিনিষ সেই সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা সঞ্চয় করিতে হইবে। অনেকেই ভালবাসা ভালবাসা করিয়া চিৎকার করে, কিন্তু ভালবাসা কাহার প্রতি হয়, কেনই বা হয়, সেই কথা তলাইয়া বুঝিবার মত সংযম এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে কয়জনার? হাঁ, ভালবাসায় জীবনের উন্নতি হয় বৈ কি? কিন্তু ভালবাসা যদি উর্দ্ধমুখী না হয় ভগবদভিমুখী না হয়, অর্থাৎ ভালবাসার পাত্র যদি স্থূল জগতের স্থূল বস্তু হয়, তাহা হইলে অনেকখানি সংযম শক্তি সঞ্চিত না হইলে, ভালবাসার পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। আমার প্রথম কথাই হইল, কাম থাকিতে প্রকৃত ভালবাসার সৃষ্টিই হইতে পারে না। কাম মানুষকে স্বার্থান্ধ করে, কিন্তু প্রেম সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দেয়। গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, চিরমুক্ত আত্মা কোন সঙ্কীর্ণ বন্ধনেই নিজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান না।

ভগবানের সৃষ্টি বিকৃত নয়, মানুষের বিকৃত রুচিই সংসারকে পাপ-পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ মানুষ কোন বস্তুরই প্রকৃত ব্যবহার জানে না। তারপর ভালবাসা subjectively এবং objectively দুই রকমেই হইতে পারে। জ্ঞানী ভালবাসে নিজকে—আত্মাকে, জ্ঞানীর ভালবাসা নিজকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভূত হয়, এইজন্যই নিছক নিজকে নিয়াই, আত্মাকে নিয়াই জ্ঞানী পরিতৃপ্ত। কোন কোন জ্ঞানী যে অপরকেও ভালবাসে. সেই ভালবাসা আর কোন কিছুর দরুণই নয়, ভালবাসার পাত্রের মাঝে তাহার নিজের আত্মার প্রতিবিম্ব কিম্বা আত্মাকে দেখিতে পায় বলিয়াই। কাজেই লক্ষ্যভেদে ভালবাসারও তারতম্য হয়। ভালবাসাকে যাঁহারা ভগবচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তঁাহাদের ভালবাসা দেহাতীত। এই দেহ-বোধ শূন্য ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। ভিতরে বিন্দুমাত্র কাম থাকিতে এই পবিত্র ভালবাসার উন্মেষ হয় না।

যাহাকে ভালবাসিবে সে যদি তোমার প্রাণে কামনা জাগাইয়া তোলে—তাহা হইলে বুঝিবে তাহার মাঝে নিশ্চয়ই অপবিত্রতা রহিয়াছে। চিত্তের এই অপবিত্রতা লইয়া কেহই কাহাকেও প্রকৃত ভাবে ভালবাসিতে পারে না। প্রাকৃত ভালবাসায় যাহারা বিমুগ্ধ, তাহারা অপ্রাকৃত ভালবাসার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবে কেমন করিয়া?

উভয়ের চিত্তের গতি উর্দ্ধমুখী না হইলে ভালবাসাতে জীবনের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হয়। সহজীয়া সাধকের অধঃপতন হয় অনেক সময় এই জন্যই। জীবনটাকে অনাঘ্রাত ফুলের মত সৌন্দর্য্যশালী না রাখিতে পারিলে, সেই জীবন দিয়া কোন উন্নত ধরণের কাজ হয় না। যৌবনে আমরা সত্যস্বরূপকে ভুলিয়া গিয়া আপাততঃ সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়ি, এইজন্যই যৌবন-অন্তে অনেক মানুষেরই কি দুঃখময় পরিণাম দেখা যায়!

জীবনের স্রোতকে উর্দ্ধমুখী প্রবাহিত করিতে পারিলেই দিব্য জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রকৃত ভালবাসায় মানুষ এই দিব্য-জীবনেরই সন্ধান পায়। এইজন্যই ভালবাসার পথে যাহারা জীবনকে উন্নত করিতে চায়, তাহাদের প্রথম সাধনাই হইল জীবনের নিম্নাভিমুখী বৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা। শক্তি যাহাতে নিম্নগামী পথের দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হইয়া উর্দ্ধগামী হইতে পারে, এইজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-সংযম-চেতনা থাকা চাই, দিব্য-জীবন লাভের যাত্রী যাঁহারা—তাঁহাদের জীবন সাধারণের সঙ্গে অনেক বিষয়েই হয়ত খাপ খাইবে না, তাহার জন্য আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

বিবাহিত-জীবনে এই পবিত্র ভালবাসাই ছিল একদিন আদর্শ। এইজন্যই নিছক ভালবাসাতেই দেখি অনেকের মাঝে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর কথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। তাঁহারা সংসার করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানী—ইহা সম্ভবপর হইল কেমন করিয়া?

ভালবাসার পাত্রের মাঝে ভগবানকে জাগ্রত করিয়া তুলাই হইল ভালবাসার চরম-পবিত্র আদর্শ। নিজের আত্মাকে দৃশ্য জগতের মাঝে প্রত্যক্ষ করাই হইল ভালবাসার মূল তাৎপর্য্য। ভগবানকে দেখিতে হইলে—দেহটাকে পবিত্রতা দ্বারা ভগবানের মন্দির করিয়া তুলিতে হইবে। জৈব কামনা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ না হইলে—ভগবান সেই আধারে অবতীর্ণ হন না। প্রাকৃত জগতের মানবের মনে কি ভালবাসার সেই উন্নত আদর্শ রহিয়াছে? তাহা হইলে তো এই জগৎ কবেই ভগবানের রাজ্যে পরিণত হইয়া যাইত!

ভালবাসার পথ সহজ বটে; কিন্তু অন্তরের অপবিত্রতার দরুণ সেই সহজ পথেই বেশী করিয়া বিকৃতি প্রকাশ পায়। সমস্ত বৃত্তিগুলি নিজের বশীভূত করিতে না পারিলে, স্থূল বস্তুর আকর্ষণে পতন অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই ভালবাসার পথ যেমন সহজ, তেমনি সহজ ভাবেই পতনও ঘটে। নিজের বৃত্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে না আনিতে পারিলে স্থূল বস্তুর সংস্পর্শে যাওয়াই অন্যায়। অবশ্য জগতে কামনাশূন্য পবিত্র আধারও যে না মিলে তাহা নয়, কিন্তু আদর্শ-ভালবাসার যোগ্য আধার খুবই বিরল।

ভালবাসার মূলে সংযম এবং তপস্যা থাকা চাই-ই। শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার মূলেই দেখি এই কঠোর আত্ম নিপীড়ন। তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা যদি কামনা-প্রসূত হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানুষ পূজা করিত কি না সন্দেহ। স্থূল-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব নিজের রুচি দ্বারাই ভগবানকেও বিচার করিয়া থাকে।

অন্ধ ভালবাসায় বিচারশক্তি লোপ করিয়া দেয়। ভালবাসায় যাহারা অন্ধ—তাহারা ভালবাসার মূল তাৎপর্য্য যে কি, তাহা বলিতে পারে না। প্রকৃত ভালবাসায় বোধশক্তিকে লোপ করিয়া দেয় না। ভালবাসা খাঁটী হইলে নিজের জীবনের উন্নতি সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধিতে ফুটিয়া উঠিবে।

ভালবাসিতে গিয়া মানুষ আত্মার স্থলে দেহটাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। এইজন্যই দু'দিন পর ভালবাসার পথেও দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। মানুষ দেহকে চায় না—আত্মাকেই চায়, এইজন্যই দেহগত ভালবাসায় দু'দিন পরই বিরাগ দেখা দেয়।

ভালবাসায় যেখানে অধঃপতন দেখা দিবে, সেখানে নিশ্চয়ই কামের বীজ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইজন্যই এই সহজ পথের যাত্রী যাহারা তাহাদের অন্তরকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। মানুষ নিজে খাঁটী না হইয়া, অপরকে উদ্ধার করিতে গেলেই পরিণামে

এই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। নিজকে না বুঝিয়া ভালবাসার পথে পা বাড়ানোটা কখনও সমীচীন নয়। জীবনে একটা সুদৃঢ় ভিত্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত জগতের পানে তাকানোই উচিত নয়। অপরের জীবন উন্নত করিবার দরুণ ভগবানই রহিয়াছেন,—তাহার দরুণ সাধক যাহারা, তাহাদের মাথা না ঘামাইলেও চলিবে। তোমরা. সাধক—সর্ব্ব প্রকারে দেহ-মন-প্রাণের পবিত্রতা রক্ষা করাই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ভালবাসার পথকে আমিও সহজ বলি, কিন্তু এই সহজ পথ সকলের অনুকরণীয় নহে।
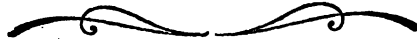
সঙ্গগুণ

—*—

পারিপার্শ্বিকের প্রভাব জীবনের উপর খুবই কার্য্যকরী হয়, এইজন্যই মানুষ সৎসঙ্গের দরুণ এত আকুল। এমনও মানুষ দেখিয়াছি, যাহার কাছে গেলে বিষয় বাসনার কথা ক্ষণেকের তরেও জাগ্রত হয় না, চিত্তে একটা অনাবিল প্রশান্তির স্রোত বহিয়া চলে। আবার কোন মানুষের কাছে গেলে দেখি আত্মজ্ঞান স্তিমিত হইয়া বিষয়-বাসনাই প্রবলাকার ধারণ করিয়া চিত্তকে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত করিয়া তুলে। কাজেই জগতে ভাল-মন্দ দুই ধরণের মানুষই রহিয়াছে। আত্মোন্নতি প্রয়াসী সাধক সৎ মানবের সংসর্গই করিবে।

সঙ্গগুণে ভাল-মন্দ উভয় দিকেই মানুষের মন প্রধাবিত হয়। ভালর সঙ্গে সঙ্গ করিলে ভালর দিকেই চিত্তের মোড় ফিরে। আবার মন্দের সঙ্গে সঙ্গ করিলে মন্দ দিকেই চিত্ত প্রধাবিত হয়। কাজেই ইচ্ছানুযায়ী মানুষ ভাল-মন্দ দুই দিকেই যাইতে পারে।

সাধারণের চিত্ত এতই বহির্ম্মুখী যে, তাহারা আত্মার খবরের চেয়ে দেহের খবরই বেশী রাখে। দেহবোধের চাপে তাহাদের আত্ম-চেতনা লোপ পাইয়াই যায়। এমন কি বিষয়ান্ধ হইয়া তাহারা আধ্যাত্মিক দিক বলিয়া যে একটা দিক আছে—তাহা স্বীকার করিতেই চায় না।

শাস্ত্রকারেরা সঙ্গগুণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এইজন্যই। সঙ্গগুণেই জীবনের উন্নতি হইতে পারে। মহৎ সঙ্গের একটা স্বাভাবিক প্রভাব আছে। কিছু না করিলেও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারের দ্বারাই জীবন উন্নত হইয়া যায়। যাঁহাকে দেখিলে ভগবানের কথা স্মরণ হয়, আধ্যাত্মিক প্রেরণায় চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠে, তিনিই বাস্তবিক মহৎ। এইরূপ মহৎ জনের সংস্পর্শে বাস্তবিকই আশাতীত ভাবে জীবন উন্নত হইয়া উঠে।

আজকাল যেরূপ পারিপার্শ্বিক পাওয়া যায়, তাহাতে চিত্তকে ভগবদভিমুখী একনিষ্ঠ রাখা বড়ই কঠিন। ভগবানের প্রতি দৃঢ়-মতি উৎপন্ন করিতে হইলে—তদনুকূলে নিয়ম সংযম নিষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক চলিতে হয়। পারিপার্শ্বিকের অসৎ চিন্তা বায়ু-

মণ্ডল পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া ফেলে। মুনি ঋষিরা এইজন্যই গিরিগুহাতে গিয়া আপন মনে সাধন-নিরত থাকিয়া সত্য লাভ করিতেন। আত্মহিত আগে, তার পর জগৎ হিত। নিজের জীবনের যে একটা কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় নাই, সে আবার অপরকে সত্যের—পথের সন্ধান বলিয়া দিবে কেমন করিয়া? গীতাতে আছে—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ॥

খারাপ লোকের সঙ্গ করিলে নিজের মাঝে যে সুপ্ত কামবৃত্তি রহিয়াছে তাহার জাগরণ হয়। এই-জন্যই বলা হইয়াছে সঙ্গ হইতে কামের সৃষ্টি। খারাপ মানুষের কথায়—সংসর্গে খারাপ দিকটাই জাগ্রত হইয়া উঠে বেশী করিয়া। এইজন্যই খারাপ লোকের সঙ্গ করিতে নাই।

পরস্পরের সাহায্যেই ভাল মন্দ উভয় দিকে আমাদের জীবন গঠিত বা অধঃপতিত হইয়া থাকে। ভাল লোকের সঙ্গ করিলে নিজের ভিতরের দৈবী বৃত্তিগুলিরই স্ফুরণ হয়, আর মন্দ লোকের সঙ্গ করিলে মন্দবৃত্তিগুলিরই স্ফুরণ হয়। সুতরাং জীবনোন্নতিশীল সাধকের অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরি-ত্যাজ্য।

পরমহংস দেব বলিতেন—"চারা গাছকে প্রথমে বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয়, পরে যখন বেশ বড় এবং শক্ত হইয়া উঠে, তখন বেড়া না দিলেও ক্ষতি হয় না।" তেমনি আমাদের জীবনেও একটা ক্ষতির সময় আছে—সে সময় সাবধান হইয়া অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিয়া না চলিলে জীবনের পরিণাম বিষ-ময় হইয়া উঠে। প্রয়োজন হইলে জগতের প্রতি বিমুখ হইলেই যদি আত্মোন্নতির সাহায্য হয়, তাহা হইলে জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। মোট কথা ব্যক্তিগত জীবন যাহার যে পথ অবলম্বন করিয়া উন্নত হয়, তাহার সেই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য—তাহাতেই তাহার প্রাণে শান্তি আসিবে। সংস্কার, রুচি প্রত্যেকেরই আলাদা সুতরাং সকলের পথ এক হওয়াও অসম্ভব।

মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতে গিয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন, যিনি ঠিক প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহাকে দেখিলেই ভিতরে কৃষ্ণনাম বা ভাবের স্ফুরণ হইবে। সাত্ত্বিক-অসাত্ত্বিক মানুষের চিনিবার ইহাই উপায়—অর্থাৎ সাত্ত্বিক মানুষ তিনিই, যাঁহার কাছে গেলে নিজের মন্দ দিকটা চাপা পড়িয়া গিয়া ভাল দিকটাই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে জগাই-মাধাইর জীবনেও এই পরিবর্ত্তনই দেখা গিয়াছিল। তাহাদের অতীত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির স্মৃতি মহাপ্রভুর অমিয় পরশেই মুছিয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংস্কার সবারই সমান নয়—সেইজন্যই সকলের অবলম্বনীয় পথ এক হইতে পারে না কিছুতেই। কিন্তু নিজের জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে জীবনের প্রথমে নিজকে একটু পীড়ন না করিলে যেন চলে না। নিজের সুযোগ সুবিধা স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিতে পারি না বলিয়াই তো আমরা ভোগী হইয়া পড়ি। এই সময় নিজের প্রতি একটু নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর হইলেই যেন আত্মোন্নতির পথে বিশেষ সাহায্য হয়।

আসল কথা হইল সত্যনিষ্ঠ হওয়া নিয়া। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা না থাকিলে জীবনের উন্নতির পরিপন্থী যাহা, তাহাই দৃশ্যে অদৃশ্যে আসিয়া মানুষকে ঘিরিয়া বসে। আমার জীবনকে অবনত-অধঃপতিত করে যে সব কথায়—যে সব দৃশ্যে—যে সব মানুষের সঙ্গে, সেই সব বিষয় নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর হইয়াই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদের প্রতি মায়া থাকাটাই অন্যায়। যদি থাকে তাহা হইলেই

বুঝা গেল সত্যের প্রতি অচল নিষ্ঠা নাই তোমার; ভোগের প্রতি দুর্নিবার লোভই রহিয়াছে তোমার —যাহাকে তুমি সংবরণ করিতে চাও না কিম্বা সংবরণ করিতে অক্ষম। মনুষ্যত্বের পথে উন্নীত হইতে হইলে, জগতের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অনেক বিষয়কেই নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে স্বাভাবিক জীবনের উল্টা—অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে চলিতে হইবে। আর উর্দ্ধে উঠিতে হইলেই—স্বাভাবিক অনেক কিছুকেই নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

জীবন গঠন করা বা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করাই হইল আসল কাজ বা কথা। মনের জোর থাকিলে হয় ত সংসারে থাকিয়াও তুমি সংসারের উর্দ্ধে বিরাজ করিতে পার, কিন্তু যাহাদের মনের বল ততটা নাই, তাহাদের নিজকে বিবিক্ত রাখিয়াই হয় ত জীবনকে গঠন করিয়া তুলিতে হয়। ইহা নিজের ব্যক্তিগত রুচি বা মনের বলের কথা। সর্ব্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে, মায়ার দরুণ তোমার moral degradation হইতেছে কি না, যদি হয় বুঝ, তাহা হইলে সেই মায়াকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে বৈ কি? এমন অনেক আকর্ষণ আছে, যাহাতে বাস্তবিকই জীবনের হিত বা কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে। যেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা বা প্রেম। ইহাতে জীবন উন্নতই হয়। এই সব পথের ভাল-মন্দ পরীক্ষা নিজের কাছেই। কেহ বা ভালবাসিয়া সংযমী হয়, আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নত হইতে থাকে, আবার কেহ কেহ ভালবাসিয়া দৈহিক আকর্ষণে মুগ্ধ বিস্মৃত হইয়া জীবনকে অধঃপাতের দিকে পরিচালিত করে। কাজেই এই সব রাগমার্গের পথের ভাল-মন্দ বিচার নিজের কাছে—অর্থাৎ নিজের বিবেক সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা চাই এবং সেই পথে ক্রমোন্নতির লক্ষণ ফুটা চাই। এইপথ এই-জন্যই কঠিনও আবার সহজও। কেন না দেখা যায়, আসক্তিতে অন্ধ হইয়া অনেক মানুষেরই ভাল-মন্দ বিচার শক্তি বা বুদ্ধিই লোপ পাইয়া বসে।

লোকের মন রক্ষা করিতে গিয়াও আমরা অনেক সময় নৈতিক-জীবনকে কলুষিত করিয়া ফেলি। লোকের মন রক্ষা করিতে গিয়াই অলক্ষ্যে অনেক মানুষ সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হয়। সত্য জিনিষটা রফার বিষয় নয়, অপরের মন রক্ষা করিয়া চলিলেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সত্য প্রত্যেকের মাঝেই সুপ্ত রহিয়াছে, সঙ্গ-প্রভাবে সেই অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতিই নজর পড়ে। জীবনে যখন মনুষ্যত্বই লাভ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে,—তখন প্রকৃত মানুষ যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গ করাই শ্রেয়ঃ। সঙ্গের প্রভাব বড়ই আশ্চর্য্য-জনক। সঙ্গের গুণে মানুষ স্বর্গলাভ করে, আবার এই সঙ্গ দোষেই মানুষ নরকে নিপতিত হয়।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুই দিন যাবৎ আমার জ্বর হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই জ্বর নিয়েই আজ খুব বৃষ্টিতে ভিজেছি। জ্বরের উপযুক্ত পথ্যও কচ্ছি বটে ; আমি বরাবরই প্রায় এইরূপ করে থাকি। রাতে এখানে যথেষ্ট শীতে কষ্ট পেতে হল, কারণ কম্বলাদিও ত ভিজে। মাঝে মাঝে কেমন সুখভোগ করতে হয়, সুধী পাঠক বুঝে দেখুন !

এখান হতে দুটী রাস্তা গিয়েছে। একটী রাস্তা বাম দিকে খাড়া চড়াই করে তুঙ্গনাথ যাবার, ডানদিকের অন্য রাস্তাটী বদরীনাথ যাবার। যাঁরা তুঙ্গনাথে না যান, তাঁরা ডানদিকের রাস্তায় চলে যান—সে পথে এই চটী হতে দেড় মাইল গেলেই ভুলকণা চটী—সেটী বদরীনাথের রাস্তা। আবার যাঁরা বামদিকের রাস্তায় তুঙ্গনাথ যান, তাঁদের এখান হতে তিন মাইল চড়াই করে তুঙ্গনাথে যেতে হয় ; আবার তুঙ্গনাথ হতে খাড়া উৎরাই পথে তিন মাইল এলে উপরোক্ত ভুলকণা চটী। এই চোপতা চটীকে তথা ভুলকণা চটীকে তুঙ্গনাথ যাবার জংশন বল্‌লেও চলে। তুঙ্গনাথ অতি কঠিন তীর্থ, প্রায় অনেক যাত্রীই এখান হতে তুঙ্গনাথজীকে প্রণাম করে পাণ্ডাজীর নিকট হতে প্রসাদাদি নিয়ে সীধা পথে ভুলকণা হয়ে বদরীনাথ যায়। আমরা কিন্তু আজ যেতে না পারলেও তথা উৎকট চড়াই হলেও আগামী কাল তুঙ্গনাথ দর্শন করতে যাব, স্থির করে নিলাম। রাতে অত্যধিক শীতের জন্য তথা কম্বলাদি ভিজে থাকার দরুণ খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল।

—৪১৭

১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, রবিবার—কাল সমস্ত রাত-দিন বারিবর্ষণ করেও ইন্দ্রদেবের কোপ কমে নি। সকালে উঠেই দেখি তখনও অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কি করা উচিত, নানা চিন্তায় পড়ে গেলাম। চটীটিও খারাপ—জলের ভীষণ কষ্ট ! সুতরাং বৃষ্টিতে ভিজেই এখান হতে রওনা হব স্থির করে বের হয়ে পড়লাম। আমরা ডানদিকের পথে না যেয়ে বামদিকের খাড়া চড়াই পথে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম। পথে আমাদের কতকগুলি ইন্দুর (মূষিক) দর্শন হল। পাণ্ডা মহারাজ খুব আনন্দের সহিত দেখালেন এবং বল্‌লেন, "এই লাঙ্গুলশূন্য ইন্দুর দর্শনে মহাপুণ্য হয়।" কি করি ? সবই বিশ্বাস করে যাচ্ছি। অগত্যা হাঁ-তে হাঁ মিলিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই করতে লাগলাম। বাস্তবিক পথে বল্‌তে আপত্তি নাই, আজ পর্য্যন্ত লাঙ্গুলহীন ইন্দুর দেখতে পাই নাই। অদ্ভুত দর্শন বটে ! ধীরে ধীরে বৃষ্টি কম্‌তে লাগলো—শীত বাড়তে লাগলো। অন্যদিকে সূর্য্যদেব কতটুকু পথ এগিয়েছেন, বুঝবার উপায় নাই—আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আছে ; ঘড়িটীও একদিন হাত হতে পড়ে যেয়ে দমশূন্য হয়ে গেছে। এদিকে ক্রমশঃ উপরের দিকে যাচ্ছি, খানিক উঠছি—দম বন্ধ হয়ে আসছে, তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকের মনোহর দৃশ্য দেখছি। পচালী পাহাড়ে আসার দিনও এমনি ভাবে অনেক দৃশ্য দেখে দেখে চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল; আজ এখানকার দৃশ্য যেন আরও সুন্দর !

পাঁচালীর পাহাড়ের চেয়েও যেন সুন্দর! আমরা ধীরে ধীরে চড়াই করতে লাগলাম, এবং আনন্দ-চিত্তে খুব দেখতে লাগলাম।

শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথ ৩ মাইল

ধীরে ধীরে চড়াই করে তিন মাইল এসে 'শ্রী'শ্রীতুঙ্গনাথ গ্রামে এসে পৌছলাম। অহো! এখানকার দৃশ্য কি সুন্দর!! ভাষার এমন কোন শক্তি নাই, যা এখানকার চারিদিকের দৃশ্য সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করতে পারে! এ যে প্রকাশ্য নয়!! এ যে অনুভবের বিষয়, তথা প্রত্যক্ষ দর্শন করে নিজের চর্ম্মচক্ষের মহাতৃপ্তির বিষয়। এখানকার দৃশ্যের কথা আর কি লিখবো? সে ভাষার অগম্য! ... ...সময় বুঝে সূর্য্য দেবও যেন অল্প সময়ের জন্য মেঘ-জাল অপসারিত করে আমাদের দর্শন দিয়ে আমাদের আনন্দ দান করতে লাগলেন, তথা চারিদিকের সুমনোরম দৃশ্য দেখাবার জন্য ব্যস্তে-সমস্তে এসে হাজির হলেন, অথবা কে জানে যে এটী শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথের দয়া নয়? হয়ত বা শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথ দেবই তাঁর চারি দিকের মনোরম দৃশ্য দেখাবার জন্য সূর্য্যদেবকে উদয় হতে আদেশ দিয়েছেন। এ দৃশ্য দেখবার সময় আমাদের শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথেরই আশীর্ব্বাদ বলে মনে হল। পাণ্ডামহারাজও ঘুরে ঘুরে চারিদিকের দৃশ্য দেখাতে লাগলেন। এখান হতে দূরে—অতিদূরে শ্রীশ্রীবদরীনাথের বরফাবৃত উচ্চ শিখর, শ্রীশ্রীকেদারনাথের বরফাবৃত উচ্চ শিখর, শ্রীশ্রীত্রিযুগী নারায়ণের বরফাবৃত উচ্চ শিখর, পাঁচালির পাহাড় আদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পর্ব্বতমালার শৃঙ্গগুলি দেখতে লাগলাম। উত্তরাখণ্ডের এ দিকটায় যতগুলি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে এই তুঙ্গনাথ সব চেয়ে উচ্চ স্থানে অবস্থিত। অধিকন্তু পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে তীর্থটি হওয়ায় চারি দিকের দৃশ্য অতি মধুর! কলিকাতার মনুমেণ্টের উপর উঠলে যেমন সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উঁচু নীচু ভাবে সুরম্য প্রাসাদ সকল দর্শকের চিত্ত বিনোদ করে থাকে, এ স্থান হতেও তেমনি ভাবে চারি দিকের দৃশ্য ঠিক সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতই পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গেলাম। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত আনন্দভরে দেখতে লাগলাম। মনে হল দূরবীন থাকলে হয়ত কলিকাতা, দিল্লী, সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখাও বোধ হয় কষ্টকর হত না। এখানকার এ হৃদয় আনন্দ-কারী দৃশ্য যিনি দেখতে পান নি, হয়ত তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন না; কাজেই তাঁরা হয়ত আমাদের কথা বিশ্বাসও করবেন কি না কে জানে? আমরা চারি দিকে ঘুরে ঘুরে এ মধুর দৃশ্য দেখতে লাগলাম, কোন সময়ে যে চড়াইয়ের জন্য যে পথ-শ্রান্তি হয়েছিল, তা অপসারিত হয়ে গেল, বুঝতেও পারি নি।

পূর্ব্বেই বলেছি এ দিকে যতগুলি তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে এই তুঙ্গনাথের মন্দিরটী সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। সমুদ্রস্থান হতে এ মন্দিরটী ১২০৭১ ফুট উচ্চ। এ শৃঙ্গটী চন্দ্রশীলা শৃঙ্গ বলে খ্যাত। এ স্থানের দৃশ্য দেখে দেখে ক্ষণে ক্ষণে না জানি কত অনন্ত ভাবের উদয় হতে লাগলো। ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করেছি, কিন্তু প্রকৃতির এমন মনোমোহন লীলা নিকেতন ত আজ পর্য্যন্ত আর কখন দেখতে পাই নি! আহা! সে কি সুন্দর!! সে কেমন চিত্ত-মন-আনন্দকারী!!! মনে হতে লাগলো হিন্দুর সবই যেন মহান্! হিন্দুর সবই যেন পবিত্র! সবই যেন বেদ-বেদান্তের বীর গাথায় উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দুরই মহিমা প্রচার কচ্ছে। সবই যেন সনাতন ধর্ম্মের জয়গাথা ঘোষণা করে নিজেকেও গৌরবান্বিত মনে কচ্ছে। এমন সনাতন হিন্দু বংশে জন্ম গ্রহণ করে

যেন আমরাও ধন্য হয়ে গেছি। এই মধুর ভাবে বিভোর হয়ে এক মহানুভব কবি, হিন্দুর হিন্দুত্বের মহিমামণ্ডিত গাথা গেয়ে গেয়ে না জানি প্রাণে কত আনন্দই অনুভব করে গেছেন! এখানকার চারি দিকের মোহন দৃশ্যে আজ আমারও অন্তঃস্থল ভেদ করে, সেই পবিত্র গাথা বের হয়ে পড়্‌লো। আমিও আকাশগঙ্গার তালে তাল মিশিয়ে গাইতে লাগলাম—

দেবময় যার অনল অনিল প্রখর তপন শীতল ইন্দু।
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই যেন আমি হই গো হিন্দু॥
(কোরাস)

লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই যেন আমি হই গো হিন্দু।
যার দেবাগার শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন শ্যামল সিন্ধু।
দেবতার নামে হয় নিশি ভোর দেবতার নামে প্রভাত কৃত্য;
দেবতার নামে শত্রু মিত্র, পুত্র কন্যা প্রভু ও ভৃত্য॥
দেবময় যার অনল……হই গো হিন্দু॥ (কোরাস)

তীর্থ যাহার নদ নদী কূলে, অতল সাগরে অতল শৃঙ্গে,
হরি নাম যার কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে প্রতি দিন বিহগ ভৃঙ্গে।
যোগবলে লভি অতুল শক্তি চাহে না যে রাঙ্গা চরণ ভিন্ন;
দেবতা যাহার বহেন বক্ষে, নিয়ত ভকত-চরণ-চিহ্ন॥
দেবময় যার অনল……হই গো হিন্দু॥ (কোরাস)

ভবনে যাহার আসে দশভুজা শ্যামল শরৎ শেফালী গন্ধে,
আগমনী গান গাহে কবিকুল, পুরাতন চির নূতন ছন্দে।
হরিরাস দোলে পূত পূর্ণিমা, পূত অমানিশা শ্যামার বর্ণে;
শ্যামের আভায় নভ ঘন নীল, মাখা শ্যামরূপ বিটপি পর্ণে॥
দেবময় যার………হই গো হিন্দু॥ (কোরাস)

জ্যোৎস্না নিশিতে শ্যামের বাঁশীতে উজান যাহার বহাত বক্ষে,
আঁধার নিশিতে শ্যামের হাঁসিতে ভীষণ মশান প্রকট চক্ষে।
প্রকৃতি যাহার দেব দেবময়ী, পুষ্প যাহার দেবের ভোগ্য;
ভক্তি যাহার বিতরে মুক্তি, চণ্ডালে করে দেবের যোগ্য॥
দেবময় যার………হই গো হিন্দু॥ (কোরাস)

যার চোখে এই বিপুল বিশ্ব দেবের মিলনে সতত রম্য,
দেবতা যাহার পিতা, মাতা, সখা, নহে অদৃশ্য অনাদি গম্য।
কর্ম্মে যাহার অধিকার শুধু, ফল যার দেব-চরণে ন্যস্ত;
নিষ্কাম যার ভক্তি সাধনা, সংযমে যার দেবতা ত্রস্ত॥
দেবময় যার………হই গো হিন্দু॥ (কোরাস)

ব্রাহ্মণে যার অতুল ভক্তি গাভীরে যে গণে জননী তুল্য,
সন্ন্যাসী পদে লুটায় নৃপতি বিভবের যথা নাহিক মূল্য।
নামে রুচি আর জীবে দয়া যার, গুরুর দত্ত প্রথম দীক্ষা;
রাজা চাহে যার ব্রজের পথেতে, কাঁধে ঝুলি লয়ে করিতে ভিক্ষা॥

মোক্ষ না পাই, দুঃখ তাহাতে নাহিক আমার নাহিক বিন্দু
লভিয়া শক্তি হৃদয়ে ভক্তি, হই যেন আমি হই গো হিন্দু॥

তুঙ্গনাথে আসার সময় যাত্রীগণ কয়েকখানা পাথর সাজিয়ে ঘর তৈরী করে প্রণাম করে থাকেন। তাদের বিশ্বাস এখানে ঘর তৈরী করে দিলে (ঐরূপ ভাবে) বিশেষ পুণ্য হয় তথা পরকালে তাদের জন্য স্বর্গধামে ঘর তৈরী হয়ে থাকে।

চোপতা হতে তুঙ্গনাথের পথে অল্প দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল পাওয়া যায়, পরে একদম বৃক্ষলতা শূন্য শুধু ন্যাড়া পাথরের শিখর দেশে আস্‌তে হয়। এর শৃঙ্গেই তুঙ্গনাথদেবের মন্দির বিরাজিত। শীত-কালে এখানেও বরফ জমে থাকে। কেদারনাথ,—বদরীনাথের মত এখানেও বৎসরে ছয়মাস পাণ্ডাদের গ্রাম **মুখী মঠে** তুঙ্গ-নাথের পূজা হয়ে থাকে। মুখী মঠ এখান হতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ গ্রামে তুঙ্গনাথের পাণ্ডাদের বসতি।

মুখী মঠ
৯ মাইল

এসব পাণ্ডারা যাত্রীদের জন্য দূর দূরান্তরে বা দেশ দেশান্তরে যায় না; চোপতাতেই ঘাটী আগলিয়ে বসে থাকে। এরা জানে, যে সকল যাত্রী কেদার-নাথ হয়ে বদরীনাথ যাবে, তাদের এই চোপতা চটী হয়েই যেতে হবে, সুতরাং এখানেই তাদের পাকড়াও কর্‌লে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। তাতে কোন খরচপত্রও নাই অধিকন্তু দেশ দেশান্তর ঘুরে ঘুরে কষ্টও ভোগ কর্‌তে হয় না। এই ভাবনায় তারা ঘাটী আগলিয়ে বসে থাকে। ফলও ফলে বেশ! যাঁরা তুঙ্গনাথে যান, তাঁরা এদের সঙ্গে নিয়ে যান; আর যাঁরা যান না, তাঁরা যৎসামান্য দক্ষিণা দিয়ে রাস্তাতেই সুফল আদায় করেন তথা কিছু প্রসাদ নিয়ে চোপতা হতেই তুঙ্গনাথজীকে প্রণাম করে লম্বা দেন।

শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির খোলার তিন দিন

পর এখানের মন্দির খোলা হয় এবং দীপালীর সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়। আমাদের পাণ্ডার নাম কেদারদত্ত গদাধর, পোঃ উখী মঠ, গ্রাম মুখী মঠ, জিলা টিহরী গাড়োবাল। লোকটী ভাল, নির্লোভী বটে।

আমরা এখানে পৌছে একটু সুস্থ হয়ে, ধর্ম্মশালায় যেয়ে, চিদানন্দ দাদার সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। তিনি কাল তুঙ্গনাথে এসেছেন, সারারাত ঘরে আগুন রাখার জন্য শীতে কষ্ট হয় নাই। তিনি এখান হতে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন; এর পরের চটীতে যেয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌বেন বলে ছোট মাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। আজ দুপুরের পাক করার ভার, তাঁর ও ছোট মার উপর সমর্পণ করে আমরা আকাশগঙ্গাতে স্নানাদি কর্‌তে চল্‌লাম।

আকাশগঙ্গা

দুর্গা চটীতে আমরা যে আকাশগঙ্গা দেখেছি, সেই আকাশগঙ্গা এই তুঙ্গনাথের চরণ কমল হতে জন্ম নিয়ে মন্দাকিনীতে যেয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। যেস্থান হতে নদীটি উৎপন্ন হয়েছে, তার চারিদিক পাথর দ্বারা বাঁধান। আমরা এখানে স্নানাদি করে পিণ্ডাদি কাজ সম্পন্ন করে নিলাম। অনেক যাত্রী এখানে শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করেন। শাস্ত্রেও এখানে শ্রাদ্ধাদি কাজ কর্‌বার নিয়ম আছে। যথা:—

পিণ্ড দানং চ যো মর্ত্যস্তীর্থ আকাশগঙ্গকে।
পিতরঃ কৃতকৃত্যাঃ স্যুঃ পুত্রেনৈতেন সুন্দরি॥
যস্যা জলকণেনাপি দেহলগ্নেন সুন্দরি।
কৃতকৃত্যোভবেন্মর্ত্যোমজ্জনাৎ কিংনু পার্ব্বতি॥

হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি আকাশগঙ্গার তটপর আপনার পিতৃপুরুষদের জন্য পিণ্ডদান করে থাকে, সেই ব্যক্তির জন্য তার পিতৃপুরুষেরা কৃতকৃত্য হয়ে যান। হে পার্ব্বতি! যে আকাশগঙ্গার জলবিন্দুতে যাত্রী কৃতকৃত্য হয়ে যায়, সেখানে স্নান কর্‌লে যে কত ফল লাভ হয়, তা আর কি বল্‌বো।

আমরা তাড়াতাড়ি স্নানাদি সম্পন্ন করে শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথের মন্দিরে প্রবেশ করে প্রণাম, প্রদক্ষিণাদি করে অন্যান্য দেব দেবীগণকে দর্শন-প্রণাম কর্‌লাম। এখানে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথদেব, ব্যাসদেব, ও জগৎ-গুরু শঙ্করাচার্য্য দেবের মূর্ত্তি এক মন্দিরে বিরাজিত। শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথদেবের পাঁচটী মুখ, তন্মধ্যে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত, চারিটী রৌপ্যনির্ম্মিত। পার্শ্বে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবী, কালভৈরব ও অন্যান্য অনেক দেব-দেবী বিরাজিত। ধর্ম্মশালা মাত্র একটী—থাকার বিশেষ কোন সুবিধা নাই। আমরা পূজাদি সম্পন্ন করে পুরী আদি দ্বারা সাধারণ জলযোগ করে নেমে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলাম।

এই তুঙ্গনাথদেব তৃতীয় কেদার নামে খ্যাত। এস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এই—

তুঙ্গেশ্বর মহাক্ষেত্রং কথ্যমানং যা শৃণু।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

মহাদেব বল্‌ছেন, আমি তুঙ্গনাথ মহাক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বল্‌ছি, শুন। যার কথা শ্রবণে মানব সর্ব্বপাপ হতে মুক্তি লাভ করে, এতে সন্দেহ নাই।

তুঙ্গনাথং শুভক্ষেত্রং পাপঘ্নং সর্ব্বকামদম্।
যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপেভ্যো বিমুক্তো লভতে শিবম্॥

তুঙ্গনাথ পাপনাশক শুভক্ষেত্র, যার দর্শন মাত্রেই মানব পাপ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে শিব সাযুজ্য লাভ করে থাকে।

সংপূজ্য মম লিঙ্গং বৈ তুঙ্গনাথাখ্য নামকম্।
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু নাস্তি তস্য মহাত্মনঃ॥

যে ব্যক্তি তুঙ্গনাথ নামক আমার লিঙ্গের পূজা করে, ত্রিলোকে তার দুর্লভ্য থাকে না।

জলমাত্রং প্রিয়ে দেবি মম লিঙ্গে প্রদাস্যতি।
যাবন্তঃ কণিকাস্তত্র জলস্য লিঙ্গকোপরি॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥
যো বিল্বপত্রমাদায় পূজয়েত্তেন বৈ শিবম্॥

কল্পমাত্রং বসেচ্ছেষে লোকে মম মহেশ্বরি ॥
অক্ষতা মম লিঙ্গে বৈ ঘৃতা যাবন্ত এব হি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মম লোকে প্রতিষ্ঠতি ॥
পুষ্পাণি চৈব যাবন্তি ন্যস্তানি মম চোপরি।
তাবদ্বর্ষ'সহস্রাণি স্বর্গভাক্ জায়তে নরঃ ॥

হে দেবি! যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গে কেবলমাত্র জল চড়ায় (দেয়) সেই জলের যতবিন্দু ঐ তুঙ্গনাথের উপর পতিত হয়, তত হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি শিবলোকে বাস করে থাকে। যে ব্যক্তি বিল্বপত্রে আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি কল্পমাত্র শেষ লোকে এবং আমার (শিব) লোকে বাস করে থাকে। যে ব্যক্তি লিঙ্গ'পর যত অক্ষত চাউল চড়িয়ে থাকে, সে ব্যক্তি, তত হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত আমার লোকে বাস করে থাকে। যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গে যত পুষ্প চড়িয়ে থাকে, সে ব্যক্তি তত হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে থাকে।

ধূপং দীপং চ যো দদ্যান্ন বৈ পশ্যতি নরকান্।
নৈবেদ্যং বিবিধং যো বৈ অর্পয়েন্মম ভক্তিতঃ॥
কদর্য্যান্নং ন বৈ ভুংক্তে তথা জন্ম সহস্রকম্॥

যে ব্যক্তি ধূপ দীপ আদি শিবজীকে দান করে, সে ব্যক্তি কখনও নরক দর্শন করে না। নানা প্রকার নৈবেদ্য আদিতে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হয়ে আমায় অর্পণ করে, তাকে হাজার জন্ম পর্য্যন্ত নিন্দিত অন্ন গ্রহণ করতে হয় না।

যেন পুজা কৃতাতুঙ্গে বিধিবদ্ভক্তিতঃ শিবে।
কল্পকোটি বসেচ্ছেষে লোকে মম মহেশ্বরি॥
যঃ কশ্চিন্মানবো ভক্ত্যা প্রাণাং স্ত্যজতি তুঙ্গকে।
যাবদ্দিনানি তৎক্ষেত্রে কীকসানি ভবন্তি হি॥
তাবদ্যুগ সহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥
এতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং কোবা বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ।
যস্ত ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদগম্যাগমনে রতঃ॥

যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক তুঙ্গনাথের পূজা করে, হে মহেশ্বরি! সে ব্যক্তি কোটী কল্প পর্য্যন্ত শিব লোকে বাস করে থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তুঙ্গেশ্বর ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির অস্থি তুঙ্গনাথে থাকবে, তত হাজার যুগ পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি শিবলোকে বাস করে থাকে। এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করবার শক্তি কারও নাই—যে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের ফলে অগম্যাগমন-জনিত পাপীও দ্বিজোত্তম যোগিগণের দুর্লভ গতি লাভ করে থাকে। পৃথিবীতে এই ক্ষেত্রের সমান কোন ক্ষেত্র নাই।

দক্ষিণাং মম যো দদ্যাৎ সম্পূজ্য ভক্তিতৎপরঃ।
ন দারিদ্র্য মবাপ্নোতি নরোজন্ম সহস্রকম্॥

যে ব্যক্তি আমায় পূজা করে ভক্তিতে তৎপর হয়ে আমার লিঙ্গে দক্ষিণা দেয়, সে ব্যক্তি হাজার জন্ম পর্য্যন্ত দরিদ্র অর্থাৎ ধনশূন্য হয় না।

তুঙ্গ ক্ষেত্রস্য দ্রষ্টার একবারেঽপি যে নরাঃ।
মৃতাঃ কচিৎ প্রদেশেঽপি প্রাপ্নুয়ুঃ পরমাং গতিম্॥

যে মানব একবারও তুঙ্গনাথকে দর্শন করে, তার যে কোন স্থানেই মৃত্যু হউক না কেন, তার শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়ে থাকে অর্থাৎ সে মুক্তি লাভ করে থাকে।

এতদূরে এমন কঠিন তীর্থে এসে সামান্য মাত্র চড়াইয়ের কষ্টের জন্য যদি এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ তীর্থ দর্শন না করা যায়, তাহলে যে যাত্রাই বিফল হয়ে যায়! যদি কেউ এমন তীর্থ মাহাত্ম্য, যোগী-ঋষি সাধু-সন্ন্যাসী তথা ব্রাহ্মণদের গাঁজাখুরী গল্প মনে করেন—তাতে কোনই ক্ষতি মনে করি না; কিন্তু এস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ত লুকোবার নয়, বা সেটা ত আর গাঁজাখুরী নয়? সে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ক্ষতি কি? প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলে হৃদয়ে নব বলের উদয় হয়ে পরম পিতার অদ্ভুত সৃষ্টি রচনার রহস্যে নিজেকে কোন্ এক অজানা দেশে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাতেও ত জীবনে একটু শান্তি লাভ হয়, তাতেও ত দেহ-মন পবিত্র হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, সুতরাং আমি প্রত্যেক হিন্দু-অহিন্দুকেই এ সুমনোরম উচ্চস্থান দেখবার জন্য বার বার অনুরোধ করি।

বেদবেদাঙ্গপারঙ্গত ধর্ম্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণের "কর্ম্মশর্ম্মা" নামক একটি পুত্র ছিল। পিতার বহু চেষ্টা যত্ন সত্ত্বেও পুত্রটি লেখা পড়ায় তিলাঞ্জলি দিয়ে সরস্বতী মাকে বিল্বপত্র দান করতঃ বিদায় করে বেকুবানন্দ বনে যায়।

কথানি

কর্ম্মশর্ম্মা বাল্যাবস্থা হ'তেই খুব দুষ্ট ছিল। সদা জুয়া খেলা তথা গাঁজায় দম মেরে নিজেকেই একমাত্র জগতের মালিক বলে গর্ব্ব করত। "পূর্ণচন্দ্রমুখী" নামে তার একজন ভগ্নিও ছিল। রূপে গুণে পূর্ণচন্দ্রমুখী বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণচন্দ্রমার চেয়েও যেন মনোমোহিনীরূপে জন্ম নিয়ে রূপের বন্যায় জগৎ ভাসিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু জানি না ভগবানের এ কি বিধান! এত রূপে গুণে জন্ম নিয়ে কিন্তু যৌবনাবস্থায় সে নানা প্রকার ব্যভিচারিতায় লিপ্ত হয়ে পিত্রালয় হতে পালিয়ে নানা দেশ দেশান্তর ঘুরে ঘুরে বেশ্যাবৃত্তি করতে থাকে। দৈববশে তার ভাই কর্ম্মশর্ম্মার সঙ্গে দেখা শুনা হয়। অজ্ঞানতার জন্য উভয়ে উভয়ের প্রতি কামাসক্ত হয়ে অনেক দিন যাবৎ পশুর মত প্রেম-লীলা করত তথা দস্যুবৃত্তি করে নিজের জীবিকা-র্জ্জন করত, একদিন রাতে কোন জন মানব শূন্য বনে উভয়ে বাস করার সময়, এক প্রকাণ্ড বাঘ এসে কর্ম্মশর্ম্মাকে হত্যা করলে পাশ ও খড়্গধারী যমদূত-গণ এসে হাজির হয়। সেই সময় একটি কাক ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে, উক্ত কর্ম্মশর্ম্মার মাংস মুখে করে তুঙ্গনাথের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কাকের মুখ হতে মাংস তুঙ্গনাথে পতিত হয়, তুঙ্গনাথে মাংস সহিত ছোট্ট একটুকরা হাড্ডি পতিত হতেই কর্ম্মশর্ম্মার পাপ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, শিবের দূতগণ উক্ত কর্ম্মশর্ম্মাকে আনবার জন্য উপনীত হয়ে দেখতে পায়—যমের ভীম কিঙ্করগণ তাকে প্রহার করছে। নন্দী ভৃঙ্গী আদি শিবের কিঙ্করগণ যমদূতেদের যুদ্ধে পরাস্ত করে, কর্ম্মশর্ম্মাকে শিবের নিকট কৈলাসে নিয়ে যায়। কর্ম্মশর্ম্মা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কৈলাসে বাস করে পরে আবার সংসারে জন্ম নিয়ে ধর্ম্মাত্মা রাজা হন। যথা :—

বহুবর্ষ সহস্রাণি স্থিত্বা বৈ মম সন্নিধৌ।
কালেন চ পুনর্জ্জাতো ধর্ম্মবান্ পৃথিবী পতিঃ॥

হে দেবি! এই তুঙ্গনাথের মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলব? সেখানে মানবের অস্থিমাত্র পতিত হলেই তার মুক্তি হয়ে থাকে। যথা :—

ইতি তে কথিতং দেবি তুঙ্গক্ষেত্রস্য বৈভবম্।
অস্থ্নো বৈ পাতমাত্রেণ যত্রপ্রাপ্তঃ পরাং গতিম্॥

যে মানব একবারও তুঙ্গনাথ দর্শন করেছে, সে মানব যেখানেই মরুক না কেন, তার পরমাগতি লাভ হয়ে থাকে। যথা :—

তুঙ্গক্ষেত্রস্য দ্রষ্টার একবারেঽপি যে নরাঃ।
মৃতা কচিৎ প্রদেশেঽপি প্রাপ্নুয়ুঃ পরমাং গতিম্॥

* * *

পঞ্চ কেদারের অন্যতম তৃতীয় কেদার শ্রীশ্রীতুঙ্গ-নাথ মহারাজজীকে দর্শন, স্পর্শন, পূজা, প্রদক্ষিণ আদি সম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি নেমে আসবার জন্য তৈরী হলাম। পাণ্ডা মহারাজ বল্লেন, "তীর্থ হতে কিছু না খেয়ে রওনা হলে তীর্থের ফলের লাঘব হয়।" এদিকেও অনেক বেলা হয়ে গেছে। সকালে উৎকট চড়াই করার জন্য উদর মহারাজও বেশ গোলযোগ আরম্ভ করে দিয়েছেন; সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অল্প কিছু ভোজন করতঃ রওনা হওয়াই স্থির হ'ল। দোকান হতে সামান্য পুরী, শাক, মিঠাই আদি দ্বারা উদরদেবতাকে সন্তুষ্ট করলাম। কিন্তু ইত্যবসরেই শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথজী তাঁর স্থানের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ততাসহ লেগে গেছিলেন; দেখতে দেখতে আকাশ ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল,—এমন ঘোর অন্ধকার হল যে পাঁচ হাত

দূরের জিনিষ দেখাও কষ্টকর। শীতও যথেষ্ট! আমাদের প্রিয় কুলী মণিরামজীকে জিনিষাদিসহ এর আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি; বলে দিয়েছি—সামনের চটীতেই চিদানন্দ মহারাজ আর ছোট মাকে পাবে। তাঁরা আমাদের জন্য সেথায় পাক করে রাখবেন, সেও যেন আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করে; তখন কিন্তু বেশ প্রখর রোদ ছিল, তাই তার সঙ্গে গরম কাপড়াদি পাঠিয়ে দিয়েছি। সুতরাং গরম কাপড়াদি আমাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না।

বেলা ১২টার সময় এমন ঘোর কুয়াশা (এমন হবে, তা আমরা পূর্ব্বে বুঝি নি!) তথা শীতে আমরা কাঁপতে আরম্ভ করেছি। কাজেই পাণ্ডা মহারাজকে তাড়াতাড়ি দক্ষিণা দিয়ে সুফলাদি নিয়ে বিদায় করে ধীরে ধীরে রওনা হলাম। অতি সামান্য চড়াই করেই খাড়া উৎকট উৎরাই। সকালে যেমন উৎকট চড়াই করে এসেছি, এবার ঠিক তেমনিই উৎকট উৎরাই কর্‌তে লাগলাম। এর ভিতর দেখতে দেখতে আমাদের মেঘে ঢেকে ফেল্‌লো। মেঘগুলি কিন্তু তখন জলবর্ষণ কচ্ছিল না আমরা নীচু হ'তে আকাশের গায় যে মেঘগুলি ঘুরে বেড়াতে দেখি, এগুলি সেই মেঘ। কেদারনাথে এরূপ মেঘের খেলা নিত্যই হয়। এ মেঘেতে আমাদের জামা কাপড়গুলি খুব স্যাঁৎসেতে হয়ে গেল বটে, কিন্তু একেবারে ভিজে গেল না—সে অনেকটা কুয়াশার মত—বা পেঁজা তুলার মত। আবার কুয়াশা যেমন ঘুরে বেড়াতে পারে না, এগুলি কিন্তু সেরূপ নয়। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে পেঁজা তুলার মত পাহাড়ের গায় গায় বেশ ঘুরে বেড়ায়। পরে কুয়াশায় আমাদের এমন ভাবে ঘিরে ফেল্‌লো যে, আমরা দুই হাত দূরের জিনিষও দেখতে পেলাম না। (ক্রমশঃ)

—o—

আলোচনা

পূজা শেষ হইয়া গেল। মায়ের পূজায় মাতৃ-সাধক বাঙ্গালীর প্রাণের পরিচয় পাইলাম; সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহারা মায়ের পূজা করিতে শিখিয়াছে, ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে প্রণতি বা ভক্তিপ্রবণতা মূলে রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করি না; কারণ কোন কোন স্থলে শুধু বাহ্যাড়ম্বর দেখাইবার জন্য অথবা আত্মপ্রাধান্য প্রদর্শন জন্যই যে এই সমস্ত পূজার আয়োজন হইয়াছিল তাহা তত্তৎ স্থানীয় ব্যবহারাদির দ্বারাই পরিস্ফুট হইয়াছে,—তথাপি আমাদের আশা আছে, একদিন এই বাহ্যিক ভাব অন্তর্হিত হইয়া সকলের হৃদয়ে আন্তর সাধনার রূপ প্রকটিত হইবে, কাঁচ খুঁজিতে খুঁজিতেই তাহারা একদিন স্পর্শমণির সন্ধান পাইবে।

*

এই দশভুজা দুর্গাই মহাশক্তি, ইনি সঙ্ঘশক্তির দেবতা অথবা প্রতীক। হৃতাধিপত্য সুরবৃন্দের মিলিত শক্তি হইতেই এই মহাশক্তির উদ্ভব—কাজেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ইহার আরাধনা করা, পূজা করা অশাস্ত্রীয় কিছুই নয়, বরং ঋষিশাস্ত্রানুমোদিত। সুরথ এবং সমাধি ভিন্নবর্ণাশ্রিত হইয়াও এক-যোগেই মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন, একযোগেই

তাঁহাদের অভীপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। মায়ের পূজায় উচ্চ নীচ বিচার নাই, ছোট বড় ভেদ নাই,—তাঁর কাছে সবাই সমান, সবাই তাঁর আদরের সন্তান।

*

মায়ের দিক্ দিয়া উচ্চ নীচ বিচার না থাকিলেও কোন কোন স্থলে সন্তানের দিক্ দিয়া তাহা বেশ পরিস্ফুট দেখিতে পাই। কাজেই সন্তানদের মধ্যে এই ছোট বড়র ভাব যতদিন না অন্তর্হিত হইতেছে, যতদিন না একটা আত্মীয়তার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া পণ্ডিত--মূর্খ ধনী--নির্ধন সকলে একতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেছে, ততদিন জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত, মায়ের কৃপা লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভবপ্রায়।

*

অবশ্য একতা অর্থে আমরা ছত্রিশ জাতির একত্রে পানাহার করাকে বুঝি না অথবা কোনদিন ইহার সমর্থনও করি না। আমরা চাই ভাবের মিলন, প্রাণের মিলন,—বাইরের জোড়াতালি বা গোঁজামিলন নয়। অনেকে এই প্রকারের একাকারের অভিনয়কেই প্রকৃত মিলনের সেতুস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী সমাজকেও পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা যে কতদূর বিচারসহ তাহা অবশ্য বিবেচ্য। কেন না একত্রে পানাহার করিলেই যে আমরা সকলে মিলনের মহাভূমিকায় দাঁড়াইতে পারিব, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না, কারণ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ এক ধর্ম্মাবলম্বী—এক টেবিলভোজী হইয়াও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হইতে বিরত নহে, আমাদেরই ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানগণ এক ধর্ম্ম—এক আচারব্যবহার সূত্রে আবদ্ধ হইয়াও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রহরণ ধারণে পরাঙ্মুখ নহে, আবার আমাদের ঘরের সন্তানগণ এক মায়ের গর্ভজাত—একই স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়াও একে অপরের বুকে ছুরী বসাইতে কুণ্ঠিত নহে। এই সমস্ত নিয়ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ চক্ষুর সম্মুখে থাকিতেও কি আমরা সেই আলেয়ার পেছনেই ছুটিব?

*

ছত্রিশ জাতি এক কোনদিন হয় নাই, হইবারও নহে। গুণগত বৈষম্য লইয়াই হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত। গুণের বৈষম্যেই এই জগতের সৃষ্টি, আবার তাহার সমতায় প্রলয়। কাজেই জোর করিয়া সমস্ত জাতিকে একত্রীকরণের প্রয়াস, ধ্বংসের মুখেই জাতিকে টানিয়া লইয়া যাইবে কি না তাই বা কে বলিবে? অবশ্য বর্ত্তমানে জাতি যে গুণগত না থাকিয়া বংশগত হইয়া পড়িয়াছে তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এই জাতিগত গুণরাজির সংস্কার বা উৎকর্ষ সাধন না করিয়া বাহিরে একটা জগা খিচুড়ী পাকাইলেই কি জাতির উদ্ধার সাধন হইবে?

*

জগতের যে কোন স্থানের অধিবাসীর দিকে লক্ষ্য করি না কেন, গুণের তারতম্য সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। ভগবান্ যে শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুন কর্ম্ম বিভাগশঃ"—তাহা শুধু এই ভারতেই নিবদ্ধ নহে—সমগ্র জগতেই সে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। খুঁজিয়া দেখিলে এই জগতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, রজোগুণ সম্পন্ন, রজস্তমো মিশ্রিত, আর শুদ্ধ তমোগুণান্বিত—এই চারি প্রকারের মানুষ দৃষ্টিগোচর হইবে। যে যে গুণসম্পন্ন, ঠিক তদনুকূল কর্ম্মে তাহার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। গুণ এবং কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহাদের তারতম্যানুসারে পূর্ব্বে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে তাহা বংশের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া সামঞ্জস্যহীন কর্ম্মের জটিলাবর্ত্তে পড়িয়া শতধা

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, জাতি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভেদের প্রভাবই বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে। এক্ষণে মূল হইতে ইহার সংস্কার আরম্ভ না করিয়া বাহির ধরিয়া টানাটানি করিলে বরং নূতন দল, নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়া পুরাতনের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিবে, হিংসা-দ্বেষের বহ্নি আরও তীব্রবেগে জ্বলিয়া উঠিবে।

*

"শুধু পৈতা থাকিলেই বামুন হয় না"—এই যাঁহাদের বুলি, ব্রাহ্মণের সপিণ্ডীকরণ না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না, তাঁহারাই দেখি তাঁহাদের বিদ্রূপের প্রধান উপকরণ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া 'শর্ম্মা' উপাধিকে আপনাদের নামের পেছনে আঁটিয়া দিতে ব্যগ্র, আর সূত্রমাত্র ধারণায় পর্য্যবসিত দ্বিজোচিত যজ্ঞোপবীত ধারণের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লইতে ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণকে উৎকোচ দিয়া হইলেও স্বমতভুক্ত করিতে তৎপর! অবশ্য ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই বিজয় ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু যদি দেখিতাম তাঁহারা তাঁহাদেরই সমালোচ্য পৈতার গণ্ডীতে আবদ্ধ না হইয়া চরিত্রের বিমলতা সম্পাদনে এবং গুণের উৎকর্ষ সাধনে তৎপর, তাহা হইলে আশ্বস্ত হইতাম এবং বুঝিতাম যে দেশের সৌভাগ্যরবি উদিতপ্রায়!

*

পূজার মধ্যে দেখিলাম কোন কোন স্থানে মুচি মুদ্দোফরাস প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু সাধারণকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছে, আবার তাই লইয়া কোন কোন সাময়িক পত্রিকা খুব লম্ফঝম্প করিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপন আপন বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি—নদীয়ার ঠাকুর তো 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ' বলিয়া গিয়াছেন, অতএব কর সব একাকার, মহাপ্রভুর তাই উপদেশ, তাই তাঁহার পন্থা! এ স্থলে আমরা তাঁহাদিগকে উক্ত শ্লোকটী পরার্দ্ধ পাদসহ স্মরণ করাইয়া দিতেছি—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ—অর্থাৎ হরিভক্তি পরায়ণ যে চণ্ডাল সে দ্বিজোত্তম। কিন্তু হলপ করিয়া কি কেহ বলিতে পারে, যাহারা এই পরিবেশনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়াছে, তাহারা সকলেই হরিভক্তিপরায়ণ—অথবা যাঁহাদিগকে পরিবেশন করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত গুণে সমতুল্য?

*

যাহা হউক ইহাতে লাভ হইল কার? পরিবেশকের না পরিভোজকের? আমরা বলি কাহারও না। অবশ্য ইহাতে সাময়িক তৃপ্তি—সাময়িক আনন্দ উভয় পক্ষেরই হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী ফল কিছু ফলিবে কি? একদিনের একত্র পান ভোজনেই কি ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক হইয়া যাইবে? গুণের উৎকর্ষতা সাধনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সাধনার তীব্র দহনে ক্রমনিম্ন হইতে ক্রমোচ্চে তুলিয়া লইবার সনাতন রীতি পরিহার করিয়া, উচ্চকে নিম্নের সমভূমিতে আনয়ন প্রচেষ্টায় জাতীয় জীবনে যে ঘনান্ধকার ঘনাইয়া আসিবে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!

*

ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র প্রচণ্ড তপস্যায় আত্ম স্বভাব সুলভ রজোগুণ অতিক্রম করিয়া যতদিন না ব্রাহ্মণোচিত সত্বগুণ অধিগত করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন ঋষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ততদিন তিনি ব্রাহ্মণ আখ্যায় আখ্যাত হন নাই। যাঁহারা প্রাচীন যুগের নজীর দেখাইয়া একাকারের পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-জনক প্রচণ্ড তপস্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি।

যদি কোন দিন সমগ্র জাতি সাধনসহায়ে গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সমগুণসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে সেই দিনই একাকারে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন সফল হইবে, তার পূর্ব্বে নয়। তমোগুণান্বিত চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করিলে সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের যেমন গুণের অপকর্ষতা সাধিত হয়, তেমনি সত্ত্বগুণান্বিত জাতি-চণ্ডালও যদি তমোগুণসম্পন্ন জাতি-ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করে, তাহারও গুণের বৈলক্ষণ্য ঘটি.ব সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে সমগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে একত্র পান ভোজন করিলেও কাহারও কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি-অবনতি কিছুই হইবে না, তবে সমাজশৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিবে এইমাত্র। স্বল্পায়ুকামী দীর্ঘায়ু লোমশ জাতি-চণ্ডালের অন্নগ্রহণ করিয়াও স্বল্পায়ু হইতে পারেন নাই, কিন্তু যেমনি তিনি কর্ম্মচণ্ডাল জাতি-ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ করিলেন, অমনি তাঁহার লোমরাশি খসিয়া পড়িল, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি-অবনতির বিচার উঠে গুণগত বা কর্ম্মগত সমতা-বিষমতা লইয়া, জাতিগত বা বংশগত হিসাবে নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে কে গুণগত ব্রাহ্মণ, কে গুণগত শূদ্র তাহা নির্ণয় করা অসম্ভবপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব নিজেদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া এ সমস্যা সমাধান-রূপ একাকারের প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া সর্ব্ববিরোধসমঞ্জস মহাশক্তিধরের আবির্ভাব প্রার্থনা করাই বর্ত্তমানে সমীচীন বলিয়া মনে করি।

নিজেদের যদি কিছু করিতে হয়, তবে তাহা হইতেছে শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টা, যাহারা অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছে তাহাদিগকে জ্ঞানের আলোকে লইয়া আসা। এই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া যদি সকলকে এক করিতে পার, বৈদান্তিকের বিরাট একত্বের অনুভূতি সকলের চিত্তে জাগাইয়া তুলিতে পার, জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল শিখায় রজস্তমের কালিমা ভস্মীভূত করিয়া সকলের মাঝে শুদ্ধ সত্ত্বগু:ণর বিকাশ ঘটাইতে পার, তবেই বুঝিব তুমি দেশ-হিতৈষী, অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রকৃত মরমী! অনুন্নত-দের উন্নত করিতে হইলে বাহিরে একত্র পানাহারের হুজুগ প্রয়োজন হয় না, বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাইতে হয় না, ব্রাহ্মণের সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় না। ইহাতে চাই সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পরিহার, জাতি জাগরণ-যজ্ঞে আত্মাহুতি, নিষ্কাম কর্ম্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ। কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, নাম যশের কামনা নাই, চাই শুধু নারায়ণ জ্ঞানে নরের সেবা করা, জন-সমাজের জ্ঞানোন্মেষ করা—তাহা হইলেই সব হইবে। যতই 'দেশ উদ্ধার' 'দেশ উদ্ধার' করিয়া চীৎকার কর না কেন, এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন দেশের মাঝে জ্ঞানের আলো ফুটাইতে না পারিলে, অশিক্ষিত দেশবাসীকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে সমস্ত প্রচেষ্টা সমস্ত কল্পনা যে শূন্যেই বিলীন হইবে, তাহা আমরা জোর ক:রয়াই বলিতে পারি।

সংবাদ ও মন্তব্য

বিভাগীয় সম্মিলনী

বিগত ২রা আশ্বিন হালিসহর সারস্বত আশ্রমে দক্ষিণ বাঙ্গালা বিভাগীয় ভক্ত-সম্মিলনীর ৮ম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্বয়ং এই সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন। নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার ভক্তগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নদীয়া জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী ও ২৪ পরগণা জেলার সদস্য শ্রীযুক্ত জানকীজীবন চক্রবর্ত্তী এই সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ভক্তগণও বিশেষভাবে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী ইহাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় আশ্রমের আয় ব্যয় ও বিবিধ কথার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনা বাবদ মাসিক যে টাকাটা ব্যয় হয়, তাহাও নিয়মিত ভাবে ভক্তদের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে বিভাগস্থ প্রত্যেক ভক্তেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, গত সার্ব্বভৌম-ভক্তসম্মিলনীর খরচ বাবদ এখনও আশ্রমের স্কন্ধে ১৫২॥/০ ঋণ রহিয়াছে। যদি উপস্থিত প্রত্যেক ভক্ত নিয়মিত হারে (জন প্রতি ৫৲ করিয়া) খরচ দিতেন, তাহা হইলে আর এই দরিদ্র আশ্রমকে এ প্রকার ঋণজালে জড়িত হইতে হইত না। ইতঃপূর্ব্বে বগুড়া আশ্রমও এইরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব ইহার পর আর কোন সম্মিলনীতেই যাহাতে ব্যয়বাহুল্য না হয় এবং সমাগত ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের অবশ্য দেয় চাঁদা নিয়মিত হারে প্রদান করেন, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অতঃপর যথাক্রমে শ্রীযুক্ত জানকীজীবন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সমবেত ভক্তগণ আশ্রমের উদ্দেশ্য ও তৎসাধন কল্পে শিষ্য-ভক্তদের কর্ত্তব্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ভারত ভ্রমণ

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ গত ১৯শে কার্ত্তিক শনিবার ভারত ভ্রমণোদ্দেশ্যে মেহারা কোং তীর্থযাত্রী স্পেসিয়াল ট্রেণে হাওড়া হইতে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ৫৫ দিনে সমগ্র দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া উক্ত ট্রেণের আগামী ১৫ই পৌষ শুক্রবার পুনরায় হওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ কিন্তু ভক্তসম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই স্পেসিয়াল ট্রেণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ হইতে সাধারণ ট্রেণযোগে যথাসময়ে সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়া ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছেন।

ভক্ত-সম্মিলনী

[অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন—১৩৩৯]

স্থান :—পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, খড়কুশমা (মেদিনীপুর)

দিন :—১১ই পৌষ সোমবার হইতে ১৩ই পৌষ বুধবার পর্য্যন্ত

আগামী ১১ই, ১২ই, ১৩ই পৌষ, ইং ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ডিসেম্বর এই দিবসত্রয় পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ভক্ত-সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্য-ভক্ত এবং আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকগণকে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সম্মিলনীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনাবলীর নিয়মানুযায়ী সম্মিলনীর ব্যয়ভার নির্ব্বাহ কল্পে জন প্রতি ৫৲ টাকা হিসাবে দেয় চাঁদা অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই আশ্রম-পরিচালকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিবেন; নচেৎ তাঁহাদের সংস্থানের জন্য পরে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। সঙ্গে স্ত্রীলোক আসিলে স্বতন্ত্রভাবে তাহার উল্লেখ করিবেন। শিশু ও বালক-বালিকা ব্যতীত আর সকলেরই এই চাঁদা অবশ্য দেয়। টাকা পাঠাইবার সময়ে প্রেরকের নাম, ঠিকানা এবং যে কয়জনের চাঁদা পাঠাইতেছেন তাহা সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। আশা করি সকলেই ইহাতে যোগদান করতঃ সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

ভক্ত-সম্মিলনীর সাহায্যার্থে স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। মণি-অর্ডার কুপনে "সম্মিলনীর সাহায্যার্থে দান" এই কথাটী উল্লেখ করিবেন। "পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম" বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলার বি, এন, রেলওয়ের গড়বেতা ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। জিনিষ পত্র সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন হইতে আসিবার জন্য ১০ই পৌষ তারিখে দুই ট্রেণের সময়ই মটর বাস এবং গরুরগাড়ী উপস্থিত থাকিবে। ষ্টেশন হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত আসিবার ভাড়া জন প্রতি ॥০ আনা হইতে ॥৵০ আনা পড়িবে। বি, এন, রেলওয়ের গোমো পেসেঞ্জার ও পুরুলিয়া ফাষ্ট পেসেঞ্জার—এই দুই ট্রেণে আসিতে হইবে। এই দুইটী ভিন্ন অন্য কোন ট্রেণ নাই। গোমো পেসেঞ্জার প্রাতে ৬—৮ মিনিটের সময় হাওড়া হইতে ছাড়িয়া বেলা ১টার সময় গড়বেতা ষ্টেশনে পৌছে এবং পুরুলিয়া ফাষ্ট পেসেঞ্জার রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় হাওড়া হইতে ছাড়িয়া রাত্রি ২—৩০ মিনিটের সময় গড়বেতা পৌছে। হাওড়া হইতে গড়বেতা পর্য্যন্ত ট্রেণভাড়া ৩য় শ্রেণীর ২।১০, ঐ সময় সম্ভবতঃ Concession টিকেট পাওয়া যাইবে।

ভক্তগণ নিজ নিজ বিছানাপত্র ও আলো সঙ্গে আনিবেন। অন্য কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

টাকাকড়ি ও পত্র পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ

আশ্রম পরিচালক—

পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম,

পোঃ খড়কুশমা, জিলা মেদিনীপুর।

২৫শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২৭১

অগ্রহায়ণ—১৩৩৯

২য় খণ্ড
২য় সংখ্যা

এতাবদনুশাসনম্

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥

কঠ—ষষ্ঠবল্লী—১৫ শ্লোক

শ্রীগুরুর অমূল্য উপদেশ—"একদিন এইরূপেই তোমার হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইবে।"

হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইলে মর্ত্ত্যমানবই অমর হয়। অমরত্ব লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই;—শ্রীগুরুর নির্দ্দেশে চলিয়া হৃদয়ের সকল গ্রন্থিকে উন্মোচন করিতে হইবে।

হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইলে তোমার কি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে জান? সংসার বলিয়া যে একটী কথা আছে—তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার কাছে অন্তর্হিত হইবে। সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইলেই বুঝিবে—তোমার উপর শ্রীগুরু কৃপা বর্ষণ হইয়াছে, তোমার হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়াছে। গ্রন্থিভেদ না হইলে সত্যের পরশ পায় না মানুষ। আবার সত্যলাভ না হইলে মানুষ নিঃসংশয়ও হইতে পারে না। সত্যলাভই যাহার জীবনের লক্ষ্য—গ্রন্থিভেদ তাহাকে করিতে হইবেই। শ্রীগুরুর কৃপা এবং তীব্র আবেগের ফলেই মানুষের একটী একটী করিয়া গ্রন্থি-ভেদ হয়। গ্রন্থি কি? —সংস্কারের গ্রন্থি। শ্রীগুরু ছাড়া সংস্কার ধ্বংস আর কে করিতে পারেন? সন্ন্যাসের সময় সকল সংস্কারকে পুড়াইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া শ্রীগুরুই শিষ্যকে নবজন্ম প্রদান করেন। এই নবজন্ম লাভই অমরত্ব। নশ্বর জীবনকে সত্যের অগ্নি-শিখায় ভস্মীভূত—বিশোধিত করিয়া নবজন্ম লাভের নামই অমরত্ব। শ্রীগুরু তোমায় সেই অমরত্বের পথেই লইয়া যাইতে ব্যাকুল। সেইজন্যই গ্রন্থি-ভেদের কথা বারংবার বলিতেছেন। শাস্ত্রেরও এইমাত্র উপদেশ—সকল সংস্কারকে পুড়াইয়া ছাই-ভস্ম করিতে হইবে। ইহারই নাম—হৃদয়-গ্রন্থিভেদ।

এক একটা সংস্কার আমাদের জীবনে গভীর ভাবে শিকড় বসাইয়া ফেলাইয়াছে। এই শিকড়কেই উৎপাটন করিতে হইবে। শ্রীগুরুর কৃপাই একমাত্র শক্তি। সংস্কারের অতীত হইতে না পারিলে জগতে কোন মহৎ কর্ম্মই তোমাদ্বারা সম্ভবপর হইবে না। মহাপুরুষ মাত্রেরই সকল গ্রন্থিভেদ হইয়াছে। শ্রীগুরু তোমায় সেই সঙ্কেতই দিয়াছেন।

নিজের সংশয় থাকিলে অপরকে তুমি নিঃসংশয় করিবে কেমন করিয়া? নিজেরই যদি হৃদয়-গ্রন্থি উন্মোচিত না হয়, অপরের গ্রন্থি উন্মোচন করিবে তুমি কেমন করিয়া? কাজেই আগে নিজের বন্ধন ছিন্ন কর, নিঃসংশয় হও, তারপর দেখিবে জগতে অনায়াসে তোমা দ্বারা কত কাজ সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। সদ্‌গুরু এই গ্রন্থিভেদের সঙ্কেতই বলিয়া দেন।

গ্রন্থিভেদ হইলে তুমি নিঃসংশয় হইবে মাত্র ; বাহিরে আর কোন পরিবর্ত্তন হইবে না তোমার। শ্রীগুরুর এক একটী বাণী বেদবাক্যের ন্যায় তোমার নিকট প্রতিভাত হইবে। গুরুবাক্যের উপর কোন মন্তব্য করিবে না—অবিচারে তাঁহার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিবে—হৃদয়-গ্রন্থি-ভেদ হইলে এই সব লক্ষণই প্রকাশ পাইবে।

যুক্তি-বিচার দিয়া মানুষ জগতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। মহৎ কার্য্যের মূলে রহিয়াছে—বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসের কোন আইন নাই—যুক্তি নাই। হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস আসিবে প্রাণে।

বিশ্বাসে—ভালবাসায় গ্রন্থিভেদ হয় দ্রুত। যোগশক্তিতেই গ্রন্থি-ভেদ হয়—কিন্তু প্রাণ তাহাতে বড় নীরস হইয়া পড়ে। চিত্ত সরস থাকে অথচ সকল গ্রন্থি উন্মোচিত হয় একমাত্র ভালবাসায়—সে ভালবাসায় নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিবার আকুলতাই জাগে প্রাণে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" —সকল সংশয়ের নিরসন হইবে—হৃদয় দিব্য-জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে—যদি তুমি নরাকার পরব্রহ্মের উপাসক হও। গ্রন্থিভেদের সহজ উপায়—সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া।

যাঁহার কাছে গেলে সকল সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়, মনে আর কোন সংশয়ই উঠে না—তিনিই তোমার গুরু—পথের দিশারী। সেই মনের মানুষকেই অনুসন্ধান কর—যাঁহার কটাক্ষে, যাঁহার স্পর্শে তোমার হৃদয়-নিহিত সকল জ্বালার অবসান হয়। যুক্তি-বিচার দিয়া কতক সংশয় নিরসন হয় বটে, কিন্তু গ্রন্থিভেদ হয় শ্রীগুরুর কৃপায়। মানুষ অনেক কিছুই বুঝে—কিন্তু সেই অনুযায়ী চলিতে পারে না কেন? মানুষের প্রাণে মানুষের দিব্য-পরশ না লাগিলে কিছুতেই সংশয় ঘুচে না।

সত্যলাভের আকুল পিপাসা জাগাইয়া তুলিতে পারেন শ্রীগুরুই,

আবার তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার উপায়ও তিনিই অবগত আছেন। বদ্ধ-জীবের আর কি গতি আছে, তাঁহরে কাছে শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ?

আগে নিজে নিঃসংশয় হও, বজ্রদৃঢ় বিশ্বাসে বুক বাঁধ, তাহার পর দেখিবে তোমার জীবন অলক্ষ্যে কতজনকে দিব্য-জীবন লাভের পথে সাহায্য করিতেছে। শুধু পুস্তকের বিদ্যায় সংশয় নিরসন হয় না—চাই জীবন্ত পরশ, সেই অমিয়স্পর্শেই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে। নরাকার পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া নিঃসংশয় হইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। এতাবদনুশাসনম্ !

ঠাকুরের কৃপা

ভূমিকা

কয়েকটী ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার সমাবেশ। একটী বৃহৎ পরিবার সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের অবশ্যম্ভাবী নিত্য ঘাত-প্রতিঘাত, বিয়োগ-বেদনা কিরূপ অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়া সর্ব্বাবস্থায় আনন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছে, মরণ তাহাদের নিকট ভীতিপ্রদ না হইয়া কিরূপ আনন্দের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, ইহা তাহারই রঞ্জনহীন অনাড়ম্বর বিবৃতি। অনেকের ধারণা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে হাসিয়া খেলিয়া সংসার সুখ উপভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায়, রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট বিপদ্-আপদ্ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ীর ত্রিসীমায়ও পৌছিতে পারে না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে পাইয়াও পাণ্ডবদের ব্যবহারিক দুর্গতি দূর হয় নাই, বরং তাঁহারা পদে পদে বিবিধ লাঞ্ছনায় অভাবনীয় ভাবে লাঞ্ছিতই হইয়াছেন। তাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন সত্য, তাঁহারা রাজপুত্র হইয়াও সাধারণের ধারণাতীত বহু কষ্টের মধ্যে নিপতিত হইয়াছেন সত্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া হাসি মুখে সে সকল সহিয়া গিয়াছেন, শত দুঃখের মাঝে থাকিয়াও অনাবিল শান্তিকে জীবনে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহারা আনন্দকেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপা বা গুরু কৃপার অর্থ ইহা নয় যে সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া বেশ আরামে দিন কয়টা

কাটাইয়া দেওয়া, অথবা ঘাত-প্রতিঘাত বিহীন হইয়া নিরঙ্কুশ ভাবে জীবন অতিবাহিত করা। পরন্তু বিধিনির্দ্ধারিত প্রারব্ধ ভোগ করতঃ মদন-মরণের মধ্য দিয়া হাসি মুখে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়াই যথার্থ সদ্‌গুরু বা ভগবানের কৃপা। এই ভাবটুকুই "ঠাকুরের কৃপা"র ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে। বিয়োগ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট নাশ করিয়া নয়—হাসিমুখে সে সব সহ্য করিবার শক্তি, অবিচলিত চিত্তে সে সব বরণ লইবার ভক্তি প্রদান করিয়া ঠাকুর কি ভাবে তাঁহার আশ্রিতদের মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছেন, সেব ভাবটীও ইহাতে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পাঠকগণ নিম্নের বিবৃতি পাঠ করিয়া ইহার সত্যতা উপলব্ধি করুন। "ঠাকুর" শব্দটী যে সর্ব্বত্র শ্রীগুরুর সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

পরিচয়

পাবনা জেলার প্রসিদ্ধ স্কুলের সন্নিকটবর্ত্তী দীঘলকান্দী একটী নাতিদীর্ঘ গ্রাম। এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও বংশ মর্য্যাদায় এতদ্দেশে সুপরিচিত। গোষ্ঠীপতি যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কর্ত্তা বা পরিচালক। তাঁহার ছয়টী উপযুক্ত পুত্র-সন্তান। তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৪ সনের ১০ই ভাদ্র রবিবার রাত্রিযোগে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। উপযুক্ত পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই; বরং শচী মাতা যেমন বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে ভগবন্! যেন আমার বিশ্বরূপ আর গৃহে ফিরিয়া না আসে।"—ঠিক সেই ভাবেই তিনি ঠাকুরকে চিঠি দিয়া জানাইয়াছিলেন—"ঠাকুর, শ্রীমান্ সুধীর আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছে ভাল কথা, তাহাকে আপনি আপনার অভীপ্সিত শিক্ষায় দীক্ষায় গঠিত করিয়া তুলুন, কিন্তু সে যেন আর সংসারাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, এই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা।" —এমনি ছিল তাঁর ধর্ম্মজ্ঞান! সেই সুধীরচন্দ্র বর্ত্তমানে ঠাকুরের পরিবারে ব্রহ্মচারী ভুবনানন্দ নামে পরিচিত!

সংসার ত্যাগের দ্বাদশ বৎসর পরে ১৩৩৪ সনের ২৪শে কার্ত্তিক এই ভুবনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ সহকারে স্বীয় জন্মভূমিতে আগমন করতঃ তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমীয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে শ্রীগুরুর চরণে সমর্পণ করেন, ঠাকুরও কৃপা-পরবশ হইয়া সানন্দ চিত্তে সকলের ভার গ্রহণ করেন। তদবধি এই বৃহৎ পরিবার ঠাকুরের অভয় শ্রীচরণতলে থাকিয়া তাঁহারই মঙ্গল ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া তাঁহার যে সমস্ত কৃপা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে—এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল।

বিবৃতি

আমার নাম শ্রীঅধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি উপরিউক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সন্তান। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আমরা অবিরত তাঁহার কিরূপ কৃপা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি, শত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও ঠাকুর আমাদের কিরূপ আনন্দের প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই অমৃতবার্ত্তা আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভক্তি প্রণত চিত্তে আমার প্রেমাস্পদ সতীর্থ সহযাত্রী ভ্রাতৃবৃন্দের করকমলে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিতেছি

না। ঠাকুরের অযাচিত করুণার কথা স্মরণ করিয়া স্বতঃই আজ যেন চিত্তের মাঝে কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, ঠাকুরের অপার মহিমার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আজ তাহা আমার প্রাণে প্রকাশের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতেছে। তাই আজ আনন্দভরে আত্মহারা হইয়া "ঠাকুরের কৃপা" লেখনী মুখে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, স্বতঃ প্রকাশিত সহস্রাংশুকে ক্ষুদ্র দীপালোকের সাহায্যে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা করিতেছি। আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সমাহিত চিত্তে, সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া নয়—সহানুভাবকের হৃদয় দিয়া আমার এই বিবৃতি পাঠ করিবেন, প্রবন্ধের দোষাংশ পরিহার করিয়া ঠাকুরের অপার করুণা মাত্র উপলব্ধি করিবেন। যদি ইহা পাঠকবৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করে তবে জানিব তাহা ঠাকুরেরই মহিমা, যদি না করে তবে বুঝিব তাহা আমার ভাব ও ভাষার দৈন্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে আমাদের ক্ষুদ্র ভবনে দুইবার শুভ পদার্পণ করিয়াছেন—দুইবার তাঁহাকে লইয়া আমরা আনন্দ করিয়াছি—দুইবার তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে আমাদের দেহ-গেহ ধন্য হইয়াছে। তথাপি যেন আমাদের আশা মেটে নাই, তথাপি যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে তাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছি, দুই বৎসর তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আকুল ভাবে বসিয়া আছি।

পিতৃদেবের বয়স তখন ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, কালের অলঙ্ঘনীয় প্রভাব তাঁহাকে বৃদ্ধত্বের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই সময় সংসারের ঝামেলার মধ্যে না থাকিয়া যাহাতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে পরপারের চিন্তা লইয়া থাকিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে পিতার প্রতি উপযুক্ত পুত্রের শেষ কর্ত্তব্যটুকু সম্পাদন করিবার জন্য ১৩৩৮ সনের মাঘ মাসে ভুবন দা একদিন জন্মভূমিতে আগমন করিয়া পিতৃদেবকে ৺কাশীধাম লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন; মাতৃদেবী, ভ্রাতৃগণ, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি সকলে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া তাহা সমর্থনও করিলেন। কিন্তু স্বয়ং পিতৃদেব ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—"বাবা ভুবন! বৃদ্ধাবস্থায় ৺কাশীধামে গিয়া বাস করাই যে শ্রেয়ঃ তাহা আমি স্বীকার করি, আর আমার আন্তরিক ইচ্ছাও তাই। কিন্তু এই যে কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, ঠাকুরকে লইয়া স্বীয় পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজন সহকারে কত আনন্দ করিব এই আশায় বসিয়া আছি, আমার এ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিয়া ত আর কোথাও যাইতে পারিতেছি না বাবা! কাজেই তুমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর, ঠাকুর আসিয়া গেলে পর তুমি আমাকে লইয়া যাইও, তখন আমার তাহাতে কোন আপত্তি থাকিবে না।" ভুবন দা পিতৃদেবের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ঠাকুরগত প্রাণ বৃদ্ধ পিতাও পুত্রকে বিদায় দিয়া ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ়ের শেষার্দ্ধে ভুবন দা আমাকে একখানা চিঠি দিয়া জানাইলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর অতি শীঘ্রই তোমাদের ভবনে শুভ পদার্পণ করিবেন, তোমরা প্রস্তুত হও। এই চিঠি পাইয়া যে আমাদের কি আনন্দ হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দীর্ঘ দিনের আশা অচিরেই পূর্ণ হইবে অবগত হইয়া আমরা আনন্দভরে এই শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়া দূরদেশস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের এই ক্ষুদ্র ভবনে একত্র করিলাম; শব্দবহ এই আনন্দ-বার্ত্তা

চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিল, একটা আগত প্রায় মহা আনন্দের আভাস যেন স্থানীয় অঞ্চলকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিল।

পূর্ব্বোক্ত চিঠি পাওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরে (বোধ হয় ৩০শে আষাঢ়) ভুবনদার লিখিত আর একখানা চিঠি পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল —"ভাই অধীর! শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের আদেশ মত জানাইতেছি যে তিনি আগামী ৭ই শ্রাবণ শনিবার তোমাদের গৃহে শুভ পদার্পণ করিবেন। যদি এ সময় তোমাদের ওখানে যাইতে কোন বাধা থাকে, তবে পত্রপাঠ জানাইবে, নতুবা আমরা উক্ত তারিখেই তথায় পৌছিব জানিবে; সেই মত বন্দোবস্ত রাখিও—ইত্যাদি।"

তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ব্রজবালা দেবী টাইফয়েড্ রোগে শয্যাশায়ী কাতর। যদিও তখনও তাহার মৃত্যুর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, তথাপি তাহার এই দারুণ রোগ নিরাময় জন্য আমরা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম—অন্যান্য সমস্ত কর্ম্ম ইহার তুলনায় গৌণস্থান অধিকার করিয়াছিল। আমাদের এই আভ্যন্তরীণ বিপদের কথা অন্তরে অন্তরে জানিয়াই কি ঠাকুর স্পষ্ট ভাবে বাধা থাকার কথা উল্লেখ করিলেন? যাহা হউক আমরা ব্রজবালার এই অসুখের সংবাদ গোপন রাখিয়াই সাগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমন প্রার্থী হইয়া একখানা চিঠি দিলাম।

এদিকে রোগিণীর অবস্থা মন্দ হইতে অধিকতর মন্দের দিকে গড়াইয়া চলিল, ঠাকুর আসিবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার অঙ্গে মরণের প্রস্ফুট লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা কিন্তু এই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও সানন্দচিত্তে ঠাকুরের শুভাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলাম, রোগিণীও ভীষণ রোগ-যন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হইয়া জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদা 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' করিতে লাগিল।

* * *

আজ শুভ ৭ই শ্রাবণ, ঠাকুরের অভাবনীয় কৃপা প্রকাশের প্রথম উদ্বোধন দিন, আমাদের পারিবারিক জীবন-নাটকের এক মহা পট-পরিবর্ত্তন তিথি! প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আটটা বাজিতে না বাজিতেই আমরা সকলে নৌকাযোগে ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিলাম। গৃহে পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র কর্ম্মচারী রামানন্দ থাকিল।

ষ্টেশনে পৌছিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে ষ্টিমারের কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি আমাদের নয়ন গোচর হইল, সেই দেখিয়া আনন্দে সকলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। ধীরে যতই তাহা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, আমাদের প্রাণও যেন ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন জন্য ততই আকুল হইতে আকুলতর হইয়া উঠিল। ষ্টিমার আরও নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রসার করিয়া দেখিলাম, ঠাকুর প্রথম শ্রেণীর অগ্রভাগে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন, আর ভুবনদা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিক্ষিপ্ত কেশপাশ সংযত করিয়া দিতেছেন। ষ্টিমার ঘাটে লাগিল, আমরাও সকলে ব্যস্তভাবে উপরে উঠিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম, তাঁহার দর্শনে—তাঁহার স্পর্শনে হৃদয়ের আবেগ কতকটা প্রশমিত হইল। তারপর ঠাকুর ও ঠাকুরের সঙ্গীয় সকলকে লইয়া নৌকায় উঠিলাম, নৌকাও অনুকূল বায়ুভরে হেলিতে দুলিতে ক্ষুদ্র গ্রামাভিমুখে ভাসিয়া চলিল।

ঠাকুর রহিয়াছেন মধ্যস্থলে, আমরা রহিয়াছি তাঁহাকে চতুর্পার্শে বেষ্টন করিয়া। দেখিলাম ঠাকুরের মুখখানা বেশ আনন্দপূর্ণ, অথচ তারই

মাঝে যেন বিষাদ গম্ভীর কালো ছায়ার একটু অস্পষ্ট আভাস! হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তোদের এখানে শ্মশান আছে রে?" আমরা বলিলাম—"না ঠাকুর, আমাদের এখানে তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট পাকা শ্মশান নাই।"

সেদিন তখনও বুঝিতে পারি নাই ঠাকুরের এই আকস্মিক প্রশ্নের নিগূঢ় রহস্য কি, সেদিন তখনও কল্পনায় আনিতে পারি নাই যে অচিরেই আমাদিগকে শ্মশানের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে হইবে—অচিরেই কয়েকটী প্রাণীর অন্তিম ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আমাদিগকে শ্মশানের শরণাপন্ন হইতে হইবে! ঠাকুর কি এই প্রশ্নে তাহারই পূর্ব্বাভাস দিয়া রাখিলেন?

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল, ঠাকুর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সমস্বরে তাঁহার স্তোত্র-বন্দনা আরম্ভ করিয়া দিল। আশ্চর্য্যের বিষয়—এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, তবু ইহার মধ্যে অত বড় একটী সাংঘাতিক রোগীর কথা একবারও আমাদের মনে পড়ে নাই। এ দিকের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রোগীর কক্ষে যাইয়া শুনি তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এমন কি ইতিমধ্যে তাহাকে বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। অথচ আশ্চর্য্য! রোগিণী তখনও ঠাকুরের চরণামৃত পানে সমুৎসুক!

অপরাহ্নে ঠাকুরকে লইয়া নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। ঘন ঘন জয়গুরু ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস আলোড়িত হইয়া উঠিল, বাহিরের জল-তরঙ্গের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যেন হৃদয়েও আনন্দের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হইতে থাকিল। আমাদের এই ঘন ঘন আনন্দ ধ্বনির মাঝে হঠাৎ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা মানুষ মরিলে কিরূপ ধ্বনি দেয় শুনাও দেখি?" আমরা তৎক্ষণাৎ আনন্দভরে মৃতদেহবাহী জনগণের অনুকরণে গগনকম্পী হরি-ধ্বনি দিয়া উঠিলাম—"বোল হরি, হরি বোল।" তখনও জানি না আগামী কল্য ঠিক এমনি সময়েই এমনি করিয়া আমাদের হরিধ্বনি দিতে হইবে, এমনি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া আমাদের সোণার প্রতিমাকে চির বিসর্জ্জন দিতে হইবে! রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পূর্ব্বে অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠানের মত পূর্ব্বাহ্নেই কি ঠাকুর আমাদের এই অংশের পূর্ব্বাবৃত্তি (Rehearsal) করাইয়া রাখিলেন?

সহসা একখণ্ড বর্ষণোন্মুখ মেঘ আবির্ভূত হইয়া সমস্তটা আকাশ জুড়িয়া বসিবার উপক্রম করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভ্রমণ অসমাপ্ত রাখিয়াই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম।

সন্ধ্যার সময় আরতির আয়োজন হইল, ঠাকুর আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন; আরতি আরম্ভ হইবে এমন সময় সংবাদ আসিল রোগিণী ঠাকুরকে দেখিতে ইচ্ছুক। অমনি ঠাকুর উঠিলেন, উঠিয়া তাহাকে দর্শন দিতে চলিলেন।

পাঁচ মিনিট কাল স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি স্বীয় আসনে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে বলিলেন—"এমন সাংঘাতিক রোগী বাড়ীতে থাকিতে তোমরা আমাকে আনিলে কেন? এ সংবাদ তো পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের জানান উচিত ছিল!" আমরা নিরুত্তর। এমনি করিয়া নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, ঠাকুর সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা আজ বা কাল যদি এই রোগীর কিছু হয়, তবে তোরা কি আমাকে লইয়া এমনি আনন্দ করিতে পারিবি?" যন্ত্রীর হাতে পরিচালিত যন্ত্র-পুত্তলিকার মত—কোন্ অদৃষ্ট শক্তির অলঙ্ঘনীয়

প্রেরণার বশে অবশের মত আমরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলাম—"খুব পারব ঠাকুর!" অবশ্য এত বড় কথাটা আমাদের মত অর্ব্বাচীন অনুপযুক্ত ভক্তের মুখে বাহির হওয়া অসমীচীন, তথাপি কেমন করিয়া যে তাহা সে সময় আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। আমাদের এই উত্তর শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—"তোরা পারবি, কিন্তু আমি তো পারব না!"

ইহার পর আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন—"এবার তোদের ঠাকুর আসার গূঢ় রহস্য আছে--পর পর তা প্রত্যক্ষ করবি।" আমরা আনত শিরে তাঁর বাণী শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া আরতি শেষ করিয়া ফেলিলাম।

৮ই শ্রাবণ প্রাতে রোগীর অবস্থা চরমে দাঁড়াইল। এ অবস্থায় ঠাকুরভোগের আয়োজন করিব কিনা নিজেরা স্থির করিতে না পারায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"২টা—২॥টার সময় তাহার দেহত্যাগ ঘটিবে, ইহার পূর্ব্বে নয়, অতএব তোমরা ভোগের আয়োজন করিতে পার।"

সময় মত ঠাকুরভোগ হইয়া গেল, আমরাও সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। অতঃপর ঠাকুর আমাদের প্রসাদ লওয়া শেষ হইয়াছে কিনা জানিয়া লইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

এদিকে আমরা রোগীর কক্ষে যাইয়া দেখি তাহার অন্তিম অবস্থা। ত্রস্তে-ব্যস্তে তাহাকে তুলসীতলায় লইয়া আসিলাম, ঠিক বেলা ২টার সময় সে 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' করিতে করিতে দেহত্যাগ করিল—ঠিক বেলা ২টার সময় অনাঘ্রাত পুষ্পবৎ তাহার পবিত্র আত্মা ঠাকুরের চরণে লীন হইল।

সংসারী লোকের পক্ষে অসহনীয় এই সন্তান-বিয়োগ যন্ত্রণা কেমন করিয়া যে আমরা সহিবার শক্তি পাইলাম তাহা শক্তিদাতাই জানেন। ৪৫ জন পরিজন লইয়া ঠাকুরের এই ক্ষুদ্র পরিবারটী গঠিত, এই ৪৫ জনের মুক্তকণ্ঠ ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইলে যে কি এক ভীষণতম ব্যাপার সংঘটিত হইত, আকাশ-বাতাস যে কি শব্দালোড়নে আলোড়িত হইয়া উঠিত, তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য্য! এই মৃতার পিতা--মাতা, পিতামহ-পিতামহী, আত্মীয়--স্বজন, কাহারও কণ্ঠে ক্রন্দনের লেশমাত্র শোনা যায় নাই, কাহারও চক্ষে একবিন্দু অশ্রুর আভাসও পরিলক্ষিত হয় নাই! ভিতরে ভিতরে ঠাকুর যেন সকলের শোক-বিহ্বলতা হরণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শান্তি ও আনন্দ, শক্তি ও ভক্তি প্রদান করিয়াছেন, সকলের প্রাণে বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপযোগী উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

আমরা সকলে সানন্দে ব্রজবালার মৃতদেহ বহন করিয়া তাহার শেষ কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রস্থান করিলাম, যাঁহারা গৃহে রহিলেন তাঁহারাও অকুণ্ঠিত চিত্তে অকম্পিত প্রাণে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এদিকে বিশ্রামান্তে ঠাকুর ভুবনদার নিকট ব্রজবালার মৃত্যুকাহিনী এবং আমাদের তদানীন্তন আচরণাদির বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইলেন, আনন্দে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইল, আরতির আয়োজন হইল, ঠাকুর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন, মৃতের পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আরতি আরম্ভ হইবে, এমন সময় ঠাকুর গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আমি ব্রজবালার মৃত্যুর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তোমরা আজ ব্রজবালাকে আমার হাতে তুলিয়া দিয়া তোমাদের ঠাকুরকে চিরদিনের মত কিনিয়া রাখিলে। আজ হইতে

এই ঠাকুর সূক্ষ্মভাবে তোমাদের গৃহে বাঁধা রহিলেন, যখনই তোমরা ডাকিবে, তখনই তিনি তোমাদের দেখা দিবেন, তখনই তিনি শান্তির—তৃপ্তির অমিয়-ধারায় তোমাদের স্নাত করাইবেন। আজ তোমরা যে প্রকার বিয়োগ-বেদনা হাসিমুখে সহ্য করিলে, আমি আশীর্ব্বাদ করি ইহা অপেক্ষাও আরও বড় বড় বিপদ্ তোমরা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে সক্ষম হও।"

ঠাকুরের এই বজ্রগম্ভীর অভয়-আশীর্ব্বাণী প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করিল, ভবিষ্যবিপদ্ সহনোপযোগী একটা দৃঢ়তার ভাব যেন সকলের প্রাণে বিদ্যুচ্চমকের মত খেলিয়া গেল—সকলে সমস্বরে 'জয়গুরু' ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। এইভাবে সেই দিনের আরতিক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল।

* * *

ঠাকুরকে লইয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম, তাঁহার সাহচর্য্যে আমাদের চিত্ত নূতন উপাদানে গঠিত হইতে লাগিল। কাহারও মুখে বিষাদের ছায়া মাত্র নাই, কাহারও বুকে হা-হুতাশের ভাব নাই; সকলেই আনন্দে ভরপুর। ইতি মধ্যে আমাদের গৃহে যে কাহারও মৃত্যু ঘটিয়াছে—আমাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না।

এই ভাবে পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইলে পর হঠাৎ একদিন রাত্রি দুই ঘটিকার সময় ঠাকুর ভুবনদাকে ডাকিয়া বলিলেন "ভুবন! তোর পিতার অবস্থা খারাপ।" ভুবনদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তিনি কি এই যাত্রাই দেহ রক্ষা করিবেন?" ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ"।

পর দিন প্রাতে ভুবনদা যখন আমাদের সম্মুখে পিতৃদেব সম্বন্ধে ঠাকুরের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন, তখন আমরা বিস্মিত হইলাম, কারণ তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুর কথা দূরে থাকুক, কোন ব্যাধির লক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, বেলা দ্বিপ্রহর হইতেই পিতৃদেব আহার ত্যাগ করিলেন; তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অথবা মরণ দেবতার নিয়ন্ত্রিত তা কে জানে? যাহা হউক তখনই বুঝিতে পারিলাম তাঁহার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিতেছে—মরণের বড় বেশী বিলম্ব নাই, এই আহার ত্যাগেই তাহার সূচনা!

আমরা সমবেতভাবে পিতৃদেবের অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাদের আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের পিতার আয়ু নাই, তৈল-হীন প্রদীপের মত আয়ুহীন দেহে সে কোন প্রকারে টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে; ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশতঃ সে এখনও জীবিত রহিয়াছে, তবে এই যাত্রাই তাহার শেষ যাত্রা!"

তখন প্রকৃতই বুঝিলাম—পিতৃদেব একান্তই আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন, কোন উপায় নাই। তিনি চলিয়া যাইবেন এই কথা ভাবিতেই যেন হৃদয়টা ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, দেহটা নিস্পন্দ হইতে আরম্ভ করিল। ভাবিতে লাগিলাম—কেমন করিয়া আমরা তাঁহার বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করিব?

ঠাকুরকে বলিলাম—"তুমি থাকিতে থাকিতে যদি বাবার দেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে আমরা হাসিমুখে সব ব্যথা-বেদনা সহিয়া যাইতে পারিব ঠাকুর! অতএব যাহাতে তোমার উপস্থিতিতেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে, তুমি তাহারই ব্যবস্থা কর।" ঠাকুর বলিলেন—"আমি থাকিতে তাহার মৃত্যু ঘটিবে না, আমি থাকিলে তাহার মাঝে বিপরীত শক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, কাজেই আমার এখানে আর না থাকাই শ্রেয়ঃ।"

ঠাকুর যাওয়ার প্রস্তাব করিতেই প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল, মনে মনে প্রার্থনা করিলাম—যাইও না ঠাকুর যাইও না, এই ভাবে তুমি আমাদের অন্তরে-বাহিরে অবস্থান করিয়া ব্যথার দহনে দহিয়া আমাদিগকে শান্তির প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া চল।

আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনায় আকুল আগ্রহে ঠাকুর ৯দিন আমাদের গৃহে অবস্থান করিলেন, ৯দিন তাঁহার সঙ্গ-লাভ করিয়া আমরা জগৎ ভুলিয়া থাকিলাম। দশ দিনের দিন তিনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আমরাও এদিকে কায়মনোপ্রাণে পিতার সেবায় নিযুক্ত হইলাম।

* * *

ভুবনদা ঠাকুরকে পৌঁছাইয়া দিয়াই পিতার শেষ কার্য্য সম্পাদন জন্য পুনরায় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি আসিয়াই পিতৃদেবকে বলিলেন—"ঠাকুর নিজ মুখে বলিয়াছেন যে তিনি যথা সময়ে আপনাকে দর্শন দিয়া আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।" এই কথা শুনিয়াই তিনি বালকের মত আনন্দে অধীর হইয়া 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' করিয়া উঠিলেন।

পিতাঠাকুর মহাশয় ঘোর সংসারী ছিলেন, অভাবহীন সংসারের সংসারী-সাধারণোচিত আসক্তিও তাঁহার কম ছিল না, কিন্তু এই মৃত্যু-বাসরে তাঁহার সে সমস্ত ভাব এমনি শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে অবিরত "জয় গুরু" মহানাম ব্যতীত সাংসারিক কোন আকর্ষণের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। এই সময় তিনি স্পষ্টভাবেই প্রার্থনা করিতেন—"ওগো ঠাকুর! তুমি আমার অন্তরের বাসনা কামনা নিঃশেষে হরণ করিয়া তাহার স্থলে আমাকে ভক্তি বিশ্বাস প্রদান কর।"

মরণোন্মুখ জীবের সংসারাসক্তির প্রধান লক্ষণ মৃত্যুভীতি। আপন হাতে গড়া সাধের সংসার ছাড়িয়া যাইতে কাহারও প্রাণ চাহে না। কিন্তু এই অন্তিম সময়ে আমাদের পিতৃদেবের আসক্তির বন্ধন এমন ভাবে খুলিয়া গিয়াছিল যে আসন্ন মৃত্যুর কথা অবগত হইয়াও তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়েন নাই, মৃতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অমৃতকে অনাদর করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক অযাচিত কৃপায় তিনি মৃত্যুকে এমন ভাবে জয় করিয়াছিলেন যে নিজেই নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন আর বলিতেন—'না, এখনও আমার সময় হয় নাই'। মুখের সম্মুখে কখনও বা আয়না ধরিয়া বলিতেন—"কই এখনও ত আমার মুখের উপর মৃত্যুর করাল ছায়া পড়ে নাই!"

এই পাপ-পঙ্কিল জগতে থাকিতে তাঁহার যেন আর মন সরিতে ছিল না, বেশী বিলম্ব যেন আর সহ্য হইতে ছিল না। তাই কেহ যদি বলিত যে নাড়ীর অবস্থা ভাল, তাহা হইলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন, আর মনে মনে বলিতেন—ঠাকুর আর কত দেরী?

একদিন ভুবনদা নাড়ী দেখিতেছেন, এমন সময় তিনি বলিলেন—"বাবা ভুবন, নাড়ীর অবস্থা কেমন দেখলি?" ভুবনদা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে নাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। ইহা শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তা'হলে শীঘ্রই আমার দেহত্যাগ ঘটিবে?" ভুবনদা বলিলেন—'হাঁ'। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যি বলছ শীঘ্রই আমার দেহত্যাগ হবে? এবারেও ভুবনদা বলিলেন—"হাঁ"। ইহা শুনিয়া পঞ্চষষ্টিতম বর্ষের বৃদ্ধ, বালকের মত বাঃ বাঃ বাঃ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন আর গান ধরিলেন—"কালভয় সভয় গুরু ডাকি হে তোমায়, রাম কমল আঁখি জীবন ত অন্ত হয় না আজি—ইত্যাদি।"

এই সময় গ্রাম ও গ্রামান্তরের ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। পিতার বাল্যবন্ধু স্থলের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্তবাবু অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় প্রায়ই তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহাকে বলিতেন—"দেখুন অখিল বাবু! সতীন সেন, যতীন দাস প্রভৃতি দেশসেবকগণ কত দিন অনাহারে থাকিয়া কত অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন; আমিও সেই ভাবে থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া লইব। বরং ততোধিক কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করিতে প্রস্তুত, তথাপি ঠাকুর দর্শন না হইলে দেহ ত্যাগ করিব না, এই আমার পণ!"

মৃত্যুর ৩ দিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের পাঁচ ভাইকে ডাকিয়া লইয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাবা সকল! তোমরা পঞ্চ পাণ্ডবের মত একপ্রাণ হইয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিও, ধর্ম্মপথ হইতে যেন কখনও বিচ্যুত হইও না। পাণ্ডবদের যেমন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদেরও তেমনি রহিলেন ঠাকুর। তিনিই তোমাদের সহায়, তিনিই তোমাদের পথ-প্রদর্শক। তিনি থাকিতে আর তোমাদের ভয় কি?—ঠাকুরের অপার মহিমা, সে মহিমার আদি অন্ত নাই; সৌভাগ্যবান্ তোমরা যে অমন ঠাকুরের চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছ। এখন অবিচলিত-চিত্তে তাঁহার উপর নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন—"কি বাবা! তোরা ঠাকুরের পথে চল্‌তে পার্‌বি তো?"

আমরা বলিলাম—"ঠাকুরের পথ কি তা তো এতদিনেও জানি না!"

তিনি বলিলেন—"ঠাকুরের পথ সমর্পণের পথ, আত্মাহুতির পথ। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন সব—এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত তাঁর পায়ে বিলাইয়া দিতে হইবে, ঠাকুরের সংসারে ঠাকুরের হইয়া ঠাকুরের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এ হাসি-খেলার কথা নয়, আগুন নিয়ে খেলা! কখনও যেন তোমরা এই লক্ষ্য—এই আদর্শ হতে চ্যুত না হও, এই আমার শেষ কথা—এই আমার শেষ আদেশ বা উপদেশ।"

পরলোকযাত্রী সাধক পিতার এই স্নেহপূর্ণ আদেশ ও আশীর্ব্বাণী আমরা অবনত শিরে গ্রহণ করিয়া লইলাম, আর মনে মনে বলিলাম—"ঠাকুর! এ অনুপযুক্তদের দিয়া তোমার যাহা করিবার তাহা করাইয়া লইও।"

ক্রমে মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তিনি দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এখন তাঁহার আর নিজের কোন সামর্থ্য রহিল না, তাঁহাকে ধরিয়া বসাইতে ও শোয়াইতে হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়াপাত হয় নাই।

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি ব্রজের বাঁশী ও মৃদঙ্গের বাজনা শুনিতে পাইলেন আর তাহা সানন্দে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে থাকিলেন। মৃত্যুর ঠিক একদিন পূর্ব্বে রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া করতালি দিতে দিতে ঠাকুরের স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন—"ওই যে আমার ঠাকুর আসিতেছেন, কি আনন্দ! কি আনন্দ!!" আমরাও সঙ্গে সঙ্গে 'জয়গুরু' কীর্ত্তন ধরিলাম। কীর্ত্তন সমাপনান্তে দেখি পিতাঠাকুর মহাশয় বেশ স্থির-ধীর ভাবে শুইয়া রহিয়াছেন, আর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি যেন দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। সেই

সময় আমরা গৃহাভ্যন্তরে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত সহস্র গোলাপের গন্ধ পাইতে লাগিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের সন্ধানে চতুষ্পার্শে আমাদের এতগুলি ব্যাকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াও অঙ্গগন্ধ ভিন্ন তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম না।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বদিন অগ্রসন্ধ্যায় তিনি বলিতে লাগিলেন—"সব পরিষ্কার, কোন জায়গায় একটুও বাধা নাই। ঐ যে বাঁশী শোনা যায়, ঐ যে ব্রজের বাঁশী! বিজয় কৃষ্ণ, পরমহংসদেব, তোমরা আসিয়াছ, কিন্তু কৈ আমার ঠাকুর কোথায়?"

পিতৃদেব যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন সমস্ত ঘরটী কেতকী পুষ্পের মধুর গন্ধে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; বুঝিলাম নিশ্চয়ই তথায় গোস্বামীপ্রভু আর পরমহংসদেবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

রাত্রিকালে পিতৃদেব কেমন যেন একটা অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিলেন—কেমন যেন অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করিতে থাকিলেন, তখনই আমরা "জয়গুরু" কীর্ত্তন ধরিলাম, আর অমনি তিনি স্থির-প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। অস্থিরতার পর কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের পর অস্থিরতা, এইভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মূত্রত্যাগ করিবেন বলিয়া পিতৃদেব তাঁহাকে উঠাইতে বলিলেন। আমরা তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলাম, তিনি মূত্রত্যাগের স্থলে মলত্যাগ করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব পরিষ্কার করিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম; গঙ্গা মৃত্তিকা, চন্দন এবং আতরাদি সুগন্ধি অনুলেপনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া দিয়া বিনয়দা তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

তখনও প্রভাত হয় নাই, পূর্ব্বাকাশ ভালে তখনও দিবালোক প্রকাশিত হয় নাই, এমন সময় পিতৃদেব আপন হৃদ্দেশে কর স্থাপন পূর্ব্বক তিনবার জয়গুরু মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠাকুর! এই মৃত্যু! এই মৃত্যু!" তাঁহার বদনমণ্ডল আনন্দের বিমল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সমস্ত অঙ্গ যেন পুলক-শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। তিনি উপস্থিত আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন——"আমাকে বাহির কর।" তাঁহার আদেশানুসারে আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তখনই তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া তুলসীতলায় রাখিলাম, দেখিলাম তখনও তাঁহার ওষ্ঠে মৃদু স্পন্দন হইতেছে, ... তারপর সব শেষ! সেদিন ২৮শে শ্রাবণ শনিবার, সবে মাত্র তখন অরুণ কিরণ ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

পিতৃদেবের এই মহাপ্রস্থানে ক্রন্দনের উচ্চরোলের স্থলে গৃহে উঠিল জয়গুরু মহানামের মধুর ধ্বনি, বিষাদ কালিমার পরিবর্ত্তে সকলের মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হইল অটল স্থৈর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আনন্দের সুস্পষ্ট আভাস!

আমরা জয়গুরু কীর্ত্তন করিতে করিতে পিতার মৃতদেহ সৎকার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম, অতিরিক্ত ৮ খানা নৌকা স্ত্রী-পুরুষে পূর্ণ হইয়া জয়গুরু ও হুলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পবিত্রীকৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এইভাবে আনন্দোৎসবের মধ্যে আমরা শবদাহ সমাপন করিলাম, এইভাবে আনন্দ করিতে করিতে আমরা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, পিতার বিয়োগজনিত দারুণ শোক বুঝি আমরা সহিতে পারিব না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখি ঠাকুরের স্নেহাশীর্ব্বাদে অতি সহজ ভাবেই তাহা সহিয়া গেল। আমাদের নিরানন্দ নাই, শোক-তাপ নাই, হা-হুতাশ নাই। ঠাকুর যেন আমাদের যাবতীয় শোক-তাপ হরণ করিয়া তাহার স্থলে আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। গৃহে

ক্রন্দনের শব্দ নাই, কাহারও মুখে বিষাদের ছায়া-মাত্র নাই।

* * *

একটা কথা প্রচলিত আছে, বিপদ্ যখন আসে তখন একাকী আসে না বা মুহূর্ত্তেই চলিয়া যায় না,—বেশ সাঙ্গোপাঙ্গ জুটাইয়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে সে অভিনয় করিতে থাকে। আমরা আমাদের সংসার-জীবনে এই কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আমার তৃতীয় ভ্রাতার ২॥ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা গতাসু হইল। হউক না সে ২॥ বৎসরের মেয়ে, থাকুক না সে অল্প-দিন মাত্র মাতৃক্রোড়ে, তথাপি সন্তান তো! ইহারই মায়া ছাড়ানো কি সাধারণ জীবের পক্ষে সহজসাধ্য? সদ্যোজাত সন্তানের দূরের কথা—মৃত সন্তান প্রসব করিয়াও প্রসূতিকে—তাহার আত্মীয়-স্বজনকে হা-হুতাশ করিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি, উচ্চ বিলাপ-ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া শিরে করাঘাত করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আর এ তো দীর্ঘ ২॥ বৎসর ধরিয়া মায়ের কোলে লালিত-পালিত হইয়াছে, কত হাসিয়াছে—হাসাইয়াছে, কত খেলিয়াছে—খেলাইয়াছে, কাজেই ইহার বিয়োগে জনক--জননীর——আত্মীয়--স্বজনের বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্য! অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং তাহার গর্ভধারিণী জননীর মুখেও বিষাদের লেশমাত্র নাই, অন্তরেও বুঝি তাহার ছায়াপাত হয় নাই!

আমরা সকলে সেই মৃতদেহটী লইয়া তুলসী-তলায় বসিয়া "জয়গুরু" নাম করিতেছি, সঙ্গে এই পরিবারের ছেলে-মেয়ে সকলেই সেই মধুর নামে মত্ত হইয়াছে, এমন সময় মৃতার গর্ভধারিণী এবং তাহার খুড়ীমাতারা দুইজন বালক-বালিকার স্বভাব-সুলভ ক্রীড়া-চপলতা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন তাহাদের প্রাণে কত আনন্দ! পুত্র-বধূদের এই অসময়োচিত বিসদৃশ ব্যবহারে বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন——"বৌমারা! তোমরা এই মৃতদেহটীকে সম্মুখে রাখিয়া এইরূপ হাসিতেছ, লোকে দেখিলে কি বলিবে বল দেখি?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উত্তর দিলেন—"কি করিব মা! ঠাকুর যে আমাদের অন্তরে বিরাজ করিয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দের অজস্র ধারা ঢালিয়া দিতেছেন, আমরা যে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছি না!"

সুধী পাঠক! একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, ঠাকুরের কি অপার মহিমা! তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহতী শক্তির কি অপূর্ব্ব লীলাবিলাস! গর্ভধারিণী জননী আপনার সম্মুখে স্বীয় গর্ভজাত মৃত সন্তানকে রাখিয়া বসিয়া আছেন, এ দৃশ্য কল্পনায় অঙ্কিত করিলেও যে প্রাণে কেমন একটা বিষাদের ভাব জাগিয়া উঠে, চিত্ত আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে! সে অবস্থা যে কি ভীষণ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখিলাম ঠিক তাহার বিপরীত, কল্পনার অতীত—ধারণার অতীত এক রহস্যময় দৃশ্য, শোকের পরিবর্ত্তে শান্তি, ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে হাসি, দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দ!—ধন্য ঠাকুরের মহিমা!—

* * *

এই ঘটনার ১০।১২ দিন পরেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একাদশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্বর রোগে আক্রান্ত হইল। মহা-মায়ার ইচ্ছায় এই জ্বর ক্রমে টাইফয়েডে পরিণত হইয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করাইল। তখনই বুঝিলাম শম্ভুরও অকাল বিদায়ক্ষণ সমাগত প্রায়।

আমাদের পরিবারের ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় স্তোত্র-বন্দনাদি করিয়া থাকে, এই শম্ভুনাথ ছিল তাহাদের অগ্রণী। কিন্তু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পর হইতে সে আর তাহাদের সহিত একত্রে বসিয়া সে আনন্দে যোগ দিতে পারিত না। তথাপি শুইয়া শুইয়া দূর হইতেই সে তাহার আকুলতা ভরা প্রাণের বেদন ক্ষীণ কণ্ঠে তথায় পৌঁছাইয়া দিত—দূর হইতেই তাহাদের স্বরে স্বর মিলাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিত।

রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় সে অধীর হইয়া পড়ে নাই, অশেষ যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইয়াও কোন দিন সে ঠাকুরকে ভুলিয়া যায় নাই। সব সময় তাহার মুখে লাগিয়া থাকিত মধুমাখা 'জয়গুরু' নাম, আর মাঝে মাঝে সে ধরিত—"জয়গুরু ·····তোমার নাম নিলে হয় আনন্দ" এই চিরাভ্যস্ত গান।

এই ভাবে ৭।৮ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, ক্রমশঃ তাহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, বাক্‌শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণভাব ধারণ করিল। এ অবস্থায় কথা কহিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত, তথাপি একদণ্ডও সে 'জয়গুরু' নাম ছাড়ে নাই, তখনও সে বলিত "জয়গুরু······ ·, মা! আর তো পারৃছি না, তুমি এখন বলে দাও।" অমনি তাহার মা গানের অবশিষ্টটুকু বলিয়া দিতেন।

অল্পদিন মধ্যেই তাহার বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল, আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট-ভাবে তাহার দেহে ফুটিয়া উঠিল!

* * *

আর বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া তাহাকে তুলসী তলায় আনিয়া রাখিলাম, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে একটু মৃদু হাসিল—হাসিয়া সে তাহার কোমল বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটী অবশ হইয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুনাথ আমাদের নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল।

পিতা মাতা আদর করিয়া সন্তানকে কোলে লইবার সময় যেমন সে সানন্দে হাত বাড়াইয়া তাঁহাদের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি ঠাকুরের শম্ভুনাথও বুঝি মৃদু হাসিয়া হাত বাড়াইয়া ঠাকুরের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

সে এক স্মরণীয় ক্ষণ; সে দিন ২৯শে আশ্বিন, রাত্রি তখন গভীর।

আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব ঘোর সংসারী হইয়াও তাঁহার অন্তিম সময়ে দেখাইয়া গিয়াছেন, কিরূপ নির্লিপ্তভাবে সংসার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া শ্রীগুরু চরণে স্থান পাওয়া যায়, আর এই বালক এত অল্প বয়সেই দেখাইয়া গেল কিরূপ ভক্তি আর সরল বিশ্বাস লইয়া শ্রীগুরুর কোলে উঠিতে হয়।

* * *

পিতা মাতার সম্মুখে উপর্য্যুপরি সন্তানের মৃত্যুশয্যা, উপর্য্যুপরি বক্ষের ধনকে মরণের কোলে তুলিয়া দেওয়া—এ যে সাধারণ জীবের পক্ষে কি অসহনীয় ব্যাপার, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সে করুণ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়া ভাষা পঙ্গু হইয়া যায়, ভাব স্তব্ধ হইয়া আসে। কিন্তু পুনরুক্তি দোষ ঘটিলেও এ স্থলে সেই পূর্ব্বের আচরণক্রম উল্লেখ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এ ক্ষেত্রেও পিতা মাতার চোখে জল আসে নাই, কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হয় নাই। বরং শম্ভুর এই অকাল প্রস্থানে তাহার সঙ্গীয় বালক বালিকারা একটু বিচলিতের ভাব দেখাইতেই শম্ভুর মা অমনি তাহাদিগকে হাসিমুখে প্রবোধ দিয়া তাহাদের সহিত ভুবনমঙ্গল 'জয়গুরু' মহা নামে মত্ত হইলেন —এমনি করিয়া 'জয়গুরু' মহা নামের শান্তিময়

স্বরলহর সে :নিশীথ স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া কোন্ সুদূরে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া চলিল।

*　　*　　*

আমরা সকলে যথা নিয়মে মৃতদেহের সৎকার করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সবিস্তারে পত্র দিলাম। সেই পত্র পাইয়া ভুবনদা আমাদের বড় দাদাকে ও আমাকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে ঠাকুরের অপার করুণার কথা, ভক্তের প্রতি ভগবানের ব্যাকুলতার কথা অবগত হইয়া আমরা পুলকস্তম্ভিত হইলাম, কৃতজ্ঞতায় আমাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সে পত্র দু'খানা ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ ইহা হইতে শিষ্যের প্রতি গুরুর অহেতুক কৃপার কথা—ভক্তবৎসলতার: কথা সম্যক্ উপলব্ধি করুন।

(১)

শ্রীশ্রীগুরুভক্তি পরায়ণেষু—

সুরেন দা! আপনাদের সকলের পত্রই শ্রীশ্রী ঠাকুর মহারাজ পাইয়াছেন, তিনি নিজ হস্তেই পত্রের জবাব দিবেন, তাহাতেই বিস্তারিত অবগত হইবেন। অদ্য প্রাতে ৯টার সময় শ্রীমান্ অধীরের পত্র পাইলাম, তাহাতে /৫ সের বেদানা পাঠাইবার কথা লিখিত ছিল। তার পর শ্রীমান্ অধীরকে পত্র দিব বলিয়া পত্র লিখিতে বসিয়াছি, এমন সময় আর এক পিওন আসিয়া তাহার আর একখান পত্র (ঠাকুরের নামীয়) দিয়া গেল। আমি হাতের লেখা দেখিয়া চিনিতে পারিলাম, তাই কি সংবাদ আছে তাহা জানিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজকে পত্রখানা দিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ পত্রখানা পড়িয়া (অর্থাৎ পড়িতে পড়িতে) আমার দিকে না তাকাইয়াই সেখান আমার হাতে দিলেন আর বালকের মত মাথায় হাত দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ১৫ মিনিট কাল তিনি আর মাথা উঠাইলেন না, তৎপরে নিকটস্থ ২।১ জন ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন—"ভুবনের বাড়ীতে চার চারটা এ ক'মাসের মধ্যে গেল, অথচ তাহাদের কি অচল অটল ভক্তিবিশ্বাস! আমি যে উহাদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে কি দিব ভাবিয়া পাইতেছি না—উহারা কি ভীষণ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে!" * * *

দাদা! আপনাকে আমার লিখিবার কিছুই নাই। আমি বেশ বুঝিয়াছি যে আপনার এবং আপনাদের উপর শ্রীগুরুকৃপা যথেষ্ট আছে, আর বোধ হয় প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝি আপনাদিগকে এইরূপ অগ্নি পরীক্ষায় ফেলিয়া রসশূন্য করিয়া লইয়া তাঁহার অমৃতময় কোলে তুলিয়া লইবেন, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন! আর আপনাদের সন্তান—তাহারা ত কোন রূপ পাপে লিপ্ত হয় নাই, কাজেই শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। তাহারা কেবল পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের জন্য সামান্য কিছু ভোগ করিয়াই মুক্তিলাভ করিয়া যাইতেছে।

দাদা! জগতে কেহই কাহারও নয়, ইহা ত বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, সবই মায়ার খেলা মাত্র। ভগবান্ জীবকে জগতে খেলার পুত্তলিকা করিয়া পাঠাইয়াছেন, আবার সে খেলা শেষ হইলেই তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, অতএব ইহাতে দুঃখের কি আছে? * * * * যাক্ এ বিষয়ে আপনাকে আমার আর লিখিবার কিছুই নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ অদ্যই আপনাদিগকে পত্র দিতেন, কিন্তু তিনি নিজেই এত ব্যাকুল হইয়াছেন যে তাঁহার আর পত্র লিখিবার শক্তি নাই। তিনি বলিতেছেন—"আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

দাদা! অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণ যেমন অভিমন্যুবধে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ আপনাদের প্রাণের ঠাকুরও সেইরূপ শম্ভুর বিয়োগে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদের সমস্ত শোক-তাপ নিজে গ্রহণ করিয়া তিনি যে আপনাদিগকে শান্তি ও আনন্দ দিতে পারিয়াছেন, এইটুকুই তাঁহার সান্ত্বনা।

ঠিক মনে হইতেছে না—আপনাদের বাড়ীর কে যেন স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুর যেন বলিতেছেন —"ভুবনের আরও ৩টীর সংকার করিতে হইবে, আমার পাও চলে না।" তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, আর আজ আমি নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

দাদা! আপনাদের ভক্তি-বিশ্বাস দেখিয়া মনে হয় প্রকৃতই আপনারা জ্ঞানী এবং ভক্ত, কারণ এই সব পরীক্ষায় আপনারা তাহার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি যেন আপনারা এইরূপ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজেদের মহাশোককে মহাশান্তিতে পরিণত করিয়া অনাবিল আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন। মুখে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া ও কহিয়া থাকে, কিন্তু হাতে কলমে তাহা দেখাইতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল। —আর বিরল হইলেও তাহাদের আদর্শই জগতের লোক গ্রহণ করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার যাহা করিবার তাহা করিয়া যাইতেছেন, আপনারা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি নিজে এই সব করিয়া আপনাদের দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছেন ইহা যেন বিস্মৃত না হন। আর অধিক কি লিখিব। আপনারা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের আশীর্ব্বাদ জানিবেন। অত্র মঙ্গল। ইতি—

(২)

কল্যাণবরেষু—

প্রাণের অধীর! এই পত্রখানা খুব প্রীতি এবং আনন্দের সহিত দিতেছি জানিবে। বেলা ৯টার সময় তোমার পত্র পাইয়া বেদানা কিনিতে যাইব, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নামীয় তোমার আর একখানা পত্র পাইলাম। ভাই অধীর! বাস্তবিকই তোমরা ধন্য, তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাসকে ধন্য। তোমরা যে প্রকৃত ভক্ত তাহা অক্ষরে অক্ষরে পরিচয় দিয়াছ এবং দিতেছ। জগতের নিয়ম-অনুসারে ভগবানের জন্য ভক্ত ক্রন্দন করিয়া থাকে, ইহাই চিরকাল শুনিয়া আসিতেছিলাম, আর আজ তদ্বিপরীতে দেখিলাম ভগবৎস্বরূপ শ্রীগুরুদেব ভক্তের জন্য কাঁদিয়া আকুল! সে যে কি অভাবনীয় দৃশ্য—তা যে না দেখিয়াছে সে কিছুতেই অনুভব করিতে পারিবে না। ভক্তের জন্য ভগবানের বালকের ন্যায় ক্রন্দন তাহা কোন দিন শুনি নাই, কিন্তু আজ নিজ চক্ষে দেখিয়া নিজ জীবনকে ধন্য বোধ করিতেছি। যাহাদের ভক্তি বিশ্বাসে শ্রীগুরুর আসন পর্য্যন্ত টলিয়া যায়, তাহাদের কোল পাইবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। * * * * তোমাদের আর বেশী কি লিখিব, তোমরা বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। কারণ পিতা ছিলেন শিবস্বরূপ —আর জননী হইতেছেন মহাশক্তিস্বরূপিণী! তাহার উপর আবার ভগবৎস্বরূপ শ্রীগুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছ, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? আমি আশা-করি তোমরা দিন দিন এইরূপ মন-প্রাণকে দৃঢ় করিয়া শ্রীগুরুর চরণে আত্মবলি দিয়া তাঁর মনের মত হইয়া উঠ। * * * যখনই জীব আধ্যাত্মিক জগতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই অধ্যাত্মগুরু সংসারের ঘাত প্রতিঘাত দিয়া তাহাদের সংসার-মায়া ছিন্ন করিয়া দেন। ইহাই বিধির বিধান। * * * আর অধিক কি লিখিব, তোমরা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহাশীর্ব্বাদ

লইও। তাঁহার পত্রও ২১ দিনের মধ্যেই পাইবে। ইতি—

ভুবনদার এই চিঠি পাওয়ার পরেই ২১ দিনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত অমিয়বর্ষী একখান চিঠি আমাদের হস্তগত হইল—সেটী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। ঠাকুরের সেই চিঠি পড়িয়াই ঠাকুরের স্বরূপ আমাদের অন্তরের মাঝে ফুটিয়া উঠিল, জীবন-মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত আনন্দ-লোকের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। আনন্দের প্লাবনে আমরা ভাসিলাম, ঠাকুরের মত ঠাকুর লাভ করিয়াছি বলিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

বর্ত্তমানে সেই চিঠিই আমাদের জীবনপথের দীপিকা, আশা-ভরসা-সান্ত্বনার চরমতম অভিব্যক্তি, ক্রমান্বয়িক আগমিষ্য বিপদ্‌রাজি সহ্য করিয়া হাসি-মুখে মায়ার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার অমোঘ সঙ্কেত!

বুঝিলাম, যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায়ই থাকি না কেন, কোন দিন আমরা ঠাকুর ছাড়া হইব না, ঠাকুরও কোন দিন আমাদের ছাড়া হইবেন না। তিনি যেন জীবন-মৃত্যুকে আপন করতলগত করিয়া আমাদিগকে তাঁর অমৃতময় বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়া-ছেন—পৌনঃপুনিক আঘাতে অনিত্যের স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া আমাদিগকে নিত্যের পানে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত এই শ্রেণীর চিঠি প্রকাশের এখনও সময় হয় নাই, তাই তাহার আভাসটুকু দিয়াই আমি এখানে ক্ষান্ত হইলাম, পাঠকগণ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

প্রবন্ধের বিস্তার নিষ্প্রয়োজন, ঘটনাবলীর বিশ্লেষণও নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় ভ্রাতৃবৃন্দ এই বিবৃতি মাত্র অবলম্বনেই ঠাকুরের কৃপা উপলব্ধি করুন, তাঁহার স্বরূপের সহিত পরিচিত হউন এই মাত্র অনুরোধ।

পরিশেষে, যিনি আমাদের অন্তরে-বাহিরে বিরাজ করিয়া দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দ, শোকের পরিবর্ত্তে শান্তি, বন্ধনের পরিবর্ত্তে মুক্তির আস্বাদ দিয়া আমাদিগকে সত্যের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন, আমাদের সেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী-ঠাকুরের চরণ কমলে শত শত প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া এই বিদায়ের বেলা তাঁহারই মঙ্গলময় নামের জয় উচ্চারণ করিয়া বলি—"জয় গুরু"। ওঁ শান্তিঃ!

——×——

সদ্‌গুরু ও শিষ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপ মহাত্মাগণের আদেশেই এবং এইরূপ সদ্‌গুরুগণের কৃপাতেই এই পরাবিদ্যা হৃদয়ে স্থাপিত হয়। তাঁহারাই উহার যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্বন্ধে তিনটী মত নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

১। জাতি, ধর্ম্ম, লিঙ্গ ও বর্ণ ভেদ না করিয়া (অর্থাৎ বাহিক সর্ব্বপ্রকার ভেদজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া) সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বীজ রোপণ করা।

২। সকল দেশের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শনাদি প্রাচীন সদ্‌গ্রন্থের চর্চ্চার উন্নতি সাধন ও তাহার প্রচার করা।

৩। জগতের দুর্ব্বিজ্ঞেয় প্রাকৃতিক বিধি-সমূহের অনুসন্ধান করা এবং মানবের আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করা।

প্রথমে যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা লিখিত হইল, তাহা শারীরিক বা সামাজিক (স্থূল) ভ্রাতৃভাব নহে—ইহা আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃভাব। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যোগমার্গে তৃতীয় পদবীতে উঠিয়া হংস অধিকার প্রাপ্ত হইলে বিশ্বের একত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহার সংবিৎ এতদূর বিস্তৃত ও দূরদর্শী হয় ও এমন উচ্চ লোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয় যে, সেই অত্যুন্নত লোকে সকলই এক বোধ হয়, আর কেহ কাহারও হইতে পৃথক্ জানা যায় না। যথার্থ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব অর্থাৎ একত্বের প্রতীতি ও উপলব্ধি কেবল উপরোক্ত অবস্থাতেই হইয়া থাকে। উক্ত সাধনের উপায় এই যে, সাধক একত্ব সাধনাদ্বারা সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হন এবং প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানের প্রসাররূপ দীক্ষা পাইয়া ক্রমান্বয়ে ‘পরিব্রাজক’ ‘কুটীচক’ ‘হংস’ ‘পরমহংস’ অবস্থা লাভ করেন;—ইহাতেই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব অর্থাৎ একত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। প্রথম অবস্থাতে মনুষ্য-সাধারণের এই একত্ব জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পরস্পরের মধ্যে প্রেম-সঞ্চার এবং মন হইতে সকল প্রকার ঘৃণা ও দ্বেষভাব দূর করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। কদাপি পরের অনিষ্ট চিন্তা মনেও না আনা, যথাসাধ্য অপরকে আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়া তাহার উপকার করা, বিশেষতঃ মনুষ্যগণের মধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির প্রচার করিবার যত্ন করা, নিজকে সংসারের উপকার করিবার যোগ্য করা কর্ত্তব্য। অপরের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখের মত অনুভব করা, এবং জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম বিশ্বাস ও মত নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও মত হইতে ভিন্ন হইলেও অশ্রদ্ধা না করা উচিত। এইরূপে পরাবিদ্যার প্রথম উদ্দেশ্যের সাধন হয়। এই উদ্দেশ্যের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে জাতিভেদ না মানিয়া সকলেই এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করুক; কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না, উহা কেবল আত্মদৃষ্টি হইলে সিদ্ধ হয়। সমস্ত জীব এক পরমাত্মার অংশ এবং সকলেই এক পরমাত্মা-রূপ সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে, এই মহৎভাব ধারণ করা কর্ত্তব্য। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়াং—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সহায়কারী, কেন না ধর্ম্মগ্রন্থাদি উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও অনুশীলন না করিলে বিবেকজ্ঞান জন্মে না ও ধর্ম্ম সকলের একতা জ্ঞান জন্মিতে পারে না; এবং যে পর্য্যন্ত না মনুষ্যের মনে বিবেক সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মনে সার্ব্বজনীন প্রেম বা ঐক্যভাব স্থান পাইতে পারে না। আর যে রাজবিদ্যা বা পরাবিদ্যার প্রভাবে একত্ব জ্ঞান লাভ হয়, সেই পরাবিদ্যা লাভ হইলে তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একত্ব লাভ করাই সকলের চরম উদ্দেশ্য। উহা প্রাপ্ত হইলে আর কিছু চাহিবার বা জানিবার থাকে না। একত্ব লাভে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। তথাহি—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

মুণ্ডকোপানিষৎ—৩।২।৮

যেমন প্রবাহিণী নদীসমূহ নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ আত্ম-তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য-পুরুষে উপনীত হয়।

পরাবিদ্যা সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে না, কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতেও বলে না, অথবা কোন বিশেষ ধর্ম্ম অথবা সাম্প্রদায়িক মতকে বিশ্বাস করিতেও বাধ্য করে না। বিশ্বাস করা বা না করায় প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে। দ্বিতীয় তৃতীয় উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যে সহানু-ভূতি নিশ্চয়ই থাকা চাই এবং উহার সাধনের নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্, দর্শনশাস্ত্রসমূহ ও অন্যান্য সদ্গ্রন্থে যে রাজবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরা-বিদ্যার বিষয় বর্ণিত আছে তাহাকেই 'থিয়সফি' কহে। যাহা সমস্ত ধর্ম্মের মূল ও যাহা হইতে সমস্ত ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্যসকল উপলব্ধি করা যায় এবং বিভিন্ন মতের পার্থক্য লোপ পায় তাহাই থিয়সফি বা পরাবিদ্যা।

বন্দে গুরুপদ কুঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।
মহামোহতম পুঞ্জ যাসু বচন রবি কর নিকর॥

যাঁহার বচনরূপ সূর্য্যের কিরণে মহামোহরূপ তমোরাশি বিনষ্ট হয়, সেই কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করিতেছি।

মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও বলেন—আমরা ব্রহ্মবিদ্ গুরু সমীপে তাঁহাদের দত্ত সাধন-প্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পদে পদে উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাদের জীবনে পরীক্ষিত সত্যলোকের আলোকে উৎসাহিত হইয়া তবে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। তোমাদের যদি যথার্থই উন্নত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদেরও এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে বৈ কি? **"সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে"**—ইহা সকল মহাপুরুষেরই মত। দেখা যায় যেখানেই কোনরূপ অলৌকিক ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে, তাহারই পশ্চাতে কোন এক মহাপুরুষ গুরুরূপে সহায় ছিলেন। লোক চলিত কথায় বলিয়া থাকে 'এ ব্যক্তির গুরুবল আছে।' শাস্ত্রে পড়িয়াছি ঈশ্বর আছেন, লোকে বলে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সদ্গুরু বলেন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। শিষ্যকে তিনি পথ দেখাইয়া দেন ও সেই পথে ধীরে ধীরে লইয়া যান। প্রকৃত গুরুর দর্শন মাত্রেই তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি কোন অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া তাহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন ও দিন দিন আরও নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহার নিকট যাইবামাত্রই যেন সংসারের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়—মনে যেন আর সংসারের বিন্দুমাত্র স্পৃহা থাকে না। তাঁহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিলে সাধক চারিদিকে আনন্দের পাথার দেখিতে পান। এ হেন গুরুর জন্য শিষ্য কি না করিতে পারে? তাঁহার প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? শাস্ত্র গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইহা কি কখন গুরুব্যবসায়ীর উপর হওয়া সম্ভব? পরন্তু ব্রহ্মবিৎ পুরুষে সহজেই হইয়া থাকে। যাহারা মানুষে ব্রহ্মবুদ্ধি করা উচিত নয়, করিলে ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এই বালসুলভ যুক্তির অবতারণা করে, ঘোর দ্বৈতজালের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান কল্পনা করিয়া গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে একান্ত বিরত, তাহাদিগকে আমি অদ্বৈত বেদান্ত একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সাধন সম্পন্ন হইতে পরামর্শ দিই।

অন্ধের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সাধারণ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণও নিষ্ফল। তাঁহাদের উপদেশের সঙ্গে সে শক্তির সঞ্চার নাই। শুনিয়াছি, বিশ্বাসও করি যে ব্রহ্মবিৎ গুরু মন্ত্রের সঙ্গে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন যে শিষ্যের নব-জীবন লাভ হয় তাহাতে। সাধারণ গুরুর নিকট কত শত উপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু প্রাণে লাগে নাই,—এ বিষয়ে মহাপুরুষের নিকট যে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহাই প্রকাশ করিলাম।

"কোন রাজার এক সময়ে সংসারে বৈরাগ্য হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ সাতদিন ভাগবত শুনিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী এক সুপণ্ডিতকে আনাইয়া ভাগবত শুনিতে আরম্ভ করিলেন। দুই মাস কাল নিত্য শ্রীভাগবত শুনিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইল না। তিনি সেই কথকঠাকুরকে বলিলেন যে পরীক্ষিতের সাত দিন মাত্র ভাগবত শুনিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, আর দুই মাস শ্রবণ করিয়াও আমার কিছু হইল না কেন? ইহার উত্তর যদি আপনি কল্য না দিতে পারেন, তবে আপনি অর্থাদি কিছুই পাইবেন না। ব্রাহ্মণ রাজার ঘোরতর অসন্তোষ আশঙ্কায় অতি বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অতিশয় কাতর হইয়া গালে হাত দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার এক বুদ্ধিমতী পিতৃভক্তিপরায়ণা কন্যা ছিল। সে পিতাকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ কারণ জিজ্ঞাসা করাতে অগত্যা অপত্যস্নেহে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাঁহার বিষাদের কারণ বলিতে হইল।

কন্যা হাসিতে হাসিতে বলিল—পিতা আপনি কিছুমাত্র ভাবিবেন না, আমি কাল রাজাকে ঐ কথার জবাব দিব। পরদিন কন্যা সমভিব্যাহারে পণ্ডিত মহাশয় রাজসভায় উপস্থিত। তিনি বলিলেন, আমার কন্যা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কন্যা রাজাকে কহিল, প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে আমি যাহা বলিব আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে। রাজা স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণকন্যা প্রহরীদিগকে বলিল, একটী থামে আমাকে ও অপর থামে রাজাকে বাঁধ। রাজার আদেশে প্রহরীরা তাহাই করিল। তখন কন্যা রাজাকে বলিল, রাজন্! আপনি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন। রাজা বলিলেন একি অসম্ভব কথা বলিতেছ! আমি নিজে বদ্ধ, তোমার বন্ধন মোচন কিরূপে করিব? তখন কন্যা হাসিয়া বলিল রাজন্! এই আপনার প্রশ্নের উত্তর।

রাজা পরীক্ষিৎ মুমুক্ষু শ্রোতা, আর বক্তা সাক্ষাৎ শুকদেব, যিনি সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মপরায়ণ মহাজ্ঞানী! তাঁহার নিকট ভাগবত শুনিয়া রাজা পরীক্ষিতের জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। আর আমার পিতা নিজে সংসারাসক্ত, অর্থের লোভে আপনার নিকট শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া আপনার কিরূপে জ্ঞানলাভ হইবে?"

এই উপদেশপূর্ণ গল্পটী দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত কখন বন্ধন মোচন হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ প্রসঙ্গে দুইটী কথা সচরাচর শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে শিষ্য যে রকমই হউক না কেন, সদ্‌গুরু লাভ হইলে তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ বা বলেন, গুরু যেরূপই হউক না কেন শিষ্যের বিশ্বাস-ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আমার মতে গুরু-শিষ্য উভয়ই উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। দেখা যায়, একই মহাপুরুষের শিষ্যগণের ভিতর কত তারতম্য হইয়া থাকে। শিষ্য যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, বিনয়ী ও অধ্যবসায়-

সম্পন্ন হয়, তবে সে অতি সহজেই গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব সমুদয় আয়ত্ত করিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যেরূপ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কথা পড়া যায়, তাহাতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্যের যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিষ্যের শরীর-মন এমন ভাবে সুগঠিত হইয়া উঠে যে তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারেই নাই বলিলেই হয়। অনেকে আবার এই গুরু-ভক্তিকে তুলিয়া দিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। যদি দেশ হইতে এই গুরুভক্তি উঠিয়া যায়, তবে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি অন্তর্হিত হইবে। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার সমাজে রাজত্ব করিতে থাকিবে। গুরুকরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পার, কিন্তু একবার তাঁহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, তাঁহার কথায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পার। অনেকে মনে করেন গুরুর উপর এইরূপ নির্ভর করিলে, আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে ও আমরা ক্রমশঃ জড়পিণ্ডে পরিণত হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। বাস্তবিক সদ্‌গুরু কখন কাহারও মনের স্বাধীনতা হরণ করেন না, বরং যাহাতে তাহার মনে স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে সে আপন পায় আপনি দাঁড়াইতে পারে, ইন্দ্রিয়গণের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়া মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে তাহাই শিক্ষা দেন। লোক সামান্য একটু অর্থ কিম্বা দৈহিক কোন উপকার পাইয়া লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ হয়। তবে যাঁহার নিকট জীবনের সারতত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ পদার্থ লাভের সন্ধান ও তল্লাভে ক্রমাগত সহায়তা পাইয়াছ, তাঁহার নিকট সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে কেন এত অন্যায় মনে কর? হিন্দুর ন্যায় কৃতজ্ঞ জাতি আর নাই। হিন্দু যেদিন গুরুভক্তি ভুলিবে, সেদিন আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্তি, সেই অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে সেই অপার বিশ্বাস একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। যদি কখনও ভারতের উন্নতি হয়, তবে এই গুরুভক্তি-সহায়েই হইবে, গুরুতে ঈশ্বর জ্ঞানে হইবে—কল্পনার ঈশ্বর নহে—প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। তাঁহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হইলে, তবে আমরা আবার মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব। শুধু যে নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইব তাহা নহে, দেশের জন্য, স্বজাতির জন্যও কিছু করিয়া যাইতে সমর্থ হইব।

(সমাপ্ত)

তুমি

(তুমি) আঘাতের পর আঘাত প্রদানি গর্ব্ব আমার করেছ দূর
অহঙ্কারের উচ্চ শীর্ষ ফেলিয়া ভূমিতে করেছ চূর।
দীর্ঘ দিন পরে বুঝিনু এবার
কি আছে আমার গর্ব্ব করিবার
যন্ত্র যে আমি তোমার হাতের যে সুরে বাজাও বাজে সে সুর
মাঝখানে শুধু আমার আমিতে তোমার আসন করেছি পূর ॥

সকল গর্ব্ব বিদূরিত আজ সব অহঙ্কার গিয়াছে থামি
বুঝেছি এবার মর্ম্মে মর্ম্মে তুমিই নিখিল জীবন স্বামী—
তুমি আছ তাই সকলেই আছে
তুমিপ্রাণময় তাই প্রাণে বাঁচে
চিন্ময় তুমি তোমারই আভাসে করিতেছে আমি আমি
আনন্দের কণা পাইয়া তোমার লুব্ধ—ভ্রান্ত—কামী ॥

ঘুচাও ভ্রান্তি ঘুচাও এ মায়া জ্বালাও তোমার জ্ঞানের আলো
অতুল প্রেমেয় অমিয় ধারাটী তপ্ত হৃদয়ে ঢাল গো ঢালো।
আমার আমিকে বহিয়া বহিয়া
পরাণ আজিকে রহিয়া রহিয়া
কাঁদিছে ফুকারি হে প্রিয় আমার চিত্ত হয়েছে কালোর কালো
এ কালোর মাঝে ওগো জ্যোতির্ম্ময় তোমার রূপের আলোটী জ্বালো ॥

এস তুমি এস দেহেতে নামিয়া ধন্য হইয়া যাউক দেহ
মন-প্রাণ মাঝে নামিয়া আসিয়া রচ গো সেথায় তোমার গেহ।
ঘুচাও মিথ্যা অহমিকা মায়া
বুঝাও দেবতা সবি তব ছায়া
তুমি ছাড়া আর অতি আপনার নাহিক আমার নাহিক কেহ
তোমার তুমিতে লীন হোক্ সবি দেহ দেব এই আশীষ দেহ ॥

———:০:———

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের
শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে
দু'টী কথা

[শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ B. Sc. D. T.]

সমবেত সজ্জন মণ্ডলি !

আজ আকিয়াব প্রবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে বড়ই শুভ পুণ্যময় দিন বলিয়া মনে করিতে হইবে। আজ আমরা এক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সকলে এক স্থানে সমবেত হইতে পারিয়াছি। এই শুভ-জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান ব্রহ্মদেশে এই সর্ব্বপ্রথম। যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে শুভ-জন্মোৎসবটি এই স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীশ্রীমৎ গোপাল ব্রহ্মচারী। আজ তিনি আমাদের এই সদনুষ্ঠানে ডাকিয়া আনিয়াছেন; তাঁহারই কৃপায় আজ আমরা সকলে এমন পুণ্যময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি এবং তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। তিনি আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

পরমহংসদেবের জীবন কাহিনী আপনাদিগকে জানাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। যদিও আমি জানি যে, আমার মত অজ্ঞ—এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কাহিনী সম্বন্ধে যথোচিত তত্ত্ব আপনাদিগকে সম্যকরূপে জানাইয়া তাঁহার অনন্ত প্রকার প্রতিভা ও কর্ম্ম প্রেরণার পরিচয় সম্যকরূপে দিতে পারিবে না, তথাপি আজ তাঁহার মনোরম শান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, তাঁহারই ঐশীশক্তি প্রভাবে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার সাহসে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি।

চিরকালই এ ভারতভূমি বীরপ্রসবিনী। ইহারই পূত গর্ভে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম ও দর্শনের উৎপত্তি হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। এই সুপবিত্র ভারত ভূমিতেই কত মহান্ ধর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়া ত্যাগ-বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্মের আদর্শ মানব সমাজকে উপহার প্রদান করিয়া অনন্ত শান্তিদায়িনী পরাশক্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই ত্যাগ-বৈরাগ্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া না জানি কত ধর্ম্মপ্রাণ মহান্ সজ্জনগণ প্রতীচ্যের জড়বাদের উপর প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার বিজয় নিশান উড়াইয়া গিয়াছেন। পুরাকালের সেই সব ত্যাগ-বৈরাগ্য, যম-নিয়ম, শম-দম আদি সাধন-ভজনের আদর্শ আজিও ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলিয়া ভারত এখনও আধ্যাত্মিকতায় জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সেই শান্তিময় ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াই কবি গাহিয়াছেন :—

"হে ভারত! শিখায়েছ নৃপতিরে
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড।"

আজও ভারতের অণু-পরমাণুতে মিশিয়া আছে সেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের জলন্ত-জীবন্ত মহিমা! সেই সুপবিত্র ভারত ভূমির মধ্যে নবদ্বীপ বাঙ্গালীর —শুধু বাঙ্গালীর কেন ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি পুণ্যতীর্থধাম। এ হেন ভক্তি-মুক্তিদাতা পুণ্যতীর্থধামে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া দেশ-বাসীকে বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতিকে গৌরব-তিলক পরাইয়া দিয়াছেন। কলির জীব উদ্ধারক প্রেমাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পদরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া নবদ্বীপ সমগ্র বঙ্গভূমির, শুধু বঙ্গভূমির কেন—সমগ্র ভারতের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। আজ যে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের শুভ-জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি, সে মহাপুরুষও এই চির পবিত্র নবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত মেহেরপুর পরগণায় কুতবপুর নামক এক গণ্ডগ্রামে শুভ ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে, গুরুবারে, শুভলগ্নে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধরাকে সুশোভিত করেন। নব শিশুর শুভাগমনে পাড়াপ্রতিবেশীরা কী ভাবে তাঁহার জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, প্রিয় পরিজনগণের কী আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার জন্মবার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত হইয়াছিল, সে সুসংবাদ তখন কেহ রাখে নাই,—রাখিবার প্রয়োজনও মনে করে নাই; কিন্তু এই জন্মদিন যে উত্তর কালে একটি বিশিষ্ট স্মরণীয় দিনে পরিণত হইবে, তাহা ত তখন কেহ ভাবে নাই! তখন কে ভাবিয়াছিল যে এই নবজাত শিশু একদিন আপন পবিত্র জীবনের মহান্-ব্রতগুলির উদ্-যাপন করিয়া একটি বিশিষ্ট কর্ম্মপন্থা সৃজন করিবেন? তখন কে মনে করিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র মানুষটি একদিন আপন অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ করিয়া দেশ বাসীকে এক মহান্ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া এক নূতন আলোকের সন্ধান জানাইয়া দিবেন?

জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম স্রোতে ভাসিয়া এই শিশু গতানুগতিক ভাবে এই পৃথিবীতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লইয়া একটি মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে। প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণ-রেণু-পূত নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস এই নবজাত শিশুর জীবন বীণায় আধ্যাত্মিকতার যে ঐক্য তান সুর বাজাইয়া দিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে এ বালক অসামঞ্জস্যপূর্ণ জগতে একটি সামঞ্জস্য সংস্থাপনের জন্য মহতী চেষ্টার সাধনা করেন। গণ্ড গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশিক্ষিত পরিবারের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার শৈশবের দিনগুলি অতিবাহিত হইলেও কিন্তু বৃহত্তম জগৎ ইহারই পার্শ্বে তাঁহার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতেছিল। মানবজীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিবার জন্য যে মানব-শিশুর জন্ম হইয়াছে, সেই মহাপ্রাণ শিশু সাধারণ পরিবারের বা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। জগতের যে গুপ্ত রত্নভাণ্ডার শান্তি-ধন এতদিন লোক-লোচনের অগোচর ছিল, যাঁহার উদ্ধার জন্য তাঁহার ধরায় আগমন, তাঁহার ডাক, তাঁহার প্রেমময় আকর্ষণ তিনি কোনও ক্রমেই এড়াইতে পারিলেন না। কাজেই তাঁহার প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তগুলিও সেই সব গুপ্তধন ভক্তি-মুক্তি-শান্তির ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিত। তাঁহার এবম্বিধ উদাস বৈরাগ্যের ভাব দর্শনে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশেষতঃ তাঁহার মাতা বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কোনও রাজপণ্ডিত দৈবজ্ঞকে তাঁহার কোষ্ঠিখানি দেখাইয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, এই শিশু ভবিষ্যতে সংসার ত্যাগ করতঃ একজন

মহান্ কঠোর সাধক হইয়া নানাপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতের অশান্তিময় চিত্তে শান্তির উৎস খুলিয়া দিবেন, তখনও কিন্তু মাতার হৃদয়ে বালকের সংসার ত্যাগের বিভীষিকা আপন আধিপত্য বিস্তার করতে ছাড়িল না—স্নেহময়ী মাতা বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বেশী দিন সে মনঃপীড়া তাঁহাকে ভোগ করতে হইল না। একদিন তিনি সকলকেই শোকসাগরে ভাসাইয়া মরণের পরপারে অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। পুণ্যতোয়া ভৈরব সেই জ্বলন্ত ভস্মাবশেষ নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহার দুঃসহ বহ্নিজ্বালা বিদূরিত করিল। যেদিন মায়ের সোণার প্রতিমা খানি আপন হাতে চিতায় তুলিয়া দিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন, সেইদিন হইতেই কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি এ মায়াময় সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিলেন। তারপর "জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে" সেই চির জীবনের পরম বাঞ্ছিতকে খুঁজিয়া লইবার জন্য কী বিপুল বেদনা তাঁহায় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, যাহার জন্য তিনি দিশেহারা হইয়া কোন্ এক অজানা অলক্ষ্যের সন্ধানে ছুটিলেন! কত নদ-নদী, বন-উপবন, শৈল-কান্তার, পাহাড়-পর্ব্বত, মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উদ্দাম মন তাঁহাকে দিগ্‌দিগন্তে বৎসহারা গাভীর মত ছুটাইয়া লইয়া চলিল। মাতৃহীনতার দৈন্যে তাঁহার সরস হৃদয়খানি কী যে এক দুঃসহ বেদনায় ভরিয়া উঠিল, ভাষার এমন কোন শক্তি নাই সে অদম্য অসহনীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারে!

তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং পরিবারস্থ অন্যান্য জনমণ্ডলী তাঁহার এবম্বিধ উদাস-বৈরাগ্যের ভাব দর্শনে, তাঁহার মনের এ অস্থিরতা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মাতামহীর পরম স্নেহ এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর পড়িয়া তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরের আবেগ কমিয়া গেলেও অন্তরে কী যেন একটা বিরাট অতৃপ্ত কামনা তাঁহার অগোচরে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এ অবস্থায় তিনি প্রায়ই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন,—এ স্বার্থান্ধ জগতের লোকসঙ্গ তাঁর কাছে বিষবৎ মনে হইত।

ধীরে ধীরে তিনি স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইলেন বটে, কিন্তু পরাধীনতার ভিতর পড়িয়া, নিজের স্বাধীন ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি কয়েক সপ্তাহ মাত্র চাকুরী করিয়া সে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তখনও কিন্তু তাঁহার মন সদাই উদাস থাকিত, কী যেন কী সব সময়েই ভাবিতেন, সে চিন্তারেখা তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার এ সমস্ত উদাসভাব সন্দর্শনে তাঁহার মাতামহী ও আত্মীয়-স্বজনগণ মনে করিলেন, বিবাহ করাইয়া দিলেই তাহার এ উদাসীনতা দূর হইয়া যাইবে, তাই তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বে সতের বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহারা তাঁহার বিবাহ দিলেন।

সংসারের নানারূপ আবিলতার ভিতর পড়িয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব লুপ্ত হইতে লাগিল। যে প্রবল ধর্ম্মভাব শৈশবে তাঁহার হৃদয়ে শান্তির আলো জ্বালাইয়া সদাই আনন্দ-সাগরে ভাসাইত, যাহার প্রকাশে তাঁহার জীবনের উন্মেষকে একটী কমনীয়তায় ও মহনীয়তায় ঘেরিয়া রাখিত, তাহা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল, তরুণ উষালোকে রঞ্জিত আকাশ মেঘের দ্বারা যেন আবৃত হইয়া গেল, হৃদয়ের পূর্ণিমার আলোকরাশি ঘন অমানিশার অন্ধকারে নিবিয়া যাইতে লাগিল।

যুবক নলিনীকান্ত পূর্ব্বের সে অপূর্ব্ব ভাবরাশি হারাইয়া ঘোর নাস্তিক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই বিপুল পরিবর্ত্তনে তাঁহার প্রিয় পরিজনগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

অতঃপর সাংসারিক জীবনের উন্নতির আশায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া কাজে যোগদান করিলেন। একদা রাত্রি বেলা তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিশেষ ব্যস্ত আছেন, এমন সময় আপন রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ মধ্যে আপনার স্ত্রীর বিষাদ-মলিন বিবর্ণ প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পরে জানিতে পারিলেন যে, ঐ রাত্রিতে ঐ প্রতিকৃতি দর্শনের সময়ই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। সেদিন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাঁহার জন্মভূমি কুতবপুর গ্রামেই ছিলেন। এ দুর্ঘটনায় পুনরায় তাঁহার মন পূর্ব্বের ভাব প্রাপ্ত হইয়া অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল,—তিনি এ জগতের নশ্বরতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। বুঝিলেন এ মায়াময় নশ্বর জগতে শান্তিলাভের আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি বুঝিলেন চিরশান্তি-ময়কে লাভ করা ছাড়া এ নশ্বর জগতের কোন বস্তুই তাঁহাকে সে পরাশান্তি—পরা-আনন্দের অধি-কারী করিতে পারিবে না। সেই চিরশান্তিময়কে লাভ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, আত্মা-পরমাত্মার বিবিধ বিষয়ের পর্য্যা-লোচনায় তিনি মত্ত হইয়া গেলেন। এই ভাব হৃদয়ে লইয়া বিক্ষিপ্ত অবস্থার ভিতর দিয়া যখন তিনি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছিলেন, অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, তখন তাঁহার জীবনের একটী Turning Point আসিল। তিনি কলিকাতায় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী মহারাজের দর্শন লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়গ্রাহী মনোরম কথায়—উপদেশে ইহার হৃদয়ে শান্তির স্রোত বহিতে লাগিল, তিনি তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধনার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যে সুমধুর জীবন-ধারা তাঁহার অন্তর মাঝে শুকাইয়া যাইতেছিল, যে সরস হৃদয়-খানি সংসারের কলুষতায় ডুবিয়া যাইতেছিল, আজ এই মহাপুরুষের সত্য অমৃত বাণী তাঁহার হৃদয়-বীণায় আঘাত করিয়া আবার সেই অনাদি সঙ্গীত বাজাইয়া দিল, তিনি পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত অথচ স্থির লক্ষ্য লইয়া আবার শান্তির আশায় ছুটিলেন। ইনি তাঁহারই নিকট দীক্ষা-শিক্ষা লইয়া সাধন-ভজন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু স্বামী পূর্ণানন্দজী বলিলেন, "যিনি তোমায় দীক্ষা-শিক্ষা দিয়া তোমাকে শান্তির জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন, তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সময়ে তিনিই তোমায় সব পাওয়াইয়া দিবেন—শান্তির রাজ্যে পৌছাইয়া দিবেন। এখনও তোমার সময় হয় নাই, আরও কিছুদিন তোমায় অপেক্ষা করিতে হইবে।"

স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ কলিকাতা ত্যাগ করার পর ইনি সাধনার জন্য, দীক্ষা-শিক্ষার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। সাধারণ কুলগুরুর নিকট ত তাঁহার হৃদয়ের এ অভাব মিটিবে না—তিনি বুঝিলেন সদ্‌গুরু চাই! কিন্তু সদ্‌গুরু কোথায়? ভাবিতে লাগিলেন,—শান্তিরাজ্যের সুগম পথ কে আমাকে দেখাইয়া দিবে? কে আমায় সুগম পথে হাত ধরিয়া নিয়া চিরবাঞ্ছিত ধনকে লাভ করাইয়া দিবে? হায়! এ জীবনে কতবারই ত বাঞ্ছিত ধনকে লাভ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া মরিয়াছি, কতবারই ত এ দেহ মন-প্রাণ শান্তিময়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু তবু—তবুও ত' সে শান্তিরাজ্যের পথ পাই নাই। কেহই ত' আমায় সে শান্তিরাজ্যের সন্ধান বলিয়া

দেয় নাই। হায়! তবে কী আমি তাঁহাকে পাইব না? হায়! তবে কী আমার এ অশান্তিময় জীবন তাঁহার পরশে শান্তিময় হইয়া উঠিবে না? হায়! তবে কি আমি আমার এ দগ্ধচিত্তের সকল প্রীতি, সকল গীতি, সকল শান্তি, সকল অশান্তি, সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকলই কী তাঁর শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারিব না? হায়! এ হৃদয়ব্যথা কি চিরতরে দূর হইবে না? এইরূপ নানা দুঃসহ বেদনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার স্নেহময় হৃদয়দেবতা তাঁহার হৃদয়াসনে বিরাজিত থাকিয়াও কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ শান্তির অধিকারী করিবার জন্য, তাঁহাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়া নিকষ পাথরে খাঁটী সোণা করিয়া তুলিতেছিলেন।

এ দুঃসহ ব্যথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সদ্‌গুরু লাভার্থে তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু নানা বন, অরণ্য, পাহাড়, পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, মরু-প্রান্তর, নানা তীর্থধাম, নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধুসঙ্গ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ের এ জ্বালা নিভিল না —তিনি সদ্‌গুরু লাভ করিতে পারিলেন না, সদ্‌গুরুর মত উপযুক্ত লোক তাঁহার নয়নগোচর হইল না। অত্যন্ত দুঃসহ হৃদয়ব্যথা লইয়া তিনি পুনরায় কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া মনের চঞ্চলতা নাশ করিবার জন্য পূর্ব্বের মত কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত হইলেন।

তিনি নানা দেশ দেশান্তর ঘুরিবার সময় সাধু শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছিলেন, "গুরু জগতের সর্ব্বত্রই অখণ্ড ভাবে বিদ্যমান আছেন, সদ্‌গুরু বা ভগবান লাভের জন্য মানবের মনে উৎকট আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইলে, যদি মানুষ-গুরু লাভের বিলম্ব হয়, অথচ সাধক সদ্‌গুরুর জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভগবান্‌ই সদ্‌গুরুর রূপ ধারণ করিয়া স্বপ্নাবস্থায় সাধককে দীক্ষা--শিক্ষা দিয়া থাকেন। আবার অনেক সময় সদ্‌গুরুও সাধকের ব্যাকুল অবস্থা দর্শন করিয়া উপযুক্ত সময় স্বপ্নে দর্শন দিয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন।" সাধু-মহাত্মাদের মুখে এসব অমিয়-মধুর শান্তির বাণী শুনিয়া শুনিয়া নলিনী-কান্তের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও সময়ে কার্য্যকরী না হওয়ায় একদা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, আজ রাত্রিবেলাই যদি ভগবানের কৃপায় বা সদ্‌গুরুর অমিয় স্নেহে তাঁহার দীক্ষা না হয়, তা' হলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তিনি আত্মহত্যা করিবেন। এ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভগবানের আসন টলিল, তিনি সেইদিনই রাত্রিবেলা সদ্‌গুরুরূপে ইঁহাকে দর্শন দিয়া ইঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইনি দেখিলেন গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এক মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃতে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। তখন তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন, মহাপুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্নেহমাখা সুমধুরস্বরে বলিলেন, "বাবা! এই তোমার কাম্যধন! তুমি মন্ত্রের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলে, লও এই তোমার মন্ত্র লও।" এই বলিয়া বিল্বপত্রের উপরে রক্ত চন্দনে লিখিত একটী বীজমন্ত্র ইঁহার হাতে দিলেন।

অনেক দিন হইতে সাধু সন্ন্যাসীর পেছনে পেছনে ঘুরিয়া সাধু সন্ন্যাসীর উপর নলিনীকান্তের এক প্রকার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি এ মহাপুরুষকেও একজন ভণ্ডসাধু মনে করিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও! বাতি জ্বালাইয়া দেখি, সত্যি কিনা?" বাতি জ্বালিলেন, বিল্বপত্রে রক্ত চন্দনের সদ্য লেখা মন্ত্রটি তখনও চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান, কিন্তু মহাপুরুষ অদৃশ্য—অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন ইঁহার হৃদয়ে এক দারুণ দুঃখের বোঝা চাপিয়া গেল, তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন "হায়!

আমি কত অকৃতজ্ঞ, কত অবিশ্বাসী! আমার অশান্তিময় চিত্তে শান্তি প্রদান জন্য এক মহাপুরুষ কৃপা করিতে আসিলেন, আর আমি তাঁহাকে অবিশ্বাস করিলাম। এই মহামন্ত্র কেমন করিয়া জপ করিতে হইবে, কতবার জপ করিতে হইবে, ইত্যাদি কোন বিষয়ই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম না, এখন উপায়? হায়! আমার মত অকৃতজ্ঞ—অধম জগতে আর কে আছে?"

এ দুঃসহ বেদনা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই নিশীথ রাত্রেই তিনি সাংসারিক জীবনের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চিরশান্তিলাভার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া চিরতরে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁর বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "যে হৃদয় দেবতা আমারই হৃদয়াসন হইতে আমারই হৃদয়-দুয়ারে নামিয়া আসিয়া আমায় শান্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, হায়! আজ আবার আমার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্তের তরে তিনি দেখা দিয়াও আবার লুকাইয়া গেলেন? আমি কেমন করিয়া আবার তাঁহার দর্শন পাইব? কোথায় গেলে আবার তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব? কে আবার তাঁহার সঙ্গে মিলন করাইয়া দিবে?" এই হৃদয়ভরা আবেগ লইয়া তিনি আবার ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে বিল্বপত্রে মন্ত্র পাওয়ার পর হইতে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মাঝে মাঝে কী যেন কী এক মধুর সাম্য সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ধ্বনিয়া উঠিত। অন্তরে বাহিরে দিশে হারা হইয়া তিনি সর্ব্বতীর্থ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় একদা হিমালয়ের একটি গহ্বরে প্রবেশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এই গুহার ভিতরে তিন দিনের মধ্যে সদ্গুরুর পুনরায় দর্শন না পাইলে আত্মহত্যা করিব।"

ভগবান্ তাঁহার এ প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিলেন। তৃতীয় দিনের দিন এক মহাপুরুষ তথায় আগমন করিয়া স্নেহ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বাবা! আত্মহত্যা মহা পাপ! আত্মহত্যা কী করিতে আছে? তুমি সদ্গুরু লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, সদ্গুরু যে তোমার ঘরের পাশেই বিরাজিত রহিয়াছেন। তুমি বাংলার বীরভূম জেলার সিদ্ধক্ষেত্র তারাপীঠ যাও, সেখানে বামাক্ষেপার দর্শন পাইবে। তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন।"

সেই দিনই তিনি বঙ্গদেশের দিকে রওনা হইয়া যথাসময়ে বীরভূম জেলায় যোগবাশিষ্ঠ রচয়িতা ত্রিভুবন তারণ পতিত পাবন ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেবের গুরু বশিষ্ঠদেব প্রতিষ্ঠিত তারাদেবীর মন্দিরে উপনীত হইয়া সিদ্ধ মহাত্মা বামাক্ষেপার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের ব্যথা সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিলেন। তাঁহার কৃপায় অতি অল্প দিনের ভিতরেই তিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জগন্মাতার দর্শন লাভ করিলেন, তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি শান্তি লাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পূর্ণ শান্তি লাভ হইল না,—তাঁহার ভেদজ্ঞান নাশ না হওয়ায় সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা লইবার জন্য বামাক্ষেপা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। তিনি বামাক্ষেপার শুভ স্নেহাশীষ শিরে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী গুরুর উদ্দেশে নানা দেশ দেশান্তর ঘুরিবার পর পুষ্করতীর্থে উপনীত হন। তথায় শ্রীশ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী দেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই মহাত্মাই নলিনীকান্তকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়াছিলেন। নলিনীকান্ত স্বপ্নদৃষ্ট গুরুর দর্শন লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়া তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ-সরোজে আত্মসমর্পণ করেন। কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাল তাঁহার শ্রীশ্রীচরণে উপস্থিত থাকিয়া

বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনায় ব্যুৎপন্ন হওয়ায় সচ্চিদানন্দ দেব তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দিক্ষীত করিয়া "স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী" নাম প্রদান করেন। শাস্ত্রালোচনায় তিনি জানিতে পারিলেন, জগতের আদি-অন্ত কোথায়? আমরাই বা কে? কোথা হইতে আসি? কোথায় যাই? এ জগৎ-সৃষ্টির কারণই বা কি? আবার মহাপ্রলয়েই বা জগৎ কোথায় লুপ্ত হয়? বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনায় তিনি এ সব বুঝিলেন বটে, কিন্তু সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিসে এ সব উপলব্ধি করা যাইতে পারে তজ্জন্য গুরুর চরণে আবার প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "অষ্টাঙ্গ যোগসাধনায় সমাধি না হইলে তুমি ও সব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তুমি যোগ সাধনা কর, আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার সিদ্ধ যোগীগুরু মিলিবে এবং তুমিও যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

নিগমানন্দ গুরুর আদেশে যোগী গুরুর অনুসন্ধানে পুনরায় ঘুরিতে লাগিলেন। নানা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া নানা বিপদ্ আপদের ভিতর দিয়া চলিয়া রাজপুতনার কোটা ষ্টেটে এক ভৈরবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন, তিনি যোগসিদ্ধা। তিনি নিগমানন্দের জীবনের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা আসার জন্য আদেশ করেন। বলেন, "ও দেশে গেলেই তুমি সদ্‌গুরু লাভ করিবে।"

নিগমানন্দ ভৈরবীর আদেশে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন, এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়াও মনোরথ পূর্ণ না হওয়ায় কামাক্ষ্যা মাতার দর্শনে কামাক্ষ্যায় যান। তথা হইতে একদল সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরশুরাম তীর্থে গমন করেন। পরে পরশুরাম তীর্থে পৌঁছিয়া কিরূপ ভাবে বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন, পরে ভূত ভাবন ভবানীপতির কৃপায় কেমন করিয়া তাঁহার সিদ্ধ যোগীগুরু মিলিয়াছিল, সে সংবাদ তিনি যোগীগুরু পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সে পুস্তকখানা পড়িলেই আপনারা সে সব বিস্তৃত সংবাদ জানিতে পারিবেন। ঐ পুস্তকখানি পড়িবার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। সময়াভাবের জন্য এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

সিদ্ধ সদ্‌গুরুর নিকট সিদ্ধমনোরথ হইয়া তাঁহার আদেশে নিগমানন্দ বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। যোগসাধন-উপযোগী স্থান ও ধার্ম্মিক গৃহস্থের আশ্রয়ে সাধনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নানা জায়গা ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের একটি দেবালয়ে রাত্রি যাপন করিলেন। ভোরে একটি লোক আসিয়া বলিলেন "মহাশয়, গত কাল রাতে স্বপ্নে দেখিলাম, একজন সন্ন্যাসী আসিয়া আমায় বলিলেন 'তোমাদের দেবমন্দিরে একজন সাধু রাত্রি যাপন করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে তোমার বাটীতে রাখিয়া তাঁহার সাধনের সহায়তা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।' তাই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাটীতে চলুন।"

যে ভদ্রলোক আসিয়া স্বামিজী মহারাজকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন, তাঁহার নাম সারদা-প্রসাদ মজুমদার, তিনি উক্ত গ্রামের জমিদার। স্বামিজী তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। সারদা বাবু ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সাধনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সাধারণ আহারে আলু কচু খাইয়া যোগ সাধন করা যায় না, তাহাতে শরীর নষ্ট হইয়া অকালেই পঞ্চত্ব লাভ করিতে হয়। সে সময় ঘী, দুধ, চিনি ও সুস্বাদু ফল ভিন্ন অন্য কিছু ভোজন

করা নিষেধ। যাহা হউক সারদা বাবুর বাটীতে এক বৎসর সাধনা করার পর নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কামাক্ষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং গৌহাটির তদানীন্তন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের গৃহে আশ্রয় নিয়া সাধনা করিতে থাকেন। দেড় বৎসর নিয়মিতরূপে কঠোর সাধনার পর তাঁহার সমাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমে তিন দিন, পরে পাচ দিন, সাত দিন, নয় দিন পর্য্যন্ত সমাধি অবস্থায় অতিবাহিত করিতে থাকেন। স্বামীজি এখানে খুব গুপ্ত ভাবে সাধন ভজন করিতেন, বাহিরের কোন লোকই জানিতে পারিতেন না। তিনি পূর্ণ সমাধিতে থাকার সময় অকস্মাৎ একদিন এক মহাপুরুষ শুভাগমন করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুকে আদেশ করেন যে, "ইঁহার সর্ব্ব শরীরে তাজা মাখন মালিশ করিতে থাক। অতঃপর স্বামিজী পুনরায় জড় জগতে নামিয়া আসিলে অর্থাৎ সমাধি ভাঙ্গিয়া গেলে ইঁহাকে আর সমাধিতে বসিতে দিও না, ইঁহার দ্বারা জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইবে।" মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন, যজ্ঞেশ্বর বাবু মহাপুরুষের আদেশ মত ইঁহার সর্ব্বশরীরে মাখন মালিশ করায় স্বামীজীর সমাধি ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপর আর সমাধিতে বসিতে না দেওয়ায় ইনি ইঁহার প্রথম গুরু সচ্চিদানন্দ পরমহংসদেবের চরণ বন্দনার জন্য উজ্জয়িনী কুম্ভ-মেলায় আসিয়া উপস্থিত হন। কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ সাধু-মহাত্মা, মহাপুরুষদের শুভাগমন হইয়া থাকে। সে কুম্ভমেলায় স্বামী সচ্চিদানন্দ ও তস্য গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সভা হইতেছিল। সচ্চিদানন্দজীর গুরুদেব সে সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতেছিলেন। নিগমানন্দ সভায় পৌছিয়া নিজের গুরুদেব সচ্চিদানন্দজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। সচ্চিদানন্দজী বলিলেন, "ইনি (সভাপতি) আমার গুরু, তোমার দাদাগুরু, তুমি ইঁহাকে প্রণাম কর।"

নিগমানন্দ উত্তর করিলেন, "আমার গুরুর গুরু নাই, আমি তাঁকে প্রণাম করিতে পারিব না। কারণ গুরুর গুরু মানিলে গুরু, গুরু না হইয়া লঘু হইয়া যান। সত্য বটে তিনি আপনার গুরু, তিনি আমার ত' কেউ নন। আমি আপনার গুরুকে মানিলে আপনি গুরু না হইয়া লঘু (ছোট) হইয়া যান, তাহা হইলে আপনার গুরুত্ব" কোথায় থাকে ?"

এই তেজস্বী যুবকের অকাট্য যুক্তিতে সভা নিস্তব্ধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সাংসারিক জগতের লোক ইহাতে অনেক কিছু অসামঞ্জস্য দেখিতে পারে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এ যুক্তিটী অকাট্য। সভায় এই বিষয় লইয়া নানা গোলযোগ উপস্থিত হইলেও কিন্তু নিগমানন্দ অকাট্য যুক্তিবলে তাঁহাদের মত খণ্ডন করেন। সভাপতি (সচ্চিদানন্দজীর গুরুদেব) মহাপুরুষ, নিগমানন্দের অকাট্য যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার হস্ত হইতে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক সেই প্রকাশ্য সভায় ইঁহাকে "পরমহংসত্ব" প্রদান করেন। সেইদিন সেই কুম্ভ মেলার প্রকাশ্য সাধু-মহাপুরুষদের সভা হইতে ইনি পরমহংসত্ব লাভ করিয়া **পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব** নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

ইহার পর তিনি উক্ত কুম্ভমেলাতেই হিমালয়স্থ একজন সিদ্ধা ভৈরবীর নিকট "ভাব-তত্ত্ব" সাধনার প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসামস্থ গাড়োহিলে পদার্পণ করিয়া "ভাব-তত্ত্ব" সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন।

তখন বাঙ্গালায় সদ্‌গুরুর অভাব ছিল, ইঁহার গুরুদেব সচ্চিদানন্দজী উক্ত গাড়োহিল আশ্রমে পদার্পণ করিয়া সাধন-পিপাসু সংসারী মানবগণকে সাধনার সুগম পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইনি বাঙ্গালায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

ইনি সদ্‌গুরুরূপে বাংলায় অবতীর্ণ হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সদ্‌গুরুর আদিষ্ট পন্থায় জন সাধারণের সাধনা করিবার মত শক্তি, উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সংযম, অধ্যবসায় কিছুই নাই এবং হিন্দু-ধর্ম্মের মূলভিত্তি গৃহস্থাশ্রম বিপথগামী। এই গৃহস্থা-শ্রম আদর্শরূপে গঠিত না হইলে অন্য তিন আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস সমস্তই বিপথগামী হইবে এবং এখনও হইতেছে। তাই তিনি সেই আদর্শ গৃহস্থের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে ত্যাগ ও সংযম সহায়ে বালকগণ শক্তি, উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য ও বীর্য্য লাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে, সে সংসার মধুময় হইবে, এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি আসামে "আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ" ও বাংলার প্রত্যেক বিভাগে এক একটি শাখা আশ্রম ও তদতিরিক্ত বাংলায় এবং আসামে আরও কয়েকটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কোন কোন আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাঁসপাতালও খুলিয়াছেন।

সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ! পরমহংসদেব লোক-শিক্ষার্থ যে বিরাট আয়োজন করিয়া যে কয়েকটি আশ্রম ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই সব মঠ ও আশ্রমের উদ্দেশ্যগুলিও অতি মহৎ এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। আধুনিক শিক্ষার যে সমস্ত দোষ আছে, তিনি সর্ব্ব সমক্ষে সে সব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি কত বারই বলিয়াছেন, "বিজাতীয় শিক্ষায়—যে শিক্ষায় সংযম, তপস্যা, তিতিক্ষা, চরিত্র গঠন হয় না, সে শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলে, জাতির পুনরুত্থানের আদি বীজস্বরূপ সুকুমার বালকগণকে ঋষিযুগের মহান্ পন্থায় পরিচালিত করিতে হইবে, সংযম ও তপস্যার সহায়ে তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে।"

পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রমগুলিতে প্রবিষ্ট শিক্ষার্থিরা সংযম ও তপস্যার সহায়ে আধ্যা-ত্মিক শিক্ষা ও লৌকিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমের নিয়মানুযায়ী এখানে কৃষি-বিদ্যারও সুব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থিরা হল-কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিয়া Cultureএর দিক হইতে একটি উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা পায়। শিক্ষার আধুনিক আদর্শ—"Social effeciency and Personal culture."—কাজেই এ দিক দিয়াও বিচার করিলে বুঝা যায় পরমহংসদেবের মঠ ও আশ্রমগুলির আদর্শ যথার্থই মহান্। ভারতের culture এবং ইউরোপীয় cultureএ একটা বৃহৎ পার্থক্য আছে। প্রাচ্যের সাধনা অন্তর্ম্মুখী এবং প্রতীচ্যের সাধনা বহির্ম্মুখী। বিদেশীয় দিগ্‌বিজয়ী বীরগণ ভারতে আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির, দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম নাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই অন্তর্ম্মুখী ভাবকে তাঁহারা বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই।

পরমহংসদেবের মঠ ও আশ্রমগুলিতে যে তরুণ কর্ম্মীদল নূতন ভাবে, নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিতেছে, একদিন এমন দিন আসিবে যে দিন তাহারা ভারতের এ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।—সে দিন যে অদূরেই অবস্থিত, এ আশা-ভরসা আমাদের বৃথা যাইবে না।

সমবেত প্রিয় বন্ধুবর্গ ! পরমহংসদেব সম্বন্ধে আমি আজ আপনাদের সমক্ষে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম মাত্র ; তাঁহার সাধন জীবনের সুমধুর স্বাদ, তাঁহার হৃদয়ের ভাব-রাশি, তাঁহার অমোঘ গুরু-শক্তির কথা সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট সম্যক্‌রূপে কিছুই বলিতে পারিলাম না। একটী বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, এমন একজন নানা প্রকার সাধনায় সিদ্ধ, জীবন্মুক্ত পরমহংস আমাদেরই বাঙ্গালীর ঘরের আদুরে ছেলে, তার চেয়ে আরও আনন্দের কথা এই যে তিনি এখনও এ মর্ত্ত্যধামে সুস্থদেহে বিরাজিত থাকিয়া এখনও সাধন-পিপাসুদের অতৃপ্ত জীবনে শান্তির পীযূষ ধারা ঢালিয়া দিতেছেন। বাঙ্গলা মায়ের গর্ভে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভের পর জগতের কাজ শেষ করিয়া আবার অনন্ত মায়ের ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন, আমরা পুস্তকে তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিয়া কত না তৃপ্তি কত না আনন্দ পাই ! আবার যদি তাঁহাদের দর্শন করিবার সুযোগ-সুবিধা আমাদের হইত, তাহা হইলে না জানি কোন্ অজানা আনন্দের লহরে আমরা ভাসিয়া যাইতাম। কিন্তু সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এখনও দেহ ধারণ করিয়া আমাদের উন্নতির জন্য কত না চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করার মত সৌভাগ্য আমাদের কোন মতেই ত্যাগ করা উচিত নয়।

বন্ধুগণ ! পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ গোপাল ব্রহ্মচারী মহারাজের বিশেষ চেষ্টায় এখানে একটী বিশেষ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইল। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা এবং অনুরোধ যে তিনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে "আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠে"র একটী শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

——×——

অস্পৃশ্যতা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

[চৌয়ালিশ ব্রাহ্মণ-সভায় সম্পাদক শ্রীবিহারীমোহন শর্ম্মা কর্ত্তৃক পঠিত। ১৩৩৯ বাং ২৮শে কার্ত্তিক]

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

পরমারাধ্য ভূদেবগণ ! আজ আমরা যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া সমবেত হইয়াছি,—যে আলোচনা, যে পরামর্শ আজ আমাদের অবশ্য-করণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহা বস্তুতঃই আমাদের উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণে সাড়া দিতেছে, উহা ছিল আমাদের বহু পূর্ব্বের কর্ত্তব্য। কিন্তু দীর্ঘকাল-ব্যাপী জড়তার মোহে আমরা এতদিন এ বিষয়ে অবহিত হইবার অবকাশ পাই নাই। বাধা না পাইলে—অভাব বোধ না জন্মিলে কেহ জাগে না। আজ আমাদের ঘুম পরিপক্ক হইয়া আসিয়াছে, অভাববোধ জন্মিয়াছে এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে বাধাও পাইতেছি যথেষ্ট।

বর্ত্তমান রাষ্ট্র—বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লববাদি আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিলেও অস্বাভাবিক নহে। জীবজগৎ একবার সত্ত্বগুণে জাগে, আবার তমোগুণে ঘুমায়। আবার জাগে, আবার ঘুমায়। এই ক্রমবিবর্ত্তন বিধাতার অলঙ্ঘনীয় ও চিরন্তন প্রথা। ইহাতে অস্থির না হইয়া, উপর হইতে আমাদের উদ্বোধনের আহ্বান মনে করিতে হইবে। জগতের ইতিহাসে ইহা চির-প্রচলিত নিত্য-ঘটনা।

মানুষ যখন হৃত-সর্ব্বস্ব হয় এবং সর্ব্বনাশের কারণটাও খুঁজিয়া পায় না, তখন একবার ইহাকে আরবার উহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে থাকে। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার ত কতই হইয়া গেল। বর্ত্তমানে একতা, ভ্রাতৃভাব ও প্রীতি-প্রণয়ের দোহাই দিয়া যে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের আন্দোলন চলিয়াছে, উহাও তদনুরূপ।

শুধু হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান কেন, এই সমগ্র বসুধাটাই যাঁহাদের কুটুম্ব মধ্যে গণ্য ছিল, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাঁহাদের পরমাত্মার উপলব্ধি ছিল এবং পার্থিব রজঃকেও যাঁহারা মধুময় দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই আহার্য্য-পানীয় সম্পর্কিত ভেদকে প্রতিবন্ধক মনে করেন নাই। বরং গুণসংক্রামক অভেদ ভাবকে যিনি যত পরিহার করিয়া চলিয়াছেন, তিনি তত সহজে ও শীঘ্র উক্ত প্রকার উচ্চ উপলব্ধি লাভ করতঃ বিধিনিষেধ বা ভেদাভেদের অতীত ভূমিতে উপনীত হইয়া সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় প্রকারেই আত্ম-সংমিশ্রণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লাফ দিয়া কোন স্থান ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইলে যেমন প্রথমতঃ কিছুদূর পাছে হটিয়া সামনের দিকে হয়, সেই প্রকার সকলের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে মিশিবার জন্যই অন্যের সংস্রব ছাড়িয়া প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হয়। এখানে ঘৃণা-বিদ্বেষের স্থান নাই। বর্ত্তমানে গোটা জগৎটাই তমোগুণে আচ্ছন্ন এবং অধিকাংশ মনুষ্যই যে তমোভাবাপন্ন উহা বোধ হয় কোন সম্প্রদায়ের সংস্কারকই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আর এই তমোগুণের প্রাবল্যেই জগতে,—বিশেষ ভাবে ভারতে যত ভেদ—যত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। এই অস্পৃশ্য বা বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির মূলেও যে তমোগুণই বিদ্যমান! কাজেই আমরা দেখিতেছি, এ ভাবে বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব লোপ পাইলে ফলটা বিপরীত দাঁড়াইবে সব একবর্ণ হইবে সত্য, কিন্তু কালবর্ণ হইবে; সাদা হইবে না। সুতরাং চিরকালই আমরা "কালা আদ্‌মিই" থাকিব। সভ্য দেশের সাদা মানুষের সঙ্গে সমকক্ষতার সুযোগ আর ঘটিবে না!

সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব বোধের আদর্শ ও যুগোপযোগী সহজ মানুষ মহাত্মা গান্ধী ছুঁৎবায়ুর প্রতীকারের চেষ্টা ও একান্ত গোঁড়ামির উপর কটাক্ষপাত ভিন্ন এ ভাবে চিরাচরিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতিভেদকে রাতারাতি চুরমার করিয়া দিয়া উদারতার অভিনয় প্রদর্শনের পক্ষপাতী নন। তাঁহার প্রচারিত কোন বাণী বা উপদেশের মধ্যে এরূপ ভাব যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন তবে আমরা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিব। অনেক স্থলেই বর্ত্তমান আকারে অনুষ্ঠিত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের মূলে আমরা ভ্রাতৃপ্রেম বা একতার নামগন্ধও পাইতেছি না। পাইতেছি শুধু ক্ষিপ্রতার সহিত ২২ কোটী অনুন্নত ও ৩ কোটী উন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করিয়া রক্ষণশীল দলের মনস্তুষ্টি বিধান।

জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার যাহারা পক্ষপাতী, তাহারা মহাত্মার বিরুদ্ধাচারী বিপ্লবপন্থী। কারণ ১২ বৎসর পূর্ব্বেও মহাত্মা ১৯২০ ইংরাজীর ৮ই

ডিসেম্বরের ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিয়াছেন :— "In my opinion it is not caste that has made us what we are. It was our greed and disregard of essential virtues which enslaved us. I belive that caste has saved Hinduism from disintegration." অর্থাৎ "আমার মতে জাতিভেদের ফলে আমাদের এই তুরবস্থা ঘটে নাই। আমাদের লোভ এবং সারভূত সদ্‌গুণের প্রতি উপেক্ষাই আমাদিগকে ক্রীতদাস করিয়াছে। আমার বিশ্বাস জাতি-বিভাগ হিন্দু ধর্ম্মকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে।" সম্প্রতিও তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছেন, "অস্পৃশ্যদিগের সহিত আহার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ব্যাপার। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য ইহা অত্যাবশ্যক নহে।"

নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সাম্প্রদায়িকতা কখনও মানুষের মধ্যে ভেদ বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। গোঁড়ামির কেন্দ্রস্থল দাক্ষিণাত্যের মহাপুরুষ তুকারাম ও অস্পৃশ্য পারিয়া-বংশসম্ভূত মহাত্মা শ্রীনন্দকে কি অভিজাতের দল গ্রহণ করেন নাই? সে দেশের কোন ব্রাহ্মণেরও ত সেরূপ প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায় না। বিধাতা যে দেশে তুকারাম ও শ্রীনন্দের জন্ম দিলেন, সে দেশে কি আমরা এমন কোন শক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাইব না, যে শক্তির প্রভাবে এরূপ কালাপাহাড়ী কাণ্ড না ঘটাইয়া শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষকে উন্নত করতঃ দেশটাকে সমভূমি করিয়া দিবে? ব্রাহ্মণ চণ্ডালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে 'ত্বমেবাহং' ঝড়ু ঠাকুরের মত ভুঁইমালীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া, হরিদাসের মত যবনের পাদোদক পান করিয়া বলিবে 'ধন্যোহহং'?

মানুষের মধ্যে মূলতঃ জাতিভেদ নাই। সব মানুষই একজাতি। মানুষ মানুষজাতি বলিয়াই পরিচিত। বর্ণ বা সম্প্রদায়ের গণ্ডী শুধু দুর্ব্বল জীবের ব্যষ্টিভাবে আত্মোন্নতি করিবার একটী উপায় মাত্র। গীতায় সঙ্গ-বর্জ্জিত হওয়ার উপদেশ দিয়া কি হিংসা-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে? বর্ত্তমানেও আমাদের দেশে এমন নিষ্ঠাবান্ শূদ্র বা চণ্ডাল পর্য্যন্ত আছে, যাহারা অন্য কাহারও এমন কি ব্রাহ্মণেরও হাতে খায় না। যার তার হাতে, যেখানে সেখানে, যাহা তাহা খাওয়া ত স্বাস্থ্যবিধি সম্মতও নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি আহারশুদ্ধির উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।" এস্থলে ইহার ভাষ্যকারগণ শুধু আমিষ বর্জ্জন বা ঘৃত ভক্ষণকে লক্ষ্য করেন নাই। যার তার প্রস্তুত বা দৃষ্টি-দুষ্ট খাদ্যকেও বর্জ্জনের উল্লেখ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যে 'দিট্' বা দৃষ্টি পড়িলে যে পেটের অসুখ হয়, ইহা ত আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা!

কোন শক্তিধর পুরুষ আসিয়া যখন জগতে আবির্ভূত হন, তখন দুর্ব্বল-সবল-নির্ব্বিশেষে সমষ্টিভাবে সকলের পরিচালনেই সমর্থ হন। তথাপি পরবর্ত্তীর শিক্ষার্থে জাগতিক নিয়মকেও যথাসম্ভব উপেক্ষা করেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যবন হরিদাসের সঙ্গে সমব্যবহার করিলেও নীলাচলে তাঁহার বাসা দিয়াছিলেন সমুদ্রের ধারে। সাধারণের বুদ্ধি বিভেদের ভয়ে অন্যান্য ভক্তের একসঙ্গে রাখেন নাই। তিনিও সমাজকে—বহিরঙ্গ লোককে ভয় করিয়া চলিতেন। এদিকে দেখিতেছি তিনি যবনের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সুবিধাবাদী সংস্কারকের দল বাহাদুরী করিতেছেন। পরন্তু তিনি যে সপ্তগ্রামের ১২ লক্ষের জমিদার শূদ্র গোবর্দ্ধনের অন্ন গ্রহণে আপত্তি করিয়াছিলেন, উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র যে পর্য্যন্ত কৃপা-পরিশুদ্ধ না হইলেন সে পর্য্যন্ত অন্ন গ্রহণ দূরে থাক্

তাঁহার মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিলেন না, ইহার উল্লেখ ত কেহ করেন না! কাহারো সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে নানা দিক আলোচনা করিয়া তাঁহাকে মোটামুটি বুঝিয়া তবে বলিতে হয়। আপন আপন মতলব অনুসারে বাছিয়া বাছিয়া কথা লইলে চলে না। ইহাতে অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চস্বামী রাখিয়া সতী হওয়ার দৃষ্টান্ত যে শাস্ত্রে আছে, মৃতপতির জীবন দান করিয়া সতী হওয়ার দৃষ্টান্তও যে সেই শাস্ত্রেই আছে! শ্রীকৃষ্ণ যেমন বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন, তেমন কালীয় দমনও করিয়াছিলেন!

আমরা মূলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু বাহিরের খোসা নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রকৃত ভেদের মূল যে মানুষের অন্তরে! বাহিরে তাহার অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং বৃক্ষের গোড়ায় জল না ঢালিয়া অসংখ্য পত্রে পত্রে দিতে যাইয়াই এত হৈচৈ উঠিয়াছে। ভেদ-জ্ঞানের উৎসস্বরূপ মনের প্রতীকার না করিয়া বাহিরের অনন্ত ভেদের অনুসরণ করিয়া কি হইবে? বাহিরের ভেদ যে অসংখ্য! একটা জাতিভেদ না হয় উঠাইয়াই দেওয়া গেল। ইহাতে ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণেতর জাতির ঈর্ষ্যাটা না হয় দূর হইয়াই গেল; কিন্তু তাহাতেই ত সব ভেদের অবসান হইয়া যাইবে না! এই বৈচিত্র্যময় জগতে ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান্-মূর্খ, সুস্থ-অসুস্থ, সুন্দর-কুৎসিত, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বহু প্রকারের ভেদ যে থাকিয়াই যাইবে এবং ভেদসম্ভূত রেষারেষিটাও অবশ্যই থাকিবে। শিক্ষায় দীক্ষায় মানসিক উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত ধনী কি দরিদ্রের নির্য্যাতন করিতে ছাড়িবে? দরিদ্র কি ধনীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে? মূর্খ কি প্রাণ খুলিয়া পণ্ডিতের সঙ্গে মিশিতে পারিবে? সুন্দর কি কুৎসিতকে একটুও তফাৎ রাখিবে না? সুস্থ-রোগীতেও কি কোন মানসিক পার্থক্য থাকে না? ইংরেজ মহাপুরুষ ফাদার ডুমেন কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের হৃদয় আকর্ষণ করতঃ তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে সফলকাম হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কুষ্ঠরোগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তবে আর শুধু জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া আমরা পূর্ণরূপে ঐক্যের আস্বাদ উপভোগ করিব কিসে? তবুও ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি মারামারি কখনও হয় না প্রমাণ করিতে পারিলে আমরা আমাদের সব যুক্তিতর্ক উঠাইয়া লইব। আর শুধু উন্নত-অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান জন্য এক পাতে এক ভাতে খাওয়াটাকে আমরা হাস্যজনক বলিয়া মনে করি। এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে আবার সমস্যা উঠিবে—"তোমরা পেণ্ট না পরিলে পেণ্ট পরা সভ্যদেশের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।" বহু দিন পূর্ব্বে নাকি মহাত্মার পোষাকের সমালোচনাও চলিয়াছিল। তাহা হইলে আমাদের বৃক্ষপত্রে জল সেকের মত কেবল সমস্যার সমাধানেই থাকিতে হইবে!

যে উপনিষদ্ হইতে 'স্বরাজ' শব্দটীর আমদানি হইয়াছে, তাহাতে এমন কোন আভাস নাই যে কোন বিদেশী জাতি গুরুর আসনে থাকিয়া আমাদের ভুল ধরিয়া ধরিয়া দিবে, আর আমরা বেমালুম সংশোধন করিয়া চলিব এবং পূর্ব্ববর্ত্তীর অজ্ঞতার অনুযোগ দিতে থাকিব। যে স্বরাজ লাভ করিতে হইলে ইংরেজ জাতির নির্দ্দেশেও চলিতে হয় না, বিদ্বেষও করিতে হয় না, আপ্ত কাম সমদর্শী মহাত্মা গান্ধীর উহাই লক্ষ্য। স্বরাজ শব্দের অর্থ আত্মস্থ হওয়া। যিনি মহাত্মার ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সরলা দেবীর বক্তৃতাতেও সে দিন আমরা তাহারই আভাস পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন

"আমাদের লক্ষ্য যে কোথায় তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে। নিষ্কাম কর্ম্মের ধারা ধরিয়া আমরা এবার বহু উর্দ্ধে চলিয়া যাইব।"

জাতি ও বর্ণভেদ রক্ষা করা আত্ম-দর্শনকামীর পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। উহা ঐ উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল। মানুষের মধ্যে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বাড়াইবার বা একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নয়। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মানুষ উন্নত হইতে চলিলে কি অপরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করিতে হয়? বড় ভাই কলেজে পড়িলে কি নিরক্ষর ছোট ভাই তাহার কাছে ঘেষিতে পাইবে না? কিন্তু আমাদের সমাজ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে স্বাতন্ত্র্যের স্থানে গোঁড়ামি বা আভিজাত্যের ভাবটাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। এবং সেই জন্যই অনেক মনীষী পর্য্যন্ত উহার উপর কটাক্ষপাত করিতেছেন। মূল উদ্দেশ্য অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই জাতিভেদটাকে একমাত্র ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা বলিয়াই যার তার মুখে ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই পক্ষেও ব্যভিচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার অভাব নাই। যা'তা করিয়া, যেমন ইচ্ছা চলিয়াও "আমি অমুক বংশের ভট্টাচার্য্য, আমি অমুকের প্রপৌত্র" এই অভিমানের আড়ালে আসল বস্তু ঢাকা পড়িয়া বাহিরে বিদ্বেষের ভাবটাই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে!

যিনি গুণ-কর্ম্মের বিভাগানুযায়ী চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তিনি আসিলেও বোধ হয় একটু অদল-বদল করিবেন, কিন্তু একবারে ভেদ ভাঙ্গিয়া একাকার করিবেন না।

আন্তর শৌচের কাছে বাহ্য শৌচটা গৌণ হইলেও মানুষ মাত্রেরই অল্প বিস্তর অবলম্বনীয়। এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে অস্পৃশ্যতার একান্ত বর্জ্জন অসম্ভব। যে সব অসভ্য জাতি বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়াও স্নান করে না, যাহারা ইঁদুর, সাপ ও ভেক ভক্ষণ করে এবং যে সব অনুন্নত জাতি প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ করে না, তাহাদের আচার-ব্যবহারের সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত একজন শৌচাবলম্বী ব্রাহ্মণে তাহাদিগকে স্পর্শ না করিলে, তাহাদের হাতের জল পান না করিলে বা তাহাদিগকে দেবগৃহে প্রবেশাধিকার না দিলে কি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ করা হইল? স্নান করিয়া আসিয়া অনেক সময় ত অস্নাত পিতাকেও স্পর্শ করা যায় না। এরূপ অস্পৃশ্যতাকে যদি ঘৃণা বা বিদ্বেষ অথবা দেবপূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ধরিয়া নেওয়া হয়, তবে বাহ্যশৌচটাকে একবারে নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া উঠাইয়া দিতে হইবে। পরন্তু সাধন-শাস্ত্র বা স্বাস্থ্যবিধিতেও বাহ্য শৌচের উপর কম জোর দেওয়া হয় নাই। তবে এমন বলা যাইতে পারে, আজ কাল উন্নত জাতির মধ্যেও ত অনেকে প্রস্রাব করিয়া জল নেয় না। তারা কি তবে স্পর্শযোগ্য? তারা কি দেব পূজার অধিকারী? না, তারাও অস্পৃশ্য; তারাও অনধিকারী। তবে উহা আমরা অবাধে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছি; কারণ বর্ত্তমান সমাজ বড় দুর্ব্বল। কঙ্কালটা মাত্র লইয়া কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি যখন প্রকৃত অস্পৃশ্যকেই অস্পৃশ্য বলিবার ক্ষমতা নাই, তখন যাহারা দাবী করিয়া ঘরে ঢুকিতে পারে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? এই সব পক্ষপাত ও উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান সংস্কারকগণ গোঁড়ামির নিন্দা করিতেছেন এবং 'ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেই কেন ব্রাহ্মণ হইবেন? তোমাদের অপেক্ষা আমরা কিসে কম?' ইত্যাদি প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ছেলেকেও

আমরা ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করিতেছি বলিয়াই তুল্যাচারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণেতর জাতিরা কৈফিয়ৎ চাহিতেছেন যে, কেন তাহাদের বেদে অধিকার থাকিবে না? কেন তাহারা প্রণব উচ্চারণ করিতে পাইবে না ইত্যাদি! মহাত্মাও এখানেই একটু জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বহুর জন্য—দুনিয়ার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা কাহারও নিজের অধিকারে বা কব্জার মধ্যে রাখা হিংসার মধ্যে গণ্য।" যাই হউক উহা অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে অধিকারীর জন্যই বলা হইয়াছে, সম্প্রদায়ের জন্য নয়। যে বেদাধিকার তপস্যা দ্বারা বহুর মাঝে একজন লাভ করিতে পাইতেন, কাল মাহাত্ম্যে উহা যেন এখন খেলার প্রতিযোগিতার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! উহা এখন সম্প্রদায়ের দাবীর জিনিষ! আজ পর্য্যন্তও যে প্রকৃত বেদাধিকার লাভ করিতে পারিতেছে, হউক না সে স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য, কোন্ ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়া আটকাইতে পারিতেছে? এবং কোন্ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার ঝগড়া করিতে হইতেছে? বেশী দিনের কথা নয়, এই পুণ্যভূমি শ্রীহট্ট জেলাতেই ঠাকুর বঞ্চিত, ঠাকুর অজ্ঞান, ঠাকুর জীবন ও ঠাকুর দুর্লভ প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল। তাঁহারা কেহই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কেহ স্পৃশ্য কেহ বা অস্পৃশ্যও ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত খ্যাতনামা সিদ্ধ পুরুষদের মতই 'ঠাকুর' হইয়াছিলেন। কেহ ত বাধা দেয় নাই—দিতে পারে নাই। এখন পর্য্যন্ত তাঁদের নাম স্মরণে ব্রাহ্মণেরাও মাথা নত করেন। এ উদাহরণ ভারতের সর্ব্বত্রই সব সময়ে ছিল ও আছে। পরমহংসদেব বলিতেন "যেখানে ধর্ম্ম হীনতা, সেখানেই ঝগড়া-বিবাদ।" বর্ত্তমানে জগতে ধর্ম্মের অভাব ঘটিয়াছে; তাই বিপ্লবও আরম্ভ হইয়াছে; তাই কারণ খুঁজিতে যাইয়া যার যাহা ইচ্ছা আবোল তাবোল বলিবারও সুযোগ পাইতেছে। কেহই যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত নয়, আনুপাতিক ভাবে সকলেরই যে পতন ঘটিয়াছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই; শুধু ব্রাহ্মণের উপর ঝাল ঝাড়া হইতেছে! কেহই কিন্তু নির্দ্দোষ নহেন।

শুধু জন্ম দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বেদাধিকার লাভ করা, আর আচারের সমতা দর্শাইয়া আইনের নজিরে দাবী করা এ দুটাই হাসির বিষয় বটে! এখানে এক পক্ষের গোঁড়ামি আর অপর পক্ষের বাড়াবাড়ি উভয়ই তুল্যভাবে দায়ী। ব্রাহ্মণ জন্ম দ্বারাই শ্রেষ্ঠ এ কথা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জড় বিজ্ঞানের যুগ বিংশ শতাব্দীর মানুষকে বুঝাইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র, আর উহা বুঝাইতে যাইয়াই আজ বিপ্লবের সৃষ্টি!

আর একটী কথা আমাদের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। যাঁহারা সাম্য-মৈত্রীর দোহাই দিয়া নির্ম্মম আঘাতে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট জাতিভেদটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষিত; সুতরাং শুধু অন্ন পানীয় সম্পর্কিত উদারতার ভাবটা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিতে হইবে। অপর পক্ষে দেখিতেছি, অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিতেরই অন্ত্যজের অন্নে বিদ্বেষ না থাকিলেও অন্ত্যজের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ গ্রাম্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অপেক্ষা অনেক বেশী। বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে যে কোন জাতির লোকই হউক অমুক দাদী, অমুক পুতি বলিয়া ডাকিতে প্রাচ্য শিক্ষিতদেরই দেখা যায়, কিন্তু পাশ্চাত্যদের পক্ষে উহা অতি বিরল ও লজ্জাজনক! পিতার বয়সের লোককেও নাম ধরিয়া ডাকাই গৌরব! একজন সর্ব্বভুক্ বাবু যে স্থলে খানসমাকে বলিবেন "শালা শূয়রকা বাচ্চা, হিঁয়াসে হট্ যা" সে স্থলে একজন আত্মপাকী ব্রাহ্মণ হয়ত বলিবেন "দেখিরে বাবা, একটু স'রে দাঁড়াও;

আমার জলে ছায়া পড়বে।" একজন সাধারণ লোক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে যেরূপ তুমি তুক্কার করিয়া কথা বলিতে পারে, মেলা মেশা করিতে পারে, পাক করিয়া অন্ন খাওয়াইতে পারিলেও একজন বড় বাবুর সঙ্গে কি সেরূপ পারে? 'আপনে অনধান' করিয়া সতর্কতার সহিত কথা না বলিলে 'বেয়াদব, বেতমিজ' শব্দ দ্বারা কি তিরস্কৃত হইতে হয় না? যাহাদিগকে অস্পৃশ্য ঘৃণিত বলিয়া ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে চটাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহারা এখনও ব্রাহ্মণকে যেরূপ "ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মামা, ঠাকুর কাকা" বলিয়া সম্বোধন করিতে পাইতেছে, এক বাবুকে 'বাবু' না বলিয়া এরূপ Friendly termএ সম্বোধন করিলে কিবা চপেটাঘাতেরই ব্যবস্থা হয়! তাহা হইলে সাধারণের সঙ্গে হৃদ্যতাটা কার বেশী হইল? স্থলবিশেষে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণতঃ সমাজের রীতি এইরূপই চলিয়াছে। তবে আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এ বিষয় ষোল আনা দোষী সাব্যস্ত করিয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় দেওয়া হয় কেন? অবশ্য তাঁদের গোঁড়ামিটাও যে আংশিক দায়ী, তাহাত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য আছে, সঙ্কীর্ণতা নাই; উদারতা আছে, ব্যভিচার নাই। এমন সর্ব্ব-সমঞ্জস বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম কি জগতে আর কোথাও কেহ দেখাইতে পারিবে? এখনও স্থানবিশেষে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কাণ্ডে পর্য্যন্ত, যে সব জাতির জল ব্যবহার নাই, সেই অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, রজক ও সূত্রধর প্রভৃতির বাধ্যতা-মূলক প্রয়োজন রক্ষা করা হইতেছে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত বৃত্তি প্রদান করা হইতেছে। সকলেই যেন একমাত্র কর্ম্মেরই এক এক অংশের সম্পাদক। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনির জীবকে পর্য্যন্ত বলি ও তর্পণের জল প্রদান আর কোন্ ধর্ম্মে আছে? পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া সেই ধর্ম্ম-আচরণের পাত্র নাই বলিয়া কি ধর্ম্মের উপর দোষ চাপাইয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে হইবে?

তারপর দেখ, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে কিরূপ সতর্ক ছিলেন। পাছে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যাইয়া কি জানি মানুষকে গোঁড়ামিতে পাইয়া বসে, পরস্পর প্রীতি-প্রণয়ের অভাব ঘটে, সেইজন্য "তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগর গ্রামদাহেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন দুষ্যতি" (হারীতঃ) ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থাও রাখিয়া গিয়াছেন। তৎপর যেখানে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব হয়, সেখানেও যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছেন; যথা—"দীর্ঘকাষ্ঠে-শিলাপৃষ্ঠে নৌকায়াং জাহ্নবীতটে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ স্পর্শদোষো ন বিদ্যতে॥" ইত্যাদি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ক্ষুদ্রতা-নীচতার স্থান একেবারেই ছিল না, অপিচ উদারতারও অভাব ছিল না।

আন্তরিকতা থাকিলে স্বাতন্ত্র্য ও উদারতা দুইই সুন্দর। অন্যথা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যাইয়া গোঁড়ামি এবং উদারতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

যে মৃগনাভির গন্ধে মুগ্ধ হইয়া মৃগ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেই বস্তু যে তাহার নিজের কাছেই রহিয়াছে উহা সে জানিতে পায় না। আমরাও নিজের বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষীরা ভারতের বৈভব দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেছেন। ' এই শুনুন ৪ মাস পূর্ব্বে কানাডার টরোণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আর উইন বাহাদুর এক দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে তথা হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কি অভিমত প্রকাশ

করিয়াছেন। তিনি ভারতের বহু পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, "আমরা ইতিহাসে বিজিত কর্ত্তৃক বিজেতার সমস্ত অভিনব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইবার বহু উদাহরণ পাইয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্ম এই দিক দিয়া এক প্রকাণ্ড বিস্ময়ের পরিচয় দিয়াছে। এই পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্ম বহু আক্রমণকারী জাতিকে গ্রাস করিয়াছে এবং উহার শক্তির একটী গোপন রহস্য এইখানে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে হিন্দুধর্ম্ম এক দুর্দ্ধর্ষ বিজেতা জাতির সম্মুখীন হয়। এই বিজেতাগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল। তদানীন্তন কালের ইস্‌লাম ধর্ম্ম একটা সামরিক ধর্ম্ম-সঙ্ঘ মাত্র ছিল এবং তখন মুসলমান-সন্তানগণের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল তাহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করা এবং প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করা। ইস্‌লামবাদীদের ধর্ম্মমত অত্যন্ত গোঁড়া, দৃষ্টি বাস্তব ও গণতন্ত্রমূলক। কিন্তু হিন্দুগণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের জীবন দর্শনভাব রহস্যপূর্ণ, দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী এবং সমগ্র জীবন-যাত্রাকে তাঁহারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে এই দুই ধর্ম্ম-মতের মধ্যে সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন।" ঐ দেখুন লাট বাহাদুর জাতিভেদবিহীন মুসলমান ধর্ম্মমতকে গোঁড়া বলিলেন এবং জাতির বেষ্টনীতে আবদ্ধ, কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হিন্দু-জীবনের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ভারতের ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া ইংরেজ মনীষীর শরণাপন্ন হইতে হইল,—ইংরাজীর তর্জ্জমা শুনাইতে হইল! ইহা দেশের শোচনীয় অবস্থা মনে করি; আর ততোধিক শোচনীয় অবস্থা মনে করিব যদি এখনও দেশের যুবকদল অবহিতচিত্ত হইয়া মহাত্মার ভাব হৃদয়ঙ্গম করতঃ খাঁটী পথ ধরিয়া না চলেন।

গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদ কর, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর হাত দিও না। গাছের চারা রোপণ করিয়া প্রথমতঃ গরু-ছাগলের ভয়ে বেড়া দিতে হয়; কিন্তু গাছ বড় হইয়া গেলে আর বেড়ার প্রয়োজন থাকে না; তখন গাছে হাতী বাঁধাও চলে। যে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আচণ্ডালে কোল দিয়াছিলেন, ভগবতী জ্ঞানে বারবিলাসিনীদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত নিজ মাথার চুল দিয়া পরিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমতঃ কৈবর্ত্ত বংশীয়া রাণী রাসমণির ৺কালী প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদরের ব্যবস্থায় ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন; তথাপি তিনি পণ্ডিত-সহোদরের বিরুদ্ধে থাকিয়াও আপন বিশ্বাসানুযায়ী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। পরে তিনি নিজেই পূজক হইয়াছিলেন।

বর্ণাশ্রমের গণ্ডীতে মানুষ আবদ্ধ থাকিলে জগতের কল্যাণ বৈ কোন অকল্যাণ হইবে না, কোনদিন হয়ও নাই। কিন্তু অসময়ে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া উহাদেরে ছাড়িয়া দিলে বিশেষ ভয়ের আশঙ্কা আছে। উহারা একটা অকাণ্ড কুকাণ্ড না ঘটাইয়া ছাড়িবে না। অবশ্য এই গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হওয়াই মানুষের চরম লক্ষ্য। জগদ্‌গুরুও বলিতে-ছেন—"**নির্গচ্ছন্তু জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।**" কিন্তু অসময়ে নয়। শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে যাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইও না। আবার দেখিও উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষা গোঁড়ামিও কম মারাত্মক নহে। কোন ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে নাকি একটী ক্ষুধার্ত্ত অস্পৃশ্য মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইলে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে অন্ন দেওয়া মঞ্জুর হইল, কিন্তু যেই মনে হইল "উহার উচ্ছিষ্ট মোচন করিবে কে?" অমনি মঞ্জুরী বাতিল হইয়া গেল। ক্ষুধার্ত্তেরও আর ইহ জীবনে অন্নের প্রয়োজন হইল না। এরূপ আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে ভাসাইয়া দিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে বাংলাদেশে গোঁড়ামি অপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খলতার সংশোধনই অধিক প্রয়োজন। এখানে যেমন বহুদিন হইতেই বিনা আন্দোলনে ছত্রিশ জাতির অন্ন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, আর কোথায়ও তেমন হয় নাই। এখানে মনসার কাছে আর ধুনার গন্ধ দিতে হইবে না। যেখানে হীন জাতিকে ঘণ্টা গলায় দিয়া "আমি অস্পৃশ্য আমায় ছুঁইও না" বলিয়া বলিয়া রাস্তায় চলিতে হয়, যেখানে অস্পৃশ্য জাতির থুথু পর্য্যন্ত মাটিতে ফেলার অধিকার নাই—নিজ নিজ হাতে ফেলিতে হয়, যেখানে পুকুরের জলে অস্পৃশ্যের ছায়া পড়িলেও জল অপবিত্র হয়, সে সব স্থানে এই আন্দোলন শোভনীয় ও মঙ্গলজনক হইবে।

জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা কখনও মানুষকে মানুষ হইতে ভিন্ন করিয়া রাখিত না। উহা স্থূল দেহের উপরেই মাত্র ক্রিয়াশীল ছিল। কালক্রমে শিক্ষার দোষে আমরা যতই দেহ-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছি, ততই ভেদ বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছি। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, পবিত্র-অপবিত্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি ভেদজ্ঞান ত শুধু দেহেতেই আরোপিত। দেহাতিরিক্ত প্রাণ বা আত্মার ত কোন ভেদ বৈচিত্র্য নাই; সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই প্রাণে প্রাণে বা আত্মায় আত্মায় মিশিয়া যাইতে কে আমাদেরে ঠেকাইতে পারিবে?

হে ভাই সব! হে প্রাণ-বন্ধুগণ! হে আত্ম-স্বরূপ দেহধারিবৃন্দ! বিভিন্ন কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই মহা মিলনই যে আমাদের চরম লক্ষ্য, আর এই একই লক্ষ্য ধরিয়া যে আমরা প্রত্যেকেই চলিয়াছি। ব্রাহ্মণ যে পর্য্যন্ত আচণ্ডালকে আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত কি তাঁহার চলার বিরাম আছে? গতি স্থগিত রাখিবার উপায় আছে? চণ্ডাল বা মেথর যে পর্য্যন্ত সেবা-কর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মণের কোল জুড়িয়া আসিয়া বসিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কি তাহার নিষ্কৃতি আছে? আমরা সবাই এক স্থানের যাত্রী। কেহ আগে, কেহ পাছে চলিয়াছি। তবে কার সংঘর্ষ বাধিবে কার সঙ্গে কার? কেহ যদি পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় বা বিপরীতমুখী ধাবিত হয়, তবেই না সংঘর্ষের সম্ভাবনা! কিন্তু আমরা যে সবাই একমুখীই ধাবিত হইয়াছি। চল ভাই! আর আমাদের ক্ষুদ্রতা নীচতার মোহে পড়িয়া মধ্য পথে বিশ্রাম করিবার সময় নাই। এ সব পথের জঞ্জাল ঝাঁটিয়া ফেলিয়া পূর্ণবেগে ধাবিত হই। বড় সুদিন আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকের ঝঞ্ঝা বিপ্লবেই তাহা সূচিত করিতেছে, আর মানুষকে আঘাত দিয়া জাগাইতেছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ যেমন হতভম্বের মত ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কি করিবে ঠিক করিতে পারে না, সেরূপ মানুষেরও জাগরণের সময় এখন। দলে দলে সব জাগিতেছে আর যার যা ইচ্ছা একটা কিছু করিতেছে। আঘাতের জাগরণ বলিয়া সম্পূর্ণ ঘোর কাটাইতে পারিতেছে না। শীঘ্রই ঘুমের ঘোর কাটিয়া যাইবে এবং ঠিক পথে চলিবে। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে এই অকরণ-কুকরণও পূর্ণ জাগরণেরই পূর্ব্বাভাস। উপর হইতেও ডাক আসিতেছে—"উত্থিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" আশ্বাস বাণী আসি-তেছে—"সম্মুখে স্নিগ্ধ আলো বিকশিত। সে আলোতে সুপ্রশস্ত অনেক রাস্তাই দেখা যাইতেছে। পৃথিবী ব্যাপী রজোগুণের ধ্বংসে সত্ত্বগুণের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। মায়ের ছেলের মা মা রবে জগৎকে মাতাইয়া তুলিতে হইবে। প্রতি ভাইয়ের প্রতি ভাইকে হাতে ধরিয়া—কাঁধে করিয়া মায়ের কোলে উঠাইয়া দিতে হইবে।" ওঁ তৎসৎ ওম্।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উৎরাই পথে আমরা খুব জোরে চল্‌তে পারলেও কিন্তু এ সময় আমাদের জোরে চল্‌বার শক্তি লোপ পেয়ে গেল—এও শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথের অহৈতুকী কৃপাই বল্‌তে হবে। সত্য বটে, এবার রাস্তা বেশ ভাল হয়েছে, কিন্তু রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে এমন খাড়া খাই (নীচু) যে হঠাৎ ভুলে সে দিকে পা পড়লে, সেখানেই চির সমাধি লাভ কর্‌তে হবে। তাই বোধ হয় শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথজী কৃপা করে আমাদের ধীরে ধীরে চল্‌তে বাধ্য কর্‌লেন। আমরা প্রকৃতির এমন হৃদয়-মন-শান্তিপ্রদ লীলা-খেলা দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে উৎরাই করে তিন মাইল দূরস্থ **বাউলকুণ্ড** চটীতে এসে পৌছলাম। এ চটীর অন্য নাম **ভুলকণা** চটী। এখানে চার পাঁচ জন দোকানদার ও পরিষ্কার জলের ঝরণা একটি আছে। এখানেই চিদানন্দ দাদা ও ছোট মা আমাদের জন্য পাক কচ্ছিলেন তথা মণিরামজীও সের খা নক আটার একখানা রুটী তৈরী করে বসে বসে চিবুচ্ছিল।

বাউলকুণ্ড
৩ মাইল

উপরে আমরা মেঘের অমন চিত্ত-মন-আনন্দপ্রদ লীলা-খেলা দেখে এসেছি ; কিন্তু এখানে তার কিছুই নাই। নামতে নামতেই মেঘের লীলা খেলা শেষ হয়ে চমচমা রোদ উঠে গেল। তখন চারি দিকের দৃশ্য কি সুন্দর! স্তরে স্তরে সজ্জিত পর্ব্বতশ্রেণী, তদুপরি স্তরে স্তরে সজ্জিত অসংখ্য রঙ্গ বেরঙ্গের সজীব সঘন-বন-জঙ্গল আমাদের চিত্তের আনন্দ বর্দ্ধন করে পথশ্রান্তি দূর করে দিল। সে যে কি সুন্দর! কেমন মনোরম!! কেমন হৃদয়-মন আনন্দকারী!!! তা' কেমন করে বল্‌ব? ভাষার এমন কোনও শক্তি নাই যে প্রকৃতির লীলা নিকেতনের প্রত্যেকটি জিনিষ বিশদরূপে বর্ণনা করতে পারে!—সেত বর্ণনার নয়, হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয়!

চোপতা হতে অন্য একটি সীধাপথ এই বাউল কুণ্ড বা ভুলকণা চটী হয়ে বদরীনাথের দিকে গিয়েছে। যাঁরা শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথের চড়াইটি খুব কঠিন মনে করেন তথা শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথ দেবকে উদ্দেশ্যেই প্রণাম করে রওনা হতে চান, আমরা যে পথে তুঙ্গনাথে গিয়াছি, সে পথে না যেয়ে তাঁরা সীধা চোপতা হতে এই পথে এসে থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথদেব তাদেরও দর্শন না দিয়ে ছাড়েন নি—সেটী পাণ্ডাদেরই অহৈতুকী কৃপা কিনা কে জানে? চোপতা হতে খানিক দূর এসে চড়াইয়ের মুখে শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথ দেবের পর্ব্বতের পাদদেশে পাণ্ডাদের কৃপায় (?) শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথের একজন প্রতিনিধি তৎপদে বিরাজিত থেকে আগন্তুক ভক্তদের দর্শন দানে মুক্তি দান কর্‌ছেন। তিনিও শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথ নামেই খ্যাত—তবে তিনি বোধ হয় শ্রীশ্রীনকল তুঙ্গনাথ বা তৎপ্রতিনিধি। যে সব যাত্রী উৎকট চড়াই করে আসল তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করতে অসমর্থ, তাঁরা এই শ্রীশ্রীপ্রতিনিধি তুঙ্গনাথকেই দর্শন প্রণাম করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে পুণ্য সঞ্চয় করে থাকেন বটে! পাণ্ডাগণও নাছোড়বান্দা! তারা চড়াই করতে অসমর্থ যাত্রীদের এই শ্রীশ্রীপ্রতিনিধি তুঙ্গনাথ দর্শন

করিয়েই নির্ম্মাল্যাদি দিয়ে নিজেদের উদর পোষণের জন্য কিঞ্চিৎ রজত মুদ্রা আদায় করতঃ (কোথাও বা স্বর্ণ মুদ্রা বা কাগজ মুদ্রা!) সুফল দানে কৃতকৃতার্থ করে থাকেন। এ পথটি চোপতা হতে দেড় মাইল। চোপতা হতে খানিক দূর এসেই উৎরাই। আমরা যেমনভাবে দুর্গা চটী হতে চড়াই করে এসেছি, এবার তেমনি ভাবে উৎরাইয়ের পালা মণ্ডল চটী পর্য্যন্ত।

আমরা আসার ঘণ্টা খানেকের ভিতরও যখন হরিদাস ভায়া এসে হাজির হল না, তখন তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পরে ভায়া আস্তে আস্তে এসে হাজির হ'ল। শুনলাম শ্রীশ্রীতুঙ্গনাথ হতে নামবার সময় মেঘে তাকে এমন ভাবে ঢেকে ফেলেছিল যে, সে পথ পর্য্যন্ত দেখতে পায় নি তথা পথগুলি ভিজে সড়সড়ে (পিচ্ছিল) হয়ে যাওয়ায় একবার পা হড়কে পড়ে যেয়ে, যদিও কোনরূপে একদম পঞ্চত্ব লাভ করে নি, কিন্তু কুচকী ফুলে ভয়ানক ব্যথা হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আস্তে দেরী হয়ে গেছে। ভায়াও অসুস্থ হয়ে পড়লো, আমিত কয় দিন হতেই জ্বরে ভুগছি; সুতরাং আজ এখানেই আড্ডা গাড়ব—আর এগুব না, সঙ্কল্প করলেও কিন্তু সঙ্গীয় অনেকেই আমাদের ফেলে রওনা হয়ে গেল; একবার জিজ্ঞাসাও করলে না আমরা যেতে পারবো কিনা ?—কেমন আছি ? যখন প্রায় সকলেই চলে গেছেন, তখন আমরা দু'ভায়ে এরূপ অসুস্থ শরীর নিয়েই চল্‌তে বাধ্য হলাম। সীধা পথে আধ মাইল আসার পরই **ভীমগোড়** বা **ভীমগড়** চটী। এখানে মাত্র দুই জন দোকানদার, থাকার বিশেষ সুবিধা নাই। অদূরেই ভীমের গুফা। প্রবাদ—ভীমসেন এখানে একান্তে বসে কুরুবংশ ধ্বংসের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে সাধনা করেছিলেন, গুফার প্রবেশ দ্বারে একটি বড় মৌমাছির চাক; সুতরাং ভয়ে গুহার ভিতর প্রবেশ করে দেখতে ইচ্ছা হ'ল না।

ভীমগড়
॥ মাইল

এ দিকের পাহাড়গুলি ন্যাড়া টিকিধারী বিল্ব সদৃশ নয়—তান্ত্রিকের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের মত ছোট বড় অনন্ত প্রকারের বিচিত্র গাছে পরিপূর্ণ। দুর্গাচটী হতে যেমন সঘন বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চড়াই করে এসেছি, এ দিকটাও তেমনি সঘন-বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উৎরাই করে যেতে হচ্ছে। দূরে-অদূরে নানা পক্ষীর কাকলীতে তথা সান্ধ্য সমীরণ আমাদের দেহে নূতন বল সঞ্চয় করে উৎসাহিত কচ্ছিল। এ সময় জায়গাটি নাতিশীতোষ্ণ। এক দিকে যেমন প্রকৃতির স্বরচিত লীলাভূমি, অন্য দিকে তেমনি নানা প্রকার পক্ষীর সুমধুর স্বরলহরী আমাদের বড্ড আনন্দ দিতে লাগলো। আমরা প্রকৃতির লীলা খেলা দেখতে দেখতে ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগলাম। সঙ্গীয় সকলেই চলে গেছেন। ভীমগড় হতে পৌণে দুই মাইল এসে **জঙ্গল** চটী। এর অন্য নাম **পাঙ্গরবাসা।** স্থানটি ঘন বন জঙ্গলের ভিতর অনেকটা সমতল স্থানের উপর অবস্থিত। সারিবদ্ধ অনেকগুলি ঘর। অনেক মেষপালক এখানে বাস করে। মেষপালকদের অনেকগুলি বড় বড় আট চালা ঘর। এখানে প্রচুর দুধ পাওয়া যায়—ঘীও যথেষ্ট। অন্যান্য জায়গার তুলনায় দুধ-ঘী সস্তাও বেশ! সরকারী ধর্ম্মশালা তথা পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে, কিন্তু স্থানটি বড় অপরিষ্কার! সঙ্গীয় সকলেই এখানে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছে। তাদের সকলেরই ইচ্ছা সামনের মণ্ডল চটী পর্য্যন্ত আজই যাবে। আমাদের অসুখের কথা তারা

জঙ্গল চটী বা পাঙ্গরবাসা
১৸ মাইল

মোটে আমলেই আনলো না। তাদের উদ্দেশ্য বুঝে কষ্ট হলেও হরিদাস ভায়া ঐরূপ অসুখের যন্ত্রণা নিয়েই যেতে তৈরী হ'ল।

এখান হতে সমস্ত পথটাই উৎকট উৎরাই, সুতরাং বিশেষ অনিচ্ছা স্বত্বেও যেতে রাজি হলাম; একদিকে যেমন পথটি উৎকট উৎরাই, তেমনি অন্য দিকেও কিন্তু সূর্য্যিমামা সারা দিন কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের আশায় আড্ডায় আড্ডা নিতে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে কিরণ জালগুলি গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। আবার অন্য দিকে ইন্দ্রদেব নিত্য বারি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকলেও কিন্তু আজ দুপুরে এ দিকটায় সে কাজ ভুলে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি কাজগুলি সম্পন্ন করতে লেগে গেলেন। —তথাপি কিন্তু সাথীদের মণ্ডল চটী পর্য্যন্ত যাওয়া চাই-ই!

ভাল! তাদের ইচ্ছাই পূর্ণ করতে সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমন অবস্থায় আবার বের হয়ে পড়লাম। প্রায় আধ মাইল উৎরাই করে এসে হরিদাস ভায়া হাঁপিয়ে গেল, তার পীড়িত স্থানের ব্যথা খুব বেড়ে যাওয়ায় ভায়া পথে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো। আমি জ্বর নিয়ে প্রায় মাইল খানেক এসে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম যে, রাস্তার পার্শ্বে নালার ভিতর ঘুরে পড়ে গেলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরটী ক্লান্ত, তদুপরি জ্বরের প্রকোপ—কাজেই চলবার শক্তি নাই। বাধ্য হয়ে সেই নালার ভিতর শুয়ে শুয়েই স্বার্থান্ধ সংসারের মায়া-মমতার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময়ে বোধ হয় স্বভাবতঃই এ চিন্তা হৃদয়ে জাগে! চিদানন্দ মহারাজ এসে হাজির হলেন এবং আমায় ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে বললাম,—"এগিয়ে মণ্ডল চটী পর্য্যন্ত যাও, আমরা আসছি।" তিনি রওনা হয়ে গেলেন। ছোট মা ছায়ার মত নিমেষে তৎপশ্চাতে অদৃশ্য হলেন। মণিরামজীও বোঝাসহ অস্পষ্টভাষায় গুন্‌গুন্ স্বরে গান করতে করতে তাঁদের পিছু নিল। আমি তদবস্থায় পড়ে রইলাম। কষ্টের সময়—বিপদের সময় জানি না কেন আপনা আপনিই হৃদয়কন্দর হতে গান বের হয়ে পড়ে। তাই অজানিত ভাবেই একটী গান বের হয়ে পড়লো।—চোখের জলে বুক ভিজিয়ে তাঁরই "**স্নেহের দান**" গাইতে লাগলাম :—

তুমি ত নীরবে ভালবেসে মোরে,
প্রণয় আমারে শেখালে।
মান-অভিমান তেয়াগি সকল
আদর করিতে দেখালে॥
পরের লাগিয়া আপনা ভুলিতে
তুমি ত' আমারে জানালে।
ঘুমন্ত প্রকৃতি এত কথা কহে
তুমি ত' তাহারে জাগালে॥
মানস-সরসে সুখের কুমুদ
তুমি ত' তাহারে ফুটালে।
শূন্য মন-গৃহ মন্দির করিয়ে
তুমি ত' প্রতিমা বসালে॥
প্রকৃতির মুখ সুন্দর দেখিতে
তুমি ত' আমারে শেখালে।
নীরব প্রকৃতি এত কথা কহে
তুমি ত' সে কথা শুনালে॥
আদর্শে থাকিয়ে দেখায়ে আমায়
এ হৃদয় তুমি গড়ালে।
বিষাদ পঙ্কলে ডুবিতেছিলাম
অমিয় সাগরে ভাসালে॥
চির জনমের সখা ওহে তুমি
এতদিন পরে বুঝালে।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
রাখিও চরণে "গোপালে"॥ *

* * * * *

কতক্ষণ আকুল হ'য়ে গান্ করেছি—জানি না। চেয়ে দেখি সঙ্গীয় সকলেই যারা পাছে ছিল, এসে পাশে বসে তন্ময় হয়ে আমার হৃদয়-গাথা তাঁরই "স্নেহের দান" শুনছে। হরিদাস ভায়া তখনও এসে হাজির হয় নি। ভায়ার জন্য অপেক্ষা করতে

* আমি ত তোমারে চাহিনী জীবনে—সুর।

লাগলাম। ভায়া যখন এসে হাজির হল, তখন অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধে গেছে। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তারার কিরণমালা হতেও বঞ্চিত। এদিকে সঘন বন-জঙ্গলে পথটী আবৃত থাকায় দেখা যায় না। আজ ছোট মার হাতে লণ্ঠন ছিল, তিনি ত' তা নিয়ে আগেই চলে গেছেন। সুতরাং আমরা এ পথটুকু—(প্রায় আড়াই মাইল পথ) অতিক্রম কর্‌তে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। একদিকে সু-উচ্চ পর্ব্বতগাত্র, অন্যদিকে গভীর খাদ। খাদের মধ্যে পড়ে গেলে মুহূর্ত্তেই পঞ্চত্ব লাভ হবে, তথা বন্যজন্তুর রসনার তৃপ্তি সাধন কর্‌বো বটে! উপায় কী? —নানা চিন্তা কর্‌তে লাগলাম। যিনি বিপদদাতা,—তিনিই উদ্ধার কর্ত্তা। সুতরাং তাঁরই নাম নিয়ে "জয়গুরু" উচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে চল্‌তে লাগলাম। হরিদাস ভায়ার টর্চ্চলাইটটীও মণিরামের বোঝার ভিতর ছিল। এদিকে কিন্তু ঝির ঝির বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে—যেন বাদলের আমাশায় হয়েছে! অতি অল্প সময়ের ভিতর আমাদের এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ঘোরতম অন্ধকারে আমাদের চলৎশক্তি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল—আমরা অন্ধের মত হয়ে গেলাম। অন্ধ যে কত কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবার বেশ বুঝতে পার্‌লাম। কলিকাতার ডায়মণ্ড-হাবড়া লাইনের গাড়ীর ভিতর একজন অন্ধ একটী বালকের হাত ধরে প্রায় নিত্যই তার দুঃখের গাথা গেয়ে গেয়ে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা কর্‌তো। সময়ের আবর্ত্তনে আজ বহুদিন পর তার সে করুণ গাথাটী আপনা আপনিই হৃদয় আলোড়িত হয়ে বের হয়ে পড়লো :—

আমার কত যে যাতনা!
কে বুঝিবে বল,		কত আঁখি জল,
আমার মুকুলিত হৃদে
কত যে বাসনা॥

লোক মুখে শুনি আছে দিবা নিশি,
আলোক ও আঁধার, আছে রবি শশী,
আছে কুসুমের সুমধুর হাসি
আঁখি নাই আমার, দেখা ত' হল না॥
—কত যে যাতনা॥

স্বভাবের শোভা না জানি কেমন,
রমণীর মুখ না হেরি কখন,
অতি কমনীয় শিশুর বদন,
বারেক বিধি জ্ঞানে দেখালে না॥
—কত যে যাতনা॥

যদি নাহি দিলি নয়ন যুগল,
রূপ তৃষ্ণা কেন করিলি প্রবল,
আঁখি নাই কেন দিলি আঁখি জল,
বাড়াতে অন্ধের হৃদয়-বেদনা॥
—কত যে যাতনা॥ +

তাই ত'! যার আঁখি নাই, জানি না কেন ভগবান্ তার আঁখিতে জল দিয়ে তার হৃদয়ের বেদনা আরও বাড়িয়ে দেন। ভগবানের এ কী ভীষণ আশীর্ব্বাদ কিছুই বুঝতে পারি না। সন্তান-হীন ব্যক্তি সন্তান কামনায় কাতর হলেও তাকে সন্তান হীন করে দিবানিশি কাঁদাবে, যারা হৃদয়-হীন নয় তাদের হৃদয়ে আরও করুণার উদ্রেক করে তাকে সদাই হায় হায় করাতে ভুলবে না। দুঃখীর দুঃখ-নিঃশ্বাস যাতে আরও সুদীর্ঘ হয়, তার জন্য সে সদাই ব্যস্ত। গরীবকে আরও গরীবত্বে নিক্ষেপ করে দিবানিশি তাকে চোখের জলে একশা করাবে। ধনীর ধন-সম্পদ আরও বাড়িয়ে তার হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জলন্ত আগুন জ্বালিয়ে তাকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যার সদাই অভাব, তাকে আরও অভাবের সমুদ্রে ডুবিয়ে নাকুনি চুবানী খাওয়াবে। যে ব্যক্তি যার জন্য অধীর, তাকে সে জিনিষ হতে আরও দূরে ঠেলে দিয়ে তার অধীরতা শত সহস্র গুণে বাড়িয়ে তুলে সদাই বিরহ-যাতনায় কাঁদাবে। যার মাতৃভক্তি প্রবল, তাকে মাতৃহীন করে সদাই মাতৃস্নেহ হতে

+ সুর—বেহাগ।

বঞ্চিত করে কাঁদাবে, যার গুরু ভক্তি প্রবল, তাকে দূর দূরান্তর—দেশ দেশান্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার হৃদয়ে আরও প্রবল আগুণ জ্বালিয়ে দিবে। কন্যা-দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দিন দিন আরও কন্যার বোঝা চাপিয়ে প্রশান্ত সাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দিবে, অন্নহীনের ঘরে যাতে অন্নের আরও অনটন হয়, তজ্জন্য "বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা"য় দিনরাত দগ্ধ করে মারবে, সতীকে বাল-বিধবা করে তার সতীত্ব অটুট রাখার জন্য সদাই নানারূপ জ্বালাতন করবে, সংসার-বিরাগী সাধুর পিছে সদাই সেবকের মত লেগে থেকে (যেন বটের আঁঠা!) যাতে তারা জগতের আর কিছুতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অতটুকুও আরাম করতে না পারে, সে জন্য উদ্‌ব্যস্ত করে মারবে—সদাই অশান্তিতে রাখবে। লীলাময়ের এ কেমন লীলা, তা সেই অনন্ত লীলাময় ভিন্ন কে আর বুঝতে পারে? হায়! জগতের এ কী ভীষণ আবর্ত্তন!— এ কী বিষম রহস্য!!—কে এর নিয়ন্তা!!! — কেন এ নিষ্ঠুর আচরণ!!!!—কে আমার এ সংশয় অপনোদন করে দিবে?.........

আজ বুঝলাম, অন্ধের কী মর্ম্মান্তিক যাতনা,— যদিও বা আমরা অন্ধ নই—কর্ম্মের ফেরে আজ অন্ধ হ'তে হয়েছে। তাই অন্ধ দেখলে বুঝি না তার হৃদয়ের ব্যথা কত গভীর! কত ভীষণ!! কী মর্ম্মান্তিক যাতনা নিয়ে, কত কষ্ট সয়ে, পেটের দায়ে আমাদের কাছে তারা হাত পাততে তৈরী হয়। কিন্তু আমরা এমনি অধম যে......! তাই আমরা আবার তারই সুরে সুর মিলিয়ে সমবেদনার্থ বলি—

যদি নাহি দিলি নয়ন-যুগল,
রূপ তৃষ্ণা কেন করিলি প্রবল,
আঁখি নাই কেন দিলি আঁখি জল,
বাড়াতে অন্ধের হৃদয়-বেদনা॥
—কত যে যাতনা—

চারি দিকে নানা প্রকার জীব জন্তুর কর্কশ শব্দ কানে আসায় আমরা থর থর করে কেঁপে উঠতে লাগলাম। সম্মুখে বিষম বিপদ বুঝতে পারলাম; কিন্তু তখন উপায় কী? মর্ম্মর শব্দে কত ডাল, পালা, গাছ, বাঁশ ভেঙ্গে পড়ছে,—মনে হচ্ছে যেন ভূত পিশাচগুলি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য বা আমাদের অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে আনন্দে নেচে নেচে ধেয়ে আস্‌ছে। কখনও মনে হচ্ছে হিংস্র জন্তুগুলি বুঝি সুস্বাদু নর-মাংস দ্বারা উদর তৃপ্তি করার জন্য বন জঙ্গল উপেক্ষা করতঃ তাদের পদ-দলিত করে আমাদের আক্রমণ করতে আস্‌ছে,— বোধ হচ্ছে যেন তাদেরই তাণ্ডবলীলায় গাছ পালাগুলি মড় মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। আবার তন্মুহূর্ত্তে আকাশে গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জন শুনে মনে হচ্ছে যেন ইন্দ্রদেবও আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, আমরা যাতে শ্রীশ্রীবদরীশকে দর্শন করে মুক্ত হতে না পারি, তারই জন্য যেন এখানেই আমাদের ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন। আবার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের প্রভায় হৃদয়ে বলের সঞ্চার হচ্ছে— বিদ্যুতের প্রভা দেখে মনে হচ্ছে যেন মহামহিমাময়, চির করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে তাঁর প্রিয় সন্তান গণের কোন অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাঁরই রূপের-ছটা বিদ্যুতের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে আমাদের অভয় দিচ্ছেন। তাতেই তো না জানি এ জীবনে তাঁর কত অনুকম্পা হৃদয়ে উপলব্ধি করে কত অনন্ত বার গেয়েছি:—

সদাই শিষ্যের পাছে পাছে কেবা এমন ফিরিতেছে,
শিষ্যের দুঃখ দেখি কেবা এমন যতন করে।
শিষ্যের ব্যথা বুঝে যে তাঁর সদাই আঁখি ঝরে॥
এমন গুরু কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
আমার প্রাণের ঠাকুর সে যে, আমার হৃদয়-স্বামী॥

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য

বিগত ৩১শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে যে কুতবপুর শ্রীশ্রীগুরুধামে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের সার্ব্বভৌম জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা আর্য্য-দর্পণের পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন। উক্ত দিবস সারস্বত মঠান্তর্গত অনেক সঙ্ঘেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিতও হইয়াছে।

সম্প্রতি সুদূর ব্রহ্মদেশের আকিয়াব সহরেও যে উক্ত মহোৎসব উক্ত তিথিতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, আমরা তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত তিথিতে উক্ত স্থানে প্রায় ৫০০।৬০০ লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে এইরূপ বিরাট ভাবে জন্মোৎসব ইহাই প্রথম। উৎসবটী শ্রীপরেশনাথ গুহ হেড্‌এসিষ্ট্যান্টের বাসায় সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীমৎ গোপাল ব্রহ্মচারীই ইহার উদ্যোক্তা। উক্ত দিবস বেলা ৫টার পর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী বন্ধুদের লইয়া এক অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ B. S. C. মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সারাংশ, সারস্বত মঠের মহান্ উদ্দেশ্য ইত্যাদি সব বিষয়েরই বিবৃতি আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমার অভিভাষণটী যথাস্থানে মুদ্রিত করিলাম।

বিগত ১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার আমিলাইস সারস্বত মহিলা সঙ্ঘের ১ম বার্ষিক অধিবেশন বিভাগীয় ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মহাশয়ের বাসভবনে বিপুল সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করতঃ সঙ্ঘের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করেন। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস সঙ্ঘের কার্য্য প্রণালী এবং তদ্বারা দেশের ও সঙ্ঘের সেবকগণের কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা বর্ণন করিয়া এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র নন্দী B.S.C. B.L. সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিয়া তদ্বারা দেশের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করেন, এবং ওজস্বিনী ভাষায় গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলকে সঙ্ঘের কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য এবং প্রয়োজন বশতঃ অর্থসাহায্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের উচ্চ আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিনা নিমন্ত্রণে অনেকেই অপ্রত্যাশিত ভাবে অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সমস্ত গ্রামে ইহাদ্বারা এক নব জাগরণের স্পন্দন অনুভূত হয়। এতদুপলক্ষে 'শ্রীশ্রীগুরুপূজা' অনুষ্ঠিত হয় এবং সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রসাদ বিতরিত হয়। বোবাং রাজ ষ্টেটের সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রত্যেক পুরমহিলা যেন এই সঙ্ঘের সাপ্তাহিক ধর্ম্মানুশীলনে যোগদান করেন তজ্জন্য বিশেষ ভাবে মহিলাদিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতা নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

গ্রন্থ-সমালোচনা

<u>ভারতীয় সঙ্ঘ-তত্ত্ব</u>—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা, মূল্য ৸০ বার আনা।

পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্ঘের সৃষ্টি হইতে পারে না। ভারতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মূল—আত্মসমর্পণ যোগ। গ্রন্থকার তাঁহার "ভারতীয় সঙ্ঘ-তত্ত্ব" পুস্তকে এই মূল কথাটাই বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানা মনোযোগের সহিত পড়িলে—সঙ্ঘ গড়িতে গিয়া পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়া বিফল মনোরথ হইতে হইবে না। সঙ্ঘসেবী মাত্রেই এই পুস্তকখানা পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

<u>সম্মিলনীর চিঠি</u>—(১৭শ বার্ষিক ভক্ত-সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ) প্রকাশক—শ্রীহরপ্রসাদ রায়, মূল্য চারি আনা, প্রাপ্তিস্থান—উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম—পোঃ বগুড়া।

সারস্বত মঠে এবং তদন্তর্গত শাখা আশ্রমগুলিতে প্রত্যেক বৎসরই পর্য্যায়ক্রমে পৌষ মাসে একবার ভক্ত-সম্মিলনী হয়। "সম্মিলনীর চিঠি" হালিসহর শাখা আশ্রমের ভক্ত-সম্মিলনীরই বিস্তৃত বিবরণ। সম্মিলনীতে যাঁহারা কোনদিন যোগদান করিবার সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগকে এই 'সম্মিলনীর চিঠি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানা পড়িতে অনুরোধ করি। ইহা পড়িলে ঘরে বসিয়াই সম্মিলনীর আনন্দোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন, ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ আনন্দ উপলব্ধি করিবার দরুণ সম্মিলনীতে যোগ দিবার বাসনাও না জাগিয়া পারিবে না। পরিশিষ্টে "ব্রতভঙ্গ" নামক প্রবন্ধটী পুস্তকখানার মূল্য বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রবন্ধটী পড়িলে, জীবনের অনেক গুরুতর সমস্যারই সমাধান পাওয়া যায়।

—×—

সাহায্য-প্রাপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুধামে

(প্রকাশিত অংশের পর)

শ্রীযুক্ত কামেশরঞ্জন পাল ১৲
শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী দত্ত ১৲
,, বিজনবাসিনী রায় ৷৷০

পূর্ব্ববাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় ১৲
,, রমেশচন্দ্র কুরি ১৲
,, ব্রজবাসী কুরি ৷৷০
,, সত্যবান কুরি ৷৷০
শ্রীযুক্ত নন্দলাল কুরি ৷৷০
,, ঈশ্বরচন্দ্র কুরি ৷০
,, যোগেন্দ্রলাল কুরি ৵০
,, সতীশচন্দ্র সরকার ১৲
,, হীরালাল গুপ্ত ১৲
,, যামিনীকুমার মজুমদার ১৲
,, রাধানাথ দে ১৲
,, বৈকুণ্ঠকুমার নমঃ ১৲
,, নরেশচন্দ্র ধর ৷৷০
,, জনৈক ভদ্রলোক ৷৷০
,, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ১৷০
,, বিপিনবিহারী সাহা ১৲

২৫শ বর্ষ | পৌষ—১৩৩৯ | ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৭২ | | ৩য় সংখ্যা

উদ্গীথোপাসনা

দেবাসুরাহবৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গী-
থমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি। ১

প্রজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুর—উভয় দলের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল। 'আমরা উদ্গীথ দ্বারা অসুরদিগকে পরাভব করিব' এই ভাবিয়া দেবগণ উদ্গীথ গ্রহণ করিলেন।

অসুরদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পূর্ব্বে দেবগণ দৈব-শক্তির আশ্রয় লইতেন। এই দৈব-শক্তির সাহায্য পাইয়াই তাঁহারা অসুরদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাহার উপাসনায় বিজয় লাভ হইবে প্রথমতঃ দেবতাগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এইজন্যই তাঁহারা—

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তংহাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনাহ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ২

নাসিকাস্থ প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অসুরগণ এই প্রাণকে অনায়াসে পাপবিদ্ধ করিল। অসুরগণ যে নাসিক্য প্রাণকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ সুগন্ধি-দুর্গন্ধি উভয়ই আঘ্রাণ করিয়া থাকে। দেবতারা তখন অন্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর—

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাংহাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যং চানৃতং চ পাপ্মনাহ্যেষা বিদ্ধা ॥ ৩

দেবতাগণ বাগিন্দ্রিয়কে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণ তাহাকেও পাপবিদ্ধ করিল। এইজন্যই লোকে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সত্য-অসত্য উভয়ই বলিয়া থাকে। বাগিন্দ্রিয়কে উপাসনা করিয়াও কোন ফল লাভ হইল না—এইজন্যই দেবতাগণ আবার—

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৪

চক্ষুকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষুও অসুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। এইজন্যই চক্ষু শুধু প্রিয়ই দেখে না, অপ্রিয়ের প্রতিও চক্ষু ধাবিত হয়। চক্ষুও অসুর দ্বারা পাপবিদ্ধ।

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৫

অতঃপর দেবগণ শ্রোত্রদেবতাকে উদ্গীথ কার্য্যের দরুণ উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অসুরগণ তাহাকেও পাপবিদ্ধ করিল। এইজন্যই লোকে শ্রোত্র দ্বারা প্রিয়-অপ্রিয় উভয়ই শ্রবণ করিয়া থাকে। শ্রোত্রের সাহায্যেও দেবতারা অসুরগণকে পরাজিত করিতে পারিলেন না।

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ং চাসঙ্কল্পনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্ ॥ ৬

অনন্তর দেবগণ মনকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মনও অবিচলিত থাকিতে পারিল না, অসুরগণ মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। এইজন্যই লোকে মনোদ্বারা সাধু-অসাধু উভয় বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে।

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তংহাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেৎ। ৭

পরিশেষে দেবতাগণ মুখ্য প্রাণকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিলেন। লোষ্টাদি যেমন কঠিন প্রস্তরকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তেমনি অসুরগণও মুখ্যপ্রাণকে বিদ্ধ করিতে গিয়া নিজেরাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দেবতাগণ মুখ্য প্রাণের সাহায্যেই ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছিলেন। এই মুখ্য প্রাণকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। শত্রুরা সেই মহাপুরুষকে বিধ্বস্ত করিতে গিয়া নিজেরাই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মুখ্য প্রাণকে যিনি জানিয়াছেন—তিনি দুর্ভেদ্য পাষাণবৎ। ভিতর-বাহিরের শত্রু তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার না করিয়া পারিবেই না। সুতরাং সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মুখ্য প্রাণকেই অবলম্বন করিতে হইবে। মুখ্য প্রাণ—অপাপ-বিদ্ধ। তাঁহাকে কোন কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। শত্রু পরাজয় করিতে হইলে মুখ্য প্রাণের বজ্রদৃঢ় অনুভূতিই লাভ করিতে হইবে। —বাহিরের আয়োজন আড়ম্বর এই অনুভূতির তুলনায় অনেক নগণ্য। আর কোন সম্বল না থাকিলেও চলিবে—চাই শুধু মুখ্য প্রাণের অচল-অটল অনুভূতি। এই অনুভূতিই শত্রু-পরাজয়ের অব্যর্থ অস্ত্র। সহায়-সম্বলহীন মানবের আজ এই অস্ত্রই উদ্যত করিয়া ধরিতে হইবে—যে অনুভূতিরূপ শাণিত অস্ত্রের নিকট সকল ইন্দ্রিয়-শক্তিই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

*　　　　*　　　　*

দেবতা এবং অসুরের এই সংগ্রাম প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক দেহেই অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"প্রকাশার্থক 'দিব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন দেব অর্থ—শাস্ত্রজ্ঞানোজ্জ্বল ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ। আর অসুর অর্থ—দেবতার বিপরীত; কেন না উহারা বিবিধ বিষয়ানুগত স্ব স্ব প্রাণ ধারণ কার্য্যেই সন্তুষ্ট বা রত থাকে—অতএব ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহ স্বভাবসিদ্ধ তমোময়। শাস্ত্রানুযায়ী প্রকাশ বৃত্তির অভিভবে প্রবৃত্ত স্বাভাবিক তমোময় ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয়ই অসুর পদবাচ্য। আবার তদ্বিপরীতস্বভাব শাস্ত্রার্থ বিষয়ে বিবেকজ্ঞান স্বরূপ দেবগণও স্বভাবসিদ্ধ তমোবৃত্তিরূপ অসুরগণের পরাভবার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত। সুতরাং লৌকিক সংগ্রামের ন্যায় উক্ত প্রকার পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পরের অভিভব ও উদ্ভবরূপ দেবাসুর সংগ্রাম অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিসে ধর্ম্ম হয়, আর কিসে অধর্ম্ম হয়, এতদ্‌বিষয়ে বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদনার্থ প্রাণের বিশুদ্ধি বিধানের উদ্দেশ্যে এখানে শ্রুতি সেই বৃত্তিদ্বয়ের পরস্পর অভিভাব্যাভিভাবক ভাবকেই আখ্যায়িকারূপে বর্ণন করিয়াছেন।"

অসুরগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে, বাগিন্দ্রিয়কে, চক্ষুরিন্দ্রিয়কে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে, মনকে পাপবিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল—কিন্তু মুখ্য প্রাণকে পাপবিদ্ধ করিতে পারে নাই। অতএব মুখ্য প্রাণকেই উদ্গীথরূপে উ াসনা করিতে হইবে। মুখ্য প্রাণের উপাসক—পাষাণের ন্যায় অনভিভাব্য।

——ওম্——

গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্থিতপ্রজ্ঞের জীবনাদর্শ

কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করার পরই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আচ্ছা, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? তাঁর চাল চলন, কথাবার্ত্তাই বা কেমনতর ?"

স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটা আজ কাল technical হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, অর্জ্জুনের মনে এই কথাটা জাগ্‌লো কি করে, আর স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটাই বা তিনি পেলেন কোথায় ? কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যাটা আলোচনা করে দেখ, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধি কথাটার ওপর খুব জোর দিচ্ছেন, বার বার বল্‌ছেন, "**বুদ্ধি**যুক্ত হয়ে কাজ কর্‌লে কর্ম্মের বন্ধন এড়াতে পার্‌বে (৩৯)" "ব্যবসায়াত্মিকা **বুদ্ধি** অব্যভিচারিণী, আর সব **বুদ্ধি** কেবল ডাল পালা মেলে।" (৪১) "ভোগ আর ঐশ্বর্য্য যার মনোহরণ করেছে, তার বুদ্ধি সমাধির দিকে যায় না।" (৪৪) "**বুদ্ধির** শরণ নাও, যারা কর্ম্মের ফল খোঁজে, তারা কৃপার পাত্র" (৪৯) "যে **বুদ্ধি**যুক্ত, সে পাপ-পুণ্যের পার" (৫০) "**বুদ্ধি**যুক্ত মনীষীরা জন্মবন্ধন এড়িয়ে যান" (৫১) "তোমার **বুদ্ধি** মোহনির্ম্মুক্ত হলে পরে আর তোমার বেশী কিছু শোনবার দরকার হবে না" (৫২) "**বুদ্ধি** যখন সমাধিতে নিশ্চল হবে, তখনি তুমি যোগী হবে।" (৫৩)

এই শেষের কথাটা হতেই অর্জ্জুনের মনে ওই প্রশ্ন জেগেছে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি আর পতঞ্জলির প্রজ্ঞা বা বৌদ্ধদর্শনের প্রজ্ঞা একই বস্তু। কেউ কেউ বলেন, এই বুদ্ধি ও জ্ঞান একই কথা। ফলে দুটী এক হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারে তারা এক নয়। বুদ্ধিকে সাংখ্য দর্শনে মহত্তত্ত্ব বা The great principle of nature বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির সঙ্গে কপিলের বুদ্ধির সম্বন্ধ আছে অথচ শ্রীকৃষ্ণের "বুদ্ধি" একটা Transcendental principle. কপিল বুদ্ধিকে পেরিয়ে যেতে বল্‌ছেন, শ্রীকৃষ্ণ এই বুদ্ধিকেই refined করে জীবনের নিত্য-সঙ্গী করে নিতে বলেছেন। জ্ঞান বল্‌তে বুঝি একটা passive state, বুদ্ধি বল্‌তে বুঝ্‌ব একটা active principle. এই বুদ্ধি শুধু reason নয়, এ will-powerও বটে ! Socratic principle of reason এর সঙ্গে এর কতকটা সাদৃশ্য আছে, উভয়ই দ্বন্দ্ব নির্ম্মুক্ত হবার চেষ্টা করছে, উভয়েই শুধু knowledge নয়, virtueও বটে ; তবে Socratic reason Transcendental কিনা, তার স্পষ্ট পরিচয় নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের "বুদ্ধি" স্পষ্টতঃই Transcedental —এক দিকে তা জীবনের নিয়ামিকা শক্তি আর এক দিকে তা আত্মজ্যোতিঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগের ওপর কর্ম্মকে স্থাপনা করেছেন, আর বল্‌ছেন, তার চরম ফল সমাধি। এই সমাধি কিন্তু কেবল স্থিত-সমাধিই নয়, শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ করে উন্মনা সমাধিকেই লক্ষ্য করেছেন। সাধারণতঃ আমাদের মনে সমাধি বল্‌তে কর্ম্মহীন কাষ্ঠবৎ অবস্থাটাই মনে জাগে এবং বহু সহস্র বৎসর ধরে আমরা ওই লক্ষ্যকেই বড় বলে বুঝে এসেছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমাধি বল্‌তে তা বোঝান নি। তাঁর সমাধি হচ্ছে একটা perfect balance

between the divergent powers of life. অর্জ্জুনকে তিনি সমাধিস্থ থেকেই যুদ্ধ কর্‌তে বলছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমাধি লাগিয়ে জড় হতে উপদেশ দেন নি। আর অর্জ্জুনের মনেও সমাধি বল্‌তে জড়ত্বের চিত্র জাগে নি, তাই তিনি সহজ ভাবে প্রশ্ন কর্‌ছেন, সমাধিস্থ যোগীর জীবনে ব্যবহার কি রকম দাঁড়ায়?

অর্জ্জুনের এই ধরণের প্রশ্নের একটা তাৎপর্য্য আছে। সমাধির স্বরূপ-লক্ষণ আমরা মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌ব না; তাহলে সমাধির আদর্শকে অনুসরণ কর্‌বার সুযোগ পাব কেমন করে? তাই সমাধিস্থ যোগীর ব্যবহার সম্বন্ধেই আমাদের জিজ্ঞাসা জাগে। সিদ্ধের যা ব্যবহার, সে সম্বন্ধে অনুশীলন কর্‌তে কর্‌তেই সাধকের হৃদয়ে সিদ্ধের অনুভব স্ফুরিত হবে। তা ছাড়া নির্জ্জনে সমাধি-অভ্যাস জীবনের এক তরফা অনুশীলন মাত্র, সজনে সমাধি-অভ্যাসও প্রয়োজন, নইলে জীবন পূর্ণাঙ্গ হল কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ দুয়েরই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকে বা জীবনের ব্যবহারকে বুদ্ধি-যোগের ওপর স্থাপনা কর্‌তে বলেছিলেন, এখন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বল্‌তে গিয়ে ওই বুদ্ধিযোগের আদর্শকেই স্পষ্ট করে তুল্‌ছেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহারের কথা। শ্রীকৃষ্ণ আগেই দিলেন কিন্তু তাঁর চিত্তের পরিচয় এবং বল্‌লেন, "কামনা ত্যাগ এবং আত্ম-রতিই হচ্ছে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ।" (৫৫) কর্ম্মযোগের কথাই এ পর্য্যন্ত হচ্ছিল, তার সঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের জীবনা-দর্শের যোগ রাখবার জন্যই এই লক্ষণটী শ্রীকৃষ্ণ আগে বল্‌লেন। বাইরে থেকে স্থিত-প্রজ্ঞকে বুঝবার উপায় নাই; তাঁর পরিচয় তাঁর অন্তরে। সে অন্তর কামনার বিক্ষোভ হতে মুক্ত এবং নিত্য-তৃপ্ত। এই কথাটী আমরা পরে বুঝবার চেষ্টা কর্‌ব। এখন শ্রীকৃষ্ণের উক্তিগুলিকে সাধকের চিত্তের evolution অনুযায়ী সাজিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শটী বোঝা যাক্।

বুদ্ধির চরম বিকাশে স্থিত-প্রজ্ঞের স্বভাব ফুটে উঠে, অতএব মানুষের evolution এর এক প্রান্ত হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞতা, আর এক প্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন। শ্রীকৃষ্ণ ৬২-৬৩ শ্লোকে এই সাধারণ মানুষের চিত্তগতির একটা সুন্দর psychological analysis দিয়েছেন। বল্‌ছেন, "সাধারণ মানুষের subjective life বা অন্তর্জীবন, introspection বা আত্ম-বীক্ষণ বল্‌তে কিছুই নাই, তাদের চিত্তের ধর্ম্ম হচ্ছে বিষয়ের ধ্যান—শুধু objective impression নেওয়া। এই impression নিতে নিতে চিত্তে তার জাগে "সঙ্গ" বা strong associations; ফলে বিষয়-চিন্তা হতে তার অব্যাহতি পাবার আর উপায় থাকে না, ধ্যানে চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী কর্‌তে চাইলেও কেবল বাইরের বস্তুই মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে। এই 'সঙ্গে'র পরিণাম হচ্ছে 'কাম' যার স্বরূপ হচ্ছে imperfect vision, selfish emotion ও misguided will. চিত্ত এই সমস্ত কলুষে আবিল থাক্‌লে জগতের সঙ্গে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং তারই ফল হচ্ছে "ক্রোধ"—a hunting sense of displeasure & uneasiness বিক্ষিপ্ত চিত্তের পরিণাম হচ্ছে অবসাদ, তাই 'সম্মোহের' সৃষ্টি করে —তার ফলে 'বিবেকজ্ঞান' power of discrimination নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে 'প্রমাদ' বা 'স্মৃতি-বিভ্রম'; বারবার আঘাত পেয়েও আদর্শের কথা মনে থাক্‌তে চায় না। পুনঃপুনঃ এই আদর্শ-বিচ্যুতি থেকে জীবন disintegrated হয়ে যায়, কোনও একটা principleকে জোর করে ধর্‌বার মত শক্তি থাকে না, তাই হল 'বুদ্ধিনাশ'। আর

এর ফলেই "প্রণাশ" বা moral death!"

অসমাহিত চিত্তের এই হচ্ছে পরিণাম; আর এ পরিণাম কি ভীষণ, তা ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে! লক্ষ্য করো, সমস্তের গোড়ায় হচ্ছে **বিষয়ের** ধ্যান। চিত্ত কেবল বাইরের বস্তু নিয়েই মত্ত রয়েছে, একবার ভিতরের পানে তাকাচ্ছে না। চিত্তের এই বহির্ম্মুখী গতিকে রুদ্ধ করতে হবে, ভিতরের দিকে তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে—এই হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের সাধনা। কি করে তা সম্ভবপর, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাই বল্‌ছেন। বোধ হয় মনে আছে, বেদবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভোগ আর ঐশ্বর্য্য এই দুটীর উল্লেখ করে বলেছিলেন, এ দুটীতে যাদের মন চুরী করে নিয়েছে, তাদের বুদ্ধি কখনো সমাধির অনুগামিনী হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞের জীবনাদর্শ বুঝতে হলে, এ কথাটাই ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ভোগ আর ঐশ্বর্য্যই আনবে প্রজ্ঞাস্থিতির অন্তরায়।

Psychologist রা বলেন, চিত্তের তিনটী ধর্ম্ম,—Knowledge, Emotion আর Will. চিত্তের যে কোন বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করলেই এই তিনটীকে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখতে পাব। আমাদের দার্শনিক পরিভাষায় বলতে গেলে এদের বলি সংবিদ্ (knowledge of cognition), বেদনা (emotion or feeling) আর বাসনা (will or volition.) চিত্তস্পন্দনের যে কোনও ক্ষণে আমরা একটা কিছুকে জানছি, জেনে সুখ-দুঃখ বোধ করছি আর সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূলে একটা না একটা প্রবৃত্তির উদয় হচ্ছে। সংবিদ্‌বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করলে যেমন অপর দু'টী বৃত্তি পাওয়া যাবে, তেমনি যে কোনও বেদনা-বৃত্তি বা বাসনা-বৃত্তিকে বিশ্লেষণ করলেও তার মাঝে আর দুটী বৃত্তি জড়িয়ে আছে দেখতে পাওয়া যাবে। এই তিনটী বৃত্তির মাঝে কোন্‌টী হেয়, আর কোন্‌টাই বা উপাদেয়, তা বলা কঠিন। অশুদ্ধ অবস্থায় তিনটীই আমাদের শত্রু; আবার বিশুদ্ধ হলে তিনটীই ব্রহ্মদর্শনের এক এক উপায়-রূপে পরিগণিত হতে পারে। তিনটী সনাতন সাধন-পন্থা রয়েছে এবং গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটীরই ব্যাখ্যা করেছেন—জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম্ম; এই তিনটী সাধন-পন্থার মূলে ওই তিনটী বৃত্তি। সংবিদ্‌বৃত্তি বা cognition এর পর্য্যবসানে পাই স্থিতপ্রজ্ঞতার আদর্শ বা বুদ্ধিযোগ বা সাংখ্যযোগ; বেদনা-বৃত্তির বা emotion এর পর্য্যবসানে পাই ভক্তিযোগ, যার পরিপাক হচ্ছে ভাগবত প্রেমধর্ম্মে; আর কামনা-বৃত্তি বা will এর পর্য্যবসানে পাই কর্ম্মযোগ—যার ভিতরের দিকটা বা সাধনার দিকটা পতঞ্জলি বিজ্ঞান-হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন; আর ফলিত দিকটা বা সিদ্ধির দিকটা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদের যে সচ্চিদানন্দ তাঁর তিনটী aspect এই তিনটী সাধনার সঙ্গে যুক্ত। Will এর চরম বিকাশে আত্মা বা ব্রহ্মকে কূটস্থ, অচল, ধ্রুব সত্যরূপে অনুভব করি। Cognition এর চরম বিকাশে তাঁকে সর্ব্বতোভাস্বর, দীপ্ত, চৈতন্যরূপে দর্শন করি; আর Emotion এর চরম বিকাশে তাঁকে অনন্ত প্রেম-স্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ বলে আস্বাদন করি। মনে রাখতে হবে, তিনটী বৃত্তিই জড়িত, আর ব্রহ্মের এই তিনটী বিভাবও synthetic, analytic নয়। সুতরাং রুচি ও শক্তি অনুযায়ী যে বৃত্তির অনুশীলনই আমরা করি না কেন, সাধনার পূর্ণতায় আমরা তিনটীরই রসময় পূর্ণ স্বরূপকে আস্বাদন করব—সচ্চিদানন্দকেই আমরা পাব। জ্ঞানী, ভক্ত, আর কর্ম্মীতে কখনো ভেদ থাকতে পারে না; অন্তরে সবাই এক, কেবল কারু হয়তো বাইরে একটা দিক বিশেষ করে ফুটে ওঠে। যারা অন্তরের

খবর জানে না, তারা বাইর ধরে বিচার করে বলে ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে বসে।

স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ primarily জ্ঞানীর আদর্শ। আর শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানকেই জীবনের ভিত্তি করে নিতে বলছেন। এইজন্য গীতার সমস্ত উপদেশের গোড়াতেই আমরা জ্ঞানের কথাটা পাই। ভেবে দেখ, অর্জ্জুনের মনে যে problemটা জেগেছিল, সেটার নিদান ছিল একটা বেদনা বা emotion. সংসারে আমাদেরও পৌণে ষোল আনা বিপত্তির সৃষ্টি হয় ওই emotion এর mal-adjustment থেকে। শ্রীকৃষ্ণ একে বলেছেন ক্লীবত্ব বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা আর প্রথম কথাতেই অর্জ্জুনকে বলছেন, "প্রজ্ঞাবাদ" পাড়ছ বটে, কিন্তু "নানুশোচন্তি পণ্ডিতা"— **জ্ঞানী** কখনো অনুশোচনা করেন না। জীবনের সমস্ত সঙ্কট মোচন হয় এই জ্ঞান-দ্বারা, চতুর্থ অধ্যায়ে (৩৭-৩৯) শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বলেছেন। ভাব (Sublime emotion) আর শক্তি (Sublime will) জীবনের ফুল ও ফল; কিন্তু তার মূল হচ্ছে জ্ঞান (Sublime congnition). গাছের মূল কেটে ফুল-ফলের আশা করা যেমন বৃথা, তেমনি ফুল-ফল ছেঁটে দিয়ে শুধু মূলটাকে স্থাণুবৎ করে রাখাও ভাগবত আদর্শ নয়।

জ্ঞান লাভ করব, সত্য কি তাই জানব, জীবনের রহস্য বুঝে নেব— এক কথায় স্থিতপ্রজ্ঞ হব, এই যদি আমাদের জীবনের গোড়ার কথা হয়, তা'হলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হয় এই জ্ঞানের পক্ষে বাধা কি? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন (৪২-৪৪), জ্ঞানের বাধা হচ্ছে ভোগ আর ঐশ্বর্য্য। ভোগ হচ্ছে বেদনার বিকার— mal-adjusted emotion; আর ঐশ্বর্য্য হচ্ছে বাসনার বিকার— mal-adjusted will. জ্ঞান যদি সম্যক্ স্ফূর্ত্ত হত, তাহলে এই mal-adjustment বা অসামঞ্জস্যটুকু থাকত না। একটা কথা এখনো বলে রাখি, জ্ঞানীকে passive জড়বৎ মনে করো না। বেদবাদীর যে ভোগ আর ঐশ্বর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণ এমন severely criticise করেছেন, তাই আবার **সত্য** হয়ে জ্ঞানীর জীবনে ফিরে আসে—সঙ্কীর্ণ বা mal-adjusted ভোগ-তৃষ্ণা ছেড়ে দিলেই দিব্যভোগের অধিকার পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্যের পিপাসা ছাড়তে পারলে অনন্ত ঐশ্বর্য্য এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কথাগুলোকে কেবল স্তোকবাক্য মনে করো না—অধ্যাত্ম জগতের এ গুলো আইন; আর যুক্তি দিয়ে এ প্রমাণ করা যায়। সে সব প্রমাণ প্রয়োগ এখন থাক, শুধু এই কথাই বলি, জ্ঞানীর আদর্শে যখন নিজকে প্রবুদ্ধ করবে, তখন জীবনটা ভোগহীন নিরানন্দ হয়ে গেল বা শক্তিহীন ক্লীব হয়ে গেল— এ কথা ভেবো না। ক্ষুদ্র ভোগ—ক্ষুদ্র সিদ্ধি ছাড়তে হল বটে, কিন্তু একটু সবুর কর, দিব্য ভোগ ও দিব্য শক্তি ওই তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে। ভোগের পর্য্যবসান কিসে?—আনন্দে তো? ঐশ্বর্য্যের পর্য্যবসান কিসে?—কামনার অপ্রতিঘাতে তো? জ্ঞানীও ঠিক এই দুটাই পান; তিনি মহানন্দময়, মহাভোগী, তাঁরও কামনা অপ্রতিহত, তিনি যা চান, তাই হয়। He says, Let there be light, and there is Light! কিন্তু জ্ঞানীর এই সিদ্ধির পথ অন্তরের ভিতর দিয়ে—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ভিতর দিয়ে, সমাধির তন্ময়তার ভিতর দিয়ে; আর ভোগৈশ্বর্য্যকামী বেদবাদীর পথ ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্যের ভিতর দিয়ে (৪৩)। কামাত্মার কোনও ভোগ জোটে, কোনটা বা জোটে না। কোনও কামনা সফল হয়, কোনটা বা হয় না; কেন না তার চিত্তবৃত্তি অসমঞ্জস—mal-adjusted, discerdant! জ্ঞানীর ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, ইষ্ট সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; কেন না he is in har-

mony with the whole universe! তাঁর ভোগ যে আত্মার তুষ্টি (৫৫), ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি তো নয়! তাঁর ঐশ্বর্য্য পরমা প্রশান্তি (৭০) আস্ফালন তো নয়!

এই অবস্থাগুলি শুধু বাইর দেখে বিচার করতে যেও না। যারা বিষয়ে বিমুগ্ধ, তারাই জ্ঞানীর জীবনে বিষয়ের সুখটাই ষোল আনা দেখতে চায়। কিন্তু বিষয়-ধ্যানের পরিণাম যে কি, তা তো শুনেছ? আর এ-ও তো জেনেছ, জ্ঞানীর দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফেরানো। একটা উদাহরণ ধর—যীশু খৃষ্টের জীবন। বিষয়ী বলবে, ঈশ্বরের পুত্র হয়ে তাঁর ভোগ আর ঐশ্বর্য্যের যে বহর, তা তো দেখা গেল; বেচারীকে শেষ পর্য্যন্ত ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে হল! কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তোমার আর Christ এর point of view কি এক? তোমার দেহে যদি একটা কাঁটা ফোটে, তাহলে তুমি অস্থির হয়ে পড়, আর দেহটাকেই চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় তুমি বিব্রত। এই তো তোমার ঐশ্বর্য্যের দৌড়? আর তোমার ভোগও ইন্দ্রিয়ের জড় প্রীতি মাত্র! Christ এর ভোগ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের আনন্দময় প্রশান্তি, ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও সে ভোগের বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণতা ঘটেছে কি? আর তাঁর ঐশ্বর্য্যের বা will power এর কথা?—তিনি কি will করেছিলেন?—To lead humanity into light. ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ায় তারই বা ব্যতিক্রম হয়েছে কি?—আজও তিনি জগদ্গুরু। তাঁর এই sacrificeই তাঁর sublime will.কে আরও সার্থক করে তুলেছে।

মোট কথা জ্ঞানীর জীবন জানবে ছন্দোময়—বিশ্বের মূল সুরের সঙ্গে তা এক সুরে গাঁথা। তাঁর ভোগ চিন্ময়—সে ভোগ দেহের ভোগ নয়, মনের বিলাস নয়। আর তাঁর ঐশ্বর্য্য in the fulfilment of the mission of his life. ভগবান যে সিদ্ধ-প্রেরণা তাঁর হৃদয় দিয়ে এ জগতে পাঠিয়েছেন, তারই পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁর মাঝে ঘটে; জগতে এমন কোনো শক্তি নাই যা তাঁর শক্তিকে বন্ধ্যা করতে পারে বা তাঁর কামনাকে প্রতিহত করতে পারে। স্থূল দৃষ্টিতে আজ তাঁকে পর্য্যুদস্ত দেখতে পার, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁর প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন—ভাগবতী বাসনার জয় অবশ্যম্ভাবী—in the evolution of the Eternal Life, his life was simply a link.

আমাদের জীবনে দুটা বিরুদ্ধ শক্তির লড়াই চলছে। এই শক্তি দুটাকে নানা জনে নানা নাম দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাদের বলছেন ইন্দ্রিয় আর প্রজ্ঞা। ইন্দ্রিয় আমাদের বাইরের দিকে, অনাত্ম বস্তুর দিকে টেনে আনে, আর প্রজ্ঞাশক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মোড় ফিরিয়ে আত্মবস্তুর দিকে চিত্তটাকে গুটিয়ে আনে। এই দুটা শক্তির ক্রিয়া অনাদি, বিশ্বব্যাপী। জগতের মূলেও এই দুটা শক্তির খেলা। উপনিষদে এদের বলা হয়েছে প্রাণ আর আকাশ। সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম আর মায়া, বৌদ্ধ দর্শনের নির্ব্বাণ আর তৃষ্ণা সবই ওই দুটা eternal principle রই নামান্তর। একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ, সবার মাঝে এই দুটা বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব—কখনও আমরা খণ্ডিত, কখনও অখণ্ড, কখনও মুখর, কখনও স্তব্ধ, কখনও চঞ্চল, কখনও নিথর। তৃপ্তি দুয়েই, আর তাইতে আমাদের দিশেহারা করে দেয়। ইন্দ্রিয়-সুখও আছে জীবনে, আবার প্রজ্ঞাসুখও আছে—ভোগেও সুখ আছে, ত্যাগেও সুখ আছে—জীবনে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। কোনটা যে বড়, তা বুঝে উঠতে পারি না বলেই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। দুয়েরই তত্ত্ব জানা প্রয়োজন, নইলে জীবনে

ইষ্টসিদ্ধি হয় না।

সোজা কথায় বল্‌তে পারি, ইন্দ্রিয় প্রাণশক্তিরই বিকাশ। ইন্দ্রিয়শক্তির স্ফুরণই জীবনের আদি কথা। ইন্দ্রিয় যে বন্ধনের কারণ, একথা প্রথমে বুঝতে পারি না। জীবনের গোড়াতেই আত্মা এবং অনাত্মার subject আর object এর একটা ভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। 'আমি' আছি, আবার 'আমি ছাড়া আরও কিছু' আছে, এই হল আমাদের ব্যবহারের (practical experience) গোড়ার কথা! হয় ত প্রথমতঃ আমার এই আমিত্বের পরিধি খুবই সঙ্কীর্ণ থাকে, আমার দেহের সুখ-দুঃখের বাইরে হয় ত মন যেতে চায় না। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিণামেই চিরকাল এই সঙ্কীর্ণতা বজায় থাকে না। গাছ যেমন বাড়ে, তেমনি করে আমার আমিত্বও বাড়ে। গোড়ায় আমি ছিলাম একটা বিন্দুমাত্র, আর এই অনাত্মবিশ্ব জগৎটা ছিল অসীম, কিন্তু পরিশেষে আমার 'আমিই' এই বিশ্বজগৎটা ছড়িয়ে যায়, subject আর object এর ভেদ দূর হয়ে সবই subject এ বা চেতনায় পর্য্যবসিত হয়—'মদাত্মা' সর্ব্বভূতাত্মা হয়ে যায়।

এখন এ কথাটা হেঁয়ালী বলেই মনে হয়। আমার এই দেহ-পরিমিত ক্ষুদ্র অহং বোধের ওপর এমনি একটা মায়া দাঁড়িয়ে গেছে, ছোট বেলা হতে এমনি কতকগুলি সংস্কার অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে প্রতিদিন ইন্দ্রিয়-সহায়ে যে প্রিয়বস্তু সুখটুকু পাচ্ছি, তাকে ছাড়বার কল্পনাতেই যেন অথৈ জলে পড়ে যাই, বিশ্বাস করতে পারি না যে আমার যদি চোখ, কাণ, নাকের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়, তাহলে থাক্‌বে কি? যে "আমি" বিশ্বব্যাপী বলে শুন্‌ছি, সে 'আমি'র যদি দেহ না থাকে, তাহলে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার কথাতে প্রাণে আতঙ্কেরই সৃষ্টি হয়। দেহ ছেড়ে যেতে চাই না বলেই, দেহাতীত কোনও কিছু যে আছে, তাও বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। তাই নির্ব্বাণই বল, ব্রহ্মই বল, অসঙ্গ পুরুষই বল, সবই আমাদের কাছে অবাস্তব। এখানে ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিষটাই আঁকড়ে ধরি, তাই নিরেট—তার সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোনও কারণই আমাদের কাছে ঘটে না; তোমার ব্রহ্মও কি তাই? ভগবানও কি তাই? তাঁকে কি চোখে দেখা যায়? —ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অভ্যস্ত জীবের পক্ষে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রশ্নই প্রথমে জাগে। তারপর সুরু হয় দর্শনশাস্ত্রের যুক্তি-জাল। মহা আড়ম্বরে কেউ প্রমাণ করেন, ভগবান আছেন, কেউ প্রমাণ করেন, ভগবান নাই।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা যুক্তি-তর্কের কোনও কথাই তুল্‌ছি না, শুধু তোমায় বলি একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ, নিজকে নিয়ে একবার বিচার করে দেখ। শুধু দেহ আর ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেই আমাদের সকল সুখ, এ কথা কিন্তু সত্য নয়। দেহের সুখ ছাড়া মনেরও সুখ আছে, মন বলেও আমাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ পড়ে আছে; মনের সুখের মাঝে কল্পনার আতিশয্য খুবই বেশী, আর এই কল্পনার মূলে রয়েছে ইন্দ্রিয় জ্ঞান—এ কথা বল্‌তে পার বটে। পেটুক রস-গোল্লা খেয়েও আনন্দ পায়, আবার সে খাওয়ার কল্পনাতেও (re-presentation) আনন্দ পায়। আমাদের কর্ম্মচেষ্টার অধিকাংশের মূলেই আছে কল্পনা, আর কল্পনার মূলে আছে ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুর স্মৃতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে আমাদের মনেরও অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানই মনের সবখানি নয়। বস্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জ্ঞানও হয়, এই সম্বন্ধগুলিকে আমরা শুধু ইন্দ্রিয়-সহায়ে জান্‌তে পারি না। ইন্দ্রিয় বস্তুগুলি মনের সামনে এনে দেয়

বটে, কিন্তু মন তার নিজস্ব কোন নিগূঢ় শক্তির বলে তাদের মাঝে সম্বন্ধের আবিষ্কার করে। আর এই সম্বন্ধ জ্ঞানমূলক সাম্য ও বৈষম্যবোধ হতেই আবার সুখ-দুঃখ বোধ জাগে। শুধু সম্বন্ধের বোধ থেকেও মানুষের মন তৃপ্তি আহরণ করতে পারে—প্রমাণ গণিত চর্চ্চা। গণিতের অনেক সত্য বস্তুর সত্য নয়—সম্বন্ধের সত্য মাত্র। উচ্চাঙ্গের গণিত আর দর্শন এইজন্য পরস্পর সগোত্র। স্বামী রামতীর্থের গণিত চর্চ্চা তাঁর চিত্তকে বেদান্ত সাধনায় অনুকূল করে তুলেছিল, তা ভাববার বিষয়।

শুধু ইন্দ্রিয় জ্ঞান আর সম্বন্ধ জ্ঞানেই যে মনের তৃপ্তি তা নয়—শূন্য জ্ঞানেও মনের তৃপ্তি হয়, এই কথাটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো। জ্ঞানের সূক্ষ্মতার একটা ধারাবাহিকতা আছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বস্তু প্রধান; কেন না ইন্দ্রিয় কোন না কোন বস্তু বা খণ্ডিত সত্তাকে অবলম্বন করেই চরিতার্থ হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানমূলক কল্পনাতেও বস্তু-স্মৃতিই হল উপাদান, অতএব সেখানেও বস্তুই প্রধান, যদিও বাস্তব বস্তু, আর কল্পিত বস্তুতে উপাদান গত তফাৎ অনেক। আসল রসগোল্লা আর মনের রসগোল্লা এক হলেও এক নয়; বস্তুটা মনের মাঝে ঢুকলেই তার ভাবান্তর ঘটে—এ কথাটা খেয়াল রেখো। যাক্!—আরও একটু এগিয়ে গেলে পাই সম্বন্ধ জ্ঞান; এখানে বস্তুর কল্পনা এত সূক্ষ্ম হতে পারে যে তাকে প্রায় ভাবের সামিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। Mathematical relation গুলিকে ভাব আর বস্তুর মাঝামাঝি বলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীন Greece এ Pythagoras এর Theory of Numbers দিয়ে জগতের আদি তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টার মূলে এই রহস্যই নিহিত আছে। এ-ও আমরা যদি ছাড়িয়ে যাই, তাহলে পাই—বস্তুশূন্য জ্ঞান। হয়ত তুমি এ কথা শুনে চমকে উঠবে, বলবে, বস্তু নাই, তবুও জ্ঞান হচ্ছে, সে কি সম্ভবপর? কিন্তু এ অসম্ভব ব্যাপার নিত্যই তোমার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে **—সুষুপ্তিতে রোজই তুমি বস্তুশূন্য জ্ঞান কি, তা জানতে পারছ।** আর সুষুপ্তিতে তৃপ্তি আছে কিনা, তা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না। রোগ, শোক, দুঃখ, সবার প্রতিষেধক ওই সুষুপ্তি। আর সুষুপ্তি যে শুধু দুঃখই ভুলিয়ে দেয় তা নয়, ইন্দ্রিয় সুখও তো সে ভুলিয়ে দেয়। মরণই বল, আর নির্ব্বাণই বল, তাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়বাদীর প্রধান আপত্তিই এই যে তা আমাদের চির পরিচিত ইন্দ্রিয় সুখ কেড়ে নেবে। মরলেপর দুঃখ যাবে, তবুও মরতে চাই না কেন, না মরলে পর যে সুখটুকুও থাকবে না—বিষয় ভোগটুকু থাকবে না, প্রিয় সঙ্গের সুখটুকু থাকবে না। এই ইন্দ্রিয় বোধকেই একান্ত সত্য বলে ধরেন বলেই প্রেম সেবোত্তরা গতিকামী-ভক্ত নির্ব্বাণ মুক্তির ওপর খড়্গ হস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সুখও যদি যায়, তার জন্য এত আতঙ্ক কেন? প্রত্যহই তো সুষুপ্তিতে তাই হচ্ছে, কিন্তু কই তা বলে সুষুপ্তি তো কারু কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠছে না—ঘোরতর ইন্দ্রিয় সেবীর কাছেও না।

এটুকু তা হলে তুমি স্বীকার করবে, এই যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানে বস্তু জগৎ ভেসে উঠছে তোমার কাছে, কেবল যে তাতেই তুমি সুখ পাও, তা নয়; যদি বস্তু জগৎ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এমন কি স্মৃতিতেও তার রেশটুকু না থাকে, তাহলেও তুমি সুখ পাও। প্রমাণ তোমার সুষুপ্তির অনুভূতি। আর এক প্রমাণ, মানুষের নেশা করবার ঝোঁক। মানব জাতির ইতিহাস খুঁজে দেখ, অতি প্রাচীন কাল হতে আজ পর্য্যন্ত, যে কোনও স্তরের মানুষ

কোনও না কোন রকমের নেশা করে এসেছে। আর নেশা করার উদ্দেশ্যই হল, সব কিছু ভুলে গিয়ে আনন্দ পাওয়া—বস্তুশূন্য জ্ঞানের দিকে মানুষের এমনি আন্তরিক টান। সমাধির দৃষ্টান্ত না দিয়ে নেশার দৃষ্টান্ত দিলাম বলে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। সমাধি তো বস্তুশূন্য জ্ঞান বটেই, কিন্তু সেটা তো তর্কের বিষয়। তুমি যে ধরে রেখেছ বস্তু জগতের প্রতিই মানুষের স্বাভাবিক টান, বস্তুশূন্যের প্রতি নয়। তাই নেশা আর ঘুমের উদাহরণ নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, বস্তু জগতের প্রতি টানও আমাদের যেমন স্বাভাবিক, **শূন্যের প্রতি টানও তেমনি স্বাভাবিক এবং সুপ্রাকৃত।** পূর্ণও তোমার কাছে যেমন সত্য, শূন্যও তেমনি সত্য।

বস্তুশূন্যতাকে যদি সত্য বলে স্বীকার কর—আর স্বীকার না করে উপায়ও নাই, তাহলে আমার এ কথাও স্বীকার করবে, ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুগ্রহণ যেমন তোমার মনের ধর্ম্ম, তেমনি ইন্দ্রিয় রোধ করে, বস্তুজগৎ উড়িয়ে দেওয়াটাও তোমার মনের ধর্ম্ম। দুটাতেই তুমি সুখ পাও। তাই তো সংসারে কর্ম্মের আবর্ত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে মাঝে মাঝে তুমি হাঁপিয়ে ওঠ—বল, "বিশ্রাম চাই।" প্রকৃতিতে এই বিশ্রামের ব্যবস্থাও তো রয়েছে। দেহও ঘুমিয়ে পড়ে, মনও ঘুমিয়ে পড়ে। অবিশ্রাম ইন্দ্রিয় ভোগ চলে না—অবসাদ আসে, বিতৃষ্ণা আসে, নিবৃত্তি আসে।

চিরকাল বস্তুজগৎটাকেই একান্ত সত্য বলে ধরে এসেছ, এইবার তাহলে শূন্যকেও তেমনি একান্ত সত্য বলে ভালবাসতে শেখ। শূন্যও তোমার জীবনের এক মহাসত্য। শূন্য মিথ্যা নয়, অযৌক্তিক নয়, নিরানন্দ নয়, অনধিগম্য নয়—তা তো দেখতেই পেলে। যদি বীর হও, তাহলে জীবনের এই দুটী সত্যকেও নিরপেক্ষ হয়ে বুকে তুলে নাও। তুমি সংশয়বাদী নাস্তিক হতে পার, বলতে পার, আমি ভগবান মানি না, ধ্যান-ধারণা বুঝি না, আমি চাই এই নিরেট বস্তুজগৎটা আমার কাছে যেমন সত্য, তেমনি সত্য একটা কিছু। আমি ত তোমার ইন্দ্রিয়-কল্পিত অবাস্তব ভগবানের উপাসনা করতে বলি না—বলি, তুমি শূন্যের উপাসনা কর, কেন না শূন্য যে পরম সত্য, পরম ক্ষেম, পরম প্রয়োজন। যে বিশ্বাসী সে চিত্তবৃত্তিকে তরঙ্গায়িত করে ভগবানের উপাসনা করুক ; তুমি নাস্তিক, তুমি চিত্তবৃত্তিকে রুদ্ধ করে মহাশূন্যের উপাসনা কর—পতঞ্জলির strictly sceintific & rational religion follow কর। দুয়েরই সমান ফল।

এইবার তাহলে আর একটা কথা বলি। আগেই বলেছিলাম, চোখ মেলে চাও, নিজকে বিচার কর, কি দেখতে পাচ্ছ ? চোখের সামনে তরঙ্গায়িত এই বিচিত্র জগৎ—আবার ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে গেল সুষুপ্তিতে! আবার জাগল—আবার মিলাল! চিরকাল এই চলছে—এই চলবে। তুমি কোথায় ? —তুমি ভোক্তা, তুমি দ্রষ্টা, তুমি জ্ঞানী। জগতও তোমার জ্ঞানে, শূন্যও তোমার জ্ঞানে। পরিস্ফুট এই জগৎ হতে প্রলয়ঙ্কর শূন্য পর্য্যন্ত একটা ধারা—আর তার কূলে বসে চিন্ময় তুমি। ওই ধারা হতে নিজকে বিবিক্ত কর, কেন না তাই তোমার পরমানন্দ যে।

আবার দেখ, দুটী জগৎ তোমার সম্মুখে—জাগ্রতে বস্তুজগৎ, আর সুষুপ্তিতে শূন্যজগৎ। জাগ্রতে তোমার জ্ঞান দীপ্ত, এইটুকু তার ভাল, আবার জাগ্রতে তোমার সুখ-দুঃখময় চঞ্চল অবস্থা, এইটুকু তার মন্দ। সুষুপ্তিতে তোমার প্রশান্তি, নিত্যানন্দ, এইটুকু তার ভাল, আবার সুষুপ্তিতে তোমার আচ্ছন্ন ভাব, এইটুকু তার মন্দ। এখন দুয়ের সামঞ্জস্য

করে নাও। জাগ্রতের দীপ্তি আর সুষুপ্তির প্রশান্তি দুয়ে মিলিয়ে জীবনের আদর্শ রচনা কর। এ নিশ্চয় সার্ব্বভৌম আদর্শ। কেউ বল্‌বে না জগতে, আমি দীপ্ত, প্রশান্ত, আনন্দের অধিকারী হতে চাই না। আদর্শের আকাঙ্ক্ষা সবার প্রাণে। আর এই হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ। স্থিতপ্রজ্ঞ দীপ্ত, শান্ত, আনন্দময়।

এ অবস্থা লাভের পথ কি? তা বোঝাতে বোধ হয় আর বেগ পেতে হবে না। ইন্দ্রিয়-সেবা করেছ এতদিন, সে তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। এইবার প্রশান্তির সেবা কর—বস্তুর ধ্যান ছেড়ে দিয়ে (বিষয়ের ধ্যানে কি বিপদ, মনে আছে তো? ৬২-৬৩) শূন্যের ধ্যান কর। তার বিস্তৃত উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠাধ্যায়ে দিচ্ছেন (৬।১০-১৫, ২৫-২৮)। শূন্য-ধ্যান সবার সার্ব্বভৌম সাধনা—ভক্তের, জ্ঞানীর, যোগীর সবার।

সাধনার এই হল positive দিক। Negative দিক হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম। দু'টাই অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ইন্দ্রিয়-সংযম ছাড়া শূন্যে মন বস্‌বে না, আবার শূন্যধ্যান ছাড়া ইন্দ্রিয়-সংযমও হবে না। দু'দিকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। বেশ ভাল করে বিচার করে জীবনের আদর্শ বুঝে নাও, তারপর মহাবীর্য্যে তাকে আকড়ে ধর। শূন্যের প্রতি আছে আমাদের আতঙ্ক, আর ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আছে লোভ। মরণ দু'দিকেই। আগে শূন্যের প্রতি আতঙ্ক দূর কর। শূন্য যে বিভীষিকা নয়, বরং তাই যে তোমার নিত্য আকাঙ্ক্ষিত, বেশ ভাল করে এইটা ধারণা কর। আর এ-ও বোঝ, ইন্দ্রিয়-সুখও শূন্যেই লীন হয়ে যায়, প্রত্যক্ষই তা দেখতে পাচ্ছ তো? তাই যদি হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়-সুখের চেয়ে শূন্যের সাধনাই বড়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ-ও বলছেন, জ্ঞানী হাজার চেষ্টা কর্‌লেও ইন্দ্রিয়গুলি এমনি দুর্ব্বার যে তারা জোর করে মনকে বানচাল করে দেয় (৬০)। তাহলে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হতে সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্যই আমাদের অহরহঃ চেষ্টা কর্‌তে হবে। ইন্দ্রিয়-সুখের স্মৃতি নানাভাবে আমাদের মনকে প্রলুব্ধ কর্‌তে চাইবে, যত আপাত-অনুকূল যুক্তি এসে হাজির কর্‌বে। কিন্তু জ্ঞানীর এক কথা—"শূন্য আমার পরমাশ্রয়, ইন্দ্রিয়-সুখ শূন্যেই লীন হয়, অতএব ইন্দ্রিয়-সুখ আমার বর্জ্জন কর্‌তেই হবে।"

(ক্রমশঃ)

ভক্তির কথা

সকল কামনা নিরুদ্ধ না হইলে ভক্তির উদয় হয় না। যোগী যৌগিক প্রণালী দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করে, ভক্তের ভগবানের প্রতি পরানুরক্তি-তেই সহজে বৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়। এইজন্যই জ্ঞানী আর ভক্তের মাঝে কোন তফাৎ নাই। খাঁটী জ্ঞানী আর খাঁটী ভক্তের মাঝে কোন বিরোধ নাই, —যত গণ্ডগোল মারামারি অবস্থার লোকদের নিয়া। নারদ কৃত ভক্তি-সূত্রের দ্বিতীয় অনুবাকে আছে :—

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ। ৭

ভক্তি কামনা পূরণের জন্য নহে—কেন না উহা নিরোধ-স্বরূপ।

কামনা থাকিতে ভক্তির বা পরানুরক্তির উদয়ই হয় না। এইজন্যই খাঁটী ভক্তের প্রাণ হইতে সর্ব্বপ্রকার কামনার অন্তর্ধান হয়। ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলেই ভক্তের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ভক্ত এইজন্যই ভগবানের কাছে মুক্তিরও কাঙ্গাল নয়। মুক্তির বাসনাও তো বাসনা,—কাজেই নিরোধ হইল কোথায়?

শুদ্ধ প্রেম বা শুদ্ধ ভালবাসায় কামনার বীজ দগ্ধ হইয়া যায়। গোপীদের মাঝে এই শুদ্ধ প্রেমেরই স্বতঃস্ফুরণ হইয়াছিল—এইজন্যই সকল কামনার নির্ব্বাণে তাঁহারা ভাগবত দেহ—ভাগবত মন—ভাগবত ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছিলেন। এই ইন্দ্রিয়ের কাজ ঊর্দ্ধ-জগতে, নিম্নে ফিরিয়াও তাকায় না তাহারা! স্থূল বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব এই গোপী-প্রেমের কি কু-ব্যাখ্যাই না করিয়া থাকে। নারদ যে ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই ভক্তি তো কামনা থাকা পর্য্যন্ত জানিতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া গোপীদের সমাধি লাভ হইত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির স্বাভাবিক নিরোধ হইয়া যাইত। ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে অন্তরে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস খেলিতে থাকে—ভক্তের চোখে-মুখে-দেহে তাহাই অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চরূপে প্রকাশিত হয়। এই দুর্ল্লভ ভক্তিলাভ যে কতজন্মের তপস্যায় হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। নারদ এই ভক্তিকে বলিয়াছেন—

সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।

সেই ভক্তি কাহারও (ভগবানের) প্রতি ঐকান্তিক প্রেমস্বরূপা। আবার ইহার পরেই বলিয়াছেন—এই ভক্তির উদয় হয় কখন? —যখন চিত্তে বিন্দু-মাত্র কামনা থাকে না। ভক্তের জোর করিয়া বৃত্তি নিরোধ করিতে হয় না, কেন না পরানুরক্তিতেই তাহার ইন্দ্রিয়-নিরোধ হইয়া যায়। ভালবাসার পথেও বৃত্তি নিরোধ হয়—ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক টানে। প্রকৃত ভালবাসায় দেহবোধ লোপ পাইয়া যায়। দেহেরই যদি বোধ লোপ পাইয়া যায়, তখন আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য দেখা দিবে কোথা হইতে? গোপীদের মাঝে এই পরাভক্তিরই উন্মেষ হইয়াছিল—এইজন্যই গোপীপ্রেম সর্ব্বকামনারহিত। কত যুগ-যুগান্তরের তপস্যায় যে গোপীরা কামনাশূন্য দেহ-মন লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়। এই বৃন্দাবন লীলার পেছনে—কঠোর তপস্যার ইতিহাস রহিয়াছে। এই নিদারুণ তপস্যা দ্বারা যখন গোপীদের চিত্ত-মন নিষ্কলুষ হইয়াছিল, তখনই সেই প্রেমস্বরূপা ভক্তির উন্মেষ হয় তাঁহাদের চিত্তে। এই ভক্তির উদয় হওয়াতেই—গোপীরা মান-লজ্জা-ভয় সব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুরক্তিতে দিবস-যামিনী পাগলিনীর ন্যায় অতিবাহিত করিতেন। এই ভাবোন্মাদ অবস্থার কথা যাহারা না জানে তাহারাই গোপীদের দেব-চরিত্রেও কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকে। নিজের ভিতর সেই পরাভক্তির উন্মেষ না হইলে গোপীপ্রেম আস্বাদ করিতে যাওয়া বিফল। বৃত্তি-নিরোধ হইলে যে অন্তর্মুখী শাশ্বত আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই আনন্দের সঙ্গে স্থূল-জগতের দৈহিক আকর্ষণের আনন্দ অতীব তুচ্ছ। বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায়, বিনা কৃচ্ছ্রতায়—প্রেম-ভক্তির স্ফুরণ হয় না। কামনাশূন্য ভালবাসার কথা—কামনায় ভরপুর চিত্তবিশিষ্ট মানব বুঝিবে কেমন করিয়া?

খাঁটী ভক্তি জাগিলে—চিত্ত প্রশান্ত হইয়া যায়। ভিতরে আর তখন বৃত্তির তরঙ্গ থাকে না। নির্ব্বাত, নিষ্কম্প প্রদীপবৎ তখন এক লক্ষ্যে চিত্ত অচল-অটল হইয়া থাকে। এই স্থিতি প্রবাহের

নামই ভাব-সমাধি। এই সমাধি ভক্তি দ্বারা লাভ হয়। যোগীরা চেষ্টা-যত্ন দ্বারা যে অবস্থা লাভ করিতে চান, ভক্তেরা শুধু ঈশ্বরানুরক্তিতেই সেই অবস্থা লাভ করিতে পারেন। অবশ্য সাধনা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। পরাভক্তির উন্মেষ হওয়াও এত সহজ নয়। তবে ভক্তিতে এত কসরৎ নাই—শুধু ভগবানের প্রতি মনকে নিবিষ্ট করিতে হইবে—প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহা হইলেই বৃত্তির নিরোধ স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। এই বৃত্তি নিরোধ করিতে গিয়া ভাব-ভক্তিহীন যোগীর যে কত ক্লেশ পাইতে হয় তাহা আর বলিবার নয়। ইহা হইতে সহজ পথ—ভক্তির পথ—ভালবাসার পথ। কাহাকেও মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসা—আর কিছুই নয়।

কামনার নির্ব্বাণ হইলেই বুঝিতে হইবে দেব-দুর্ল্লভ ভক্তির আগমন সন্নিকটে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠে যে, যদি কোন কামনাই না রহিল, তাহা হইলে কি ভক্ত জড়বৎ হইয়া পড়ে? না, তাহা নয়, ভক্তের জীবন তখন ইষ্টের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইয়া যায়, এই সম্মিশ্রণের ফলে আবার যে বৃত্তির উন্মেষ হয়, সেই বৃত্তি দ্বারা কেবল ভগবানের মাহাত্ম্যই উপলব্ধি হয়—আর অন্য কিছু নহে। চিত্ত নির্ব্বিষয় হইলে, ভগবানই তাঁহাদের চিত্তে জগদ্ধিতের বাসনা লইয়া অবতরণ করেন। জগতে ভক্তির আদর্শ এইসব মহাপুরুষরাই দেখাইয়া দেন।

ভগবৎ প্রেমে বা ভাবে চিত্ত সহজেই নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই নিরোধ আবার ছয় প্রকার, যথা—ভীতিভাবনিরোধ, স্বামিভাব নিরোধ, সর্ব্ব-ভাব নিরোধ, সখ্যভাব নিরোধ, বাৎসল্যভাব নিরোধ ও কান্তভাব নিরোধ। এই ছয় প্রকার নিরোধের মাঝে যে কোন একটা ভাব অবলম্বনেই চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা আসিতে পারে। মোট কথা যে কোন ভাবই অবলম্বন করা যাউক না কেন, চিত্ত তাহাতেই লয় করিয়া দিতে হইবে। সেই ভাব ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভাবেরই স্থান হইবে না তখন।

উপরোক্ত ভাবকে স্থূলে আরোপ করিয়াও সাধনা চলে। মোট কথা যে কোন ভাবই অবলম্বন করা যাউক না কেন, নিজের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ করিতে হইবে। হৃদয় পবিত্র না হইলে, বৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে—স্থূল আরোপের সাধনায় অনেকেরই পতন ঘটায়। এইজন্যই অন্তরের ভাব দৃঢ়-খাটী না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ভাবকে স্থূল বস্তুতে আরোপ করিতে যাওয়া অনেক সময় বিপদের কারণ হয়। অনেক সময় ভগব-দিচ্ছায়ই আসিয়া আশ্রয় জুটিয়া যায়। ভগবৎ প্রেরিত আশ্রয়ের সঙ্গে মনের কোন দিক্ দিয়াই অমিল থাকে না। ভালবাসার বস্তু কেবল ভাব-লোকেই থাকিয়া যাইবে—স্থূল জগতে তাঁহার কোন সন্ধান মিলিবে না—এমন কথা নয়। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবানও মানুষীতনুতে প্রকাশিত হন। কাজেই একটা ভাবে চিত্ত মসগুল করিয়া দিলে, সেই ভাব-রূপী ঈশ্বর যে স্থূলেও দেখা দিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভক্তি বেদ-বিধির পরপারে। অর্থাৎ লৌকিক-বৈদিক অনুষ্ঠানদ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না। পূর্ব্ব শ্লোকেই বলিয়াছেন—ভক্তি নিরোধ-স্বরূপা। নিরোধ কি?—

নিরোধস্তু লোক বেদ ব্যাপার সন্ন্যাসঃ॥ ৮

লৌকিক এবং বৈদিক কার্য্য সমূহের সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের নাম "নিরোধ"। অর্থাৎ নিরুদ্ধাবস্থায় লৌকিক—বৈদিক কোন ক্রিয়াই থাকে না। সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হইলে লৌকিক—বৈদিক ক্রিয়া করিবে কে? ভক্তি নিষ্ক্রিয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত।

এইজন্যই বুঝি শ্রীরাধা লৌকিক ভয়, ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের রোগমুক্তির দরুণ ভাবোন্মাদ অবস্থায় নিজের চরণামৃতই দিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ করিয়া শ্রীরাধার ভক্তিই পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

ভালবাসার বা প্রেমের কোন শাস্ত্র বা বিধি নাই, শাস্ত্র দেখিয়া ভালবাসা জন্মায় না—ভালবাসা, স্বতঃস্ফূর্ত্ত মনের টান—ইহার কোন যুক্তি নাই, তর্ক নাই, ভাল লাগে, ভাল না বাসিয়া পারি না তাই ভালবাসি। সহজ কথায়—ইহাই উত্তর। ভালবাসার পথ—সৃষ্টি ছাড়া পথ। এই বিধি প্রতিপালন করিলে ভালবাসা জন্মিবে—ইহা কেহই বলিতে পারে না। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই বেদ-বিধির পর পারের কথাই বলিয়াছেন। "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" বেদ-বিধি দিয়ে ভগবান লাভ করা যায় না। ভক্তির পথ এইজন্যই লৌকিক বা বেদাচারের পথ নয়। ভগবদ্ভাবে সর্ব্বদা বিভোর থাকিলে—লৌকিক বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে কে; আর করিবার সময়ই বা কোথায়? ভক্তির বা ভালবাসার পথের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। ভক্তের যেরূপ করিয়া ভাল লাগে, যেরূপ করিলে তাঁহার ইষ্ট প্রীতি হয়, ভক্ত সেই পথই অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহার সঙ্গে শাস্ত্র মিলিল বা নাই মিলিল এইজন্য ভক্তের কোন মাথা ব্যথা নাই।

তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ॥ ৯

—ভগবানে অনন্যভাব এবং তদ্বিরোধী বিষয় মাত্রের প্রতিই ঔদাসীন্যকেও নিরোধ কহে।

অর্থাৎ ভগবান ছাড়া যখন অন্য প্রসঙ্গ, অন্য চিন্তা, অন্য কাজ কিছুই ভাল লাগিবে না, সেই অবস্থাকেও নিরোধ বলে। অর্থাৎ চিত্ত যখন ইষ্টাভিমুখী একভাবে তন্ময় হয়ে পড়ে, তখন আপনি আর সকল বৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা আসিয়া পড়ে। ইহার দরুণ বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় না তখন। পরমহংসদেব বলিতেন—"ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা যেন তখন বিষের মত লাগে।" ঈশ্বরানুরক্তি জন্মিলে—ঈশ্বর ছাড়া আর যাহা কিছু সবের প্রতিই এমন করিয়া বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য দেখা দেয়। ইহা পরাভক্তি উন্মেষের পূর্ব্ব লক্ষণ।

ব্যাস-শুক সংবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুত্রস্নেহমুগ্ধ ব্যাসদেব সুরপতির যথাযোগ্য অর্চ্চনান্তে যাবতীয় ব্যাপার বর্ণনা করিয়া এই কার্য্যোদ্ধারের উপায়স্বরূপ তাঁহার নিকট কোন সুর-রমণীর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সুরপতি প্রসন্নান্তঃকরণে রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার আদেশ দিলে, মুনিবর রম্ভাকে লইয়া সানন্দ চিত্তে নিজ ভবনে প্রত্যাগত হইলেন।

ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য ছিল—বন-গমনোদ্যত পুত্রের মনোবিকার জন্মাইয়া তাহাকে সংসারাসক্ত করিয়া রাখা, রমণীর চটুল চঞ্চল কটাক্ষে তাহার অভীপ্সিত পন্থার বিঘ্ন উৎপাদন করা; তাই রূপসী রম্ভাকে স্বীয় পুত্রের সমীপবর্ত্তিনী করাইয়া, তাহাকে তাহার

চিত্তবিকারজনক অঙ্গ-সঞ্চালনাদিরূপ হাব-ভাবাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তিনি অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান্ শুকদেব পূর্ণ-বিবেকী, তিনি ত্রিভুবনকেও তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করেন, সর্ব্বদাই তিনি পূর্ণানন্দে আনন্দময়, বন্ধনের হেতুভূত এই ক্ষণিক অনিত্য বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে কেন? তাই তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞার অচল ভিত্তিতে স্থির থাকিয়া জলদগম্ভীর স্বরে সত্য অমৃত বাণী উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন—

সংসার ঘোরে সরুজে সদাকুলে,
শোকান্তরে দুঃখ নিরন্তরান্তরে।
মোক্ষান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

এই সংসার নিরন্তর রোগরাশিতে সমাকীর্ণ, সর্ব্বদাই আকুল এবং শোক-দুঃখাদিতে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

শুকদেবের এই শান্ত-রসাস্পদ গম্ভীর বাক্য শ্রবণান্তর রম্ভা ঠিক তদ্বিপরীতে আদিরসের অবতারণা করিয়া ভ্রূভঙ্গী সহকারে বলিতে লাগিল—

বসন্ত মাসে কুসুমৌঘ সঙ্কুলে,
বনান্তরে পুষ্প নিরন্তরান্তরে।
কামান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

কুসুমরাজি বিরাজিত বসন্ত মাস সমুদিত হইলে যখন উপবনান্তর পুষ্পপুঞ্জে সমাকীর্ণ হয়, তখন যে ব্যক্তি কামের সেবা না করে, সেই ব্যক্তির জীবন বিফল।

উত্তুঙ্গপীনস্তনবর্ত্তুলান্তরং,
মুক্তাবলীহারবিভূষিতান্তরম্।
স্তনান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

যাহা উত্তুঙ্গ, পীবর ও বর্ত্তুলাকার, যাহার মধ্যভাগ মুক্তামালায় বিভূষিত যে ব্যক্তি এতাদৃশ স্তনযুগলের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

রসময়ী রম্ভার রসগর্ভ বাক্চাতুরী শ্রবণ করিয়া শান্তি-রসাস্পদ পরম যোগী শুকদেব তদুত্তরে বলিলেন—

মায়া-বিমোহ-ক্ষয়কারকান্তরং,
দীর্ঘং বিশালং নয়নান্তরান্তরম্।
নেত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

যাহা মায়া ও বিমোহাদির বিনাশ করিয়া দেয়, নেত্রনিমীলন করিয়া নয়নগর্ভে যাহাকে ধ্যান করিতে হয়, মানবজন্ম ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সেই যোগের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

শুকদেবের অনির্ব্বচনীয় সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে রম্ভার সংশয় জন্মিল বটে, তথাপি 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ' এই বিবেচনায় পুনর্ব্বার সে বিলোলকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল—

লোলীকৃতং কজ্জলরঞ্জিতান্তরং,
দীর্ঘং বিশালং নয়নান্তরান্তরম্।
নেত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্॥

যাহা কজ্জল দ্বারা অনুরঞ্জিত, কটাক্ষবশে কুটিলীকৃত দীর্ঘ ও বিশাল, যে পুরুষ সেই নয়নযুগলের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

কস্তুরিকা-কুঙ্কুম চর্চ্চিতান্তরং,
কেয়ূর-ভূষাদি-বিভূষিতান্তরম্।

ভুজান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

যাহা কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা অনুলিপ্ত, কেয়ূর ও অন্যান্য বিভূষণে বিভূষিত, যে ব্যক্তি নরজন্ম ধারণ করিয়া রমণীজনের তাদৃশ বাহুলতার সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

রম্ভার এই প্রলোভন বাক্যে শুকদেব অবিচলিত থাকিয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন—

পৈশুন্যহীনং বিজনেষু ভোজনং,
বৃক্ষে নিবাসং ফলমূল ভক্ষণম্।
তপোবনং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

যে পুরুষ বিজন স্থানে পৈশুন্যরহিত ভোজন, তরুতলে অবস্থিতি, ফলমূল ভক্ষণ, তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে তাহার জীবন ধারণ বিফল।

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরান্তরে,
রোগাভিভূতে সুখ-দুঃখিতান্তরে।
দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

যে পুরুষ ভীত, ক্ষুধিত, বিকলচিত্ত, রোগাভিভূত ও ক্ষণিক সুখ-দুঃখে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে, তাহার জীবন ধারণ বিফল।

স্বীয় সৌন্দর্য্যে—অঙ্গ ভঙ্গীতে সুর-নর বিজয়ী রম্ভা যখন কিছুতেই শুকদেবের চিত্তবিকারোৎপাদনে সমর্থ হইল না, তখন সে বিগতলজ্জা হইয়া ভাবান্তর প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—

লবঙ্গ-কর্পূর-সুবাসিতান্তরং,
তাম্বুল-রক্তোষ্ঠ-বিভূষিতান্তরম্।
মুখান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

যাহা লবঙ্গ ও কর্পূর যোগে সুবাসিত, তাম্বুল ভক্ষণজ রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরে বিভূষিত, নরজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি রমণীর তাদৃশ বদন-সুধা পান না করে, তাহার জীবন বিফল।

গভীর-নাভি—ত্রিবলী-কৃতান্তরং,
শ্রোণ্যন্তরং মেখলমণ্ডিতান্তরম্।
কট্যন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

গভীর নাভি ও ত্রিবলীরেখায় বিভূষিত মেখলা-মণ্ডিত রমণীর কটিদেশ যে পুরুষ সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

মহাভাগবত শুকদেব রম্ভার এবম্বিধ বচন-কৌশল শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তাহার নিকট বেদ-বেদান্তের সারভূত নিগূঢ় রহস্যসমূহ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন—

ওঁকার মূলং পরমং পদান্তরং,
গায়ত্রী-সাবিত্রী-সুভাষিতান্তরম্।
বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

ওঁকার যাহার মূল, মোক্ষাখ্য পরম পদ যাহার গর্ভে বর্ণিত, গায়ত্রী সাবিত্রী প্রভৃতি পবিত্র ছন্দে যাহা সংনিবদ্ধ, যে পুরুষ সেই বেদ-বেদান্তের সেবা না করে, তাহার জীবন বিফল।

শব্দান্তরং মুক্তি—নিরাকৃতান্তরং,
তত্ত্বান্তরং নীতি-নিরন্তরান্তরম্।
শাস্ত্রান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে,
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

যাহার মধ্যে মুক্তিদায়ক জ্ঞানগর্ভ শব্দসমূহ বিন্যস্ত, তত্ত্ব ও নীতিসমূহ যাহার মধ্যে সুবর্ণিত, যে ব্যক্তি তাদৃশ শাস্ত্রের সেবা না করে, তাহার জীবন বৃথা।

শুকদেব গোস্বামীর মতি ব্রহ্মপথে প্রবর্ত্তিত

দেখিয়া রূপগর্ব্বিণী রম্ভা তাঁহার মতি-গতি ফিরাইবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মমতের প্রাধান্ত স্থাপনোদ্দেশ্যে বলিল—

যে চ ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
জ্যোতীরূপা মহাসিদ্ধাস্তে স্ত্রৈর্ণার্য্যঃ সুসেবিতাঃ॥

ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ এবং জ্যোতি-রূপী মহাসিদ্ধ পুরুষেরাও রমণীর সেবা করিয়া থাকেন!

স্ত্রীমুদ্রাং মকরধ্বজস্য জয়িনঃ সর্ব্বার্থ সম্পাদিনীম্;
যে মোহাদবধারয়ন্তি কুধিয়ো মিথ্যা ফলান্বেষিণঃ।
তে তেনৈব নিহত্য নির্ভরতয়া লম্বীকৃতা বঞ্চিতাঃ,
কে চিৎ পঞ্চশিখি ব্রতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে॥

রমণীরূপিণী মুদ্রা বিশ্ববিজয়ী কন্দর্পদেবের সর্ব্বার্থ সম্পাদন করে। যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মোহবশে সেই নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা করিয়া মিথ্যা ফল-লাভের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, তত্তৎ কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পরিণামে বঞ্চিতই হইয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জটীল (জটাধারী), কেহ কেহ বা কাপালিক বেশে অব-স্থিতি করে, সুতরাং তাহাদিগের সেইরূপে অবস্থিতি কেবল কুৎসিত বেশধারণ মাত্র, তাহাতে কিছুমাত্র ফল দর্শে না।

রম্ভার এইরূপ প্রগল্‌ভতায় তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মপরায়ণ শুকদেবের চিত্ত ক্রমশঃ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি স্থির গম্ভীর অথচ উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাকে ঘৃণাসূচক তিরস্কার বাক্য বলিতে লাগিলেন—

এতান্ পশ্যসি নির্ম্মলান্ সুতিলকান্ মুক্তাবলীমণ্ডিতান্
নৈব পশ্যসি পূতিক ব্রণ মুখং দুর্গন্ধি দোষান্বিতম্।
নানা মূত্র-পুরীষ-দোষ-বহুলং বস্ত্রেণ সংবেষ্টিতং,
নারী নাম নরস্য মোহন পদং স্বর্গস্য মার্গার্গলম্॥

অয়ি প্রগল্‌ভে! তুমি এই সমস্ত নির্ম্মল তিলক-মণ্ডিত মুক্তাবলী বিভূষিত রমণীরূপ পদার্থকে সুন্দর দেখিতেছ বটে, কিন্তু এই সমস্ত যে পূতিক ব্রণবহুল মুখসম্পন্ন, দুর্গন্ধ দোষে সমাকীর্ণ, মূত্রপুরীষাদি নানাবিধ দোষবহুল এবং বস্ত্র দ্বারা সংবেষ্টিত, তাহা দেখিতে পাইতেছ না। বস্তুতঃ এই নারীরূপ নর-বিমোহন পদার্থ স্বর্গপথের অর্গলস্বরূপ সন্দেহ নাই।

অমেধ্য পূর্ণে কৃমি জাল সঙ্কুলে,
স্বভাব দুর্গন্ধ বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে,
রমন্তি মূঢ়া, বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

যাহা অপবিত্র দ্রব্যরাশিতে পরিপূর্ণ, কৃমিজালে সমাকুল, স্বভাবতঃ দুর্গন্ধপূর্ণ দ্রব্যে বিনিন্দিত এবং মলমূত্রে প্রপূরিত, মূঢ়েরাই তাদৃশ দেহে রমণ করিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তৎপ্রতি বিরক্তিই প্রদর্শন করেন।

ব্রণমুখমিব দেহং পূতি চর্ম্মাবনদ্ধং,
ক্রিমিকুল শতপূর্ণং মূত্র বিষ্ঠানুলেপনম্।
বিগত বহু রূপং সর্ব্বভোগাদি বাসং,
ধ্রুব মরণ নিমিত্তং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যা॥

এই দেহ রূপ পদার্থ ব্রণমুখবিশিষ্ট, পূতিগন্ধপূর্ণ চর্ম্মে সংবদ্ধ, শত শত ক্রিমিকুলে পরিব্যাপ্ত, মল-মূত্রাদিতে অনুলিপ্ত, বাল্য-যৌবনাদি বহুবিধ রূপ-বিশিষ্ট এবং সকল প্রকার দুর্ভোগের আস্পদ। তথাপি মোহবশে মানবগণ মরণের নিমিত্তই ইহাতে আসক্ত হইয়া থাকে!

ইদমেব ক্ষয়দ্বারং ন পশ্যসি কদাচন।
ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানি চ॥

নারীরূপ পদার্থ যৌবন ও যাবতীয় ধনের বিনাশ করিয়া দেয়, এই নারীরূপ বস্তুই সর্ব্বপ্রকার ধ্বংসের দ্বারস্বরূপ। ওগো রূপগর্ব্বিতা রম্ভে! তুমি কি ইহা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছ না?”

শুকদেবের এইরূপ বাসনা শূন্য নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভার লজ্জার পরিসীমা রহিল না,—সে নিজেই নিজের রূপকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে তাহার রূপের প্রভায়—কথার চাতুর্য্যে ত্রিভুবন জয় করিয়াছে, কত মুনি-ঋষির মন টলাইয়াছে, কিন্তু

আজ এই সদ্যোজাত বালকের কাছে তাহার সে সমস্ত বিজয়োপকরণ পরাজিত হইয়া গেল, বিজয়গর্ব্ব ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইল ;—এই দুঃখে-লজ্জায়-অভিমানে আনতমুখী হইয়া সে তৎক্ষণাৎ অমরনগরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ব্যাসদেব অন্তরালে অবস্থান করিয়া সবই দেখিতে ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে বাক্ পটীয়সী রম্ভার বাক্‌চাতুর্য্যে, অটুট রূপ যৌবন সম্পন্না রম্ভার রূপের মোহে শুকদেবের মতি গতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংসার ভোগে আসক্ত হইবে, কিন্তু তাঁহার এত প্রচেষ্টা এত প্রযত্ন সবই বিফল হইল দেখিয়া শুক সকাশে আগমনপূর্ব্বক শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রাধান্য এবং সুকরতা, আশ্রমান্তরের গৌণত্ব এবং দুষ্করতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন—"বৎস! বনবাসের কষ্ট কি তোমার সহ্য হইবে? সেখানে দংশ বহুল মশকাদি কীট অবস্থান করে, তাহাদের ভীষণ দংশন তোমার নবনীত কোমল অঙ্গে কেমন করিয়া সহ্য হইবে? কেমন করিয়া তুমি অনাহারে অনিদ্রায় শত যন্ত্রণায় দারুণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। আর আমরা তোমার জনক জননী, তোমাকে নির্ম্মম পাষণ্ডের মত বনে যাইবার অনুমতি দিয়ে কোন্ প্রাণে গৃহে অবস্থান করিব বল? বৎসরে! গৃহে থাকিয়া কি আর ধর্ম্ম সাধন হয় না? গৃহে অবস্থান করিয়া কায়মনোবাক্যে জনক জননীর সেবা, অকুণ্ঠিত চিত্তে বন্ধু বান্ধবের উপকার সাধনই ত প্রকৃত ধর্ম্ম; এই সর্ব্ব-জনোপকারক গৃহস্থাশ্রমের অবশ্য পালনীয় সর্ব্ববিধি নিয়ম পালন করিলেই ত সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার জন্য আবার আশ্রমান্তর—ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি? বৎস! যে ধর্ম্মে জীব হিংসা নাই, যে ধর্ম্মে সত্য বাক্য ও দয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, যে ধর্ম্মে গৃহে বাস করিয়াই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, আমার বিবেচনায় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। আমি বুঝি জপই পরম ধর্ম্ম, তপই পরম ধর্ম্ম, দেবার্চ্চনাই পরম ধর্ম্ম। বৎস! সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য সন্তান প্রথম বয়সে অধ্যয়ন করিবে, দ্বিতীয় বয়সে অর্থোপার্জ্জন করিবে, তৃতীয় বয়সে সন্তানোৎপাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে এবং চতুর্থে অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে বন গমন করিবে। ইহাই হইতেছে সনাতন ধর্ম্মের ধারা বৎস! বৃথাই তুমি অল্প বয়সে বৃদ্ধসাধ্য দুষ্কর প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কারণ তুমি তো স্বর্গ লাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগে উদ্যুক্ত হইয়াছ, কিন্তু দেখ এই সংসারই যে স্বর্গস্বরূপ, রমণী সম্ভোগই স্বর্গ, তাম্বুল ভক্ষণই ঐশ্বর্য্য, অতএব সংসার-সুখ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ তুমি তোমার কল্পিত স্বর্গের সন্ধানে ছুটিও এই আমার বক্তব্য।"

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের এইরূপ প্রলোভন বাক্য শুনিয়া শুকদেবের হৃদয়ে উত্তরোত্তর বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল; তিনি পিতৃকথিত উপদেশের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"যাহার দেহ ব্রণ পূরিত, যে সর্ব্বদা কোন কৌতুক-কর বিষয়েই লিপ্ত থাকে, কন্দর্প বিজয়ে যে পটীয়সী, এতাদৃশী নারীর সেবা করিলে কদাচ পিতৃঋণ পরিশোধ করা যায় না। কেবল লোক লোচনের তৃপ্তির জন্যই বিকল্পিত। নারী, শয্যা, আসন, ধন, তাম্বুল ভক্ষণ, রাজ্যৈশ্বর্য্য, বিভূতি এতৎসমস্তই মুক্তির অন্তরায় এবং বন্ধনস্বরূপ। একেত জীবন অনিত্য, তদুপর এই অনিত্য জীবন লাভের সময় গর্ভাবাসের দারুণ দুঃখ, আবার অন্তকালে মরণ সময়ে অসহনীয় ক্লেশ—ইহা প্রত্যেক মানুষকেই ভোগ করিতে হয়। অতএব এই অনিত্য দুঃখ

ক্লেশময় জীবন ধারণের পরিবর্ত্তে নিত্য জীবনের জন্য প্রচেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য নহে কি? পিতঃ! আমি সেই নিত্য জীবন লাভের জন্যই এই অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি, ইহাতে ত আপনার আনন্দিত হইবারই কথা।"

শুকদেবের এই প্রকার বৈরাগ্যাতিশয্য দেখিয়াও ব্যাসদেব পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না; তিনি অপত্য স্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"হে বুদ্ধিহীন পুত্র! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিহার করিয়া যতিবেশে প্রবাসে গমন করিলে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতিতে ক্লিষ্ট হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, আর তাহাতে কুভোজন অবশ্যম্ভাবী। অতএব হে বৎস! অগ্নিহোত্রী হইয়া নিত্য পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এবং ঋতুকালে দারাভিগমন করা বিধেয়। এই প্রকার শাস্ত্রানুমোদিত আচরণ দ্বারাই মনুষ্য নিত্যধাম লাভ করিতে পারে, কারণ অগ্নিহোত্র ব্যতীত কদাচ স্বর্গ লাভ হয় না। অতএব তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান কর।"

শুকদেব মহর্ষি বাদরায়ণের এবম্প্রকার প্রবৃত্তি মার্গ প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া উক্ত মার্গের দোষাবলী প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। —"পিতঃ, অগ্নিসাধ্য কার্য্য প্রভৃতি সংসারে পুনরাগমনের এবং কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্য সকল সংসার বন্ধনের কারণ। তদুপর এতৎ সমস্তই অশাশ্বত ও অনিত্য; অতএব ইহাদের অনুষ্ঠান বৃথা। আরও দেখুন, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকাণ্ড রাক্ষসদিগেরও গৃহে গৃহে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মৌন, এ সকল তাহাদের নাই। যদি যূপকাষ্ঠ প্রোথিত করিয়া তাহাতে পশু বন্ধনপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিয়া —রক্তের স্রোত বহাইয়া স্বর্গে গমন সম্ভব হয়, তবে নরকে যাইবে কে? যে ধর্ম্মে সত্যই যূপস্বরূপ, তপস্যাই অগ্নিস্বরূপ এবং সাধকের প্রাণই সমিধস্বরূপ, সেই অহিংসাই পরমধর্ম্ম—আর এই ধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম—আর এই ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গণনীয়। কারণ নিজের প্রাণ যেরূপ অভীষ্ট, অপরাপর প্রাণিগণেরও সেইরূপ, মনীষিগণ আপনার সহিত উপমা করিয়াই সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব পশু বধই যে ধর্ম্ম তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করি?"

শুকদেবের এই যুক্তি অকাট্য বুঝিতে পারিয়াও মোহমুগ্ধ ব্যাসদেব পুনরায় গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন —গৃহস্থাশ্রমীদিগের গৃহ আশ্রয় করাই প্রধান ধর্ম্ম। গৃহ আশ্রয় পূর্ব্বক যে কার্য্য করা যায়, তাহাতেই ধর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। মাতৃস্তন্য পান করিয়া যেমন জীবগণ জীবন ধারণ করে, ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়। যেমন নদ নদী সমস্তই সাগরে যাইয়া সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ সকল আশ্রমী গৃহাশ্রম আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। গৃহাশ্রমিগণই সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়; ভিক্ষুকেরা অনবস্থিত। অতএব যে আশ্রম আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রমী জীবনধারণ করে, সেই গৃহাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

পিতৃপ্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া সমস্ত শাস্ত্রার্থ পারদর্শী শুকদেব বলিতে লাগিলেন—"সুমেরুগিরি ও সর্ষপ এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, সূর্য্য ও খদ্যোতের মধ্যে যে প্রভেদ, নদী ও সাগরের মধ্যে যে প্রভেদ, হে পিতঃ! ভিক্ষু ও গৃহী এই উভয়ের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদই বিদ্যমান জানিবেন। যেখানে শূদ্র দাতা এবং ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহীতা, সেখানে দান মাত্রেই কি শূদ্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

ব্যাসদেব পুত্রকে কোনরূপে নিজের মতে আনিতে না পারিয়া অবশেষে পুত্রহীনের সর্ব্ব ধর্ম্মের নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"বৎস! কি ইহলোকে কি পরলোকে, অপুত্রকের কোথাও গতি নাই। অতএব প্রথমে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিও। হে বৎস! পুত্র হইতেই স্বর্গ লাভ হয়, পুত্র দ্বারাই বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং পুত্র দ্বারাই যশ ও কীর্ত্তিলাভ হয়। অতএব গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া তুমি প্রথমে পুত্র উৎপাদন কর।"

ব্যাসদেব এই প্রকার উপদেশ দিলে পরমাত্মদর্শী মহামতি শুকদেব আত্মবিবেক বাণী দ্বারা পিতৃকথিত উপদেশের বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"হে পিতঃ! যদি পুত্র দ্বারাই স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই নিরর্থক। কেন না, যাহার বহু পুত্র থাকে সে ত ধর্ম্মহীন হইয়াও স্বর্গধামে যাইবেই। সর্পিণী, গোধিকা, কুকুরী, কচ্ছপী, ইহাদিগের অসংখ্য পুত্র জন্মে; অতএব আপনার যুক্তি বা মতানুসারে যদি ইহাদের স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠানই যে নিরর্থক হয়। হে পিতঃ! আমার মতে পুত্র দ্বারা কখনও স্বর্গলাভ হয় না, যশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পৌরুষ প্রাপ্তিরও আশা নাই, বরং পুত্রোৎপত্তি হইলে লোকে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে। গৃহারম্ভ অনিত্য, সংসার-বন্ধন দুঃখের কারণ যে সকল গৃহমেধী সংসার-জীবনে আসক্ত হয়, তাহারা মূর্খ সন্দেহ নাই। আরও শুনুন—

> অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরি-নদীবেগোপমং যৌবনং,
> মানুষ্যং জলবিন্দু লোলচপলং কেশোপমং জীবনম্।
> ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চল মতি স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্,
> পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিগতঃ শোকাগ্নি না দহ্যতে॥

অর্থ পদধূলির তুল্য, যৌবন পর্ব্বতনিসৃত নদীবেগের সদৃশ, মনুষ্যজীবন জলবিম্বের ন্যায় চপল, জীবন কেশ সদৃশ নশ্বর; অতএব যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হইয়া স্বর্গার্গলের উদ্ঘাটনের উপায়স্বরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে পরিণামে পরিতপ্ত ও জরাগ্রস্ত হইয়া শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইতে হয়।

> আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং,
> ব্যাপারৈর্বহু কার্য্যকারণশতৈঃ কালোঽপিন ভারতে।
> দৃষ্ট্বা জন্ম-জরা-বিয়োগ-মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে,
> পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥

আদিত্যদেবের গতাগতিতে অহরহঃ জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সংসারে লোকে শত শত কার্য্যকারণে ব্যাপৃত থাকিয়া সময়ও বুঝিতে পারে না; জন্ম, জরা, বিয়োগ, মরণ, এ সমস্ত প্রতিনিয়ত সংসারে ঘটিতেছে দেখিয়াও লোকের ভয় জন্মে না; সুতরাং অখিলজগৎ মোহময়ী প্রমোদমদিরা পান করিয়া উন্মত্তবৎ অবস্থিত রহিয়াছে।

"পিতঃ! সংসারে যাহারা অজ্ঞান—তিমিরে আচ্ছন্ন ও মোহের বশীভূত হইয়া বহুবিধ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহারা অধমা গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহামুনে! এক জন্মকৃত ভ্রান্তি শত জন্মেও দূর হয় না, কিন্তু শত জন্মকৃত পাপ এক জন্মেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব অজ্ঞান-তিমির নাশক জ্ঞানোন্মেষের জন্য সকলেরই প্রযত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য নহে কি? তবে কেন আপনি আমাকে এই মহান্ পথ হইতে বিরত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন? অনুমতি করুন পিতঃ! আমি স্বচ্ছন্দে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করি।"

পুত্রের এইরূপ নির্ম্মম বাণী শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব নিরতিশয় ব্যাকুলান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন—"বৎস! তোমাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য আমি কত কঠোর তপস্যা করিয়াছি, অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম তোমার মত পুত্রকে গৃহস্থাশ্রমে বিরাজমান দেখিয়া আমার নয়ন-মন সার্থক করিব, আমার

অধীত বিদ্যা তোমার মত সুপাত্রে অর্পণ করিয়া পিতার কর্ত্তব্য সমাপন করিব, কিন্তু দুরদৃষ্টবশে আজ তদ্বীপরীতে একি হইতে চলিল? তুমি সত্যই কি তোমার জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে বৎস? এখনও বলিতেছি তুমি আমার কথা শুন। আমি তোমার পিতা, আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই সর্ব্বাভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে অতএব আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না বৎস!

শুকদেব পিতার আশা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া নির্ম্মমভাবে এ বন্ধন ছেদন মানসে বলিয়া উঠিলেন—"পিতঃ! আমি সহস্র সহস্র বার আপনার মত স্নেহাতুর পিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সহস্র সহস্র বার ঘোরতর সংসার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সহস্র সহস্র বার ইহার রস সম্ভোগ করিয়াছি, কিন্তু আর না, এবার এই সহজাত বৈরাগ্যের তীব্র আকর্ষণে সাংসারিক আকর্ষণসমূহ ছিন্ন করিয়া এই আমি চলিলাম—ক্ষমা করিবেন পিত!! ......"

এই বলিয়াই শুকদেব দ্রুতগতিতে তথা হইতে অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, ব্যাসদেবও পুত্র-স্নেহমুগ্ধ মূঢ়ের মত 'হা পুত্র' 'হা পুত্র' করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

(সমাপ্ত)

আমার আমি

আমাকে আমার চাই। কথাটা অদ্ভূত মনে হতে পারে, কেন না, যা নাই, তার অভাব দূর করতে লোকে সেই জিনিষ চায়। আমি তো আমার চিরকাল হয়েই আছি, আবার চাই বলব কেন? বিবেকী ব্যক্তি এই ভাবে থাকাতে তৃপ্ত নন। তাই তিনি বলছেন, আমি চাই আমাকে। সত্যি আমি হারিয়ে গেছি। তোমরা বল, আমি আছি, নাম ধরে ডাক, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না সত্যি কাকে ডাকছো, কে-ই বা উত্তর দিচ্ছে। সত্যিকার আমি কোন্‌টা? এই যে দেহটা চলছে, ফিরছে, এর কোন্ জায়গা যে সত্যিকার আমিটা লুকিয়ে আছে, তা ভাবতে গিয়ে সারা হই! যদি বল সবটা দেহ নিয়েই আমি, তাহলে যখন এটাকে মরার পরে সমাহিত করবে, তখন কি আমি আর থাকব না? বল কি? এ যে ভাবতেও বুক শুকিয়ে যায়! এই দেহটার মায়া বরং এড়ানো যায়, কেন না, বাল্য-যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য হিসাবে যখন এটা এক সময়ে এক এক রকম হয়ে যায়, তখন মরার পরেও হয়ত আর এক রকম দেহ লাভ হবে। যৌবনে যেমন বাল্যের দেহ নাই বলে কেউ কাঁদতে বসে না, তেমনি মরার পরে আমার এতটা কালের রক্ত মাংসের দেহটা গেল ব'লে হয়ত কাঁদতে আসব না কিন্তু তাই ব'লে কিছুই থাকবে না, আমার এত আশা-ভরসা, জীবন-মরণের এত রঙ্গীণ কল্পনা, শয়নে-স্বপনে-জাগরণের এত সুখের নেশা, সবই মরণের সাথে ভস্মীভূত হবে? মরণ কি এমনই

ভয়ানক শক্তিশালী যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী যে এই আমিত্বের কলরব, সে সমস্তকে চিরতরে সমাহিত করবে? না, এ হ'তে পারে না। মরণ আমার আর সব নষ্ট করতে পারে, কিন্তু আমার আমিত্বকে নষ্ট কর্‌তে পারে না। এমন বরং হতে পারে যে, সুন্দর আমি, কুৎসিৎ আমি, ইত্যাদি আমার যে সব অভিমান রয়েছে, তা নষ্ট করতে পারে কিন্তু তাই ব'লে আসল আমি যা, যে বস্তু সুন্দর-কুৎসিৎ, ভাল-মন্দ সবার মাঝে থেকে নিয়ত বল্‌ছে—"আমি আছি" বা শুধু "আছি," তাকে সেই, সদা-বিরাজমান সত্ত্বাকে মৃত্যু বা কালের কবাল শক্তিতেও নষ্ট কর্‌তে পারে না। তারা পারে শুধু এই বাইরের রূপটা বা অভিমানাদিকে পরিবর্ত্তিত, বিকৃত বা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিতে। কিন্তু আসল যে আমি সবার মাঝে থেকে নিয়ত হুঙ্কার দিয়ে বল্‌ছে, 'আছি', সেই মহা শক্তিমান পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করে মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে, কালেরও কাল অর্থাৎ মহাকাল হয়ে জগৎকে ধারণ করে আছেন। সেই মহাকাল, পরম শিব পরম মঙ্গলময়ের সত্ত্বা আপনার মাঝে সূক্ষ্মভাবে আছে বলেই কেহ মরণ বা বিনাশরূপ অমঙ্গলের চিন্তা সহ্য করতে পারে না। এ তার দুর্ব্বলতা নয়—মূলগত স্বভাবের পরিচয়।

সেই পরম সত্ত্বারূপী সনাতন আমার মহান্ বিপুল বিকাশ দেখতে চাই। অনুভব করতে চাই আমার বিরাট্ শক্তি সত্যিকার প্রকাশ! নইলে শুধু 'আমি' 'আমি' করে আঁধার ধরে হাতড়ে বেড়িয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুল্‌তে চাই না। যাদের যাদের সঙ্গে এ জগতে আমার নিত্যযোগ বর্ত্তমান, সেই একান্ত বন্ধু-বান্ধবেরা হয়ত আমাকে পাগল বলে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু তাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আজ যে আমি তাঁদিগকে এতখানি জড়িয়ে ধরেছি, সেই জড়িয়ে ধরার মূলেই বা আছে কোন্ শক্তি? কেন আমাদের এমন গলাগলি ভাব? তারও মূলে কি সেই মহান্ একাত্মতার প্রবল আকর্ষণ নয়? আমার আমিত্বকে যতটুকু প্রসার করতে পেরেছি, আমার আত্মীয়তা ততটুকু ছড়িয়েছি। কিন্তু যদি সেই সঙ্কীর্ণ সীমা ক্রমে বিস্তৃত হয়ে যায়, তবে আমার স্বরূপের অনুভূতিও আরো বেড়ে যাবে। অনুভূতি যত ব্যাপক হবে, ততই নিবিড় হয়ে উঠবে। এইরূপ গভীর-নিস্তব্ধ-ধ্যান তন্ময়তার ভিতর দিয়েই আমার আমিকে ক্রমশঃ চিন্‌তে পারব। তোমরা বল্‌ছ, বাইরের দেখা শুনা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়েই আত্মীয়তা বাড়ে। কিন্তু আমি দেখছি, আলাপ আপ্যায়ণের ভিতরে কেবল থাকে প্রাণের আসল রূপটা আবৃত রেখে ভদ্রতা ও লৌকিকতার লোক দেখানো এক কৃত্রিম ভাব। বাইরের জগতে দেখি যে, যাকে যত তুমি ভালবাস্‌বে, সে তত তোমার আচার-ব্যবহার আলাপ সম্ভাষণাদির ভিতর দিয়ে ভালবাসার পরিচয় পেতে চাইবে। তাই যখন সে সবের অভাব হয়, তখনই মন তার বিগড়ে। যাবেই তো! ও যে ভুল পন্থায় সুরু হয়েছিল।

যে মনে করে, ভাষা দিয়ে জগৎকে ভোলাব, সেও যেমন ভুল করে, আবার যে ভাবে, শুধু ব্যবহার দিয়ে দশ জনকে বশে রাখব, সেও তা বেশী পারে না, কেন না, ক'জনকে তুমি সব সময়ে অর্থ-সামর্থ্যের সাহায্য দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা ক'রে বশে রাখতে পারবে? কাজেই আত্মীয়তার অর্থ এই নয় যে, মিষ্ট কথায় বা সুন্দর ব্যবহার দ্বারাই সকলকে আমি ভালবাস্‌ব—আপন করে নেব। ভিতরে একটা মহান্ ভাবের আশ্রয় না পেলে অপরকে সত্যি সত্যি আপন ভাবা যায় না।

সে মহান্ ভাব আর কিছু নয়, শুধু আমিত্বের প্রসার। এই আমি কি বস্তু, সেই চিন্তায় মন ডুবিয়ে দিতে পারলে ক্রমশঃ দেখা যাবে যে,

যাদিগকে আগে আমার বা আমি বলে ধরে নিয়েছিলাম, বাস্তবিক আমি মাত্র এতটুকু নই। আমার গণ্ডী তার চেয়ে কোটী কোটী গুণ ব্যাপক আমার আমিত্ব এত ব্যাপক বলে ক্রমশঃ উপলব্ধি হবে যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তার মাঝে উঠছে পড়ছে। আর আমার পূর্ব্ব কল্পিত আমিত্বের গণ্ডীস্বরূপ ক্ষুদ্র দেহটা আর দু'দশটা দেহের মত আমারই একাংশে চলা-ফেরা করছে। যেমন আমার এই হাতখানা। এর মাঝে পাঁচটী আঙ্গুল রয়েছে। প্রত্যেকটী আঙ্গুলই আমার দেহের বা শরীরের। কিন্তু একমাত্র একটী আঙ্গুলই আমার দেহ নয়। তেমনি এই রক্ত মাংসের সমগ্র দেহটাই 'আমি' নই। কিন্তু আমার এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডময় সনাতন বিরাট দেহের একটী অংশ মাত্র এই আমার ক্ষুদ্র দেহটী। সুতরাং এর নাশে আমার বিরাট দেহের এক অতি সূক্ষ্মাংশ বা নগণ্য অংশ বিকৃত হবে বটে, কিন্তু আমার সত্যিকার দেহ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ অক্ষত থাকবে। তার মাঝে এই ক্ষুদ্র দেহের মত কোটী কোটী দেহ নিয়তই উদ্ভব ও লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। এক কথায় এ যেন অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।

শুদ্ধ সত্ত্ব দেহধারী হয়েও শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন যে, বাস্তবিক 'আমি' বলতে রক্ত মাংসের দেহটাই যে আমরা ধরে নিই, তা নয়। যা কিছু আমরা স্থূল চোখে দেখি, সে সব এবং অন্য যা কিছু দেখতে চাই —সব নিয়ে, এক কথায় অনন্ত কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে সে আমি। যথা—

> ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
> মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥

শত শত হাজার হাজার নানা রকমের, নানা আকৃতির দিব্য দেহীরও অভাব নাই তার মাঝে। সে এমন জ্যোতির্ম্ময় যে—

> দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
> যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

সহস্র সূর্য্যের যুগপৎ প্রকাশের কালে যেমন আভা হয় তেমনি।

হয়ত বলবে, কাজ নেই অমন রূপ দেখে। কারণ আমাদের শক্তি হবে না। অর্জ্জুনের মত বীর্য্যবান সাধককেও সে জন্য শ্রীভগবান্ দয়া পরবশ হয়ে দিব্য চক্ষু দিয়েছিলেন, তবে গিয়ে তিনি তা দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কাজেই দুর্ব্বল আমাদের ভরসা কি? কথাটা সত্য বটে। কিন্তু এই 'সংসার-সাগরং ঘোরং তর্ত্তুম্ ইচ্ছতি যো নরঃ' ঘোর সংসার সাগরে যে নর ত্রাণ পেতে চায়, তাকে দুর্ব্বল হ'লে চলবে না। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। দুর্ব্বল তাঁকে পায় না। কাজেই বীরবাণীরূপ 'গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ।'

সে গীতা বা বীরবাণী কি? আত্ম তত্ত্বের উদ্বোধন। তোমার ভিতর সেই মহান্ আত্মা তো রয়েছেনই। তবে তোমার অমন দুর্ব্বলতা কেন? সব তোমার ওই ক্ষুদ্র দেহটাকে আমি বা যথা সর্ব্বস্ব মনে করেই যত সব গোল বাধে। এই দেহের শক্ত বাঁধন, সব চেয়ে বেশী শক্ত মনের ওই সংস্কারের বন্ধন, যত দিন না টুটবে, তত দিন কোনও আশাই নাই, এখানে এসে পরম নির্ভরশীল হয়ে বকধার্ম্মিক সেজে বলে উঠলে চলবে না যে 'যাঁর দেওয়া বাঁধন, তিনিই ছুটাবেন, আমার সাধ্য কি?' ও সব নিজের মনের দুর্ব্বলতাকে শাস্ত্রীয় সুরে সান্ত্বনা দেওয়া বই আর কিছুই নয়। সর্ব্বত্র তোমার নিজের বড়াই, আর যেই শক্ত কাজের চাপ, অমনি দোহাই দেওয়া অপরের—এ ছলনা মাত্র; সত্যি যদি যাঁর বাঁধন দেওয়া, তাঁর 'পর নির্ভর আসে, তবে দেখবে বাঁধন খোলার জন্য প্রাণপণ আকুলি বিকুলি করবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চেষ্টার সাথে তাঁর কাছে ওই প্রার্থনা

জাগবে যে, "ওগো দাও তুমি দিব্য চক্ষু, দাও এ বাঁধন খুলে তুমি।"

সে দিব্য চক্ষু কি? আমার প্রাণপণ চেষ্টা ও আকুল প্রার্থনার পর তাঁর কৃপা কটাক্ষ। প্রাণ যদি জাগে, যদি যথার্থ আত্মানুসন্ধান জাগে, যদি প্রাণ উদ্বারিয়া বল্‌তে পার—"যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্"—'হে যোগেশ্বর, তাহলে তুমি একবার আমাকে তোমার সেই রূপটী দেখাও'—তবে তিনি অন্তর হতে এখনও ডেকে বল্‌বেন—"ছাড় মিথ্যা ওই দেহাভিমান—যথার্থ আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর—সে জন্য দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।"

কিন্তু দিব্যি আরামে খাব, ঘুমাব, আর মাঝে মাঝে অপরের কথা স্মরণ করে মনে হবে যে, তাই ত, আমিটা কি বা কে? সত্যি তো সেটা কে ধর্‌তে ছুঁতে পারি না—এমনটী হ'লে চল্‌বে না। সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হবে। সে জন্য দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ ক'রে অন্বেষণ চাই। কায়মনোবাক্যে যদি নিয়ত অন্তর হতে না পাওয়ার বেদনা দেবতার পায়ে নিবেদন করা যায়, তবে দেবতার আসন অটল থাক্‌তে পারে না। কিন্তু প্রথমে চাই তপস্যা। নিজকে তাপ দিয়ে, দুঃখ সয়ে আত্মানুধ্যান কর্‌তে হবে। সে জন্য চাই সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক আহার—মাঝে মাঝে যথার্থ সাধু সঙ্গ। ভাবের আকুলতা বা গভীরতা অনুযায়ী সে সাধু স্থূলে বা সূক্ষ্মে আপনি এসে ধরা দিবেন। চিন্‌বার জন্য বেগ পেতে হলেও শেষ পর্য্যন্ত ঠক্‌বে না।—কিন্তু চাই গভীর ভাবের চিন্তা, গম্ভীর ধ্যান-তন্ময়তা। আমাকে বাদ দিয়ে যখন আমার চলে না, জগতের আর সবাই বা আর সব কিছু বাদ দিলেও যখন আমাকে আমার চাই, তখন একাগ্র হয়ে নিথরে ডুবে যেতে হবে, দেখতে হবে তন্ন তন্ন বিচার করে, যথার্থ আমি কোন্‌টা। এই দেহ-মন, অথবা স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগতের সমষ্টি সেই বিরাট রূপ! ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

———×———

রঘুনাথ দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্রমে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া আসিল, নীলাচলের উচ্ছল কীর্ত্তন তরঙ্গে যতি পড়িতে আরম্ভ করিল। নাম সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ—দৈন্যের প্রকট মূর্ত্তি—ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ঠাকুর হরিদাসের মহাপ্রস্থানে মহাপ্রভুর লীলা-সংহরণের সূচনা হইল; ভক্তগণ বুঝিলেন লীলা-অপ্রকটের আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

সহসা একদিন হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে জগজ্জন-নয়ন-মন-আনন্দপ্রদ দারুজগন্নাথ দারুজগন্নাথে লীন হইলেন; মহাপ্রভুর ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী—শয়ন-স্বপন-জাগরণের একমাত্র সঙ্গী স্বরূপ দামোদরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ভাবগম্ভীর গম্ভীরা লীলার অবসান হইল, সদা বিলাপ-মুখরিত গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

রঘুনাথের এ বিরহ-জ্বালা অসহ্য হইল। যে পূর্ণশশীর রূপসুধা পান করিবার মানসে তিনি রাজ্য সম্পদ্ সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, যে মহামানবের পদনখ পার্শ্বে স্থান পাইবার আশায় তিনি ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য আর অপ্সরাসম নারীর মোহ বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার সেই চির আরাধ্যতম দেবতা আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, চিরদিনের মত তিনি সরিয়া পড়িলেন, এ ভীষণতম জ্বালা কেমন করিয়া তাঁহার প্রাণে সহ্য হইবে? —তাহাও সহ্য হইত, নয়ন-নীরে বক্ষঃস্থল অভিসিঞ্চিত করিয়া হৃদয়ের বিরহানল কতকটা প্রশমিত হইত—যদি তাঁহার জীবন-তরণীর কর্ণধার, অধ্যাত্মগুরু স্বরূপ দামোদরও তাঁহার অনুগমন না করিতেন। তিনি থাকিলে হয় ত রঘু তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ লইয়াই নীলাচলে আরও দীর্ঘ দিন—এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ তিনিও মহাপ্রস্থান করিলেন! কাজেই নীলাচলে অবস্থান তাঁহার বিষবৎ বোধ হইল, তিনি আর এক মুহূর্ত্তও তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর মহাদান গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন শিলা লইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"আর এ দেহ রক্ষা করায় প্রয়োজন কি? যাঁহাদের অমিয় স্পর্শে এ দেহ-মন-প্রাণ সঞ্জীবিত—পরিপুষ্ট ছিল, তাঁহারাই যখন বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন আর এ জীবন ধারণের ফল কি? একবার গোবর্দ্ধনে গিয়া সেখানেই ভৃগুপাতে প্রাণত্যাগ করিয়া এ জ্বালার অবসান করি না কেন?"

এই সঙ্কল্প করিয়া রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিলেন, তথায় মহাভাগবত রূপ-সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, রঘুপ্রমুখাৎ মহাপ্রভুর মহাপ্রস্থান বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারাও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, শোকাশ্রুতে তাঁহাদেরও বক্ষঃস্থল পরিপ্লাবিত হইয়া গেল।

কিন্তু তাঁহারা রঘুনাথকে মরিতে দিলেন না, বরং স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"মরিবে কেন ভাই? আমাদের ত আত্মহত্যা করিবার অধিকার নাই! এ দেহ যে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত, কাজেই স্বভাব বশে যতদিন না দেহপাত হয়, ততদিন তাঁরই গুণগানে, তাঁরই মহিমা প্রচারে আমাদের ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, তাঁরই মহান্ লীলার অনুধ্যান করিয়া হৃদয়ের শোক সন্তাপ দূর করিতে হইবে।"

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধুর সম্ভাষণে, তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনায় রঘুনাথের হৃদয়-জ্বালা অনেকটা প্রশমিত হইল, তিনি ভৃগুপাতে মরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, রূপ-সনাতনও তাঁহাকে তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতৃস্বরূপে আপনাদের সকাশে রাখিয়া দিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে:—

তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিয়া।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিলা॥

রূপ-সনাতনের আগ্রহে শ্রীমৎ রঘুনাথ এই সময় প্রতিদিন গৌর-লীলানুকীর্ত্তন করিতেন, সুধাময়ী লীলা বর্ণনা করিতে করিতে শুনিতে শুনিতে বক্তা-শ্রোতা উভয় পক্ষেরই ভাব-বিহ্বলতা উপস্থিত হইত, নয়নজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অভিসিঞ্চিত হইত। সম্ভবতঃ রঘুনাথ এই সময়েই "শ্রীশচীনন্দনাষ্টক" ও "শ্রীগৌরাঙ্গস্তব কল্পবৃক্ষ" স্তোত্রদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। এই স্তোত্রদ্বয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে মহাপ্রভুর জীবন কথা, তাঁহার ভজন প্রণালী, তাঁহার প্রতি রঘুর ঐকান্তিক আকর্ষণের কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গৌরচরণানুধ্যায়ী ভক্ত-জনগণকে আমরা

এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যাহা হউক যে সময়ে রঘুনাথ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, সে সময় সেখানে এই ভ্রাতৃযুগলের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত; পাণ্ডিত্যে, ভজননিষ্ঠায় ও বিনয়ে ইঁহারা "গোস্বামী" খ্যাতি লাভ করিয়া তথায় সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও পূজিত। শ্রীমদ্ রঘুনাথ সর্ব্ববিষয়েই ইঁহাদের সমতুল্য বলিয়া তাঁহারা ইঁহাকে সহোদর বা মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথও সর্ব্বদা ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া, ইঁহারা যেভাবে ভজন-সাধন করিতেন, সেইরূপ তদ্গত ভাবে ভজন-নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইলেন। রূপ-সনাতনের সহিত রঘুর এক-প্রাণতা দেখিয়া বৃন্দাবনধামে রঘুনাথ দাস অতঃপর "শ্রীমৎ দাস গোস্বামী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

রঘুনাথ কিছুদিন রূপ সনাতনের সহিত বৃন্দাবনে বাস করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণান্তর গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের নিভৃত স্থানে ভজন করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে যে গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করেন, নীলাচলে অবস্থান সময়েই রঘুনাথ ইহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু ইঙ্গিতে গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডকেই তাঁহার শেষ জীবনের ভজনস্থলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ এতদিন পরে সেই গিরিরাজের চরণান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে আসিয়াই "শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় দশক" স্তোত্র রচনা করেন। ভাব গাম্ভীর্য্যে এবং রচনা-মাধুর্য্যে ইহা অতুলনীয়!

রঘুনাথ মনে করিয়াছিলেন—গোবর্দ্ধনে আসিয়া তিনি স্থিরচিত্তে ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু তদ্বিপরীতে তথায় আসিয়া যেন তাঁহার গৌরাঙ্গ-বিরহ জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, কারণ তিনি এতদিন শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ-গোস্বামীর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া গৌর-কথায় দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধনে আসিয়া সে সঙ্গীহারা হইয়া তাঁহার হৃদয়ে মহাপ্রভু ও স্বরূপের বিরহানল অধিকতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল। যাহা হউক এই অন্তর্দাহে জ্বলিয়া পুড়িয়াই তিনি সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দীনতার খনি রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের চরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া দীনতা সহকারে "গোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশক" নামক স্তোত্রটী রচনা করেন। উহার দশম শ্লোকে তিনি বিনয় সহকারে বলিতেছেন :—

> নিরুপধি করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
> ময়ি কপটি শঠোঽপি ত্বৎ প্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
> ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
> নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন! আমি অতি কপটী—আমার বৈরাগ্য কেবল লোক দেখান। আমি প্রতারক—আমি শঠ; আমার মনে এক, মুখে আর। আমি জানি, আমি তোমার নিকট স্থান পাওয়ার অযোগ্য। কিন্তু গিরিরাজ! আমার আর এক ভরসা এই যে তুমি, আমার যোগ্যতাযোগ্যতার বিচার করিবে না; কেন না তোমার অতি প্রিয় শ্রীশচীনন্দনই আমাকে তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণা নিরুপধি, তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্রের বিচার নাই। সুতরাং হে গিরিরাজ! তুমি দয়া করিয়া তোমার চরণান্তিকে আমাকে একটু স্থান দাও।

রঘুনাথ গোবর্দ্ধনান্তিকে কিয়ৎকাল ভজন-সাধন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ভজনাধিকার লাভ করিলেন। তিনি রাধাকুণ্ডে গমন পূর্ব্বক তথায় রাধা-কৃষ্ণের মানস-সেবায় নিমগ্ন হইলেন। এই রাধাকুণ্ডই তাঁহার শেষ জীবনের শেষ ভজনস্থল। এই রাধাকুণ্ডে অবস্থান কালেই তিনি "শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক" স্তোত্র রচনা করেন।

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী এই কুণ্ডতটে বৃক্ষমূলে বসিয়া

বোধিদ্রুম মূলে গৌতমবুদ্ধের মত কঠোর সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল, কত হিংস্র পশু তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও রহিল না।

শ্রীবুদ্ধের সহিত রঘুনাথের ধ্যেয় বা অনুসন্ধেয় বস্তুর পার্থক্য থাকিলেও একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা বিষয়ে যে উভয়ের ঐক্য রহিয়াছে তাহা সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য। শ্রীবুদ্ধের প্রতিজ্ঞা ছিল :—

> ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
> ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু।
> ন প্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্লভাং
> নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

অর্থাৎ এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, ত্বগস্থিমাংস বিলয় হয় হউক, তথাপি বহুকল্পদুর্ল্লভ বোধি না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন এই আসন হইতে আমার দেহ বিচলিত না হয়।

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর প্রতিজ্ঞা এই যে :—

> ব্রজোৎপন্নক্ষীরাশন বসনপত্রাদিভিরহং,
> পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যহ্বতিমদম্ভং সনিয়মঃ।
> বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
> মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ॥

কর্ণানন্দে শ্রীল যদুনন্দন দাস ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা :—

> এই বৃন্দাবনে মোর সাধন-ভজন,
> এইখানে দেহত্যাগ আমার নিয়ম॥
> ব্রজোদ্ভব ক্ষীর যেবা আমার ভক্ষণ,
> ব্রজ বৃক্ষপত্র এই আমার বসন॥
> ইহাতেই নির্ব্বাহ মোর দম্ভ দূর করি
> শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা গোবর্দ্ধন গিরি॥
> রাধাপ্রেম সরোবরে নিকটে নিশ্চয়,
> এইখানে মরি যেন হেন বাঞ্ছা হয়॥

রঘুনাথের মাথার উপর দিয়া কত শীতাতপ, বর্ষণের কত প্রবল ধারা বহিয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি কুটীর বাঁধেন নাই, তথাপি তিনি আপন আসন ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হন নাই। অবশেষে রঘুনাথ শ্রীমৎ সনাতনের স্নেহাদেশে তাঁহার অনুজ্ঞায় বিরচিত পর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহাতেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ কাটাইয়া দিলেন।

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর এই কুণ্ডতটে অবস্থান কালে নানা দেশ হইতে নানা ভক্ত আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। প্রকৃত পক্ষে দাস গোস্বামীর অবস্থান সময় হইতেই রাধাকুণ্ড সাধারণের চক্ষে মহান্ তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। এই সময়েই চৈতন্য চরিতামৃতকার ভক্তশ্রেষ্ঠ কবিরাজ গোস্বামী রঘুনাথের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সাধন-ভজন ইত্যাদি শিক্ষা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ দাসের চরিত্র বর্ণনাবসরে চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিতেছেন :—

> তাঁহার সাধন রীতি অতি চমৎকার,
> সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

প্রকৃত পক্ষে রঘুনাথের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-কাহিনী শ্রবণ না করিলে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতের মত অমূল্য গ্রন্থ ভক্ত-করকমলে উপহার দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থে এই কৃতজ্ঞতার কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন :—

> চৈতন্য-লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার
> তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
> তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা এই বিবরিল
> ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

* * *

শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ-গোস্বামী মাঝে মাঝে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন, ইহাতে রঘুর চিত্ত অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। ফলতঃ উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সাময়িক সাহচর্য্যে তিনি মহাপ্রভু ও স্বরূপের বিরহ জ্বালা সহিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি এমনি নির্ম্মম যে একে একে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কেও জগৎ হইতে সরাইয়া লইলেন। তাঁহাদের বিয়োগে রঘুনাথ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ললাটে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

উদ্দাম নর্ম্মরসকেলি বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধা-মুকুন্দ যুগলং ললিতা বিশখে।
গৌরাঙ্গ চন্দ্র মিহরূপযুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট ॥

হায়! পরিহাস-রসক্রীড়াশীল রাধা-কৃষ্ণ কোথায়, নর্ম্মসখী ললিতা বিশাখা কোথায়, আমার পরম দয়াল গৌর স্নস্ু-দর কোথায়? হায়! হায়! আমার শেষাশ্রয় সেই রূপ-সনাতনই বা কোথায়, আমার ললাটে কি এত দুঃখ ছিল, আর কত যাতনাই সহ্য করিব? পোড়া কপাল আমার এখনও বিদীর্ণ হইল না!

বৃন্দারণ্য রঘুনাথের নিকট প্রকৃতই অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, দেহবন্ধ শিথিল হইল, সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার অতি প্রিয়তম গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড তাঁহার নিকট বিষবৎ ভাব ধারণ করিল। প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকে এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন :—

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥

হায়! আমার জীবন স্বরূপ শ্রীরূপ বিহনে মহাগোষ্ঠ শূন্য বোধ হইতেছে, গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, এমন কি রাধাকুণ্ডও ব্যাঘ্র-তুণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

ন পততি যদি দেহ স্তেন কিং তস্য দোষঃ,
স কিল কুলিশ সারৈঃ যদ্ বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতু গাঢ় তর্কেন দৃষ্টঃ
প্রকট রুদন ভারং কোবহত্বন্যথা বা।

এখনও যে এই দেহ পাত হইতেছে না, তাহাতে তাহারই বা দোষ কি? বিধাতা যে এ দেহকে বজ্রসারে নির্ম্মিত করিয়াছেন। অথবা আমি ভাবিয়া দেখিলাম—আমি মরিলে এ দুঃখভার আর কে বহন করিবে?

প্রকৃত পক্ষে প্রিয়জনের বিরহে অতি সম্ভোগ্য প্রিয়বস্তুসমূহও বিষবৎ বোধ হয়, কেন না এই সকল পদার্থ সন্দর্শনে শোকের আগুণ অধিকতর রূপে জলিয়া উঠে, এই জ্বালায়ই এই প্রকার হৃদয়বিদারক বিলাপ-ধ্বনি স্বতঃই উত্থিত হয়! এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যাঁহার হৃদয় হইতে মায়া-মমতার বীজ এখনও লুপ্ত হয় নাই, পরন্তু তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত রহিয়াছে, তিনি যত বড়ই সাধক হউন না কেন সিদ্ধি হইতে বহু দূরে। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, জ্ঞানের সাধনায় বিচারের পথে অনাত্মীয় বোধে সকলকে দূরে সরাইতে হয়, কিন্তু ভক্তির সাধনায় স্বভাবসুলভ এই কোমল-বৃত্তিগুলির সুষ্ঠুভাবে স্ফুরণ করিয়া তোলাই হইতেছে সাধকের পূর্ণতার লক্ষণ। অবশ্য প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত মায়া-মোহে তাঁহারা মুগ্ধ হইবেন না, কিন্তু ইহাকে অবলম্বন করিয়াই অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হইবেন এই মাত্র; এই হিসাবে ভক্তি-সাধক বিরক্ত নহেন আসক্ত, ত্যাগী নহেন—প্রেমিক!

তাই—যিনি অবলীলাক্রমে পিতা-মাতার স্নেহ ও প্রণয়িনীর কোমল বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া কঠোর বৈরাগ্যের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, সেই দাস গোস্বামীর জীবনেও দেখি পারমার্থিক আত্মীয়বর্গের অকাল বিয়োগে উচ্ছ্বসিত শোক-প্রবাহের কি উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গী! ভক্তিরত্নাকরকার লিখিয়াছেন—

কোথা শ্রীস্বরূপ রূপ-সনাতন বলি।
ভাসয়ে নেত্রজলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥
অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥

পদকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ সনাতন যবে হইল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥

নীলাচলে গমনের পর হইতেই রঘুনাথ রসনা জয় করিয়াছিলেন, ক্ষুধা জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার আহার ছিল না বলিলেই হয়। শ্রীগৌরাঙ্গবিরহের পর হইতেই তিনি অন্ন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুই তিন পল মাঠা ও ফল ভক্ষণ করিয়া দেহ ধারণ করিতেন, সনাতন গোস্বামীর বিয়োগে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন, কেবল একটু জলপান করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরূপের বিচ্ছেদে জলটুকুও ত্যাগ করিলেন। যথা—

রাধা কৃষ্ণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
সুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে
রাধা কৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥

এই রূপে কি প্রকারে দেহ রক্ষা পায়, বর্ত্তমান Physiology তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইলেও এরূপ ঘটনায় অবিশ্বাসের হেতু নাই। পঞ্জাবের হরিদাস সাধু নয় মাস কাল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত থাকিয়াও সজীব ছিলেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। অধুনা ভারতীয় যোগতত্ত্বের দিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি পড়িতেছে। Psycho-Physiology নামধেয় বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই সকল রহস্য ব্যাখ্যার পথ ক্রমেই প্রসরতর হইবে, এখন এরূপ আশা করা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না।

যাহা হউক এই প্রকার অনাহারে থাকিতে থাকিতে রঘুনাথের শরীর এতই শুষ্ক নীরস হইয়া পড়িয়াছিল যে, যেন তাহা বাতাসে হেলিয়া পড়িত; তথাপি তাঁহার ভজন-নিয়মের অন্যথা হইত না। চৈতন্য চরিতামৃত তাঁহার তদানীন্তন ভজন প্রণালী সম্বন্ধে যে কয়েক ছত্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা রঘুনাথের ভজন নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার প্রস্ফুট পরিচয় পাই। যথা—

সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহা প্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন-মান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা—সেহো নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধন রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত রঘুনাথের এই সাধন রীতির বিস্তার নিষ্প্রয়োজন. সুধী পাঠক—নিবিষ্ট চিত্তে ধীর ভাবে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন ইহাই অনুরোধ।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ১॥ ঘণ্টা অবসর গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ২২॥ ঘণ্টা কাল সাধন-ভজন লইয়া যিনি কাটাইয়া দিতেন, সাধন-জগতে তাঁহার স্থান যে কত উচ্চে তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। সাধন বিষয়ে অদ্বিতীয় না হইলেও রঘুনাথের মত একনিষ্ঠ অহর্নিশ ভজন পরায়ণ সাধক যে একান্ত বিরল তাহা উচ্চ কণ্ঠেই বলিতে পারি। বস্তুতঃ ইহ জগতে রঘুনাথের মত একাধারে ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, ও সাধন সম্পদ্ সম্পন্ন মহাপুরুষের খুব কমই আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তিনি যে কিরূপ ধনী গৃহস্থের সন্তান ছিলেন তাহা বোধ হয় আর প্রকাশ না করিলেও চলে, তদুপর তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও অভাব ছিল না। বাল্য জীবনে তাঁহার বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও

শেষ জীবনে তাঁহার লেখনী নিঃসৃত শ্রীদানচরিত, শ্রীমুক্তাচরিত ও স্তবমালা প্রভৃতি পূত গ্রন্থাবলীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই স্তবমালা উনত্রিংশ উৎকৃষ্ট স্তবের সমাবেশ। এই স্তবমালা ভক্ত জনের কণ্ঠহার। মণি-মুক্তার মোহন মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাধক ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনদ্যুতিমতী এই অত্যুজ্জল স্তবমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। কাজেই কি ধনী—কি পণ্ডিত সর্ব্ব শ্রেণীর সাধকের পক্ষেই যে রঘুনাথের চরিত্র আদর্শস্বরূপ তাহা বলাই বাহুল্য।

রাধাকুণ্ড তীরে বসিয়া শেষ জীবন শুধু তিনি প্রেম-ভক্তির সাধন লইয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ মানস-সেবায় তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। এইরূপ নিয়মিত সাধন-ভজনের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার নিত্য স্বরূপাবস্থানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, ক্রমে দেহ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িল, তখন—

রাধাকুণ্ড তটে পড়ি　　সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি
　মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে,　　নেত্রে প্রেম-অশ্রু পড়ে
　রাধা পদ করয়ে স্মরণ॥

পুণ্যশ্লোক রঘুনাথ এই প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত দেহে ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন, ইহাই প্রামাণিকদিগের মত। কিন্তু ঠিক কোন্ সালে অথবা কত শকাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কাজেই সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রচার করাও অসম্ভব!

যাহা হউক শ্রীমদ্ রঘুনাথ মহাজনরূপে সাধন পথে যে পদাঙ্কপাত করিয়া গিয়াছেন, সাধক মাত্রেরই তাহা অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা কিছু না করিয়াই মস্ত কিছু পাইবার জন্য ব্যগ্র, অথবা সদ্গুরু লাভ হইয়াছে বলিয়া আর কিছু করিতে হইবে না এই বোধে যাঁহারা সাধারণের অপেক্ষাও অধিকতররূপে সংসারাসক্ত, তাঁহাদিগকে রঘুনাথের ভজন নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পাইয়াও—দীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াও তিনি কোন দিন সাধন-ভজন ত্যাগ করেন নাই, অথবা মহা প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতকৃতার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছি বলিয়া বেশী করিয়া প্রাকৃত জগতের মোহে আবিষ্ট হইয়া পড়েন নাই। যে কোন দিক দিয়া ধরিতে গেলে রঘুনাথের জীবন যে একটী নিষ্কলুষ আদর্শ জীবন, তাহা অবিসম্বাদিতরূপেই বলা যাইতে পারে। ভজন প্রণালী না হইলেও রঘুনাথের ভজন নিষ্ঠা যে সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ান্তর্গত জনগণের অনুকরণীয় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। সাধনের তীব্রতা ও কঠোরতা বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়।

অনেক দিন হইল রঘুনাথ জড় জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধন নিষ্ঠা তাঁহাকে সাধক-জগতে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

(সমাপ্ত)

মধ্য-বিবেকী বা জীবন্মুক্ত

একটা প্রশ্ন প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে বিবেক জ্ঞান হইবামাত্র জীবন্মুক্তের শরীর পাত হয় না কেন? ইহার উত্তর চক্র-ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ চক্র ভ্রমণের ন্যায় পূর্ব্ব সংস্কারের লেশ থাকায় জীবন্মুক্তের শরীর কিছুকাল থাকে, বিবেকজ্ঞানের উদয় মাত্রই শরীরের পতন হয় না। বিবেকজ্ঞান আবির্ভূত হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের জন্ম-আয়ু ও ভোগরূপ ফল প্রদান করিবার শক্তি থাকে। কুম্ভকারের ব্যাপার না থাকিলেও বেগাখ্য সংস্কার বশতঃ যেমন কুলালচক্রের ভ্রমি থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার বিনিবৃত্তি হইলেও কিছুকাল বিবেকীও জীবিত থাকেন। এই বিবেকীদিগের দ্বারাই জগৎ জ্ঞানের আলো পাইয়া থাকে—তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগকেই শাস্ত্রে মধ্য-বিবেকী বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্তেরা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের দরুণ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহা না হইলে বদ্ধজীব মুক্তির সন্ধান পাইবে কাহার কাছে? জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণই লোকগুরু। যুগে যুগে তাঁহাদের নিকট হইতেই জ্ঞানের আলো পাইয়া বহু মানব জীবন ধন্য করিতে পারিয়াছে।

সম্পূর্ণ বিবেকী বা সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য বা বিদেহ-মুক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরাদি থাকে না,—সুতরাং তাঁহাদিগকে দিয়া জগতের কোন স্থূল উপকার সাধিত হয় না। তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের প্রারব্ধও নিঃশেষ হইয়া যায়—এইজন্যই জগতে আর তাঁহাদের কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যাঁহাদের প্রারব্ধের সংস্কার প্রবল—তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরও তাঁহাদের জীবন-চক্র কিছুকালের দরুণ ভ্রমণ করিতে থাকে। এই যে ভ্রমণ, ইহাতে তাঁহাদের নূতন কর্ম্মাশয় সৃষ্ট হয় না। বেগাখ্য সংস্কার নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহারাও বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মহা-পুরুষদের প্রারব্ধটাই জগদ্ধিতের মূল নিদান। প্রারব্ধ থাকে বলিয়াই আমরা বুদ্ধ—শঙ্কর—গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষদের অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করি। জগৎকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত করিবার দরুণ, স্বেচ্ছায়ই যেন সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগ করিবার দরুণ মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের প্রারব্ধ ভোগের দরুণ জগদুদ্ধার হইয়া যায়।

সম্পূর্ণ বিবেকী আর সম্পূর্ণ অবিবেকীর দ্বারা জগৎ হিত হয় না। সম্পূর্ণ বিবেকীর তো তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই আর দেহ থাকে না। আর সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, সে আবার অপরকে উপদেশ দিবে কি? অজ্ঞেরা যদি উপদেশক হয়, তাহা হইলে তাহাদের উপদেশে উপদেশ্য শিষ্যগণও অবিবেকী হইবে। অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না—কারণ সে নিজেই অন্ধ। সুতরাং মধ্য-বিবেকী বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরাই—প্রকৃত উপদেষ্টা। জগৎ জ্ঞানের আলো পাইয়া থাকে, তাঁহাদের কাছ হইতেই।

তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞান সংস্কারকে দগ্ধ করিলেও তাহা দগ্ধবীজের ন্যায় আভাসভাবে অবস্থিতি করে। এক-মাত্র শরীর পাতেই তাহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়—আর তখনই বিদেহ-কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ হইয়া

থাকে। সংস্কারের আভাসটুকুও যদি নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন আর তাঁহাদের দেহ-ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। সম্পূর্ণ বিবেকীর চিত্তে সংস্কারের এই আভাসটুকুও থাকে না—এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের দেহের অবসান হয়। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের প্রারব্ধ ভোগের সময়ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অসদ্ভাব হয় না। একবার যাঁহাদের তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে—কোন প্রতিবন্ধক আসিয়াই তাঁহাদিগকে সেই জ্ঞানভূমি হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। সাধারণ মানব প্রারব্ধও ভোগ করে, আবার নূতন করিয়া পরজন্মের দরুণ প্রারব্ধের সৃষ্টিও করে; কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের আর নূতন করিয়া কর্ম্মাশয়ের সৃষ্টি হয় না। বেগাখ্য সংস্কার দ্বারাই তাঁহাদের জীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। মহাপুরুষদের জীবনকে কুলালচক্রের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে; কুলালচক্র কিন্তু নিজে অন্ধ, মহা-পুরুষগণ সেইরূপ নহেন। তাঁহারা সচেতন ভাবেই প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন। সকল সময় তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রদীপ সমভাবে উজ্জ্বল থাকে বলিয়াই জ্ঞানী যদিও প্রারব্ধ ভোগ করেন, তথাপি তাঁহারা ভোগের জ্বালায় অধৈর্য্য বা অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না। পরমহংসদেব কেন্‌সার রোগেও ভুগিতেছেন, আবার এই অবস্থাতেই অসংখ্য মানবকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশও প্রদান করিতেছেন। সাধারণ মানবের পক্ষে কি ইহা সম্ভবপর? কখন কখন জ্ঞানিগণের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া আমরা তাঁহাদের মহাপুরুষত্বের প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া থাকি, কিন্তু জ্ঞানি-দিগের বিষয়ানুরাগ কখনই মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না।

পঞ্চদশীতেও আছে—"জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া দৃঢ়তর হইলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই জ্ঞান আর নিবারিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রে সাধক অপরিসীম আনন্দ লাভ করেন এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।" ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় না। সাধারণ মানব আর মহাপুরুষগণের মাঝে পার্থক্য হইল—এই তত্ত্বজ্ঞান লইয়া। জ্ঞান হইয়া গেলে ভোগ দ্বারা জ্ঞানী কখনো বদ্ধ হন না। প্রারব্ধ-ভোগান্তে যে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইবে, জ্ঞানীর এই বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই

অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধ কর্ম্মের কেহই প্রতিকার করিতে সক্ষম হয় না—সকল ব্যক্তিকেই অবশ্য প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যদি যোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতিকারের উপায় বা সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতি দুঃখে পতিত হইতেন না। এখন সাধারণের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ঈশ্বর যদি অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ খণ্ডন করিতে না পারেন, তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের মাহাত্ম্য রহিল কি? এই কথার সিদ্ধান্ত পঞ্চদশীতে বেশ সুন্দর ভাবে করা হইয়াছে—"ঈশ্বর যে এই অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ খণ্ডন করিতে সমর্থ হন না, তাহাতে ঈশ্বরত্বের কোন হানি হয় না। যেহেতু ঈশ্বরই প্রারব্ধ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিত্ব গুণ প্রদান করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি তাহার অন্যথা করিতে না পারিলেও তাঁহার মাহাত্ম্যের হ্রাস হয় না।" কথা হইল এই যে, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াও যদি আত্মজ্ঞান বিন্দুমাত্র প্রতিহত না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাওয়াই তো শ্রেয়ঃ। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাদিগের আত্মতত্ত্ব-পরিবিজ্ঞানের অন্যথা হয় না কখনও। "যে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক পদার্থের স্বরূপ পরিজ্ঞাত আছে অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক

ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে যে ব্যক্তি সেই ব্যাপারকে অলীক বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তিও ঐন্দ্রজালিক পদার্থ দর্শন করিয়া কেবল আমোদ অনুভব করে, অতএব প্রারব্ধ কর্ম্ম বিভিন্ন বিষয় প্রযুক্ত আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হন না।" সাধারণ জীবে আর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষে এই জায়গাতেই রাত-দিন পার্থক্য। তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত না হওয়ায় সাধারণ জীব প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগে অন্ধ হইয়া কাল-যাপন করে। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানীই প্রারব্ধ ভোগের জ্বালায় অস্থির হন না। তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়ও এই নির্ব্বিকার, অচল-অটল ভাব দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। গীতাতে আছে—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই এই অবস্থা আসে। তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে যাঁহার সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে ভোগটুকু ভুগিতে হয় তাহা তাঁহাদের নিকট অতীব তুচ্ছ বলিয়াই প্রতীয়-মান হয়।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ লোক-শিক্ষার দরুণই প্রারব্ধ স্বীকার করেন। কেন না দেহধারী না হইলে লোককে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। দেহধারণ করিতে হইলেই কোন না কোন বাসনা থাকা চাই-ই। বাসনার মাঝে অবশ্য পার্থক্য থাকে। বাসনাও দ্বিবিধ—শুদ্ধ বাসনা আর মলিন বাসনা। মহাপুরুষগণ এই শুদ্ধ বাসনা অবলম্বনেই দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইজন্যই লোক-শিক্ষায় বা জগদ্ধিতের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবামাত্রই তাঁহারা বিদেহ-কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জগতের দুঃখ দেখিয়া মহাপুরুষদের প্রাণ এইভাবেই বিচলিত হইয়া উঠে—আর এইজন্যই নির্ব্বাণমুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা জীব উদ্ধারার্থ জগতে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা নিজে মুক্ত—তাঁহারাই অপরের জীবনের ভার স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারেন। নিজের ভারে নিজেই যে অবনত, সে আবার অপরের হিত করিবে কেমন করিয়া? আত্মমুক্তি বা আত্মজ্ঞান না হইলে জগদ্ধিতের বাসনা করাও অন্যায়। অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? নিজে যে মুক্তির সন্ধান পায় নাই, সে আবার অপরকে মুক্তির পথ বলিয়া দিবে কেমন করিয়া? সাধারণ মানবই আজকাল মধ্য-বিবেকীর স্থান অবলম্বন করিয়া জগদ্গুরু সাজিয়া বসিতে চান। এই জগদ্গুরুর গুরুতর চাপে শিষ্যের উদ্ধার না হইয়া প্রাণান্তই হইয়া থাকে। প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রারব্ধ ভোগের দুঃখে যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান স্তিমিত হইয়া আসে, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আখ্যা দেওয়া চলে না। মধ্য বিবেকী বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে জগতের যে কি শোচনীয় পরিণাম হইত তাহা আর বলিবার নয়। মধ্য-বিবেকীরা কত বড় ত্যাগী—নির্ব্বাণ বা ব্রহ্ম-পদের আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ করিয়াও জীব-কল্যাণের দরুণ তাঁহারা অশেষ দুঃখ-যাতনা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লন।

শুদ্ধ বাসনা আর মলিন বাসনা যাহাই হউক, যে বাসনাই থাকুক না কেন তাহাতেই শরীর থাকে। মহাপুরুষগণ এই শুদ্ধ-বাসনা অবলম্বন করিয়াই জগদ্ধিতার্থে কাল অতিবাহিত করেন। জগতের প্রয়োজনটাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ আধারে তীব্রভাবে অনুভূত হয়—আর সেই জন্যই সুখ-দুঃখ-লাঞ্ছনা এমন করিয়া তাঁহাবা বরণ করিয়া লন। আমাদের অশেষ ভাগ্য যে আমরা মধ্য-বিবেকী বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের আবার ফিরিয়া পাই। তাহা না

হইলে অন্ধ পথভ্রষ্ট মানবকে সত্যের বিমল জ্যোতিকে প্রদর্শন করাইতেন? সম্পূর্ণ কৃতকৃত্যের তো নাগাল পাওয়াই যায় না, সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে সে তো নিজেই অন্ধ—মধ্য-বিবেকীই তো একমাত্র পথ-প্রদর্শক। তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ভুত হইলেও—জীবহিতার্থে তাঁহারা প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন—কিছু না করিলেও যথার্থ মহাপুরুষদের অবস্থিতিতেই অনেক কাজ করে। জগতের উর্দ্ধে উঠিয়া যাঁহারা সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ওপারের বার্ত্তা পাই বলিয়াই তো আমাদের প্রাণ অসত্যের পথ হইতে সত্যের পথে উন্নীত হয়—সত্য লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রাণে জাগে। যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, তিনি আমাদের জীবনের আদর্শ নন, যাঁহাকে আমরা ধরিতে-ছুঁইতে পাই, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী অথচ জগদ্ধিতার্থে স্বেচ্ছায় প্রারব্ধ স্বীকার করিয়াছেন, সেই মধ্য-বিবেকী বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই আমাদের জীবনের আদর্শ। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণই জগদ্গুরু!

—×—

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তবে কী এ তাঁরই আঁখিজল? এ ঝির ঝির বৃষ্টিকণা কী তাঁরই অশ্রুকণা? তাহলে কী সত্যই আজ তিনি দূর দূরান্তরে বসে তাঁরই স্নেহের সন্তানগণের জন্য ঝিরঝির করে চোখের জল ফেল্‌ছেন? কে আমার এ রহস্য উদ্ঘাটন করে দিবে? কে আমার এ সংশয় অপনোদন করে দিবে?.........

আজ যে আমরা কেমন বিপদে পড়েছি, তা একমাত্র অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেবই জানেন। আমরা এরূপ বিষম বিপদে পড়ে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। সকলে এক জায়গায় জড় হয়ে কী করা যায় মন্তব্য স্থির করতে লাগলাম। রাত তখনও বেশী হয় নি। শুক্লা চতুর্থী হলেও আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন তথা অল্প অল্প বারিপাত হওয়ায় অন্ধকার এমন জমাট বেঁধে গেছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, আপনা আপনিই হৃদয় কেঁপে উঠতে লাগলো। ঘোর বিপদের সময় প্রথমে হৃদয় আপনা আপনিই কেঁপে উঠে তথা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যুই যখন স্থির হয়ে যায়, তখন আপনা আপনিই জানি না কার ইঙ্গিতে হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার হতে থাকে। আমরা খানিকক্ষণ পরে স্থির করলাম প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাঁধে হাত দিয়ে, যেমন ভাবে অন্ধলোক চলে, তেমনি ভাবে পা টিপে টিপে চল্‌ব—তা ছাড়া ত এখানে থাক্‌বারও কোন উপায় নাই! অন্য দিকে ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। অগত্যা একজনের পিছে আর একজন দাঁড়িয়ে সামনের লোকের কাঁধ ধরে চল্‌বার তালে তালে "জয়গুরু" "জয়গুরু" এই সর্ব্ববিপদ-হন্তা একমাত্র শান্তিপ্রদ মহামন্ত্র জপ করতে করতে চলতে লাগলাম। সকলের সামনে আমি ছিলাম। দু'হাতে দুটী লাঠি ধরে পা টিপে টিপে চলেছি—সামনে কোন খাই, গাছ-পালা, গর্ত্ত আছে কি না! এ দিকে মাঝে

মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়ে তাঁর করুণার কথা আপনা আপনিই হৃদয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল। প্রত্যেকেই ডান হাতে সামনের লোকের কাঁধ ধরেছে এবং বাম হাতে লাঠি ধরে পা টিপে টিপে চলেছে। সন্দেহ হলে বা মাঝে মাঝে আবার দেয়াশলাই জ্বালিয়ে খানিকটা পথ দেখে নিচ্ছি। হরিদাস ভায়া তথা সারদা ভায়ার কাছে সবসময়ই দেয়াশেলাই থাক্‌তো। কারণ তারা মাঝে মাঝে ধূমপান কর্‌তে ভুল্‌তো না। এইভাবে ধীরে ধীরে চলে রাত্রি ৯টার পর **মণ্ডল** চটী এসে পৌছি। পাঙ্গরবাসা হতে মণ্ডল চটী সোয়া তিন মাইল। সমস্ত পথটাই ঘোর বন-জঙ্গলে আবৃত তথা উৎকট উৎরাই। চটীতে পৌছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম তথা পরম মঙ্গলময় পরম পিতাস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের তরুণ অরুণ ভাতি শ্রীশ্রীচরণ-কমলে কত যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর্‌তে লাগলাম তা একমাত্র জানি আমরা, আর জানেন যাঁকে জানিয়েছি—তিনি।

মণ্ডল চটী
৩। মাইল

আমরা আশা করেছিলাম, যখন আমাদের আস্‌তে দেরী হচ্ছে, তখন বোধ হয় চিদানন্দ দাদা ও ছোট মা আমাদের জন্য পাক করে রাখবেন। রোজই প্রায় এইরূপ হত, যিনি আগে যেয়ে চটীতে পৌছতেন, তিনি পাক কর্‌তে আরম্ভ করে দিতেন; তন্মধ্যে আমার পালাই বেশী পড়ত। কিন্তু আশ্চর্য্য যে এঁরা আমাদের জন্য পাক ত করেনই নাই, অধিকন্তু মণিরামকে লণ্ঠন দিয়ে যে এগুতে পাঠিয়ে দিবেন, তাও পাঠান নি। অনেক দিন এমন হয়েছে আমরা আগে চটীতে পৌছে যাবার পর যদি দেখতে পেতাম রাত হয়েছে, তখন লণ্ঠন নিয়ে যারা আসে নি, তাদের জন্য এক মাইল দুই মাইল এগুতে চলে যেতাম। * * *

জর হলে কী হবে? —ক্ষুধায় আকুল ছিলাম; সুতরাং তখনই পাক কর্‌তে লেগে গেলাম। খেয়ে দেয়ে ঘুমুতে রাত ১২টা বেজে গেল। শরীরিক অসুস্থতার সঙ্গে আজ অত্যধিক পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম। তাই সঠিক বল্‌তে পারবো না, কম্বলটী ভাল করে পেতে নিয়েছিলাম কি না? —এমনি ভাবে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম! আজ সমস্ত দিনে তের মাইল পথ হাঁটা হয়েছে।

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই সোমবার—মণ্ডল চটী অতি সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন চটী। এখানে ১০।১২ খানা বড় বড় ঘর, তথা পার্ব্বত্য মিঠাইয়ের দোকান আছে। তিন চারিটী ঝরণা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার জন্য তথা নির্ম্মল সুস্বাদু জল দান করে যাত্রীদের আনন্দ দান করার জন্য যেন চটীর ভিতর দিয়ে কলকল শব্দে 'জয়' 'জয়' বলে উলুধ্বনী দিতে দিতে চলেছে। আবার চটীর পার্শ্বে **রুদ্রগঙ্গা** নাম্নী একটী নদী না জানি কার বিরহে পাগলিনীর মত উৎকণ্ঠিত ভাবে ছুটে চলেছে। রুদ্রগঙ্গার অন্য নাম **বালখিল্য** বা **বাগমতী** গঙ্গা। নদীর তটে ভীমের মন্দির তথা ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। স্থানটী সমতল। একটি বড় অশ্বত্থ গাছ তথা কলাগাছে স্থানটীর শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। মোটের উপর জায়গাটী উত্তম। সকালে স্থানটী দেখে খুব আনন্দ হল। এখান হতে চতুর্থ কেদার **রুদ্রনাথে** যেতে হয়। একটী পাকদণ্ডী চড়াই পথে দুই মাইল যাবার পর **অনসূয়া দেবী।** অনসূয়া দেবী **বৈতরণী গঙ্গা** নাম্নী নদীর তটে কব্‌চে নামক পর্ব্বতে বিরাজিত আছেন। উক্ত অনসূয়া দেবী হতে পাকদণ্ডী উৎকট চড়াই পথে বার মাইল চড়াই কর্‌লে চতুর্থ কেদার **রুদ্রনাথ।**

রুদ্রগঙ্গা

অনসূয়া দেবী
২ মাইল

রুদ্রনাথ
১২ মাইল

রুদ্রনাথে যেতে হলে স্থানীয় লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। আমাদের শরীর অসুস্থতার জন্য তথা সঙ্গীয় লোকজন ভোরেই আমাদের না বলে চলে যাওয়ায় আমরা রুদ্রনাথ দর্শন কর্‌তে পারি নাই। রুদ্রনাথ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি এইরূপ :—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়ং বৈ মমালয়ম্।
রুদ্রালয়মিতি খ্যাতং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্॥

ভগবান্ শিব পার্ব্বতীর নিকট বল্‌ছেন—হে দেবি! আমার তৃতীয় (কেদারনাথে শিব নিজে বাস করেন, কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে প্রথম মধ্যমেশ্বর, দ্বিতীয় তুঙ্গেশ্বর [তুঙ্গনাথ], তৃতীয় রুদ্রনাথ হয়, তাই বল্‌ছেন আমার তৃতীয় আলয়) আলয় বর্ণনা কর্‌ছি শুন। সেটী তীর্থের মধ্যে উত্তম তীর্থ, রুদ্রালয় নামে খ্যাত।

যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
রুদ্রালয়ং মহাপুণ্যং নানা তীর্থ বিভূষিতম্॥

মহাপুণ্যদাতা রুদ্রালয় তীর্থ অনেক তীর্থ দ্বারা বিভূষিত। যার মাহাত্ম্য শুন্‌লে মানব সর্ব্ব পাপ হতে মুক্তি লাভ করে—এতে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার, শুধু বাঙ্গালার নয় ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এমন দুর্দ্দশা যে বিষ্ণুর উপাসকগণ, শিবভক্ত দেখলে নানারূপ বিদ্রূপ বাক্যবাণে তাকে অপদস্থ কর্‌তে থাকেন; আবার শিব-ভক্তগণও বিষ্ণু-ভক্তের পাল্টা জবাব দিতে কসুর করেন না। সময় সময় এ-ও দেখতে পাই যে বিষ্ণুভক্তগণ শিবজী ভগবান্‌কে প্রণাম ত করেনই না, এমন কি তাঁর মন্দির দেখলেও ধর্ম্মচ্যুত হবার ভয়ে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে চলে যান। হায় রে আমাদের দুরবস্থা!! এর চেয়ে আর আমাদের কী অধঃপতন হতে পারে!!! এ বিরুদ্ধ ভাব যারা হৃদয়ে পোষণ করে, তাদের যে কী গতি হবে, সে সম্বন্ধে ভগবান্ শিব পার্ব্বতীর নিকট বল্‌ছেন :—

গতিস্তেষাং ন বৈ দেবি তথা কল্পশতৈরপি।
যে মযি শ্রীবাসুদেবে ভেদবুদ্ধি ধরাঃ প্রিয়ে॥

হে দেবি! যে ব্যক্তি আমার ও বাসুদেবের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি (জ্ঞান) পোষণ করে, তার গতি (মুক্তি) শতবর্ষ পর্য্যন্তও হবে না।

শিব এবং বিষ্ণুতে ভেদবুদ্ধি করা কখনও উচিত নয়। যথা :—

তস্মান্মম চ বিষ্ণোশ্চ ভেদবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।
যত্রাহং সংস্থিতো দেবি তত্র বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥
যত্র বিষ্ণু স্তত্র শিবো বর্ত্ততে নিত্যমেব হি।
বিষ্ণোর্ভক্তাশ্চ যে দেবি মম ভক্তা ন সংশয়ঃ॥
মম ভক্তাস্তু যে সন্তি তে বিষ্ণোর্নৈব সংশয়ঃ।
বিষ্ণোর্ভক্তেন দেবেশি বেদ্যোঽহং বিষ্ণুরেব হি॥
মম ভক্তেন বিষ্ণুর্বৈ শিবো বেদ্যো ন সংশয়ঃ।
দ্বেষ বুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যা কুর্ব্বংস্তু শিবহা ভবেৎ॥

হে দেবি! সেইজন্য আমাতে ও বিষ্ণুতে ভেদবুদ্ধি করিবে না—যেখানে আমি আছি, সেখানে সনাতন বিষ্ণুও বিরাজিত আছেন। আবার যেখানে সনাতন বিষ্ণু বিরাজিত আছেন, সেখানে সদাশিবও নিত্য-নিবাস করে থাকেন। এইজন্য আমাতে ও বিষ্ণুতে ভেদবুদ্ধি করা উচিত নয়। আবার যে ব্যক্তি আমার ভক্ত সে বিষ্ণুভক্ত, এতেও কোন সংশয় নাই। হে দেবি! বিষ্ণুর ভক্ত আমাকে বিষ্ণুই দেখেন, আবার আমার ভক্ত বিষ্ণুকে শিব বলেই জানেন—এতেও সংশয় নাই। ভক্তদের দ্বেষবুদ্ধি করা উচিত নয়। ভেদবুদ্ধিকারী শিবের মৃত্যুকারী হয়।

স বৈ ধন্যোঽভেদবুদ্ধির্নর এব ন সংশয়ঃ।
তত্রাপি যে রুদ্রগৃহে গচ্ছন্তি ভক্তি তৎপরাঃ॥
জরা মরণ জন্মাদের্ব্বাধ্যন্তে নৈব মানবাঃ।
সর্ব্ব তীর্থ ময়ং স্থানং যত্রাহং সংস্থিতঃ পুমান্॥

যে মানবে ভেদবুদ্ধি নাই, তিনিই ধন্য। তন্মধ্যে যে মানব ভক্তিতে তৎপর হয়ে রুদ্রালয়ে গমন করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধি হতে মুক্ত হয়ে যান। যেখানে আমি পুরুষরূপে অবস্থিত থাকি, সেস্থান সর্ব্বদা তীর্থময় হয়ে যায়।

যস্ত তীর্থস্ত দেবেশি দর্শনাদেব পাতকম্।
শত জন্মার্জ্জিতং গচ্ছেৎ সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥
তত্র মাং বিধিবৎ পূজ্য গন্ধ পুষ্পাদিকৈঃ পুমান্।
ইহ ভোগান্ বরান্ প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে॥

হে দেবি! যে তীর্থের দর্শন মাত্রেই শতজন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যায়—সেইস্থানে যে মানব আমার বিধিপূর্ব্বক পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন, তিনি ইহ-লোকের ভোগ্যবস্তু ভোগ করতঃ অন্তে শিবলোকে গমন করে থাকেন। —এতে সন্দেহ নাই।

শৃণু দেবি বরারোহে তীর্থানি মম পার্ব্বতি।
তত্র বৈতরণী শ্রেষ্ঠা পিতৃণাং তারিণী সরিৎ॥
যত্র পিণ্ড প্রদানেন গয়াকোটি ফলং লভেৎ॥

হে দেবি! তথায় পিতৃপুরুষদের মুক্তি দান কর্‌তে সমর্থা **বৈতরণী** নাম্নী একটী নদী আছে। যেখানে পিণ্ডদান কর্‌লে গয়া হতেও কোটিগুণ ফল লাভ হয়ে থাকে। কে জানে এ বৈতরণী সেই বৈতরণী কি না, যার চিন্তায় আমরা ভয়-ভীত হয়ে ধর্ম্মকাজে ব্রতী হয়ে থাকি, তথা বৈতরণী পার হবার আশায় গুরু-পুরোহিত দ্বারা নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় কার্য্যাদি করে থাকি। কে এর রহস্ত উদ্ঘাটন কর্‌বে?

বৈতরণী নদী

রম্যং শিবমুখং তত্র সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
এতস্ত দর্শনাদেব মুক্তোভবতি মানবঃ॥

তথায় নানাপ্রকার আভরণে ভূষিত রম্য শিব-মুখ দর্শন কর্‌লে মানব মুক্ত হয়ে যায়।

গোত্রহত্যা দোষদুষ্ট পাণ্ডবগণ গোত্রহত্যা দোষ হতে মুক্তির জন্য নানা তীর্থ ভ্রমণ করতঃ আমায় (শিব) অনেক স্থানে অনুসন্ধানের পর কেদারনাথে আমার দর্শন পান। তাঁদের দেখে আমিও তাঁদের নিকট যেয়ে উপনীত হই। তাঁরা আমার নিকট আস্‌তে থাকায় আমায় স্পর্শ কর্‌তে না পারে এইজন্ত তাঁদের দেখে আমি তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে প্রবেশ কর্‌তে থাকি। তখন তাড়াতাড়ি তাঁরা এসে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করায়, তাঁরা গোত্র-হত্যা দোষ হতে মুক্তিলাভ করেন। সেখানে (কেদারনাথে) সেই পৃষ্ঠদেশ আজ পর্য্যন্তও স্থিত আছে। যথা:—

কেদারে সংজ্ঞকে দেবি পস্পর্শুঃ পৃষ্ঠকং শুভম্।
স্পর্শ মাত্রেণ তে সর্ব্বে বিমুক্তা গোত্রহত্যয়া॥
পৃষ্ঠভাগং তে তত্রৈব স্থিত মদ্যাপি পার্ব্বতি॥

ত্রিলোকের মুক্তিদাতারূপে তিনি কেদারেশ নামে বিখ্যাত হন। হে দেবি! অধোমার্গে (নীচের দিকে) আমার মুখ মহালয়ে স্থিত আছে। যথা—

কেদারেশ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মুক্তিদঃ।
অধোমার্গেণ দেবেশি মন্মুখং তু মহালয়ে॥

মুক্তিকামী যে সব লোক এখানে এসে আমায় দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে জ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে থাকেন। সে সব মানব অন্তে আমার শরীরেই লীন হয়ে যা'ন। যথা:—

আগতং মুক্তিদং লোকে যে স্মদ্দর্শন কারিণঃ।
তে মুক্তাঃ সর্ব্ব পাপেভ্যো জ্ঞানকঞ্চুক সংবৃতাঃ॥

মানতলাও (মানস সরোবরের) কথা স্মরণ করে ভগবান্ শিব বল্‌ছেন—

মানসং তীর্থমাখ্যাতং শিবলোক প্রদায়কম্॥

তীর্থের মধ্যে উত্তমের চেয়েও উত্তম তীর্থ মানস, তথায় যারা গমন করেন তারা শিবলোক প্রাপ্ত হন। তিনি আরও বল্‌ছেন—যেখানে ত্রিলোকের দুর্লভ মানস তীর্থ বিরাজিত, অহো! যার জল একবার মাত্র স্পর্শ করতঃ প্রার্থনা কর্‌লে হে দেবি! ক্ষণকাল মাত্র মধ্যে সে মানব সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে দেবতা হয়ে যান। তার পূর্ব্বে "সারস্বত" নামে একটী সরোবর আছে। সেই সরোবরে "মৃকণ্ডু" নামক একটি মৎস্য আছে। ঐ সরোবরের দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজিত, যার দর্শন মাত্রেই মানব সাযুজ্য লাভ করে থাকেন। যথা:—

যস্ত দর্শন মাত্রেণ নরঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

স্কন্দপুরাণে আরও উক্ত আছে উক্ত সারস্বত কুণ্ডের মৃকণ্ডু নামক মৎস্যটি হাজার হাজার বৎসরের

পুরাতন। ঐ সরোবরের জলের ভিতর শিব বিরাজিত আছেন। তাঁর সঙ্গলাভের আশায় ঐ মৎস্য ওখানে বাস করে থাকে। হে দেবি! ঐ মৎস্য মাঘ মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথি সংযুক্ত মঙ্গলবারে ভক্তদের দর্শন দিয়ে থাকেন। যথা :—

মাঘ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশ্যাং ভৌমবারে স মৎস্যকঃ।
চলতে তজ্জলে দেবি! দৃশ্যমানঃ স্বকৈর্জনৈঃ॥

ঐ সরোবরে কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে স্নান করলে জড় (অজ্ঞানী) মানবও বৃহস্পতির সমান হয়ে যায়, এতে সন্দেহ নাই। যথা :—

তস্মিন্ সরোবরে স্নাত্বা কৃষ্ণাং প্রতি চতুর্দ্দশীম্।
জড়োঽপি বাক্‌পতেস্তুল্যঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥

ঐ সরোবরে প্রবাল বর্ণ সদৃশ বর্ণযুক্ত শিব বাস করেন; ঐ শিবকে রুদ্রমন্ত্র দ্বারা পূজা করা উচিত। যথা :—

প্রবালবর্ণবর্ণো হি তত্র লিঙ্গধরো মৃডঃ।
তং পূজয়িত্বা রুদ্রেণ বৃহৎ সাম্নাথবা শিবঃ॥

যে মানব আমার ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য পড়বে বা কাহারও দ্বারা পড়াবে, হে নগনন্দিনি! তিনি শরীর ত্যাগান্তে শিব সাযুজ্য লাভ করে থাকেন এবং যে মানব এ মাহাত্ম্য শুনে, তিনিও অনেক দিন পর্য্যন্ত রুদ্রালয়ে বাস করে থাকেন। যথা :—

মমালয়স্য মাহাত্ম্যং পঠন্তি পাঠয়ন্তি চ যঃ।
শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি দেহান্তে নগনন্দিনি॥
শৃণুয়াচ্চৈব যো মর্ত্ত্যো রুদ্রলোকে বসেচ্চিরম্॥

*　　*　　*

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বসে বসে ভাবছি, এত জ্বর নিয়ে কেমন করে যাব? রাতে জ্বরে বেশ কষ্ট পেয়েছি; কিন্তু কাল অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ায় এমন গাঢ় ঘুম হয়েছিল যে কষ্টটা তত উপলব্ধি হয় নি। একটা ঘুমেই যে কেমন করে রাতটা কেটে গেছিল তা একমাত্র তিনিই জানেন। আয়ুর্ব্বেদে পড়েছি, সুনিদ্রা—যাতে স্বপ্নের লেশমাত্র নাই, সেইরূপ সুনিদ্রা নির্ব্বিকল্প সমাধির মত আনন্দদায়ক তথা স্বচ্ছতার লক্ষণ। সে যে কত শান্তিদায়ক, কত আরামপ্রদ, কত আনন্দের তা' একমাত্র তারাই বুঝে, যাদের সুনিদ্রা হয়। কাল রাতে সুনিদ্রা হওয়ায় শরীরের গ্লানি একদম কমে গেলেও কিন্তু জ্বর ছাড়ে নি। হরিদাস ভায়া কিন্তু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে না জানি কত আবোল তাবোল ভাবছে—ভায়া এইভাবে না জানি কী ভাবত! আমাদের দুজনের কাকেও কিছু না বলে ধীরে ধীরে সঙ্গীয় প্রায় সকলেই চলে গেলেন, শুধু স্নেহময় চিদানন্দ দা যাবার বেলা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছিস? যেতে পারবি ত'?"

বল্লাম—"ভাল না, জ্বর আছে—এগিয়ে যাও। কিন্তু সাম্‌নের চটীতেই অপেক্ষা করো—যদি বেশী এগুতে না পারি ত'!"

তিনিও চলে যাবার পর হরিদাস ভায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার মতানুসারে দুই ভায়ে ধীরে ধীরে রওনা হ'লাম। মণ্ডল চটী হ'তে বের হয়েই প্রথমে রুদ্রগঙ্গার উপরিস্থিত পুলটী পার হয়ে তার ধার দিয়ে ক্রমে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলাম। পথটী মনোরম! নদীর দুই পার্শ্বের উপত্যকার সমতল ভূমিতে নানাবিধ ফসলের গাছ। গাঢ় সবুজ বর্ণ নূতন গাছগুলি প্রাণে আনন্দ ঢেলে দিতে লাগলো তথা বসন্তের সুমধুর বায়ু-হিল্লোলে প্রাণে নববলের সঞ্চার করে দিল। আমরা অনেক নীচুতে চলে এসেছি, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে এস্থান ২৫০০ ফিট হবে। আমাদের সোনার ভারত এমন সুন্দর জায়গা, যাতে চিরকাল **চিরবসন্ত** ভোগ করা যায়।

চিরবসন্ত

মনে করুন বাঙ্গালায় যখন ঘোর শীত অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাস তখন একদম সমুদ্রের ধারে (যেমন আকিয়াবে, পুরীতে) ঠিক বসন্তকালের মত আবহাওয়া। তথায় সামান্য একটু গরম আরম্ভ হলেই চলে যান দেরাদুনে।

আবার দেরাদুনে গরম আরম্ভ হলেই অর্থাৎ বৈশাখে চলে আসুন এই স্বর্গভূমি হিমালয়ে। এই শান্তি-ভূমি হিমালয় এমন সুন্দর জায়গা এখানে গরমের সময় অর্থাৎ বৈশাখ হ'তে ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত সব সময়ই বসন্ত ভোগ করা যায়। একটু গরম মনে হলেই একটু উপরের দিকে অর্থাৎ বরফান প্রদেশের দিকে চলে যান, আবার শীত মনে হলেই নীচের দিকে দুই চার মাইল চলে এলেই বসন্ত। তথায় বসন্তকালের মত আবহাওয়া মিল্‌বে বটে, কিন্তু বাঙ্গালা বসন্তকালে যেমন ভাবে ফল-ফুলে নূতন আকার ধারণ করে—তা' মিল্‌বে না কিন্তু সেখানে। তবে সেখানকার বসন্তের শোভা যেমন হবার—হবে, তা উপভোগ কর্‌তে পাবেন। হাঁ, আমার কয়েক-জন লঙ্কাদ্বীপস্থ সিংহলী বন্ধুর মুখে শুনেছি—সেখানে চিরবসন্ত, শীত কাকে বলে তা তারা জানে না, তথায় ফল-ফুলে গাছপালাগুলিও নাকি বারমাসই নব সাজে সেজে-গুজে বসে থাকে। সেথায় যে রাবণ রাজার রাজত্ব ছিল! বসন্তরাজ যে তার হুকুমে বারমাসই তথায় সমভাবে বাস করে থাকেন।

আবার যাঁরা বারমাসই শীত ভোগ কর্‌তে চান, তাঁদের ত কথাই নাই! তাঁরা হিমালয়ে থাকলেই বারমাস শীত ভোগ কর্‌তে পারেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে বাঙ্গালায় যখন আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হতে চান (অবশ্য বাঙ্গালা,—রাজপুতানা, সংযুক্ত-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাঠিয়াবার, গুজরাতের মত তীব্র গরম না হলেও) তখন যদি তাঁরা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে চলে যান, তা' হলে জীবনে একটী নূতন যুগ আরম্ভ হয়ে যাবে তাঁদের। বৈশাখ হতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ভূস্বর্গ কাশ্মীরে শোভার কথা শুনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দেব কামাখ্যা হ'তে তথায় উপনীত হয়ে বাকী জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় দেশ!! তাই তার নাম ভূ-স্বর্গ!!!

রুদ্রগঙ্গার পাশ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌তে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে ঝরণার জল নালা করে এনে জমিতে দিচ্ছে—বেশ সুব্যবস্থা বটে। বাঙ্গালা দেশের চাষীরা আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে থাকে। কবে ইন্দ্রদেবের কৃপা হবে, তখন তারা হাল ধরবে। বাংলার উপর ভগবানের নেহাৎ দয়া, তাই প্রতি বৎসর বাংলায় অজস্র পরিমাণে বারি বর্ষণ হয়। অন্য দেশের চাষীরা কিন্তু বাংলার চাষীর মত কুঁড়ে নয় তথা ইন্দ্র দেবের কৃপার জন্য চাতকের মত হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে থাকে না। এমন যে মরুভূমি রাজপুতনা, যেখানে জলের বিশেষ অভাব, তথাকার চাষীরা কূপ হতে দিন রাত জল তুলে সুন্দর চাষ আবাদ কচ্ছে। সে সব দেশে যেখানেই দু'চার দশ বিঘা জমি দেখতে পাওয়া যায়, তথায় নিশ্চয়ই একটী দুটী কূপ আছে। সেই সব কূপ হতে গরু মহিষের সহায়তায় পালানু-সারে দিন রাত জল তুলে তারা জমিতে দেয়; তাই সে দেশের ফসলও বেশ ভাল হয়। সে সব দেশে একদম বৃষ্টি না হলেও তারা তত ক্ষতি মনে করে না—যেমন ভাবে আমরা মনে করে থাকি। আবার হিমালয়ের চাষীরা ত বহুদূর হতে ঝরণার বা নদীর জল নালা করে এনে জমিতে দিয়ে সদাই জমি উর্ব্বরা করে রাখে। মনে হয় বাঙ্গালায় সেই ভাবে চাষ-আবাদ কর্‌লে বাঙ্গালার জমিতে সোনা ফল্‌তে পারে।

(ক্রমশঃ)

ভক্ত-সম্মিলনী

অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন—১৩৩৯

স্থানঃ—পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, খড়কুশমা (মেদিনীপুর)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গত ১১ই পৌষ সোমবার হইতে ১৩ই পৌষ বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে ভক্ত-সম্মিলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন যথানিয়মে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জমিদার, হাকিম, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কেরাণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতে এমন কি সুদূর আসাম ও বিহার উড়িষ্যা প্রদেশ হইতেও ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। সম্মিলিত ভক্ত সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত হইবে। গত বৎসরের অপেক্ষা এবার মহিলা ভক্তদিগের সংখ্যাও অধিক হইয়াছিল।

প্রথম দিবস—শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজকে সভাপতিরূপে আহ্বান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা গীত ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ৯টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল এর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্রের সমর্থনে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ সহকারী সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সভাপতি মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করিয়া একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আত্ম-জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রভাব কি ভাবে অনুভব করিয়াছেন এবং ভক্তগণমধ্যে তাঁহার মাহাত্ম্য কিরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, প্রাঞ্জল ভাষায় সে সমস্ত বর্ণনা করেন। অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু বি, এল মহাশয় স্বয় যথাক্রমে তাঁহাদের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর সহকারী সভাপতির নির্দ্দেশে শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এল, টি, মহাশয় ভক্ত-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ গত বৎসর এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, লিখিত বিবরণ হইতে তাহা পাঠ করেন। অতঃপর আলোচ্য বর্ষে যে সকল গুরুভ্রাতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের গুণপনা ও অলৌকিক মৃত্যু সংবাদ বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল কামনায় নির্দ্দিষ্টকাল নিবিষ্ট চিত্তে "জয়গুরু" মহামন্ত্র জপ করা হয়। অনন্তর তত্ত্বাবধায়িকা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল মহাশয় গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে আগামী বৎসরের জন্য প্রয়োজন মত নূতন সদস্যাদি নির্ব্বাচনান্তে মঠ ও আশ্রমগুলির আয় ব্যয় প্রদর্শিত হইয়া সেবক ও সদস্যগণের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যথাযোগ্য মন্তব্য গৃহীত হওয়ার পর বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস—যথা নিয়মে আরতি, কীর্ত্তন ও স্তোত্র পাঠান্তে বেলা ১০টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভা-আরম্ভের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত একখানা স্নেহাশীর্ব্বাদপূর্ণ চিঠি আসিয়া পৌঁছে এবং তাহা শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ঠাকুরের বাণী সমবেত ভক্তবৃন্দের প্রাণে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া সকলের চিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদনোপযোগী মহা উৎসাহের ভাব সঞ্চার করিয়া দেয়। অতঃপর শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ উক্ত চিঠি অবলম্বনে ঠাকুরের ভাব ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ মহারাজ স্বীয় জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস বি, এল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গাপাধ্যায় এল, টি, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত জানা, শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কি ভাবে তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন এবং ঠাকুরের ভাবধারা ও শিক্ষা কি ভাবে তাঁহাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সবিস্তার বর্ণনা করেন। পরে ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর অভিবাদন ও আলিঙ্গনান্তে বেলা ২টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

এই দিন অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৮—৩০ মিনিট পর্য্যন্ত সমবেত মহিলাবৃন্দের একটী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন, সঙ্ঘ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও ভাব বিনিময় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

তৃতীয় দিবস—বেলা ৩টার সময় আশ্রম প্রাঙ্গণে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গড়বেতার প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মহাশয় সারস্বত মঠের উদ্দেশ্য ও মঠ-আশ্রম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস বি, এল মহাশয় মানব জীবনের উদ্দেশ্য, গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সমূহ শ্রুতি স্মৃতি-ইতিহাস পুরাণের প্রমাণ সহায়ে বিশদ করিয়া মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যাদি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অনন্তর শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ সাধারণ ভাবে উপদেশচ্ছলে বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। অতঃপর সাধারণ পক্ষ হইতে দুই জন সভ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তাদের বক্তব্যের সমর্থন পূর্ব্বক আশ্রম-মঠের উদ্দেশ্যকে অভিনন্দিত করিয়া এক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় সংক্ষিপ্ত ভাবে সারগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেন। অনন্তর সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ স্থূল ভাবে এই সম্মিলনীতে অনুপস্থিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার সূক্ষ্ম প্রেরণা সমবেত ভক্তবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। এই কয়দিন উপস্থিত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সম্মিলনীর সমুদয় ব্যয়ভার সমাগত ভক্তমণ্ডলীই বহন করিয়াছেন। আগামী বর্ষে **জলপাইগুড়ি সারস্বত আশ্রমে** (জোড়পাকড়ী, জলপাইগুড়ি) সম্মিলনীর ১৯শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

—:×:—

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও শাখা আশ্রমগুলির বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব।

(সন ১৩৩৮ পৌষ হইতে ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত)

আয়			ব্যয়		
শ্রীশ্রীগুরুধাম ও আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ		৬৭২৸৵৫	...	...	... ৫৬০৭৷৷/১০
শ্রীশ্রীগুরুধামের	৪০৭৲		শ্রীশ্রীগুরুধামের	৬৮৮৸০	
সারস্বত মঠের	২৭৯।৵০		সারস্বত মঠের		
কৃষি বিভাগের	১৮৪১৵১০		ভরণ পোষণে	৭৩৫।৶/১৫	
প্রচার বিভাগের	৩৩১২৲১০		সেবা-বিভাগে	৩২৮৵৫	
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৬৮৩ /৫		শিক্ষা বিভাগে	৮৬৶/১০	
হাওলাত জমা	২০০৲		প্রচার বিভাগে	১৫৮২৶/১০	
সাধারণের সাহায্য	×		কৃষি বিভাগে	১৯১৬৷৷৵০	
			বিবিধ বিভাগে	৫৭০৵১০	
মধ্য-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		১৬৫৫৵০	...	...	... ৮৫৫৸৵/১৫
আশ্রমের আয়	১১৩৪৸/০				
সাধারণের সাহায্য	৫২০৷৷/০				
উত্তর-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		৬৮০।/১০	...	...	... ৬০৬/১০
আশ্রমের আয়	৫০৮৷৷/১০				
সাধারণের সাহায্য	১৭২৸০				
ঐ জোড়পাকড়ীর শাখা আশ্রম		৩৩১৸/৫	...	...	... ৩০৬৸৫
আশ্রমের আয়	৩০১৷৷৵৫				
সাধারণের সাহায্য	৩০৶/০				
পূর্ব্ব-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		৬৩৮৷৷৶/১৫	...	...	... ৬৮০৷৷১৫
আশ্রমের আয়	৬৩৮৷৷৶/১৫				
সাধারণের সাহায্য	×				
দক্ষিণ-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		৬৮৩।১০	...	...	... ৬১৪৸/০
আশ্রমের আয়	৬৪১।৶/০				
সাধারণের সাহায্য	৪১৸/১০				
পশ্চিম-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম		১০০২৷৷৵/১৫	...	...	... ৯৫৭৲১০
আশ্রমের আয়	৯৪৬৸৵/১৫				
সাধারণের সাহায্য	৫৪৸০				
মোট আয়		১১৭১৬৵০			৯৬২৯৲৫

মন্তব্য ঃ—আলোচ্য বর্ষে সারস্বত মঠ ও তদন্তর্গত শাখা আশ্রমগুলিতে সর্ব্বমোট ৯৬২৯৲৫ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণের সাহায্য ৮২০/১০ বাদে বাকী ৮৮০৮৸৵/১৫ মঠ ও আশ্রমসমূহের আয় হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

অভিনন্দন

[ভক্ত-সম্মিলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী দ্বারা পঠিত]

সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ !

আজ বড় আনন্দের দিন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের প্রতিষ্ঠিত এবং অনুমোদিত আশ্রমের বহু প্রতিনিধি আজ এই দেশ-হিতকর প্রতিষ্ঠানে সমবেত। আপনাদিগকে বাচনিক অভ্যর্থনা জানাইবার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি এখনও নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমা অপেক্ষা প্রবীণতর ও বিজ্ঞতর ব্যক্তির উপর এ গুরুভার ন্যস্ত হইলেই ভাল হইত। কিন্তু যখন এ ভার আপনারা স্বেচ্ছায় আমাকেই বহন করিতে দিয়াছেন, তখন নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়াও আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি এবং অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আমাদের সাদর ও সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইতেছি। আপনাদিগকে একত্র সম্মিলিত হইতে দেখিয়া যে আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। দেবতাকে আমরা 'ইহাগচ্ছ' 'ইহতিষ্ঠ' বলিয়া আহ্বান করি। অতিথিও দেবতা ! সেইজন্য আমিও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি নিজগুণে সকল ক্রুটী মার্জ্জনা করিয়া আপনারা যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে এখানে আসিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইবেন। সকল প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা স্নেহপ্রবণ উদারহৃদয় আপনারা, আপনারাই আমাদের আজিকার মিলনের প্রাণ, আমাদের অবসাদগ্রস্ত দেহ-মনের নবীন জীবনী-শক্তি। আপনাদের আগমনে আজ আমরা ধন্য হইয়াছি। কিন্তু সকল রকমে রিক্ত আমরা, কি দিয়া আপনাদের যোগ্য সমাদর করিব ? আমাদের যে কোন সম্পদ নাই ! আছে একটী মাত্র জিনিষ, আমাদের স্বকৃতজ্ঞ হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধার অতি ক্ষুদ্র অর্ঘ্য। তারই অঞ্জলি আপনাদের চরণতলে আজ রাখিলাম। আপনারা যখন দীন বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা না করিয়া আমাদেরই তুচ্ছ ডাকে এই সুদূরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তখন আমাদের খুবই বিশ্বাস ও ভরসা যে, আপনাদের স্নেহ-করুণা লাভে আমরা বঞ্চিত হইব না। আর বিশ্বাস, আমাদের যা কিছু ক্রুটী, অক্ষমতা ও দৈন্য স্নেহচক্ষে ক্ষমা করিয়া আপনারা সরল মনে সে সব সহিয়া যাইবেন। ওঁ জয়গুরু।

অভিভাষণ

[ভক্ত-সম্মিলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত ভীমাচরণ বসু বি, এল মহাশয় দ্বারা পঠিত]

"নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধ ভার॥"

একদিন এমন ছিল যে, বৃন্দাবনের পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাস বাঁশীর তানে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, এমন কি যমুনার স্রোত উজান বহিত। পরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গমন করিলে বৃন্দাবনের যে অবস্থা হইয়াছিল এবং তথাকার সকলই যেমন বেসুরা বাজিয়াছিল, আজ আমাদের আনন্দ-ঘন বিগ্রহ আমাদের মধ্যে উপস্থিত না থাকায় আশ্রম কর্তৃপক্ষগণের সমস্তই তেমনি অশোভন ও বেসুরা বোধ হইতেছে—আর ভক্তগণের ভাব-যমুনা-স্রোতও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ আর সে হাসি নাই, সে আনন্দ নাই, পুলকের সে বিদ্যুৎ শিহরণ নাই; আছে শুধু মর্ম্মদাহী তপ্তশ্বাস, আর উদ্বেলিত হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস!

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথোমদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া যাঁহাকে আমরা সকলেই অতি ঘনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতা সখা ও বন্ধুরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার শ্রীশ্রীচরণোদ্দেশে প্রণতিপূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীত ভাবে অন্তরের সহিত আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। মঠ ও অন্যান্য বিভাগীয় আশ্রমের তুলনায় এই আশ্রমটী একরূপ আমাদের পরমারাধ্য গুরুমহারাজের বিভাগীয় আশ্রমগুলির মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। সুতরাং মঠ ও অন্যান্য আশ্রমান্তর্গত শিষ্য-ভক্তগণ যাহাতে এই আশ্রমের অধীন শিষ্য-ভক্তগণকে অধ্যাত্ম পথে নিজ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নি জ্ঞানে স্নেহের চক্ষে দেখেন, এই আশ্রমের ভক্তগণ তাঁহাদের নিকট তাহাদের সেই বিনীত দাবী এবং প্রার্থনা জানাইতেছে। আপনারা শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব জ্ঞানগরিষ্ঠ এবং আমাদের অপেক্ষা সকল রকমে বড়। আপনারা আপনাদের এই কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃবৃন্দের সকল দোষ সকল ত্রুটী ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন বলিয়াই আশা করি। আপনারাই এই মহাযজ্ঞের যোগ্য পুরোহিত। আপনারা সকলেই বহুদূর হইতে অনেক অসুবিধা, অনেক ক্লেশ ও অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া আজ বঙ্গদেশের এই শেষ পশ্চিম প্রান্তে সমাগত হইয়াছেন। আপনারা যেরূপ জীবনযাত্রাতে অভ্যস্ত, সেরূপ ভাবে আপনাদের সম্বর্দ্ধনার কোন আয়োজন আমরা

করিতে পারি নাই। আপনারা আপনাদের অভ্যাসানুরূপ পান-ভোজন ও শয্যার পরিবর্ত্তে এই দরিদ্র আশ্রমের উপযুক্ত অতি সাধারণ খাদ্য এবং তৃণশয্যা মাত্র পাইতেছেন। যদিও এই বিভাগে শিষ্য-ভক্ত সংখ্যা অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা অধিক, তথাপি সেই সমস্ত ভক্তের মধ্যে অধিকাংশই অতি দরিদ্র এবং কোনরূপে কায়ক্লেশে কালাতিপাত করিয়া থাকেন মাত্র। সুতরাং তাঁহাদের নিকট কোনরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নাই। এই বিভাগ হইতে মাসিক চাঁদা সামান্য যাহা আদায় হয় এবং ভিক্ষালব্ধ চাউল ও কিঞ্চিৎ অর্থ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সুচারুরূপে আশ্রমের দৈনন্দিন ব্যয় সমূহই নির্ব্বাহিত হয় না! তদুপর এখনও পর্য্যন্ত আসন ঘরটী অভিলষিত মত সম্পূর্ণ হয় নাই এবং জল সরবরাহের জন্য কোন কূপ খনন বা নলকূপ বসাইতে পারা যায় নাই। এইরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ পৃথিবীব্যাপী এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে আপনাদের সুযুক্তি ও সাহচর্য্য পাইবার প্রত্যাশায় আমাদের আশ্রমের স্বার্থের জন্যই এই দূর–দেশে আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনাদিগকে একান্ত আপনার জন বলিয়া ভাবিতে না পারিলে এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় আপনাদিগকে এইরূপ ভাবে নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হইতাম কিনা সন্দেহ। ইহার উপর আর একটী বিশেষ কথা এই যে, আপনারা সকলেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জনকে দেখিতে, স্পর্শ করিতে ও তাঁহার উপদেশপূর্ণ মধুময় বাক্যাবলী শুনিতে পাইবার সুযোগ হইবে ভাবিয়া শত অসু–বিধা ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রাণের টানে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু জানি না কোন্ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অপরাধের জন্য আজ আমরা সে পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম!

* * *

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানের প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত কীর্ত্তিগাথার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না। এই আশ্রমের অনতিদূরে এই মেদিনীপুর জেলার মধ্যে নাড়াজোলের রাজাবাহাদুরের গোপ নামক স্থানে যে প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ স্থানে মহাভারতীয় যুগে বিরাট রাজার উত্তর গো-গৃহ ছিল বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এই আশ্রমের নিকটেই গড়বেতার সর্ব্বজনবিদিতা প্রসিদ্ধা সর্ব্বমঙ্গলা দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন, তদ্ভিন্ন গড়বেতা হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে বগড়ী নামক স্থানে প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণ রায় জীউ ঠাকুর অবস্থিত আছেন। রাস ও দোলের সময়ে উক্ত ঠাকুরের স্থানে দেশ বিদেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। গড়বেতা সহরের নিকটস্থ শীলাবতী নদীতীরে পঞ্চানিয়ার ডাঙ্গায় মহাভারতীয় যুগে বকাসুর নামক অসুরকে ভীম সেন বধ করেন বলিয়া জনশ্রুতি বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। একচক্রা

নগরও (বর্ত্তমানে একড়া নামে অভিহিত) অতি নিকটে অবস্থিত; সেই স্থানে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসের সময়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। স্থানটী বহু প্রাচীন; প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই স্থানে অনেক প্রাচীন কাহিনী ছিল বলিয়া জানা যায়। এই আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও এই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের সহিত এই স্থানের স্মৃতি জড়িত থাকায় এবং কিছু দিন পূর্ব্বে এই স্থানটী পরিত্যক্ত স্থান বলিয়া পতিত থাকিতে দেখিয়াই বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণে এ স্থানে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। এবং তাহারই ফলে তাঁহার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের এই ক্ষুদ্র সূচনা বা পূর্ব্বাভাস!

সাধারণতঃ ভক্ত সম্মিলনীর কয় দিনই ভক্তগণের বড়ই আনন্দের দিন, ঐ দিন ঠাকুর মহারাজকে তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইয়া থাকেন। ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সুযোগ ও সুবিধা অনেকের ঘটিতে পারে। কিন্তু সম্মিলনীর এই বিশেষ দিনে ভক্তভগবানের মধুর মিলন সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য—পূর্ণ আনন্দ লাভের সুযোগ যে আর কুত্রাপি হয় না—তাহা জোর করিয়াই বলিতে পারি, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে আমরা আজ সে সৌভাগ্য ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলাম! ভক্তসম্মিলনীর ইতিহাসে এরূপ দুর্ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু ইহাতেও আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না; তাঁর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, তাঁর অভয় আশীর্ব্বাণী স্মৃতি পথে জাগরূক রাখিয়া তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে আমাদিগকে দৃঢ়চিত্তে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শ্রীমুখ হইতেই আপনারা সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা শুনিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে পূর্ব্বে সুদূর আসাম মঠেই কয়েক বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, কিন্তু তথায় অতি কম সংখ্যক ভক্তই যোগ দিতে পারিতেন বলিয়া, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশেই শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্য ভক্তের সংখ্যা অধিক বলিয়া তিনি বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগে ক্রমশঃ পাঁচটী শাখা আশ্রম স্থাপন করিয়া পর্য্যায় ক্রমে প্রতি বৎসর এক এক আশ্রমে সম্মিলনী অধিবেশনে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; তাহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভক্ত ইহাতে যোগদান করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসর আমাদের পশ্চিম বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে সেই শুভ-সম্মিলনী হইবার পালা পড়িয়াছে।

পশ্চিম বাঙ্গালার ভক্তগণের পক্ষে ও আশ্রম-পক্ষে ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনাদের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিবার ক্ষমতা এই দরিদ্র আশ্রমের নাই। আমাদের ভরসা এই যে, আমাদের সকল দোষ সকল ক্রুটী যেমন আমাদের আশুতোষ সদাশিব নিজ অশেষ কৃপাগুণে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তেমনি তাঁহার প্রিয় সন্তান আপনারা, আপনারাও তাঁহার মত আপনাদের এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সকল অপরাধ, সকল ক্রুটী হাসিমুখে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রদ্ধেয় যোগেন দাদা সহ আমি গত বৎসর এখানে সম্মিলিত হইবার জন্য আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম এবং অদ্য পুনরায় আপনাদিগকে এই সম্মিলন-ক্ষেত্রে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আসুন, আমরা সকলে ভক্তিপরিপ্লুত চিত্তে শ্রীগুরুচরণে প্রণত হইয়া অন্তরের সহিত বলি—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥

মহাপ্রয়াণ

আমাদের শ্রীহট্ট জেলা-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট জগৎসী নিবাসী একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ৺গগনচন্দ্র দেব গত ১৩৩৭ বাং ১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার ৫০ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সে অঞ্চলে একজন যশোবন্ত জমিদার ছিলেন। বিগত ১৩২৪ বাং অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়া প্রায় ১৬ বৎসর যাবৎ ঠাকুরের সেবকরূপে অনাসক্ত গৃহস্থ-জীবন যাপন করিয়া "গৃহস্থ-বৈষ্ণবের" আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজকে দীনাতিদীন ভাবিতেন এবং আড়ম্বর-বিহীন হইয়া চলিতেন তথাপি প্রজা, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও গুরুভ্রাতৃবৃন্দ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রীতি-প্রণয়-আচার-ব্যবহারে তিনি সমভাবে শত্রু (?) মিত্র সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন।

আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করি।

২৫শ বর্ষ
সমষ্টি সং ২৭৩

মাঘ—১৩৩৯

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

এক দেবতা (পরমেশ্বর) সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা স্বরূপ। তিনি কর্ম্ম সমূহের অধ্যক্ষ, প্রাণিবৃন্দের আবাসস্থল, চেতয়িতা এবং কেবল নির্গুণ।

প্রকাশার্থক 'দিব্' ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি স্বীয় স্বভাব প্রভাবে বিশ্বচরাচর প্রকাশ করিয়া সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমীভূত

পদার্থে গূঢ়ভাবে—গোপন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন সেই দেবতা এক; তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়। সেই দেবতাকে চিনাইতে গিয়া বেদান্তসূত্রে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিতেছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" ওই যে বিশ্বচরাচর রূপ-রস-গন্ধের ডালি লইয়া মোহন বেশে তোমার সম্মুখে অবস্থিত, এই যে তুমি--আমি নিখিল প্রাণিবৃন্দ যাহার আশ্রয়ে আশ্রিত, জীবিত ও পরিপুষ্ট, সেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি--লয় যাঁহা হইতে এবং যাঁহাতে হয়, তিনিই সেই। ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারের মত তিনি এ জগৎ প্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণই নহেন শুধু, উর্ণনাভের মত নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই। তিনি স্বীয় উপাদানাংশে এই জগৎ-প্রপঞ্চ রচনা করিয়া আত্মচৈতন্য দ্বারা তাহাকে সঞ্জীবিত——চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছেন। জগতের উপাদানরূপে আত্মদান করিয়া তিনি সকলকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি সর্ব্বজীবে অবস্থিত রহিয়াছেন অতি গূঢ়ভাবে—গোপনভাবে। তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, অরণিগর্ভে যেমন বহ্নি থাকে, তেমনি তিনি অতি গোপনভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন, এ জড়চক্ষে তাঁহার দর্শন মিলে না— "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য"—তাহার জন্য চাই জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন!

তিনি যে বিশ্ব-প্রপঞ্চ রচনা করিয়া ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তাহা বিভিন্ন শ্রুতিতে, বিভিন্ন স্মৃতিতে, বহুভাবে উক্ত হইয়াছে। সেই মহাসত্যই বর্ত্তমান-প্রসঙ্গে ঋষির কণ্ঠ মথিয়া ফুটিয়া উঠিল—**একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।**

তিনি যে শুধু সকলের অগোচরে গোপনভাবে কোন সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন তাহা নহে, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেই তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন—ব্যাপকরূপে সর্ব্বভূতে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এমন ঠাঁই খুঁজিয়া পাইবে না যেখানে তিনি নাই। যদি স্থল-বিশেষের নাম করিয়া বল অমুক স্থানে তিনি নাই, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ব্যাহত হয়। এদিকে কিন্তু জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপীরূপে অবিসম্বাদিত ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কাজেই তিনি যে সর্ব্ববস্তুতে

ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল মন্তব্যই গৃহীত হইতে পারে না।

"সর্ব্বব্যাপী" এই শব্দের অর্থ 'তিনি সর্ব্ববস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন' এইরূপ করিলে দ্বৈতবাদকে মানিয়া লওয়া হয়। কারণ ঐরূপ অর্থ করিলে 'সর্ব্ব' তাঁহা হইতে পৃথক্, আর তিনি "ব্যাপী" অর্থাৎ ব্যাপকরূপে তাহাকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এইরূপ অর্থই দাঁড়ায়। তাহা হইলে সর্ব্বের সর্ব্বত্বে তাঁহার ব্যাপকত্ব থাকে না, কাজেই 'সর্ব্বব্যাপী' এই বিশেষণটীও নিরর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু "সর্ব্বব্যাপী"র অর্থ "তিনি আত্মস্বরূপকে সর্ব্বরূপে পরিণত করিয়া অনন্ত জগদাকারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন" এইরূপ করিলে সকল কথার সামঞ্জস্য হয়, সকল বিরোধের অবসান হয়। তাই ঋষি বলিলেন—তিনি **সর্ব্বব্যাপী**!

আবার তিনি যে শুধু জড়জগৎরূপে পরিণত হইয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, তিনি সর্ব্বভূতজাতের চেতনা সঞ্চার করিয়া তাহাদের অন্তরে অনুভূতিরূপেও ফুটিয়া উঠিয়াছেন। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিগণ "আমি" "আমি" রবে দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, "আমি"কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রতিনিয়তই একটা আমির সঙ্গে আর একটা আমির দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এ 'আমি' আসিল কোথা হইতে ? ঐ অন্তরাত্মা হইতে। তিনি যেন অনুদ্বেলিত মহাসাগর, আর এই অনন্ত কোটী 'আমি' তাঁহারই বুকে বুদ্বুদ-বিলাস ! এই 'আমি'গুলিই অন্তর, কেন না এইগুলিই তো জীবের জীবত্ব, এইগুলি উদ্ভূত হইয়াই না তাহাকে আত্মা হইতে—স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে মরণের মাঝে ঘূরপাক খাওয়াইতেছে ! এই সমস্ত অহঙ্কাররূপী অন্তর-সমূহের উপাদান বলিয়া—মূল উৎস বলিয়া—অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া—তিনি সকলের আত্মা—প্রাণ—একমাত্র আশ্রয় ! তার এই আশ্রয়ত্বকেই আত্মস্বরূপে বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন তিনি **সর্ব্বভূতান্তরাত্মা**!

তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ—কর্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা—স্বয়ং প্রভু ! এক হইতে যে বহুর বিকাশ, নাস্তি হইতে যে অস্তির পরিণতি,—অদ্বিতীয়ের যে

সদ্বিতীয়রূপে ভাণ, ইহাই কর্ম্ম, আর এই কর্ম্মেরই কর্ত্তা সেই আদিদেব! সাংখ্যমতাবলম্বীরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন—এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্রী আদ্যা প্রকৃতি, —আর পরব্রহ্ম সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিবিক্ত দ্রষ্টা-স্বরূপ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এ বিরোধের মীমাংসা পাই। ভগবান্ বলিতেছেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"—আমার (ঈশ্বরের—ব্রহ্মের) অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন। অবশ্য প্রকৃতিই হাতে-কলমে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু প্রকৃতির মাঝে কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া তুলে কে? জড়াকে চৈতন্যময়ীরূপে পরিণত করে কে? সেই দেবাদিদেব পরব্রহ্ম! তাঁহার সন্নিধান মাত্রেই সঞ্চারিতশক্তি এই প্রকৃতি স্বভাব বশে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতি এই বিশ্ব-কর্ম্মের সাক্ষাৎ 'কর্ত্তা' (?) হইতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বোপরি পরব্রহ্মের সন্নিধিই যে তাঁহাকে সকল কর্ম্মের কর্ত্রীরূপে স্থাপন করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরব্রহ্ম কর্ত্তা না হইলেও মূলে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান—তাই ঋষি তাঁহার মুখ্য কর্ত্তৃত্বের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন—তিনি **কর্ম্মাধ্যক্ষঃ।**

এই যে তাঁহার অধ্যক্ষতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, সর্ব্বভূতের উদ্ভব, ইহারা উদ্ভূত হইয়া অবস্থান করে কোথায়? যদি তাহাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অনন্তত্বে ব্যাঘাত ঘটে, তিনি সান্ত হইয়া পড়েন। তাই ঋষি 'তজ্জলান্' এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—তিনি **সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।** অর্থাৎ সর্ব্বভূত তাঁহাতেই বাস করিয়া থাকে, তিনিই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রস্বরূপ!

অধি—বস্+ঘঞ্ এই ভাবে এই অধিবাস পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই প্রকৃতি প্রত্যয় লব্ধ অর্থে অধিবাস শব্দে 'আবাসস্থল'ই বুঝায়। অতএব তিনি সর্ব্বভূতাধিবাসঃ—কি না সমস্ত ভূত পদার্থের আশ্রয়স্থল ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এই যে সৃষ্ট অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড, তাহারা যে আত্মস্বরূপ

পরব্রহ্মের একদেশে মাত্র অবস্থিত, তাহাও শ্রীমদ্‌ভগবদুক্তি হইতেই পাই। বিভূতিযোগবাখ্যাবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জ্জুন! বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" 'অথবা হে অর্জ্জুন! এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি জানিয়া রাখ যে আমি একাংশে এই সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।' অতএব এই স্মৃতি প্রমাণে তাঁহার "সর্ব্ব-ভূতাধিবাসিত্ব"ই দৃঢ়ীকৃত হইল।

যদিও তিনি সমগ্র কর্ম্মের অধ্যক্ষ, যদিও তাঁহারই প্রেরণায় প্রকৃতি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ"—তিনি শুধু দ্রষ্টা, কোন কর্ম্মেই লিপ্ত নহেন, কোন কার্য্যেই আসক্ত নহেন। "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়"—সেই সমস্ত কর্ম্ম উদাসীন আমাকে কোন প্রকারেই আবদ্ধ করিতে পারে না—ভগবানের এই উক্তিই বোধ হয় এক্ষেত্রে ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। আবার তিনি সমগ্র ভূত পদার্থের আশ্রয়স্থল হইয়াও তাহাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কর্ম্ম-পঙ্কে লিপ্ত নহেন, ইহাই পরিস্ফুট করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" অর্থাৎ এই ভূতগ্রাম থাকিয়াও যেন নাই—ইহাই আমার যোগৈশ্বর্য্য! প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী সম্প্রদায় 'থাকিয়াও যেন নাই' এই ভাব অবলম্বন করিয়াই এই জগতের পারমার্থিক সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন সবই মায়া অতএব মিথ্যা! কাজেই পরব্রহ্মের সাক্ষী-স্বরূপত্ব, কেবলত্ব ও নির্গুণত্ব কিছুতেই ব্যাহত হইতেছে না। তিনি সর্ব্বা-বস্থায় সর্ব্বকালে একই ভাবে অবস্থিত ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ভক্ত-সম্প্রদায় আবার জগৎকে একেবারে মায়া—মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়াও পরমেশ্বরের নির্ব্বিকারত্ব সুন্দরভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, জগৎ মিথ্যা হইবে কেন? জগৎ সত্য, সেই সত্যস্বরূপই এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন অতএব ইহাও সত্য। তবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি বিকারী হইয়া পড়েন নাই, স্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন। চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়—

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেম ভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥

অতএব কি জ্ঞানী সম্প্রদায়, কি ভক্ত সম্প্রদায় সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যের প্রধান কর্ত্তারূপে স্থাপিত করিয়াও সমস্ত কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিবিক্ত রাখিয়াছেন। এই ভাব অবলম্বন করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—তিনি সর্ব্বদা স্বরূপেই অবস্থিত; জগৎ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাঁহার স্বরূপচ্যুতি কিছুতেই ঘটিতেছে না।

সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র দ্রষ্টা বলিয়া তিনি **সাক্ষী**, জড়া প্রকৃতির মাঝে সৃষ্ট্যোপযোগী চেতনার সঞ্চার করেন বলিয়া তিনি **চেতা**, একমেবা দ্বিতীয়ম্ বলিয়া তিনি **কেবল**, আর 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্' হইয়াও সকল বিকৃত অবস্থার অতীত বলিয়া তিনি **নির্গুণ।** পরব্রহ্মের সম্বন্ধে এই কয়টী নিগূঢ় সত্য বিশেষণ-বাণী একত্র সংযোগ করিয়া ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—তিনি **সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।**

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মেতে চরণ তারে ব্রহ্মচর্য্য কয়,
উচ্চচিন্তা বিনা উর্দ্ধরেতা নাহি হয়।
বারিধির সাথে যোগ না হলে সাধন,
স্রোতস্বতী-কলনাদ কে করে বারণ ?

—শাশ্বত-সংবাদ

ইতিহাসে প্রথমে দেখিতে পাই, প্রাচীন হিন্দু-দের জীবন-যাপনের চারিটী পবিত্র স্তর বা বিভাগ ছিল—(১) ব্রহ্মচর্য্য (২) গার্হস্থ্য (৩) বানপ্রস্থ (৪) ভৈক্ষ্য বা যতি। ব্রহ্মচর্য্যের সময় অষ্টম বর্ষ হইতে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত, ইহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ প্রয়োজন মত এই আশ্রমের কার্য্য শেষ করিতেন। এই সময় বিদ্যার্থিগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন, গুরুর উপদেশ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিতেন, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যবহারিক জ্ঞানও লাভ করিতেন।

তাঁহাদের বহু বিধি ও নিষেধমূলক উপদেশ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে হইত, যথা—"বর্জ্জয়েৎ মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ" ইত্যাদি। সে সকলের উদ্দেশ্য ছিল দেহ সুস্থ রাখিয়া অবহিত চিত্তে বেদাদি অধ্যয়ন ও প্রশান্ত মানসে ব্রহ্মের ধ্যান ও তন্নিষ্ঠা। কেহ কেহ চিরকাল এই ভাবে কাটাইতেন, অনেকেই দারপরিগ্রহ করিয়া শান্ত ও সংযত চিত্তে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন—যথা, "অবিপ্লুতো ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ" অর্থাৎ অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাদি এই যে চারিটী আশ্রমের কথা বলা হইল, ইহারা একটী বিশেষ অবস্থা হইলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটী সংযোগ-সূত্র রহিয়াছে, একটী অপরটীর সহিত অন্তর্নিবদ্ধ। আবার ব্রহ্মচর্য্যকে সকল অবস্থারই মেরুদণ্ড বলা যায়। যুবক ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন কালে যে ভোগ-বাসনায় নিমগ্ন থাকিবে, প্রবল ইন্দ্রিয় অনলে যে শুধু আহুতি দিতে থাকিবে এমন নহে। তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা হয় নাই। তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখিয়া, আত্মরতি অক্ষুণ্ন রাখিয়া ধীরে ধীরে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। অন্য দিকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া কঠোর প্রত্যাহার অবলম্বন করতঃ কোন ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে, তাহাতে ব্যর্থকাম হইতে হইবে, প্রতিক্রিয়ার এক একটা প্রবল প্রবাহ অতি কষ্টের বাঁধ চুরমার করিয়া দিয়া যাইবে—ক্রমশঃ কুৎসিৎ ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিবে। আজকাল ব্রহ্মচর্য্য বলিলেই লোকে বুঝে দারপরিগ্রহ না করা, কামেন্দ্রিয় নিগ্রহ করা ইত্যাদি। অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত রেতঃপাত হইলে শরীর নিস্তেজ, মন দুর্ব্বল ও চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহার ফলে ঐ সকল অপটু যন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা আদৌ হয় না—সেজন্য এ বিষয়ে বিচক্ষণ শাস্ত্রকারগণ বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কামেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে ইহার দ্বিতীয় নাই। সেজন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ঋষিগণ এই ইন্দ্রিয় সংযত করাকে অন্যান্য উপায়গুলির মধ্যে একটী উপায় বা সহায়ক মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য এক মাত্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নহে। আমরা প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, লক্ষ্যের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি না দিয়া

সাধনের দিকেই অধিক জোর দেই। আবার প্রবল নিরোধেও ইন্দ্রিয়গণ শান্ত হয় না, জ্ঞান আলোচনা ও উচ্চ চিন্তাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করে; যথা "ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবযা। বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ"—মনু। অর্থাৎ জ্ঞানালোচনাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ যেমন ক্রমে ক্রমে উপশান্ত হয়, বিষয় উপভোগ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইলে তাহারা সেরূপ সংযত হয় না।

কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—একই তত্ত্বের স্থূল পরিণতি মাত্র—সবগুলির সমষ্টিই তিনি। জগতের এমন কোন বস্তু বা চিন্তা নাই, যেখানে ভগবান নাই। সমস্তই তাঁহার সচ্চিন্তা প্রসূত, সকলই সুব্যবহার সাপেক্ষ হইলে মঙ্গলপ্রসূ, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই।

প্রকৃতি নিখিল জগতের জননী। রমণী সেই প্রকৃতি জননীর মানুষী মূর্ত্তি মাত্র—সেই মা হইতে আমাদের উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধন। রমণীমাত্রেই এক একটী মাতৃমূর্ত্তি, কালের দোষে কুশিক্ষার ফলে আমাদের কু-চিন্তা, কু-ধারণা আসিয়াছে আমাদের কুটিল দৃষ্টি জন্মিয়াছে—সব জিনিষই আমরা কুভাবে দেখিতে শিখিয়াছি, সেজন্য জীবপ্রসবিনী মাতৃগণকে আমরা দয়াবতী মা বলিয়া না চিনিয়া কেবল কু-লীলার সহায়ক মনে করিয়া দিন দিন অধঃপতনের চরম দশায় উপনীত হইতেছি। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্যের 'মণিরত্নমালায়'——"দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী"—ইত্যাদি বাক্যে নারী জাতির উপর অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শিত হইলেও মনুসংহিতায় আবার উক্ত হইয়াছে—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে মোদন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

একই বস্তুর প্রয়োগ-কৌশলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফল দেখা যায়। স্থল বিশেষে সুধা বিষে পরিণত হয়, আবার বিষও সুধার কাজ করে। একদেশী ধর্ম্ম পালনে পূর্ণ জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

জগন্মাতার মূর্ত্তিস্বরূপা নারীমূর্ত্তিগণ একেবারে হেয় পদার্থ নহে, স্নেহ-মায়া-দয়া-করুণা প্রভৃতি কোমল ভাব সকলের প্রত্যক্ষ প্রতিমাস্বরূপা রমণীগণ আদৌ ঘৃণার বস্তু নহে। তাঁহাদের মধ্যেও অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে, সুব্যবস্থা অবকাশ ও আলোচনা করিতে পাইলে তাহা শীঘ্র ও সহজে উন্মুক্ত হইয়া লোকলোচনে প্রকাশিত হইতে পারে। অরুন্ধতী, গার্গী প্রভৃতি যে সকল প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী রমণীগণের আখ্যায়িকা শুনা যায়, তাহা কেবল মিথ্যা কবি-কল্পনা নহে। গার্গী ব্রহ্মজ্ঞানে এতদূর পারদর্শিনী হইয়াছিলেন যে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের বিবুধ সভায় ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরীক্ষার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিতেন। অন্যদিকে দ্রৌপদীর রাজনৈতিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের কথা 'মহাভারতে' তথা "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" নামক মহাকাব্যে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হায়! কালের প্রভাবে আমরা এ হেন রমণীকে "দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী"—শুধু এইভাবে চিনিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি। তন্ত্রে শক্তি আরাধনার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ সাধকের মাতৃভাবের সাধনা ও সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে। তাহাতে পুরুষ-গুরুর সঙ্গে স্ত্রী-গুরুর মাহাত্ম্য স্তব কবচাদি বর্ণিত আছে। মাতৃভাবের উপাসক যে কোন সাধক উপযুক্ত স্ত্রী গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বাভীষ্ট লাভ করিতে পারেন, তন্ত্র শাস্ত্রের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে ইহাও একটী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা।

জোর করিয়া যাহা করা যায়, তাহার ফলই

স্থায়ী হয় না। মানুষের কৃত্রিম বল অপেক্ষা স্বভাবের বল অনেক বেশী। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতিস্তাং নিযোক্ষ্যতি।" পক্ষান্তরে নিষেধমূলক নীতি পালন করিতে করিতে যাহা নিষেধ তাহা করিতে স্বতঃই কৌতূহল ও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা করিও না, তাহা করিও না, এইরূপ উপদেশ পাইতে পাইতে বালক গোপনে ইহা ও উহা করিতে স্বতঃই লুব্ধ হয়, পরিশেষে আকৃষ্ট হইয়া সেগুলি ছাড়িতে পারে না। সাধনক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অপরিপক্ক চালকের উপদেশে অপরিণতমস্তিষ্ক সাধক নানারূপ কঠোর নিষেধ-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। ফলে অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও পদে পদে স্খলিতপদ হইয়া নিরাশ-সাগরে ভাসিতে থাকেন।

বিশ্বামিত্র ও মেনকার উপাখ্যান মিথ্যা নহে। কঠোর তপস্বীর উগ্রতপস্যা দেখিয়া ভয়ে ও ঈর্ষ্যায় দেবতাগণ কৌশলে তাহার তপোবিঘ্ন জন্মাইয়া থাকেন—এইরূপ কথা চিরন্তন। কিন্তু গূঢ় রহস্য তাহা নহে। "জোর" প্রত্যাহার দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয় একটু অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়া প্রবল দাপটে অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিরুদ্ধ ভীষণ জলস্রোতের বহির্গমনের ন্যায় মাঠ-ঘাট ভাসাইয়া দিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্ষুধা জোর করিয়া নিবারণ করা অসম্ভব, তাহাতে প্রতিক্রিয়ার ফল যাহা তাহাই হইবে। ক্ষুধার্ত্ত বৃত্তিগুলি কঠোর নিয়ন্তার শাসনে যখন বিষম বিধ্বস্ত হইবে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই মাথা তুলিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিবে, তাহার দেহে নানাবিধ কু-ব্যাধির সঞ্চার করিয়া দিবে, ফলে বেচারীর ইষ্ট-সাধনের পরিবর্ত্তে রোগ পরিচর্য্যা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে।

—৫৬ক

কোন বস্তু ভোগ না করিয়া একেবারেই ত্যাগ করাকে প্রকৃত ত্যাগ বলে না। "যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী সত্যাগীত্যভিধীয়তে।" জোর করিয়া কোন বস্তু কিছুকালের জন্য ত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে অন্তরের নিভৃত-কোণেও তাহার ভোগ-বাসনা আছে কি না! তাহা যদি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে গীতার উক্তি অনুসারে মিথ্যাচার বলিতে হইবে। ভোগের বস্তু হইতে আমি অতি দূরে থাকিব, তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা আলোচনা করিব না, এ ক্ষেত্রে চিত্তের বিক্ষোভ কিছুদিনের জন্য না আসিলেও পরে আসিতে পারে, কিন্তু সেই যথার্থ বীর, যে ভোগের বস্তু সম্মুখে রাখিয়াও বিচলিত হয় না। কুমার-সম্ভব কাব্যে কবি ঠিকই বলিয়াছেন—"বিকারহেতৌ সতিবিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" অর্থাৎ বিকারের হেতু উপস্থিত হইলেও যাহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না—তাহারাই প্রকৃত বীর।

সেই পরাৎপর তত্ত্ব নিজেকেই বিজৃম্ভিত করিয়া প্রত্যক্ষ জগৎরূপে বিরাজমান; লীলা রস আস্বাদনের জন্য তিনিই বিশ্বে রূপান্তরিত হইয়াছেন। সচ্চিদানন্দের আনন্দাত্মক অভিব্যক্তি মধুর হইতে সুমধুর, তিনি সেই আনন্দ রস উপভোগ করিবার জন্যই নিজেকে অনন্ত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভোগের জন্য তাঁহার জগৎ সৃষ্টি—ত্যাগের জন্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য আমরা তাঁহার লীলারস ভোগ করিব, সানন্দে দিন কাটাইব। কিন্তু আমরা ভোগের রীতি ও রহস্য ভুলিয়া গিয়া দুর্গম জটিল পথে ভ্রমণ করিতেছি। স্বাভাবিক ভোগের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক সম্ভোগ করিতেছি। পরম পিতার সদিচ্ছার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিজেদের কু-ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অযথা শক্তি ক্ষয় করিয়া দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তিনিই জানেন কবে

আমাদের এই মোহান্ধতা ঘুচিবে, কবে আমরা আসল পথ খুঁজিয়া বাহির করিব, কবে আমরা ভোগ-কৌশল শিখিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে পারিব।

কামাদি ষড়রিপু বাহ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে। সকলই একই বস্তুর অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। একই বস্তুর রকম-ফের। সকলগুলিই সমসূত্রে বাঁধা, একটী জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলে তাহার শক্তি অপরগুলিতেও সংক্রামিত হইবে; অপরগুলি সেই শক্তি পাইয়া বর্দ্ধিততেজে নির্য্যাতনকারীকে আক্রমণ করিবে। আবার একটী রিপুর প্রশ্রয় দিলে অপরগুলিও সেইরূপ প্রশ্রয় পাইবে। যে ব্যক্তি যত মাত্রায় ক্রোধী বা লোভী তাহার কামরিপু বাহ্যতঃ প্রকাশ না পাইলেও ভিতরে ভিতরে তত মাত্রায় প্রবলভাবে বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় নিরোধ ব্যাপার বড়ই গুরুতর, ক্ষুদ্র মানুষের বল-বুদ্ধি ইহাতে খাটে না।

একটী ইন্দ্রিয়ের অণুমাত্র দুর্ব্বলতায় অন্যান্য সংযত ইন্দ্রিয়ের বাঁধ ক্রমশঃ খসিতে থাকে, তাহাতে বহু যত্নে লব্ধ পরম জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যায়, যথা—

"ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্। তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃপাদাদিবোদকম্॥" (মনু)

অর্থাৎ ভিস্তি বহু ছিদ্রময় না হইলেও, তাহাতে যদি একটী ছিদ্রও থাকে, তাহা হইলে যেমন সমস্ত জল ঐ ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যেই পরম জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে।" এ ক্ষেত্রে সহজ ও সরল উপায় হইতেছে সকলকে সাম্যভাবে রাখা। একটীর নিগ্রহ, অপরটীর প্রশ্রয় এইভাবে চলিলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যাইবে; চিত্তস্থৈর্য্য আদৌ [illegible] না, ফলে ইষ্টসাধন বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নিষেধমূলক নীতি সুফলপ্রসূ নহে। বিধিমূলক নীতি এবং আদর্শের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত গন্তব্যে পৌছিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

যাঁহার গুণ গরিমায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করা যায়, যিনি চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশই শিরোধার্য্য করিয়া ধীরে ধীরে শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। তিনিই ঋষি, তাঁহার বাক্যই ঋষিবাক্য; তাঁহার প্রতিপাদিত ও সুপ্রমাণিত বিধি প্রাচীন কালের বিধি অপেক্ষা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় অধিক উপযোগী।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোনও অপরিবর্ত্তনীয় নীতি থাকিতে পারে না, অবস্থানুসারে তাহার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কোন সমাজে তাহা না করিলে তাহাকে পিছাইয়া পড়িতে হয়। অগ্রগতিশীল জগৎ তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অন্যান্য সমাজকে সঙ্গে করিয়া দ্রুত গমনে উন্নতির শিখরে উঠিতে থাকিবে। সেজন্য বিচক্ষণ সমাজ জগতের আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়া নিজের গতি-বিধি চালাইয়া বা ফিরাইয়া লয়, এবং সেই সমাজের প্রতিভাবান্ দক্ষ কর্ণধার সকল অল্প বুদ্ধি সাধারণ লোককে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

সেইজন্য যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির আবির্ভাব হয়, এবং তাহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়মের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই পার্থক্য আদৌ দোষের নহে। তাঁহারা কাল-উপযোগী বিধান-ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র। সাধারণ লোকে বিধানগুলির পরস্পর বৈচিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও তত্ত্বান্বেষী বিজ্ঞজনের নিকট তাহা সহজেই মীমাংসা হইয়া থাকে। কি রাষ্ট্রনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি ইষ্টসাধন প্রণালী সকলকেই দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিতে হয়,

নচেৎ সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। হিন্দুশাস্ত্রে পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলা হইয়াছে—"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ইত্যাদি অনেক কথা শাস্ত্রে আছে। এই সকল কথা নিরর্থক নহে। পত্নী ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত—ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তির জন্য নহে। ব্রহ্মবিৎ ঋষি-সন্তান আমরা; তাঁহাদের পবিত্র বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গর্হিত বা নিন্দনীয় নহে। ভগবান্‌কে সাক্ষী রাখিয়া পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে হিন্দুর বিবাহাদি যে দশ-সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নিরর্থক নহে। বিবাহ, গর্ভাধান প্রভৃতি হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সকল ধর্ম্মজড়িত ও সদুদ্দেশ্য পরিপোষক।

সর্ব্বশাস্ত্রে যোগের উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। গীতায় যোগের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।—

> যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
> যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ আহারে-বিহারে সকল কার্য্যেই যুক্ত অর্থাৎ পরিমিত ভাব অভ্যাস করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গৃহী ব্রহ্মচারী নিঃসন্দেহে এই অভ্যাস করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে না। শাস্ত্রও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"নিন্দাস্বষ্টাসু চান্যাসুস্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্। ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্রতত্রাশ্রমে বসন্॥ (মনু)।

অর্থাৎ যিনি স্বীয় স্ত্রীর ঋতুকালের প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি এই নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্টরাত্রি এই চতুর্দ্দশ রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দুইরাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন—তিনি ব্রহ্মচারীই থাকেন—তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কোনও হানি হয় না।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার। যিনি এই বিস্তারের আলোচনা করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। সৎচিন্তা ও সৎকার্য্যের দ্বারা এই বিস্তার বা প্রেমের আলোচনা বৃদ্ধি হইতে পারে। সচ্চিন্তাপরায়ণতা ও সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। সুতরাং যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী বলিতে পারা যায়। নিজের প্রাণের মমতা ভুলিয়া গিয়া যে জীবহিতৈক-ব্রত কর্ম্মী মারীভয়, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত হতভাগ্য জীবগণের রক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন—তিনিও ব্রহ্মচারী। নিজের উন্নতির দিকে দৃক্পাত না করিয়া যে নিঃস্বার্থ শিক্ষক পল্লীর কৃষক সন্তানগণকে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদানে আনন্দ অনুভব করেন—তিনিও ব্রহ্মচারী। যে দেশহিতৈষী মহাপ্রাণ জননায়ক, দরিদ্রদেশে কিরূপে অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচন হয়, তজ্জন্য গভীর চিন্তা করেন এবং কার্য্যকর উপায়সকল উদ্ভাবন করেন—তিনিও ব্রহ্মচারী। জীবের ত্রিতাপ দর্শনে কাতরপ্রাণ যে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ পাপী-তাপীর দ্বারদেশে শান্তিসুধা লইয়া উপস্থিত—তিনিও ব্রহ্মচারী। এই মহাত্মাগণ কৃতদার হইলেও সচ্চিন্তাবিরত ও সৎকার্য্যে বিরত বাহ্য বিধি-নিষেধ পালনে তৎপর অকৃতদার তথাকথিত ব্রহ্মচারী অপেক্ষা শতাংশে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

এই সচ্চিন্তাপরায়ণতা ও সৎকার্য্যরতি বিবাহিতের যে অসম্ভব তাহা নহে। বিবাহিত ব্যক্তিও এই সচ্চিন্তা ও সৎকার্য্য অবাধে চালাইতে পারেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরেই পূর্ণজ্ঞানী সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইলে বিপথে পা পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। এই প্রকার সন্নিষ্ঠ বিবাহিত ব্যক্তিকেও ব্রহ্মচারী বলা যায়। যিনি কেবল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করেন, অথচ সচ্চিন্তাপরায়ণ নহেন, সৎকার্য্যের চিন্তা যাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হয় নাই—তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিতে পারা যায় না। যিনি প্রবলভাবে ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়াছেন অথচ

সচ্চিন্তাপরায়ণ নহেন তাঁহাকে কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

বিবাহ হইয়াছে অথবা পুত্রোৎপাদন হইয়াছে অতএব ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মোপলব্ধি হইবে না এই আশঙ্কা কুসংস্কার মাত্র। এই সকল আশঙ্কার প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মপিপাসু বিবাহিত পুরুষগণকে হতাশ হইতে হয়। বাস্তবিকই হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধু ধার্ম্মিক গৃহস্থ, জ্ঞান ও অন্নাদি দানে অপর তিন আশ্রমবাসীকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যথা :—

যস্মাত্ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিনো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমোগৃহী॥

এইজন্য প্রাচীনকালে ধর্ম্ম সাধনার যুগে তপস্বী ঋষিগণের মধ্যেও বিবাহ প্রথা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন প্রচলিত ছিল; এবং অল্পই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ছিলেন যাঁহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই।

বাল্যে ও কৌমার বয়সে সৎসঙ্গের মধ্যে থাকিয়া সুব্যবস্থা সম্পন্ন বিদ্যালয়ে শান্ত-দান্ত জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম-নিষ্ঠ আদর্শস্থানীয় শিক্ষকের অধীনে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া পরিণত বয়সে পিতা মাতার আদেশে দার-পরিগ্রহ করতঃ বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে প্রত্যক্ষ সদ্‌গুরু লাভ করিলে কোন আশঙ্কাই থাকে না।

নবদম্পতি সংসারে প্রবেশ করিয়াই যদি সেই পরম বস্তু সদ্‌গুরুর চরণে মন-প্রাণ সঁপিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরম দয়াল তিনি তাঁহার দুর্ব্বলচিত্ত অদূরদর্শী ক্ষুদ্র পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে নিশ্চয়ই হাত ধরিয়া সুপথে পরিচালিত করিবেন। তখন নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া জোর করিয়া কোন কঠোর বিধি-নিষেধ পালন করিবার আবশ্যক হয় না। সর্ব্বদা সকল কাজের মধ্যে "গুরোঃকৃপাহি কেবলম্" বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিলে শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে তদ্‌গতপ্রাণ হইতে পারিলে সব বালাই একে একে কমিয়া কাটিয়া যায়।

সদ্‌গুরু, সত্যনাম ও সৎ-সঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রধান অবলম্বনত্রয়—এই কয়টী কথা যেন গৃহীর সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। তাহা হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া গৃহীও ব্রহ্মচর্য্যের চরম ফল ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অধিকারী হইতে পারিবে।

গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫ প্রজ্ঞাস্থিতির সাধনা

ধাপে ধাপে নেমে এসেছি অনেক নীচে, তাই আবার উঠতে হলে ধাপে ধাপেই উঠে যেতে হবে। জীবনের এই স্তরগুলিও আমাদের জেনে নেওয়া উচিত। এক ধারে জড় দেহ, আর এক ধারে চিন্ময় আত্মা, এই দুয়ের মাঝে অহংএর ক্রমবিকাশানুযায়ী কতকগুলি স্তর আছে। এই স্তর-অনুযায়ী সাধনাই রাজযোগে বিজ্ঞানের আকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; গীতাতে তারই psychological exposition আছে।

প্রধানতঃ স্তরগুলি এই—আদিতে দেহ, তার চেয়ে সূক্ষ্ম প্রাণ (ইন্দ্রিয় যার ক্রিয়া), তার চেয়ে সূক্ষ্ম মন, তার চেয়েও সূক্ষ্ম বুদ্ধি (এই বুদ্ধির sublime aspectই কিন্তু গীতার লক্ষ্য, পূর্ব্বেই তা বলেছি)। সাধনা হচ্ছে মূলতঃ স্থৈর্য্যের। চল আর অচল, এই দুটী হল বিশ্বের তত্ত্ব। তার মাঝে চলাটা আমরা ভাল করেই জানি, এখন শিখতে হবে অচল হওয়াটা। কেন অচল হতে যাব, এ প্রশ্ন ধৃষ্টতা মাত্র। কেন না অচল হওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণা যে তোমার মাঝে আছেই, সে আলোচনা ইতি-পূর্ব্বেই করেছি। স্বভাবতঃই যদি অচল থাকবার শক্তি তোমার থেকে থাকে, তাহলে সাধনা অনাবশ্যক—তুমি ঐশী শক্তি নিয়েই জন্মেছ বুঝতে হবে, আর তা যদি না থেকে থাকে, তাহলে অচল হতে তোমায় শিখতে হবে, simply to make your life perfect, to make your education complete. যেমন লেখাপড়া শেখ, ব্যবসা শেখ, "জগতের হিত" করতে শেখ, তেমনি অচল হতেও শিখতে হবে, নইলে শিক্ষার বড়াই করো না। থাক।

স্থৈর্য্যের সাধনাকে প্রথমতঃ দেহের প্রতি প্রয়োগ কর। দেহকে স্থির কর। এই হচ্ছে রাজযোগের তৃতীয় অঙ্গ—আসন সাধনা। আর দুটী অঙ্গ হচ্ছে যম-নিয়ম বা চরিত্র-গঠন। সেগুলো general training, আসন হল specific সাধনা। আসন-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাবে। (৬।১১—১৩)। পাতঞ্জল হতে সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু'চার কথা বলব।

প্রথমেই তোমাকে একটা idealistic out-look নিতে বলি। দেহ বল্‌তে শুধু এই জড় পিণ্ডটা বুঝো না, দেহ বল্‌তে **দেহবোধ** বুঝো অর্থাৎ তোমার অন্তরে দেহের সত্তা ও ক্রিয়া যে ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই ভাবটাই বাস্তবিক দেহ। দেহ সম্বন্ধে তোমার অভ্যস্ত ভাব-ধারাকে বদলে ফেল্‌তে হবে; আছে তোমার জৈব-দেহ, তাকে করতে হবে ভাগবত-দেহ। ভাগবত দেহ-বোধের লক্ষণ হচ্ছে, স্থৈর্য্য, সুখ, প্রযত্ন-শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তি। নিজের জৈব দেহ সম্বন্ধে এই চারটী ভাবের অনুশীলন করে দেহকে জ্ঞানময় করে নিতে হবে, এই হচ্ছে আসন-সাধনার তাৎপর্য্য।

দেহকে চঞ্চল করেও সুখ পাওয়া যায়—আমাদের অনেক ভোগ-সুখ শুধু দেহের চঞ্চলতা মাত্র। কিন্তু সে সুখ পরিণামে নিয়ে আসে অবসাদ বা ব্যাধি বা দুঃখ। অতএব চঞ্চলতার পথে নয়—চল স্থৈর্য্যের পথে। দেহকে স্থির রাখতে অভ্যাস কর।

সব: স্থির হয়ে যাক্—পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যাও, গিরিশৃঙ্গের মত অটল হয়ে যাও—বজ্রের মত দৃঢ় হয়ে যাও। একদিনে হবে না। একটু একটু করে অভ্যাস করতে হবে—অভ্যাসে সবই হবে। এই স্থৈর্য্য-ভাবনা হতে আপনি সুখের উদয় হবে। তখন মনে থেকে দেহের representationটা মুছে ফেলে ওই সুখময় অনুভূতিতেই তোমার অধিষ্ঠান এই ভাবনা কর। এই ভাবনার ফলে আসবে প্রযত্ন শৈথিল্য—অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধে আমাদের যে একটা স্বামিত্ব বোধ আছে, "আমার দেহ" বলে যে দেহবোধের মাঝে একটা গ্রন্থি আছে, সেই গ্রন্থিটা আল্‌গা হয়ে যাবে। তোমারই মনশ্চক্ষুর সামনে তোমার দেহটা তরল হয়ে যেন গলে যাবে। চৈতন্যদেবের মাঝে এই প্রযত্ন শৈথিল্য এতটা প্রকট হয়ে পড়ত যে তাঁর দেহ অবশ হয়ে পেশী-গ্রন্থিগুলি সত্যি সত্যি নাকি আল্‌গা হয়ে পড়তো। এই প্রযত্ন-শৈথিল্যের ভাবনা হতেই আসবে অনন্ত সমাপত্তির ভাবনা—তোমার দেহ আলোর মত, বাতাসের মত, আকাশের মত অনন্তে ছড়িয়ে পড়বে—সবার দেহ তোমার হবে—যে নিত্য ভাবদেহ সমস্ত দেহ সৃষ্টির মূল, সেই দেহে তুমি সমাপন্ন হবে। শ্রীকৃষ্ণ একেই বল্‌ছেন—"ব্রহ্ম-সংস্পর্শমত্যন্তং সুখং" (৬।২৮)

দেহকে অবলম্বন করেই ব্যষ্টি দেহ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বিরাট-দেহ লাভ করা—এই হল আসন সাধনের তাৎপর্য্য। এই আসন-সাধনা হতেই সমাধি হতে পারে। শূন্যতাসিদ্ধির এ-ও একটা উপায়। দেহ স্থৈর্য্যের বা আসন-সাধনার এই হল positive দিক। এর আবার negative discipline-ও আছে। সব সাধনারই তাই, আর দু' দিকেই সমান দৃষ্টি রেখে চল্‌তে হয়, কেন না positive আর negative aspect একই discipline-এর দুটা দিক মাত্র। Positive দিকে থাকে অচলতত্ত্ব বা আকাশের আকর্ষণ, আর negative দিকে থাকে প্রাণের বিকর্ষণ হতে মুক্তি। দু'দিকেই তাল ঠিক রাখতে হবে।

আচ্ছা, এখন দেহ সম্বন্ধে বিচার ক দেখ, প্রাণের বিকর্ষণ কোথায় কোথায় প্রজ্ঞার আকর্ষণকে বাধা দিচ্ছে। প্রাণের ক্রিয়া প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুকূল বলেই মনে হয়। কিন্তু আমাদের খেয়াল থাকে না যে সে প্রকৃতি পরা-প্রকৃতি নয়, অপরা-প্রকৃতি মাত্র। ও আমাদের secondary nature, আমাদের primary nature হচ্ছে প্রজ্ঞাভিমুখিনী। প্রজ্ঞাবিমুখী যে দেহ-প্রকৃতি, তার চারটী simple natural re-action—আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয়। দেহের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে এই চারটী automatic re-action হতে মুক্ত থাকতে হবে।

গোড়ার কথা হচ্ছে আহারশুদ্ধি। আহার সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সাধনা চলে না—এ ঠিক জানবে। আহার সম্বন্ধে বিচার শ্রীকৃষ্ণ সপ্তদশ অধ্যায়ে করেছেন (৭—১০)। যোগীর আহার-নিদ্রা সম্বন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়েও উপদেশ আছে (১৬—১৭)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—আহারশুদ্ধি হতে সত্ত্ব-শুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি থেকে স্মৃতি ধ্রুবা হয় (অচলা ধারণাশক্তি জন্মে), আর তাই হতে সমস্ত বাঁধন খসে পড়ে। বুদ্ধদেব বল্‌ছেন যে 'ভোজনম্ হি মিতঞ্ঞু"—আহারের মাত্রা যে জানে—সেই সত্য লাভ করতে পারে। সব ধর্ম্মেই আহার সম্বন্ধে সংযমের উপদেশ আছে। খৃষ্ট সত্যলাভের পূর্ব্বে ৪০ দিন উপবাসী ছিলেন, বাইবেলের এই উক্তিকে প্রমাণ ধরে বিলাতে এক সম্প্রদায় উপবাসকে spiritual realisation-এর অপরিহার্য্য উপায় বলে প্রচার করছেন।

এই তো গেল সব আপ্তোপদেশ বা authority. প্রাচীনেরা যুক্তিও দিয়েছেন। উপনিষদ বল্‌ছেন, অন্নের সূক্ষ্মভাগ মনে রূপান্তরিত হয়। অন্ন হতে প্রাণের পুষ্টি, প্রাণ হতে মনের পুষ্টি—এই materialistic line of thought আধুনিক ইউরোপেও অপরিচিত নয়। বস্তু শক্তির প্রভাবে চিন্তার রূপান্তর সম্বন্ধে James'এর The Varieties of Religious Experienceএর "Mysticism"—অধ্যায় পড়ে দেখতে পার। Anaesthetic Revelation সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রমাণ সংগ্রহ সেখানে পাবে। আহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যের দিক থেকে যে সব laboratory analysis আজ কাল বের হচ্ছে, তার বিচার খুব স্থূল। Protein পেশী গড়ে সত্য, কিন্তু আরও কিছু কি গড়ে না? ডালের protein আর মাংসের protein সর্ব্বতোভাবে যে এক, তার প্রমাণ কি? অথচ সাধকদের ঐ বিষয়ে যথেষ্ট experience আছে। যা মানতে পারছ না, তা নিজে পরখ করে দেখ না কেন? আহার সম্বন্ধে বিচার করে দেহকে এত sensitive করা যায় যে খাদ্যে গুণভেদ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবসর থাকে না, এ কথা experienceএর জোরেই বল্‌তে পারি।

জড় চিন্তারই স্থূল পরিণাম মাত্র; যা অন্তরে ভাবরূপে থাকে, বাইরে তাই বস্তুরূপে ফুটে ওঠে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বস্তুর শোধনে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির আবির্ভাব অসম্ভব নয়। আহার শুদ্ধির বিচারটা এই দিক দিয়েই। যুক্তিতে যদি চিত্ত সায় না দেয়, পরখ করে দেখ, তবুও মতুয়ার (dogmatic) হয়ো না।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ একটী কথা বল্‌ছেন, যার তাৎপর্য্য আহার শুদ্ধির দিক দিয়েও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ—রসবর্জ্জম্।" (৫৯) অর্থ এই, দেহাভিমান যার আছে, সে যদি আহার শূন্য হয়, তাহলে তার কাছ থেকে বিষয়গুলি আপনা থেকে সরে যায়, কিন্তু "রস" যায় না। অবশ্য আহার বল্‌তে এখানে দেহের আহার, মনের আহার দুই-ই বোঝাচ্ছে। আমরা দেহের আহারের কথাটাই আগে বুঝে নিই। কথাটার তাৎপর্য্য এই। বিষয়ের ধ্যান যে প্রজ্ঞাস্থিতির পক্ষে প্রধান বাধা, সে কথায় আলোচনা এই অধ্যায়েই আছে (৬২-৬৩)। বিষয় ধ্যান তমোগুণ বা জড়ত্বের পরিচয়। মন যখন জড় হয়ে যায়, তখন জড় বস্তুর অনুশীলনেই সে আমোদ পায়। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যে এ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা আছে, (যোগসূত্র ১।২), জড়-চিন্তার হাত হতে অব্যাহতি পেতে হলে জড়ের খোরাক কমাও। **প্রজ্ঞাস্থিতিকে লক্ষ্য করে** আহার ত্যাগ কর, চিত্ত আপনা হতে একাগ্র হবে। কিন্তু আহার ত্যাগে সব হয় না, তাতে চিত্তের **রস** অর্থাৎ বিষয়াস্বাদনের সূক্ষ্ম সংস্কার মরে না। বরং সংযমে ভোগ-শক্তিকে আরও সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী করে তোলে। এই হল দেবত্ব। এই দেবত্বের প্রলোভনও ছাড়তে হবে। শ্লোকের বাকী অংশে শ্রীকৃষ্ণ তাই বল্‌ছেন, "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।"—পরম দর্শনের পর রসও মরে যায়। থাকে তখন প্রশান্তি-ব্রাহ্মীস্থিতি (৭২)। আসল কথাটা তাহলে এই। স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হলে আহার-সম্বন্ধে কঠোর সংযমী হতে হবে এবং scientific principle হিসাবে উপবাসে অভ্যস্ত হতে হবে। কিন্তু আহার সম্বন্ধে এই সংযম **চিন্তাসহকারে** করতে হবে। গতানুগতিক আহার-সংযম বা উপবাস বা কৃচ্ছ্রতা কোনও কাজেরই নয়। সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই ধরণের

অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা দুর্ব্বুদ্ধিপূর্ব্বক তপস্যার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। (১৭।৫-৬)।

দ্বিতীয় natural reaction হচ্ছে নিদ্রা। প্রজ্ঞাস্থিতির পক্ষে এ-ও বাধা। নিদ্রাকে আমরা সাধারণতঃ দেহধর্ম্ম বলেই মনে করি। কিন্তু দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। যা দেহের ধর্ম্ম, সূক্ষ্ম বিচারে তা মনেরও ধর্ম্ম হবে। পতঞ্জলি কিন্তু নিদ্রাকে মনের দিক থেকেই বিচার করেছেন। তিনি বলেন, অভাব-প্রত্যয় বা শূন্য জ্ঞানকে অবলম্বন করে যে চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, তাই নিদ্রা। এই শূন্যজ্ঞান আর প্রকৃত শূন্যজ্ঞানে যে তফাৎ আছে, সে আলোচনা পূর্ব্বেই করেছি। এই শূন্য-জ্ঞান গুণময়, এই জন্য নিদ্রারও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনটী ভেদ আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যে আছে (যোগসূত্র, ১।১০)। গুণাতীত যে নিদ্রা, তাই সমাধি, তাই প্রজ্ঞাস্থিতি। শূন্যজ্ঞানের এই তুরীয়স্তর। এর পরেরও একটী অবস্থার কথা বৈষ্ণবেরা বলেছেন, "গোপীদের প্রেমময়ী নিদ্রা।" সে হচ্ছে return from the Absolute!

নিদ্রাজয় প্রজ্ঞা স্থৈর্য্যের সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। জাগ্রদবস্থাকে শাসনে না রাখলে নিদ্রাকে আয়ত্ত করা যায় না। জাগ্রদাবস্থায় আমরা যে বিষয়ের চর্চ্চা করব, চিত্তে সেই গুণের প্রলেপ পড়বে—আর নিদ্রাতেও সেই গুণেরই স্ফূর্ত্তি হবে। অতএব নিদ্রাজয়েচ্ছুর প্রথম কর্ত্তব্য, জাগ্রদবস্থায় চিত্ত হতে রজোগুণ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে দূর করা। সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক কর্ম্ম, সাত্ত্বিক চিন্তাধারা জাগ্রদবস্থাকে উদ্দীপ্ত রাখ, সাত্ত্বিক নিদ্রা তোমার পক্ষে সহজ হবে। সাত্ত্বিক নিদ্রার লক্ষণ—নিদ্রার স্বল্পতা, দেহ-মনের প্রসন্নতা ও নিদ্রার সময় জ্যোৎস্নার মত অনতিস্ফুট প্রকাশের অনুভব। এই সাত্ত্বিক নিদ্রাকে অবলম্বন করে নিদ্রাবৃত্তির সাক্ষী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটী অভ্যাস সাপেক্ষ—এর কোন royal road নাই। তবে এই কয়েকটী সঙ্কেত এর আনুকূল্য করতে পারে। শবাসনে শুয়ে শরীরটাকে নিস্পন্দ অথচ আল্গা করে দাও, আর ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত তালে তালে প্রবাহিত কর। তার পর স্বেচ্ছায় নিদ্রা আনবার চেষ্টা কর, অর্থাৎ ভাব "আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ হয়ে আসছে।" ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, তা ধরা বড় কঠিন—ওইটুকুই হচ্ছে তমোগুণের অলঙ্ঘনীয় প্রভাব। তবুও চেষ্টা করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তটীর দর্শন তুমি পাও কিনা। কয়েক দিন চেষ্টার পর কখনো কখনো বিদ্যুতের দীপ্তির মত উজ্জ্বল অথচ আনন্দ-ময় জ্যোতির ঝলক দেখা যাবে। ওই ঝলকটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টা করতে হবে। ফলে কখনো কখনো দেহ স্থিরহিত অথচ পূর্ণ জাগ্রৎ একাকার আনন্দময় অস্মিতা বৃত্তির সাক্ষাৎকার হবে। ওই বৃত্তিকে অটুট রাখবার চেষ্টাই নিদ্রাজয়ের তাৎপর্য্য।

এই অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাজয় সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় সঙ্কেতপূর্ণ কথা বলেছেন।—"যা নিশা সর্ব্ব-ভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" (৬৯) আহার-সম্বন্ধীয় উপদেশের মত এই কথাটারও খুব গভীর অর্থ আছে বটে, কিন্তু কথাটাকে literally ধরে নিলেও তা থেকে আমাদের মহা উপকার হয়। কথাটা এই—"সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা নাকি রাত্রি, সংযমী পুরুষ তাতে জেগে থাকেন। আর যাতে সবাই জেগে আছে, তাই মুনির রাত, সেই রাতেও তিনি চোখ মেলে চেয়ে থাকেন।" "সংযমী" আর "মুনি" দুটী বিশেষণ লক্ষ্য করো। আহার-বিহারে সংযম ভিন্ন, অন্তরে-বাহিরে মৌন ভিন্ন নিদ্রাজয়ের

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব! আর একটী কথা—রাত্রে জেগে থাকতে হবে। সবাই সুপ্ত, সেই সুষুপ্তির তুমি সাক্ষী। আবোল-তাবোল চিন্তা নিয়ে তুমি জেগে থাক, একথা শ্রীকৃষ্ণ বল্ছেন না। সবার যেমন মন সুপ্ত, রাত্রে তোমারও তেমনি মন সুপ্ত থাক্—কিন্তু তবুও তুমি জেগে থাক—তীব্র বিবেক বলে মোহ হতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে মহাশূন্যের শুদ্ধ প্রশান্তি নিয়ে তুমি জেগে থাক—তোমার বুকে লক্ষ কোটী ভূত সুষুপ্তি-শয়ান থাকুক—তুমি স্তব্ধ হয়ে দেখ, শুধু দেখ। এই হচ্ছে শিবের আনন্দ–মহাশ্মশানে জেগে থাকার আনন্দ।

যেমন রাত্রে তুমি জেগে থাক্বে, তেমনি দিনেও জেগে থাক্বে। সবার রাতকে তুমি দিন করেছ, তেমনি তাদের দিনকে কর্লে তুমি রাত। কিন্তু এ রাত ঘুমের রাত নয়—"সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ"—চোখ মেলে চেয়ে থাকেন যে মুনি, এ তাঁরই রাত। জগৎ কর্ম্মমুখর, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ রাত্রের মতই নিস্তব্ধ—তুমি বিবিক্ত, শুদ্ধ, সমাহিত—তুমি দ্রষ্ট'।

স্থিতপ্রজ্ঞ এমনি সদাজাগ্রত। সাধুদের একটী সুন্দর দোঁহা আছে——

"পহেলা প্রহর সব কোই জাগে, দুসরা প্রহর ভোগী।
তীসরা প্রহর রোগী জাগে, চারোঁ প্রহর যোগী॥"

একটা ধারণা আছে, ঘুম কম হলে শরীর খারাপ হয়। যদি মন চঞ্চল থাকে, তাহলে ঘুমের অভাবে শরীর খারাপ হতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ ঘুমের অভাব কখনো শরীর খারাপ করে না। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্দের তাই রায়। কারু মতে ঘুম একটা বিষ-ক্রিয়া। Electric charge দিয়ে দেখা গেছে, এই বিষ ক্রিয়া দূর করা যেতে পারে, এবং তাতে ঘুমের কোনও প্রয়োজনই হয় না, শরীরের বিন্দুমাত্র ক্ষতিও হয় না। না ঘুমালে পর শরীরের কোন যন্ত্রেরই বিন্দুমাত্র বিকলতা দেখা যায় না, এটা

পরীক্ষা করে দেখা গেছে। যাঁরা কৌতূহলী, তাঁরা Halliburtonএর Physiologyর "Sleep" অধ্যায়ের শেষ অংশটুকু পড়ে দেখতে পার।

মোট কথা, সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক কর্ম্ম ও সাত্ত্বিক চিন্তাকে আশ্রয় করে সাত্ত্বিক নিদ্রার ভিতর দিয়ে নিদ্রাজয়ের সাধনা কর্তে হবে—প্রজ্ঞাস্থিতির সাধনায় এটী অপরিহার্য্য।

প্রকৃতির তৃতীয় reaction হচ্ছে **কাম।** স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের গোড়াতেই শ্রীকৃষ্ণ বল্ছেন, "প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্—আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ"—যিনি মনোগত সমস্ত কামকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করে আত্মাদ্বারা আত্মাতে তুষ্ট থাকেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। (৫৫) অবশ্য এখানে কাম শব্দটী খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, "মনোগত" বিশেষণটী তারই সূচক। আমরা এখন আলোচনা কর্ছি প্রধানতঃ দেহগত কামের, কিন্তু আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে উপদেশের মত এই কাম সম্বন্ধে উপদেশকে যদি Liberal ভাবে গ্রহণ করি, তাতেও তার তাৎপর্য্যের কোনও ব্যত্যয় হয় না। কাম সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ে দিয়েছেন, তাতে বল্ছেন "এই কাম মহাশন, মহাপাপ্মা, জ্ঞানীর নিত্য বৈরী, দুরাসন শত্রু, জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশন, জ্ঞান-জ্যোতির পক্ষে ধূমস্বরূপ (৩।৩৭-৪৩)। এই কামের একটা cosmic aspect আছে, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি সপ্তমাধ্যায়ে (১১) এবং দশমাধ্যায়ে (২৮) আছে; আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা কর্‌ব। দ্বিতীয়াধ্যায়ে কাম সম্বন্ধে এই কয়টী উক্তি আছে।—মনোগত কাম ত্যাগ ও আত্মরতিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (৫৫); বিষয়-ধ্যান হতে সঙ্গ বা আসক্তি ও আসক্তি হতে কামের উৎপত্তি এবং কাম ক্রোধের জনক (৬২); আপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন বারি-সমূহ প্রবেশ করে, তেমনি

সমস্ত কাম যাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি পান, কামকে যে কামনা করে, সে শান্তি পায় না (৭০); সমস্ত কাম ত্যাগ করে যে পুরুষ স্পৃহাশূন্য, মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। (৭১)। এই উক্তিগুলিতে নিশ্চয়ই কাম শব্দটী খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে—আমরা সাধারণতঃ বাসনা বা কামনা বল্‌তে যা বুঝি, কামের অর্থও এখানে তাই। কিন্তু দেহগত ও মনোগত কামে প্রকৃতিগত তফাৎ কিছুই নাই। যে কারণে মন কামনাযুক্ত হয়, সেই কারণেই দেহও কামযুক্ত হয়। দেহের কামকে তাড়াতে হলে, মনের কামনাকেও তাড়াতে হবে। কামনা ত্যাগের উপদেশটী নিশ্চয়ই অতিশয় সূক্ষ্ম, এবং তার তুলনায় কামজয়ের সঙ্কেত অপেক্ষাকৃত স্থূল। কিন্তু পরিণামে (evolutionএ) স্থূল-সূক্ষ্মের তারতম্য থাক্‌লেও নিদান বা sourceএর দিকে তাকিয়ে আমরা কাম ও কামনাকে একই পর্য্যায়ে ফেল্‌তে পারি। মনে রাখতে হবে, স্থূল উপায়ে কাম জয় কর্‌লেও মনোগত কামনার বীজ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত দেহগত কামের অঙ্কুর আবার দেখা দিতে পারে। সুতরাং কামনা ত্যাগের উপদেশ, কামজয়ের উপদেশেরই তুল্যার্থক। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশগুলিকে আমরা দুইবার দুই ভূমি হতে বুঝতে চেষ্টা কর্‌ব। আপাততঃ দেহগত কামের আলোচনাই করা যাক্।

যেমন দুঃখ আছে, এটা স্বতঃসিদ্ধ, চাই দুঃখনিরোধের উপায় জ্ঞান, আর সেই জন্যই চাই দুঃখের হেতুজ্ঞান—তেমনি কাম যে আছে, এটা স্বতঃসিদ্ধ, আমরা জান্‌তে চাই, কি করে কামকে আমরা বশে রাখতে পার্‌ব, আর তারি দরুণ জান্‌তে চাই, কামের হেতু কি? কামের যদি প্রকৃতি বিচার করি, তাহলেই তার হেতুও বুঝতে পার্‌ব এবং সেই হেতুর উচ্ছেদ দ্বারা কামের উচ্ছেদ সম্ভবপর হবে।

উপনিষদে একটী কথা আছে—"সোঽকাময়ত, অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়।" "ব্রহ্ম কামনা কর্‌লেন আমি বহু হব, বিচিত্র হয়ে জন্মাব।" ব্রহ্মের এই বিরাট কাম ক্ষুদ্র **জীবদেহেও** প্রতিফলিত হয়, তাই দেহের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই জীবদেহেও সিসৃক্ষার আকুলতা জাগে। বৈজ্ঞানিক বল্‌বেন, একটী cell যখন উপযুক্ত পরিমাণ প্রাণবস্তু আত্মসাৎ করে স্ফীত হয়, তখন আপনা হতেই দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ার জন্য তার মাঝে একটা উত্তেজনা জাগে—সেই উত্তেজনাই সিসৃক্ষা, তাই কাম। সুতরাং কামের একদিকে রয়েছে পূর্ণতার অনুভূতি, আর একদিকে বিস্তৃত হবার আকাঙ্ক্ষা। পূর্ণতা ও ব্যাপ্তি—এই হচ্ছে সৃষ্টির নিগূঢ় আনন্দ। এ কথাটী অতি সুন্দর, কিন্তু বিপর্য্যয় হয় প্রয়োগের বেলায়—অবিদ্যা এসে সেইখানে আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। যে কোনও পূর্ণতার অনুভূতিই ব্যাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পর্য্যবসিত হবে, এ ধ্রুব সত্য। জ্ঞান ও প্রেমে যদি হৃদয় পূর্ণ হয়, অমনি ইচ্ছা হবে, সবার মাঝে তাকে ছড়িয়ে দিই, আমার মত সহস্র সহস্র জ্ঞানীর ও প্রেমিকের সৃষ্টি করি। এটা হল ভাল দিক। আবার এরই একটা মন্দ দিক দেখ; মানুষ যদি কিছু জানে, অমনি তা জাহির কর্‌তে চায়, তাই নিয়ে অহমিকার উদ্ভব হয়। তার প্রকাশ কর্‌তে চাওয়াটা দোষের হয় নি, দোষের হয়েছে—**"অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান মনে করা।"** তেমনি দেহের পূর্ণ পরিণতিতে মানুষের মাঝে সিসৃক্ষা জাগবেই এবং তাই নিয়ে সে প্রমত্তও হয়ে উঠবে, জোর করে এই সিসৃক্ষাকে চেপে রাখাও সব সময় কল্যাণকর হবে না; যে point থেকে মানুষ out-

line হয়েছে, সেই point এ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দেহের পূর্ণ-পরিণতিকেই সে আত্মার পূর্ণতা মনে করেছে——কামের হেতু এইখানে। অথবা আরও স্পষ্ট কথায়—দেহাত্মবোধই কামের হেতু। "আমি দেহ" এই জ্ঞান থাকতে কাম যাবে না।

এই কথাটীকে সূত্র ধরে কাম জয়ের সঙ্কেত আবিষ্কার করতে হবে। কামজয় করতে হলে আগে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রটীকে তন্ন তন্ন করে দেখতে হবে, কোন্ ধরণের চিন্তা নিয়ে আমাদের মন ব্যাপৃত থাকে। অনেকে মনে করে, কাম-চিন্তা সম্বন্ধে সতর্কতাই কামজয়ের উপায়, কিন্তু এটাও আসল কথা নয়। বরং অনেক সময় "লম্বোদর গজাননের" মত কামচিন্তাকে চাপতে গিয়েই association বশতঃ ওই চিন্তাই আরও বেশী করে জেগে ওঠে। কাম জড়শক্তি, জড়ের চিন্তা হতেই তার উদ্ভব, **অতএব কাম জয় করতে হলে জড়ের চিন্তা ছাড়তে হবে**——এইটীই হচ্ছে আসল কথা। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, (৬২)—

> "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ——"

কামজয় যদি করতে চাও, বিষয়-ধ্যান ছাড়। শুধু objective impression নিও না, be subjective—turn yourself inwards. শুধু বিষয়-চিন্তার ফল হচ্ছে সঙ্গ or strong associations, যাতে মনটা বিষয়ের দিকেই কেবল ঝোঁকে। এই ঝোঁক হতেই কামের উৎপত্তি হয়। কথাটা আরও বুঝিয়ে বলি।

অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করেছ, স্পষ্টতঃ কামচিন্তা না করেও মানুষ সময় সময় কাম দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে। কেন কামের আকস্মিক আক্রমণ হয়, তার হেতু কেউ খুঁজে পায় না। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাতে সর্ব্বত্রই কামচিন্তাকেই কামের হেতু বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আকস্মিক কাম-জাগরণের মূলেও অজ্ঞাতসারে কাম-চিন্তারই প্রভাব রয়েছে বলে বোঝানো হয়েছে। সাধকের দশা এতে হয়েছে একচক্ষু হরিণের মত। তার হুঁসিয়ার চোখটা রয়েছে ডাঙ্গার দিকে, কিন্তু জলের দিক হতেও যে ব্যাধের তীর আসতে পারে, এটী খেয়াল হয় নি।

Psychology ও Physiology কিন্তু কতকগুলি নূতন কথা বলছে, যা থেকে sexual control সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেরুদণ্ডের যে নাড়ী-গ্রন্থি কামের উত্তেজক (Sacrum & pudendal plexus.) তা Reflex centre সমূহের অন্তর্গত। Reflex centre গুলির ধর্ম্মই এই যে মনের volition বা ইচ্ছার যোগ না থাকলেও আপনা হতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে।

আবার আমাদের মাঝে Ideo-motor activity বলে একটা শক্তির খেলা অহরহঃ চলছে। সেটী এই——আমাদের ideaতে বা চিন্তায় যা জাগছে, তা তৎক্ষণাৎ তদনুকূল কোনও motor-activity বা ক্রিয়াতে পর্য্যবসিত হচ্ছে। এই activityর সবটুকু নানা কারণে আমাদের কাজে ফুটে ওঠে না। Activityর যে residue বা অবশেষটুকু থাকে, তা গিয়ে ওই সমস্ত reflex centre গুলিতে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয়ের একটা সীমা আছে, তা পূর্ণ হলেই reflex centre হতেই ওই activity টা বিস্ফুরিত হয়——তখন সহসা অচিন্তিত পূর্ব্ব একটা কিছুতে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। এই অচিন্তিত পূর্ব্ব উত্তেজকের মাঝে কামও যে একটী, তা পূর্ব্বেই বলেছি।

এইজন্যই বলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ততে আন্দোলন থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ীই তা কাজের ইন্ধন জোগাবে। Object এর সঙ্গে যে idea যুক্ত, তার motor activity থাকবেই আর তা **তোমার অজ্ঞাতসারে** কামের reflex centre কে উপচিত করে তুলবে। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যত নিয়মের কড়াক্কড়ই কর না কেন, চিত্ত যদি বিষয়-ধ্যান বা objective impression নিতেই অভ্যস্ত থাকে, তাহলে কামজয়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

বিষয়-ধ্যান কাকে বলব? —দেহাত্মবোধের সঙ্গে যে চিন্তা জড়িত, তাই জানবে বিষয়-ধ্যান। সমস্ত objective thought হতে মনকে বিরত রাখবার চেষ্টা করতে হবে, এই হচ্ছে সাধনার negative side ; positive side হচ্ছে, পাতঞ্জলোক্ত বিদেহ ধারণা (যোগসূত্র ৩।৪৩)। প্রথমতঃ কল্পনা দ্বারা নিজকে শরীরের বাইরে অবস্থিত বলে অনুভব করতে শেখ, তারপর শরীরের অবলম্বন-নিরপেক্ষ হয়েই মন অনন্ত আকাশবৎ হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। এর নাম অকল্পিতা মহাবিদেহা। কামজয়ের পক্ষে এটী একটী অমোঘ উপায়। "কাম চিন্তা করছি না, অতএব আমার কাম জাগবে না।" —এটী মনে করো না ; কিম্বা নানা বিষয়ে মনকে ছড়িয়ে দিয়েও শুধু কাম চিন্তাকে নিরোধ করবার উৎকট প্রয়াসেও যে কামজয় করতে পারবে, তা মনে করো না। শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে রেখো, বিষয়ের চিন্তা হতেই সঙ্গ আর সঙ্গ হতেই কামের উদ্ভব।

চিন্তার দিক থেকে কামজয়ের কথা বলা হল। অবশ্য এইটীই হল আদত উপায়। অন্যান্য স্থূল-সঙ্কেত তখনই কার্য্যকরী হবে, যখন এই মূল সঙ্কেতটী কাজে লাগাবে। এ সম্বন্ধে "রাম কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গের" 'গুরুভাবে' সুন্দর একটী কথা রয়েছে। রামকৃষ্ণদেব নানা যৌগিক প্রক্রিয়ার চেয়ে জপ আর ধ্যানকে কাম জয়ের সবিশেষ উপযোগী সাধন বলতেন। স্বামী যোগানন্দ কেমন করে তাঁর উপদেশ মত শুধু নামজপদ্বারা কামজিৎ হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা সেখানে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা চিত্ত যতই একাগ্র হবে, ততই সত্ত্বগুণের স্ফূর্ত্তি হবে এবং কামও সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে।

এখন ব্রহ্মচর্য্য সাধনার আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটী কসরতের কথা বলি। মনে রাখতে হবে, চিন্তার পরিধিকে সঙ্কুচিত না করে, এই সব কসরত করতে গেলে তেমন কিছু ফল পাওয়া যাবে না। সবার মূল দেহাত্মবোধ, আর সেটা চিন্তা দ্বারাই আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আহারশুদ্ধি আর নিদ্রাজয়ের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। এরা যে ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত অনুকূল, সে বিষয়ে বোধ হয় আর বেশী কিছু বলতে হবে না।

আসন-সাধনা কামজয়ের একান্ত উপযোগী। হেতু সুস্পষ্ট। আসনের লক্ষ্য হচ্ছে স্থৈর্য্যের সুখ, অনন্ত সমাপত্তি, দেহাত্মবোধ হারিয়ে ফেলা ; আর কামের লক্ষ্য হচ্ছে চাঞ্চল্যের সুখ, পশুবোধ, দেহ-বুদ্ধিকে তীব্র করে তোলা। সুতরাং আসন-সাধনা দ্বারা কামজয় করা সর্ব্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থা। সিদ্ধাসন দ্বারা কামজিৎ হওয়া যেতে পারে। যোগীর অধিকাংশ আসনেই হাঁটু দুটী মুড়িয়ে রাখতে হয়। তাতে Sciatic nerveএ টান পড়ে ও সেটী কিছুক্ষণ পরে অসাড় হয়ে যায়। এই Sciatic nerve এর সঙ্গে আবার sexual centre এর নিবিড় যোগ। এইজন্যই সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি আসনগুলি ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত অনুকূল। সিদ্ধাসনে sex-centreকে একেবারে নিষ্পেষিত করে দেয়। (ক্রমশঃ)

শুভযোগ

আজি শান্ত শীতল পরশে
কে গো তুমি মোরে জাগাইয়া দাও হরষে—
বিমল তোমার আঁখির আলোকে
ভুলাইয়া নেয় কোন্ সে গোলকে—
সকল কলুষ-কালিমা আমার মুছাইয়া দিলে দরশে,
এমন শান্ত শীতল পরশে !

কিবা মোহন গন্ধ মাখিয়া
সুপ্ত ভুবনে অমন নীরবে কে গো যাও মোরে ডাকিয়া—
অপূর্ব্ব সেই গন্ধে ভবনে,
পুলকিত তনু শান্ত পবনে,
খুঁজে মরি তোমা সকল ভুবনে প্রাণ কাঁদে থাকি' থাকিয়া
এলে মোহন গন্ধ মাখিয়া।

কেন জাগাও এহেন ভরসা—
জানিতাম ভাল, নাহি হবে শেষ এ জীবনে দুখবরষা—
কেন গো এমন মোহন শরতে,
আসিলে গো তুমি প্রাণের পরতে,
বলে যাও হেসে, রজনীর শেষে ওই যে গগন ফরশা।
কেন জাগাও এহেন ভরসা ?

যদি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে
ভরিলে পরাণ, জাগাইলে মোরে সুখের সাগরে ভাসিতে
জানাইও আসি এমনি আবার,
ভুলে যাই তোমা যবে বারেবার,
স্মৃতিটী জাগা'য়ো হৃদয়ে আমার কতখানি ভালবাসিতে
এমন স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে।

অভয়ের নিদান

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। —ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কদাচ ভয়প্রাপ্ত হন না। সে ব্রহ্ম কিরূপ? "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" —মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মানন্দ বল্লীর দ্বিতীয় বল্লীর চতুর্থ অনুবাকের এই প্রথম অনুবাকটী আমাদের জীবনে এক পরম শক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। জীবন আমাদের অহরহঃ অভাবের তাড়নায়, প্রতিকূলতার সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া যখন ভীতিসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন বেদান্তের এই অগ্নিগর্ভবাণী বুকে এক দুর্ব্বার শক্তির অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়—মনে হয় আমাদের ভয়ের কিছু নাই, বিকট দুঃখরাক্ষসীর সম্মুখ হইতে পশ্চাৎপদ হইবার কিছু নাই। বরং সেই বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের কথায়—Face the devil—and he will be driven—সয়তানের সম্মুখীন হও—সে বিতাড়িত হইবে—এই মহাবাণী বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ ঘটে। পুঁথির বিদ্যা কাজে লাগে।

ভয় কার হয়? যে মরণকে স্বীকার করে। স্বীকার করা বলিতে মরণকে ভুল অর্থে যে বুঝিয়া লয়, তাহারই কথা হইতেছে। যদি মরণ অর্থে আমরা শুধু বিনাশই বুঝি, তবে ভয় হইবারই তো কথা। কেন না, কে এমন অবশ্যম্ভাবী বিনাশকে সাদরে বরিয়া লয়? আমরা আনন্দ চাই, তাই তাহাকে বরিয়া লই—তাহার জন্য কত আয়োজনে ব্যস্ত হই। কিন্তু দুঃখকে বরণ করিব কেন? বিনাশ তো আমাদের কাছে দুঃখময়—তাই আমরা বিনাশ বা মরণকে চাই না। কিন্তু মরণের যদি অন্য অর্থ হয়, যদি অধিকতর আনন্দ লাভের কারণ হয়, তবে আর তাহাকে ভয় কি? কিন্তু সে আনন্দ যে পাইবে, এই দেহ পতনের পরবর্ত্তী অবস্থান্তরে যে আনন্দ মিলিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? বরং আমার যে ধরণের কর্ম্মের বহর, তাহাতে বিপরীত দুঃখই অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

তাই কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। অতীত কর্ম্মের ফল, যাহা আমাকে প্রারব্ধরূপে দিন দিন জ্বালাইয়া মারিতেছে, তাহার হাত হইতে যখন নিস্তার নাই, তখন যে কোন উপায়ে হউক সেই জ্বলুনির প্রতিকার করিতে হইবে। প্রাণের মধ্যে যদি দুঃখবিরোধী আনন্দের বিপুল সঞ্চয় বহন করিতে পারি, তবেই এই দুঃখ-বরষার অবিরত জলধারা প্রাণের অদম্য তেজঃপুঞ্জকে মলিন করিতে সমর্থ হইবে না। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভম্" বলিয়া যে প্রাক্তন কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ভোগের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, বা সাধারণ লোকে যাহাকে অদৃষ্ট বলিয়া থাকে, সেই অদৃষ্ট বা ভাগ্যকে (lot) এইরূপেই অতিক্রম করিতে হইবে। যাহাই সম্মুখে আসুক না কেন, প্রাণের ভিতরকার সেই অদম্য আনন্দের অগ্নিতেজে মণ্ডিত করিয়া, শুদ্ধ করিয়া, তাহাকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে। তারপর তাহা গ্রহণ করিলে আর তাপ থাকিবে না। দুঃখের তাপকে এমনি অন্তরের আনন্দে শীতল না করিলে আর উপায় নাই।

কিন্তু প্রারব্ধ ভোগকে না হয় এই ভাবে হজম করা গেল, তারপরও যে আবার কুকর্ম্ম জমিয়া

জমিয়া মহাভীষণ দুঃখ-বিভীষিকা সৃষ্টি করে, সেই ভবিষ্য দুঃখের বীজস্বরূপ যে বর্ত্তমান এই ক্রিয়মাণ কর্ম্ম, তাহার পরিশুদ্ধি হয় কি করিয়া? এই সমস্ত কর্ম্মদোষে যে ব্রহ্মের আনন্দকে আপনার মাঝে অনুভব করিয়া আমরা তাহার শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না। তার মাঝে প্রারব্ধ-কর্ম্মের উপর না হয় হাত নাই, কিন্তু ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে শুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন না করিলে, আনন্দের পথকে যে ভবিষ্যতের জন্যও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানের দুঃখের চাপেই প্রাণ যায়, ভবিষ্যতের আনন্দের আশাটুকুও না থাকিলে শেষের উপায় কি হইবে?

এখানে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন যে, জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না; আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইলে তাহার দোষ বা গুণ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। এ সম্বন্ধে মতান্তর রহিয়াছে। কিন্তু সকল মতেই এ কথা একান্ত স্বীকার্য্য যে, "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ"—দুশ্চরিত বা দোষদুষ্ট কর্ম্ম হইতে বিরত না হইলে আধ্যাত্মিক জগতে তাহার কিছু হইবে না। ব্রহ্ম কখনও দুষ্কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হন না। দোষ বা দুঃখজনক, পরিণামে ভয়াবহ অথচ আপাত মধুর যে সমস্ত কর্ম্ম, তাহার মাঝে—সেই অপবিত্রতার মধ্যে, ব্রহ্মের বিকাশ একরূপ অসম্ভব। হয়ত বলিবে, তিনি যখন সর্ব্বত্র বিরাজমান তখন এই বৈষম্য কেন? বৈষম্য বিকাশের দরুণ।

সর্ব্বত্র অগ্নি থাকিলেও যেমন একস্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইলে বিশেষ আয়োজন দরকার হয়, তেমনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে যদিও ব্রহ্ম অনুস্যূত, তথাপি বিশেষ একটী আধারে তাঁহার প্রকাশের জন্য বিশেষ বিধি অবলম্বন করিতে হয়। তাহার মধ্যে প্রথম বিধিই হইল সৎকর্ম্ম। বাঙ্গালায় নীতি বা ইংরেজীতে moral বলিতে যাহা বুঝায়, জীবনের প্রারম্ভে বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রথমেই সেইগুলি পালন করিতে হয়। তাই পাতঞ্জলোক্ত যোগবিধানেও প্রথমেই যম ও নিয়ম নামে কতকগুলি অবশ্য পালনীয় বিধান আছে। যেমন, যম:—"অহিংসা-সত্য--অস্তেয়--ব্রহ্মচর্য্য--অপরিগ্রহা যমাঃ।" এবং "শৌচ---সন্তোষ--তপঃ--স্বাধ্যায়--ঈশ্বর---প্রণিধানানি নিয়মাঃ।" বৈনাশিকবাদী বৌদ্ধও এই সকল বিধান মানিয়া থাকেন এবং সৎকর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী জন্মান্তর গ্রহণের বহু উপাখ্যান বৌদ্ধ-জাতকে পাওয়া যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-খৃষ্টান বা মুসলমান প্রভৃতির ধর্ম্ম বিষয়ে স্থানে স্থানে মতানৈক্য থাকিলেও সুনীতি বা সৎকর্ম্মই যে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সোপান, এ বিষয়ে সকলেরই একমত। সৎকর্ম্ম বলিতে আরও একটু বিশেষত্ব আছে।

আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তের মধ্যেই সাধারণতঃ জ্ঞান, কর্ম্ম, ইচ্ছা, এই তিনটী যুক্ত থাকে। যে বিষয়টী নিষ্পন্ন করিতে চাই, সে বিষয়টী জানা চাই, ইহাই জ্ঞান নামে অভিহিত হইতেছে। তারপর কর্ম্ম নিষ্পাদন; তৎসঙ্গে কর্ম্মজনিত ইচ্ছা বা তাহার ফল আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। এই কল্পনা পর্য্যন্ত বিশেষ দোষের নয়, কেননা ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের হৃদয়ের একটা বিশেষ আকর্ষণ, সুফলে হর্ষ, কুফলে বিষাদ—এই আসক্তিই সমস্ত অনর্থের মূল। যদিও ইহা সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক, তথাপি এই আসক্তি পরিত্যাগ করা চাই। নতুবা সে কর্ম্ম যতই সৎ হউক না কেন, আসক্তির বিন্দুমাত্র মিশ্রিত হইলেও প্রচুর দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র পতনে দুগ্ধের বিকৃতির মত সে কর্ম্ম অসৎ হইয়া পড়ে। হয় ত সাধারণ দৃষ্টিতে লোকের কাছে সে সব কর্ম্ম সৎকর্ম্ম বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারে,

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ লাভের পক্ষে যেহেতু তাহা অন্তরায়, অতএব অসৎ, সুতরাং আসক্তি পরিত্যাজ্য।

কর্ম্মের মাঝে আসক্তি ত্যাগ, বিশেষতঃ সৎ-কর্ম্মের মাঝে, খুবই কঠিন কথা। কেন না, অসৎ-কর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্তির টানকে পরাস্ত করাই শক্ত, তবুও নীতির দোহাই দিয়া এবং লোকলজ্জার খাতিরে তবু কোনও মতে অসৎ কর্ম্মের প্রলোভন ত্যাগ করা যায়, কিন্তু সৎ কর্ম্মের মাঝেও নাম-কামের গন্ধ রাখিব না, শুধু কাজের জন্য কাজ, duty for duty's sake—ইহা বড়ই হৃদয়হীন বলিয়া প্রথমে মনে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যস্থিত মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সৎ কর্ম্মের জন্য যে পরিমাণ হর্ষসুখ আমাদের মনে আসিয়া দেখা দেয়, reaction বা প্রতিক্রিয়ায় আবার ঠিক ততখানি দুঃখ বা আত্মগ্লানি আসিয়া আমাদের সমস্তখানি হৃদয় অন্ধকারে আবৃত করে। সুতরাং ব্রহ্মের স্থায়ী বা শাশ্বত আনন্দ এইরূপে রজঃ এবং তমোগুণান্বিত মনের পক্ষে সুদূর-পরাহত। বরং অসৎ কর্ম্মের নিন্দা সহনীয়, কিন্তু সৎ কর্ম্মের প্রশংসা মানুষের আত্মোন্নতি বা ক্রমোন্নতির পক্ষে মহা অন্তরায়, সুতরাং দুঃসহ।

মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে সৎ কর্ম্মের পুরস্কার কি? কিন্তু এ কথা মনে হওয়াই যে আসক্তির লক্ষণ! পুরস্কার চাইলেই তিরস্কার জুটিবে। আর না চাইলে আপনি আসিবে। সেই না চাওয়ার ফলে যাহা আসে, তাহা বুক ছাপাইয়া উপচিয়া পড়ে। প্রার্থিতের ক্ষুদ্রত্বের তুলনায় তাহা এত বৃহৎ যে, মানুষ প্রথমে হয়ত তাহা কল্পনা করিতেও অক্ষম হয়। জগতে কোন কিছুই যখন বিফল হয় না—প্রত্যেকেরই যখন কোনও রকমে সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তখন সৎকর্ম্মেরও যে একটা কিছু সুফল আছেই, ইহা তো নিশ্চিতই রহিয়াছে। সুতরাং সেজন্য মনটাকে ব্যস্ত না করিয়া বরং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারা দেবতার করুণা এবং পরবর্ত্তী আরও উচ্চতর কর্ত্তব্য যাহাতে অধিকতর সুন্দররূপে নিষ্পন্ন করা যায়, সেজন্য আপনার আর্ত্তি জানাইয়া প্রার্থনা করিতে হয়,—যেন উর্দ্ধ জগতের দেবতাগণ কর্ত্তব্য সম্পাদনে শক্তি ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য করেন।

সাধারণতঃ জগতে আমাদের একমাত্র আনন্দের কারণ অর্থ। অর্থ ভিন্ন কিছুতেই মন ভরে না, তাই অর্থই আমাদের অনর্থের মূল বা নিরানন্দের কারণ। শক্তি বা উৎসাহ সমস্ত নিহিত থাকে আমাদের অর্থের ভিতর। তাই ইংরেজীতে একটা কথা প্রচলিত আছেযে Silver is the best tonic টাকাই একমাত্র পুষ্টিকর ঔষধ। যত দুঃখ-দারিদ্র্য-অশান্তি-নিরানন্দ সমস্তের মূল অর্থের অভাব। অর্থ-সামর্থ্যে শত্রুকেও বশ করা যায়, আর অর্থের অভাবে অতি প্রিয় জনের সঙ্গেও মহা অনর্থ ঘটিয়া যায়। কিন্তু এই অর্থই যদি একমাত্র শান্তির ও আনন্দের কারণ হয়, তবে লক্ষ লক্ষ ক্রোড়পতিরাই একমাত্র সুখ-শান্তি ও আনন্দের ভাগী হইতেন। অর্থই যদি সুখের বা আনন্দের নিদান হয়, তবে রাজা মহারাজদিগের আর অশান্তির কারণ থাকিত না। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বা মুনিঋষির জীবন বিফল হইত।

অর্থের সাময়িক আনন্দের পিছনে ভয় আছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কাছে তাহা ব্রহ্মানন্দের তুল্য মনে হইলেও আসলে তাহা নয়। যদি ভয় না থাকিত, চির দিন সুখ বিধান করিতে পারিত, তবে তাহা ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তুলিত হইতে পারিত। কিন্তু 'ন বিভেতি কদাচন'—এই পরম নির্ভীকের ভাব একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন আর কোথায়ও নাই। তাই একমাত্র কর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া ধার্ম্মিকই

প্রকৃত সুখী ও আনন্দের অধিকারী। তাঁহারই শুধু মুখের হাসি ফুরায় না। এখানেই ধন-গর্ব্বিতের উচ্চ মস্তক অবনত হয়।

কিন্তু ধর্ম্ম পথেও সাধনা আছে, সংগ্রাম আছে। সৎকর্ম্ম প্রচেষ্টায় বিফলতাও মাঝে মাঝে সাধককে অবনত করিতে চাহে। সাধনার দুঃখ অর্থের দুঃখের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। কেন না, অর্থ এই জগতে অন্য কাহারও কাছে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধনার দুঃখ দূর করিতে পারে, এমন মানুষ কোথায় পাওয়া যায়? আধ্যাত্মিক রাজ্যে পরম শক্তিশালী ভগবৎকল্প, পরম দুর্ল্লভ, একমাত্র শ্রীগুরু ভিন্ন এ জগতে সে বান্ধব আর নাই। কিন্তু তাহার মাঝেও অনেকখানি নির্ভর করে আপনার সেই সৎকর্ম্মের উপর। জ্ঞান-কর্ম্মে সমুচ্চয় হউক বা না হউক, কর্ম্মদ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা যে সৎ কর্ম্ম, ইহাতে কারও আপত্তি নাই, এবং তৎসাধনে সবারই এক মত।

কাজেই কর্ম্মের পথে "অভীঃ" হইতে হইলে একমাত্র সৎকর্ম্ম ও আসক্তিহীন কর্ম্ম প্রকৃষ্ট। লক্ষ্য যদি সত্য লাভ হয়, তবে তুচ্ছ-জীবন উৎসর্গ করিবার মত সাহস ও উৎসাহ চাই। মরণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জীবনের পথে সত্যের অন্বেষণে নিয়ত, সেই মরণজয়ী সাধকদিগকে এই জগতের আর কোন্ ভয় ভীত করিবে? সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভয় মৃত্যুই যদি পদদলিত হয়, তবে সে সব বুকে আনন্দ ভিন্ন আর কোনও দুঃখের স্থান থাকিতে পারে না। আনন্দই তাহাদের পথ আলোকিত করে—সৎকর্ম্মের আনন্দই সমস্ত অবসাদ, নিন্দা-কালিমা, পূর্ব্ব শোক বিস্মৃত করাইয়া পরম উৎসাহের—মহাশক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। সে আনন্দের কাছে বাহিরের তুচ্ছ আনন্দ, সকল গৌরব অতি সহজে আয়ত্ত ও অবনমিত হয়। কিন্তু সেই নির্ভয়ের আনন্দ যেমন সকলকে তুচ্ছ করে, তাহা অর্জ্জনের সময়েও তেমনি বাহিরকে আমাদের তুচ্ছ করা চাই। অবাঙ্-মানস গোচরকে জানিয়া নির্ভীক হইতে হইলে বাহিরের বাক্য-মনের লালসা ছাড়িতে হইবে। নতুবা ইহারাই ভয় আনিবে।

—×—

গুরু নানকের বাণী

আদি গুরয়ে নমহ।
যুগাদি গুরয়ে নমহ।
সতি গুরয়ে নমহ।
শ্রীগুরুদেবয়ে নমহ।

আদিগুরুকে নমস্কার, যুগাদি গুরুকে নমস্কার, সদ্‌গুরুকে নমস্কার, শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার!

ধর্ম্ম-জীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে, সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া যায়। গুরু নানকের ভিতরও এই অসাম্প্রদায়িক ভাব বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উপদেশগুলি শুনিলে প্রাণ শীতল হইয়া যায়। 'সুখমাণ' গ্রন্থ হইতে কয়েকটী ছন্দ উদ্ধৃত করিবার মনস্থ করিয়াছি।—

যিউ মন্দরকউ থামৈ থংমন।
তিউ গুরকা শবদ মনহি অসথংমন ॥

—যেমন স্তম্ভসকল মন্দিরকে রক্ষা করে, তেমনি গুরুদত্ত মন্ত্র মনকে স্থির রাখে।

গুরুদত্ত মন্ত্রকে স্তম্ভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। স্তম্ভই যেমন গৃহের রক্ষক, তেমনি গুরুমন্ত্রও মানবের প্রধান সম্বল। মনের চঞ্চলতাতেই আমাদের দেহ-রূপ গৃহ ঠিক থাকে না—এই চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে দৃঢ় খুঁটার প্রয়োজন। গুরুমন্ত্রই সেই অবলম্বন বা খুঁটা। দীক্ষা যাঁহাদের হইয়া গিয়াছে, জীবনে তাঁহারা মস্ত বড় খুঁটা পাইয়াছেন। আর কিছুতেই তাঁহাদের টলাইতে পারিবে না। স্তম্ভ যেমন স্থির—অচঞ্চল ভাবে মন্দিরকে ধারণ করিয়া আছে, গুরুদত্ত মন্ত্রও মনকে ঠিক সেই-ভাবে স্থির—অচঞ্চল ভাবে ধারণ করিয়া রাখে। মনকে আপন বশে আনিতে হইলে অর্থাৎ স্থির করিতে হইলে—গুরুমন্ত্র ছাড়া আর কোন উপায় নাই। যাঁহার মন আপন বশে, যাঁহার মনে স্থৈর্য্য আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি তো পরম ভাগ্যবান্। গুরুদত্ত মন্ত্রের জোর কত—স্তম্ভের ন্যায় অচল—অটল। জীবনের দৃঢ়ভিত্তি সদ্‌গুরু প্রদত্ত নাম। এই নাম যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা নিজেও ধন্য আবার তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসেন, তাঁহারাও ধন্য। নামে যাঁহার চিত্ত স্তম্ভিত, নাম-মাহাত্ম্য তাঁহাদ্বারাই প্রচারিত হয়। নানক বলেন—ভব-সমুদ্র হইতে তরিতে হইলে এই নামেরই শরণ লও।

যিউ পাষাণ নাব চড় তরৈ।
প্রাণী গুর চরণ লগত নিসতরৈ॥

—পাষাণও যেমন নৌকায় চড়িয়া পার হয়, তেমনি মানুষও গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া উদ্ধার হয়।

সাধারণের চিত্ত-মন-দেহ মলিনতায় ভারী, এই পাপের বোঝা লইয়াও তরিবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করা। পাষাণ নিজে ভারী, কিন্তু তাহাকেও নৌকায় তুলিয়া পার করা যায়। ভবসমুদ্র পার হইতেও শ্রীগুরু-চরণ-তরণী ছাড়া আর উপায় নাই। নিদারুণ বোঝাও যিনি হাল্কা করিয়া লন—তিনিই তো গুরু। সেই গুরুচরণে যাঁহারা আশ্রয় পাইয়াছেন তাঁহাদের আর চিন্তা কি?

যিউ অন্ধকার দীপক পরগাসু।
গুর দরশন দেখ মন হয় বিগাসু॥

—অন্ধকারে যেমন দীপ আলোকিত করে, সেই-রূপ গুরু দর্শনে মন বিকশিত হয়।

প্রদীপের দীপ্তিতে যেমন অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, সবদিক আলোকিত হইয়া উঠে, তেমনি গুরুর দর্শনেও মনের জড়ত্ব বা অন্ধকার ঘুচিয়া মন সম্পূর্ণ-রূপে আলোকিত হইয়া উঠে। এই মন দ্বারাই কিন্তু ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে মনের মাঝে গলদ থাকে বলিয়াই তো আমরা জ্যোতির্ম্ময় দেব-তাকে দেখিতে পাই না। মনের ময়লা যাঁহার কাটিয়া গিয়াছে—তিনিই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন। মন তো জড়—অচেতন—কিন্তু সেই জড়তাগ্রস্ত মনেও দিব্যালোকের জ্যোতি পড়িলে—এই মনই তখন সোনার রং ধরে। এই মনই তখন হয় পরম বন্ধু।

যিউ মহা উদিয়ান মহিমারগ পাবৈ।
তিউ সাধুসঙ্গ মিলজোত প্রগটাবৈ॥

—সাধুসঙ্গ দ্বারাই পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়, সেই জ্যোতির সাহায্যে গহন অরণ্যও অনায়াসে পার হইয়া যাওয়া যায়।

সংসার একটা গহন অরণ্যই বটে। ইহার ভিতর পথ পাইতে হইলে সাধুসঙ্গ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সাধুসঙ্গ দ্বারা মনের ময়লা কাটে, মন পরিষ্কার হইলে বাহিরের পথও পরিষ্কার। জঙ্গল বাহিরে নয়—মনে। এই মনটাকে সাফা করিতে পারিলেই বাহিরের সংসার-অরণ্যের ভিতরও আর দিশেহারা হইতে হয় না। মন পরিষ্কার হইলেই পথ মিলে। মন পরিষ্কারের উপায়—সাধুসঙ্গ।

নানক বলিতেছেন—"সেই সাধুর চরণধূলিই আমি বাঞ্ছা করি, হে হরি আমার মনের বাসনা পূর্ণ কর।"

কবহু সাধ সংগত ইহু পাবৈ।
উস অস্থান তে বহুর না আবৈ॥

—সাধুসঙ্গ বড়ই দুর্ল্লভ, কচিৎ কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে। একবার সাধুসঙ্গ লাভ হইলে মন আর নীচে ফিরিয়া আসে না। সাধুসঙ্গের যে দিব্য-আনন্দ সেই অবস্থাতেই চিত্ত সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকে।

অংতর হোয় জ্ঞান পরগাশ
উস অস্থান কা নহি বিনাশ।

—সাধুসঙ্গের গুণে অন্তরে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানের আর বিনাশ নাই—বিস্মৃতি নাই। সেই জ্ঞান কি—পূর্ণ-চেতনা, আর কিছুই নহে। জ্ঞান অবাধিত হইলেই বুঝিবে সত্য জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছ। দিব্য-জ্ঞান কোন কিছুর আড়ালে পড়িয়া অদৃশ্য হয় না—তাহার দীপ্তিতে সকল আবরণ ঘুচিয়া যায়। সাধুসঙ্গ দ্বারাই হৃদয়ের সকল স্তরে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করে।

মন-তন নাম রতে ইক রংগ।
সদা বসহি পারব্রহ্মকৈ সংগ॥

—যিনি সাধুসঙ্গ পাইয়াছেন, তাঁহার শরীর-মন এক নামের রঙ্গে রঞ্জিত থাকে। তিনি সদাই পরব্রহ্মের সঙ্গে বাস করেন।

সাধুসঙ্গগুণে যিনি নামের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার মন নয় শুধু—দেহও নামের রসে বিভোর। তন-মন নামের রঙ্গেই রঞ্জিত হইয়া উঠে।

যিউ জল মহি জল আর খটানা।
তিউ জ্যোতি সংগ জোত সমানা।

মিট গয়ে গবন পায়ে বিশ্রাম।
নানক প্রভকৈ সদকুরবান্॥

—যেমন মহাজলের মধ্যে ক্ষুদ্রজল মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, যেমন মহাজ্যোতির মাঝে ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ এক হইয়া থাকে, তেমনি সাধুসঙ্গ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যাওয়া আসাও মিটিয়া যায়, তিনি বিশ্রাম পান। নানক সেই প্রভুকে সদাই বলিহারি যান—যাঁহার কৃপায় মানুষের আসা-যাওয়ার ইতি হয়।

পারব্রহ্মকে সগল ঠাউ।
যিত যিত ঘর রাখৈ, তৈ সা তিন নাউ॥

—উপনিষদের কথা—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।" পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। পরব্রহ্মই নিজকে অনন্ত আধারে বিলাইয়া অনন্ত নামে অভিহিত হন। জল একই—কিন্তু আধার ভেদেই ভিন্ন নামকরণ হয়, —যেমন পুষ্করিণী, দীঘি, নদী, সমুদ্র। পরব্রহ্মই অনন্ত কোটী জীবে অনন্ত তারকার ন্যায় প্রতিভাত হন।

আপে করণ করাবন যোগ।
প্রভভাবৈ সেই ফুনি হোগ॥

"—তিনি আপনিই সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সৃষ্টি করেন। যাহা যাহা তিনি ভাবেন, তাহাই হয়।" তিনি সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার একটী ভাবনাও ব্যর্থ যায় না। বাইবেলে আছে—"Let there be light and there was light." ভগবানের সৃষ্টি হয় ইচ্ছামাত্রই—তাঁহার ইচ্ছার অমন অমোঘ শক্তি। সেই ইচ্ছাময়কে আমি বারংবার নমস্কার করি।

পসরিয়ো আপ হোয় অনন্ত তরঙ্গ।
লখে ন যাহি পারব্রহ্মকে রঙ্গ॥

—অনন্ত তরঙ্গে নিজকে প্রসারিত করিয়া তিনি অনন্ত হন। তাঁহার রহস্য বুঝা ভার।

যৈসি মত দেয়, তৈসা প্রগাশ।
পারব্রহ্ম করতা অবিনাশ॥

সদা সদা সদা দয়াল।
সিমর সিমর নানক ভয়ে নিহাল॥

—যাহাকে যতটুকু বুঝিবার শক্তি দেন তিনি, সে ততটুকুই বুঝে। সেই কর্ত্তা—পরব্রহ্ম অবিনাশী। নানক বলিতেছেন—"সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

দেবতার টান

জীবনে দুঃখ পায় সকলেই, আবার আনন্দও সকলেই পায়। তুমি হয়ত ভাবছ তোমার মত এত কষ্ট সয়ে মানুষ হয়েছে খুব কম লোকেই; কাজেই দুঃখের ভাগটা তোমার জীবনেই বেশী। কিন্তু খুঁজে দেখ, তোমার চেয়ে শত শত জীবন কত বেশী দুঃখ কষ্টে ভরা। তুমি হয়ত দুঃখের আঘাত যেমন ক'রে হোক্ স'য়ে স'য়ে এখন মানুষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু কতজন এখনও যে চোখের জলে বুক ভাসিয়েও দিনের নাগাল পাচ্ছে না! কিন্তু তবু বলি, তাদের জীবনেও আনন্দের ক্ষণিক শিহরণ একদিন এসেছিল। জীবনের প্রভাতে ভাগ্যাকাশে যার যতটুকু আলোর রেখাপাত হয়েছে, জীবনের মধ্যাহ্নে তারই স্মৃতি বড় মধুর—বড়ই হৃদয়-দ্রাবক হয়ে দেখা যায়। যদি তখন আনন্দের কিছুই না থাকবে, তবে তার স্মৃতিটুকুই বা অমন হৃদয়গ্রাহী হবে কেন? বাইরের পারিপার্শ্বিক না হয় প্রতিকূল ছিল, কিন্তু শিশুমনের আধ ফোটা ফুলের মত কত যে অপ্রকাশ্য আনন্দের দ্যোতনা কত সময়ে এসে গেছে, বাইরের কত তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন ক'রে হৃদয়ে যে কত সুরের কত গান তখন গীত হয়েছে, কে তার হিসাব রাখে?

কেবল শৈশব নয়, জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই এমনিভাবে আমাদের হিসাবের বাইরে অনেক কিছু আনন্দের এবং অনেক কিছু দুঃখের ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মৃতিপটে আমাদের কেবল দুঃখের কথাগুলিই প্রবল থাকে, এই ভবিষ্যতের দুঃখে প্রাচীন দুঃখের কাহিনীই মনে জাগে। আনন্দে সুপ্ত স্মৃতি সেই অসময়ে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে না। যদি বিশেষ গভীরভাবে বিচার করা যায়, তবে দেখা যাবে, কেউ কখনো জীবনে দুঃখের বোঝা বেশী বহন করে না। আনন্দের তুলনায় দুঃখের বোঝা বেশী হলে মানুষ তার চাপে অতলে তলিয়ে যেত। জীবন তার দুর্ব্বিষহ হয়ে মরণই একমাত্র কাম্য হত। কিন্তু কই মানুষ তো মরতে চায় না!

দুঃখের অনুভূতি প্রবল হয়ে আনন্দের কারণ বা স্মৃতিকে যতই দমিয়ে রাখুক, সত্যি যদি মানুষ দুঃখের অন্তরালে কোথাও না কোথাও আনন্দ না পায়, তবে সে বাঁচতে চায় কেন? হয়ত বলবে, ভবিষ্যৎ আনন্দের আশায়। তাহ'লে বল যে, ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনা এখন তার ভিতর আনন্দের দ্যোতনা নিয়ে এসে তার মাঝে বাঁচবার সাধ

জাগিয়ে রাখছে। কাজেই স্বীকার কর যে, সে বর্ত্তমানেও কল্পনার ভিতর দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। সেই আনন্দকে আরও ব্যাপকভাবে স্থূলে নামিয়ে আন্‌বার আশাতেই সে এখন বাঁচতে চাইছে। হয়ত জীবনে তা ঘট্‌বেই না, তবু সেই কল্পনায়, সেই প্রচেষ্টায় সুখ আছে। কাজেই আনন্দের আশাতেই বেঁচে থাকা। এই যে জগন্ময় এত সোরগোল, দুঃখের এত হাহাকার, এ সব দেখে শুনেই মনে করো না যে জগৎটা দুঃখময়। বরং গভীর ভাবে ভাবলে দেখবে, জগৎটা আনন্দময়। আনন্দের আশাতেই এই কর্ম্মময় জগতের সৃষ্টি, আনন্দের শক্তিতেই এই জগৎ চল্‌ছে, আবার ওই যে মরণ বা বিনাশ, সেও আনন্দেরই নিগূঢ় কারণ।

যদি বল কি রকম? আনন্দে সৃষ্টি হয়, এ কথা মানি। অথবা আনন্দে স্থিতি হয়, এও বুঝলাম বা জানি. কিন্তু আনন্দেই বিনাশ, এ কথা কি ক'রে শুনি? কিন্তু কেন হবে না? মন্দ যে অবস্থা তোমার অভিপ্রেত নয়, সেই জীর্ণ মলিনকে পরিত্যাগ ক'রে নূতনকে পাওয়া কি আনন্দের নয়? শীতান্তে বসন্ত, নিশান্তে অরুণালোক, মরণান্তে জীবন কার না আনন্দদায়ক? বর্ত্তমান বিনাশকে মানুষ চায় না, বর্ত্তমান আনন্দের অভাব হবে ব'লে। কিন্তু বর্ত্তমান অপ্রীতির মাঝে সামান্য প্রীতির ক্ষীণ রশ্মিটুকু অন্তর্হিত হয়ে যদি আনন্দের জ্যোতির উৎস প্রাণকে স্নিগ্ধ শীতল করে দিয়ে যায়, তবে সেই নূতনের অভিনন্দনে জীর্ণ মলিন বস্তুকে কেন বিসর্জ্জন দিবে না? তাই বল্‌ছি, মরণ বা বিনাশেও আনন্দ বর্ত্তমান।

তাই ঋষির উল্লাসবাণী—"আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে সংশ্রিয়ন্তে বিলীয়ন্তে চ।"—আনন্দ হতেই এই জগৎ জন্মাচ্ছে, টিকে থাকছে এবং বিলয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এই জীব বিলীন হওয়া আর জন্মানো অহরহ চল্‌ছে, তাই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অন্ত নাই। এ কথা উঠতে পারে না যে, যা আছে তা যদি গেল, তবে আর থাক্‌বে কি? আনন্দময় জগৎপাতার এই জগদাসন কখনও শূন্য থাকে না। সৃষ্টির যেমন আদি নাই, তেমনি অন্তও নাই। নূতন নূতন রূপ বদ্‌লিয়ে, নূতন রস জুগিয়ে সেই শাশ্বত-রসময়ের সনাতন সৃষ্টি চল্‌ছেই। যা যাচ্ছে, তার স্থানে নূতন এসে বস্‌ছে। বরাবর এমনি চলেছে, চল্‌ছে ও চল্‌বে। আবার যে নূতন আস্‌ছে, সেও প্রাচীনের সমস্ত সম্পর্ক-শূন্য নয়। তাহলে যে সনাতন এই সৃষ্টি-সঙ্গীতের সুর তান বা লয় ভঙ্গ হয়! তাই বুঝি ঋষি বল্‌ছেন—

> সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
> দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

—বিধাতা পূর্ব্বের মতন সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষাদি সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু সবই যথা-পূর্ব্বম—পূর্ব্বমনতিক্রম্য, আগের কিছু অতিক্রম না করে। মনে হতে পারে যে, তাতে আনন্দ কোথায়? 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্' যদি হয়, তবে আর স্ফূর্ত্তি কই? আছে। যদি তার মাঝে নূতন ভাবের নব রসের উন্মাদনা থাকে, তবে সে যেমন ভাবেই আসুক না কেন, আসল ভিতরের সৌন্দর্য্যে সকলের প্রাণ আকৃষ্ট হয়, প্রাণ ভরপুর হয়। তাই বসন্ত চির-পুরাতন হয়েও চির-নবীন। সেই চির-পুরাতন ভাবেই—

> "অদ্যাবধি নরলীলা করে গোরা রায়।
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

কিন্তু কি করে সেই ভাগ্যবান হওয়া যায়?—চির আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়? আনন্দেই যদি জগৎ এখনও বিধৃত, তবে আমরা তার সন্ধান পাই না কেন? কিসে এই পোড়া আঁখি বাঁধনশূন্য হয়ে সেই আনন্দ-লীলাদর্শনে সমর্থ হয়? জগৎ ভরা যদি

সেই সুধা পরিব্যাপ্ত. তবে আমার প্রাণে কেন তার সাড়া নাই? এখানেই মানুষের গলদ। বেদান্ত বলেন, আছে গো আছে। তোমার মাঝেও আনন্দ আছে। জগৎ ভরা যদি আনন্দ থাকে, তবে তোমার মাঝেও কি তা না থেকে পারে?—তুমি কি জগৎ ছাড়া? জগৎ আনন্দে ভরে আছে আর তুমি সৃষ্টি ছাড়া হয়ে পড়ে থাকবে, করুণাময়ী জগজ্জননীর এমন বিধান নয়। তিনি আকাশ-বাতাসে সকলের মনে প্রাণে আপনি অনুস্যূত থেকে আনন্দের ফল্গুধারা হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সে কান্ত মধুর মূর্ত্তি চিনে ফেলে কত সাধকভক্ত তাঁকে ধর্‌তে জীবন উৎসর্গ করেছেন—কোথায় ফেলে গেছেন তাঁদের ঘর-সংসার—স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব! তারা পড়ে আছে শুধু চোখে ঠুলি দিয়ে সংসারের মায়ায়, আর আপনার মাঝের সে আনন্দ না দেখে দিনরাত কেবল হাহাকারের কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুল্‌ছে।

একবার কেউ ভাল করে নিজের দিকে তাকায় না। আঁচলে গেরো দেয়া আছে মানিক, অথচ হা-অর্থ হা-অর্থ ক'রে জগন্ময় ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। বেদান্ত বলেন, নিজের বুকের আয়নাখানা একটু ভাল করে পরিষ্কার করলে, তার মাঝেই এই জগতের আনন্দময় রূপ বা আপনার স্বরূপ ফুটে উঠবে। নিজের কানে কলম গুঁজে সারা গ্রাম তা খুঁজে বেড়ালে কি তা পাওয়া যায়? কিন্তু এমনি ভুলে ভরা আমাদের জগৎ, অথবা এমনি ভুলো আমরা যে কে কাকে সেই ভুল ভাঙিয়ে দেখিয়ে দেবে? সকলেরই এক অবস্থা। সবাই শুধু বুকের আগুনে জ্বলে মরছে, তারই মাঝে যে তা নিবানোর সন্ধানও রয়েছে, তা কে কাকে দেখিয়ে দেয়?

তবে কেমন করে আপনার মাঝের সেই রত্নাকরের সন্ধান পাওয়া যাবে? সেজন্য ডুবতে হবে আপনাকেই। তারপর যদি কেউ বাইরে থেকে এসে সাহায্য করে, তবে তো সেই গুরুরূপী মহাজনের কাছে প্রাণ-মন বিকিয়ে যাবেই; কিন্তু বাইরে কেউ তেমন না এলেও অন্তরে তাঁর দেখা মিলবেই। এঁরই মোহন বাঁশীর সুতান শুনে শুনে পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যদি তার কাছে প্রবঞ্চনা না করি, তবে শেষ পর্য্যন্ত এই মহাঘোরে তাঁর বাঁশী হৃদয় ভরে শুন্‌তে পাবই। তাঁর রূপে উজল হয়ে অন্ধ আঁখি আমার খুলে গিয়ে আপনার মাঝে সেই আনন্দের বিশ্বরূপ দর্শন হবেই হবে। এই বিশ্বাসটুকু দৃঢ় রাখতেই হবে। আর কিছু না পারি, অন্তরের অন্তঃস্থলে যেই মহান্ আকর্ষণে প্রাণ-মন বাইরে ছুটে গিয়ে আঘাত খেয়ে মরে, তাকে ফিরিয়ে এনে ঘরমুখো কর্‌তেই হবে। বাইরে আমি লোকের কাছে চোর-বদ্‌মায়েস প্রবঞ্চকাদি যত আখ্যাই পাই না কেন, অন্তরের অন্তর হতে সেই মহাজন নিয়ত আমায় তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন, সেই অন্তর্য্যামীর কাছে আমি ত কখনও উপেক্ষিত নই! সবাই আমাকে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু সে তো তা পার্‌বে না!

তাঁরই সন্ধানে গিয়ে, তাঁরই কাছে মন-প্রাণ খুলে দিতে হবে। সমস্ত জগৎ আমার একাকার হয়ে তাঁরই পায়ে লুটিয়ে পড়ুক, সব মুস্কিলের আসান হবে—সকল সমস্যার সমাধান হবে—সমস্ত আনন্দ-তড়িতের কেন্দ্রস্থলে মিলে যাবে। আপনার নাভিতে যে কস্তুরী রেখে সারা বনময় মৃগ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার সন্ধান, সে ভ্রমণের নিবৃত্তি এমনি অন্তরের মণিকোঠায়। বেদ-বেদান্ত, সাধক-ভক্ত, বৈষ্ণব-শাক্ত যত জন দেখ, সকলেই চেয়েছে আগে অন্তরে তাঁকে, পেয়েছেও তাই। বাইরের গুরু শুধু উদ্বোধক, অন্তরের জ্বালাই প্রথম পথে তাদের বর্ত্তিকা হয়েছিল।

ওই যে প্রাণ উধাও হয়ে স্নেহের বাঁধনে আর একটী প্রাণের কাছে ছুটে যেতে চাইছে, খোঁজ কর, কিসের সন্ধানে, স্বার্থসিদ্ধির কি আকর্ষণে সে এমন পাগল হয়ে ছুটেছে। হয় ত গিয়ে সে পাবে না—যার জন্য প্রাণ পাগল, সে হয় ত মোটেই তোমাকে আমল দিবে না। কিন্তু তবু তারই আগল দেওয়া দুয়ারের কাছে মাথা কুটে মর্‌বে, আর ভাববে, হায় আমার চেয়ে জগতে দুঃখী আর আছে? টাকা-পয়সা, জায়গা জমি, ধন-জন প্রভৃতি যত কিছুর আকর্ষণ সব থেকেই মানুষ এমনি করে আঘাত খেয়ে একদিন ফিরে আসে। তবে কেউ দু'দিন আগে, কেউ বা দু'দিন পরে। ফির্‌তে হবে সব বাছাকেই। কেন না, অন্তরের বল্গা ধ'রে যে ঘর-মুখে তিনি কেবল টান্‌ছেনই। কিন্তু মায়ার এমনি খেলা যে, সে টানকে তুচ্ছ করে মরণ পানে সবাই একবার ছুটবেই। প্রবৃত্তির পথে কোনও রকমে পা কিছু-না-কিছু না পড়েছে, এমন মানুষ খুবই বিরল, অথবা নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অনেকে আবার ঘরমুখো টানে ফিরে এসে দেখেছে তখন সে আনন্দের তুলনা নাই—কত তুচ্ছ তার আগের আনন্দ এর চাইতে?

কাজেই কেবল চাই আত্মানুসন্ধান বা ঘরখোঁজা। বিশ্বাস কর্‌তে হবে যে আনন্দেই জগতের যখন জীবন-মরণ, তখন আমার মাঝেও সে আনন্দ আবিষ্কার কর্‌তে হবে। সেই মহান্ পবিত্র আনন্দের তুলনায় যখন বাইরের প্রবৃত্তির আনন্দ অতি তুচ্ছ, তখন বাইরের এ আনন্দ থেকে নিজকে বঞ্চিত রেখে নিজকে তাপ বা দুঃখ দিয়ে তপস্যা কর্‌তে হবে সেই অন্তরের আনন্দময়ের দর্শনের দরুণ। সে আছে, বা সে যে তোমারই প্রকৃত স্বরূপ! একথা আগে না বোঝ, পরে বুঝবে। কিন্তু আগে তাঁকেই প্রাণের প্রাণ জেনে বাইরের সকলের জন্য প্রাণের ওই তুচ্ছ টানকে জয় কর্‌তে হবে। ওসব যে দৈত্যের টান! আগে দেবতার টানে অন্তরে দেব-দর্শন হোক, তারপর সেই দৃষ্টি নিয়ে জগতের সবার দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে—

"আনন্দাদ্ধ্যেবেমানি ভূতানি জায়ন্তে
সংশ্রিয়ন্তে বিলীয়ন্তে চ।"

মরণ-বিভীষিকা

আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ,—বর্ত্তমান ছাড়া অতীতে—সুদূর ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত নহে—এই জন্যই বর্ত্তমানকে লইয়াই আমাদের সকল বিচার। অতীত-ভবিষ্যৎ জানি না বলিয়াই পরিণাম আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাত। কিন্তু যাঁহারা ত্রিকালদর্শী—তাঁহাদের নিকট পরিণাম সুস্পষ্ট। মহারথী অর্জ্জুনও আমাদের মত বর্ত্তমানের দৃষ্টি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধের কলঙ্কের কথা, অশুভ পরিণামের কথা বলিয়াছিলেন। একদেশদর্শী অর্জ্জুনের মনে যুদ্ধটা তখন ভয়ানক পাপ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু লোকক্ষয়কারী কালরূপে যে মৃত্যু তখন সকলকেই গ্রাস করিবে, এই কথাটী অর্জ্জুন জানিতেন

না। তারপর মায়ামুগ্ধ মানবের মনে এত বড় ভয়ঙ্কর প্রলয়ের কথাতে নিদারুণ ঘোর বিভীষিকা জাগিয়া উঠিবারই কথা। অর্জ্জুন তখনও মোহগ্রস্ত, আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তখনও তাঁহার হৃদয়কে আলোকিত করিয়া তুলে নাই। তাই যুদ্ধের নামে—লোকের প্রাণনাশের নামে তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনে তো কোন ভয় ছিল না—তিনি তখন অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের লক্ষণই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই প্রলয়কে বাধা দিতে পারে এমন কোন ক্ষমতা জগতে কাহারও নাই। সুতরাং অর্জ্জুনের বৈরাগ্যে কিছু আসিবে যাইবে না। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার ইচ্ছাই যখন প্রলয় সাধনে ব্রতী হয়, তখন সেই দুর্ব্বার প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে কে বাধা দিতে সক্ষম? ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র হৃদয় কি না, তাই জগৎ হিতের বাসনা জাগে—ভয়ে হৃদয় বিকম্পিত হয়। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই নিষ্ঠুর সত্য-বাণী শুনাইলেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

—অর্জ্জুন! যুদ্ধের ভয়ে তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে, না? কিন্তু আমিই সেই লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল—লোকসমূহকে বিনাশ করিবার জন্যই আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই যে সব বড় বড় বীর যোদ্ধা দেখিতেছ, তুমি যদি তাহাদিগকে বধ নাও কর, তাহা হইলেও তাহাদের মাঝে কেহ জীবিত থাকিবে না।

সত্য সকল সময় সহজভাবে, মনোরমরূপে দেখা দেন না—তাঁহার নিষ্ঠুর রূপও আছে। দুর্ব্বলচিত্ত প্রলয়ের কথাতে বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহারা ভাবে না—জগৎ যাঁহারদ্বারা সৃষ্ট—তিনিই যদি তাঁহাতে সবকে গুটাইয়া লইতে চান, তাহা হইলে মায়া করিয়া তাহাতে বাধা প্রদানও যে নিরর্থক! সত্য সুন্দরই নন কেবল—তিনি দুরন্ত কালও। সৃষ্টির মায়াতে আমরা প্রলয়ের কথা ভুলিয়া যাই। তাহা না হইলে কি জগৎকে আমরা এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি? মহাকাল মাঝে মাঝে লোকক্ষয়কারীর বেশে আসিয়া আমাদের মায়ার বাঁধনকে শিথিল করিয়া দিয়া যান। আমরা তখন জীবন-মরণ উভয় দিকের কথা লইয়া ভাবিতে থাকি। মরণের কথা মনে জাগে বলিয়াই—ইহলোকের প্রতি ষোল আনা টান কমিয়া আসে। কাজেই লোকক্ষয়কারী কাল তো আমাদের পরম বন্ধু!

সমষ্টি ইচ্ছার কাছে, ব্যষ্টি ইচ্ছা অতীব তুচ্ছ। বিরাট ইচ্ছার কাছে ব্যষ্টি ইচ্ছাকে বলি না দিয়া আর কোন উপায় নাই। অর্জ্জুনের আত্মসমর্পণও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণের বিরাট ইচ্ছার কাছে—অর্জ্জুনের ক্ষুদ্র ভাল-মন্দ জ্ঞান অতীব তুচ্ছ। প্রয়োজন ছিল ধ্বংসের—কাজেই মায়া করিলে তো আর সৃষ্টি রক্ষা হইত না। মায়া জীবকে মুগ্ধ করে কিন্তু মায়াধীশকে তো আর মায়াতে বদ্ধ করিতে পারে না। যিনি জগৎ সংসারকে সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার চেয়ে সৃষ্টির প্রতি আর কাহারও বেশী দরদ থাকিবার কথা নয়—কিন্তু তিনিই যখন লোকক্ষয়কারী কালরূপে আবির্ভূত হন—তখন তাঁহার সেই ইচ্ছার মাঝে জগতের কল্যাণের কামনাই থাকে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে যাহা আমাদের কাছে দোষের—সমষ্টির দৃষ্টিতে আবার তাহাই কল্যাণকর। এক এক সময় এক এক রূপ প্রয়োজন হয়। আমরা বর্ত্তমান ছাড়া তো আর কিছু দেখিতে পাই না, তাই সম্মুখ হইতে কোন কিছুকে অপসারিত

করিলেই আঁৎকাইয়া উঠি। ভগবানের বিচার শুধু বর্ত্তমানকে নিয়া নয়—বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সব কালকে নিয়া তবে তাহার কার্য্যধারা প্রবর্ত্তিত হয়।

সকলকেই একদিন মরিতে হইবে এই কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি মৃত্যুর দিকে নয়, জীবনের দিকেই সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা জীবন-মৃত্যুকে সমভাবে দেখেন—তাঁহাদের এই জগতের প্রতি অত্যুগ্র টানটা স্বাভাবিকই কমিয়া আসে। তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানী, জন্ম-মৃত্যু দুই দিকেরই দৃষ্টি তাঁহাদের সমভাবে জাগ্রত। মায়ার আর্ত্তনাদ বৃথা—অথচ মানুষ যখন মরে, তখন মানুষ চিরকাল ধরিয়াই কাঁদিয়া আসিতেছে। তত্ত্বজ্ঞানী অজ্ঞানীর এই কান্না দেখিয়া হাসেন। আশীর্ব্বাদ করেন যাহাতে তাহাদের আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে। জন্মিলেই যে মরণ আছে, মানুষ তাহা ভুলিয়া যায়। অর্জ্জুনের তখনো জ্ঞান দৃষ্টি খুলে নাই—মায়া-মমতা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—এইজন্যই অজর-অমর আত্মার দিকে না তাকাইয়া তিনি নজর দিয়াছিলেন এই বিনশ্বর দেহটার প্রতি। সাংসারিক সম্বন্ধ তো মায়ার সম্বন্ধ মাত্র, আসল প্রাণ-সূত্রের যোগ যে ভগবানের সঙ্গে! আমাদের ব্যষ্টি জীবন সেই ভগবানরূপ মহাসূত্রেই গ্রথিত।

সৃষ্টির কথাতে যেমন মনে সুখ আসে—তেমনি প্রলয়ের কথাতেও সুখ না আসিয়া দুঃখ আসিলে চলিবে কেন? উভয় দিকই যে সত্য—অনিবার্য্য। কাজেই বাঁচা-মরা কোন অবস্থাতেই স্থৈর্য্য—আনন্দ হারাইতে নাই। যিনি সৃষ্টি করেন তিনি যেমন সত্য—তেমনি যিনি প্রলয় ঘটান তিনিও সত্য। উভয়ের কথা স্মরণ রাখিয়াই আমাদের চলিতে হইবে—তাহা হইলেই এক দিকের আকর্ষণ আমাদের এত প্রবল হইয়া উঠিবে না।

জীবন সত্য, তেমনি মরণও সত্য। উভয়কে সম দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। কালকে দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে কেন? বাঁচিয়া থাকা যেমন আনন্দের—মৃত্যুও তেমনি আনন্দের। অজর-অমর আত্মার অনুভূতি লইয়া মরিতে পারিলে দেখা যায়—জন্ম-মৃত্যু অবিনশ্বর আত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মায়া বাড়াইতে হইলে আত্মার প্রতিই বাড়াইতে হইবে—নশ্বর দেহের প্রতি মায়া বাড়াইলে কোন লাভ নাই। মরণ দেহের—আত্মার নয় কিম্বা প্রাণেরও নয়। প্রাণও অমর। জীবন সেই অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের ক্ষুদ্র আবর্ত্ত। জগতের ধৃতি-শক্তি—প্রাণে। এই প্রাণের লয় নাই কোথায়ও। জীবনে প্রাণের সূক্ষ্ম বিকাশ। পরিণাম উভয় দিকেই আছে। জাগ্রত দশা যেমন আনন্দের—সুষুপ্তির অবস্থাও তেমনি আনন্দের। মৃত্যু কি?—সুষুপ্তি—মহা ঘুম। এই ঘুমের মাঝে মুখ্য প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশ্রিত করিয়া যিনি সেই প্রাণের লীলা দেখেন তিনিই সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। লোক-ক্ষয়কারী কাল মুখ্য-প্রাণকে ক্ষয় করিতে পারে না। ক্ষয় করে শুধু স্থূল দেহের। কাজেই মরণের আবার বিভীষিকা কি? মরণও তো উপভোগের বস্তু, যেমন উপভোগ করি আমরা জীবনকে।

ভিক্ষুর আত্মকথা

মহাপুরুষের শরণ নিলেই জীবন্মুক্তি অবস্থা আসে না—পূর্ব্ব সংস্কার নিঃশেষে মুছিয়া না গেলে চিত্তের সেই প্রশান্তি আসিতেই পারে না। কাজেই ধৈর্য্য-উৎসাহ অবলম্বন পূর্ব্বক সংযমের ভিতর দিয়া জীবন পরিচালিত করিলে একদিন সেই পরম শান্তির সন্ধান পাওয়া যাইবেই যাইবে। আশ্রম-জীবন—তপস্যার জীবন, দু'দিনের উচ্ছ্বাস লইয়া যাহারা আসে, দু'দিন পরেই তাহাদের চিত্তে আবার অবসাদ দেখা দেয়, তাই তাহারা পূর্ব্বাশ্রম-কেই আবার শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থান দেয়। পূর্ব্বে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে যাঁহারা যোগদান করিতেন, তাঁহাদের সকলের চিত্তই নিষ্কলুষ ছিল না, তাই সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াও তাঁহাদের চিত্ত-বিক্ষেপ দেখা দিত। সঙ্ঘের একটী বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

বৌদ্ধসঙ্ঘে অন্যান্যের ন্যায়, স্বয়ং বুদ্ধদেবের আত্মীয় স্বজনও জীবন উৎসর্গ করিতেন। বুদ্ধদেবের মাসীমার ছেলে আয়ুষ্মান্ নন্দও বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইতেছে না দেখিয়া—একদিন আয়ুষ্মান্ নন্দ সঙ্ঘের অপরাপর ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ! আমি অনিচ্ছার সহিতই ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছি, কিছুতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিতেছি না। আমি শীলাদি শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহী হইব। গৃহী হওয়াও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তবু আর এই জ্বালা সহিতে পারিতেছি না।" আয়ুষ্মান্ নন্দের কথা শুনিয়া, ভিক্ষু-ভ্রাতাগণের প্রাণে সমবেদনা সঞ্জাত হইল, তাঁহাদের ভিতর হইতেই একজন ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়া নন্দের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণন করিলেন—"ভন্তে, ভগবানের মাসতুত ভাই আয়ুষ্মান্ নন্দ ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন যে, তিনি অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, শিক্ষা ত্যাগ করিয়া গৃহী হইবেন।"

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শাস্তা অন্য একজন ভিক্ষুকে বলিলেন—"ভিক্ষু, তুমি যাও, বল যে নন্দ ভিক্ষুকে আমি ডাকিতেছি।" "আচ্ছা ভন্তে," বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আয়ুষ্মান্ নন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"বন্ধু! আসুন, আপনাকে শাস্তা ডাকিতেছেন।" প্রত্যুত্তরে নন্দ বলিলেন—"কি বলিলেন বন্ধু! শাস্তা আমার ন্যায় অজ্ঞানী মূর্খকে ডাকিতেছেন? আচ্ছা, আমি এখনই চলিলাম।" এই বলিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া, শাস্তাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার এক পাশে বসিলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে নন্দ, তুমি কি সত্য সত্যই ভিক্ষুগণকে এইরূপ বলিতেছ যে তুমি অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছ, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিতেছ না, শিক্ষা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে হীন-স্থানীয় গৃহী হইবে?"

"হাঁ ভন্তে!" ভিক্ষু নন্দ এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ নন্দকে বলিলেন, "হে নন্দ, তুমি কেন তাহা হইলে অনিচ্ছার সহিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছ? কেনই বা ব্রহ্মচর্য্য

রক্ষা করিতে পারিতেছ না? কেন শিক্ষা ত্যাগ করিয়া গৃহী হইবে?"

নন্দ বলিলেন—"ভন্তে! আমি যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসি, তখন শাক্যকুমারী জনপদ-কল্যাণী মাথার চুল আঁচড়াইতেছিল। আমি তাহাকে না বলিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। তাহার কথা মনে হইয়া নিদারুণ সন্তাপ অনুভব করিতেছি। আমি যখন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে অক্ষম, তখন আমার গৃহী হওয়াই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

নন্দের কথা শুনিয়া ভগবান যোগবলে নন্দকে সঙ্গে করিয়া জেতবন হইতে অন্তর্ধান হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে উপনীত হইলেন। তখন কপোতের পায়ের ন্যায় রক্ত-চরণা পাঁচ শত অপ্সরা দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করিতে আসিয়াছিল। ভগবান্ আয়ুষ্মান্ নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নন্দ, তুমি কি এই সব সুন্দরী অপ্সরাগণকে দেখিতেছ?" নন্দ প্রত্যুত্তর বলিলেন—"হাঁ ভন্তে।"

ভগবান বলিলেন—"আচ্ছা নন্দ, এই পাঁচ শত অপ্সরা বেশী সুন্দরী, না তাহাদের তুলনায় জনপদ কল্যাণীই বেশী সুন্দরী?"

নন্দ বলিলেন—"এই কপোত-চরণা অপ্সরাগণ আর জনপদ কল্যাণীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ! অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কি তাহার তুলনা দেওয়া চলে? অপ্সরাগণের তুলনায় জনপদ কল্যাণী যেন নাক-কান কাটা আধপোড়া একটী বানরী বিশেষ।"

ভগবান বলিলেন—"আচ্ছা নন্দ, এইরূপ পাঁচ শত অপ্সরার দরুণ আমি জামিন রহিলাম। তুমি আজ হইতে প্রব্রজ্যায় বিশেষভাবে মনোযোগী হও। শীল পালন করিয়া চল।" ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নন্দ আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "ভন্তে! আপনি যদি আমার দরুণ এই-রূপ পাঁচ শত অপ্সরা দিতে জামিন হন, তাহা হইলে আমি বিশেষ ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী পালন করিতে আজ হইতেই সচেষ্ট-যত্নবান্ হইব।" নন্দ স্বীকৃত হওয়ায় ভগবান সেই ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অন্তর্ধান হইয়া পুনঃ জেতবনে উপস্থিত হইলেন।

এইদিকে অপরাপর ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন যে, নন্দ পাঁচশত অপ্সরা লাভের দরুণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। ভগবান স্বয়ং নাকি তাহার দরুণ জামিন। ইহার দরুণ ভিক্ষুগণ নন্দকে নানা উপায়ে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে ভৃত্য ও উপক্রেতা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রতিদিন এই তিরস্কার শুনিয়া একদিন নন্দের মনে বিবেক জাগিয়া গেল—সেইদিন হইতে নন্দ একাকী অপ্র-মত্ত, উৎসাহশীল, সমাধিস্থ ও নির্ব্বাণগত চিত্ত হইয়া, অচিরে সেই ব্রহ্মচর্য্যের ফলস্বরূপ অর্হত্ব লাভ করিলেন—যে অর্হত্ব লাভ করিবার দরুণই ভিক্ষুগণ অনাহারে প্রব্রজিত হন। অর্হত্ব লাভ হইলে নন্দ বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহাকে আর এই লোকে আসিতে হইবে না, তাঁহার সকল বাসনার নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে।

যে রাত্রিতে নন্দ অর্হত্ব লাভ করিলেন, সেই রাত্রেই ভগবান বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মাসতুত ভাই আয়ুষ্মান্ নন্দ ইহলোকেই আসক্তি ক্ষয় করিয়া অনাশ্রব চিত্ত বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আয়ুষ্মান্ নন্দ সেই রাত্রি গত হইলে ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—"ভন্তে, আমার পাঁচশত অপ্সরা লাভের জন্য ভগবান যে জামিন হইয়াছিলেন, এখন আমি ভগবানকে সেই জামিন হইতে মুক্ত করিতেছি।

আমার আর পাচশত অপ্সরার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

ভগবান বলিলেন—"হে নন্দ, আমিও চিত্তের দ্বারা চিত্ত অবগত হইয়া জানিতে পারিয়াছি যে তুমি আশ্রবসকল ক্ষয় করিয়া ক্ষীণাশ্রব হইয়াছ এবং ইহজন্মেই অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিতেছ। একজন দেবতাও রাত্রে আসিয়া আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। যখন হইতে তুমি আসক্তিহীন হইয়া আশ্রব ক্ষয় হেতু ক্ষীণাশ্রব হইয়াছ, তখন হইতেই আমি জামিন-মুক্ত হইয়াছি। দেখ, আমার কথায় শীল পালন করিয়া চলায় তোমার কি অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে!"

আয়ুষ্মন্ নন্দের বিষয় সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া ভগবান্ তখন এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

"আর্য্য মার্গ সেতু দিয়ে
ভব পঙ্ক হয়েছে যে পার,
সেই জ্ঞান দণ্ডাঘাতে
কাম-কাঁটা মর্দ্দিত যাঁহার;
অবিদ্যার ক্ষয় জ্ঞান
যে ভিক্ষুর হয়েছে উদয়,
সুখে-দুঃখে লোক-ধর্ম্মে
সেই ভিক্ষু কম্পিত না হয়।" *

রোগ মুক্তি

সে অনেক দিনের কথা নয়। মাত্র কয়েক বৎসর আগেও কুসুমপুর গ্রামখানি ধনে-জনে পরিপূর্ণ সোণার গাঁ ছিল। হাট-বাজার, পথ-ঘাট, পুকুর-মাছ, ডাক্তার-কবিরাজ, স্কুল-পাঠশালা কিছুরই অভাব ছিল না। এমন কি এ যুগের পক্ষে অনাদৃত মৃতভাষা (?) সংস্কৃত শিক্ষার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কূটতর্কে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হইত। লক্ষ্মী-সরস্বতীর সাপত্ন্য বিদ্বেষ বশতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আর্থিক অবস্থা যদিও স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু তাহাতে গ্রামের অবস্থা নিঃস্ব ছিল না। বহু হাকিম, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীর বাস থাকায় গ্রামখানিকে দেখিয়া লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে বিদ্বেষের কথা ভুলিতেই হইত। অবশ্য লক্ষ্মী-সরস্বতীর বাহনদিগের মধ্যে বিশেষ কোনও যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আজ আর গ্রামের সে অবস্থা নাই। কেন নাই, কেমন করিয়া গ্রামখানির সে সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইল, তাহাই বলিব।

ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা বসুন্ধরার স্নিগ্ধ শ্যামল হাস্যে যখন কৃষকের প্রাণ ভরিয়া উঠিল সেবার, ঠিক সেই সময়ে ধরাবাসীর না জানি কোন্ পাপের ফলে বিধাতার কোপানল প্রজ্জলিত হইল। দেশময় প্রলয় প্লাবন দেখা দিল। শস্যপূর্ণ কত মাঠ, ধন-জন পরিপূর্ণ কত নগর সে প্লাবনে ভাসিয়া গেল—কতজন কত স্নেহ-মমতার নীড় শূন্য হইয়া অকালে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে অকূলে প্রাণ বিস-

* শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্ত্তৃক অনুদিত "উদানং" গ্রন্থাবলম্বনে। আঃ দঃ সঃ

র্জ্জন দিল, কিন্তু তবু এত বড় জল-প্লাবনেও বিধাতার কোপানল নির্ব্বাপিত হইল না।

অজ্ঞাত পাপের অসমাপ্ত প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করিতে তারপর আসিল মহামারী। বহু পুণ্যের জোরে যাহারা সেই করাল প্লাবনকেও ফাঁকি দিয়া কোনও রকমে প্রাণটাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল, মারীর ভয়ে তাহাদের শুষ্ক প্রাণ আরও হতাশ হইয়া পড়িল। না জানি বিধাতার মনে কি আছে ভাবিয়া নীরোগ ব্যক্তিরও প্রাণ যায় যায় হইল। বিধাতার এমনই পরীক্ষা!

আমাদের কুসুমপুরও বন্যার হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। তবে একেবারে বিনাশপ্রাপ্তও হয় নাই। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে আর ধন জন-পূর্ণ কুসুমপুরের সে সমৃদ্ধি-সৌরভ নাই। সে সৌরভ-গৌরব বিধাতার কোপে পরাভব মানিয়াছে। গ্রামের অস্তিত্ব রাখিয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রলয় প্লাবনের মহাচিহ্ন-স্বরূপে ম্যালেরিয়াকে স্থায়ী পাট্টা দিয়া গ্রামে রাখিয়া গিয়াছে, সে গ্রামখানিকে দিনে দিনে নিশ্চিহ্ন করিবার অবসর পায়।

এ হেন গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার গৃহে হিমেশের জন্ম। দেশের ও দশের এই দারুণ দুর্দ্দশার মধ্যেও হিমেশ জন্মাবধি এ যাবত মা-বাপের স্নেহের নীড়ে পরিপুষ্টই হইতেছিল। কিন্তু জন্মান্তরীণ কোন্ পাপে জানি না, হিমেশের ভাগ্যে সে সুখটুকুও টিকিল না। রোগে-শোকে জর্জ্জরিত দারিদ্র্য-নিপীড়িত অকাল বৃদ্ধ তাহার পিতা মাতা অকালে হিমেশকে শোক সাগরে ভাসাইয়া—হৃদয়বিদীর্ণকারী তাহার করুণ ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া এতদিনকার সমস্ত স্নেহ-মমতা ভুলিয়া আগে মাতা, তিনদিন পরে মৃতার অনুসরণপূর্ব্বক হিমেশের পিতাও অমরধামে প্রস্থান করিলেন। আপন বলিয়া হিমেশের আর কেহ রহিল না।

—৫৯খ

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। বন্যার্ত্ত-দিগের সেবার্থ আসামের কোনও মঠ হইতে আগত একদল সন্ন্যাসীসেবকের সঙ্গে হিমেশ সেই মঠে আশ্রয় পাইয়া লালিত-পালিত হইয়াছে। আশ্রম দেবতার স্নেহার্দ্র বক্ষে ধারা বহাইয়া তাঁহারই করুণায় হিমেশ আর বাল্যজীবনে তেমন কোনও দুঃখের সাড়া পায় নাই। কত সকাল-সন্ধ্যায় আশ্রমে ভগবদ্ বন্দনার সময়ে সকলের সুরে সুর মিশাইয়া হিমেশও তাহার ছোট্ট বুকখানার কত সুখ-দুঃখের বেদনা কোন্ অজানা দেশে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিয়াছে। প্রাণ উঘারিয়া স্তোত্র-মন্ত্রে যেটুকু প্রাণ সে নিবেদন করিয়াছে, স্থূলে নানা জনের অকারণ স্নেহ মমতার ভিতর দিয়া দেবতার কৃপা সে ততটুকু প্রত্যক্ষ ভাবেই পাইয়াছে। তাই দিনের পর দিন সেও সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া দেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হিমাচল সন্নিকটস্থ গাত্রচর্ম্মবিদ্ধকারী ভীষণ শীতের ভয়ানক তুহিনপাতেও প্রত্যুষে দেবতার পূজার পুষ্প চয়নে সে কাতর হয় নাই।

কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে যে কালরূপী ম্যালেরিয়া গ্রাম হইতে তাহার বক্ষে বাসা নিয়াছিল, তাহার প্রকোপে হিমেশের কোথাও সোয়াস্তি নাই। তাহার প্রভাবে জীবনের অনেকখানি শক্তি পঙ্গু থাকাতে হিমেশের ইচ্ছাস্বরূপ জীবনের বিকাশ সেখানে ঘটিতে পারিল না! এই বড় দুঃখে জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইতে অনেকখানি সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে থাকিতে হইল। কিন্তু করুণাময় আশ্রম দেবতার কৃপা কটাক্ষ হইতে সে তবুও বঞ্চিত হইল না। যেখানেই সে যায়, আশ্রমের আদর্শে পরিচালিত জীবনের প্রভাবে অন্য কোথাও তাহার পরাভব

ঘটে না। তাই সে শত দুঃখ দৈন্তেও সেই প্রিয়তমের সে আদর্শ পরিত্যাগ করে নাই।

এবার পূজা আসিল। প্রতি বৎসরের মত সকলে সেই মহান্ আনন্দোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এবার সে আনন্দ নাই। অর্থাভাবের দারুণ নিষ্পেষণে বারম্বার নিপীড়িত হইয়া অনেক গৃহস্থকে পিতৃ প্রথামত বড় আনন্দের মায়ের পূজাখানি পর্য্যন্ত এবার বড় দুঃখে ছাড়িতে হইয়াছে। যাঁহারা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রথামত নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন মাত্র। একে অনাচারে ব্যভিচারে দেশ জর্জ্জরিত, তাহার উপর স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠদিগের এই মহা সঙ্কট কাল, তাই পূজাবাটীর ঢাকও যেন এবার আনন্দদানের পরিবর্ত্তে আর্ত্তনাদের মত বক্ষ বিদীর্ণ করে। কিন্তু তবু সেই ঢাকের শব্দে দেশের বুকের কান্না প্রতিধ্বনিত করিয়া মায়ের বোধন-প্রচেষ্টা সম্পন্ন হইল। জানি না, ভক্তের বুকের এই নিয়ত নীরব কান্না এমন করিয়া ঢাকের শব্দে নিনাদিত হওয়া সত্ত্বেও মায়ের কপটনিদ্রা ভগ্ন করিতে ভক্ত সমর্থ হইল কি না? নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট এই তমোগ্রস্ত জাতিকে প্রবুদ্ধ করিতে আরও কত দুঃখ দিয়া যে মা তাহাদিগকে জাগাইয়া আপন কপটনিদ্রা ভঙ্গ করিবেন কে জানে? তবে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য দেশের অবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, বুঝি বা ইহাই মায়ের আগমনের সূচনা—তাই নূতন রকম আগমনী।

তথাপি এবার মায়ের পূজার নূতনত্ব অনেক। আবহমান কাল যে প্রথায় মায়ের পূজায় সকলে সন্তুষ্ট ছিল, সার্ব্বজনীন পূজার নাম করিয়া সে প্রথা ও সন্তোষ দূর করিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রচেষ্টা চলিল। অস্পৃশ্যতার অজুহাতে যাহাদিগকে সত্যই দূরে রাখা হইত, তাহাদিগকে দূরেই রাখিয়া তাহাদের জাতীয় শিক্ষিত ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগকে—আগে যাহারা গোপনে স্পৃশ্য ছিল তাহাদিগকে প্রকাশ্যে স্পৃশ্য বলিয়া প্রচার করা হইল। আচারের শিক্ষা না হউক, কিন্তু অনাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকেই উচ্চ বলিয়া ভরসা দেওয়া হইল —ইত্যাদি।

দেশের এই দুর্দ্দিনের উৎসবে আমাদের হিমেশ সমস্ত প্রকার দুঃখ-হিমকে জয় করিবার নীরব সাধনায় ব্যাপৃত হইয়া আশ্রমের আদর্শে এক কুটীরে বাস করে। কেহ করুণায় কেহ বা শ্রদ্ধায়, কেহ সমবেদনায়—কেহ বা উপেক্ষায়, কেহ প্রশংসায়—কেহ বা নিন্দায়, কেহ উৎসাহ প্রদানে—কেহ বা বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে—সকলেই তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যায়।

একদিন একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জাতি সম্বন্ধে বা অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আপনার বা আপনাদের মঠের আদর্শ কি?" খুবই কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর হইল—"যে সংস্কার পেয়েছি, তাতে এই বুঝি, প্রত্যেক জাতি পরস্পরকে শ্রদ্ধা করবে—এতে উচ্চ-নীচ, মানাপমান নাই। তবে আচারে অপরকে আঘাত না দিয়ে স্বধর্ম্ম পালন ক'রে যাবে।"

প্রশ্ন—'কি রকম? সে কি সম্ভব? মঠে আপনাদের বিধি কিরূপ?'

উত্তর—"বয়োজ্যেষ্ঠ হলেই তাঁকে দাদা বল্‌তে হবে। সকাল সন্ধ্যায় সকলেই স্বীয় সাধন পদ্ধতি অনুসারে আরাধনাদি কর্‌তে হবে। আহারাদিতে প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণের নিয়মে অর্থাৎ স্বীয় ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করে মৌনভাবে প্রসাদমাত্র গ্রহণ কর্‌ছি এই ভাবে আহার কর্‌বে। একজাতি হলেও কেউ কাউকে ছোঁবে না, পাক-পরিবেশনাদি যেমন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবের কর্ম্ম, তার যোগাড়াদিতে অন্য জাতি

তেমনি সাহায্য করবে। পংক্তি পৃথক হলেও খুব দূরে নয়। মোট কথা অস্পৃশ্য কেউ নয়, তা বলে এক সঙ্গে দু'জনে একজাতি হলেও খাবে না—সকলকেই (উপবীত না থাকলেও) ব্রাহ্মণের নিয়মে চলতে হয়। হঠাৎ দেখলে বোঝা দায় যে সবাই ব্রাহ্মণ এমনি আচারসম্পন্ন। কাজেই জাতি-সমস্যা আমাদের ওঠেই না।" এমনি কত কি প্রশ্ন আসে, নিরুত্তর বা সাধ্যমত উত্তরে সবাই খুসী হইয়া যায়।

ষষ্ঠীর বোধন পূজার পর সপ্তমীর পূজা বিধিমত সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ তনয় বলিয়া হিমেশের উপর পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুতের ভার। সপ্তমীর দিন যথা রীতিতে সে তাহা সম্পন্ন করিলেও অষ্টমীর দিন প্রত্যূষে আর তার গাত্রোত্থান সম্ভবপর হইল না। কালজ্বরে অন্ততঃ তিনটা দিনও তাহাকে রেহাই দিবে না। কিন্তু সেও ছাড়িবার পাত্র নহে। একটু সুস্থবোধ করিবামাত্র ৺মায়ের নামে ডুব দিয়া তাঁহার উপর যে কার্য্যের ভার ছিল, তাহা সম্পন্ন করিয়া পূজাকালে ৺শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ সমাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিতে গেল। কিন্তু এ কি? কার কণ্ঠস্বর তাহার অন্তর হইতে এমন দৈব বাণীর মত ধ্বনিত হইল— "যোগি-জন-দুর্ল্লভ-মহাজন-কৃপয়া প্রাপ্তেহপি পরমমুপায়ং ত্বয়ি কুতস্তে রোগজ-বিষাদঃ? উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান্নিবোধত।"—যোগীদিগের দুর্ল্লভ এমন 'মহাজনের কৃপায় পরম উপায় প্রাপ্ত হইয়াও তোমার রোগজনিত এমন বিষাদ কোথা হইতে আসিল? (ও সব ছাড়)—ওঠো, জাগ, তুমি যা চাও, তা পাওয়া যায়, বর গ্রহণ কর।'

বরাভয়করা দনুজদলনী দুর্গতিহারিণী শ্রীশ্রী-দুর্গারই বাণী মনে করিয়া ভক্ত গদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—'মা, আমি তো কোনও দিন আমার রোগ মুক্তির জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি নাই, কিন্তু মা আমার আর একটী প্রার্থনা আছে, সেটী এই যে, **আমাকে তোমার করিয়া নাও**—এটী তোমার পূরণ করিতেই হইবে। "তথাস্তু"—শুনিয়াই ভক্ত পরম আগ্রহে শ্রীশ্রীমায়ের অতুল-রাতুল চরণ প্রান্তে যেই তাকাইবে, অমনি চোখ মেলিয়া দেখে—সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। সম্মুখে তাহার গললগ্নীবাস ভক্তবৃন্দের প্রণামরত মস্তক সমীপে শ্রীশ্রীদশভূজার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির অপরূপ স্মিতহাস্য। ভক্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—মা দেখা দিয়াও দিলি না! উত্তর হইল—"অন্তরে পাবে—তাতেই রোগমুক্তির নিদানও মিল্‌বে।" জানি না হিমেশ আর রোগমুক্ত হইবে কি না, কিন্তু অন্তরে সে যে রোগ মুক্তির সন্ধান পাইল সে যে অক্ষয় বর্ম্মণ।

ধৃতি-শক্তি

জীবনের লক্ষ্যটা যাহার কাছে যত সুস্পষ্ট, তৎসাধনে তাহার প্রয়াসেও তত আন্তরিকতা দেখা যায়। লক্ষ্য স্থির না হইলে—তৎসাধনে সবিশেষ চেষ্টারও উদ্বোধন হয় না। সাধারণ আর অসাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য রহিয়াছে এইখানেই। সাধারণের চিত্তে জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট নয়—এইজন্যই তাহারা একটা কিছুতে তেমন করিয়া জোর দিতে পারে না। যাহাকে চায়, তাহাকে চিত্তে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিবার মত ধৃতিশক্তি সাধারণের নাই। এক কথায় বলিতে গেলে সাধারণের মাঝে এই ধৃতিশক্তিরই অভাব। এইজন্যই সাময়িক উচ্চ ভাব আসিলেও পরক্ষণেই আবার তাহাদিগকেই অতি নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতে দেখা যায়। অসাধারণ মানুষের মাঝে এই ধৃতিশক্তিই অসাধারণ ভাবে ফুটিয়া উঠে—বিশেষত্ব তাঁহাদের এইটুকুই।

ধ্যান করিতে বসিলে সাধারণের মন হয় ত দু'এক মিনিট এক লক্ষ্যে সংলগ্ন থাকে; তাহার পরই চিত্তের সেই একাগ্রতা আর থাকে না। দেশ-বিদেশে তাহার পাল্লা আরম্ভ হয়। মনের এই চাঞ্চল্যকে দ্রষ্টার মত নিরপেক্ষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় তাহাকে স্ববশে আনিবার শক্তিও তাহাদের নাই। সুতরাং ধ্যানের মাঝে চৈতন্য উজ্জ্বল না হইয়া, অনেকেরই নিদারুণ ঘুম পাইয়া বসে। চিত্তকে যে এক লক্ষ্যে বেশীক্ষণ নিবিষ্ট রাখিতে পারে না মানুষ, তাহার কারণ ধৃতি-শক্তির অভাব। প্রচণ্ড ধৃতি-শক্তির বলেই, ধ্যানের পর মানুষের সমাধির অবস্থাও লাভ হয়। তাহা হইলেই এই কথা দাঁড়াইল যে, যাঁহার ধৃতি শক্তি প্রবল তিনিই ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, আর যাহার ধৃতি-শক্তির অভাব তাহার ইষ্টসিদ্ধি সুদূর পরাহত। অতি সাধারণ মানুষের মনেও সাময়িক উচ্চ ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যায়, কিন্তু সেই উচ্চভাবকে পরিপূর্ণ চেতনা লইয়া ধরিয়া রাখা সাধারণ-মানুষের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। জীবনে কোন একটা ভাব বা লক্ষ্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত বীর্য্য নাই বলিয়াই, অনেকের জীবনেই নিদারুণ হতাশার ভাব দেখা দেয়। ধৃতিশক্তির অভাবই মানুষকে এক লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। এই ধৃতি-শক্তির প্রাবল্য যাঁহার মাঝে রহিয়াছে—জগতে তিনিই বীর, সাহসী, ধার্ম্মিক সবই হইতে পারেন। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের বিরোধী হইয়া উঠিলেও—তাঁহারা কিছুতেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন না। এই ধৃতি-শক্তি-নিষ্ঠা না থাকিলে, কোন দিকেই জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

গীতাতে আছে তিন প্রকার "ধৃতির" কথা। সাত্ত্বিক ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা যায়। মহাপুরুষগণ এই সাত্ত্বিক-ধৃতিই লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্যই মন-প্রাণের চাঞ্চল্য তাঁহারা কটাক্ষেই বিদূরিত করিতে পারেন। ইচ্ছামাত্রেই মনের সমস্ত চাঞ্চল্যকে যিনি বিদূরিত করিতে পারেন—তাঁহার সাত্ত্বিক-ধৃতি লাভ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরমহংসদেবের মাঝে এই সাত্ত্বিক-ধৃতির লক্ষণ অতীব সুস্পষ্ট। ইচ্ছামাত্রেই তিনি মনকে নির্গুণ ব্রহ্মে লয় করিয়া দিয়া সমাধিতে নিমগ্ন হইতে পারিতেন। মনকে ইচ্ছানুযায়ী ঊর্দ্ধ-

মুখী করিবার শক্তি যাঁহাদের করায়ত্ত—তাঁহারাই সাত্ত্বিক-ধৃতিসম্পন্ন।

রাজসিক ধৃতিসম্পন্ন যাহারা—তাহারা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের প্রতি ঝোঁক দেয় অত্যন্ত বেশী। অর্থাৎ তাহাদের ধৃতি-শক্তি ধর্ম্ম-কাম-অর্থ লাভেই নিয়োজিত হয়। রাজসিক ধৃতিতে চাঞ্চল্য বর্ত্তমান থাকে—কিন্তু সাত্ত্বিক ধৃতিতে কোনরূপ চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। সাত্ত্বিক ধৃতি দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

তামসিক ধৃতি—স্বপ্ন, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও গর্ব্বকে বাড়াইয়া তুলে। অর্থাৎ তামসিক ধৃতি-সম্পন্ন লোক সর্ব্বদা তমোগ্রস্থ হইয়া থাকে। তাহারা জড়গ্রস্ত—প্রাণে নিদারুণ অশান্তি তাহাদের।

এই ধৃতিশক্তির সঙ্গে খাদ্যের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক খাদ্যদ্বারা ধৃতিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আহার শুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে অচলা ধৃতিশক্তি জন্মে। এইজন্যই সাধকদের পক্ষে খাদ্য-বিচারের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যাহা-তাহা খাওয়াতে সাত্ত্বিক-ধৃতি লাভের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়। হিন্দুর খাদ্য-বিচারের মূলে—বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ হইবে সাত্ত্বিক-ধৃতিসম্পন্ন, ক্ষত্রিয় রাজসিক ধৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ আত্মাকে জানিয়া অচঞ্চল—ক্ষত্রিয় এই আত্মজ্ঞান লাভের দরুণই চঞ্চল। সুতরাং ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের কাছে আত্মজ্ঞানের দীক্ষা লইতে হইত। পরস্পরের সাহায্যেই সবদিক সামঞ্জস্য ভাবে চলিত তখন—এখন সর্ব্বত্রই ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে। এই ধৃতিশক্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বিচার।

জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে—ধৃতি-শক্তিকে বাড়াইতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। ধারণাশক্তি লাভ হইলে—তখন যে কোন উপায় অবলম্বনেই চিত্তের স্থৈর্য্য আসিয়া পড়ে। ধারণাশক্তির অভাবেই মানুষের দুর্গতি। ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হইলে, অর্থাৎ স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে মানুষ নির্ব্বিতর্ক সমাধি লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধৃতিশক্তির বলেই ধ্যেয় বস্তুতে একরূপ বৃত্তির প্রবাহ পরিচালিত করিতে পারা যায়।

এই ধারণা-শক্তি অবশ্য দুই এক দিনেই আয়ত্ত হয় না। "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্য সৎকারা-সেবিতো দৃঢ় ভূমিঃ।" দীর্ঘকাল ব্যাপী শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যাস করিবার পর ধৃতি-শক্তির ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। ধ্যানে হয়ত প্রথমে মন বসিতেই চায় না (অবশ্য ধৃতিশক্তির অভাবই ইহার কারণ) কিন্তু ক্রমাভ্যাস দ্বারা এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, শেষ পর্য্যন্ত সমাধির অবস্থাও লাভ করিতে পারে মানুষ। পঞ্চ-দশীকার সমাধি লাভের পক্ষে এই অভ্যাসের দৃঢ়তা-কেই প্রধান সহায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধৃতি-শক্তিকে একটু একটু করিয়াই বাড়াইতে হয়, হঠাৎ একদিনে কেহই সাত্ত্বিক-ধৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ইচ্ছামাত্র মন সংযম—সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা সেই অবস্থা সকলেই লাভ করিতে পারে—পতঞ্জল মুনি সকলকে এক-বাক্যে সেই ভরসা দিয়াছেন। এই জন্মে সিদ্ধি লাভ না হইলেও, অভ্যাসের ফল ব্যর্থ হয় না কিছুতেই। তাঁহারাই আবার পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া 'যোগীনাং শ্রীমতাং গেহে'—জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং ধৃতিশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এই ধৃতিশক্তি বাড়াইতে হইলে—ব্রহ্মচর্য্য এবং খাদ্য সংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির কোন দিন ধৃতিশক্তির জোর নাই—এইজন্যই তাহাদের চিত্ত এত দুর্ব্বল, কোন

একটা লক্ষ্যে বেশীক্ষণ তাহাদের চিত্ত কিছুতেই স্থির থাকে না। ধৃতিশক্তির অভাবেই মানুষের জীবনের লক্ষ্য এত অস্পষ্ট এবং সেই লক্ষ্যে চিত্তকে নিয়োজিত করিতে মানুষ এত বেগ পায়। যাঁহাদের ধৃতিশক্তি প্রবল, তাহারাই জগতে একটা তোলপাড় করিয়া যাইতে পারেন। নেপোলিয়ান, বিবেকানন্দ—এই সব বীর সাধকের মাঝে এই ধৃতিশক্তিরই বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায়। তাঁহারা যে কোন কাজে হাত দিয়াছেন, সেই কাজেই বিজয়ী হইতে পারিয়াছেন। সঙ্কল্পের উৎকট দৃঢ়তা ছিল তাঁহাদের মাঝে। এইজন্যই তাহাদের মাঝে Tenacity of purpose এত প্রবল।

জীবনে দুইটী জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন—সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা। একটা লক্ষ্য নিয়া চলিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্যের প্রতি সমগ্র মনকে নিয়োজিত করিতে হইবে। লক্ষ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে, তাহার দিকে সমস্ত শক্তিকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে—তাহা হইলে ইহ জীবনেই অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের আশা।

পরিপূর্ণ জীবনে সাত্ত্বিক-রাজসিক উভয় ধৃতিরই প্রয়োজন। কর্ম্ম এবং ধ্যান যুগপৎ আয়ত্ত হওয়া চাই। কাজও করিব আবার ইচ্ছানুযায়ী মনকে কাজের চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া আত্ম-চিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিব—এই অবস্থা লাভ হইলেই আদর্শের আর কোন ন্যূনতা রহিল না। সাত্ত্বিক-ধৃতির ক্ষমতা ব্যবহারিক জীবনেও প্রমাণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী মনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত হইলে, তখন কর্ম্মের মাঝেও মুক্তির আনন্দ পাওয়ার সুযোগ ঘটিবে। সুতরাং কর্ম্মের ভিতর দিয়াও সাত্ত্বিক ধৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তামসিক জড়গ্রস্ত জীবন সাত্ত্বিক-ধৃতির পরিচায়ক নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ধৃতিশক্তি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং রাতারাতি বড় হইয়া যাইবার কল্পনা ছাড়িয়া নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়া যাইতে হইবে। ক্রমশঃ রাজসিক এবং সাত্ত্বিক-ধৃতি লাভ হইবে। পাশ্চাত্যে রাজসিক ধৃতিরই প্রাবল্য—প্রাচ্যে সাত্ত্বিক ধৃতিরই প্রাবল্য। এইজন্যই পাশ্চাত্যের রাজসিক ধৃতিতে কাহারও প্রাণে শান্তি আনয়ন করিতে পারিতেছে না। বাহিরের সুখ-সম্পদ আয়ত্ত করার চেয়ে—মন-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ধৃতিশক্তির মূল্যই বেশী। প্রাচ্যে সাত্ত্বিক ধৃতির জায়গা তামসিক ধৃতিতে অধিকার করিয়া বসিয়াছে——এইজন্যই বিবেকানন্দ আসিয়া রাজসিক বৃত্তি জাগাইবার দরুণ এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তামসিক ধৃতির চেয়ে——রাজসিক ধৃতি শত গুণে শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বে শ্রুতিমাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া যাইত—ইহা আর কিছুই নহে উত্তম অধিকারীর সাত্ত্বিক-ধৃতির লক্ষণ। এখন ব্রহ্ম—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধারণায়ও আসিতে চাহেন না। কাজেই উন্নত-যুগ বলিব বর্ত্তমানকে না অতীতের ঋষি যুগকে? ধারণা শক্তির হ্রাসের দরুণই যে টীকা-টীপ্পনীর এত প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিন নিছক আপ্তবাক্যই পর্য্যাপ্ত ছিল——আর কোন কিছুর প্রয়োজনই হয় নাই তখন। বিশ্বাস জিনিষটা দুর্ব্বলের নয়—সবল সুস্থ সাত্ত্বিক-ধৃতি সম্পন্ন মানবেরই বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস। দুর্ব্বলের প্রতি পদে পদে অবিশ্বাস দেখা যায়, তাহার কারণ তাহাদের ধৃতিশক্তির ন্যূনতা ঘটিয়াছে। চিত্তের একাগ্র-শক্তি বা ধৃতিশক্তির অভাবে, কোন কথাতেই তাহাদের মন অধিকক্ষণ সংযোজিত থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালীর বুদ্ধি-প্রতিভার দৈন্য নাই বটে, কিন্তু এই ধৃতিশক্তির যথেষ্ট দৈন্য ঘটিয়াছে। 'মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী' এই নিন্দাবাদ এইজন্যই আমাদের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণের চাঞ্চল্য আছে—কিন্তু প্রাণকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিবার সঙ্কেত বা ক্ষমতা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইলে ভিতরে যে প্রবল ধৃতিশক্তি থাকার প্রয়োজন, সেই দিকে আমাদের যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। আমাদের আবার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, ধৃতিশক্তিকেই আয়ত্ত করিতে হইবে। মেরুদণ্ড শক্ত না হইলে—অল্প আঘাতেই আমাদিগকে মুস্‌ড়াইয়া পড়িতে হইবে। জগৎকে যে পরা-প্রকৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আমাদের মাঝেও সেই পরা-প্রকৃতিরই উদ্বোধন করিয়া মনুষ্যত্বে উন্নত হইতে হইবে।

চট করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা প্রতিভারই লক্ষণ বটে, কিন্তু ধারণাশক্তিকে স্থায়ী করিতে হইলে প্রতিভার সঙ্গে অধ্যবসায় জিনিষটীরও সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। আমরা সহজে বুঝিয়া ফেলি বটে, কিন্তু সেই বুঝাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে শক্তি, সামর্থ বা ধৃতির প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই—এই জন্যই অনেক কিছু বুঝিয়াও জগতের সমক্ষে আমরা সেই দীন-কাঙ্গাল বলিয়াই পরিচিত।

আমাদের পৃষ্ঠপোষক—একমাত্র ধৃতিশক্তি। বাহিরের শক্তি আমাদের কোন সাহায্যই করিবে না, আবার আমরা যদি ধৃতি-সম্পন্ন হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের নায্য প্রাপ্তি কেহই আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিবে না। নানা সমস্যা উদ্ভবের দিনে আবার আমাদের সেই নচিকতার শ্রদ্ধা, বীর্য্য বা ধৃতিশক্তিই লাভ করিতে হইবে।

শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নহে, সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই একমাত্র ধৃতিশক্তির অভাবে নানা দিক দিয়া কেবল দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। সাহিত্য মানসিক চাঞ্চল্যের উপাদান নহে—সাহিত্য দ্বারা মানুষের জীবন গঠিত হইবে। সাহিত্য যেখানে নিছক উপভোগের সামগ্রী, সেখানে বুদ্ধি-প্রতিভার প্রখরতা থাকা চাই, কিন্তু শুধু বুদ্ধি-প্রতিভা দ্বারা তো আর জীবনের পূর্ণ পরিণতি ঘটে না। ভাব প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে—ভাব-গাম্ভীর্য্যও থাকা চাই—তবে না বুঝিব তাহার সকল রকমের ধৃতিই করায়ত্ত।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজকের পথটী অতি সুন্দর, প্রাণে কে যেন নব নব আনন্দ ঢেলে দিতে লাগলো। সেই আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে চল্‌তে লাগলাম। অনেক দূর যাবার পর **বালসুতা** নামক একটী নদী পেলাম। তদুপরি ছোট্ট পুলটী পার হয়ে চল্‌তে লাগলাম। হরিদাস ভায়া আমায় এগিয়ে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ জিদ্ করায় আমি আগে চলে যেয়ে মণ্ডল চটী হতে প্রায় দুই মাইল দূরস্থ **বৈরগড়া** নামক চটী পেলাম। বৈরগড়া চটীটি খুব ছোট্ট, তাতে মাত্র একজন দোকানদার আছে। জলের কষ্ট—জল একটু দূরে। তথায় না থেমে চল্‌তে লাগলাম। এ পর্য্যন্ত সীধা পথেই চলে এসেছি। এবার সামান্য সামান্য ক্রমোচ্চ চড়াই কর্‌তে লাগলাম। এক মাইল ক্রমোচ্চ চড়াই করার পর **কোলটী** নামক চটী পেলাম। এর অন্য নাম **আরাম চটী।**

বৈরগড়া
২ মাইল

আরাম চটী বা
কোলটী চটী
১ মাইল

এখানে জোয়ানা কোতোয়াল নামক একজন পাহাড়ী রাজবংশী স্বব্যয়ে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করেছেন, তথা কখনও কখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের সদাব্রতও দিয়া থাকেন, নিকটে অন্য একটী ধর্ম্মশালাও আছে। একটীমাত্র চটী। চটীতে বসে হরিদাস ভায়ার জন্য অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও ভায়া যখন এসে পৌছিল না, তখন তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আগন্তুক অন্যান্য যাত্রীদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পার্‌লাম, ভায়ার জ্বর বেড়েছে, তদুপরি কুচকীর ব্যথা বেশী হওয়ায় ভায়া রাস্তার উপরই বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। বিশেষ চিন্তিত হয়ে ভায়ার অনুসন্ধান করতে কোলটী চটী হতে মণ্ডল চটীর দিকে ফিরে রওনা হলাম।

কোলটী চটী হতে এক মাইল উৎরাই করার পরই বৈরগড়া চটী পেলাম। দেখলাম ভায়া এ চটীতে কম্বল মুড়ী দিয়ে শুয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম, আস্‌বার সময় কুচকীর ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় তদুপরি জ্বর বেশী হওয়ায় অনেক কষ্টে সে এ চটী পর্য্যন্ত এসেছে। আর এগুবার শক্তি নাই। অগত্যা আমিও তার পার্শ্বেই কম্বল মুড়ী দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভায়ার কিন্তু মনের জোর খুব। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ সরোজে আশ্রয় নেবার পর অনেক দিন তাঁর সেবা করে করে ভায়ার মনটী এমনি শক্ত হয়ে গেছিল যে এসব বিপদকে সে আমলেই আন্‌তো না। এই নিয়ে ভায়ার সঙ্গে বচসা হতে হতে কেমন করে যে বেলা দুটা বেজে গেল—জানি না। বোধ হয় উদর-দেবতা গোলমাল সুরু করে না দিলে আরও যে কত সময় সেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে কেটে যেত কে জানে? বাস্তবিকই বটে! যখনই ভায়ার সঙ্গে ঠাকুরের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি তখনই প্রাণে কতই না শান্তি, বল, অনুভব করেছি—হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেছে। ভায়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কথাই যে আমাদের শুনাত—শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা কত যে মুগ্ধ হয়ে যেতাম, তা' একমাত্র অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীঠাকুরই

জানেন। জানি না কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি বলে বা তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আমাদের মত নারকীকে তিনি সাদরে শ্রীশ্রীচরণ-কমলে স্থান দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুল্‌ছেন। সাধ্য কি আমাদের, আমরা তাঁর মনেরমত হ'তে পারি, যদি না তিনি নিজেই কৃপা করে আমাদের তাঁর মনের মত করে না নেন। তাই না কতদিন আকুল হয়ে গাই :—

চল মন বেড়িয়ে আসি
সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ তলে।
(সেথা) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
যা' চাবি—পাবি অবহেলে॥
সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ তলে
শান্তি-কল্প-তরু মূলে।
(সেথা) চাওয়ার মত চাইতে পারলে
অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ-মেলে॥
ভবের মায়ায় হয়ে মুগ্ধ (সেথায়)
যাস্‌নি মন তুই কোন কালে।
(সেথা) জ্ঞান সূর্য্য হৃদে লয়
ভক্তি ধন চাস প্রাণ খুলে॥
(সেথা) সালোক্য সারূপ্য আদি
মুক্তি বেড়ায় পলে পলে।
(ওরে) তেমন মুক্তি চাস্‌নি কখন
(তা হলে) যাবি মন তুই রসাতলে॥
(মনরে) হন্ না কেন যতই পাপী
পড়ে থাক তাঁর চরণ তলে।
"গোপাল" বলে হেসে খেলে
এবার পাড়ি দিব ভবের কুলে॥

সত্যই ত আমরা আনন্দময়ের সন্তান, আমরা যতই কেন পাপী, তাপী, রোগী, ভোগী, যতই কেন দুরা চারী হই, তবুও ত ক্ষণেকের তরে তাঁর সুধাময় কথা মনে হ'লে হৃদয়ে না জানি কত আনন্দের লহর বয়ে যায়। তখন কী তার সে অমিয় মধুর আনন্দ নীরে আমাদের হৃদয়ের সারা ময়লা মাটী ধুয়ে তাঁর শান্তিময় আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না? তাঁর স্নেহময় স্পর্শে হৃদয় কী পবিত্র হয়ে যায় না? তখন কী আমরা তাঁরই হয়ে যাই না? মরু-সম-হৃদয়ে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে, সে কঠোর হৃদয়ে এমন করে নির্ম্মল আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় কেন? তাঁর মুখপানে চেয়ে চেয়ে জগৎ ভুলে যাই কেন?' পার্থিব জগতের কোন জিনিষই আমাদের সে অমিয় তৃপ্তি দিতে পারে না কেন? চির আনন্দময়ের, চির শান্তিময়ের শ্রীশ্রীচরণ-কমলে পৌছে দিবার জন্য কে আমাদের অমন করে ধরে নিয়ে যায়? —সে যে আমাদেরই গো! —সে যে আমাদেরই হৃদয়ের হৃদয়েশ্বর—প্রাণের ধ্রুবতারা! সে যে আমাদের হৃদয়ের চির আরাধ্য দেব! সে যে সদ্‌গুরুরূপী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আমাদেরই শ্রীশ্রীঠাকুর! আমরাও যে তখন তাঁরই! তখন যে আমরা সেই আনন্দময়ের—চির শান্তিময়ের আদরের সন্তান! তখন যে আমরা সেই চির প্রেমময়ের কোলে বসে চিরমুক্ত হয়ে যাই, আজ আমরা ধন্য! আজ আমরা চির পবিত্র!! আজ আমরা চির আনন্দময়ের সংশ্রবে এসে চির আনন্দময় হয়ে যাচ্ছি! ধন্য ঠাকুর! তুমিই ধন্য!! তোমার অনন্ত করুণা ধন্য!!! তোমার বালারুণ চরণ কমলে আশ্রয় নিয়ে আজ আমরাও ধন্য!!!

* * *

জ্বর সামান্য ছিল, ক্ষিদেও কম পায়নি, কাজেই কিছু খাবারের চেষ্টায় লেগে গেলাম। জ্বরের পথ্য ত সঙ্গে কিছুই নাই—চটীতেও কিছু পাওয়া গেল না। অগত্যা চাল-ডাল একসঙ্গে সিদ্ধ করে (বিনা মসল্লায়) খানিকটা লবণ-ঘী দিয়ে খেতে লাগলাম। জ্বরের মুখে সবই অরুচি লাগে—কাজেই কিছুই খেতে পার্‌লাম না। তা ছাড়া দেখেছি, যখনই নিজের জন্য পাক করি, জানি না কেন সে জিনিষ খারাপ হবেই হবে। আবার দশজনের জন্য পাক করলে দেখতে পাই, সে জিনিষ কখনই খারাপ হয় না। তাই মনে হয় মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মা বল্‌তেন, "যারা নিজের জন্য পাক করে, তারা রাক্ষস। একা হলেও কমের

পক্ষে পাঁচ জনের পাক করা উচিত। অন্য কাকেও খাওয়ান উচিত।"

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে হরিদাস ভায়াকে সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগলাম। এক মাইল চড়াই করে **কোলভী** চটী। এখান হ'তেই সকালে হরিদাস ভায়ার জন্য ঘুরে গিয়েছিলাম। তথায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে বের হয়ে পড়লাম। রোদের তাপ তখন বেশ শান্ত হয়ে এসেছে—মনে হচ্ছে যেন বাঙ্গালার বসন্তকালের সন্ধ্যা। সুতরাং তখন আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছিল। সামান্য চড়াই করার পর সীধা ও সামান্য সামান্য উৎরাই পথে দেড় মাইল যাবার পর **সেটানা** চটী।

সেটানা বা বালখিল্য চটী ১৷৷ মাইল

এ চটীর অন্য নাম **বীর** চটী। এই চটীতে পৌছাবার পূর্ব্বে **বীরগঙ্গা** নামীয় একটী ছোট্ট নদী পার হ'তে হয়েছে। বীরগঙ্গার অন্য নাম **বালখিল্য** গঙ্গা। তাই অনেকে এই চটীর নাম বালখিল্য চটীও বলে থাকে। একে নদী না বল্‌লেও চলে, কারণ দুটী উচ্চ পর্ব্বতের শিখরস্থ দেশ হ'তে একটী বড় ঝরণা জন্ম নিয়ে সবেগে নীচের দিকে ছুটে চলেছে। তদুপরি ছোট্ট একটী পুল—তাই এটী নদী।

সেটানা চটী বেশ ভাল চটী——অনেকগুলি দোকানদার। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। পার্শ্বেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, তার গোড়াটা বেশ মনোরম করে মাটী ও পাথর দ্বারা বাঁধান। সেখানে বস্‌তে বেশ আনন্দ লাগলো। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে বসে বিশ্রাম কর্‌লাম। বড্ড আনন্দপ্রদ স্থান বটে! এদিকে সবিতৃদেবও সারাদিন আফিসের হুকুম তামিল করে বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত! স্থানটী দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল। ইচ্ছা হ'ল এখানেই রাত কাটাব। কিন্তু হরিদাস ভায়া আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সেখান হ'তে আবার চল্‌তে লাগলাম।

পাহাড়ের কোল দিয়ে বেশ বাঁকে বাঁকে পথ। পথটীও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে—মনে হয় যেন কেউ ঝাট দিয়ে রেখেছে। সামান্য চড়াই উৎরাই—কিন্তু প্রায়ই সীধা। খানিক দূর যাবার পর দেখি পাগলী মা, তথা বৃন্দাবনের অন্য একজন মাতাজী আমাদের খোঁজে ধাই ধাই করে ছুটে আস্‌ছে। সকালেই তারা চামেলী চটী পর্য্যন্ত চলে গেছে। দুপুরে আমরা সেথায় না যাওয়ায় মায়ের দল বিশেষ চিন্তিত হলেও কিন্তু ভায়াদের দল নির্ব্বিকার! মায়েদের দল ভায়াদের পাঠাতে চেষ্টা করে অসমর্থ হয়, নিজেরাই শেষে আমাদের খোঁজে ছুটে আস্‌ছে। তাদের দেখে বড্ড আনন্দ হ'ল—হৃদয়ের ভিতর না জানি কেমন একটী বিদ্যুৎ খেলে গেল—শরীরে নব বলের সঞ্চার হল। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। …………

সমস্ত পথটাই ভায়াকে ধরে ধরে আন্‌তে হয়েছে। পাগলী মার খবর ত আমরা এর আগেই পাঠকদের জানায়েছি। সে খুব তেজস্বী, কোন কিছু দেখে ভয়ে কাবু হয়ে যায় না। তৎসহ বৃন্দাবনে একজন মাতাজী যোগ দেওয়ায় দুইজনে দুইখানা পার্ব্বত্য লাঠি নিয়ে লালসাঙ্গা হ'তে পৌণে তিন মাইল চড়াই করে ও এক মাইল সীধা ও উৎরাই পথে এসে আমাদের ধরে বিশেষ ব্যস্ততা তথা আন্তরিকতা প্রকাশ কর্‌তে লাগলো—আমাদেরও বিশেষ আনন্দ হ'ল। জগতে মায়ের কোল যে কত আনন্দবর্দ্ধক—কত আরামপ্রদ তথা শান্তিদায়ক, তা' তারাই বুঝে, যারা মাতৃস্নেহ হ'তে বঞ্চিত হয় নি। অন্য দেশের খবর না জান্‌লেও ভারত কিন্তু কখনও মাতৃশূন্য নয়। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মাতৃত্বে আরোপ করে যুগাবতার শ্রীশ্রীভগবান্

রামকৃষ্ণদেব মহামায়ার কৃপা লাভ করে চিরশান্তি-দায়িনী মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়ে নিজে ধন্য হয়েছেন, তথা জগৎকেও ধন্য করে গিয়েছেন। তাই পুনঃ বল্‌ছি—মাতৃত্ব চিরশান্তিপ্রদ—সে যে কত সুখের তা মনে হলে এখনও চক্ষের ধারা বয়ে যায়। ··················

মাতাজীদ্বয় আমাদের ঝোলা কম্বলাদি নিয়ে আমাদের বোঝা হাল্কা করে দিল। আমরা সকলে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগলাম। সেটানা চটী হতে পৌণে দুই মাইল আসার পর **গোপেশ্বর** চটী পেলাম।

গোপেশ্বর চটী
১৮ মাইল

এর ভিতর কোন সময়ে যে স্যুর্যি মামা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন, মায়েদের যাওয়ায় এত আনন্দ হয়েছিল যে তা' বুঝতেও পারি নি। সুর্যিমামা ফাঁকি দিলেও কিন্তু তখনও অন্ধকার হয় নি। এ পথে আমরা চড়াইয়ের শেষ সীমায় এসে উঠেছি, এবার উৎরাই করে পৌণে তিন মাইল গেলেই চামেলী বা লালসাঙ্গা জংশন পাব — যেখানে আমাদের সঙ্গীয় অন্যান্য সকলে আড্ডা নিয়াছেন। ততদূর যাবার সময়ও ছিল না, শক্তিও ছিল না। কাজেই এখানে একটী ভাল চটী বেছে নিয়ে আড্ডা জমান গেল।

গোপেশ্বর একটী পার্ব্বত্য সহর—বেশ বড় বস্তী। চটীতে পৌছাবার মুখেই একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আছে। জলের কষ্ট! কিন্তু নিকটে একটী কূপ আছে—কূপে জল ছিল। কূপটী ৯ হাত গভীর। হিমালয়ের ভিতর আর কোথাও কূপ নাই। চটীর নিকটেই শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের একটী অতি পুরাতন মন্দির—তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন। মন্দিরটী প্রাঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। প্রাঙ্গনের চারিদিকে সারিবদ্ধ কতকগুলি ঘর—তাতে যাত্রীরা বিশ্রাম করতে পারে। প্রাঙ্গনের এক কোণে লৌহ-নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড ত্রিশূল, তাতে অনেক ভাষায় কত কিছু লেখা আছে। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন, "ত্রিশূলটী অষ্টধাতু নির্ম্মিত তথা খুব চমৎকারপ্রদ। ভক্তি ভরে সামান্য একটী অঙ্গুলির জোরেই ত্রিশূলটী নড়তে থাকে, আবার উপেক্ষার সহিত শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় কর্‌লেও কিন্তু একটুও নড়ে না"—এটী পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ-সুবিধা আমাদের হয় নি।

প্রাঙ্গনের বাইরে একটি দ্বিতল গৃহে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবী স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজিতা আছেন। কেদার-খণ্ডের প্রথম ভাগের ৫৫ অধ্যায়ে এ স্থানের মহিমা বর্ণিত আছে। কেদারখণ্ডে এর নাম **"গো-স্থল।"** মন্দিরের ভিতর অনেকগুলি তাম্র-শাসন বিদ্যমান—পার্শ্বেই **বৈতরণী কুণ্ড**। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বৈতরণী কুণ্ডে স্নান তথা পিণ্ডাদি দিতে বলেন। গোপেশ্বর মহারাজের পূজারীর গদীও অতি নিকটে অবস্থিত। তিনিও রাওল নামে অভিহিত। ইনি পূর্ব্বে কেদারনাথের রাওলের অধীনে ছিলেন। বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বরাজ লাভ করতঃ স্বাধীন হয়েছেন। নিত্য পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। মণ্ডল চটী হতে চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথ যাবার পথের বিবরণ এর পূর্ব্বেই সুধী পাঠকদের জানিয়েছি। যাঁরা ঐ পথে মণ্ডল চটী হতে রুদ্রনাথ যান, তাঁরা সে পথে আর মণ্ডল চটীতে না যেয়ে, রুদ্রনাথ হতে অন্য পথে সাত মাইল এলেই এই গোপেশ্বরে পৌছিবেন। স্থানীয় লোক সঙ্গে থাকা দরকার।

এখান হতে পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের ভিতর **কামাক্ষি** নামক স্থান বিদ্যমান। তথায় মহা-দেব তপস্যা করার সময় কন্দর্প এসে উৎপাত আরম্ভ

করায় মহাদেব তাকে চিৎপাত করেছিলেন। তৎপার্শ্বেই রতিকুণ্ড।

রাত্রিবেলা এখানে সামান্য শীত অনুভূত হয়। রাতে পাক করে খাওয়া গেল। হরিদাস ভায়াও কয়েকখানা রুটী দিয়ে জ্বরের পারণ করলো।

২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার—প্রাতে গোপেশ্বর চটী হতে বের হতে বেশ বেলা হয়ে গেল। আজ বেশী দূর যাবার শক্তি নাই—ইচ্ছাও নাই। লালসাঙ্গা বা চামেলী পর্য্যন্ত যেয়েই আস্তানা গাড়বো সঙ্কল্প ছিল, তাই বের হতে দেরী করলাম। এদিকে হরিদাস ভায়ার বাঘীর অবস্থাও খারাপ—বোধ হয় পাকতে আরম্ভ হয়েছে। যন্ত্রণায় ভায়া সারা রাতই খুব কষ্টে কাটিয়াছে। তার কষ্ট দেখে বড্ড দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু উপায় কী?

আজকের রাস্তা সমস্তই উৎরাই। একটু বেলা হবার পর বের হয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে উৎরাই করে পৌণে তিন মাইল যাবার পর অলকানন্দার তটে উপস্থিত হলাম। আমরা দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ছেড়ে যমুনোতরী, গঙ্গোতরীর পথে চলে গিয়েছিলাম, এতদিন পর পুনঃ তার পুণ্যতটে উপনীত হলাম। পবিত্র অলকানন্দার অপর পারেই **চামেলী** সহর। চামেলীর অন্য নাম লালসাঙ্গা। আমাদের বদরীনাথ যেতে অলকানন্দার এপার দিয়ে যে পথটি পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, সেই পথেই যেতে হবে। সঙ্গীয় অন্যান্য লোক ওপারে আছেন। কাজেই অলকানন্দার উপরিস্থিত ঝুলান লোহার পুলটি (Suspension Bridge) পার হয়ে সামান্য চড়াই করে যেখানে আমাদের সঙ্গীরা আসর জমিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচিলাম।

চামেলী বা লালসাঙ্গা জংশন ২৮ মাইল

এখানে পৌঁছে ঝোলা কম্বল রেখে তখনই হরিদাস ভায়াকে সঙ্গে করে খানিকটা উঁচু পথ চড়ে হাসপাতালে গেলাম। হায় রে! পাহাড়িয়া অসভ্য ডাক্তার!! পাহাড়ের পাথরের কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে ভায়াও যেন দয়া-মায়া শূন্য হৃদয় নৃশংস পামরের মত হয়ে গড়ে উঠেছে! ভায়ার বাঘীর কথা শুনে তারা ত ঔষধ দিলই না—অধিকন্তু নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। প্রাণে বড়ই ব্যথা বাজলো। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে হাসপাতাল তথা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করে দিয়াছেন, তারা সেই সব হাসপাতালে বসে বসে দাবা তাসের সদ্গতিকরণ কচ্ছে, তথা মাস কাবারে টাকাগুলির জন্য শকুনির মত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দিন গুজরাণ কচ্ছে। আবার অন্যদিকে রীতিমত ঘুস না দিলে কোন লোকই ঐসব হাসপাতালের দ্বারা কোনও রূপ উপকৃত হয় না। কী করব? আমরা গরীব—অর্থহীন—টাকা পয়সা শূন্য তীর্থের যাত্রী! নতুবা রীতিমত উপঢৌকন দিতে পারলে এসব ডাক্তারদের ঘাড়ে "টাট্টি" "পেশাব" করাও কোন কষ্টকর নয়। অনেক অনুনয় বিনয় করেও একটু টীনচার আইডিন পর্য্যন্তও বিনা পয়সায় বের করতে পারলাম না। হতাশ প্রাণে ভায়াকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

(ক্রমশঃ)

২৫শ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৩৯ | ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৭৪ | | ৫ম সংখ্যা

ততো ন বিজুগুপ্সতে

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

আত্মজ্ঞানীর কাহারও প্রতি ঘৃণা নাই। অপরের মাঝেও যিনি আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান, তিনি আর অপরকে ছোট বলিয়া ভাবিতে পারেন না। আত্মজ্ঞানের এই ব্যাপ্তিবোধ যাঁহার ভিতর উজ্জ্বল নয়—তাঁহার ভিতরই জাতি-বিদ্বেষ, ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। আত্মজ্ঞানীর কাছে শত্রু বলিয়া কেহই নাই।

আত্মজ্ঞানের অভাবেই পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন আমরা। ঐক্যবদ্ধ হইতে হইলে সকলের ভিতর আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বল আলো প্রজ্বালিত করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মদর্শন শুধু ব্যষ্টি আধারে নয়—সকল জীবে—

সর্ব্বত্র আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সাধনার পরিসমাপ্তি হইবে সেইদিনই।

কেন্দ্রে এবং পরিধিতে আত্মজ্ঞানের ব্যাপ্তি হওয়া চাই। ভারতের আদর্শও তাহাই। এইজন্যই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ জড় হইতে পারে নাই—সকলের ভিতর আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার দরুণ আপ্রাণ চেষ্টা দেখা দিয়াছে। নিজের ভিতর ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই হইল না—অপরের ভিতরও ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ভাগবত-ভাব উন্মেষের পক্ষে অপরের মাঝে যে বাধা-বিঘ্ন, আত্মজ্ঞানীকেই তাহা অপসারিত করিতে হইবে। এইজন্যই আত্মজ্ঞানীর নিজের সাধনা শেষ হইলেও—অপরের হইয়া তাঁহাকে আবার সেই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইতে হয়।

ভারত হইতে যেদিন আত্মজ্ঞানের সাধনা বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে—ভারত সেইদিন হইতেই সকল দিকে নিঃস্ব—দরিদ্র বলিয়া জগতের সমক্ষে আপনার অপযশ অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবার আত্মজ্ঞানের পথেই ভারতকে জাগ্রত—প্রবুদ্ধ হইতে হইবে।

শুধু মুখের কথায় বা পাণ্ডিত্যে আত্মজ্ঞান অর্জ্জন হয় না। মূলে চাই কঠোর তপস্যা—আর অবিচল শ্রদ্ধা। যাঁহার ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে, শাস্ত্র তাঁহাকেই যথার্থ পণ্ডিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আত্ম-জ্ঞানীর একটা বিশিষ্ট লক্ষণই এই যে—তিনি ভাল-মন্দ সকলকে আপন করিয়া লইতে ইচ্ছুক। ছোট বলিয়া, নিজের মহত্ত্বকে ছোটর কাছেও কোনদিন খর্ব্ব করিতে তিনি প্রয়াসী নন। নিজের মাঝে আত্ম-দর্শন বরঞ্চ সহজ, কিন্তু অপরের ভিতর আত্ম-দর্শনের সাধনা বড়ই কঠিন। কঠিন বলিয়া আত্মজ্ঞানীর কাছে তাহা বিভীষিকার বিষয় নয়।

প্রথমে আত্মোপলব্ধির নিবিড় সাধনায় তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, প্রয়োজন হইলে এই সময় নিবিড় হইয়াও থাকিতে হইবে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এই বিবিক্ত-ভাব চিরকালের দরুণ নয়। আত্মার নিবিড় অনুভূতি লাভ করিয়া, তাহার পর বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে সেই অচল-অটল অনুভূতির প্রমাণ দিতে হইবে। সাংখ্যের কূটস্থ ভাব নয়—বেদান্তের পুরুষোত্তমের ভাব লইয়া বাস্তব-জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

আত্মজ্ঞান হইলে মানুষ মানুষকে কখনো ছোট চক্ষে দেখিতে পারে না। আত্ম-বিশ্বাসের আলোক তখন অনন্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মানুষের মাঝে যে ক্ষুদ্রতা—যে তুচ্ছতা রহিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে নাই, মানুষের ভিতর যে ভগবান রহিয়াছেন—এই কথাটাই বড় করিয়া ধরিতে হইবে। আত্মজ্ঞানীর মহান্ ভাবনায়, অপরের মাঝেও মহান্ ভাবের উদ্বোধন হয়। সকলকে উন্নত করিবার মূল হইল সকলের সম্বন্ধেই বড় ভাব পোষণ করিয়া থাকা। আত্মজ্ঞানীর পক্ষেই ইহা সম্ভব। অপরের শুধু মুখের কথাই সার হয়।

"সর্ব্বা হি ঘৃণা আত্মনোঽন্যৎ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি"—আত্মা ব্যতিরেকে যিনি কোন কিছুই সন্দর্শন করেন না, তাঁহার আবার ঘৃণা হইবে কাহার প্রতি? আত্মব্যাপ্তিতে মানুষের ঘৃণাবোধ থাকিতেই পারে না। আজ জাতি-হিংসা, জাতি-বিদ্বেষ প্রবলরূপে প্রতিভাত হইতেছে—ইহার একমাত্র কারণ আত্মজ্ঞানের অভাব। ঘৃণা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞানে—ঘৃণা দূর করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। থাকিলেও তাহা শুধু বাহিরের প্রতিকারের উপায় মাত্র।

অন্তরের বিরোধকে আচ্ছন্ন করিয়া বাহিরের সাময়িক মিলনের কোন মূল্য নাই—এইজন্যই মিলনের জয়ধ্বজা উড়াইবার পরক্ষণেই দেখা যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষাগ্নি প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মদর্শী একটা জাতির উদ্ভব নিছক কল্পনা বা স্বপ্নের বিষয় নয়। ঋষিযুগে আত্মদ্রষ্টার সংখ্যাই বেশী ছিল—এইজন্যই বাহিরে তাঁহাদের ভেদ পরিলক্ষিত হইলেও—অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। ঋষিসঙ্ঘের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল এইজন্যই।

ঘৃণা দূর করিবার একমাত্র উপায় উপনিষদের ঋষিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উপনিষদের এই উদার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া চলিতে পারিলে, বিনা বাক্য প্রয়োগে দ্বেষ-হিংসা তিরোহিত হইয়া যাইবে। সাধনার চেয়ে হৈ-চৈ আজকাল বেশী। যে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে তিল তিল করিয়া তপস্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, আজকাল শুধু বাক্যাড়ম্বরেই তাহা লাভ করিবার অতিষ্ঠ লোলুপতা দেখা যায়। মিলন শুধু মুখের কথাতে পর্য্যবসিত হয়—কাজের বেলায় দেখা যায় তাহার ব্যভিচার!

মানুষের ভিতর ভগবান দর্শন করিব, আত্মদর্শন করিব—এই সঙ্কল্প-ধারী একদল কঠোর সংযমী তপস্বীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে অবজ্ঞা করিয়াই আমাদের আজ এই দুর্গতি। সম্পদের যুগে মানুষের আত্মব্যাপ্তি উজ্জ্বল থাকে—সেইজন্যই বিচ্ছিন্ন জাতির চেয়ে বিরাট জাতির উদ্ভব হয় তখন। ঋষিযুগ ছিল সেই সম্পদের যুগ। অপরের মাঝে আত্ম-দর্শন করিতে না পারিলে নিজের প্রতি ঘৃণা বা ধিক্কার আসিত, এখন হইয়াছে তাহার উল্টা। অবজ্ঞা করিয়াই আমরা শত্রুর সংখ্যা বাড়াইয়াছি। অবজ্ঞাত জাতির দরুণ আমাদিগকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে– অর্থাৎ আমাদিগকে যথার্থ আত্মজ্ঞানী হইতে হইবে। নিজের পরিধিটাকে অনন্তে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে ; সেই অনন্তের মাঝে সকলকেই প্রত্যক্ষ করিয়া ঘৃণাবোধকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে হইবে।

আত্মজ্ঞানের পথেই আমাদের যথার্থ ঐক্য। মিলনের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। কি করিয়া আমাদের সেই দুর্ল্লভ আত্মজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাহারই নিগূঢ়-সাধনায় ব্যাপৃত হইতে হইবে। অজ্ঞানীর মিলন দু'দিনের, জ্ঞানীর মিলনই স্থায়ী হয়। দেহে-মনে-প্রাণে, সর্ব্বাবস্থায় আমাদের সংবিৎ যেন উজ্জ্বল থাকে। আত্মাকে দৃশ্য-জগতে প্রতিভাত না করিতে পারিলে—সাধনার পূর্ণ পরিণতি হইল না। আত্মজ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ্তি দ্বারা অজ্ঞানীর হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে ; ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা, নর-নারায়ণের শ্রেষ্ঠ সেবা। ঘৃণা, হিংসা-দ্বেষ দূর করিয়া আমাদের এই ব্রত লইতে হইবে যে, আমরা মানুষের ভিতর ভগবানকে দেখিতে চাই, মানুষই যে ভগবান্ প্রাণে প্রাণে যেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। আত্মাতে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ইহাই।

কি চাই ?

জীবনে কি চাই, ইহা যদি গভীরভাবে তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, আমাদের দৈনন্দিন চাওয়ার বস্তু আমাদের প্রাণের সকল জ্বালাকে মিটাইতে সক্ষম নয়। এই জন্যই চাওয়ার চাঞ্চল্য আমাদের লাগিয়াই আছে। আজ একটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, কাল আবার নির্ম্মমভাবে তাহাকেও পরিত্যাগ করি, এই ভাবে আমাদের প্রাণ ধ্রুব লক্ষ্যের অনুসন্ধানে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের নিগূঢ় রহস্য না বুঝিয়া তৌষ্টিকের মত সাময়িক তৃপ্তিতে মন-বুদ্ধিকে এলাইয়া পড়িতে দিলে, তাহাতে কল্যাণ সাধিত হয় না। অতৃপ্তি শত গুণে শ্রেয়ঃ, তবুও তৌষ্টিকতা যেন পাইয়া না বসে।

জীবনের লক্ষ্য যাহাদের অবধারিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরও গতি আছে, কিন্তু তাহাদের গতিতে চাঞ্চল্য নাই। কিন্তু লক্ষ্য যাহাদের এখনও সুস্পষ্ট নয়, তাহাদের চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। জীবনে কি চাই, কি পাইলে পরা-শান্তির অধিকারী হইব, তাহা জানি না, কিন্তু না জানিলেও নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রাণ তোমাকে নিয়তই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার দরুণ উস্কাইয়া তুলিবে। মোট কথা নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে পারিবে না কেহই। সবলকেই মহালক্ষ্যের পানে ছুটিতে হইবে। এমনি ভাবে চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়াই একদিন অবিচলিত ভাবের সন্ধান পাইব। ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াই সুদূর লক্ষ্যের সন্ধান মিলিবে। ভুল হইবে বলিয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকা জড়ের লক্ষণ। জড় পরিবর্ত্তন চায় না, কিন্তু মানুষের ভিতর প্রাণ আছে, সেই জন্যই চরম লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের গতিই মানুষকে নিশ্চিন্ত হইতে দিবে না।

অনেক পরীক্ষার পর, অনেক দুঃখ-কষ্ট-তপস্যার পর, চরম সত্য মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়। সত্যকে যাহারা সহজভাবে পাইতে চায়, সত্য তাহাদিগকে আবার সহজভাবেই ফাঁকি দেয়। তুষ্টি আসে, সাময়িক তৃপ্তিও লাভ করিয়া থাকি আমরা, কিন্তু তাহা আপেক্ষিক। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—গীতার এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে অনেক কঠোর পরীক্ষা দিতে হয়। জীবনের দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে অনেক উপায়েই, কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় কিসে—ইহা আবিষ্কার করিতে গিয়াই সাংখ্য-দর্শনের সৃষ্টি। আমরাও জীবনে সুখ পাই, শান্তি পাই, কিন্তু সেই সুখ, সেই শান্তি স্থায়ী নয়; এই জন্যই মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—আত্যন্তিক শান্তি লাভ হয় কিসে? এমন একটা অবস্থা হয়ত আছে, যেখানে পৌছিলে আর কিছুতেই পতনের আশঙ্কা থাকে না। মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রেয়কে উপেক্ষা করিয়া আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ যাহা, তাহা লাভ করিবার দরুণ তাহার দিকে আপ্রাণ চেষ্টায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এই যাত্রা যে কবে শেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সুখ চাই না, ভোগ চাই না, চাই সত্যকে—উত্তেজনার মুহূর্ত্তে অধিকাংশেরই এই কথাটী স্মরণ থাকে না। সত্যলাভের পথে সুখ, ভোগ, স্বার্থপরতা অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত

করিয়া দেয়। এই জন্যই নিজের প্রতি নির্ম্মম হইতে না পারিলে, অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাতসারে অনেক শত্রু প্রশ্রয় পাইয়া বসে। কোন ক্ষেত্রেই প্রমাদের অবস্থা কল্যাণকর নয়। সুতরাং জীবনের লক্ষ্য নির্ব্বাচন করিবার বেলায় সমাধিস্থ হইয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য—কিসে ঠিক্ ঠিক্ আমাদের জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, কি লাভ করিতে পারিলে প্রাণে আর চাঞ্চল্য থাকিবে না! গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব, আমরা সচরাচর যাহা চাই, তাহা ঠিক্ ঠিক্ প্রাণের চাওয়া নয়। অনবরত চাওয়ার পরিবর্ত্তনও হয় এই জন্যই। কঠোর পরীক্ষার পর জীবনের লক্ষ্য যাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সাধনার মাঝে একটা অনাবিল প্রচেষ্টা দেখা দেয়। মন-প্রাণের সমগ্র শক্তি তিনি এক লক্ষ্য সাধনে তখন নিয়োজিত করিতে পারেন। মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই ভাবেই প্রাণের ধনকে আয়ত্ত করিয়া নিতে পারা যায়। চঞ্চল চিত্ত লইয়া অনিশ্চিত লক্ষ্যের পানে মানুষ অনর্থক ঘুরিয়া মরে।

বাহিরের কাজটাই বড় নয়, চিত্তের প্রশান্তি আসে কিসে, ভিতরে জ্ঞানের আলো কি করিয়া চির প্রজ্জ্বলিত রাখা যায়, তাহার উপায়ই আবিষ্কার করিতে হইবে। কাজ করা ভাল, কিন্তু অপ্রমত্ত হইয়া কাজ করা আরও ভাল। এই জন্যই স্থিত প্রজ্ঞের কর্ম্মে কোন দিন উত্তেজনা নাই, তাড়াহুড়া নাই; তাঁহার আহার-বিহার চেষ্টা-প্রযত্ন সবই সুনিয়মিত। হৈ-চৈ করিয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নয়। উত্তেজনায় যাহারা চলে, তাহাদের পরক্ষণেই অবসাদ দেখা দেয়। দেখাদেখি যে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণে জাগ্রত হয়, তাহার মূল্য খুবই কম, অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে বজ্রদৃঢ় ইচ্ছার উদ্বোধন হয়, সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাই ঠিক্ ঠিক্ খাঁটী, জীবনের কল্যাণ হয় সেই ইচ্ছার বা আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধনেই। এই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করিতে হইলে অনেক উত্তেজনার মুহূর্ত্তকেই অবাধে চলিয়া যাইতে দিতে হইবে। উত্তেজনায় সাড়া না দিলেই যে প্রাণ নাই, ইহা অমূলক আশঙ্কা। প্রাণ শক্তির অপব্যয়ও মহাপাপ।

যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, নিষ্ঠার সহিত আত্ম নিয়োগ করিতে না পারিলে তাহার ফল কিছুতেই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে—যে দিকেই হউক না কেন সর্ব্বাগ্রে নিষ্ঠা জিনিষটী থাকা চাই। এই নিষ্ঠা জিনিষটী আসে অনেক সাধ্য-সাধনার পর। হুজুগ অল্প সময়ের দরুণ আসিয়া মানুষের চিত্তকে পাগল করিয়া তুলে, কিন্তু নিষ্ঠা জিনিষটী স্থায়ী। এই নিষ্ঠার অভাবেই অনেক সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধার্ম্মিকের জীবন পণ্ড হইতে দেখা যায়। সকলের জীবন এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দরুণ গঠিত নয়। এই উদ্দেশ্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়াটাও কল্যাণকর নয়, তাহাতে অনেকের জীবন পণ্ড হইতে দেখা যায়। নিজের ভিতরের আবর্জ্জনা দূরীকৃত না করিলে, লক্ষ্য কখনও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিতে পারে না। চিত্ত-শুদ্ধির দিকে জোর দেওয়ার কথা এইজন্যই মহাপুরুষগণ এত করিয়া বলিয়া থাকেন। শুদ্ধ চিত্তে লক্ষ্য আপনি প্রতিভাত হইয়া উঠিবে

কত কিছুই চাহিলাম, কত কিছু পাইলামও, কিন্তু কৈ তাহাতে প্রাণের অভাব মিটে কোথায়? আমাদের চাওয়া ঠিক হয় নাই বলিয়াই চাহিতে গিয়া নির্দ্দেশ পাইয়াছি—"জীবনে কি চাও,

তাহা ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝ, চাওয়া ঠিক হইয়া গেলে তাহা পাইতে আর বেশী সময় লাগিবে না।" বাস্তবিকই চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিব—জীবনে কি চাই, তাহা এখনো আমরা ধরিতেই পারি নাই। 'ইহাই চাই' বলিয়া যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরি, দু'দিন পর সেই বলে, ইহার পরও আরও কিছু চাহিবার রহিয়াছে। চরম লক্ষ্যের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত—আপেক্ষিক লক্ষ্য আমাদের এমন করিয়া প্রবঞ্চিত করিবেই। শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়—দ্বিবিধ পথই রহিয়াছে। প্রেয়ের পথে আপাততঃ শান্তি বা সুখভোগ হইতে পারে বটে, কিন্তু জীবনের পরিণামের দিক দিয়া বিচার করিলে আপাত মনোরম প্রেয়ের পথকে উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়ের পথে চলাই কর্ত্তব্য। এক একটা সময় আসে—তাহাতে এক এক ভাবের প্রাধান্য দেখা দেয়, সেই প্রাধান্যে যাহারা আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, তাহাদের পরিণাম অনেক ক্ষেত্রেই কল্যাণকর হয় না। মোটকথা বুঝিয়া-শুনিয়া চলিবার মত প্রজ্ঞা যাহাদের নাই, তাহাদের জীবন প্রায়ই ভাবের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়া কোথায় ঠেকে তাহা বলা দুষ্কর। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে অধিকাংশ লোকেই প্রজ্ঞাকে হারাইয়া ফেলে—এইজন্যই বিনা বিচারে কর্ম্মক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়ার দল দিয়া আন্দোলনের একটা স্থায়ী বা কল্যাণকর সার্থকতা আসে না।

চরম লক্ষ্যকে লাভ করিতে গিয়া দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করাও ভাল, অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, তবু বিচার শূন্য ভাব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়া সঙ্গত নয়। কাজ সবাই করে, কিন্তু কাজের মত কাজ দু'চারটী লোক দিয়াই সাধিত হয়। উত্তেজনা বা হুজুগ জীবনকে কখনো কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারে না। মুখের ঐক্যের বাণীতে প্রাণের অনৈক্য দূর হয় না এইজন্যই আজ-কালকার অনেকের বড় বড় কথা প্রায়ই শূন্যে বিলীন হয়, কিম্বা কার্য্যক্ষেত্রে ভাবের বিপর্য্যয়ই দেখা যায় বেশী। যে অহংএর সম্পূর্ণ বিসর্জ্জনে মানুষের ভিতর হইতে ভেদ বুদ্ধির অপসরণ হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, অর্থাৎ প্রত্যেকের অহং ভাবকে আরও বিশেষ ভাবে উগ্র করিয়া তুলিয়া চাই আমরা সম্মিলিত হইতে—ইহা কি কখনো সম্ভব? আত্মা সবারই এক—কিন্তু সবার বুদ্ধি এক নয়। সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বের উপরে না উঠিলে, শুধু মুখের কথায় ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার আশা করা বৃথা। আসল তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, আমরা চাই শুধু কথার মিলন। জাতিভেদ উঠাইয়া না দিলে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়—ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং অযৌক্তিক কথা। তাহা হইলে নীচ শ্রেণীর লোকের মাঝেও ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইত না। আসল কথা বলিতে গেলে—কেহই প্রকৃতিস্থ নয়—এইজন্যই অনেকেই ভাবিতেছে সব একাকার করিয়া দিলেই বুঝি জগতের কল্যাণ শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইবে। একাকার কিছুতেই হইতে পারিবে না—ইহা প্রকৃতিরই বিধান। সবার বুদ্ধি কোন দিন এক হইতে পারে না। বুদ্ধিতত্ত্বের মাঝে বৈচিত্র্য থাকিবেই। মোট কথা আমরা কি চাই—তাহা আমাদের অধিকাংশই বলিতে অক্ষম; যাহা প্রকাশ করি, তাহা ঠিক ঠিক প্রাণের অভিব্যক্তি নয়। এত সভা, এত সম্মিলনী করিয়াও যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিতেছি না—ইহার কারণও হইল এই। জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে তখন হুজুগই দেখা দেয় বেশী। ধৃতি-শক্তির অভাবে তখন আত্মবৈশিষ্ট্য অনায়াসেই বিলুপ্তির পথে চলে। যে পথ

অবলম্বন করিলে—(অর্থাৎ আত্মদর্শনের পথ) ভিতরের ভেদ বিলুপ্ত হইবে—আমাদের মাঝে কয়জন সেই আত্মজ্ঞানের পথে চলিয়াছি? আত্ম-জ্ঞান লাভেচ্ছুর সেই নিষ্ঠা, সেই বিনয় মম্র ভাব কোথায়? ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবাতেই একদিন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইত, সেই পথে কেহ চলিলে বলি——উহা তাহার slave mentality. এই সব ভাব, এই সব কথা কি ঠিক ঠিক সত্য বা আত্ম-দর্শনাকাঙ্ক্ষীর যোগ্য? এইজন্তই বলি, হুজুগ আসিলেই যে তাহাতে মাতিয়া যাইতে হইবে, আর না মাতিলে প্রমাণ হইবে—তাহার প্রাণ নাই, ইহার কোন অর্থই নাই। প্রাণ-শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করাও বিচক্ষণের কাজ।

জাতির ভিতর বিশ্বাস ও ধৃতি-শক্তির অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্তই নিজের ধর্ম্ম ছাড়িয়া পরের ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে রাতারাতি বড় হওয়া যায় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরুণ সকলের ভিতর এক অত্যুগ্র লোভের সৃষ্টি হইয়াছে। এই লোভের পরিণাম যে কোন রকমেই কল্যাণকর নয়, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ধৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হয় সংযমে, নিষ্ঠায়। ব্যভি-চারীর জীবনে হুজুগ দেখা যায় বেশী, কিন্তু একটা লক্ষ্যের পানে তিল তিল করিয়া প্রাণ ঢালিয়া দিবার মত বীর্য্য তাহার কোথায়? সংযমী ধৃতি-শক্তি-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান সাধকেরই প্রয়োজন বেশী। এইজন্যই জীবন-গঠন করার দিকে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ি-য়াছে। জীবন গঠনের মূল নীতি পাশ্চাত্য দেশ হইতে ধার করিয়া আনিতে হইবে না আমাদের—ঋষি শাস্ত্রে অব্যর্থ জীবন লাভের বীর্য্যবন্ত উপদেশ যথেষ্টই রহিয়াছে। কাজ হইল নিষ্ঠার সহিত সেই সব কল্যাণপ্রদ নিয়মগুলি মানিয়া চলা। যাহারা হৈ-চৈ করে, তাহারা যে আত্মস্থ নয়, তাহাদের কার্য্যের ধারাই তাহা সু-প্রমাণিত করে। মনুষ্যত্ব লাভের পথ—উচ্ছৃঙ্খলতার পথ নয়। এক একটা গুণ আয়ত্ত করিতে হয় ত আজীবন তপস্যা করিতে হইবে। দু'দিনে অব্যর্থ বীর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাণের বহিরঙ্গ দিকটা উত্তেজনা; প্রাণের (মুখ্য প্রাণের) অন্তরঙ্গ দিকও রহিয়াছে, সেই দিকে নীরব সাধনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায় বেশী। মুখ্য প্রাণের বজ্র দৃঢ় অনুভূতি যাহাদের অস্থি-মজ্জায় এখনো বিজড়িত হয় নাই, তাহারা প্রাণের পরিচয় দিবে কেমন করিয়া? দুই দিনের উত্তেজনা অনেকেই দেখাইতে পারে।

কর্ম্মের উদ্দীপনা খুবই ভাল, কিন্তু সেই কর্ম্ম আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে না প্রেয়ের পথে পরি-চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহা আত্মস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আত্মঘাতীর কোন দিন কল্যাণ নাই। মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করাই হইল আসল কাজ—আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল কর্ম্ম যাহা, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। কর্ম্মের বহর বাড়াইয়া চলাটাই জীবনের সফলতার লক্ষণ নয়। আত্মজ্ঞান মুখ্য—কর্ম্ম গৌণ বা তাহার অনুকূল সাহায্যকারী, এই কথাটী সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে। আত্মজ্ঞানী ছাড়া জগতের হিত সকলকে দিয়া হয় না। অবিশুদ্ধ চিত্তে জগৎ-হিতের বাসনা জগতের পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া অকল্যাণকরই হইয়া থাকে। অনেক কিছু চাহিতে পারি, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত চাওয়ার শেষ কোন দিনই হইবে না। জীবনে কি চাই—জীবন-ভরা তপস্যার ভিতর দিয়া ইহাই জানিতে হইবে।

———×———

নিষ্কাম কর্ম্মের নিগূঢ় সঙ্কেত

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—কাজ ছেড়ে কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী এক মুহূর্ত্তও টিক্‌তে পারে না। কিছু না কিছু কর্‌ছে সবাই। আবার গীতাকারই এক জায়গায় বল্‌ছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ—কর্ম্মের গতি বড়ই জটিল। কাজ ছেড়েও থাক্‌বার যো নেই—আবার কাজ করে পরিণামে যে কি ফল পাব—তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই; অতএব এ জায়গায় কর্ত্তব্য কি—এই গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। কাজ ছেড়ে তো মানুষ থাক্‌তেই পার্‌বে না, তাহলে কাজ কর্‌তেই হবে—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। এই জায়গাতেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। কাজ কর্‌তে হবে, কিন্তু ফলের দিকে লোভ না থাকা চাই। তাহলেই এ জায়গায় নিষ্কাম কর্ম্মের কথা এসে পড়ে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড়ই শক্ত কথা। ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম্ম করা—সাধকের পক্ষে সহজ নয়,—সিদ্ধের পক্ষে তা সহজ হতে পারে। তবে ভালবাসায় নিষ্কাম কর্ম্ম করা সম্ভবপর। অর্থাৎ কারও জন্য, কাউকে ভালবেসে জীবনের সব বিলিয়ে দেওয়া—নিজের বল্‌তে আর কিছুই সঞ্চয় না রাখা। কর্ম্মের গতি যখন গহন, তখন এই আত্ম-সমর্পণের পথই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ পথ। গীতাকারও শেষ-মেষ অর্জ্জুনকে সেই কথাটাই বলে দিলেন।

কাজের মাঝে দৃশ্যে-অদৃশ্যে কত প্রতিবন্ধক থাক্‌তে পারে, সুষ্ঠুভাবে কর্ম্ম করা—এ কি কখনো সম্ভব? কোন না কোন বিষয়ে গলদ থেকে যাবেই—অথচ এই গলদের পরিণাম ভুগতে হবে কর্ম্মীকেই, কাজেই কর্ম্মী তো মুক্ত হতে পার্‌ল না কিছুতেই। কাজ কর্‌ব না বলে আবার বসে থাকাও যায় না। সুতরাং মুক্তি পেতে হলে, কাজের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর সহজ পন্থা কি থাক্‌তে পারে? এরই নাম আত্ম-সমর্পণ—গিরিশ ঘোষের "বকল্‌মা" দেওয়া। অর্থাৎ কর্ম্ম করে যাব—কিন্তু সেই কর্ম্মের পরিণাম চিন্তা আমার নয়। ভাল-মন্দ চিন্তার ভার সব অন্যের ওপর। আমি মুক্ত!

"কৃপণাঃ ফলহেতবঃ"—ফলাকাঙ্ক্ষীদের কৃপণ বলে তিরস্কার করা হয়েছে। কৃপণেরাই এতটুকু কাজ কর্‌তে শত দিক থেকে চিন্তা করে, পরিণাম চিন্তায় হয় ত তাদের আর কর্ম্ম করাই হয়ে ওঠে না। এ-ও কিন্তু মস্ত বড় দুর্ব্বলতা। গীতাকার এই দুর্ব্বলতাকেও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি বলেছেন কর্ম্ম কর্‌বে না কেন? আর কর্ম্ম না করে যে থাক্‌তেই পার্‌বে না। তবে কর্ম্ম করার সঙ্কেতটী বলে দিয়েছেন ভাল করে। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"—কর্ম্ম কর, কিন্তু যোগ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। অর্থাৎ কর্ম্ম কর্‌লে যে আত্মানুভূতি হারিয়ে ফেল্‌বে তা নয়। অভ্যাস যোগ দ্বারা কর্ম্মকে সহজ করে ফেল—কাজ তখন অনায়াসে হতে থাক্‌বে, কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মনিরত থাক্‌বে—আর মনকে তখন আত্ম-চিন্তায় বিভোর করে রাখতে পার্‌বে। এরই নাম যোগে থেকে কর্ম্ম করা। এই কর্ম্ম করার স্বাদ যে একবার পেয়েছে—তার কর্ম্ম তখন বন্ধনের কারণ হয় না। বরঞ্চ বাহিরের ইন্দ্রিয়কে কর্ম্ম দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজ করে চলে। কর্ম্মত্যাগকে ক্লীবত্ব বলেও গাল দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। কাজেই কর্ম্ম

ছেড়ে মুক্তি নয়—কর্ম্ম করে মুক্তিলাভ—তার উপায় 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি'। যাঁরা কর্ম্মের এই সঙ্কেত পেয়েছেন, তাঁরা আর ফলের দরুণ এত ব্যস্ত হয়ে উঠেন না।

শ্রীকৃষ্ণ বরাবর বীরত্বের প্রশংসা করে এসেছেন। যোগেরও তিনি কম প্রশংসা করেন নি—কিন্তু সেই যোগ isolated সাধনা নয়—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।" যোগে থেকেও কর্ম্ম করা যায়—আর সবকে তিনি এইভাবে কর্ম্ম করার কথাই বল্‌ছেন। হাত-পা যখন ভগবান দিয়েছেন——তখন তাদের কাজও নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু হাত-পায়ের কাজের সঙ্গে নিজকে মিশিয়ে ফেল্‌লে চল্‌বে না। আত্মজ্ঞান সর্ব্বদা উজ্জল রাখতে হবে। তাই অজ্ঞানে থেকে কর্ম্ম করাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রশংসা করেন নি। কর্ম্ম কর্‌বে জ্ঞানীর মত—অর্থাৎ কর্ম্মের ক্লান্তিতে আপন লক্ষ্য অস্পষ্ট হলে চল্‌বে না। কাজ ছেড়ে যখন নিস্তার নেই, তখন কাজকে নিজের করেই তবে তার ওপর প্রভুত্ব কর্‌তে হবে। প্রথমাবস্থায় সামঞ্জস্য রক্ষা করে কর্ম্ম কর্‌তে গিয়েই নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত হয়। তখন মনে হয়, কর্ম্ম ছেড়ে দিলেই বুঝি যোগে বেশী করে মন বস্‌বে। কিন্তু মানুষের স্বভাবে কর্ম্মের বীজ এমনি সঞ্চিত রয়েছে যে, যোগে বস্‌লে নিস্তরঙ্গ মনে তার অঙ্কুর আরও সতেজ ভাবে দেখা দেয়। এই সময়ই সাধকের বড় সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সুদৃঢ় ভিত্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত মন কেবল এদিক ওদিক দু'দিকেই আনা-গোনা কর্‌তে থাকে। তারপর যখন সাধক এই সংগ্রামের ভিতর দিয়েই কর্ম্মের নিগূঢ় সঙ্কেতটী আবিষ্কার করে ফেলেন, তখন আর কোন লেঠা থাকে না। তখন কর্ম্ম কর্‌তে আর বাধে না কিছুতেই।

কাজ কর্‌ব না বলে বসে থাক্‌লেও মনে মনে অসংখ্য কাজ করে ফেলি আমরা, কাজেই কর্ম্ম থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? বাহিরের কাজ তো মনেরই বহির্বিকাশ মাত্র! কাজেই এই মন ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্‌ব না বলেও তো কোন লাভ নেই। আমি কাজ কর্‌তে না চাইলেও, প্রকৃতিই আমার ঘাড়ে ধরে কাজ করিয়ে নেবে। কাজেই এই কুণ্ঠার তো কোন মূল্যই থাক্‌ল না। বরঞ্চ ভিতরটাকে সাধ্যমত সজাগ কর্‌বার চেষ্টা করে কর্ম্ম করে যাওয়াতেই লাভ। তারপর 'কর্ম্মাশয়' বলে যে একটী কথা আছে, তা কি নিরর্থক? কত কর্ম্মের বীজ যে সেই আশয়ে পরিপূর্ণ তার খবর কে জানে? কর্ম্মের আশয়ের কথা তো আমরা জানিই না। কাজেই আমাদের কর্ম্ম-কৃপণতার তো আদৌ কোন মূল্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই অজ্ঞতা দেখেই ধমক মেরেছিলেন যে, "তুমি কি পণ্ডিতের মত কথা বল্‌ছ, তুমি কি তোমার কর্ম্মাশয়ের কথা কিছু জান? তারপর "গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ"——পণ্ডিতের তো কোন শোকই থাক্‌তে পারে না। তুমি পণ্ডিতের মত কথা বল্‌ছ বটে, কিন্তু পণ্ডিতের মত হৃদয়ের বল কোথায় তোমার?" এই ধমকি পেয়েই অর্জ্জুনের যেন মোহ ভেঙ্গে গেল।

আমাদেরও মাঝে মাঝে ধাক্কা খেয়ে নিজের দৌর্ব্বল্য ধরা পড়ে। কাজ করার শক্তি আমাদের কতটুকু, আর শক্তি থাক্‌লেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কর্‌বার সঙ্কেতই বা জানি কয়জন? অথচ অভিমান —কাজ করেই ফল পাব। কাজ করেও ফল লাভ হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে নিরভিমানের ভাব না আসে। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অহং ভাব জাগলে তাতে ক্ষতি ছাড়া ইষ্ট হয় না। আসল কথা হল **নিরভিমান হওয়া।**

আত্মসমর্পণ ছাড়া নিরভিমানীর ভাব আস্‌তে পারে না। আমি একটা কিছু করে তুল্‌ব—সেই

শক্তি আমার কোথায়? আমি আমার জীবনের কি জানি? সুতরাং এমন একজনের শরণাপন্ন হওয়া চাই, যিনি আমার জীবনের ভাল-মন্দ সবই জানেন সবই বুঝেন। তাঁর নির্দ্দেশে জীবনকে গঠিত করে তুলাই সহজ। মানুষের কর্ত্তৃত্বাভিমানে এইখানেই আঘাত লাগে। অর্জ্জুনের ভিতরও এই ব্যক্তিত্বের বালাই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। আজকাল সমর্পণের কথা বল্‌লেই যেমন বলা হয়—slave mentality, কিন্তু সমর্পণ ছাড়া মহৎ কার্য্য সিদ্ধির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। নিজকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে দিতে না পার্‌লে যে জগদ্‌গুরুর আসন হৃদয়ে স্থাপিত হতেই পারে না! ভিতরে পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ দেখা গেলে, তখন নিজকে বিশ্বাস করাতে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সেই অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া সুষ্ঠু পথে জীবন গঠন করার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সহজ সাধনার সঙ্কেত পাওয়া যায় আত্ম-সমর্পণের পথেই। তখন সাধনার মাঝে অহং ভাব থাকে না, অর্থাৎ আমি যোগ করে, তপস্যা করে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ কর্‌ব এইরূপ ভাব থাকে না। সমর্পণের পথে দৈবী প্রকৃতির কৃপা লাভ হয়। সাধক তখন দ্রষ্টা——সাধনা করে প্রকৃতি, অর্থাৎ যাঁর সাধনা তিনিই করেন। জীব শুধু তাই দেখে রহস্যময়ী প্রকৃতির চরণে লুটিয়ে পড়ে। নিজকে এইভাবে যত নিরভিমানী করে তুলা যায়, সাধনার উগ্রতা তত কমে আসে। সাধনার চেয়ে কৃপার কথাটাই তখন বড় হয়ে জেগে ওঠে মনে।

মোট কথা 'অহং' টাকে মেরে ফেল্‌তে হবে। যত জঞ্জাল এই 'অহং' এর মাঝে। এই 'অহং' সর্ব্বজ্ঞ অহং নয়, তাহলে তো জীবনে কোন অশান্তি বা প্রশ্নই উঠত না। কিছুই বুঝছি না, অথচ অবুঝ বলে নিজের দীনতা স্বীকার কর্‌তেও বড়ই বাধছে—আমাদের অবস্থা সকলেরই প্রায় এইরূপই।

বর্ত্তমানেরও সবটুকু জানি না, অতীত ভবিষ্যৎ তো অনেক দূরে। অথচ এই সঙ্কীর্ণ জ্ঞান নিয়েই বড়াই করে মরি জ্ঞানের। উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি এইজন্যই বলেছেন—"যিনি মনে করেন আমি জানি, তিনি কিছুই জানেন না, আর যিনি মনে করেন আমি কিছুই জানি না, তিনিই প্রকৃত জানেন।" না জানার কথা, অজ্ঞানীর কথা নয়। অভিমান শূন্য জ্ঞানীর মুখ দিয়েই এইরূপ কথা বের হয়।

কর্ম্ম না করেও উপায় নেই, কর্ম্ম করেও কি হবে না হবে তা জানি না—সুতরাং শরণাগতি ছাড়া আর কি উপায় আছে? অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম্ম যিনি জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষের নির্দ্দেশে চলাই তো সব চেয়ে কল্যাণকর। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই সহজ কথাটাই বলেছিলেন প্রথমে—কেন না অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই ভালবেসেছিলেন। ভাল-বাসার পথ যুক্তির পথ নয়—কল্যাণের পথ। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বে তখন আঘাত লাগল অর্জ্জুনের, তাই তিনি বড় বড় বুলি ঝাড়তে আরম্ভ কর্‌লেন। অথচ এই বুলির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কোনই ঐক্য ছিল না।

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার কর্‌তে অনেক সময়ই আমাদের বাধে। নিজের বুঝটাকে সকলের বুঝের চেয়ে সেরা মনে করে আমরা এক অভূতপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় এই আত্মপ্রসাদের মূল অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বরঞ্চ নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে সত্যদর্শীর নির্দ্দেশ মেনে নেওয়াতে ব্যক্তিত্বের কোনই লাঘব হয় না।

"কিংকর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" —সাধারণের কথা তো দূরে, কর্ম-অকর্ম নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতরাও কিছু সিদ্ধান্ত করে উঠতে পারেন নি। কর্মাকর্ম সংশয় স্থলে "অধিকতম লোকের অধিক সুখ"—এই তত্ত্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু অধিকতম লোকের অধিক সুখের দরুণ যে গো-বেচারীদের উপর অত্যাচার চল্‌ছে, তাদের কি প্রাণ নেই—তাদের কি সুখ-দুঃখ বোধ নেই? কাজেই এই নীতিতে তো জগতের সবাইকে তৃপ্ত করা যায় না। তাহলে তো সেই খুঁৎই থেকে গেল। কর্ম-অকর্ম নিয়ে যে এত প্রশ্ন—তার কারণ এইখানেই। সব স্থলে খাঁটী সত্য যে কি তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কাজেই কর্ম-অকর্মের ন্যায়-অন্যায় বিচার নিজের উপর না রেখে—অন্যের উপদেশে কর্ম করে যাওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ। তবে কি না উপদেষ্টা—পূর্ণ জ্ঞানী হওয়া চাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছিলেন যে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে মহা মহারথীদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—কাজেই তাদের প্রাণরক্ষার দরুণ যত্ন করা নিরর্থক। অর্জ্জুনের মনে যতক্ষণ সংশয় ছিল, ততক্ষণ অবশ্য ভাল-মন্দের দরুণ তিনিই দায়ী ছিলেন—কিন্তু যে ভাবেই হোক্, অর্জ্জুনের মন যখন নিঃসংশয় হল, শ্রীকৃষ্ণের উপর ভাল-মন্দ সব ভার অর্পণ করে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—তখন হতে ভাল-মন্দের দায়িত্ব বাস্তবিকই অর্জ্জুনকে উদ্বিগ্ন করে তুল্‌তে পারে নি।

কাজ কর্‌তে গেলেই কিছু না কিছু অনিষ্ট কারও না কারও হয়ে থাকেই—অথচ কাজ না করেও থাকার যো নেই,—সুতরাং কাজও কর্‌ব—অথচ যাতে কারও অনিষ্ট না হয়। কিম্বা ইষ্টানিষ্ট দায়িত্ব জ্ঞান থেকে আমি যদি মুক্ত হতে পারি, তাহলেই আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি"—এই এক নিগূঢ় সঙ্কেত দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু যোগস্থ থেকে কর্ম করা যে কত বড় শক্ত কাজ, তা আর বল্‌বার নয়। অত্যধিক মনের জোর না থাকলে—কর্মের সংস্কারে মনে কিছু না কিছু আবিলতা প্রবেশ না করেই পারে না। জ্ঞানাতীত ভূমি থেকে কর্ম করা সম্ভবপর, কিন্তু জ্ঞানের পরিপাকাবস্থা না জন্মালে—সাধকের পক্ষে সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করা অতীব সুকঠিন। বহু সাধনার ফলে চিত্তের মাঝে যুগপৎ কর্মতৎপরতা এবং কর্ম থেকে বিশ্রামের সঙ্কেত পাওয়া যায়। আমাদের সাধকাবস্থায় বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলেও কর্মের এই সঙ্কেতটীকেই আবিষ্কার করে নিতে হবে।

প্রথমাবস্থায় দুই দিক রক্ষা করে চলা প্রায়ই ঘটে উঠে না—অর্থাৎ balance ঠিক রাখা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু অভ্যাসের ফলে পথের সকল জঞ্জালই ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে যায়। A balanced life between service and meditation কে না চায়? কিন্তু বাস্তব-জীবনে এই balanceটুকু আন্‌তে গিয়ে সাধককে যে কতখানি কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়, তা আর বল্‌বার নয়। কাজ করার পর মনের মাঝে কর্মের সংস্কারই কিল্‌বিল্ কর্‌তে থাকে, তখন ধ্যানে বসেও চিত্ত স্থির হয় না—সুতরাং ধ্যানেরও কোন উপকারিতা বুঝি না। কর্মের সঙ্গে নিজকেও জড়িয়ে ফেলি বলেই আমাদের এই দুর্গতি। তা না হলে উপনিষদের ঋষির বাণী হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে জাগ্রত রাখতে পার্‌লে—অর্থাৎ "ন কর্ম লিপ্যতে নরে"—কর্মের অবসাদ কিছুতেই আত্মজ্ঞানকে নিষ্প্রভ কর্‌তে পারে না, এই সুদৃঢ় ধারণা নিয়ে কাজ কর্‌লে—কাজ করে মানুষ কখনও বন্ধনদশায় পতিত হয় না।

আমরা কাজ করি সাধারণতঃ অভিমান-মিশ্রিত ভূমি থেকে, লক্ষ্য থাকে যশ, সুখ্যাতি লাভ। সেই জন্যই কাজ করে যখন কাজের ফল তেমন ভাবে পাই না, তখন মনে-প্রাণে অশান্তি আসে, আর তা থেকেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জনেই খাঁটি কর্ম্ম করার প্রেরণা জাগে—অর্থাৎ তখন আমরা নিজের সঙ্কীর্ণ মন-বুদ্ধির অনেক উপরে উঠে যাই—সেই সত্য-ভূমি হতে যে প্রেরণা জাগে কর্ম্মের—সেই কর্ম্মই সুষ্ঠু এবং কল্যাণপ্রসূ হয় তখন। নিজের ভাল-মন্দ বুঝি না আমরা অনেকেই, কিন্তু এই অজ্ঞতা স্বীকার করতে যেন অনেকেরই মিথ্যা ব্যক্তিত্বে একটু লাগে। এই মিথ্যা অভিমান বজায় রেখে ঠিক ঠিক কর্ম্মও হয় না, আবার কর্ম্মের শান্তিও পাওয়া যায় না।

কৃপা ছাড়া—সাহায্য ছাড়া—আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উন্নত হওয়া যায় না কিছুতেই। যাঁরা আত্ম-চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে প্রচার করেন, তাঁদের জীবনেও দেখা যায় অদৃশ্যে—অলক্ষ্যে কত শক্তির ক্রিয়া চল্‌ছে, তাঁদের কৃপা লাভ করেছেন বলেই তাঁরা সিদ্ধি লাভে ধন্য হয়েছেন মানুষের আত্ম-চেষ্টার চেয়ে তাঁর কৃপার পরিমাণ অনেক বেশী। "কৃপাবাদ" মানুষকে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে বল্‌ছে না, কিন্তু চেষ্টা-যত্নের উপরেও যে আর একটা কথা আছে অর্থাৎ যার মূল্য চেষ্টা-যত্ন-উদ্যমের অনেক উপরে—এই কথাটাই সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। মোট কথা এতটুকু অভিমান থাক্‌তে সিদ্ধি লাভের আশা দুরাশা। উপনিষদের মাঝেও দেখা যায় অনেক ঋষির এইরূপ আত্মম্ভরিতার ভাব এসেছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের এই ভাব টিকেনি। কেনোপনিষদের "বহু শোভমানা হৈমবতীর" আবির্ভাব হয়েছিল—দেবতাদের এই গর্ব্বান্ধ ভাব ঘুচাতেই। "তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি"—এই কথা বলে একে একে সকলের গর্ব্বকে তিনি মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করে দিলেন। দেবতারা বুঝতে পেলেন, তাঁদের শক্তির সীমানা কতটুকু?—তখন তাঁদের রীতিমত দৈন্য দেখা দিল—এর পরই দেখি আত্মজ্ঞানীর মত তাঁদের উক্তি। সুতরাং অভিমান থাক্‌তে সত্য লাভ হতেই পারে না। এই অভিমান বিসর্জ্জনের সহজ পথ হল—শ্রীগুরুর নির্দ্দেশে চলা। নিজেই নিজের পরিচালক হলে, অনেক ক্ষেত্রে নিজের অভিমান আত্ম গোপন করে থাকে—আর সাধারণতঃ নিজের গলদ নিজের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। এইজন্যই অনেক আত্ম-চেষ্টা সম্পন্ন সাধকের হঠাৎ পতন হতে দেখা যায়। আত্মার স্থলে বুদ্ধির ইঙ্গিতেই আমরা চলি, এইজন্যই আমাদের প্রতি পদে পদে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায়। বুদ্ধির একটু উপরেই জ্ঞানের আলো জ্বল্‌ছে, সেই আলোতে নিজের মনকে রঞ্জিত কর্‌তে না পার্‌লে—এই মন দিয়ে সুষ্ঠু কর্ম্ম করা অসম্ভব। মোট কথা নিজের মনে কারসাজি থাক্‌তে সত্যের সন্ধান মিলে না। নিজের মনটাকে মেরে ফেল্‌বার সহজ উপায়ই আত্ম-সমর্পণ। সমর্পণের পথ এইজন্যই এত কঠিন।—আমরা মন ছাড়া আত্মার সন্ধান কোন দিন পাই নি, এইজন্যই মনের বিলয়ে আত্ম বিলয় হবে বলে আতঙ্কে শিউরে উঠি। কিন্তু যাঁরা যে কোন উপায়েই হোক্‌—এই মনের উপরে উঠতে পেরেছেন, তাঁরাই জানেন এই মনের মূল্য কতখানি। এই মনের ভূমি ছাড়িয়ে উঠতে না পার্‌লে যে প্রতি পদে পদে সত্য হতে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা রয়েছে, এতে আর কোন ভুল নেই। সমর্পণের পথে সহজে মানুষের আত্ম বুদ্ধি লোপ পায়, দেহ-মন-প্রাণের কোন অহঙ্কারই থাকে না। এই দেহকে ভুল্‌তে গিয়ে

যোগী—তপস্বীর কতই না উৎকট পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। "বিবেক জ্ঞান" "নেতি নেতি বাদ"—কত বাদেরই না উদ্ভব হয়েছে—কিন্তু সব চেয়ে সহজ পথ যে আত্ম সমর্পণের পথ, একেই সবাই উপেক্ষা করে চলেছে। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই সহজ উপায়টী বলে দিতে গিয়েছিলেন বলেই—শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার সূচনা করতে হয়েছিল। অর্থাৎ মানুষ সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝতে চায় না; সব কথা ঘুরিয়ে বলা, আর ঘুরিয়ে বুঝাই যেন পাণ্ডিত্য। কিন্তু এই পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি নিয়ে কারও প্রাণে কোন দিন শান্তি আসে নি। অনেক মনীষী এইজন্যই শিশুর ন্যায় উলঙ্গ প্রাণকেই সত্য লাভের প্রথম এবং প্রকৃষ্ট উপায় বলে কীর্ত্তন করেছেন।

কর্ম্মের সঙ্গে মুক্তির কোন বিরোধ নেই—কেন না মুক্তির আস্বাদন হয় জ্ঞানে, কর্ম্ম ছাড়লেই যে মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই। আমরা কর্ম্মের সঙ্গে নিজকে মিশিয়ে ফেলি, জ্ঞানকে উজ্জ্বল রাখতে পারি না, এইজন্যই বলি কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু জ্ঞানাতীত ভূমি হতে যাঁরা কর্ম্ম করেন, তাঁদের কর্ম্মের সংস্কার জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে কিছুতেই নির্ব্বাপিত করতে পারে না। অবশ্য এই জ্ঞানকে উজ্জ্বল রাখতে প্রথম প্রথম খুবই সজাগ সচেতন থাকতে হয়, কিন্তু অভ্যাসের দৃঢ়তা বশতঃ যখন দৃঢ় ভূমি লাভ করা যায়, তখন দেখা যায় কর্ম্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হতে পারে না—তার কারণ জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের কোন সংস্রব নেই। সংস্রব আছে মনে করেই মানুষ যত গণ্ডগোলে পড়ে। নিয়ত অভ্যাসের ফলে বিপর্য্যয়-জ্ঞানও যে তত্ত্বজ্ঞানের বাধা জন্মাতে পারে না—এ কথা পঞ্চদশীতেও আছে। আর পঞ্চদশীর বিশেষত্ব এই জায়গাতেই—তিনি বলছেন সাধারণ ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের বাধা জন্মাতে কিছুতেই সক্ষম নয়। বীরের আদর্শই বটে! উপনিষদেও পাই—এই সিদ্ধ-ভূমির কথা, যেখানে কর্ম্মত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে নি।

কর্ম্মত্যাগও তিন রকমের——গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে তা বর্ণিত আছে। না বুঝে মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা হয়েছে। আর কায়-ক্লেশ ভয়ের দরুণ যে কর্ম্মত্যাগ তাকে বলা হয়েছে রাজস। কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হয়েছে। সুতরাং কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞানীর লক্ষণ নয়। হয় তো অপরের কর্ম্মত্যাগের আদর্শের দোহাই দিয়ে নিজের শারীরিক ক্লেশ হতে মুক্তিলাভ করাই অনেকের কর্ম্মত্যাগের তাৎপর্য্য হয়।

তাহলে শেষ পর্য্যন্ত এই কথাতে এসে আমরা পৌছলাম যে, কর্ম্ম করতে হবে—অথচ তাতে ফলাসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকবে না—এই হল কর্ম্মবাদের সুষ্ঠু মীমাংসা। আত্মসমর্পণের পথে চললে—এই সাত্ত্বিক ত্যাগ সহজ এবং অনায়াস হয়ে ওঠে। এই পথেই আশাতীত কাজও করতে পারে মানুষ, আবার মুক্তিরও আস্বাদন পেতে পারে। আত্ম-প্রাধান্যের ভাব সহজে স্তিমিত হয়ে আসে—এই আত্ম-সমর্পণের পথেই। মিথ্যা আমির সংস্কার আমাদের বদ্ধমূল, এর মূল শিথিল করবার পন্থা আত্ম-সমমর্পণের মাঝেই আছে। কোন কথাতেই যেখানে "আমির" ভাব নেই, সেখানে "আমি" বা অহং এর দৌরাত্ম্য হতে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। গুরুর আশ্রমে বাস করবার নিগূঢ় তাৎপর্য্যও হল এই। নিরভিমানী হয়ে কর্ম্ম করে গেলে—চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হলেই গুরুর আশ্রমবাসের চরম সার্থকতা স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার

লাভ হয়। আত্মার সন্ধান যাঁরাই পেয়েছেন—তাঁরা নিরভিমানী না হয়ে পারেন না।

স্বপ্ন—জাগ্রত-সুষুপ্তি—এই তিন ভূমিতেই যাঁর জ্ঞান সমভাবে উজ্জ্বল থাকে—তিনিই ভবিষ্যৎ বক্তা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জীবনের কেন—সমস্ত জীবেরই দ্রষ্টা জ্ঞানী পুরুষ, তাই তিনি অর্জ্জুনের মনের সাময়িক ক্লীবত্বকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি—তিনি জান্‌তেন অর্জ্জুনের মাঝে কর্ম্মত্যাগের সংস্কারের আবেগই বেশী। যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র——কিন্তু সাধকমাত্রই একদেশদর্শী, সুতরাং পূর্ণজ্ঞানী নরাকার পরব্রহ্মের নির্দ্দেশে চলাই তাঁদের পক্ষে সব চেয়ে কল্যাণকর।

মানুষ সব ছাড়তে পারে, কিন্তু নিজের অহংকে বিসর্জ্জন দিতে তার ভারী কষ্ট বোধ হয়। ঔদ্ধত্য ও ক্ষোভ জাগে এই কারণেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে অনেকেই আত্ম-সমর্পণের পথকে দুর্ব্বলমস্তিষ্ক-প্রসূত বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু "অহং"কে বিসর্জ্জন দিতে হলে যে আত্ম-সমর্পণের পথই সহজ এবং একমাত্র পথ, শেষ পর্য্যন্ত একথা কেউই অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না। কর্ম্ম করার আদর্শে আজকাল অনেকেই উদ্বুদ্ধ—কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর চেয়ে কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর প্রসংশা এবং আদর অনেক বেশী; কিন্তু কর্ম্ম করার মূলে অহং ভাব সম্পূর্ণ বজায় থাকায় কর্ম্মের মাঝে অসামঞ্জস্য এবং অপূর্ণতাই দেখা যাচ্ছে বেশী। যুবকদের কর্ম্মোন্মাদনা প্রশংসার্হ, কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্ব বোধ লোপ না হওয়া পর্য্যন্ত সুষ্ঠু কর্ম্ম তাদের কাছ থেকে আশা করা বৃথা। নিরভিমানী কর্ম্মীকে—হয় ভগবান, না হয় গুরু—একজন না একজনকে অবলম্বন কর্‌তেই হবে—যাঁকে ধরে তার অহং বোধ সম্পূর্ণ বিলয়প্রাপ্ত হবে। গুরুবাদে অনেকেই বীতস্পৃহ—এর প্রধান কারণ তাদের অহং জ্ঞানটা খুব প্রবল, তারা মনে করে আর একজনকে স্বীকার কর্‌লে নিজের প্রাধান্য রইল কোথা? অথচ মানুষ এ কথাটা বুঝে না, নিজের অহং বোধ বিসর্জ্জন না দিলে, নিজকে রিক্ত করে দিতে না পার্‌লে যে জগতে কোন মহৎ কার্য্য করাই সম্ভবপর নয়! কাজ কর্‌তে চায় সবাই—কিন্তু কাজের মূলে এই অহং বোধ সব পণ্ড করে দেয়। নিষ্কাম কর্ম্মের নিগূঢ় সঙ্কেতই হল আত্ম-সমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের ফলেই—গরু চরিয়েও ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। জীবমাত্রেরই কাজ নিয়েই থাক্‌তে হবে—কিন্তু নিরভিমানী হয়ে কাজ কর্‌তে না পার্‌লে কর্ম্মে কোন দিন সার্থকতা এনে দেবে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি

কে তুমি, কে তুমি তরুণ অরুণ
কনক কিরণ হাসিয়া,
(ওগো) বহু ভাগ্য ফলে দিলে দরশন
আঁখির মরমে পশিয়া।
শতেক চাঁদের পীযুষ চুম্বিত,
অনুপম রূপ কন্দর্প গঞ্জিত,
বিম্বোষ্ঠ দু'খানি যাবক রঞ্জিত
কে তুমি, কে তুমি দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত
উদিলে ত্রিতাপ নাশিয়া ?
(ওগো) তোমারে হেরিয়া অন্তর আমার
পুলকে যেতেছে ভাসিয়া।
নব নীরদের শীতলতা আনি
কুসুম সুষমা দানিয়া—
(ওগো) বিরলেতে বিধি গঠিল তোমায়
অমৃতে নবনী ছানিয়া।
আধ বিকসিত কোরক কমল
প্রেমে ঢল ঢল নয়ন যুগল,
উত্তাপিত রুক্ম সু-পীত বরণ
সিন্দুর মণ্ডিত যুগল চরণ,
ভুবন ভুলিছে হেরিয়া,
(ওগো) কে তুমি এসেছ পরাণ ভুলান
চিকণ মাধুরী ধরিয়া ?
ব্রজধামে যথা ব্রজেন্দ্র নন্দনে
হেরি সুখে ভাসি হরষে—
(ওগো) তত সুখ পাই অন্তর ভরিয়া
তব রূপ আজ দরশে।

তেমনি তোমার চাহনি বঙ্কিম,
সেইরূপ তুমি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,
তেমনি স্থ-পূত মহিমা উজলি
মৃদু মন্দ হাসি খেলিছে বিজলী
অমিয় কিরণ ঝলসে—
(ওগো) তব রূপ হতে নয়ন ফিরে না
অতুল সুখের অলসে।
ভস্ম আচ্ছাদিত পাবক সমান
কে তুমি রয়েছ লুকায়ে ?
(ওগো) মহিমা চুম্বিত কণক কিরণ
দিতেছে তোমারে দেখায়ে।
ভিতরেতে কাল উপরে গৌরাঙ্গ
করে নাই বাঁশী কেন হে ত্রিভঙ্গ ?
ত্যজিলে কেন বা ব্রজবাসী সঙ্গ
কার রূপ লয়ে হয়েছ হেমাঙ্গ
কাহার প্রেমেতে বিকায়ে ?
(ওগো) কে তোমারে দিল শ্যাম-রূপ ছাড়ি
গৌরাঙ্গ সাজিতে শিখায়ে ?
কে তুমি কে তুমি তরুণ যুবক
তরুণ রূপের ঝলসে—
(ওগো) তরুণ মহিমা করুণ কোমল
তরুণ ভাবের আবেশে ?
তরুণ অরুণ তোমাতে বিকাশ
তরুণ শশাঙ্ক অমিয় উচ্ছাস
তোমাতে তরুণ কুসুম সুষমা
তোমার নাহিক রূপের উপমা
কে তুমি আমায় বল সে,
(কেন) তরুণ রূপের অমিয় প্লাবনে
শত ঢেউ মম মানসে ?

—×—

ঈশোপনিষদের সার মর্ম্ম

অদ্বয় তত্ত্বের তিনটী বিভাব—ব্রহ্ম, আত্মা ও শক্তি। ঈশ, কঠ ও কেন এই তিনখানি উপনিষদে এই তিন দিক থেকে সচ্চিদানন্দকে বোঝানো হয়েছে। তার মাঝে ঈশোপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ—Synthetically দেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্ব অধিগত কর্‌বার সঙ্কেত শান্তিপাঠেই পাবে। ব্রহ্মের সাধনা পূর্ণত্বের সাধনা। প্রপঞ্চে ও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বে বিরোধ আমাদের বুদ্ধির কাছে স্বতঃই প্রতিভাত হয়। তার একমাত্র সমাধান হয় ব্রহ্মের পূর্ণত্বের অনুভব দ্বারা, অদঃ—'The beyond' বা প্রপঞ্চাতীত যেমন পূর্ণ, 'ইদং'—The phenomenal worldও **তেমনি পূর্ণ**—যোগ ও বিয়োগে সবই পূর্ণ, কেন না সবই অনন্ত, অখণ্ড, রস স্বরূপ, বুঝবার সঙ্কেত—ঈশতত্ত্ব দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদিত করা। সাধনার এই হল positive দিক বা **অভ্যাসের** এই তত্ত্ব। এই অভ্যাসের সঙ্গে থাকা চাই **বৈরাগ্য**—তাই হল সাধনার negative দিক। ভোগ মিথ্যা নয়, কিন্তু তার সত্যতা ত্যাগেই প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বলা হয়েছে। এই সব কথা বুদ্ধির analytical process এরও পরের কথা। এ হচ্ছে বোধির synthesis. সমগ্র উপনিষদ খানিতে এই সুরই রয়েছে। (১) প্রথম শ্লোকটাই সমস্ত উপনিষদের Key (চাবি)। একটু নিবিষ্ট মনে ঈশোপনিষদ খানা পড়লেই তা বুঝতে পার্‌বে। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখবে, উপনিষদের মাঝে কোথায়ও অসামঞ্জস্যের কথা নেই। উপনিষদের ব্রহ্মের পূর্ণতা সকলকে নিয়ে, কাউকে উপেক্ষা করে নয়। এইজন্যই যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগতেও রয়েছেন। তাঁর ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র—সুতরাং তাঁর প্রসাদ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। ত্যাগে—ভোগে সর্ব্বত্র তিনি জড়িত আছেন। ভোগের মাঝেও তিনি আছেন, এ কথা মনে হলেই ভোগ ত্যাগে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্যই উপনিষদ ভোগের নামে আতঙ্কিত নন, কিন্তু ভোগের মাঝে ব্রহ্মকে ভুল্‌লে চল্‌বে না—এই একটু সতর্কের বাণী বল্‌লে দিচ্ছেন সবাইকে।

(২) দ্বিতীয় শ্লোকে কর্ম্মের উপদেশ আছে। শঙ্করাচার্য্য সমুচ্চয়বাদের ওপর analytical spirit থেকে তাঁর দর্শনের ভিত্তি রচনা করেছেন। তাই তাঁর কাছে এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধের কথাই সূচিত হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের spirit হচ্ছে সমুচ্চয় বা ecclesiasticism নয়, সমন্বয় বা harmony. জ্ঞানের কুক্ষিগত কর্ম্ম, ব্রহ্মের লীলা এই জগৎ, পূর্ণতার intuition দ্বারা আচ্ছাদিত জাগতিক অপূর্ণতার দ্বন্দ্ব (ঈশাবাস্যং)—এই সমস্তই সমন্বয়বাদীর কাছে psychological reality. তাই উপনিষদ জোর করে বল্‌ছেন, ব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারা যদি জগৎকে আচ্ছাদিত কর্‌তে পেরে থাক, ভোগকে যদি ত্যাগ দ্বারা অনুবিদ্ধ করে থাক, গৃধ্রস্বভাব যদি দূর হয়ে থাকে, তাহলে কর্ম্ম করেই বেঁচে থাক্‌বে—ছেড়ে নয়। "এবং ত্বয়ি" অর্থাৎ তুমি যদি এমনি পূর্ণতাবাদী জ্ঞানী হয়ে থাক, তাহলে "নান্যথেতোঽস্তি", এর আর রকম ফের নেই, "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"—মানুষের সঙ্গে—জ্ঞানীর সঙ্গে কর্ম্ম জড়িয়ে যায় না। প্রমাণ গীতা—ভগবানের বচন—তৃতীয় অধ্যায়। গীতার আদর্শে আর উপনিষদের আদর্শে অনেক জায়গায় সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে। কর্ম্মটাকে উপনিষদের ঋষি যেমন

সহজ দৃষ্টিতে দেখছেন শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মকে সে চক্ষে দেখেন নি. এইজন্যই ভাষ্য পড়ে উপনিষদের সার-রহস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কর্ম্মত্যাগের কথা গীতাতে যেমন নাই, তেমনি উপনিষদেও কর্ম্ম-বিভীষিকা বলে কোন কথা নাই। বরঞ্চ কর্ম্মকে তাঁরা সহজ দৃষ্টিতেই দেখে গিয়েছেন।

(৩) ভোগী হয়ো না, আঁধারের পথে যেও না—আসুরিক ভাবকে বর্জ্জন কর—আত্মঘাতী হয়ো না। কর্ম্মের পথে পিছনে পড়া সম্ভব, তাই আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম্ম কর, এই হল তৃতীয় শ্লোক।

(৪—৮) —এই কয়টী শ্লোকে সমন্বয়বাদী পূর্ণ-জ্ঞানীর আত্মানুভবের বিবরণ। এর সঙ্গে কবীরের "সহজ-সমাধির" আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। মূলে সেই একই সুর—নেতিবাদের পূর্ণতা ইতিবাদে—জগৎকে বর্জ্জন করে সত্য নয়—সত্য দ্বারা, ব্রহ্ম দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত করেই অনুভবের পূর্ণতা।

(৯—১৪) —এই কয়টী শ্লোকে analytical বুদ্ধির দ্বন্দ্ব নিরসন। বুদ্ধি চলে analysis এর পথে—তাই তার কাছে সর্ব্বদাই দুটী বিরোধ উপস্থিত হয়—একটী বিদ্যা (positivism) আর একটী অবিদ্যা (negative charactar of supreme knowledge, অবিদ্যা অর্থে কিন্তু এখানে শঙ্করের "অজ্ঞান" নয়) ; একটী সম্ভূতি (manifestation of creative energy or crolution) আর একটী অসম্ভূতি (annihilation of creation or Invo lution) এর যে কোনও একটীকেই একান্তভাবে দেখা পূর্ণতার সাধনা নয়। চাই সমন্বয়। মৃত্যু বা relativity of knowledge কে অতিক্রম করতে হবে অবিদ্যা (negativity or the sense of the void, বৌদ্ধ শূন্যবাদ) দ্বারা ; তারপর সেই শূন্যের বুকে ফুটিয়ে তুলতে হবে বিদ্যা ও সম্ভূতি—Divine knowledge & creative energy—তাই অমৃত—the perfect life.

(১৫—১৮) —এই চারটী শ্লোক উপনিষদের cooteric side বা রহস্যবাদ। আমি সত্যের উপাসক। কিন্তু destructive dialectic দ্বারা তাঁকে জানতে চাই না, তাই আমার দেবতা "পূষা"—এই বিশ্বের যিনি ঈশা বা over-soul, the sustaining spirit. হিরণ্ময় পাত্র তাঁর ঐশ্বর্য্য, মায়ার শেষ পোছ—অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রাগ্‌ভূত শেষ বিকল্প। এর সামনে এসে সাধক বলছেন, এই ঐশ্বর্য্য অপসৃত কর, let me take the great leap beyond—let me lose myself. পরবর্ত্তী শ্লোকই অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার বাণী—"সোঽহমস্মি"! এইখানেই উপনিষদ শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নি। সমস্তটা উপনিষদের spiritটী যদি বুঝে থাক, তাহলে নিশ্চয় বুঝতেই পারছ কেন হয় নি। There must be a return to the man in every great life, নইলে জীবনের পূর্ণতা কোথায়? ১৭।১৮ শ্লোকে জীবন্মুক্তের উক্তি। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন, দেবতাভিমানীর দেবযান পথে গতি বলে, কিন্তু তা নয়। They refer to the subsequent mission of a transformed divine life. এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্বপ্রাণ হল, এই ভস্মান্ত শরীর দিব্য, অমৃতময় হল—ওম্। হে ক্রতো—(Thou supreme strength! Thou will to power!) কৃতং স্মর। —Remember the mission of your life! (১৭) What is that mission? To follow the devine fire, to lead the mankind to glory (রায়ে) through knowledge, to fight the evils that beset man to be God's soldier!

গৌরব

কিছু দেখাইয়া লোকের কাছে আমি যশস্বী হইব, বড় হইব, এমন ধারণা লইয়া যাহারা কোন কিছুর জন্য প্রচেষ্টা করে, তাহারা বাহিরে যদিও সেই যশ পায়, কিন্তু অন্তর তাহাতে উন্নত হয় না। অন্তর উন্নত করা যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা বাহিরের অপেক্ষা না রাখিয়া নদীর মত আপন বেগে চলিয়া যান, কে কোথায় তাঁহাদের কার্য্যের কিরূপ সমালোচনা করিল, তাহার দিকে নজর দেন না। অবশ্য এই জগতে থাকিতে হইলে যখন পরস্পর সাহায্যের প্রয়োজন, তখন অপরের মন্তব্যের দিকে সামান্য দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্ম প্রণালীর একমাত্র নিয়ামক কখনও পরের মন বা পরের মন্তব্য হইতে পারে না। পরের মন্তব্যই যাহাদের একমাত্র নিয়ামক, তাহারা জীবনে কখনও কোনও কাজে স্বাবলম্বী হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম আমার, সমালোচনা অপরের, সুতরাং এই দুইটী জিনিষের সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য একান্ত দুর্লভ। তাহা ছাড়া জগতে 'ভিন্ন রুচয়ো হি লোকাঃ।' 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'—সুতরাং মননশীল ব্যক্তিদিগেরই যখন একমত পাওয়া যায় না, তখন সাধারণ মানুষের যে একটা কর্ম্ম বিষয়ে সকলের একমত হইবে, এমন আশাই করা যায় না। কিন্তু তবু মানুষ চায়—লোকে কি বলিবে!

কর্ম্ম মাত্রই দোষাবহ—শঙ্করাচার্য্যের এই অভিমত বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়—এই সব কর্ম্ম সমালোচনা দ্বারা। সকলেই চেষ্টা করে যাহাতে কর্ম্মটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, কিন্তু এ জগতে স্বয়ং ভগবানও অবতার হইয়া আসিয়া এমন কর্ম্ম করিতে পারেন নাই যে, যাহার কোনও না কোনও অংশ কাহারও না কাহারও কাছে মন্দ বলিয়া প্রতীত হয় নাই। যে কোনও অবতারের সমস্ত কার্য্য জগৎ শুদ্ধ সমস্ত লোকের মনের মত হইলে সেই অবতারের প্রচারিত ধর্ম্মই জগতে সকলে মানিয়া লইত এবং জগতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম পন্থায় হাঙ্গামা কমিয়া গিয়া সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী হইত। তাহা কিন্তু হয় নাই। কাজেই অবতারেরা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মেই সকলের প্রশংসা পান নাই।

মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ওই একই কথা—সাধারণ সংসারী লোক বা কর্ম্ম পথের পথিক আমাদের সম্বন্ধেও ওই একই কথা। কাজেই কর্ম্মের নিয়ামক বাহির হইতে অপরে নয়—অন্তর হইতে নিজের অন্তর দেবতা। যদি জগতে একটীও আমার মরমী—অন্তরের দরদী না পাই, তবু অন্তর দেবতার প্রেরণায় প্রেরিত আমার কর্ম্মকে আমি ছাড়িব না—তাহাতে প্রশংসা নাই বটে, কিন্তু তার চেয়ে বহু মূল্যবান্ আত্মপ্রসাদজনিত আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—"যদি তোর ডাক শুনে আজ কেউ না আসে—তবে একলা চল্—একলা চল্—একলা চল্‌রে—ইত্যাদি।" তাহা ছাড়া অপরের প্রশংসা বা নিন্দায় আমার অন্তরের ধর্ম্ম ভুলিয়া সাময়িকভাবে প্রণোদিত যে কাজে হাত দিব, তাহাই যে সুসম্পন্ন হইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? বরং আপন অন্তরের ধর্ম্ম ভুলিয়া, সাময়িকভাবে ভুলিয়া, উচ্ছ্বাসে পড়িয়া ভয়াবহ পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাতে

নরকের সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু স্বধর্ম্মে নিধনপ্রাপ্ত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। তাই ভগবানের উপদেশ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

কেন শ্রেয়ঃ? না, বিগুণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ হইলেও স্বধর্ম্ম আমাকে পরবর্ত্তী পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাতে আমি স্বাভাবিকভাবে চলিতে পারি ; কিন্তু পরের ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নভাবে করিলেও পরবর্ত্তী পথ আমাকে দেখাইয়া দিবে না,বা দেখাইয়া দিলেও আমি তাহাতে স্বাভাবিক ভাবে চলিতে সমর্থ হইব না ; সুতরাং নরকে গিয়া পড়িতে হইবে। পরের মুখের দিকে চাহিয়া যে পথ চলে, সে হোঁচট্ লাগিয়া আছাড় খাইবেই—আপন পায়ের দিকে চাহিয়া চলিলে অন্ততঃ সেই ভয়টুকু নাই।

অপরের নিন্দা-প্রশংসার দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করাই পরের মুখের দিকে চাহিয়া চলা। এইরূপ ভাবে চলিতে গিয়া আপন হৃদয়ের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কত সময়ে যে জীবন মরুময় হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনে সেই করুণ একান্ত অসহায় অবস্থায় যাহারা মরুভূমির মরীচিকার মত আশার কুহকে ক্ষণিকের জন্য পথ ভুলাইয়া জীবনকে আরও শ্রান্ত ও তিক্ত করিয়া তোলে, তাহাদিগকেই প্রথমে একান্ত বান্ধব বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সে ভ্রম অচিরেই ধরা পড়ে, কিন্তু তখন তাহা সংশোধনের বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু স্বধর্ম্মে, আপন হৃদয়ের ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া চলিলে পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে হৃদয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। তাই বাঙ্গালী মায়ের প্রাণের অনুভূতিতে বাঙ্গালী স্ত্রীকবি গাহিয়াছেন—

করিতে পারি না কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সঙ্কল্প সদা টলে—পাছে লোকে কিছু বলে।
—৬৩খ

একটী স্নেহের কথা প্রশমিতে লাগে ব্যথা
চলে যাই উপেক্ষার ছলে—পাছে লোকে কিছু বলে!"

ইহাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বীরের মত যদি সকলের মতামত তুচ্ছ করিয়া আপন বিবেকের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক আপন পথে চলিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারি, তখন দেখা যায়, যাহারা প্রথমে নিন্দায় মুখর হইয়াছিল, তাহারাই এখন সর্ব্বাগ্রে প্রশংসার সাগরে ডুবাইতে আসেন। কাজেই এই প্রকার যখন বাহিরের লোকের প্রকৃতি, তখন তাহাদের নিন্দা-প্রশংসার মূল্য কি? তাহা ছাড়া স্বমতে চলিয়া হার হইলেও বুকে জোর থাকে যে, নিজের মতে চলিয়া ভাঙ্গিয়াছি, আবার গড়িতেও পারিব নিজেরই বুকের জোরে। কিন্তু পরের উপর সে জোর চলে কি?

দুর্ব্বল আত্মনির্ভর করিতে ভয় পায়, পরের অধীনতা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও সে স্বাধীনতার কথা ভাবিতে পারে না। স্বাধীনতার তেজ এমন ভাবেই অন্তর হইতে মুছিয়া যায় যে, জীবন-ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সে আপন বিচারে, আপন জোরে পথ অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না। পরের মতে চলিয়া মরিলেও বোধ হয় তাহারা মরিবার পরে পরকে দোষী রাখিবার দাবী রাখে! অন্ততঃ পরের মতে চলিয়া মরিলে কেহ তাহাদিগকে দোষ দিবে না—যেন এইরূপ স্বস্তিবোধেই আপন মতে চলিতে ভয় পায়। অনেকে এমনই হতভাগ্য হইয়া পড়ে যে, স্বমত গঠনের শক্তিও হারাইয়া ফেলে। বিবেক-বিচারে আপন কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার বাধ্য হইয়াই তাহারা অপরকে দেয়। কিন্তু চিন্তাশীলতার একেবারে অভাবও তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। কারণ অপরকে দোষী করিয়া তাহার দোষ সাব্যস্ত করিবার সময়ে তাহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। সুতরাং বালক বলিয়া তাহাদিগকে

উপেক্ষা করিবারও অথবা দয়া করিবার পথও তাহারা রাখে না।

কিন্তু যে যতই পরনির্ভরশীল ও পরনিন্দক হউক না কেন, চলার পথে শেষ পর্য্যন্ত জোর করিতে হয় নিজের পায়ের উপরই। চক্ষুষ্মান্ ও সুস্থকায়কে কেহ চিরদিন ঘাড়ে করিয়া বেড়ায় না। জীবন-যুদ্ধে জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত শান্ত হইতে হইলে তাহার জন্য সাধনা করিতে হয় নিজেকেই। সে সাধনার নিন্দা-প্রশংসায় পেট ভরে না, যদি তাহাতে সিদ্ধি না ঘটে। নিজে যদি উপবাসী থাকা যায়, তবে বাইরে কেহ সারাদিন ধরিয়াও যদি 'মিঠাই-মণ্ডা দ্বারা ভূরিভোজন করিয়াছি' বলিয়া আমার উত্তম খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্য-প্রশংসায় মুখর হয়, তবুও আমার পেট খালি বলিয়া যন্ত্রণা পাইতে হয় আমাকেই। আর পেট ভরা থাকিলে আমার অন্ন জুটে না, সুতরাং উপবাসী আছি বলিয়া কেহ যদি নগরময় রাষ্ট্রও করে, তবু তাতেই পেট খালি হয় না। যেমন বাহিরের ব্যাপারে এই অবস্থা, অন্তরে আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও ঠিক এই অবস্থা। আপন সাধনে যে পরিতুষ্ট অর্থাৎ যে ক্রমোন্নতি বুঝিতেছে, সে অপরের কথায় টলিবার পাত্র নয়।

কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের পথ এমনই বন্ধুর যে, পদে পদে মানুষের টলিয়া পড়ার সম্ভাবনা। বাহিরের সামান্য নিন্দাস্তুতিতে অন্তর সন্দিহান হইয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া যাহারা কর্ম্মযোগী, যাহাদের প্রত্যেকটী কর্ম্ম লোকচক্ষুর পুরোভাগে নিন্দা-প্রশংসার তুলাদণ্ডে তুলিত হয়, তাহাদের অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে সঙ্কটজনক। এইজন্যই তাহাদের চেয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালস্থ গিরি-গহ্বরস্থ সাধকের পন্থা অপেক্ষাকৃত সুগম। এইজন্যই জনক বা বিজয়-কৃষ্ণের, রামকৃষ্ণের সংখ্যা অল্প হইলেও পর্ব্বত-কন্দরবাসী সাধকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। তবু বলি, গৃহস্থমাত্রেরই রাজা জনকই আদর্শ।

নিন্দা-স্তুতিতে সমজ্ঞান ব্যক্তিদিগের বহুল প্রশংসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ" —"তুল্য নিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।" ইত্যাদি বলিয়া কর্ম্মযোগপন্থার এবং কর্ম্মযোগীর বহু প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মপন্থার প্রধান অন্তরায়ই এই নিন্দা ও প্রশংসা। এই প্রশংসা হইতেই অপরের প্রতি মাৎসর্য্যের উৎপত্তি। আপন নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রশংসা শুনিলে এমন লোক খুবই কম আছে, যাহাদের চিত্ত সেই প্রশংসনীয়ের প্রতি গদ্‌গদ্ ভাব ধারণ করে। এইজন্যই ষড়রিপুর মধ্যে মাৎসর্য্য একটী রিপু এবং ইহার স্থান ষষ্ঠ বা সর্ব্বশেষে। কারণ, আর সমস্ত রিপু পরাস্ত হইলেও তখন পর্য্যন্ত মাৎসর্য্য বর্ত্তমান থাকে। কাম-ক্রোধাদি সকলকে জয় করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াও সেখানে অপরের অধিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে মুগ্ধচিত্ত মাৎসর্য্যান্বিত হয় এবং তাহার ফলে পুনরায় ভূতলস্থ হয়।

এই প্রশংসার কথা বলিতে গিয়াই বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"Fame is the last weakness of the great—খ্যাতিই মহান্‌দিগের শেষ দুর্ব্বলতা।" নিন্দা হজম করা তত কঠিন নয়, কারণ তাহা বাধ্য হইয়া যে কোনও রূপে সহিতেই হয় এবং তাহার পর মানুষ উন্নত হইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু প্রশংসা হজম করা অতীব কঠিন। অতি তুচ্ছ নিতান্ত নগণ্যের মুখেও আত্ম-প্রশংসা শুনিলে চিত্ত সেই নগণ্য প্রশংসাকারীর পিছন ছাড়িতে চাহে না। এই ছোট-খাটো প্রশংসা লাভের চেষ্টাই ক্রমশঃ দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভের আকার ধারণ করে। ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে লোক-সমাজে বড় হইবার ইচ্ছা উদ্রেক হইলেও সঙ্গে সঙ্গে

আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অলক্ষ্যে বিলোপ করে। তাই ঋষির সাধকের প্রতি গম্ভীর সতর্কবাণী—

নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ। অহমিকার চেয়ে শত্রু নাই। গৌরবং রৌরবং ধ্রুবম্। গৌরবের কাছে সাধু সাবধান!

ধ্যানী ও জ্ঞানী

ধ্যানী এবং জ্ঞানীর মাঝে যে পার্থক্য রহিয়াছে, পঞ্চদশীকার তাহার সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ধ্যানীর লৌকিক বিস্মরণ হয়, যখন তিনি ধ্যানে বসেন; কিন্তু জ্ঞানীর কোন সময়ই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে লৌকিক-বিস্মরণ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানীকে চিনা এই জন্যই বড়ই কঠিন। সচরাচর আমরা ধ্যানীকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করি, কিন্তু জ্ঞানী ধ্যানকে পরিপাক করিয়া ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা সহজাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। লৌকিক ব্যবহার দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানী নিরূপণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

> নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানং যদাপেক্ষা তদৈব তৎ।
> বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাতুং শক্নোত্যেব হি তত্ত্ববিৎ॥
> উপাসক ইব ধ্যায়ন্ লৌকিকং বিস্মরেদ্ যদি।
> বিস্মরত্যেব সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতির্ন তু বেদনাৎ॥

—আত্মা সম্বন্ধে একবার নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া গেলে, যখন ইচ্ছা হয় তখনই আত্ম বিষয়ে মনন করিতে বা ধ্যান করিতে তত্ত্বজ্ঞানীরা সমর্থ হন। উপাসকের ন্যায় ধ্যান করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞানী যদি লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন, তবে তাহাকে কেবল ধ্যানের কার্য্যই বলা যায়, নতুবা জ্ঞান দ্বারা কখন লৌকিক ব্যবহারের বিস্মৃতি হয় না।

গীতাতে এই জ্ঞানকে সম্বল করিয়াই কর্ম্ম করিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম কোন দিন তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী নয়—এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানীকে প্রবর্ত্তক সাধকের ন্যায় সচরাচর বিমুখী বা কার্য্য-নিরত হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। জনকাদি মহাপুরুষগণ যে লৌকিক জগতের কর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, ধ্যানীর ন্যায় ধ্যান-তন্ময়তায় তাঁহাদের লৌকিক বিস্মৃতি ঘটে নাই। উপনিষদে, পঞ্চদশীতে, গীতাতে সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানীর মত ব্যবহার করিয়া যাওয়াকেই প্রশংসা করা হইয়াছে। আর বলিতে গেলে—ইহাই মানব জীবনের পূর্ণ আদর্শ। পরমহংসদেব অতি সহজ ভাষায় এই কথাটীরই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসী তাই কর।" অর্থাৎ জ্ঞান পরিপক্কাবস্থা লাভ করিলে তখন লৌকিক জগতের খুটিনাটী কর্ম্মের ভিতরও আত্ম-বিস্মৃতির কোন আশঙ্কাই বর্ত্তমান থাকে না। যোগস্থ হইয়াও যে কর্ম্ম করা যায়, ইহা পঞ্চদশীর তত্ত্বজ্ঞানীর কথাই বলা হইয়াছে। কেন না তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞান অবাধিত হইয়া পড়ে।

আত্মজ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশই গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য। জ্ঞানীর কোন দিন জগৎ ভুল হয় না—জগৎকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বাবস্থায় প্রদীপ্ত থাকে। এইজন্যই পঞ্চদশীকার আর এক জায়গায় বেশ সুন্দর একটী শ্লোক বলিয়াছেন—

> বিরলত্বং ব্যবহৃতে রিষ্টশ্চেদ্ ধ্যানমস্তু তে।
> অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ॥

পঞ্চদশীর বিশেষত্ব এই শ্লোকটীতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—"যদি তুমি 'আমি মনুষ্য' ইত্যাদি রূপ বিপর্য্যয় জ্ঞানের ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া জ্ঞান এবং উক্ত ব্যবহারের নিবারণার্থ ধ্যান সাধনা করা তোমার অভীষ্ট হয়, তাহা হইলে তুমি উক্ত ব্যবহার নিবারণের নিমিত্ত ধ্যান সাধনা কর; কিন্তু আমি উক্ত ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া জানি। আমার মতে উক্ত বিপর্য্যয় জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না, অতএব আমি কেন আর ধ্যান সাধন করিব?"

জ্ঞানীর পক্ষে লৌকিক-জগতের বিস্মরণের কোন প্রয়োজনই হয় না। কেন না লৌকিক জগতের জ্ঞান তো তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ নহে। এইজন্যই ধ্যানীর ন্যায় তাঁহার জগৎ-ভুল হয় না কখনও।

"ব্রহ্ম সত্য-জগৎ মিথ্যা"—ইহা সাধক-ধ্যানীর কথা। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা লাভ হইলে তখন এই জগৎই যে ব্রহ্মের লীলা, তাহার আস্বাদন হয়। এই জগৎ তখন আর মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কিম্বা এই জাগতিক জ্ঞান বিলুপ্ত করিবার দরুণ ধ্যানের আশ্রয় লইতে হয় না।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন না হওয়াতেই সাধকাবস্থায় জগৎজ্ঞানে ভ্রান্তি আনয়ন করিয়া থাকে। এইজন্যই লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ ভাব রক্ষা করিতে গিয়া, ধ্যানীর লৌকিক ব্যবহারের স্বাভাবিক বিস্মৃতি ঘটে। সাধকমাত্রেরই এই ধ্যান-তন্ময়তার সময় জগৎ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধ্যানে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া গেলে তখন আর জাগতিক জ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানের বাধা জন্মাইতে পারে না। কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনেক সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন হয়।

ধ্যানীর ধ্যান-ধারণা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে বাধ্য-বাধকতা বলিয়া কিছু নাই; কেন না ধ্যান না করিলেও বিনা আয়াসে তাঁহার চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে।

> ধ্যানং স্বৈচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তি সিদ্ধিতঃ।
> জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ॥
> তত্ত্ববিদ্ যদি নাধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ।
> প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্ত্তনে॥

তত্ত্বজ্ঞানীর ধ্যান ঐচ্ছিক মাত্র, নতুবা জ্ঞান দ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হয়। জ্ঞান দ্বারা যে কৈবল্য লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যান লাভ করেন, বাহ্য ব্যবহারেও প্রবৃত্ত হন, তাহাতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই; কেন না সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানীর কোন অনিষ্ট উৎপাদন হয় না। ধ্যানের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, সেই জ্ঞান লাভ যাঁহার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে ধ্যানের কোন অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি ধ্যানে বসিতেও পারেন, না বসিলেও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান বিলোপের কোন আশঙ্কা নাই।

বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞানীকে চিনা এইজন্যই বড়ই কঠিন ব্যাপার। তত্ত্বজ্ঞানী যখন সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করেন, অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে

তাঁহার সেই ব্যবহার ধরিয়া তাঁহাকে চিনিতে যাওয়া ভ্রান্তি মাত্র। সাধারণের আর তত্ত্বজ্ঞানীর মাঝে পার্থক্য হইল "জ্ঞান" লইয়া। সাধারণ মানবের কর্ম্মটাই বড়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মের মূলে থাকে জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ।

পূর্ণ জ্ঞানীর আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ—তিনি কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ কাহাকেও দেন নাই। কেন না নিজের জীবনই যে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া জগতের প্রত্যেকটী কর্ম্ম সুনিপুণভাবে করা সম্ভবপর, ইহার আদর্শ তিনি নিজ জীবন দিয়াই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।"—এই বাণীটিরও তাৎপর্য্য হইল সিদ্ধের ভূমি হইতে কর্ম্ম করার সঙ্কেত। কেন না—"ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" কর্ম্ম কখনো তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না।

অভ্যাস দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান পরিপক্কাবস্থা লাভ করে। সাধকাবস্থায় জগৎ বিস্মৃতি হইতে পারে; কিন্তু চিরকাল এই বিস্মৃতি লইয়া থাকাই জীবনের আদর্শ নয়। মানুষ কর্ম্ম করিয়াও জ্ঞানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে—ইহা শুধু মৌখিক কথা নয়। কার্য্যদ্বারা মহামানবগণ তাহার সুপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ধ্যানীর অবস্থাই শেষ নয়—আমাদিগকে পূর্ণ জ্ঞানীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। গীতা, উপনিষদ্, পঞ্চদশী—পূর্ণ জ্ঞানীর আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা
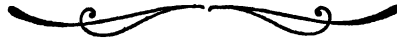
ধর্ম্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে
ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।
ইতি—শ্রুতি

এই ভারতবর্ষেই মানুষ সর্ব্ব প্রথম আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারত একদিন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। যখন ভূভাগের অন্যান্য অংশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তখন জ্ঞান-সূর্য্য ভারত গগনে সমুদিত হইয়া তাহার বিমল প্রভায় চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোন দিক্ বল না কেন, যাহার কোন একটি লইয়া জগতের যে কোনও দেশ গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে, তাহার সকল দিক্ এই ভারতে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। কালের গতি পরিবর্ত্তনশীল। ভারতের আর সেদিন নাই, কিন্তু আদর্শ হিসাবে এই ভারতে কোন বস্তুরই অভাব নাই। এইজন্য ভারত মহান্ ও জগতের আদর্শস্থানীয়।

এই ভারতের জলবায়ু, ফুল-ফল, নদী-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু, মানুষ-দেবতা যাহাই বল না কেন, সকলেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে; তাই মনে হয় ভগবান যেন একান্তে বসিয়া মনের মত করিয়া ভারতকে সৃজন করিয়াছেন। এই ভারতে জন্মগ্রহণ

করাও সৌভাগ্যের কথা। এখানে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ, তদুপরি ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বর্ণে জন্মলাভ করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয়ে ঋষিশাস্ত্রের অনুশীলন করতঃ মোক্ষমার্গী হওয়া পরম পুরুষার্থ।

এই ভারতে সত্যদ্রষ্টা মহা মহা ঋষি মুনি, মহাপুরুষ, সাধু জ্ঞানী ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার প্রত্যেক ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাকে পরম তীর্থে পরিণত করিয়াছেন। এখানেই স্বয়ং ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন।—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
—ইতি গীতা

এখানেই অনাদি কাল হইতে অপৌরুষেয় বেদের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্ত শাস্ত্র মানুষকে অজ্ঞান তিমির হইতে জ্ঞানের পবিত্র আলোক প্রভার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ভারতের ঋষি একদিন তমঃ প্রকৃতির পরপারে উপনীত হইয়া অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জগতের জীবকে আশ্বাস দিয়া এই মঙ্গলময় বাণী বিঘোষিত করিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।

এই অনাদি অপৌরুষেয় বেদমূলক যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহাও অত্যন্ত পরিণতি ও পরিপুষ্টির ফলস্বরূপ। এই বহুশাখা ও বিশাল কাণ্ডবিশিষ্ট প্রাচীন সুস্থূল সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকল প্রকার অধিকারী স্থান পাইতে পারে। পৃথিবীর যে কোন ধর্ম্ম এই ধর্ম্মের তুলনায় আধুনিক এবং তৎতৎধর্ম্মে এমন কিছুই নূতনত্ব নাই, যাহা ইহার বিশাল গর্ভে স্থান লাভ করে নাই। এই ধর্ম্মেই জীবনের সকল দিক দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবার বিধি-ব্যবস্থা ও উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহা সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের অনুমোদিত।

এই ধর্ম্মের আশ্রয়ে যত ঋষি, সত্যদ্রষ্টা, জ্ঞানী-ভক্ত-সাধু মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, এমন আর কোন ধর্ম্মের দেখা যায় না। ইহার আশ্রয়েই আদর্শ জ্ঞানী, আদর্শ ভক্ত, আদর্শ সাধু, আদর্শ সতী, আদর্শ বীর, আদর্শ গৃহী, আদর্শ কবি, আদর্শ রাজা, আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ সন্তান ইত্যাদির আবির্ভাব হইয়াছে, পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম বা জাতি নাই যাহারা এই সকল বিষয়ে ভারতবাসীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, সুতরাং সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া কোন কারণেই যে আদর্শের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে এরূপ নহে।

কালের গতি পরিবর্ত্তনশীল। ভারতের সেদিন আর নাই। এখন ভারতবাসী আত্মহারা হইয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের পিতৃ-পিতামহ প্রদত্ত ধনের দিকে আর লক্ষ্য নাই, স্বল্প মূল্যের অধিকতর চাকচিক্যশালী কাঁচাদির ন্যায় পরের ধনের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। তাই তাহারা নিঃস্বের ন্যায় অন্যের দ্বারস্থ। ভিক্ষালব্ধ ধনে কখনও অভাব মোচন হয় না, চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। পিতৃ-পিতামহ প্রদত্ত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে শিখে নাই, তাই আর্য্যসন্তান কালবশে আজ গভীর তিমিরে মগ্ন থাকিয়া উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে, পথ না দেখিয়া গভীর শোকমগ্ন হইতেছে। কোথায় যাইব, কি করিব, কাহার শরণাগত হইব ? এই প্রকারে পরিবেদনা প্রকাশ করিতেছে। আমাদের অবস্থা দেখিয়া অন্যে উপহাস করিবে, সমবেদনা জানাইবে না। কারণ

আমরা ত প্রকৃত প্রস্তাবে অভাবগ্রস্ত নহি যে কাহারও আমাদের প্রতি দয়া হইবে! কাজেই আজ আমরা জগতের কাছে লাঞ্ছিত অবমানিত হইয়া বিষম দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছি।

ইত্যাকার অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় সম্যক উপলব্ধি হইলেই তখনই কর্ত্তব্যপথ স্থিরতর হইতে পারে।

দেশভেদে ও অবস্থা ভেদে জাতির বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে। সনাতনপন্থী হিন্দুদিগেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য লইয়াই হিন্দুগণ নানারূপ সংঘর্ষ ও অভাব-অভিযোগের মধ্যেও জীবিত আছে। এই বৈশিষ্ট্যই হিন্দুর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া কখনই হিন্দুগণ জগতে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং হিন্দুত্ব রক্ষা করাই সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ধরাধারকঃ——ধর্ম্মই জাতিকে রক্ষা করে, পালন করে, পোষণ করে। ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ পশুশ্রেণীতে নামিয়া পড়ে, —বর্ব্বরত্ব ও মূর্খত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সনাতনপন্থী হিন্দুগণ যে পরিমাণে ধর্ম্মহীন হইয়াছে, সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব হারাইয়া অন্যের পদানত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। আমাদের আত্মিক মুক্তির উপায় এই স্বধর্ম্মেই আছে। আমাদিগকে এই স্বধর্ম্মেরই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের ঋষিরা যে আলোক দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই পথ অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, সুতরাং তাঁহাদের পথই প্রকৃষ্ট পথ। —মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।

যখনই আমরা আমাদের আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছি, তখনই আমরা অন্য ধর্ম্মীর সংঘর্ষে আসিয়াছি। তাহাতে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারও একটা ভাল দিক আছে। আমরা যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, সেই পরিমাণে অন্যের সংস্পর্শে আসিয়া আত্মগঠনেরও সুযোগ লাভ করিয়াছি। মঙ্গলময় জগৎকর্ত্তার বিধানেই দুইটী জগতের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ জাতির সংঘর্ষে ও সংস্পর্শে আমরা আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার একটী আদর্শ স্বজাতি-প্রেমিক ও অপরটী আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক। প্রথমটী মুসলমান ও দ্বিতীয়টী খৃষ্টান।

লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে ক্ষতি মনে করিতে পারি, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা ক্ষতি না হইতেও পারে। মনে কর, আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া আত্মচৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আমাদের এই নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্যই যেন এইরূপ আঘাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং অন্য জাতির সহিত সংঘর্ষে আসা ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধ-বিগ্রহাদির পর যখন দেশে শান্তি বিরাজ করে, তখনই দেশবাসী আত্মগঠনের সুযোগ লাভ করে; দেশে মনীষী, কবি, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, ভক্ত, নেতা জন্মিয়া দেশবাসীকে কর্ত্তব্য পথে অতি মাত্রায় পরিচালিত করিবার সুযোগ পান। রাম-রাবণের যুদ্ধের পর রামায়ণের মত কাব্য, বাল্মীকির মত কবি ও মুনির উদ্ভব হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে গীতার ধর্ম্ম, মহাভারতের ন্যায় কাব্য, বেদব্যাসের মত ঋষি ও কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তন্ত্রজ্ঞান ও ভক্তিমার্গের বিশেষরূপ অনুশীলন চলিয়াছিল, বহু অবতার-মহাপুরুষ, কবি-ভক্ত, জ্ঞানী-গুণীর আবির্ভাব হইয়াছিল, ইদানীন্তন যুগে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত সংঘর্ষের পর শান্তি প্রতিষ্ঠা কালে বহু মনীষী, কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ইহাতে দেশ আত্মগঠনেরই সুযোগ লাভ করিয়াছে। এখন দেশবাসীর কর্ত্তব্য তাহাদের জীবনের সকল অভাব পূরণ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া। ভারতবাসীকে ইহা চির-দিনই স্মরণ রাখিতে হইবে যে অধর্ম্মের দ্বারা কখনই ধর্ম্মরক্ষা হয় না, অসত্যের আশ্রয়ে কখন সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না, অধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কখনই স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায় না। ধর্ম্মই জীবনের সকল অভাব পূরণ করিতে সমর্থ। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার যাহা কিছু বল না কেন, সকলই এক ধর্ম্মে পর্য্যবসিত। যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় জল সিঞ্চন না করিয়া এক মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলেই বৃক্ষের সকল অঙ্গ পূর্ণতা ও পরিপুষ্টি লাভ করে, তদ্রূপ এক ধর্ম্ম পালন করিলেই মনুষ্য-সমাজের সকল অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। হিন্দু ঋষি তাই এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া জীবনের সকল দিক্ দেখাইয়াছেন—"ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

শাস্ত্র ও গুরু অস্বীকার করিয়া ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়াছে। অনুশাসনের অধীনতা স্বীকার না করিলেই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি লইয়া চলিলে নীতি ধর্ম্ম সমাজ সকলই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তাই ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করিলেই আমরা প্রকৃত পথ পাইব।

দেশে সৎশিক্ষার অভাব সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, সুতরাং শাস্ত্রানুকূলে শিক্ষার বহুল প্রচলন হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এতদর্থে জাতীয় ভাবানুকূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ভাষার মূল এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা সংস্কৃত, এবং সেই সংস্কৃত ভাষায় ভারতের যাহা কিছু গৌরবস্থানীয় বেদ-বেদান্ত, দর্শন পুরাণ, শাস্ত্র ও কাব্যাদি রচিত, সুতরাং তাহা উপভোগ করা ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল শাস্ত্রাদি অনুসরণ করিলে ভারতবাসীর কর্ত্তব্যপথও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এই সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে সংস্কৃতের স্থান গৌণ হওয়ায়, অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি উহার মর্ম্ম ও স্বাদ গ্রহণে অসমর্থ থাকায়, তাঁহারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন। সনাতনপন্থীদিগের অধঃপতনের ইহা একটী মুখ্য কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ণাশ্রম বিভাগ সমাজ ও ধর্ম্মের পরিণতির ফলস্বরূপ। উহাকে উপেক্ষা করিলে বর্ব্বরতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"; সুতরাং গুণকর্ম্ম অনুসারে সমাজে শ্রেণী বিভাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহাতে শৃঙ্খলা ও বিধিব্যবস্থার সুন্দর প্রচলন থাকিতে পারে; এইরূপে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চির দিনই অধ্যয়ন অধ্যাপনা, শাস্ত্রানুশীলনপরায়ণ। আদর্শরূপে জীবন যাপন করিয়া ত্যাগ ও অন্যান্য সদ্‌গুণে সমাজের আদর্শ, শিক্ষক, ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের ধারক পোষক অনুষ্ঠাতা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শে অন্যান্য বর্ণ সমূহ পরিচালিত ও উন্নত হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

এই প্রকারে আশ্রম চতুষ্টয়ও দেখা যাইবে, জীবন গঠনের কেন্দ্র ও বীজ রক্ষার গোলা (store housc) স্বরূপ। আশ্রম চতুষ্টয় সর্ব্ববিধ উপাদানে সমাজ শরীর পুষ্ট করিয়া থাকে।

আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস শীর্ষ স্থানীয়। সুতরাং সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণেরও গুরু। ব্রাহ্মণের দ্বারা সমাজে যেরূপ পুরুষার্থ প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে,

সন্ন্যাসিগণদ্বারা সেইরূপ পরমার্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। সন্ন্যাসিগণ বেদশীর্ষ বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা যে সর্ব্ব বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় হইবেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাঁহারা ত্যাগ বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ পরোপকার ব্রত পালন করেন এবং গুরু ও উপদেষ্টারূপে সমাজকে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করেন। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহারাই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের ধারক, রক্ষক ও পোষক। সন্ন্যাসিগণই অনাদিকাল হইতে সমাজের গুরু, শিক্ষক ও উপদেষ্টা।

যে সনাতন ধর্ম্মে বেদান্তবেদ্য অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের সন্ধান মিলিয়াছে, যাহা অনাদিকাল হইতে প্রচলিত, যাহার উদার গর্ভে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর স্থান হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানালোকের ও ভক্তি-প্রেমরূপ অমৃত রসাল ফলের সন্ধান মিলিয়াছে, সেই ধর্ম্ম যে পূর্ণাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও অত্যুৎকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? জগতে যত কিছু ধর্ম্ম, যত নীতি, যত অনুশাসন, সবকে গ্রাস করিয়াও এই মহান উদার ধর্ম্ম অতিরিক্ত হইয়াই আছেন।

> এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ
> স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ।
> ইতি—মনু

এই আর্য্যাবর্ত্তের অগ্রজন্মা আর্য্যগণদ্বারাই সমস্ত ভূমণ্ডলের সকল মানুষের ভিতর অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া মনুষ্য মাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

দেশে সর্ব্ব দিক দিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া হিন্দু সমাজের সংস্কারের অবশ্যই প্রয়োজন থাকিতে পারে। সে সংস্কার স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইলেই ভাল হয়। অন্য সমাজের আদর্শে গড়িতে গেলে উহাকে হীন ও খর্ব্ব করাই হইবে। কারণ হিন্দু সমাজ বহু প্রাচীন সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক সমাজের ছাঁচে উহাকে গড়িতে গেলে হিন্দু সমাজকে বর্ব্বরতার যুগে নামাইয়া আনা হইবে। সংস্কারের প্রয়োজন হইলে তাহা পুরাতন ভিত্তির উপরই করিতে হইবে, তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া নহে। ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে গেলে আমাদিগকে হাজার হাজার বৎসর পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মুক্তিকামী স্বদেশপ্রেমিকগণকেও এই কথা বলা চলে যে, ন্যায় ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ হয় না। ন্যায্য এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায় অবলম্বনেই তাহা লাভ হয়। অসত্যের আশ্রয়ে সত্য ও ধ্রুবকে কখনই লাভ করা যায় না।

ভারত রত্নপ্রসূ, কামদুঘা ও কল্পতরু। ভারত কি ধনে ধনী কেহই তাহার সন্ধান রাখে না। যাহারা এ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আসিয়াছিল, তাহারা ভারতের বাহিক ধ ৷ রত্নই অপহরণ করিয়াছে, আন্তর রত্ন অধ্যাত্ম সম্পদ্—ধর্ম্মজ্ঞান হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। ভারত বাহ্য ধনে চিরবঞ্চিত হইলেও তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। ভারতবাসী জানুক যে তাহারা রাজ রাজেশ্বরীর সন্তান, ভিখারী নহে; তাহারা সিংহীর সন্তান — মেষপাল নহে। এই আত্মচৈতন্য ফিরাইয়া আনিতে দেশে ধর্ম্মানুকূল সৎশিক্ষার প্রয়োজন। প্রকৃত রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে যেমন বিফল হয়, দেশে সর্ব্ববিধ চেষ্টাই সেইরূপ বিফল হইতেছে। দেশবাসীকে সৎ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিতে পারিলে, অবতার নেতা সংস্কারক সকলের কার্য্যই অধিকতর সুগম হইয়া আসিবে।

ব্যাকরণের সাধনা

যাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্রকে কেবল শব্দরূপ ও ধাতুরূপ সাধন করিবার নিয়ম প্রণালী কিম্বা দার্শনিকতা বিবর্জ্জিত কতকগুলি দুঃশ্রব সাঙ্কেতিক সূত্র বলিয়া চির দিন ধারণা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই প্রবন্ধের নাম দেখিয়া কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইবেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে ভাবে ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাতে এই শাস্ত্রের গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। অনেকেই এখন ব্যাকরণ আলোচনায় দীর্ঘকাল ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা প্রচলিত নিয়মানুসারে ব্যাকরণের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেরই শব্দতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য ও তাৎপর্য্য জানিবার ঔৎসুক্য দেখা যায় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে ব্যাকরণ সাহিত্যের মূল ভিত্তি, চিন্তার ধারা এবং চরম লক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় অনেকেই ব্যাকরণ শাস্ত্র.ক যথার্থ শব্দতত্ত্ব-বিদ্যা এবং ভারতীয় শব্দচর্চ্চার অতুলনীয় সম্পদ্ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণকে শুধু শব্দ শাস্ত্র বা শব্দানুশাসন না বলিয়া অনেক সময় স্মৃতি তন্ত্র এবং আগম নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাকরণানুশাসন যেমন একদিকে শব্দের সাধুত্ব নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়, তেমনি অন্য দিকে শিষ্ট পরিগৃহীত ও ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় অনাদি কাল হইতে প্রচলিত। এই ভাবে দেখিলে ব্যাকরণকে বরং স্মৃতি (স্মরণ সমাচারঃ) বলা যাইতে পারে; কিন্তু প্রশ্ন হইবে যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রকে তন্ত্র ও আগম বলা হয় কেন? বিশেষতঃ আগম শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত। অনুষ্ঠানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তন্ত্রের সহিত ব্যাকরণোক্ত প্রক্রিয়ার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি পরবর্ত্তী শাব্দিকগণের শব্দ চর্চ্চার পদ্ধতি ও চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তন্ত্র ও যোগ দর্শনের সহিত ব্যাকরণাগমের শব্দতত্ত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্তের যে অনেকাংশে ঐকমত্য বর্ত্তমান আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কেবল তাহাই নয়, তত্ত্বার্থদর্শী মহাভাষ্যকার ও বাক্যপদীয়কার যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বর্ণমালার স্বরূপ বিচার, পরা পশ্যন্তী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আন্তর শব্দনির্ণয়, স্ফোটবাদ ও শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন এবং শব্দ ব্রহ্মোপসনা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শৈবাগম ও শাক্তাগমের সহিত অন্ততঃ দার্শনিকতার হিসাবে শব্দচর্চ্চার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। শব্দশাস্ত্রেও অধ্যাত্ম চিন্তা আছে। যাঁহারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই পারমার্থিক দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমগ্র চিন্তা প্রবাহকে অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা করিতেন, সেই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় মনীষিগণ শব্দ চর্চ্চার মধ্যেও সাধনার রাজমার্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শাব্দিকগণ শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতেন। শব্দতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য আলোচনাই বৈয়াকরণদিগের সাধনা। বাগ্‌যোগবিদ্ পতঞ্জলি ও ভর্ত্তৃহরি এই

সাধনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই বাগুপাসনার সহিত উপনিষদ্ বিদ্যা ও যোগ মার্গের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে শব্দ ব্রহ্মোপাসনা অতি রহস্যময় ও প্রাচীন। বেদের জ্ঞানকাণ্ডই ইহার ভিত্তি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যাকরণের স্মৃতি, তন্ত্র ও আগম সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ভারতীয় সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটা দিক প্রদর্শন করিব।

ব্যাকরণ শাস্ত্র বেদাঙ্গ ও বেদমূলক। শাস্ত্র সকলের প্রাধান্যাপ্রাধান্য বিচার করিলে বেদ-বিদ্যার পরেই ব্যাকরণের স্থান হয়। এইজন্য সকল বিদ্যা অপেক্ষা এই শাস্ত্রের প্রাধান্যও বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদের ইতিহাসের ন্যায় ব্যাকরণের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের অনাদিত্ব ও প্রবাহনিত্যতা উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। বেদার্থ পরিজ্ঞানের জন্য যে ছয়টী শাস্ত্র বৈদিক সাহিত্যের প্রথম যুগে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, ব্যাকরণ কেবল তাহাদের অন্যতম নয়, কিন্তু প্রধান। শ্রুতিতে আছে, যিনি বাগ্‌যোগবিৎ (বৈয়াকরণ) তাঁহার নিকট বেদ বিদ্যা আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন—

উত ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে—
(ঋগ্বেদ ৭।৭১।৪)

ব্যাকরণের প্রাধান্য আরও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। যিনি শব্দ সকলকে যথাযথভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি পরকালে অনন্ত সৌভাগ্য লাভ করেন।

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহার কালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগ বিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।
(মহাভাষ্য ধৃত শ্লোক। মহা, ১।১)

বেদমন্ত্রের সাকল্যকৃত পদ পাঠেই আমরা ব্যাকরণ প্রক্রিয়া বা বিশ্লেষণের প্রথম আভাস দেখিতে পাই। পরবর্ত্তীকালে এই ব্যাকরণ শাস্ত্র স্মৃতি এবং অন্যান্য আগম শাস্ত্রের ন্যায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম চিন্তার সহিত ব্যাকরণের উপাসনা-মূলক সিদ্ধান্তের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা পরে বিশেষভাবে দেখিতে পাইব। তন্ত্র, স্মৃতি ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহের মধ্যে আপাততঃ দৃষ্টিতে প্রভেদ দেখা গেলেও উপাসনার রাজ্যে সকলেরই শেষ লক্ষ্য যে এক, তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে কতকটা বুঝিতে পারিব।

মন্বাদি প্রণীত গ্রন্থ সমূহ (সংহিতা) যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়, গম্যাগম্য ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারদ্বারা স্মৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছিল, শব্দের সাধুত্ব ব্যবস্থা করিয়া তেমন ব্যাকরণ শাস্ত্রও মীমাংসকগণের নিকট স্মৃতি বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ব্যাকরণ হইতে শব্দের সাধুত্ব জ্ঞান হয় বলিয়া ভর্ত্তৃহরিও ব্যাকরণ শাস্ত্রকে স্মৃতি আখ্যা দিয়াছেন।

সাধুত্ব জ্ঞান বিষয়া সৈষা ব্যাকরণ স্মৃতিঃ।
বাক্যপদীয় ১।১৪৩

মীমাংসকগণ নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে ব্যাকরণ-স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করা কঠিন। এইজন্যই মীমাংসকেরা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ব্যাকরণকে এত উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে ব্যাকরণের সহিত ধর্ম্মেরও সম্বন্ধ আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বহু বেদ-মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্যাকরণশাস্ত্র বেদ ও ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ। তিনি বলিয়াছেন, শব্দাত্মক বেদকে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যাকরণ শাস্ত্র অভ্যাস করার দরকার। (রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।) বেদের ছয়টী অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যও তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্।
মহাভাষ্য ১।১।১

ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উভয়ই ব্যাকরণ জ্ঞান সাপেক্ষ। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, গৌঃ এই সাধু (সংস্কৃত) শব্দ এবং গাভী, গোণী প্রভৃতি অপশব্দ তুল্যভাবে অর্থজ্ঞান জন্মাইলেও চিরাচরিত নিয়মানুসারে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধু শব্দ প্রয়োগে ধর্ম্ম বা অভ্যুদয় হয়, পক্ষান্তরে অসাধু বা অপশব্দ ব্যবহার করিলে অধর্ম্ম হয়।

সমানায়ামর্থগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন চ ধর্ম্ম নিয়মঃ ক্রিয়তে।
মহাভাষ্য ১।১।১

শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ব্বক সাধু শব্দ প্রয়োগ না করিলে অধর্ম্ম হয়। এই কথা বারবার বলিয়া পতঞ্জলি ধর্ম্মের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অনাদি কাল হইতে আচার্য্যপরম্পরাক্রমে প্রচলিত এই লক্ষণানুসারে মীমাংসা ভাষ্যে শবর স্বামী শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

"যথৈব পারম্পর্য্যেণাবিচ্ছেদাদয়ং বেদ ইতি প্রমাণ
মেবাং স্মৃতিরেবমিয়মপি প্রমাণং ভবিষ্যতীতি।"
শবর ভাষ্য মীঃ সূঃ ১।৩।১

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে শ্রুতি, স্মৃতি, আগম সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই স্মরণাতীত কাল হইতে শিষ্ট সমাজে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রাকারে উপনিবদ্ধ না হইলেও এই সকল শাস্ত্রীয় প্রবাদ (Tradition) লোকমুখে শুনিয়াই এক সময় মানুষ অভ্যাস ও আয়ত্ত করিত। এখন দেখা যায় যে, গুরুপরম্পরাক্রমে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রচলিত দেখিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রকে শিষ্টাচরিত স্মৃতি বলা অসঙ্গত হয় নাই। ভর্তৃহরি স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই প্রকার অনাদি আম্নায় ঋষি প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাকরণের উৎপত্তি হইয়াছে।

তস্মাদকৃতকং শাস্ত্রং স্মৃতিংবা সনিবন্ধনাম্।
আশ্রিত্যারভ্যতে শিষ্টৈঃ শব্দানামনুশাসনম্॥
বাক্যপদীয় ১।৪৩

বৈদিক ও লৌকিক শব্দের স্বর-সংস্কার-পদ্ধতি চিরন্তন অনুবর্ত্তন করিয়াই প্রসার লাভ করিয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্র অধুনাতন প্রবর্ত্তিত নিরর্থক নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। শব্দের সাধুত্ব ব্যবস্থা করিবার প্রণালী অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে।

নানার্থিকামিমাং কশ্চিদ্ ব্যবস্থাং কর্ত্তুমর্হতি।
তস্মান্নিবধ্যতে নিত্যা সাধুত্ববিষয়া স্মৃতিঃ॥
বাক্যপদীয় ১।২৯

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পরিশুদ্ধভাবে যদি শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং তাহার অর্থ যদি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয়, তবে উহা কামধেনুর ন্যায় সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।
মহাভাষ্য ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৮

বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি সকল অনুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে। মন্ত্রের পাঠশুদ্ধি ও মন্ত্রার্থ জ্ঞান না হইলে আবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপ ফলোপধায়ক হয় না, বরং অনীপ্সিত ফল দান করে। পাঠশুদ্ধি ও মন্ত্রার্থ জ্ঞান উভয়ই ব্যাকরণ জ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না। এইজন্য ঋষিগণ প্রথমেই ব্যাকরণ চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ অনুভব করিয়া স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ব্যাকরণকেও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কথিত আছে অসুরগণ অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল।

তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বা পরাবভূবুঃ।

দুষ্টোচ্চারিত শব্দ বজ্রস্বরূপ হইয়া আর একজন অসুরকে বধ করিয়াছিল।

সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।
মহাভাষ্য ১।১।১

ব্রাহ্মণের পক্ষে দুষ্ট শব্দ (ম্লেচ্ছ) উচ্চারণ করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল (ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ)। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে বেশ বুঝা যায় যে ধর্ম্মের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ কেমন অপরিহার্য্য। (ক্রমশঃ)

শ্রেষ্ঠ-পন্থা

যত কিছু নীতির কথা, সব রয়েছে কর্ম্মযোগের মধ্যে বিশেষ করে। যোগপন্থার প্রসঙ্গে যদিও যম নিয়মের ভিতর দিয়ে অনেকানেক নীতি সাধনের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবু কর্ম্মপন্থার মাঝে যেমন এগুলির স্থান অতি উচ্চে, যোগপন্থায় তেমন নয়, সেখানে এগুলি আদি পীঠরূপে বর্ণিত হলেও যেন প্রাণায়ামের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাণায়ামের সহায়করূপেই যেন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে শম-দমাদির উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশের নীতি (moral) হতে এই নীতিগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য দেশে অন্যান্য ধর্ম্মে বা অন্যান্য পন্থায় এই নীতিগুলির ফল বল্‌তে গিয়ে এই জগতের প্রশংসা ও সুখলাভই মাত্র বর্ণিত হয়, কিন্তু যম-নিয়মের সাধনার ফলে এই জগতের সুফল পাওয়া তো যায়-ই, বরং অদ্ভুত ভাবে পাওয়া যায় এবং কোথাও কোথাও পরলোক বা অন্য জন্মকেও টেনে আনা হয়।

যেমন সাধারণ নীতি বাক্য রয়েছে—'সত্য কথা বলিবে, পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না। মিথ্যা কথা বলা ও চুরি করা বড় দোষ। যে মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না—চুরি করিলে শাস্তি পাইতে হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে ইত্যাদি।' এ সমস্তই প্রত্যেক সভ্য জাতির ভাষাতেই এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই বোধ হয় বাল্যশিক্ষার মধ্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য তারপর সমস্ত জীবন ভরে এ সবের সাধন চলে, তবুও অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত পাঠ মরণ কালেও শিক্ষা হয় না। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই নীতিগুলিই অদ্ভুত ফলসহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন সত্য সম্বন্ধে বলা হয় "সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া-ফলাশ্রয়ত্বম্। সত্য কারও মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌লে অর্থাৎ কারও সত্যব্রত সম্যক্ স্থির হলে, সে যা বলে, তাই ঘটে; অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ ধার্ম্মিক হয়ে যাবে। এম্‌নি যা বলে, তাই ঘটে।

চুরি সম্বন্ধে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হয়—"অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।" 'চুরি করা বা পরদ্রব্য গ্রহণেচ্ছা সম্পূর্ণ নিরোধ করা হলে সেই অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির মনে সমস্ত রত্নের কল্পনা মাত্রেই তারা এসে সেই ব্যক্তির সকাশে উপস্থিত

হয়।' এইরূপ—"অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্ম কথায়াঃ সংবোধঃ।" অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয়-দোষ দর্শনান্তে বৈরাগ্যজনিত যখন কোনও কিছু গ্রহণ করতে ইচ্ছা না হবে, তখন পূর্ব্ব জন্মের কথা এবং কেনই বা এই জন্ম হল, তা মনে পড়বে—ইত্যাদি।

এসব থেকে স্পষ্টই মনে হয়, অন্য দেশে বা মুক্তির সাধন-মার্গের অন্য পন্থাতে নীতি (moral) যেন কেবলমাত্র উপরভাসা রকমে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই নীতির ফল কতদূর যায়, তা দেখতে গিয়ে মাত্র ইহলোকের সুখ-সুবিধা এবং পরলোকে বড় জোর সব স্থানেই কেবল অক্ষয় স্বর্গ (eternal bliss) ইত্যাদির কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু পাতঞ্জলাদির মত সূক্ষ্মভাবে তলিয়ে দেখে কেউ নীতি শাস্ত্রের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তা নির্ণয় করে বলেন নাই। কিন্তু সেই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রই যম-নিয়মের উপরে তত জোর দেন নাই, যত দিয়েছেন মনস্থৈর্য্যের উপর। এই মন স্থির করবার উপায় বলতে গিয়েই যোগশাস্ত্র প্রাণায়ামের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মুক্তির উপায় বলতে গিয়ে যোগশাস্ত্র প্রধান উপায় ধরলেন মনস্থৈর্য্য বা চিত্তসংযম; তার উপায় প্রাণায়াম এবং প্রাণায়ামের অঙ্গীভূত যম-নিয়মাসনাদি। চিত্তসংযম বা সমাধি প্রধান উপায়, তার কারণ বা উপায় আবার বাকী সাতটী অর্থাৎ যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার ধারণা-ধ্যান ইত্যাদি। কিন্তু আবার বলি, মুক্তি সাধনের উপায় সমাধিই তার প্রধান লক্ষ্য। প্রেমশূন্য কঠোর হৃদয় এবং বিচার-বিমুখ-মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যোগপন্থা আশু ফলপ্রদ ব'লে মনে হয়। কিন্তু সকলের পক্ষেই সমান সাধন-মার্গ অবলম্বনীয় নয়।

আশুফলপ্রদ বলে অনেকেই যোগ ও তন্ত্র পথের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু স্বীয় পারিপার্শ্বিক, অধিকার ও অবস্থা বিচারের শক্তি অনেকেরই থাকে না। আপনার অন্তর্নিহিত সাধনার বীজ কি, তা না জানার জন্যই মানুষ অধ্যাত্মপিপাসু হয়েও এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রে মরে। একমাত্র সদ্‌গুরুই সেই পূর্ব্বজন্ম নিহিত আসল বীজটী ধরিয়ে দিয়ে মুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারেন। নতুবা মুক্তি চেয়েও মানুষ তার পন্থা ঠিক করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। তখন যেটী আশু ফলপ্রদ ব'লে শুনতে পায়, সেটীই ধরে বসতে চায়। কিন্তু জানে না যে যোগ ও তন্ত্রপথ যেমন আশু ফলপ্রদ, তেমনি উপযুক্ত গুরু পিছনে না থাকলে পদে পদে মহা বিপদেরও অবধি নাই। যেমন জীবনের আশঙ্কা, তেমনি আবার যেখানে জীবনাশঙ্কা নাই, সেখানেও এমনি সব দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ হয়, যা ডাক্তার কবিরাজাদি লৌকিক চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার বাইরে। সুতরাং কেবল শাস্ত্র দৃষ্টে এসব পন্থার অনুসরণ করা বাতুলতা মাত্র। গীতোক্ত বাণীর অনুসরণ ক'রে যাঁরা মনে করেন যে, এই সমস্ত সাধন পন্থায় প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে মরণেও সুখ, কেন না মরণান্তে যোগ্য দেহ ও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক নিয়ে 'যোগিনাং শ্রীমতাং গেহে' জন্ম নিয়ে তাঁরা যোগভ্রষ্টতার দুঃখ দূর করবেন, তাঁদেরও আর এক বিষয় চিন্তা করা উচিত।

সেটী হচ্ছে এই যে, মরণ পণ করেও যাঁরা এই সব পন্থায় সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁদের এইটুকু পূর্ব্বে চিন্তনীয় যে, তাঁহাদের কাম্য কি? পন্থাটাই কাম্য, অথবা পথের শেষ লক্ষ্য যে মুক্তি, তাই। যদি তাই হয়, তবে তাঁর ভিতর যে অন্য পথের বীজ লুক্কায়িত নাই, অন্য পথে গেলে যে অচিরে তাঁদের সিদ্ধিলাভ না ঘটবে, তার প্রমাণ কি? যদি বলা হয় যে, তাতে অর্থাৎ পন্থা নির্দ্দেশে গুরু প্রয়োজন, সে গুরুর অভাব, তাই আপন রুচি অনুযায়ী যোগপথ গ্রহণই ভাল—

তার উত্তর এই যে, সে পথেও তো গুরু প্রয়োজন। নতুবা গুরুহীন শাস্ত্র বিপথে নেয়।

কারণ, উপযুক্ত শাস্ত্রদ্রষ্টা মহাপুরুষ গুরু পিছনে না থাক্‌লে বুদ্ধি বিভ্রমেরই সম্ভাবনা। শাস্ত্র এমনই বিভিন্ন যে, সে গহন বনে পন্থা নির্দ্দেশ করা আরও শক্ত। শাস্ত্রপথে কতদূর চ'লে জীবন বিপন্ন ক'রে পরজন্মেই যে অভীষ্ট মিল্‌বে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? পরজন্মেই যে মিল্‌বে, গীতা এমন নিশ্চয়তা স্বীকার করেন না। যদি বল, গুরুনির্দ্দিষ্ট পন্থাতেই বা সে নিশ্চয়তা কোথায়? তার উত্তর এই যে, সদ্‌গুরু হলে তিন জন্মে অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধিলাভ ঘট্‌বেই। একাধিক মহাপুরুষের কাছ থেকে এ বাণী শোনা গিয়েছে। কাজেই যে পথেই যাও না কেন, একজন গুরু বা গাইড প্রয়োজন সব পথেই। যদি বল, শাস্ত্র বা গ্রন্থই আমার গুরু, তবে সে গুরু তো অনেক পন্থাই বলেন; তার মধ্যে যেটীতে উপরোক্ত বিপদ্‌-আপদের আশঙ্কা কম, এবং একাধিক শাস্ত্র যার প্রশংসায় একমত, সেই কর্ম্ম-যোগই সকলের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় কম বিঘ্নকর।

সেই কর্ম্মযোগে নীতিকে উচ্চস্থান দিবে, এটা স্বাভাবিক। কারণ, দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে জগৎ-শৃঙ্খলা চলে না। এই যেমন বাইরের দিক, তেমনি অন্তরের দিক থেকে আত্মপ্রসাদজনিত বিমল আনন্দ ও প্রশান্তিই মস্ত লাভ। হৃদয়ের সেই স্নিগ্ধ আনন্দই স্বর্গ। তার তুলনায় শাস্ত্র বর্ণিত স্বর্গীয় সুখ ভোগ খুব একটা বেশী কিছু নয়। তবু সাধারণ ভোগ-লোলুপ মানুষকে ভোগের প্রলোভন প্রদর্শন ভিন্ন স্বর্গের পথে (eternal bliss) বা অনন্ত আনন্দের দিকে প্রবৃত্ত কর্‌বার আর উপায় নাই। তাই সাধারণের জন্য শাস্ত্রকারেরা যেন অগত্যাই শুধু গৌণ ফলটাই বেশী উজ্জ্বল ক'রে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন। অন্ততঃ তাতে প্রলুব্ধ হয়েও যদি মন আমাদের সেদিকে যায়, তবুও সেই বিমল আনন্দের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। একবার প্রবৃত্ত হয়ে যখন গৌণ-মুখ্য দুটা ফলই পাব, তখন মুখ্যটা ছেড়ে গৌণটাতে যে মজে, সে মূর্খ।

যোগাদি শাস্ত্রেও এমনি প্রলোভনের অন্ত নাই। বিভূতিপাদ বা পূর্ব্ব বর্ণিত সত্যাস্তেয়াদির ফল বর্ণনে এরূপ গৌণ ফল বা প্রলোভন বর্ত্তমান। কিন্তু সে সমস্তেরও মুখ্য ফল যে চিত্তপ্রশান্তি, তাতে সকলেই একমত। কারণ, যোগেও এ সমস্ত বিভূতি বর্ণনান্তে বলা হয় যে, যিনি এই সব বিভূতিতে মগ্ন হন, তিনি পরম পদলাভে বঞ্চিত হন। তবু যে এসব বলা, তা কেবল রুচি জন্মিয়ে কোনও মতে পথে আনার জন্য—অর্থাৎ এসব মন্দের ভাল। আসল ভাল হচ্ছে, চরম ও পরম সেই সমাধিগম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কর্ম্মই বল, যোগই বল, সকলেরই লক্ষ্য যাতে বিমল আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, সেই চিত্তশুদ্ধি। লক্ষ্য এই হলেও পথের কথা বল্‌তে গিয়ে কত জনে কত কিছু অদ্ভুত খবর দিচ্ছেন—কারও কথা মিথ্যা নয়—সেই পথে গেলে তা মিল্‌বে বই কি! কিন্তু সে পথে যাওয়া আমার উচিত হবে কি না—সেটা আলাদা চিন্তার কথা।

সাধারণ চিন্তাতে দেখা যায় যে, যখন শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীভগবানও কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধে বল্‌ছেন:—

> "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

—কেউ এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করে থাক্‌তে পারে

না—কারণ প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা বাধ্য হয়েই সকলকে কর্ম্ম কর্‌তে হয়;" এমন কি স্বয়ং ভগবানও যখন কর্ম্মের হাতে রেহাই পান না ব'লে, এই গীতাতেই তিনি একস্থানে কর্ম্মের মহিমা বল্‌তে গিয়ে বল্‌ছেন :—

"নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ৩।২২

—জগতে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই, কেন না ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্য কিছু নাই, তবু আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি"—তখন কর্ম্ম কর্‌তেই হবে, তখন একটু বুদ্ধি বা কৌশল নিশ্চয় দরকার। কর্ম্মযোগও তাই—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"

এই "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" ব'লে কর্ম্মের মধ্যে সেই কৌশলরূপ যোগ কি, তাই বুঝাতে গিয়ে আঠার অধ্যায় গীতা শ্রীভগবানকে অর্জ্জুনের কাছে বল্‌তে হল। কারণ, বলা যত সহজে একটী নিঃশ্বাসে শেষ করা যায়, সাধন তত সহজ নয়; মেধাবী শিষ্য অর্জ্জুন শ্রীভগবৎ প্রসাদে সেই সাধন-মার্গে যত প্রকার বাধা আস্‌তে পারে, এক একটী করে সবগুলির সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন কর্‌লেন—শ্রীভগবানও এক এক ক'রে সবগুলির সমাধান বলে দিয়ে শেষে আবার সেই সারভূত কৌশলটী বলে দিলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—'ওগো তুমি মদ্গতচিত্ত, আমার ভক্ত এবং আমার ভজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর, তা হলে তুমি আমাকেই পাবে—তোমাকে প্রতিজ্ঞা ক'রেই বল্‌ছি এসব—কারণ তুমি আমার প্রিয়।' —তুমি সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত কর্‌ব—দুঃখ ক'রো না। এমন স্নেহে, এমন অভয় দিয়ে হৃদয় ঢেলে এ জগতে আর কে এমন ভাবে বুকে তুলে নিতে চায়? কতবার তো অন্তর হ'তে তাঁর সতর্ক বাণী শুনেও তাঁরই নিষিদ্ধ সর্ব্বজন ঘৃণিত কত কুকার্য্যে ব্রতী হয়েছি, কিন্তু কই, এ জগতের মৌখিক আত্মীয়দের মত সে ত দূরে সরে যায় নি—বরং ফিরে এসে "আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে কোলে করে নিয়ে" সে বসেছে। 'ওগো এমন প্রিয় তুমি, আর এমন হতভাগা আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় কোন্ ঘৃণ্যে মজে আছি! ওগো তুমি দাও আমার এ মোহ ভেঙ্গে—তোমার ওই চির প্রসারিত স্নিগ্ধ আনন্দময় প্রশান্ত ক্রোড়ে টেনে নাও তুমি—আজ হতে আমি সব ছেড়ে দিয়ে তোমারি হলাম'—এমনি হৃদয় সমর্পণ করে সর্ব্বভাবে তাঁরই শরণাগত হয়ে, **তাঁকে চেয়ে কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ—ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।**

জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্

আমাদের জ্ঞান অল্প, কিন্তু জ্ঞেয় অনেক; যোগিদের কিন্তু এর বিপরীত, অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞানের সীমা নাই, কিন্তু জ্ঞেয় তার তুলনায় খুবই স্বল্প। আমাদের বুদ্ধিতে মালিন্য আছে বলেই, একটা বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হতে আমাদের এত সময় লাগে, আর জীবনে আমরা খুব অল্প বিষয়ই আয়ত্ত কর্‌তে পারি, কিন্তু যোগিগণের চিত্তে মালিন্য নাই, তাই তাঁদের জ্ঞানের আলো সকল বিষয়ে সহজে প্রবেশ করে, আর এইজন্যই একটা বিষয় বুঝতে বা নিজের বোধের মাঝে প্রতিফলিত কর্‌তে তাঁদের অধিক সময় লাগে না। সাধনার আগুণে বুদ্ধির জঞ্জাল খসে পড়ে বলেই—এই বুদ্ধির মাঝে অনন্ত শক্তির সমাবেশ হয়। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্য পাদে এই মর্ম্মে একটা সূত্র আছে—

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্॥ ৩০

বুদ্ধিসত্বে কোন মালিন্য থাকে না বলেই, জ্ঞানের বা বুদ্ধির আলোক অনন্ত হয়ে পড়ে, সুতরাং জ্ঞেয় তার তুলনায় তখন খুবই অল্প হয়ে পড়ে।

আবরণের জঞ্জাল যাঁর মাঝে যত কম, তাঁর প্রকাশ শক্তি তত বেশী। আলোচনা বা চর্চ্চার অভাবে বুদ্ধির মাঝে জঞ্জাল পড়ে যায়, এইজন্যই একটা বিষয় আয়ত্ত কর্‌তে আমাদের এত সময় এবং সাধনার প্রয়োজন হয়। যাঁর বুদ্ধিতে মালিন্য নাই, তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখা দেয়। আমাদের জ্ঞানের আলো নিষ্প্রভ, এইজন্যই জগতে আমাদের জান্‌বার জিনিষই সম্মুখে বেশী।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাধনার মাঝে এই ক্ষেত্রেই বিষম পার্থক্যের সূচনা হয়েছে। পাশ্চাত্য আত্মার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, জড় জগতের পেছনেই কেবল ছুটছে—এইজন্যই তারা দেখছে জ্ঞেয়ের অন্ত নাই। প্রাচ্যের কথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। উপনিষদের জিজ্ঞাসু ঋষির মুখ দিয়ে এইজন্যই এই বাণী বের হয়েছে "কাকে জান্‌তে পার্‌লে জগতের আর সবকেই জানা যায়?" জ্ঞানের আলো ভিতরে জলে উঠ্‌লে, জ্ঞেয়-জগৎ যে তখন জ্ঞানের আলোকে ভরপুর হয়ে যায়, সুতরাং তখন তো অজানা বলে কিছু থাকেই না। একটী একটী করে বিষয় জান্‌তে গেলে, অনন্ত জীবনেও তা জানা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না—এইজন্যই মূলকে জান্‌বার দরুণ প্রাচ্যের ঋষির আন্তরিক ব্যাকুলতা। মূলে এমন একজন আছেন—যাঁর মাঝে জগতের ভাল-মন্দ, সু-কু সবাই ঠাঁই পেয়েছে—সুতরাং এককে ধর্‌তে পার্‌লে, সবকেই জানা যাবে। এই এক জ্ঞানময়, জ্যোতিঃস্বরূপ, সকলের অন্তর্দেবতা। এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে জান্‌তে পার্‌লে তাঁর আলোতে আর সবাইকে জানা যায়, বুঝা যায়। জগতের যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে—সবের পেছনেই রয়েছে সেই চৈতন্যময় পরমাত্মার অনন্ত ব্যাপ্ত জ্ঞানের দীপ্তি।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর শ্লোক আছে—

সর্ব্ব দ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

সত্বগুণ বৃদ্ধি হলে, তখন জ্ঞানের আলো দেহের প্রতি লোম কূপেও প্রকাশ পায়, তখন সর্ব্বদেহ দিয়ে জানা যায়, বুঝা যায়। আমরা উল্টা পথ

ধরি বলেই আমাদের এক একটা বিষয় অধিগত করতে এত সময় এবং পণ্ড শ্রম করতে হয়। আসল কথা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যা—তাকে সর্ব্ব প্রথমে দূর করতে হবে, বুদ্ধির আলো যাতে বাধা না পায়, তার দরুণ সত্ত্বগুণের বিকাশ চাই। একদিন শ্রুতিমাত্রই ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যেত, বুদ্ধির বৈশারদ্যই এর একমাত্র কারণ। এখন বুদ্ধিতে মস্ত বড় আবরণ পড়ে গেছে আমাদের, এইজন্যই বার বার কাণের কাছে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য বললেও—আত্মা বিন্দুমাত্র উদ্বুদ্ধ হন না।

জ্ঞানের আলো প্রদীপ্ত হয়ে উঠলে, তখন প্রাণে অসীম শান্তি আসবে, জ্ঞেয় জগৎ তখন সেই জ্ঞানের আলোর কাছে, সূর্য্যের তেজের কাছে নক্ষত্রের আলোর যতটুকু মূল্য সেইরূপে পরিগণিত হবে। আমাদের জ্ঞান নাই বলেই জগতে অন্ধকারই দেখছি বেশী, অর্থাৎ জানার জগতের বিভীষিকাই আমাদের বেশী। জ্ঞানের স্বল্পতা বলেই, জ্ঞেয় জগতের সীমা আমাদের কাছে অসীম। আজ কাল জ্ঞেয়-জগতের পানে সবাই অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটছে,—এটা ঠিক প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নয়। জ্ঞানের মাঝে চাঞ্চল্য নাই,—জ্ঞানের আলো যাঁর মাঝে ফুটে উঠেছে, তাঁর কাছে জ্ঞেয়-জগৎ কত তুচ্ছ!

"ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা"—এর মাঝেও নিগূঢ় তাৎপর্য্য রয়েছে। ব্রহ্মের সেই জগদ্ব্যাপ্ত দীপ্তির তুলনায় জগৎ কত ক্ষুদ্র—কত তুচ্ছ। ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন—তাঁর কাছে যে সব ব্রহ্মময়—অর্থাৎ তাঁর কাছে অজানা কিছু নাই। সর্ব্বত্র ব্রহ্মের ব্যাপ্তি যেখানে, সেখানে আর জ্ঞেয় কোথায় রইল? জ্ঞানের অভাবে জ্ঞেয়ই বেশী—এইজন্যই বিংশ শতাব্দীর মানবের জানার চাঞ্চল্য দেখে, তা ঠিক ঠিক প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ বলে স্বীকার করতে বাধে। আবরণ অপসারিত করতে হলে, তার সাধনা হবে অন্তর্ম্মুখী; বহির্ম্মুখী চাঞ্চল্য মোটেই থাকবে না।

বুদ্ধি যখন আত্মার আলোতে সম্পূর্ণ অবগাহিত হয়ে যায়, তখন সেই বুদ্ধির আলোকও অনন্ত হয়ে পড়ে। আত্মবিরোধী বুদ্ধি জড়—তাই জড় বুদ্ধি দিয়ে বিষয় অধিগত করা কঠিন। বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী না করলে, বুদ্ধির আলো ক্রমশঃই নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। আত্মার সঙ্গে বুদ্ধিকে যুক্ত রাখতে পারলে—এই বুদ্ধি দিয়ে সহজে সকল বিষয় অধিগত করবার ক্ষমতা জাগে। পাশ্চাত্য জগৎ আত্ম-বিমুখী, তাই পাশ্চাত্যে বুদ্ধির স্থৈর্য্য দেখা যাচ্ছে না—কেবল নূতন নূতন আবিষ্কার। এই আবিষ্কার দ্বারা আত্মহিত বা প্রাণে বিন্দুমাত্র শক্তি আসছে না, অশান্তি কেবল বেড়েই চলছে। কেবল জড়-বুদ্ধির প্ররোচনায় চলেই জগতের আজ এই দুর্গতি।

মানুষের মন বুদ্ধি ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠছে, এইজন্যই সংশ্লেষণ বুদ্ধির স্থলে ক্রমশঃ বিশ্লেষণ বুদ্ধিরই একাধিপত্য দেখা যাচ্ছে। মালিন্যের দরুণ সহজ সত্যকে বুঝাতে এত বাক্য প্রয়োগ এবং তর্ক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। জগতে আজ এই বিশ্লেষণ বুদ্ধির বিস্তার দেখে, জগৎ উন্নতির দিকে না অবনতির দিকে চলছে—এ নিয়ে মনে বাস্তবিকই সন্দেহ জাগে। ঋষির সরল উদার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তিকে তাই পাশ্চাত্যের মানব চাষার গান বলে আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নি।

জ্ঞানের অনাময় প্রকাশ যাতে হতে পারে, তারই চেষ্টা কর্‌তে হবে আমাদের—সুতরাং করণের বিশুদ্ধির দিকে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বুদ্ধির মালিন্যের দরুণই মহাবাক্যের অর্থ প্রতিভাত হতে আমাদের এত সময় লাগে।

ঋষিযুগ ছিল—সহজ-জ্ঞানের যুগ, তাই তর্ক-শাস্ত্রের সৃষ্টি না হয়ে, উপনিষদের সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগে। তাঁদের বুদ্ধিতে—মনে, কোথায়ও একটা আবরণ দেখতে পাওয়া যায় না, যা বলেছেন, তাতে তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহের ছায়া পড়ে নি। তাঁদের বাণী এইজন্যই এত মর্ম্মস্পর্শী। এক এক ঋষি জাগতিক সম্পদে দরিদ্র হলেও—পারমার্থিক সম্পদে তাঁদের ভিতর পরিপূর্ণ ছিল, তাই দেখে ঋষির পায়ে রাজ-রাজেশ্বরের মুকুটও অবনমিত হয়েছে। জগতে শান্তি আন্‌তে হলে, আবার আমাদের ঋষিদের ন্যায় আত্মস্থ হতে হবে—জ্ঞানের আলো নিজের ভিতরে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। আত্মাকে জানি না বলেই—কিছুতেই আমাদের দৈন্য ঘুচছে না। আত্মজ্ঞানী পুরুষের পায়ে সকল সম্পদ এসে লুটাচ্ছে। তাঁরা তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও কর্‌ছেন না। যাঁকে জানার অত্যাবশ্যক প্রয়োজন, তাঁর প্রতি আমরা বিমুখ—এইজন্যই জ্ঞানের পরিচায়ক স্বরূপ এত উপাধি লাভ করেও—প্রাণে শান্তি আস্‌ছে না কিছুতেই।

বুঝি আমরা বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু জ্ঞানের আলোতে বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এইজন্যই বুদ্ধি দিয়ে যা জানি, তা ঠিক ঠিক বিষয়ের স্বরূপ নয়। জ্ঞানের আলো দিয়ে জানা, আর জড়বুদ্ধি দিয়ে জানাতে রাত-দিন পার্থক্য। যথার্থ জ্ঞান লাভ কর্‌তে হলে বুদ্ধির মোড় ফিরাতে হবে—অর্থাৎ বুদ্ধিকে আত্মানুরাগিণী কর্‌তে হবে। অসতী বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হচ্ছে, তা ব্যভিচার জ্ঞান। সেই জ্ঞানে সমত্ব বুদ্ধি, স্থৈর্য্য উৎপন্ন না হয়ে, চাঞ্চল্যই বাড়ছে শুধু।

যে নিজকে জানে না, তার জগৎজ্ঞানে কি আস্‌বে যাবে? যথার্থ জ্ঞানের আলোতে যার হৃদয় উদ্ভাসিত নয়, বাহিরের আলোর সাহায্যে তার হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হবে কেমন করে? নিজকে উপেক্ষা করে, বাহিরের আশায় বসে আছি বলেই, আমাদের প্রতি পদে পদে লাঞ্ছনা পেতে হচ্ছে। আসল কথা ভিতরে তপস্যার আগুন জ্বালাতে হবে, তাতে মন-বুদ্ধির জঞ্জাল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আত্মার জ্যোতিঃ তখন জড়ের বাধায় প্রতিহত হবে না—জড়ও তখন বিদ্যুন্ময় হয়ে উঠবে। চাই তাপ-সংযোগ। তপঃশক্তি নিষ্প্রভ, তাই জড়ের আধিপত্যই আমাদের উপর এত বেশী। এই দেহ-মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়ে যদি সত্যকে প্রকাশিত কর্‌তে চাই, তাহলে করণের শোধন চাই। সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ—সাত্ত্বিকতার চরম লক্ষণ। আমাদের শুদ্ধ সত্বসম্পন্নই হতে হবে। অপরের দেখাদেখি আত্মবিমুখী হয়ে, জ্ঞেয় জগতের পানে ঝুঁকে পড়লে, প্রাণে আমাদের শান্তি আস্‌বে না কোন দিন। জ্ঞান বল্‌তে জ্ঞেয়-জগতের জ্ঞান নয়—আত্মার জ্ঞান। অর্থাৎ যাকে জান্‌লে জগতের কিছুই অজানা থাক্‌বে না। জগতের সবাই অপুর্ণ—একমাত্র আত্মাই পূর্ণ। আত্মজ্ঞান দ্বারা সবকে জানা যায়, কিন্তু বিশিষ্ট কোন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা জগতের সবের জ্ঞান লাভ হয় না। এইজন্যই ভারতের ঋষির মূলমন্ত্র হল "আত্মানং বিদ্ধি।" এই আত্মাকে জান্‌তে পার্‌লে, না জানার দৈন্য থাক্‌বে না।

সকল সংস্কার হতে মুক্ত হতে হবে। বিশিষ্ট সংস্কারও সত্যের প্রতিবন্ধক। বুদ্ধি চরম তত্ত্ব বটে, কিন্তু এই বুদ্ধিই সত্যের মুখের এক সুদৃঢ় আবরণ। একে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে, তবেই সত্যের আলোতে —দেহ-মন-প্রাণ সব over-flooded হয়ে যাবে। আমরা চাই বুদ্ধি দিয়ে সত্য নিষ্কাসন কর্‌তে—তাতে বুদ্ধি তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু দেহের অন্যান্য বৃত্তির উপর জ্ঞানের আলো প্রতিফলিত হতে পারে না। আমাদের কাজ হলো সব আবরণ উন্মোচন করা—সত্যের সহজ প্রকাশ তাতেই হবে। জ্ঞানের আলো যেন কোথায়ও প্রতিহত না হয়, সেদিকেই সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। তাহলেই এক এক করে সকল প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়ে যাবে। বুদ্ধি দিয়ে যা জানি, তাই খণ্ডিত, আত্মা দিয়ে যা জানি তা অখণ্ডিত। এইজন্যই বুদ্ধির উপরে উঠে জ্ঞানের আলোতে নিজকে সংমিশ্রিত করে দিতে পার্‌লে, তখন আর অন্ধকার কোথায়ও থাকে না। তখনই জ্ঞান হয়ে পড়ে অনন্ত—আর জ্ঞেয় হয় অল্প; বা শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞেয় থাকেই না—সর্ব্বত্র জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। ঋষিরা বুদ্ধি দিয়ে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি, তত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছেন আত্মার দিব্য জ্যোতিঃ দ্বারা। এইজন্যই বিশ্লেষণ বুদ্ধির চেয়ে, তাঁদের মাঝে সংশ্লেষণ দৃষ্টির পরিচয়ই পাই অধিক। আমাদের বুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, আত্মার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, তাহলেই অনন্ত জ্ঞানের আলোতে আমাদের বাহির-ভিতর পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাশেই একটী ছোট্ট আম গাছ ফল-ফুল ভারে নত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সতৃষ্ণ নয়নে আমাদের দেখে সমবেদনা প্রকাশ কচ্ছে। গগনস্পর্শী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গময় পর্ব্বতের পাদদেশে মৃদু সমীরান্দোলিত নব আম্র পল্লবগুলি তথা কচি কচি আমগুলি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তারা আমাদের দুঃখে কাতর হয়ে আমাদের সুশীতল বায়ু হিল্লোলে সিঞ্চন করার জন্য ধীরে ধীরে দুল্‌ছে। আষাঢ় মাস অস্ত হতে চল্‌লেও কিন্তু আমগুলি বাঙ্গালার ফাল্গুন চৈত্রের মতই কচি কচি, আবার কোন কোন ডাল মুকুলে পূর্ণ, তখনও তাতে আম ধরে নি। পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণ, বেশ স্বাস্থ্যবন্ত।

ভায়াকে নিয়ে ধীরে ধীরে চটীতে ফিরে এলাম। আশা করেছিলাম, সুবিধা হলে ভায়াকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দিব, তথা তার জন্য এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করব। আশা নষ্ট হয়ে গেল! অন্য দিকে সঙ্গীদের নীরবতা তথা উপেক্ষা। প্রাণে দারুণ বোঝা চেপে গেল, বিপদ ত কম নয়! এ বিপদে বিপদ্‌তারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে নীরবে সহ্য করা ভিন্ন উপায় কি? হায় ঠাকুর! তুমি এ কী

বিপদে ফেল্‌লে ? এ তোমার কেমন লীলাখেলা ? .... নানা ভাবে কত কিছু ভাবনা এসে আমায় পাগল করে তুল্‌লো—নিজের জ্বরের কথা তখন মনেই ছিল না। ভায়া কিন্তু স্থবিরের মত বিপদকে মাথায় তুলে নেবার জন্য নীরবে সব সহ্য কর্‌তে লাগলো। তাকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল ভায়া যেন বিপদ দেখে "থ" বনে গেছে।

* * * *

চামেলী সহরটী বেশ বড় বটে! টিহরীর পর এত বড় সহর এ পথে আর আমরা পাই নি। এখানে সব রকম জিনিষই মিলে——যা' এ পথে দরকার হয়। দামও বেশ সস্তা। হিমালয়ের ভিতর এর চেয়ে সস্তা জিনিষ আর কোথাও দেখি নি। অনেকগুলি দোকান আছে বটে! তন্মধ্যে একজন মাড়োয়ারীর দোকানই বেশ বড়, লোকটীও ভদ্র, তার কাছে সব জিনিষই পাওয়া যায়—দামও সকলের চেয়ে সস্তা তথা একদর। তার নিকট হতেই বদরী নারায়ণ প্রভৃতি উপর দিকস্থ সব জায়গায় জিনিষ পত্র চালান হয়। আমরা তার নিকট হতে অনেকগুলি জিনিষ কিনে নিলাম। লোকটীর নাম দুর্গাপ্রসাদজী। যে সব জিনিষ আমাদের বদরীনাথের পথে দরকার নাই—যেমন গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজল, ভূর্জ্জ পত্রাদি, সে সব একটী গাঁঠরি বেঁধে এখানেই রেখে গেলাম।

এখানে কিন্তু বাঙ্গালার জ্যৈষ্ঠ মাসের মত গরম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতায় এস্থান প্রায় দুই হাজার ফিট—এটী বড় জংশন। হরিদ্বার হতে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ না যেয়ে যাঁরা সীধা বদরীনাথ চলে যান, তাঁরা রুদ্রপ্রয়াগ হতে অলকানন্দার বাম তট দিয়ে সীধা কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ হয়ে এই চামেলী বা লালসাঙ্গায় এসে পড়েন। এখান হতে অলকানন্দার উপরিস্থিত লৌহ সাঁকোটী পার হয়ে অলকানন্দা ডাইনে রেখে তার বাঁ তট দিয়ে বদরীনাথ যেতে হয়, আবার যাঁরা রামনগর, কাঠগুদাম আদি স্থান হতে সীধা বদরীনাথ যান, তাঁরা অন্য রাস্তায় কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত এসে এই বদরীনাথের পথে পড়েন। আবার যাঁরা রুদ্রপ্রয়াগ হতে কেদারনাথে যান, তাঁরা কেদারনাথ দর্শনান্তে আমরা যে পথে এসেছি, সেই পথে এই চামেলী পর্য্যন্ত এসে বদরীনাথের পথ ধরেন। কাজেই এটী একটী বড় জংশন। স্থানটীও বেশ বড়। পূর্ব্বে সহর অলকানন্দার ডান তটে (উত্তর পারে) ছিল। এর একটু উপরেই **বিরহীগঙ্গা** ও অলকানন্দার মিলন স্থান। বিরহীগঙ্গা পূর্ব্বদিকস্থ বরফান পর্ব্বতে জন্ম নিয়ে এর একটু উপরেই অলকানন্দায় আত্মসমর্পণ করে নিজের নাম লুপ্ত করে ধন্য হয়েছে। বদরীনাথ যাবার সময় সঙ্গম স্থান দেখা যায়। সংযোগ স্থলের সাত মাইল উপরে বিরহীগঙ্গার পাশে গোহনা গ্রাম অবস্থিত। এই ছোট্ট নদীটি উক্ত গ্রামের উত্তর পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হতে জন্ম নিয়েছে।

বিরহীগঙ্গা তথা বিরহীতলাও বা গোহনাতলাও

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর গোহনা গ্রামের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের ৪০০ গজ উচ্চ শৃঙ্গ বিরহী নদীতে ভেঙ্গে পড়ে—তাতে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিরহীর এক তীর হতে অন্য তীর পর্য্যন্ত দুই হাজার ফিট প্রশস্ত এগার হাজার ফিট লম্বা নয় শত ফিট উচ্চ পাথর ও মাটীর একটী বাঁধ হয়ে যায়। বাঁধটীর তলদেশ এগার হাজার ফিট প্রশস্ত হয়ে যায়। পাহাড় ধসে নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় সেটী একটী তলাও (সরোবর বা হ্রদ) রূপে পরিণত হয়ে যায় এবং দিন দিন তার জল বাড়তে থাকে। এই তলাওকে কেউ বিরহীতলাও, কেউ বা গোহনা তলাও বলে। গভর্ণমেণ্ট ঐ তলাওয়ের ভবিষ্যৎ

চিন্তা করে, ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা এর বিধি-ব্যবস্থা করতে লেগে যান। তলাওয়ের পাশে থাকার বাংলা, টেলিগ্রাফ আফিস তৈরী হয়। তখন ও দিকটায় টেলিগ্রাফ আফিস ছিল না। হরিদ্বার হতে সাময়িক টেলিগ্রাফ আফিস তৈরী হয়ে যায়।

এই চামেলী চটী বা লালসাঙ্গা অলকানন্দা ও বিরহীগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত—এ কথা প্রিয় পাঠকদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি। বিরহীগঙ্গা সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণের কেদারখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত আছে। যথা :—

> তত উত্তর দিগ ভাগে নদী পরম পাবনী।
> ব্রীহিকা নাম বিখ্যাতা সর্ব্বপাপ হরাসতা॥

তার উত্তরে (নন্দ প্রয়াগের উত্তরে) সর্ব্বপাপ নাশক পরম পাবনী "ব্রীহি" অর্থাৎ বিরহীগঙ্গা নামে নদী আছে।

> ততো বৈ বিরহবতী নদী পাপ প্রমোচনী।
> বিরহেণ পুরা তত্র সত্যাস্তপ্তং শিবেন হি॥

তার পিছে সর্ব্বপাপ প্রমোচনী বিরহবতী নদী আছে, যেখানে প্রথমে সতীর বিরহে শিবজী তপস্যা করেছিলেন।

> ততঃ প্রভৃতি কল্যানি নাম্না বিরহবতী নদী।
> তপস্তপ্তস্য দেবস্য প্রত্যক্ষং চণ্ডিকা ভবেৎ॥

হে কল্যাণি! সেই দিন হতে ঐ নদীর নাম বিরহবতী গঙ্গা হয়। ঐখানে শিব তপস্যা করায় চণ্ডিকাদেবী প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন।

> সা বৈ জগাদ দেবেশং ভবিষ্যামি গিরের্গৃহে।
> ততো মাং সর্ব্বলোকে বৈ বদিষ্যন্তি গিরেঃ সুতাম॥

দেবী শিবকে দর্শন দিয়ে বলেন, আমি ভবিষ্যতে গিরিরাজের ঘরে জন্ম নিব, তখন হতে সব লোক আমায় গিরিসুতা বলবে।

> ভবিষ্যামি পুনর্ভার্য্যা তব দেব মহেশ্বর।
> ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা হৃষ্টরোমা সদাশিবঃ॥

"হে মহেশ্বর! তখন আমি তোমার ভার্য্যা হব," এই প্রকার বাণী শুনে সদাশিব প্রসন্ন হয়ে যান।

> বিরহেশ্বরো মহাদেবঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদঃ।
> স্নানং দানং চ মরণং ত্রয়ং তত্র বিশিষ্যতে॥

সর্ব্ব কামনার ফলদাতারূপে মহেশ্বর তথায় "বিরহেশ্বর" নামে বিখ্যাত। তথায় স্নান, দান এবং মৃত্যু এই তিন কাজ হলে বিশেষ ফলদাতা হয়ে থাকে।

তার পূর্ব্বে মণিভদ্র নামক একটি সরোবর আছে, তার দক্ষিণে মহাভদ্রা নামক নদী। তৎপার্শ্বে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষদাতা সূর্য্যতীর্থ বিদ্যমান। তার দুই ক্রোশ দূরে দণ্ডাশ্রম নামে সর্ব্বপাপ নাশকারী একটি মহাতীর্থ বিদ্যমান। তথায় গণপতি মহারাজ বিরাজিত আছেন। এখানে মহারাজা দণ্ড পরম তপস্যা করায় তাঁর নামানুসারে দণ্ডকারণ্য নাম হয়েছে। যথা :—

> দণ্ডো নাম্না বরেঃ কুণ্ডে তেপে পরমকং তপঃ।
> যন্নাম্না দণ্ডকারণ্যং খ্যাতমস্তি ত্রিলোককে॥

* * *

দুপুরে অলকানন্দায় স্নান করা গেল, জল অতীব ঠাণ্ডা এবং তদ্রূপই ঘোলা। এই জল কেমন করে যে খাব তথা এই জলদ্বারা কেমন করে যে পাক করবো—বড্ড চিন্তা হল। তা ছাড়া আবার অলকানন্দা হতে সহরটী অনেক উপরে। একবার জল আনতে যেতেই প্রাণান্ত—তবে দেবপ্রয়াগের মত নয়। এখানে ঝরণা নাই। ঝরণার জল পাইপে করে এখানে এনেছে বটে! তা সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য নয়, শুধু হাসপাতালের জন্য। কিন্তু অলকানন্দার বাম তটে,—যেখানে আমাদের বদরীনাথ যেতে হবে,

সেখানে একটি খুব বড় জলপ্রপাত আছে। তার জল অতি সুন্দর, কিন্তু ততদূর আর কে যায়? সুতরাং অলকানন্দার ঐ পবিত্র জল দ্বারাই কোন রূপে কার্য্য সমাধা করা গেল। হিমালয়ের ভিতর যেগুলি সহর নামে বিখ্যাত, তার প্রত্যেকটীতেই এইরূপ জলের অসুবিধা।

অলকানন্দোত্তরে তীরে বৃক্ষ গুল্মলতাবৃতে।
বিশ্বেশ্বরো মহাদেব স্তত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ॥

অলকানন্দার উত্তর তীরে বৃক্ষ, লতা, গুল্মদ্বারা আচ্ছাদিত বিশ্বেশ্বর মহাদেব ওখানে নিত্য বাস করে থাকেন, তার চিহ্ন হচ্ছে বিল্ববৃক্ষে বদরীফলের সমান (কুলের সমান) শ্রীফল অর্থাৎ বেল হয়।

লালসাঙ্গার ডাকঘর (Po. Chamoli, Garhwal, Pouri, U. P.), তারঘর, বাবা কালী কমলীবালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। এটি গাড়োবাল জেলার একটি প্রধান সব ডিভিসন, এখানে একজন ডেপুটী কালেক্টর বাস করেন। তাঁর আদালতটি পাহাড়ের উপরে মনোরম জায়গায় অবস্থিত। নীচে পূর্ত্ত বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বাংলা, বড় বাজার;—এ সমস্তই কিন্তু অলকানন্দার বাম তটে অবস্থিত। এখানে অলকানন্দা পশ্চিমাভিমুখিনী। পূর্ব্বে সহরাদি সবই অলকানন্দার ডান তীরে ছিল। গোহনা বন্যায় সব ধুয়ে মুছে যাওয়ায় সব বাম তীরে আস্তানা গেড়েছে। বন্যায় অলকানন্দার উপরিস্থিত পুরাতন পুলটি ভেঙ্গে গেছিল। এখন এখানে একটি নূতন পুল তৈরী হয়েছে—২৩৩ ফিট লম্বা। এখানে যথেষ্ট কুলী মিলে, কুলীর এজেন্সি আছে। যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁরা অর্থ ব্যয় করলে এখান হতে ডাণ্ডী, কাণ্ডী, ঝাম্পান বা অশ্বপৃষ্ঠেও যেতে পারেন। একটি স্কুল ও দুটী ডাক্ বাংলো আছে; সে সব যাত্রীদের জন্য না হলেও চটীগুলি সুন্দর; দোকানদারগুলিও ভদ্র, থাকবার তথা খাবার দাবার জিনিষের বিশেষ সুবিধা আছে বটে, —তবে একমাত্র অসুবিধা জলের। দোকানে প্রায় সব জিনিষাদিই মিলে—কাপড় পর্য্যন্ত।

জুলাই মাসের প্রারম্ভে অলকানন্দার দুই পার্শ্বস্থ সমুদয় বসতি গ্রামের লোক জন হটিয়ে পাহাড়ের উপরে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে বর্ষাকালের জলধারায় বিরহী তলাওয়ে ক্রমশঃ জল বাড়িতে থাকে। ধীরে ধীরে ছয় সাত মাইল লম্বা, দুই তিন মাইল চওড়া একটি বড় তলাও হয়ে তাতে জল পূর্ণ হয়ে যায়। ১৮৯৪ সালের ২৫শে আগষ্ট শনিবার রাত্রি ১২।৩০ সময় ৩২০ ফিট বাঁধ এক সঙ্গে ভেঙ্গে যায়, তলাওয়ের বাঁধটি ৯০০ ফিট উচ্চ ছিল। জলের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ২০ মাইল জোরে প্রবাহিত হতে থাকে। তখনই "তারের" সহায়তায় চারিদিকে খবর পাঠান হয়। রাত্রি ১টার সময় চামেলী, ১।১৯ সময় নন্দপ্রয়াগে, ২টায় কর্ণ প্রয়াগে, ২।৪৫ মিনিটে রুদ্রপ্রয়াগে, ৩।৫০ মিনিটে শ্রীনগরে, ৪।৪৫ মিনিটে দেবপ্রয়াগে বন্যার জল এসে পড়ে। রবিবার দিন সকালেই কিন্তু বিরহী তলাওটী শান্ত হয়ে যায়। এই প্লাবনে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় লোকজন না মরলেও কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি সব নাশ হয়ে হরিদ্বার পর্য্যন্ত হাহাকারে পরিণত হয়ে গেছিল। ২৬শে আগষ্ট প্রাতে দেখা গেল যে ১০,০০০,০০০,০০০ ঘন ফুট জল বের হয়ে গেছে।

বিরহী বা গোহনাবন্যা

* * *

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, বদরীনাথ ক্ষেত্র নন্দপ্রয়াগ হতে আরম্ভ হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ হতে যে পথটি ত্রিযুগী নারায়ণ দিয়ে কেদারনাথে গিয়েছে, পুরাকালে সে পথটি ছিল না। তাই যাত্রিগণ তখন

রুদ্রপ্রয়াগ হতে কর্ণপ্রয়াগ দিয়ে নন্দপ্রয়াগ আসতেন। নন্দপ্রয়াগে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে স্নান তর্পণাদি করতঃ এই চামেলী বা লালসাঙ্গায় আসতেন। পরে এই চামেলী হতে কেদারনাথ যেতেন। আবার যাঁরা রুদ্রপ্রয়াগ হতে কেদারনাথ যান, তাঁরা কেদারনাথ আদি তীর্থ পরিভ্রমণ করে এই চামেলী চটীতে আসেন। যাঁরা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সমুদয় ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করতে চান, তাঁরা কেদারনাথে পৌঁছে, তথাকার ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করে এই চামেলীতে আসবেন। পরে এখান হতে হরিদ্বারের দিকে সাড়ে সাত মাইল দূরস্থ নন্দপ্রয়াগে পৌঁছে, তথাকার শাস্ত্রীয় কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করতঃ ফিরে এই চামেলীতে আসবেন এবং এই চামেলী হতে ধীরে ধীরে তীর্থস্থান গুলিতে শাস্ত্রীয় কাজগুলি করে বদরীকাশ্রম যাবেন। আমরা এ সব বিষয় আগে জানতাম না, এখন ভ্রমণ কাহিনী লিখতে যেয়ে অনেক শাস্ত্রের সাহায্য লওয়ায় এ সব বিষয় জানতে পেরেছি। নন্দপ্রয়াগের মাহাত্ম্যাদি আমরা যখন বদরীনাথ হতে ফিরে নন্দপ্রয়াগে যাব, তখন পাঠকদের জানাব। এখন এই চামেলী হতে বদরীকাশ্রম পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ সব বিবরণ জানাচ্ছি। এই চামেলীও একটি তীর্থস্থান—শাস্ত্রে এরও মহাত্ম্য পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

আত্মসমর্পণ যোগ †

[সমালোচনা

এই রক্তমাংসের স্থূল দেহকেও কি করিয়া ভাগবত দেহে রূপান্তরিত করা যায়, প্রাকৃত মানব-জীবন কি করিয়া দেব-জীবনে উন্নীত হয়, গ্রন্থকার তাহারই অব্যর্থ সন্ধান দিয়াছেন——"আত্মসমর্পণ যোগে।" বাঙ্গালী সহজ সাধকের বৈশিষ্ট্য এইখানেই—তাঁহারা জীবনকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন নাই ;—এই দেহ মিথ্যা নয়, এই জগৎ মিথ্যা নয়, যদি এই দেহকে ভাগবত-দেহে রূপান্তরিত করা যায়, এই জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করা যায়। আশ্রয়-তত্ত্বই দেব-জীবন লাভের সুগম উপায়। আপন বলিতে যাহা কিছু আছে, সবকে সেই আশ্রয় তত্ত্বে সমর্পণ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরই জীবনে এক আশ্চর্য্য রূপান্তর আসে। প্রাকৃত-চেতনার উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে, এই অপ্রাকৃত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না। সমর্পণের পথে নিজকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করিয়া দিতে হয়, তবেই সেই রিক্ত আধারে ভাগবত-ভাবের পরিপূর্ণ উন্মেষ হয়। আত্ম-সমর্পণ যোগের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য !

সমর্পণে, মানব-জীবনে অলক্ষ্যে আশ্চর্য্য রূপান্তর আসে। এই সহজ আত্ম-সমর্পণ যোগের সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইলে—পূর্ণ আশ্রয়-তত্ত্বের সন্ধান লইতে হইবে। এই আশ্রয় তত্ত্ব-বস্তু আর কেহই নহে—

† শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, এম, এ। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস—৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বয়ং ভগবান্। নিজ জীবনে যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষভাবে অবতরণ করাইয়াছেন—সেই মানুষরূপী গুরু বা ভগবানই আশ্রয়-তত্ত্ব। মানুষ হইতে হইলে এই মানুষ-ভগবানেরই আশ্রয় লইতে হইবে। তাঁহার কাছে দীক্ষা লাভের পরই প্রকৃত জীবনের সূচনা হয়। আত্মসমর্পণের দীক্ষা সম্পূর্ণ হইলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া গ্রন্থকার সুন্দর কয়টি কথা বলিয়াছেন—"আত্ম-সমর্পণের দীক্ষা সম্পূর্ণ হইলে জীব দ্রষ্টা—কর্ত্তা হন ভগবান্। ইষ্টবস্তুই সাধক হইয়া অন্তর্য্যামীর আসন গ্রহণ করেন; কাজেই জীব ধীরে ধীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ চেষ্টাহীন স্থির অবস্থাই এই যোগের প্রাকৃত-অবস্থা—ইহার অন্যথা হইলে বুঝিতে হইবে, দীক্ষা ঠিক মত হয় নাই।"

দীক্ষা ভিন্ন জীবন কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। কথাটা অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সাময়িক অস্বীকার করলেও—পরিশেষে জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকেই আবার সেই পথকে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করিতে হয়। মান্ত্রী দীক্ষা হইতে, আত্মসমর্পণ যোগে—শাম্ভবী এবং শক্তি দীক্ষাই অধিক ফলপ্রদ এবং সহজে কার্য্যকরী হয়। গ্রন্থকার দীক্ষা-তত্ত্ব সম্বন্ধেও কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। "যোগ—বিনা দীক্ষায় আরম্ভ হয় না। সে দীক্ষার দক্ষিণা আত্মদান। উৎসর্গের বলিরূপেই সাধককে গুরু-রূপী নরদেবের চরণে আপনাকে লুটাইয়া দিতে হয়।"

গুরু শব্দ উত্থাপন করিলেই অনেকে কাণে আঙুল দেন। কেন না ইহা যে দাস-মনোবৃত্তির নিদর্শন! কিন্তু ইহাও নিঃসন্দিগ্ধ কথা যে, গুরু স্বীকার ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ সুদূর পরাহত। আত্মচেষ্টাকেই অনেকে চরম মনে করেন। অভিমান পূর্ণ আত্মচেষ্টায় পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"আত্মপ্রচেষ্টার জোরে সাধকের উর্দ্ধগতি এক নিমিষেই নীচে নামিয়া পড়িতে পারে। এ পতনের আর পুনরুত্থান নাই। সাধকের সাধ্য কি? উহা বুঝিলেই গুরুর অনিবার্য্য প্রয়োজন অনুভূত হইবে।"

আত্মসমর্পণের পথে—"অহং"ই হইল প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ বাধা। "অহং"এর সম্পূর্ণ নিরসনেই আত্ম-সমর্পণের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়। গ্রন্থকার এই জন্যই সাধককে লক্ষ্য করিয়া এই কথাটী বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—"সাধক যেখানে নিজকে কর্ত্তা মনে করে, সেখানেই সে গুরুশক্তিকে বা আশ্রয়-তত্ত্বকে দ্রুত কর্ম্ম-সাধনে বাধা দেয়।" গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াও যে অনেকের জীবনে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রধান কারণ তাহারা "অহং"এর বীজকে গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করিয়া চলে।

বাঙ্গালী চিরকাল রসের সাধক। ইষ্টকে নিছক তত্ত্বরূপে পাইয়াই তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে নাই, ইষ্টকে পাইতে চায় সে রস-ঘন-বিগ্রহ মূর্ত্ত-রূপে। এইজন্যই জ্ঞানের সাধনার চেয়ে, প্রেমের সাধনায়ই বাঙ্গালী বিশেষ ভাবে উন্মুখী। জ্ঞান থাকিলেই, জ্ঞানকে পরিপাক করিয়া প্রেমে তাহাকে পর্য্যবসিত না করা পর্য্যন্ত যেন তাহার তৃপ্তি আসে না কিছুতেই।

দেহের রূপান্তর চাই—শুদ্ধি চাই, তবেই এই দেহ দিয়া নিষ্কলুষ ভাবে তত্ত্ববস্তু আস্বাদন সম্ভবপর। এই প্রাকৃত দেহ, অপ্রাকৃত ভাব-দেহ দ্বারা আবিষ্ট-

অনুপ্রাণিত না হইলে, যে কোন মুহূর্ত্তে পতনের আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে। তাই গ্রন্থ-প্রণেতা বলিয়াছেন—"এ দেহের রূপান্তর যদি না হয়, মন যত উচ্চ ভূমিতে উঠাইয়া ধর, স্নায়ু ও শোণিতের আকর্ষণে তোমায় যে কোন মুহূর্ত্তে নীচে আছাড় দিয়া ফেলিতে পারে।" সম্পূর্ণ আত্মাহুতি দিয়া আত্ম-শুদ্ধি লাভ না করা পর্য্যন্ত সহজ সাধনায় অনেক সময় সাধকের মাঝে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়। ইহা অবিশুদ্ধ আধারেরই লক্ষণ। সাধকের নিজ দেহ-মন-প্রাণের উৎকর্ষের প্রতি সতত সচকিত দৃষ্টি থাকা চাই।

বাঙ্গালী সহজ-সাধক "আত্মসমর্পণ যোগ" পুস্তকখানা পড়িলে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবেন। মানব-জীবন গঠনের যে সহজ সঙ্কেত পুস্তকখানাতে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেরই পুস্তকখানা একবার পড়িয়া দেখা উচিত। সহজীয়া সাধনার এইরূপ সুন্দর—সরল বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সহজ-সাধনা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য—সেই বৈশিষ্ট্য কি, এই পুস্তকখানা পড়িলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।
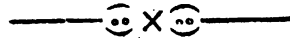
সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বিগত পৌষ মাস হইতে এতদিন যাবৎ কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি ৺পুরীধাম রওনা হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কিছুদিন তথায়ই অবস্থান করিবেন। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা—"নীলাচল কুটীর"—স্বর্গদ্বার—পুরী।

—):০:(—
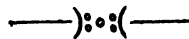
গ্রাহকগণের প্রতি

১৩৪০ সালের আর্য্য-দর্পণ

বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় আর্য্য-দর্পণের পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। শ্রীগুরুর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের আনুকূল্যে আমরা এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ দেশের ও বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আর্য্য-দর্পণ যে দিন দিন ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে, তাহা শ্রীভগবানেরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল। নব-বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

বর্ত্তমান বর্ষে যাঁহারা গ্রাহক ছিলেন, আগামী বর্ষেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিয়া—সনাতন ধর্ম্ম প্রচার ও সংরক্ষণে আমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে দৈব-দুর্ব্বিপাক বা অন্য কোন অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকা যাঁহাদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইবে, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন ১৫ই বৈশাখের মধ্যে নিষেধসূচক পত্র প্রেরণ করেন। আর যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন (নূতন অথবা পুরাতন গ্রাহক), তাঁহাদিগের পক্ষে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য বাবদ ২॥০ টাকা মণি-অর্ডার যোগে প্রেরণ করাই সুবিধা ও লাভজনক। নতুবা ভিঃ পিঃ তে পত্রিকা লইতে বিলম্ব হইবে এবং অনর্থক ৴১০ আনা খরচও বেশী পড়িবে। পুরাতন গ্রাহকগণ টাকা পাঠাইবার সময় মণি-অর্ডার কুপনে নিজ নিজ গ্রাহক নম্বর এবং নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটী লিখিতে যেন বিস্মৃত না হন। ১৫ই বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে গ্রাহকগণের নিকট যথারীতি ভিঃ পিঃ তে প্রেরিত হইবে। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন ঔদাসীন্য বশতঃ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না করেন।

বিগত ১৩৩৮ সনের আশ্বিন মাস হইতে আর্য্য-দর্পণের মুদ্রণ কার্য্য বগুড়ায় সম্পাদিত হইয়া আসাম সারস্বত মঠ হইতে ডাকযোগে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইয়া আসিতেছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই আমরা এতদিন গ্রাহকগণের নিকট সময় মত পত্রিকা প্রেরণ করিতে পারি নাই এবং তজ্জন্য নানারূপ অসুবিধারও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণ মানসে আগামী বর্ষ হইতে আমরা "আর্য্য-দর্পণ কার্য্যালয়" আসাম—সারস্বত মঠ হইতে বগুড়া—উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেই বরাবর ডাকযোগে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছি। আশা করি এই ব্যবস্থায় গ্রাহকগণ সময় মত পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ,—তাঁহারা যেন ১৩৪০ সনের পত্রিকার বার্ষিক মূল্য যথাসময়ে (আসাম—সারস্বত মঠের ঠিকানায় না পাঠাইয়া) নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন। অতঃপর "আর্য্য-দর্পণ" সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদের আদান প্রদান, কোন মাসের পত্রিকা সময়মত না পাইলে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহার অপ্রাপ্তি সংবাদপ্রেরণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"আর্য্য-দর্পণ"
উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, বগুড়া।
P. O. BOGRA, (BENGAL).

২৫শ বর্ষ | চৈত্র—১৩৩৯ | ২য় খণ্ড
সমষ্টি সং ২৭৫ | | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ধর্ম্মধর

(জেতবন—একুদ্দান থের)

ন তাবতা ধম্মধরো যাবতা বহু ভাসতি,
যো চ অপ্পম্পি সুত্বান ধম্মং কায়েন পস্সতি,
সবে ধম্মধরো হোতি যো ধম্মং নপ্পমজ্জতি ॥ ৪

—"যদি কেহ বহুবাক্য বলে, তদ্দ্বারা সে ধর্ম্মধর হয় না; কিন্তু যিনি অল্পমাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও, দেহ দ্বারা তাহা দর্শন করেন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মধর হন, ধর্ম্মে কখনো তাঁহার প্রমাদ হয় না।"

কেবল বাক্যাড়ম্বর নহে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া চিৎকার নহে, ধর্ম্মকে দেহ দিয়া, মন দিয়া, প্রাণ দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে—তবেই তুমি প্রকৃত

ধর্ম্মধর হইতে পারিবে। দেশে আজ এইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসী একদল ধর্ম্মধরেরই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম শুধু বাচনিক পরিভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

তোমাদিগকে প্রকৃত ধার্ম্মিকই হইতে হইবে। তোমাদের স্পর্শে, তোমাদের ছোঁয়াচে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকেও বিনা বাক্যব্যয়ে ধর্ম্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। ধর্ম্মধর পুরুষেরই অভাব—তাহা না হইলে ভারতের আকাশে-বাতাসে, স্থূলে-সূক্ষ্মে ধর্ম্মের সজীব প্রেরণা বর্ত্তমান রহিয়াছেই—চাই শুধু আধার।

কথা ছাড়িয়া, উত্তেজনা পরিহার করিয়া তোমাদিগকে আজ তপো-নিরত হইতে হইবে। ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার পথে দেহের-মনের যে জঞ্জাল রহিয়াছে, তপস্যার অগ্নিতে সেই জঞ্জালগুলিকেই ভস্মীভূত করিতে হইবে। এইজন্য চাই—অনির্ব্বাণ তপস্যার অগ্নি। তাহাতে মন-বুদ্ধি পুড়িয়া আবার নূতন রূপ ধারণ করিবে। শুধু মন দিয়া নয়, বুদ্ধি দিয়া নয়—দেহ দ্বারাও ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সেই দেহ স্থূলদেহ নয়—তপস্যার তাপে যে ভাগবত দেহ পাওয়া যায়—সেই দিব্য-দেহ।

দেশের আজ এই দুর্গতি কেন? —ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়াছে বলিয়া। সমাজে, দেশে আজ আর সেই ধর্ম্মধর পুরুষ নাই। ধর্ম্মকে জীবন দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এমন মানবেরই অভাব।

বেশী ভাব নয়, বেশী আলোচনারও প্রয়োজন নাই—দু'টী একটী ভাবকে অবলম্বন করিয়া, সেই ভাবে জীবন গঠন করিয়া তোল। উপদেশ আমি অনেককে অনেক রকমেরই দিয়াছি—কিন্তু সেই উপদেশ প্রতি-পালনের বজ্রদৃঢ় ইচ্ছা এবং বিশ্বাস কাহারও মাঝে জাগ্রত হয় নাই। এইজন্যই তোমাদের জীবনে আজ এত ব্যর্থ হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছি—জীবন গঠনের পক্ষে বিশ্বাসই একমাত্র অব্যর্থ উপাদান। গুরু কর্ণে মহাবাক্য শুনাইয়া দিলেন, কিন্তু সেই মহা-

বাক্য জীবনে প্রত্যক্ষ হইয়া না উঠিলে, সেই মহাবাক্যের মর্ম্ম তোমরা কি অবগত হইলে ?

বিচার নয়—যুক্তি নয়, ঝাঁপ দিতে হইবে। সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। যাহা ধরিবে, দৃঢ় পরাক্রম সহকারে তাহা সমাধা করিবে, শিথিল বা অলস ভাবে সম্পাদিত শ্রামণ্য. ধর্ম্ম অনিষ্টকেই আকীর্ণ করে শুধু। তোমাদের মাঝে যেন শৈথিল্যের ভাব প্রশ্রয় না পায়।

ধর্ম্ম মুখের কথা নয়—অনুভূতির বস্তু। এইজন্যই "স্বল্পমপি ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ভারতে আজ এই ধর্ম্মানুভূতিরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া, পণ্ডিত বলিয়া, ধর্ম্মধর বলিয়া নিজকে পরিচয় দেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ধর্ম্মকে জীবন্ত বিগ্রহরূপে নিজের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। উপলব্ধি না পাইলে—প্রাণে জোর আসে না। যাঁহারা মৌখিক ধার্ম্মিক, তাঁহাদের সেই প্রাণের বল, বজ্রদৃঢ় বিশ্বাস কোথায় ?

ধর্ম্ম—তোমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে; উপলব্ধি না পাওয়া পর্য্যন্ত আধার-শুদ্ধির দিকে সকল উদ্যম-চেষ্টা নিয়োজিত কর। আধার শুদ্ধ হইলে দেহ দ্বারাও ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। দেহ তখন আর জড়দেহ থাকে না —সাত্ত্বিক ভাবে তাহার প্রতি অণু-পরমাণু বদলাইয়া যায়।

উপলব্ধি আসে অনেক তপস্যার পর—দেহ-মনের বিন্দুমাত্র মালিন্য বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত সেই জীবন্ত অনুভূতির পরশ পাওয়া অসম্ভব। আমি চাই তোমরা দেহ দিয়া, মন দিয়া, প্রাণ দিয়া—তোমরা যে প্রকৃতই ধর্ম্মধর তাহার পরিচয় দাও। শাস্ত্রতত্ত্ব কে বেশী অধিগত করিয়াছে, তাহার দিকে মোটে আমার লক্ষ্য নাই, শাস্ত্র-তত্ত্বকে জীবনে কে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছ—সেই আমার পরম প্রিয়। এইজন্য যে লেখা-পড়াও জানে না, অথচ আমার এক একটী বাক্যকে বেদবাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া, জীবনে

সেই বাক্যের অর্থকে ফলাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাকেই আমি আমার অন্তরঙ্গ লোক বলিয়া জানি।

কাঁকিতে আর সব চলিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মলাভের বেলায় এতটুকু ফাঁকি থাকিলে চলিবে না। আজকাল সবাই চায় অনায়াসে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব অধিগত করিতে; ইহা কি কখনো সম্ভবপর? এইজন্যই দীর্ঘ সাধনার প্রতি স্বাভাবিকই একটা অধৈর্য্য—অসহিষ্ণুতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। আমার আদেশ-বাণীকেও বিনা বিচারে সশ্রদ্ধ ভাবে মানিয়া চলিবার বীর্য্য নাই কাহারো। ধর্ম্মলাভ কি শুধু মুখের কথায় হইবে?

উপদেশ দিতে দিতে আমি হয়রাণ হইয়া গিয়াছি—আর উপদেশ দিতে ভাল লাগে না, এখন চাই তোমাদের মাঝে দু'একটীও আমার বাক্যকে মহাবাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মধরের পরিচয় দাও। বেশী না, দুই একটী ভাবকে বাছাই করিয়া—সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধর, দেখিবে ধর্ম্ম তখন কত বড় বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে তোমাদের মাঝে। তোমরা ধর্ম্মধর হও—অপ্রমাদী হও—বর্ষশেষে আমার এই আশীর্ব্বাদ।

বিচিত্রা

আকুলতা ভাল, অতৃপ্তি ভাল,—তবু যেন তৌষ্টিকের মোহাচ্ছন্ন ভাবে অভিভূত করিয়া না ফেলে। চরম সত্য যে কি, তাহা দু'এক দিনের আরামের সাধনায় বুঝা সম্ভবপর নয়, এইজন্যই প্রাণে নিদারুণ সত্য পিপাসা লইয়া সত্যের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে হইবে। সত্যের পথে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও ভাল, তবু অসত্যকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার অনিবার্য্য লোভে যেন পাইয়া না বসে।

আমরা আরাম চাই, সুখ চাই, যশ চাই—সত্যকে চাই না। এইজন্যই আরামের ব্যাঘাত যেখানে ঘটিবে, সেখানে যাইতে আমাদের আতঙ্ক। সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিয়া আমাদের যে সত্যলাভ হয়, দু'দিন পর সেই সত্য আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। তবু মোহান্ধ মানব—এই সুলভ আপেক্ষিক সত্যকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেই ভালবাসে।

সত্যলাভ করিতে হইলে, নিজের বিবেক, বুদ্ধি, বিচারশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হইবে যাহারা বলে, তাহারাও ভ্রান্ত। যথার্থ সত্য-পিপাসা জাগিয়া থাকিলে, মন-বুদ্ধি, কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে বলিদানেরও কোন প্রয়োজন হয় না। বিচারশূন্য, বুদ্ধিশূন্য মানব সত্যের যে ধারণা করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধির মালিন্য আছে বলিয়াই—প্রাণশক্তি স্তিমিত বলিয়াই—সত্য সম্বন্ধে এক এক জনের অদ্ভুত ধারণা। পরস্পরে বিরোধ সৃষ্টি হয় সম্যক্ সত্যের অনবধারণেই।

—৬৭খ

হুজুগ কখনই শ্রেয়ঃ আনিতে পারে না। পরের কথায় যাহাদের উঠা-বসা, তাহাদের ভিতর মৌলিকত্ব জিনিষ আদৌ নাই। সুতরাং উঠিতে তাহাদের যতক্ষণ লাগে, অতলে তলাইয়া যাইতেও তেমনি অধিক সময় লাগে না। বিচারশূন্য মানবের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

অসাড়তায় সুখ-দুঃখ বোধকে কমাইয়া দেয়, অনেকে ইহাকেই চরম শান্তি বলিয়া মনে করিয়া বসে। তাহাদের বিচারশক্তির প্রাখর্য্য নাই, চিত্তের মাঝে নব-নব সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হইবার অভিলাষ নাই—সর্ব্বদাই তাহাদের "বেশ আছি"র ভাব লাগিয়া আছে। এই "বেশ আছি"র ভাব যে কতখানি জড়তার লক্ষণ, প্রচণ্ড আঘাতে জড়তা ভাঙ্গিয়া না গেলে তাহাদিগকে সেই কথা বুঝানোও এক দুরূহ ব্যাপার।

জ্ঞান পূর্ণ হইলেই, কর্ম্ম পূর্ণ মূর্ত্তি পাইবে। জ্ঞানের অভাবে মাতামাতিতে অনেক কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যাইতে দেখা যায়। আমাদের ধারণক্ষমতা অতীব অল্প—এইজন্যই ভাব জমিতে না জমিতেই ভাব বিলাইবার উন্মাদনায় আমাদিগকে পাইয়া বসে। পূর্ণ সত্যের জ্ঞান লাভ না করিয়া এই যে কর্ম্মের হুজুগ—তাহার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ হইয়া থাকে। কেবল হুজুগ আর মাতামাতি—কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই গভীর জ্ঞানের ভিত্তি নাই। দেশে আজ অনেক দিকেই কর্ম্মের সাড়া পড়িয়াছে—কিন্তু কর্ম্মের মূলে একটা গভীর জ্ঞানের প্রশান্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই কাজের সফলতার চেয়ে ব্যর্থতাই দেখা যাইতেছে বেশী।

দুঃখের ভিতর দিয়া, কষ্টের ভিতর দিয়া যে সত্য লাভ হয়, তাহাই স্থায়ী এবং কল্যাণজনক। নিজকে ফাঁকি দিয়া মানুষ যেখানে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে, দু'দিন পর লাভে-মূলে সবই তাহার বিনষ্ট হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। আমাকে কিছু করিতে হইবে না, অথচ আমার হইয়া আমাকে স্বর্গে তুলিয়া নেবেন একজন, এইরূপ বিশ্বাস যাহাদের—তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর নাই। দেশে আজ এইরূপ ভণ্ড আত্মসমর্পণকারীর দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই, আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রেও অসহনীয় গলদ দেখা যাইতেছে। মানুষ ফাঁকি দিয়া যে সত্যলাভ করে, সেই সত্যও তাহাকে ফাঁকি দিয়া অন্তর্ধান হয়।

মন-বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া না তুলিলে, বিরাট সত্যের ধারণা করিতে পারিবে মানুষ কেমন করিয়া? এইজন্যই শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা ক্ষেত্রকে সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। দেশে আজ যথার্থ শিক্ষারই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। মুনি-ঋষিদের যুগে আচার্য্য-শিষ্যের প্রতিদিনের আলোচনাতেই ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের অনায়াসে ফুটিয়া উঠিত। ব্রহ্ম সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে যেখানে একদিন আলোচনা হয় না, সেইখানে ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের কথা বলিলে মানুষ চমকিত হইয়া উঠিবে বৈ কি? ব্রহ্ম, আত্মা—এইসব বড় বড় কথা মুখে বলিলে কি হইবে? যদি তাঁহাদের সম্বন্ধে রাত-দিন আলোচনায়, ভিতরে একটা সুস্পষ্ট ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারা না যায়।

মানুষ যেখানে অসত্যকে অবলম্বন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, সেখানে বিপ্লব দ্বারা তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে বৈ কি? কেন না ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়াই যে তাহাদিগকে সত্যের পথে উন্নীত করা! একটু অশান্তি কিম্বা উপদ্রবের সৃষ্টি হইলে, তাহা অকল্যাণকর নয়। সত্যের দরুণ যাহাদের প্রাণে আকুলি-বিকুলি রহিয়াছে, তাহারা তৌষ্টিকদিগের চেয়ে শতগুণে প্রশংসার্হ।

আত্মজ্ঞান লাভ করাই হিন্দু দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের ভিতর এই জ্ঞানের আলোই জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। অনেক দিনের সংস্কারে বাধিবে বলিয়া কি তাহাদিগকে অসত্যের মাঝেই নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে? তিল তিল করিয়া যেমন তাহাদের অজ্ঞানের সংস্কারটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি তিল তিল করিয়াই আবার তাহাদিগকে জ্ঞানের সংস্কার অর্জ্জন করিবার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মজ্ঞানের চর্চ্চার অভাবে, বাজে বিষয়েই মানুষের মতি-গতি ধাবিত হইতেছে। মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি উপাখ্যানপূর্ণ গ্রন্থেও অদ্বৈত জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখন মূলেই আত্মজ্ঞানের চর্চ্চার অভাব ——সুতরাং সেই জ্ঞানের কথা গল্পে—উপদেশে বর্ত্তমান থাকিবে কেমন করিয়া?

জাতি-হিংসা, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব—এইসব দূর করিতে হইলে জন সাধারণের মাঝেও কি করিয়া আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, সেই উপদেশ প্রচার করিতে হইবে। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে মানুষের মাঝে কখনো এত বিরোধ, এত অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। ভেদের সৃষ্টি কাহাকে অবলম্বন করিয়া হইতেছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। মুখের কথায়, কিম্বা মৌখিক ভাব রক্ষায় কিছুতেই ভিতরের প্রতিহিংসা দূর হইতে পারে না। ভিতরে প্রতিহিংসার অগ্নি প্রজ্বালিত থাকিলে—লৌকিক সম্মিলন দু'দিন পরই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

যশের দরুণ নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জনের দরুণ নয়—সত্যের দরুণ একদল তপস্বীর প্রয়োজন,

যাবতীয় প্রলোভনকে যাহারা নির্ম্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইবে। নচিকেতার মত প্রাণে সেই অমিত-বিক্রম থাকা চাই—স্বয়ং যমরাজও আসিয়া যেন কোন প্রলোভন দেখাইয়া সত্য হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে।

প্রথম জীবনের সেই ত্যাগ বৈরাগ্য ক্রমশঃই মানুষের নিষ্প্রভ হইতে থাকে, এইজন্যই পরিণামে অনেকের ভিতর হইতে সত্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়া গিয়া, তাহার স্থলে "যে কোন রকমে একটা উপলক্ষ ধরিয়া দিন কাটাইলেই হইল"—এইরূপ মারাত্মক আত্মার অবনতিকারক দুর্ব্বল ভাব প্রশ্রয় পাইয়া বসে। ভিতর হইতে যাহাতে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আগুণ নির্ব্বাপিত না হয়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হয়। প্রতি দিন জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যের অনুকূলে জীবনকে কতখানি উন্নত করিতে পারিয়াছি—এই চিন্তায় নিবিষ্ট-তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে।

অনাদি গুরু ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নাই; নিজের আধারকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে, সেই আধারে ভগবৎ-ভাব ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। কি করিয়া ভিতরটাকে স্বচ্ছ পবিত্র করিয়া তুলা যায়, তাহারই উপায় আবিষ্কার করিতে হয়। চরম সত্যরূপী ভগবান দেশ-কালের অতীত, তিনি দেশ-কালের অধীন নন.।

ঘর-বাড়ী, আত্মীয় স্বজনের মায়া ছাড়িলেই মায়া পরিত্যাগ হইল না; অসত্যের মায়া কি মায়া নয়? সত্য হইতে মানুষকে বিচ্যুত করে যে ভাব, যে সঙ্গ, যে চিন্তা, তাহাদের সকলের প্রতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হইবে। জীবনের লক্ষ্যকে ধ্রুবতারার ন্যায় উজ্জ্বল রাখিতে হইবে সর্ব্বদা। চরম সত্যের সন্ধানী সকলে হইতে পারে না, সকলেই আপেক্ষিক সত্যের মোহিনী মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়ে। গীতাতে এইজন্যই বলা হইয়াছে—"সহস্রের মাঝে ক্বচিৎ একজন হয়ত তত্ত্বতঃ ভগবানকে জানিতে পারে।"

প্রাণকে নিরোধ করিয়া নয়, প্রাণকে নিষ্পেষিত করিয়া নয়—প্রাণের উপাসনায়ই অদ্বৈতকে লাভ করিতে হইবে। অনেক অদ্বৈতবাদী এই খানে মস্ত বড় ভুল করিয়া বসেন। তাঁহারা প্রথমেই চাহেন প্রাণটাকে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে। বৈদিক যুগের ঋষি প্রাণকে কখনো অস্বীকার করেন নাই।—এই প্রাণের উপাসনায় যাঁহারা ব্রহ্মকে লাভ করিতেন, তাঁহারাই ছিলেন যথার্থ ক্ষত্রিয়। উপনিষদের অধিকাংশ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিই ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ প্রাণের উপাসনায় ব্রহ্মকে—অদ্বৈতকে জানিয়াছিলেন। ক্ষাত্রোপসনা বলিতে—এই প্রাণের উপাসনাকেই বুঝায়। একদিন এই প্রাণের উপাসনারই জয় জয়কার ছিল। প্রাণকে নিরোধ করার কথা—সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনের উক্তি। সাংখ্য-পাতঞ্জল অনেক পরে সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদিক ঋষি প্রাণকে নিরোধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখেন নাই। এইজন্যই উপনিষদের ঋষি এক জায়গায় বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বলহীন কোন দিন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আত্মাকে লাভ করিতে হইলে ভিতরে প্রাণশক্তির জোর থাকা চাই। প্রাণহীন কোনদিন ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে না।

বেদান্তের মতবাদ ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে—ইহা খুবই সুলক্ষণ। দেশে প্রাণশক্তির স্ফুরণ হইবে—এই বেদান্তের আলোচনাতেই। নিজকে যাহারা কৃপাভিখারী ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবিতে পারে না—বৈদান্তিক তাহাদিগের এই দুর্ব্বলতাকে নির্ম্মম ভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন।

বেদান্ত সকলের ভিতরেই যে ব্রহ্মস্বরূপ রহিয়াছেন, তাহাই বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করেন। কাহাকেও বৈদান্তিক ছোট নজরে দেখেন না। সকলের প্রতিই এই যে মহান্ ভাব, ইহাতে বৈদান্তিকের উচ্চ প্রাণেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেক সাধ্য-সাধনা, তপস্যার পর সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সত্যলাভ এত সহজ নয়। গন্তব্য স্থলে না পৌঁছিয়াই আমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়ি, এইজন্যই যেখানে আমাদের ক্লান্তি আসে, সেই স্থলকেই আমরা সত্যের সীমানা বলিয়া নির্দ্দেশ দেই—কিন্তু আমাদের সীমানা অতিক্রম করিয়াও যে সত্য রহিয়াছেন। দেহ-মন-বুদ্ধি যাহাতে ক্লান্ত-অবসাদগ্রস্ত হইয়া না পড়ে, এইজন্য নিয়মিত সাধনা চাই। চরম সত্যের সম্মুখীন হইতে হইলে—বুদ্ধির অনেক খানি বৈশারদ্যের প্রয়োজন। নির্ম্মল-সূক্ষ্ম বুদ্ধিই সত্য অবধারণে সক্ষম।

তৃপ্তি এবং প্রাণের শান্তি এক কথা নয়। চরম সত্য লাভ না করিয়াও আমাদের তৌষ্টিকতা আসিতে পারে——কিন্তু এই তৌষ্টিকতা সত্য-লাভেচ্ছুর পক্ষে বড় বিঘ্ন। নানা প্রলোভনে আমরা মধ্য পথেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি—চরম সত্যের সন্ধান হয় ত অনেকের ভাগ্যেই মিলে না, অথচ সত্যের বড়াই করে তাহারাই।

দোল লীলা

রস ও প্রেমের মিলন—এই তো দোল লীলা। কেবল ব্যষ্টি আধারে নয়, সমস্ত জীবে জীবে অভূতপূর্ব্ব অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে—বসন্তোৎসব আজ নব পল্লবে, কুঞ্জে, বনে, প্রান্তরে—গৃহে সব জায়গায়। পথে-ঘাটে ছেলেরা রঙ্গিন আবির নিয়ে মত্ত—যাকে পথে দেখছে তাকেই রঞ্জিত করে দিচ্ছে। কোথায় গেল লজ্জা—আর কোথায়ই বা গেল মান-অপমানের ভয়! বেঁধে আর প্রাণকে কত দিন রাখা যায়? সঙ্কোচে থেকে আর কত দিন প্রাণ বাঁচে? মুক্তির আস্বাদন চাইই জীবনে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেই মুক্তির আহ্বান এসেছে। তোমাদের যা কিছু আছে, সব উজাড় করে তাঁকে বিলিয়ে দাও—তবেই তো তোমাদের জীবন তাঁর লীলা রসের পূর্ণ অভিব্যক্তির ক্ষেত্র হবে। প্রকৃতি দেবীর এত সাজ-সজ্জার বিন্যাস—এ সব কার দরুণ? এর মাঝে কি নিবেদনের গোপন ব্যাকুলতা নাই?

ভাব চির দিন বিবশা—তাই ভাবে আজ সমস্ত জগৎ মাতোয়ারা,—নিবেদনেই এ আত্মতৃপ্তি, তাই এত আকুলতা। রস আর ভাব, প্রকৃতি আর পুরুষ, আবহমান কাল ধরে তাঁদের লীলা চলে আসছে; তবে বিশেষ সময়কে উপলক্ষ করে লীলা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। কালের মাহাত্ম্যে ভাবও উন্মেষিত হয়ে ওঠে। বসন্ত ঋতুতেই

ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—তাই রসরাজ মদন-মোহনের সঙ্গে নিত্য সহচরী গোপীদের এ সময়েই পূর্ণ লীলা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল লীলা—রস আর রতির সম্মিলন একই কথা।

দোল পূজা মূল ভাবেরই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। অন্তরে যা অনুভূতিতে পাই, বাইরে রূপে-রসে তাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারলে—মন আরও আনন্দে নেচে ওঠে। রূপের লালসাও যে রয়েছে মনে, কিন্তু ভাবই খাঁটী। গোপাঙ্গনাগণ উন্মত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ফাগু নিয়ে খেলা করছে, পথে ঘাটে নর-নারী অবাধে আবির কুঙ্কুম নিয়ে সকলের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে, সবই ভিতরের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আসল লীলা কিন্তু চল্‌ছে অন্তরে অন্তরে।

সঙ্কোচ আর থাকে কেমন করে—এ যে সহজ আকর্ষণ! এ প্রীতি যে চিরন্তন! এ লীলার তো অবসান নেই—এ যে নিত্য লীলা। সমস্ত বাধা-সঙ্কোচ, যেখানে যত মনের বিষম প্যাঁচ সবই যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন কেমন করে বলি, আমি যাকে চাই এ তারই অব্যর্থ আকর্ষণ নয়? জোর করেও তো কেউ আজ পালিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না—পালিয়ে গিয়েও যে দেখি তাঁর কাছেই হাজির হয়েছি। গোপীরা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল—তাতে কি তাদের পতন হয়েছিল—না মর্ম্মে মর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের সত্তা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল?

দোল লীলার স্থান কোথায়? তোমার অন্তরে। ভক্ত তাই গেয়েছেন—

গিয়া দোল হে তথায় আমার মন দোলনায়
তুমি ভারী কেমন আজ বুঝ্‌ব হরি;
যদি মঞ্চ লয়ে পড়ে যেতে পার
আমার মন দোলনা ছিঁড়ি॥

—আমার মন দোলনাকে নিয়ে ছিঁড়ে পড়। মনের দোলনায় তুমি দুল্‌তে পার, কিন্তু আমার পক্ষে যে প্রাণান্ত। মন স্থির হলেই তো তোমাকে পান। আর বাস্তবিকও এ দোলনার শেষ না হলে ভগবান লাভও তো বিড়ম্বনা। চিত্ত দুলে ওঠুক কিন্তু তুমি দোলাও আর কেউ যেন না দোলায়। অনবরত আমরা দোল খাচ্ছিও আবার দোল দেখছিও, কিন্তু কৈ আজ দোল লীলা সন্দর্শনে যেমন আনন্দে শরীর উল্লসিত হয়ে উঠছে, দৈনন্দিন জীবনে তো সে অমৃতের এতটুকু আস্বাদনও পাই না। বুঝেছি দোল খাওয়া নয়—দোল দেখা, তাই তো এত আনন্দ—আর তোমার লীলা দেখে আনন্দ হবে না।

আর এ হচ্ছে অপ্রাকৃত লীলা—এতে তো প্রাকৃত আসক্তির নাম গন্ধও নেই। কোন কিছুর প্রত্যাশায় নয়—অনুরাগে ছুটেছে। সমস্ত প্রকৃতির মাঝে প্রতিদানের উন্মুখীনতা এসেছে, তাই আজ বিলিয়েই প্রকৃতি দেবীর এত আনন্দ। হুলি খেলার মাঝে অজস্র আনন্দের অপচয় হচ্ছে—কিন্তু কেউ কি বিমর্ষমনা হয়ে বসে আছে? মিলন চলে পূর্ণে পূর্ণে—রস-রতি কারও অপূর্ণতা নেই আজ। এই যে মিলন-লীলা, এর মাঝে অভাব পূরণের উগ্র আকাঙ্ক্ষা নেই—আছে পরিমল শান্তি। সমস্ত বিশ্ব আজ পরিপূর্ণ—কারও মাঝে অপূর্ণতার দৈন্য নেই, অভাবের তীব্র জ্বালা নেই, অথচ আকর্ষণ; এই তো লীলা! প্রয়োজন মিটিয়েও যে আনন্দ—এই তো লীলা! গাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফল ফুল দেখছি আর বল্‌ছি আঃ ভগবানের কি অপার লীলা, মহাশক্তির খেলা দেখছি আর বল্‌ছি ভগবানের কি লীলা—এই যে ক্ষুদ্রত্বের দারুণ পীড়ন থেকে অজস্র-অফুরন্ত আনন্দের আস্বাদন দিয়ে

জীবকে মুক্তি পথে উন্নীত করছেন—এ সবই তো তাঁর লীলা।

অতি মাত্রায় প্রাণের স্ফুরণ যেখানে, সেখানে মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। কিছু না কিছু দেওয়া চাইই তার—ফিরে কিছু পাব এ আশায় নয়। শুধু দেওয়ার মাঝেই যেন কি একটা অপরিসীম আনন্দ রয়েছে। গোপীরা তন্ময় হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, তারা কি অন্তরে কিছু পায় নি না চাওয়াতে তাদের হৃদয় ভরপূর হয়ে ওঠে নি? মৌনভাবে কি জগতে আদান-প্রদান চল্‌ছে না—অন্তরের নীরব ভাষা বলে কি কিছু নেই জগতে?

বিশেষ স্থানে, বিশেষ সময়ে যদি এ লীলা দর্শন করে সার্থক হতে চাও—বুঝব দুর্ভাগ্য তোমার। সর্ব্বত্রই যে দোল-লীলার মাধুরী অনুস্যূত। অশোক গাছের দিকে তাকাও, স্তবকে স্তবকে তাদের অনুরাগ রঞ্জিত হয়ে উঠেছে—নাগেশ্বর গাছকে তো আর গাছ বলেই মনে হয় না—সর্ব্বাঙ্গে যেন কে তাকে আবির লেপন করে দিয়েছে—যে কোন গাছের দিকেই তাকাও না কেন, লাল কচি কচি অনুরাগের কুঁড়িতে ভরে গিয়েছে দেখতে পাবে—তবু কি বল্‌তে চাও ওদের বাড়ী গিয়ে দোল লীলা দেখে আস্‌ব? আজ যদি সবের মাঝে মদনমোহনকে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে না দেখ, তবে যে লীলা দর্শন কিছুই হয় নি তোমার।

দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংঘর্ষের মাঝে এই যে অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত সার্ব্বভৌম রস সঞ্চার, একেই বলি তাঁর লীলা কিম্বা উৎসব। এক ঘেঁয়ে জীবন আর কত দিন ভাল লাগে? তাই তাঁর লীলা-প্রকাশেরও যেন একটা সঙ্গতি রয়েছে—পালাক্রমে তাদের আবির্ভাব হয়। শীতের প্রকোপে চিত্ত আপনি সঙ্কুচিত হয়ে আসে, তেমনি বসন্ত ঋতুর সমাগমে প্রসারিত হতে থাকে। এমনি করে আমাদের জীবনটা সুখ-দুঃখের অপরূপ লীলায় আবর্ত্তিত হয়ে চল্‌ছে। সবই লীলা বটে, তবে এক অবস্থায় প্রাণ জাগে, অন্য অবস্থায় স্তিমিত হয়ে আসে।

বাহ্যিক আড়ম্বর নিয়ে মাতামাতি করলে চল্‌বে না, শুধু একরাশি আবির এনে খুব ছড়াছড়ি করলে দোল-লীলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন হবে না, চাই অন্তরের অনুরাগ। অনুরাগ দিয়ে মদনমোহনকে আবৃত করে রাখ—হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা দূর হয়ে আজ সকলের চিত্ত অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠুক—একে বাজার থেকে ক্রয় করে আন্‌তে হবে না। তোমার—গোপীদের মতন ঐকান্তিক আবেগ থাক্‌লেই হল। তোমার সমস্ত শিরা উপশিরায় সেই অনুরাগের রাগ রঞ্জিত হতে থাকুক—আর আপন মনে সেই শ্রদ্ধার ফাগ প্রভুর চরণে সমর্পণ করতে থাকো, এর চেয়েও কি দোল-লীলায় শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্য রয়েছে?

বশিষ্ঠদেবের উপদেশ

বশিষ্ঠ উবাচ—

আর্য্য সঙ্গম যুক্ত্যাদৌ প্রজ্ঞাং বৃদ্ধিং নয়েদ্বলাৎ।
ততো মহাপুরুষতাং মহাপুরুষ লক্ষণৈঃ ॥ ১

—বশিষ্ঠদেব বলিলেন—"মুমুক্ষু ব্যক্তি সাধুসঙ্গ, সাধু জনের উপদেশ গ্রহণ ও সদাচার শিক্ষা দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিবে। অনন্তর মহাপুরুষের লক্ষণানুসারে স্বীয় মহাপুরুষত্ব সম্পাদন করিবে।"

প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিবার তিনটী উপায়—মহৎ সঙ্গ, মহতের উপদেশ গ্রহণ, এবং সেই উপদেশানুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করা।

মহতের সংস্পর্শে জীবনে স্বভাবতঃই আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্বোধন হয়। এইজন্যই প্রজ্ঞা বৃদ্ধির প্রথম উপায়ই হইল—সাধু সঙ্গ। সাধু মহাপুরুষদের সংস্পর্শে অনেকের জীবন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—এইরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধুসঙ্গের গুণ অতি মহান্।

মহাপুরুষদের জীবনকে আদর্শ ধরিয়া, তবে নিজের জীবনের উন্নতি-অবনতির বিচার করিতে হইবে। প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করাই জীবনের লক্ষ্য।

যো যো যেন গুণেনেহ পুরুষঃ প্রবিরাজতে।
শিক্ষেত তং তমেবাশু তস্মাদ্ বুদ্ধিং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ২

—সমগ্র মহাপুরুষ লক্ষণ হয়ত এক পুরুষে নাও বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সুতরাং যে পুরুষ, যে গুণের প্রভাবে সাধারণ হইতে উচ্চাসনে দেদীপ্যমান, সেই পুরুষের সেই গুণ শিক্ষা করিয়া, তদ্দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

আসল কথা হইল, জীবনের সম্পূর্ণ পরিণতি। এক মহাপুরুষের মাঝে হয়ত সকল গুণ নাও থাকিতে পারে, সুতরাং সেই মহাপুরুষের নিকট হইতে শিক্ষা স্বরূপ যাহা লাভ হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ, ইহার পর অন্য মহাপুরুষের অন্বেষণ করিতে হইবে। জীবনকে পূর্ণ করিতে হইলে, অনেকের কাছেই হয়ত শরণাপন্ন হইতে হইবে। প্রাণে যথার্থ সত্য পিপাসা থাকিলে, বহু গুণসম্পন্ন বহু গুরুর আশ্রয় নিলে তাহাতে ব্যভিচার হয় না। সকল গুণে আদর্শ মহাপুরুষ লাভ করা বড়ই দুর্ল্লভ। সুতরাং বিশিষ্ট মহাজনের নিকট হইতে বিশিষ্ট গুণটী আয়ত্ত করিয়া, তাহার পর অন্য বিশিষ্ট মহাপুরুষের আশ্রয় লইতে হইবে। প্রাণ যদি একজনের উপদেশে পরিতৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন ক্ষতির কারণ নাই। মোট কথা ভিতরে ভণ্ডামী না থাকিলে চরম সত্যের জন্য বহু মহাপুরুষের আশ্রয় লইলে, তাহাতে ক্ষতি না হইয়া বরঞ্চ ইষ্ট লাভই হইয়া থাকে।

মহাপুরুষতা হেষা শমাদি গুণশালিনী।
সম্যগ্ জ্ঞানং বিনা রাম সিদ্ধিমেতি ন কাঞ্চন ॥ ৩
জ্ঞানাচ্ছমাদয়ো যান্তি বৃদ্ধিং সৎপুরুষ ক্রমাঃ।
শ্লাঘনীয়াঃ ফলে নাস্তবৃষ্টেরিব নবাঙ্কুরাঃ ॥ ৪
শমাদিভ্যো গুণেভ্যশ্চ বর্দ্ধতে জ্ঞানমুত্তমম্।
অন্নাত্মকেভ্যো যজ্ঞেভ্যঃ শালিবৃষ্টি রিবোত্তমা ॥ ৫

—"হে রাম! শমদমাদি গুণ ও প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাই মহাপুরুষের লক্ষণ। সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে এই মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না। বর্ষণের পর যেমন নবাঙ্কুর উদ্গাম হয়, এবং ক্রমে সেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল সম্পদে প্রশস্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞান প্রভাবে শমদমাদি গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আন্তরিক ফল— আত্ম-সুখ উৎপাদন করতঃ শ্লাঘ্য হইয়া থাকে।

অন্নদ্বারা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে পর আবার অন্ন উৎপত্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি, এবং শমদমাদি গুণদ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

জ্ঞান এবং সদাচার পরস্পর সাপেক্ষ। এইজন্য ধর্ম্ম এবং নীতি উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অনাচারীর জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। আচারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার কথা এইজন্যই মুনি-ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। নিয়ম-সংযমের ভিতর দিয়াই যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শমদমাদি গুণ জ্ঞানলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। গুণাতীত অবস্থা আমাদের আদর্শ নয়, গুণের চরম উৎকর্ষ করাই আমাদের আদর্শ। জ্ঞানীর আচার-ব্যবহারে সর্ব্বত্র সংযমের ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাস্থিতির লক্ষণ জ্ঞানীর মাঝেই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে। শুধু নিয়ম-নিষ্ঠা-আচার লইয়া থাকিলেও চলিবে না— যদি পেছনে জ্ঞানের ভিত্তি না থাকে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, জ্ঞান এবং সদাচার উভয়ই বর্ত্তমান থাকা চাই। শুষ্ক জ্ঞান এবং জ্ঞানহীন আচার কোনটাতেই জীবনকে শ্রেয়ের পথে উন্নীত করে না। জ্ঞান না থাকিলে, নিছক আচার-নিয়ম প্রতিপালনে দিন দিন মানুষ অন্ধ এবং গোঁড়া হইয়াই উঠে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ তখনই উপস্থিত হয়, যখন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের ন্যায় জ্ঞানী লোকের অভাব হইয়া পড়ে। জ্ঞানের অভাবে মানুষ বাহ্যিক আচারটাকেই তখন আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসে। এইজন্যই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত বিরোধ।

গুণাঃ শমদমাদ্যা জ্ঞানাচ্ছমাদিভ্যস্তথাজ্ঞতা।
পরস্পরং বিবর্দ্ধন্তে তে অব্জসরসী ইব। ৬
জ্ঞানং সৎপুরুষাচারাজ্ঞ জ্ঞানাৎ সৎপুরুষক্রমঃ।
পরস্পরং গতৌ বৃদ্ধিং জ্ঞান সৎপুরুষক্রমৌ॥ ৭
শমদমাদি নিপুণ পুরুষার্থ ক্রমেণ চ।
অভ্যাসেৎ পুরুষো ধীমান্ জ্ঞান সৎপুরুষো ক্রমৌ॥ ৮
ন যাবৎ সমভ্যস্তৌ জ্ঞান সৎপুরুষ ক্রমৌ।
একোঽপি নৈতয়োস্তাত পুরুষস্তেহ সিধ্যতি॥ ৯

—"যেমন পদ্ম হইতে সরোবরের শ্রীবৃদ্ধি এবং সরোবর হইতে পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে শমদমাদির বৃদ্ধি এবং শমদমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। এই জ্ঞান ও সদাচার পরস্পর পরস্পরের বর্দ্ধক। শম-দম-প্রজ্ঞা প্রভৃতি গুণ দ্বারা সুনিপুণ মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ করিয়া মতিমান্ মুমুক্ষু জ্ঞান ও মহাপুরুষাচার অভ্যাস করিবে। হে বৎস! যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত এতদুভয়ের কোনটাই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।"

জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত হওয়া চাই। কোন এক বিষয়ে ত্রুটী থাকিলেও চলিবে না। জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ যিনি অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত আদর্শযোগ্য। জ্ঞান হইলেও সদাচারকে মহাপুরুষগণ অবহেলা করেন না —কেন না তাহা না হইলে ইতর জনকে উন্নত করা সম্ভবপর হয় না। গীতাতে আছে—"ইতর জনেরা মহাপুরুষদের আচারই অনুসরণ করিয়া থাকে।" তাঁহাদের আচারে ত্রুটী থাকিলে নিম্ন স্তরের মানবগণ উন্নত হইবে কেমন করিয়া?

জ্ঞান না থাকিলে শুধু আচার-নিষ্ঠ হইলেই চরম শান্তি লাভ হয় না। এইজন্যই জ্ঞান ও সদাচারকে যুগপৎ অভ্যস্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মহাপুরুষগণের সকল আচার জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুসরণ না করিলে, অনধিকারীর পক্ষে তাহা অকল্যাণজনকই হইয়া থাকে। আবার শুধু জ্ঞান দিয়াও কিছু হয় না, যদি তাহা আচার-আচরণে ফুটিয়া না ওঠে। এইজন্যই মহাপ্রভু - "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" এই উপদেশ

দিয়াছেন। জ্ঞানী পুরুষের আচার-আচরণ আদর্শ করিয়া সাধারণ জীব উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। মহাপুরুষগণই উন্নত আদর্শকে জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটাইয়া তুলেন। জীব শিক্ষা পায় তাঁহাদের নিকট হইতেই। জীব-শিক্ষার দরুণই তাঁহাদের আচার-আচরণের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়।

মূলে জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তি না থাকিলে, নিছক আচার প্রতিপালনে জীবের প্রাণ নিরস—শুষ্ক হইয়া যায়। আচারের মূলে জ্ঞান থাকিলে, আচার প্রতিপালনের ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়।

> যথা কলম রক্ষিণ্যা গীত্যা বিতততালয়া।
> খগোৎসাদেন সহিতং গীতানন্দঃ প্রসাধ্যতে॥ ১০
> জ্ঞান সৎপুরুষেহাভ্যামকর্ত্রা কর্ত্তৃরূপিণা।
> তথা পুংসা নিরিচ্ছেন সমমাসাদ্যতে পদম্॥ ১১

—"যেমন কলম ধান্য রক্ষিকা কৃষক কামিনী উচ্চ করতালি দিয়া গান করায়, কলমধান্য ভক্ষণার্থী বিহঙ্গমকুলের নিরাকরণ এবং সঙ্গীত প্রমোদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মুমুক্ষু পুরুষ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ ও বিষয় কামনা বর্জ্জন দ্বারা জ্ঞান ও সদাচার পদ যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

> সদাচারক্রমঃ প্রোক্তো ময়ৈবং রঘুনন্দন।
> তথোপদিশ্যতে সম্যগেবং জ্ঞান ক্রমোঽধুনা॥ ১২
> ইদং যশস্যমায়ুষ্যং পুরুষার্থ ফলপ্রদম্।
> তজ্জ্ঞাদাপ্তাচ্চ সচ্ছাস্ত্রং শ্রোতব্যং কিল ধীমতা॥ ১৩
> শ্রুত্বা ত্বং বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যাদ্ বলাদ্ যাস্যসি তৎপদম্।
> যথা কতক সংশ্লেষাৎ প্রসাদং কলুষং পয়ঃ॥ ১৪
> বিদিতবেদ্যমিদং হি মনো মুনের্বিবশমেব হি যাতি পরং পদং।
> যদববুদ্ধমপণ্ডিতমুত্তমং তদববোধবশান্ন জহাতি হি॥ ১৫

—"হে রঘুনন্দন! আমি সদাচার ক্রম তোমাকে উপদেশ দিলাম। এক্ষণে উত্তর প্রকরণে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিব। এই যশস্কর, আয়ুষ্কর, মোক্ষপ্রদ সৎশাস্ত্র, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট মতিমান মুমুক্ষু শ্রবণ করিবে। তুমি এক্ষণে ইহা শ্রবণ করিয়া পরম পদ প্রাপ্তি হেতু মানসিক নির্ম্মলতা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে। সাধন প্রভাবে মননশীল মুমুক্ষুর অন্তঃকরণ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, নিজের কোন প্রেরণা না থাকিলেও পরম পদে প্রবিষ্ট হয়। শুধু যে প্রবিষ্ট হয় তাহা নহে, তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞানাদি নিরাকরণ পূর্ব্বক যে পরম পদ প্রকাশিত হইয়াছে—অন্তঃকরণ কিছুতেই আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।"

———×———
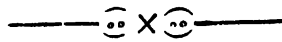
গীতা এত ভাল লাগে কেন?

গীতার মাঝে জীবনের একটা পরিপূর্ণ সুষ্ঠু আদর্শ পাই বলিয়াই গীতাকে এত ভাল লাগে, গীতার এত সমাদর লোক সমাজে—এক কথায় ইহাই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর।

—৬৮৭

জীবনের স্বাস্থ্যপূর্ণ পরিণতি আনিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, যে সব সাধনা অবলম্বন করা অতীব প্রয়োজন, গীতার মাঝে সে সব কথারই ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত দেওয়া আছে। সত্যলাভেচ্ছু

সাধক গীতা হইতে নিজ জীবনের লক্ষ্যের অনুকূল যে কোন একটী আদর্শ অবলম্বনেই পরম গন্তব্য স্থানে অনায়াসে উপনীত হইতে পারেন।

জীবনটা আমাদের চিরকালই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই চলে এবং চলিবে; এই দ্বন্দ্বের ভিতরও কি করিয়া সাম্য বুদ্ধি সম্যক্ বজায় রাখিয়া সানন্দ চিত্তে জাগতিক কর্ম্ম সম্পাদন করা যায়—গীতার বক্তা তাহারই স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাই দেখি শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট স্মরণেরও উপদেশ দিয়াছেন। "যুদ্ধ কর—এবং আমাকেও মনে রেখো"—এক কথায় গীতার সার মর্ম্ম ইহাই।

পঞ্চদশীকারের সঙ্গে গীতার বেশ সুন্দর একটা মিল দেখা যায়। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ আর পঞ্চদশীর তত্ত্বজ্ঞানীতে কোন পার্থক্য নাই। জাগতিক কর্ম্ম ব্যাপারকে অব্যাহত রাখিয়াও তাঁহাদের উভয়েরই জ্ঞান অপ্রতিহত। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নয়—কর্ম্মের ভিতর দিয়াও কি করিয়া জ্ঞানকে পূর্ণোজ্জ্বল রাখা যায়—গীতাকার বারংবার তাহারই উপদেশে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

গীতা পড়িয়া সকলেরই প্রাণ শীতল হয়, কেন না গীতার মাঝে সকলকে তৃপ্তি দিবার উপকরণই রহিয়াছে। নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে, ভাব অনুসারে, গীতার কত টীকা, কত ভাষ্য হইল—কিন্তু গীতা সকল ভাষ্যকারকেই, সকল ভাবুককেই সমভাবে আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন—এবং ভবিষ্যতেও গীতা সকলকেই সমান আনন্দ বিতরণ করিবেন।

কাহাকেও আঘাত না করিয়া, নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের পথ রক্ষা করিয়াও—সকলকে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করিবার অমন সহজ উপায় আর কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই গীতার ভাষ্যকারের সম্প্রদায় থাকিলেও—গীতাকারের কোন সম্প্রদায় নাই। তিনি সকল মানবের সকল দ্বন্দ্বের সমাহার স্বরূপ। গীতার এই সার্ব্বভৌম আদর্শে শুধু প্রাচ্য কেন, পাশ্চাত্যের মনীষীগণও আজ মুগ্ধ-বিস্মিত।

গীতাকারের জীবনের আদর্শ, দ্বন্দ্ব এবং উপলব্ধির কথা গীতার প্রত্যেকটী বাণীতে মিশিয়া রহিয়াছে। এইজন্যই সেই মহাভাগবত মহামানবের জীবন্ত আদর্শে আমাদের প্রাণকে অমন করিয়া উল্লসিত-উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। গীতা পড়িয়া দেখি, তাহাতে আমাদেরই নিত্যিকার দ্বন্দ্বের কথা, তাহার সমাধানের সহজ সরল উপায়ের কথাই সুন্দর সুনিপুণ ভাষায় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

গীতার উপদেশ অসাধ্যকর কিম্বা অলৌকিক নয়। মানুষের অকৃত্রিম চেষ্টা থাকিলে, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে—এই সাধারণ মানুষও কি করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব বলিয়া যে বিশেষ দুর্ল্লভ বস্তুটী রহিয়াছে, তাহা লাভ করিতে পারে—গীতায় তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় মানুষ যে কোন অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, সেই জায়গা হইতেও যে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে চলিতে পারে এবং তীব্র ইচ্ছা থাকিলে পারিবেই—ইহা জোরের সহিতই বলা হইয়াছে। সুতরাং গীতার মাঝে ধ্বংসের নয়, সমন্বয়ের কথাই বলা হইয়াছে। কাহারও সহিত কাহারও বিরোধের সূত্রপাত না করিয়া—কি করিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় এবং তাহার **মূলসূত্রগুলি** কি, গীতাকার তাহা স্পষ্ট করিয়াই লোক লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন। সুতরাং গীতাকে যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহারা বিশ্ব-মৈত্রীর ভাবেই বিশেষ করিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িবেন; সেখানে বিশেষ আচারের কথা, বিশেষ সাধনার কথা, বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা মনেই জাগরিত হইবে না।

গীতা পাঠ করিতে করিতে নিজের জীবনে যে দিন পূর্ণ সাম্যভাব আসিবে—সেই দিনই বুঝিতে হইবে, গীতার বাণী এতদিনে অস্থি-মজ্জায় মিশিয়াছে—এবং সেই উদার ভাব আসিবার কারণও একমাত্র তাহাই।

মানবের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে অন্ধভাবে এবং গোঁড়ামীর দৃষ্টিতে চাপিয়া রাখা কিম্বা একেবারে স্বীকারই না করিয়া বসা—এইরূপ একদেশদর্শিতা গীতার মাঝে কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণ মানবের এতটুকু দুঃখেও গীতাকার যেন বিচলিত—তাই তাহারও প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান এবং তাহার সঙ্কেত বলিয়া দিতে গীতাকারের মাঝে এত উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা দেখিতে পাই। মানুষের মাঝে পাশবিক বৃত্তি রহিয়াছে, কিন্তু সেই বৃত্তিগুলিকে ভগবদভিমুখী করিয়া দিয়া কিরূপে সাত্বিক-সংযত আনন্দে মানুষের জীবন ক্রমে ক্রমে অনাবিল শান্তিতে নিমগ্ন হইতে পারে—গীতাকার সেই উপায়ই বলিয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে গীতাকে উৎকৃষ্ট কাব্য এবং সাহিত্যও বলা যাইতে পারে। গীতার মাঝে সকলেরই প্রাণের খোরাক রহিয়াছে। ভক্ত যেমন গীতাতে আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত, তেমনি জ্ঞানী, যোগী, প্রেমিক, উদাসীন। এক কথায় বলিতে গেলে গীতা পড়িয়া কেহই বিফল মনোরথ হয় না, কিছু না কিছু লাভ সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তীব্র পিপাসা লইয়া যাঁহারা সত্যের সন্ধানী, তাঁহারা একমাত্র গীতার মাঝেই সত্যের উজ্জ্বলময় পথ দেখিতে পান। সেই পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা আবার দেখিতে পান, এই গীতাকে অবলম্বন করিয়াই আরও কত যাত্রী, কত পথে একই সত্যের দ্বারে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন।

মানবের জীবনের ঐশ্বর্য্যই অধিক—দৈন্য তাহার তুলনায় খুবই কম, এইজন্যই দৈন্যকে—দুর্ব্বলতাকে গীতাকার বড় একটা ভ্রূক্ষেপই করেন নাই। তিনি দেখিতে পাইয়াছেন মানুষের অকৃত্রিম ইচ্ছা থাকিলে, ভগবানের প্রতি আন্তরিক টান থাকিলে সাময়িক দৌর্ব্বল্যকে মানুষ অনায়াসে জয় করিতে পারে—ইহা কিছুতেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই-জন্যই দুর্ব্বলতাকে তিনি বারংবার চাবুক মারিয়া গিয়াছেন। মানুষের মাঝে এমন একটা দিক আছে, যেদিকে জোর দিলে আর অন্য সব গলদ আপনি দূরীভূত হইয়া যায়। গীতার মাঝে অন্ধকারের চেয়ে—আলোকের সন্ধানই পাই বেশী। গীতা পড়িতে পড়িতে ভিতরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তি-গুলির উন্মেষ হইতে থাকে।

গীতা অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার, গীতাতে অজস্র ব্যঞ্জনা রহিয়াছে; তাই গীতা পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি আসে না, গীতা কোন দিন পুরাতন হয় না। এক এক দিন এক এক অধ্যায়ের নব নব অর্থ প্রতি-ভাসিত হইয়া উঠে। গীতার কথা এখনো মানুষ বুঝিয়া শেষ করিতে পারে নাই—কোন দিন পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। তাই গীতা সম্বন্ধে ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনী এখনো অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে। এখনো মানুষ গীতার অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডারের অবধি পায় নাই। গীতা সম্বন্ধে বক্তব্য বোধ হয় কোন দিন শেষ হইবে না—গীতার মাঝে অমন অফুরন্ত ব্যঞ্জনা-শক্তি রহিয়াছে।

গীতার বিশেষত্বই হইল—গীতা অলৌকিক সাধন রহস্যেই পরিপূর্ণ নয়। সাধারণ মানুষও গীতার উপদেশ প্রতিপালন করিয়া মনুষ্যত্বের চরম শিখরে উন্নীত হইতে পারে। গীতার সাধনা অসাধ্য নয়; একটু ইচ্ছা থাকিলে, সংযম শক্তি থাকিলে, ভগবানের প্রতি ভালবাসা থাকিলে—গীতার সাধনা

কত সহজ বলিয়াই মনে হয়। গীতার শেষ কথা সমর্পণের কথা। সমর্পণ যথাযথ ভাবে করিতে পারিলে—ভগবানই জীবের আধারে নামিয়া সাধন করেন। জীব তখন যন্ত্র মাত্র——যন্ত্রীর আসন ভগবানই অধিকার করিয়া বসেন। ইহা অপেক্ষা সহজ সাধন-পন্থা আর কি থাকিতে পারে? ইহাতে কোন কৃচ্ছ্র নিয়ম নাই, কঠোরতা নাই—শুধু ভাল-মন্দ সব কিছু তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। এই সমর্পণের সাধনায় মানুষের কোন কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। জ্ঞানী জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া যে বস্তু লাভ করিবে, ভক্ত ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও সেই বস্তুই লাভ করিবে। সুতরাং লাভের বেলায় কোথায়ও ন্যূনতা ঘটিবে না।

সব চেয়ে বড় কথা গীতার এই অভয় বাণী—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" এক-জনের জীবনের ভার অন্যে অমন করিয়া বহন করিবার ক্ষমতা আর কোথায়ও দেখি না। গীতা-কারের এই আশ্বাস বাণীতে সকলের প্রাণই সমভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। জীবনে ভাল-মন্দ যাহা করিয়াছি, তাহার ফল ভুগিতে হইবে না—আমার হইয়া আমার বেদনা অন্য একজন ভোগ করিবেন—ইহার চেয়ে বড় মুক্তির কথা আর কি থাকিতে পারে? এতখানি আশ্বাস আর কোন্ গ্রন্থকার দিতে পারিয়াছেন? গীতার সব কথা বাদ দিলেও—এই কথাটীর বিশেষত্ব সকলকেই মুগ্ধ না করিয়া পারিবে না। জীবনের দায় হইতে অমন সহজ ভাবে মুক্তির উপায় আর কি হইতে পারে?

পাণ্ডিত্য জ্ঞান না থাকিলেও, কিছু না বুঝিয়া গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিলে, অজ্ঞানীর হৃদয়েও একদিন গীতার বাণীর অর্থ স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া উঠে। গীতার ইহা আর একটী বিশেষত্ব। এমন অনেকের কথা জানি, যাঁহাদের আদৌ সংস্কৃত জ্ঞান নাই, অথচ গীতার কি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই না করিতে পারেন তাঁহারা। এইজন্যই বলিয়াছি, গীতা শুধু পণ্ডিতের সামগ্রী নয়—গীতা জ্ঞানী-অজ্ঞানী—এক কথায় সাধকের হৃৎপিণ্ড! ভাষা না বুঝিলেও গীতার বাণী সাধকমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। এইজন্যই নিরক্ষরের মুখেও গীতার মর্ম্মরহস্য শুনিয়া মুগ্ধ—বিস্মিত হইয়া যাই।

সকলের বোধগম্য অথচ সহজ-সরল ভাষায় সাধন-রহস্য ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে——এরূপ আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। সর্ব্ববিদ্ ভগবান ছাড়া—এরূপ সমন্বয়ের বাণী আর কে শুনাইতে পারেন? আর কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থ না পড়িলেও, একমাত্র গীতা অধ্যয়ন করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। সংক্ষিপ্ত ভাবে সকল সাধন পথেরই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে গীতাতে; নিজের ভাব বুঝিয়া যে কোন সাধন-পদ্ধতি অবলম্বনেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এ জন্মে না হোক্, পরজন্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবেই—সাধনা কোন দিন ব্যর্থ হয় না।

গীতাতে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, ভক্ত-অভক্ত, সাধু-অসাধু সকলেরই উন্নত হইবার পথ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতাকার কাহাকেও ঘৃণা বা উপেক্ষা করেন নাই। সাধনা'র নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চস্তর পর্য্যন্ত সকল রকম সাধনারই সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মরহস্য ব্যক্ত করা হইয়াছে গীতাতে গীতা পড়িয়া ভাল লাগে এইজন্য। আমি যেমন গীতা পড়িয়া আনন্দ পাই, তেমনি আমার সঙ্গে যাঁর মতানৈক্য, তিনিও গীতা পড়িয়া আনন্দ পান। গীতার মাহাত্ম্য এইখানেই। বিরোধ আমাদের মতে—গীতাতে নয়।

——×——

ব্যাকরণের সাধনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তন্ত্র বলিতে প্রথমতঃ কেবল প্রসিদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্রকেই বুঝায় না, প্রাচীন কাল হইতে "তন্ত্র" শব্দ বিভিন্ন শাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সকল শাস্ত্রে প্রবীণতার জন্য ষড়দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রকে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলা হইত। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র সকলও তন্ত্র নামে অভিহিত হইত। কুমারিল ভট্টের একখানি মীমাংসা গ্রন্থের নাম "তন্ত্রবার্ত্তিক"। কৌলাচার্য্যগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তন্ত্র শাস্ত্রের ভিত্তিও শাশ্বত বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য কৌল বিদ্যাকে বেদাত্মক বলা হইয়াছে।

তস্মাদ্বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকং প্রিয়ে।
(কুলার্ণব ২।৮৫)

হারীত বচন উদ্ধৃত করিয়া মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুই প্রকার শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন।

যদাহ হারীতঃ—শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকীচ।
(মনু ২।১ শ্লোকের কুল্লুক টীকা)

বোধ হয় একদিকে তন্ত্রশাস্ত্রে বেদের বৈধ হিংসা ও উপনিষদের 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ', 'ব্রহ্মাহমস্মি' ও জীব ও আত্মার ঐক্য স্থাপন দেখিয়া এবং অপর দিকে অথর্ব্ব বেদে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত আভিচারিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রশক্তির কথা আছে বলিয়া তন্ত্রেরও স্মৃতি আখ্যা হইয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্রও বেদমূলক ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট বেদ সকল বিদ্যার মূল স্বরূপ। বেদের উপর তাঁহাদের এমন অগাধ শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁহারা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল শাস্ত্রকেই বেদ হইতে সংগৃহীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রও তন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইত এবং কোন কোন ব্যাকরণ আজও তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ (কাতন্ত্র)। কেবল নামে নয়, তন্ত্রোক্ত সাধনার সহিতও ব্যাকরণের শব্দব্রহ্মোপসনার বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

স্বয়ং যোগেশ্বর শিব তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান বক্তা। তাঁহার মুখ হইতে আগত বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে সাধারণত আগম বলা হইয়া থাকে।

বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকাইব॥
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥
(কুলার্ণব ১১।৮৯)

কথিত আছে, সর্ব্বাগম বিশারদ মহাদেব যোগতত্ত্বোপদেশচ্ছলে পার্ব্বতীর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু তন্ত্রোক্ত কৌলাচার ও চক্রাদি সাধন পদ্ধতি গুপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেজন্য মোক্ষোপদেশাত্মক উপনিষদ্ বিদ্যার ন্যায় শাম্ভবী বিদ্যাও রহস্য বিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মনুসংহিতায় ২।১৪০ শ্লোকের সরহস্যম্ কথার ব্যাখ্যায় কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন—

রহস্যমুপনিষৎ। সাম্নাং বা সরহস্যানাম্।
(মনু ১১।২৬২)

কুলার্ণব তন্ত্রকে বলা হইয়াছে 'মহারহস্য'। ত্রিপুরাখ্য তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থের নাম ত্রিপুরা রহস্য। এরূপ অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থেরও রহস্যান্ত নাম দেখা যায়। পাণিনি ব্যাকরণের উপজীব্য সূত্রগুলিও শিবমুখাগত বলিয়া শিবসূত্র নামে পরিচিত। শব্দব্রহ্ম বা বাগ্দেবতার সহিত সাযুজ্য

(মুক্তি) লাভ করাই বৈয়াকরণের শব্দ চর্চ্চার চরম ফল বা পরম পুরুষার্থ। সত্যদেবাঃস্তামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ (মহাভাষ্য ১।১।১) এবং 'প্রাহু র্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্য মিষ্যতে।' (বাক্যপদীয় ১।১৫২) বৈয়াকরণের বাগ্ব্রহ্ম ও উপনিষদের উদ্গীথাক্ষর (উৎ—প্রাণ, গীঃ—বাক্, অ—অন্ন—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১৩৬) একই পদার্থ, উভয়ের উপাসনা পদ্ধতিও এক। সুতরাং উপাসনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এক অর্থে শব্দ তত্ত্বালোচনাকে রহস্য বিদ্যা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, দর্ভ পবিত্র পাণি আচার্য্য পাণিনি বিশুদ্ধ স্থানে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করতঃ ব্যাকরণের সূত্রসকল অতিশয় যত্নের সহিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এমন পরিশুদ্ধ ভাবে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন যে, তাহার এক বর্ণও নিরর্থক হইতে পারে না। "প্রামাণ ভূত আচার্য্যো দর্ভ পবিত্র পাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা যত্নেন সূত্রং প্রণয়তিস্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্।" (মহাভাষ্য ১।১।৩) ঋষিরা বলিয়াছিলেন, যিনি শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার শব্দবাচ্য সকল পদার্থের জ্ঞানলাভ হয়। (স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য কামচারো ভবতি—ছান্দোগ্য ৭।২) উপনিষদের এই বাগুপাসনার কথাগুলি শুনিয়া মনে হয় যে, পতঞ্জলি প্রভৃতির ন্যায় যে সকল শাব্দিকগণ শব্দ-ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, তাঁহারাও শব্দজ্ঞানবলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই জানিতে পারিতেন। ইহাই সাধনার রাজ্যে 'দিব্যদৃষ্টি লাভ বা সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্তি'।

শব্দের সাধুত্ব নির্ব্বাচনের উপায় বলিয়া এক দিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রকে মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ যেমন স্মৃতি আখ্যা দিয়াছেন, তেমন অপর দিকে শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন, প্রণব হইতে জগতের উৎপত্তি ও শব্দ-ব্রহ্মবাদ স্থাপন করার জন্য ব্যাকরণকে তন্ত্র সংজ্ঞায়ও অভিহিত করিয়াছেন। ঋকৃতন্ত্র ব্যাকরণ নামে একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ (প্রাতিশাখ্য) আছে। ইহা শাকটায়ন বিরচিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। পাণিনির সূত্রাত্মক অষ্টাধ্যায়ীর নাম ব্যাকরণ তন্ত্র। ভর্তৃহরি ব্যাকরণ শাস্ত্রের লক্ষণকে বলিয়াছেন তন্ত্র (তন্ত্রোপায়াদি লক্ষণঃ) এবং ইহাকে পুণ্যরাজ বলিয়াছেন তন্ত্র ন্যায়। ভর্তৃহরির "সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাম্" এই কথার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার পুণ্যরাজ কাত্যায়ন প্রণীত বার্ত্তিক সূত্রগুলিকে অনুতন্ত্র বলিয়াছেন।

সূত্রাণাং সানুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাং চ প্রণেতৃভিঃ।
(বাক্যপদীয় ১।২৩)

কলাপ ব্যাকরণেরও এক নাম 'কাতন্ত্র'। পাণিনি ব্যাকরণের তুলনায় আয়তনে ক্ষুদ্র এবং বিষয়-বিচারে তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয় সর্ব্ববর্ম্ম প্রণীত ব্যাকরণের কাতন্ত্র সংজ্ঞা হইয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যে পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরাচ" (মণ্ডুকোপনিষৎ ১।১)। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ব্যাকরণকে উত্তর বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ব্যাকরণং নামেয় মুত্তরাবিদ্যা।" (মহাভাষ্য—পা ১।২।৩২) বিদ্যা সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া (পবিত্রং সর্ব্ব বিদ্যানাম্) ভর্তৃহরি ব্যাকরণ বিদ্যাকে অধিবিদ্যা বলিয়াছেন। তন্ত্র মতে পরা, অপরা ও উত্তরা সকল বিদ্যাই চিচ্ছক্তিরূপা মহাবিদ্যার নামান্তর মাত্র। মহাবিদ্যা, বিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, উপবিদ্যা এই সকল এক মহাশক্তির অংশ, কলা বা বিভিন্ন রূপে স্ফূর্ত্তি। দেবীমাহাত্ম্যেও সকল বিদ্যাকে পরাবিদ্যার রূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ॥

শব্দ-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে আমরা তন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত ব্যাকরণের উপাসনামূলক সিদ্ধান্তের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। বৈয়াকরণগণের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুষ্টয়ী বাক্‌ও তন্ত্রোক্ত পরাবিদ্যার বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তে চিন্ময়ী পরাবাক্‌ই গুণাতীত পরব্রহ্ম শব্দ বাচ্য ও পশ্যন্তী বাক্ হইল বেদ-প্রসূতি প্রণব। ইহাই সকল শব্দের জনয়িত্রী ও ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্ম। প্রণব বিশ্ব প্রপঞ্চের মূল কারণ এবং তাহা হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা ভর্ত্তৃহরি শ্রদ্ধার সহিত প্রচার করিয়াছেন।

বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গ নিবন্ধনাঃ।
বিদ্যা ভেদাঃ প্রতীয়ন্তে জ্ঞান সংস্কার হেতবঃ॥
(বাক্যপদীয় ১।১০)

প্রণব সকল শব্দার্থের চরমা প্রকৃতি।

"স হি সর্ব্ব শব্দার্থপ্রকৃতিঃ।" (পুণ্যরাজ) এই ব্যাকরণ সিদ্ধান্তের সহিত বর্ণাত্মক মন্ত্রশক্তিবাদী তান্ত্রিকগণের কোনও বিরোধ নাই বরং ইহা তাঁহাদের স্বমতের যথেষ্ট অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। ভর্ত্তৃহরি শিল্পকলা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাকেই শব্দে উপনিবদ্ধ দেখিয়া বাঙ্ময়ী বলিয়াছেন। সা সর্ব্ব বিদ্যা শিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী (বাক্যপদীয় ১।১২৬)। বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতত্ত্বে সন্নিবিষ্ট বলিয়া সকল বিদ্যাই বাগধিষ্ঠানা। স্থাবর জঙ্গমস্য প্রবৃত্তয়ঃ বিদ্যাদয়শ্চ বাগ্‌রূপায়াং বুদ্ধৌনিবদ্ধাঃ (পুণ্যরাজ বাক্যপদীয় ১।১২৭)। কেহ কেহ বাগ্‌ব্যবহার শব্দোচ্চারণকেই আভ্যন্তর চৈতন্যের প্রত্যক্ষ স্পন্দন বা স্ফুরণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথাঃ—

বাগুপাত্তমেব চিতিক্রিয়ারূপমিতোকে।
(পুণ্যরাজ—বাক্য ১।১২৮)

ভর্ত্তৃহরি বাক্ 'প্রত্যবমর্শিনী' বলিয়াছেন (বাক্যপদীয় ১।১২৫)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাগ্‌ব্যবহার দ্বারা সবিকল্পক জ্ঞান সম্পাদিত হইয়া থাকে, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, শব্দ ব্যবহার ভিন্ন কোন জ্ঞান হইতে পারে না এবং সকল প্রকার জ্ঞানই সূক্ষ্মভাবে শব্দে উপনিবদ্ধ আছে। (বাক্যপদীয় ১।১২৪)

মানুষের যাবতীয় লৌকিক প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতা শব্দকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। তন্ত্র বলেন—প্রতি মাতৃকা বর্ণের বা অক্ষরের উচ্চারণের সময় মূলাধার স্থিতা চিচ্ছক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার উচ্চারিত শব্দকে অনাহত ধ্বনির নাহ্য প্রকাশ বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইভাবে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও শব্দ ব্যবহারের মূলে বৈয়াকরণগণ বাগ্দেবতা বা চৈতন্যের সত্তা অনুভব করিয়া প্রণব বা শব্দকেই (বাক্) পরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "আম্নাতা সর্ব্ববিদ্যাসু বাগেব প্রকৃতিঃপরা" (পুণ্যরাজ ধৃত শ্লোক—বাক্যপদীয় ১।১২৮)।

শব্দই জগতের মূল। শ্রুতিতে—প্রজাপতি ভূঃ এই শব্দ বাচক উচ্চারণ পূর্ব্বক পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যথা:—

স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভুবমুদসৃজৎ—(তৈ ব্রাহ্মণ ২।২।৪।২)

এই শ্রুতি বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ভর্ত্তৃহরি "ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত" এই কথা বলিয়াছেন। শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য বাক্যপদীয়ের প্রথম শ্লোকেই ভর্ত্তৃহরি শব্দতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চকে শব্দবিবর্ত্ত বলিয়াছেন। "অনাদি নিধানং ব্রহ্ম শব্দ তত্ত্বংযদক্ষরং। বিবর্ত্ততেহর্থ ভাবেন প্রক্রিয়া জগতোযতঃ।" (বাক্যপদীয় ১।১) বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তু

জগৎ সূক্ষ্মভাবে শব্দে (বাচক শব্দে) অধিষ্ঠিত।
"সর্ব্বা অপ্যর্থ জাতঃ সূক্ষ্মরূপেণ শব্দাধিষ্ঠানাঃ।"

(পুণ্যরাজ)।

বাক্য বাচকরূপে তন্ত্রোক্ত মহাশক্তি বা ব্যাকরণের সত্তা বা মহা সামান্য মায়িক উপাধি বশতঃ বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া প্রতিবিম্ববৎ আমাদের সামান্য বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ভর্ত্তৃহরি অন্যত্র পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্বসৃষ্টির উপযোগিনী শক্তি শব্দেই অধিষ্ঠিত আছে।

শব্দেষেবাশ্রিতাঃ শক্তি র্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী। (বাক্য ১।১১৯)

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব্বভূতের অন্তরালে বিরাজমানা এই মহাশক্তিকে শৈবাগমে বলা হইয়াছে 'পরা সংবিৎ'। এই মহাশক্তি বা মহাসত্তা নিখিল পদার্থের ভিতর দিয়া বিভিন্নাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে। আকাশ যেমন এক এবং অখণ্ড হইলেও ঘটাকাশ ও পটাকাশরূপে অবিচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তেমন স্বয়ং অভিন্ন হইলেও সম্বন্ধী বস্তুর ভেদবশতঃ মহাসত্তাও আমাদের নিকট ভেদবিশিষ্ট বলিয়াই সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এই মহাসত্তাই সকল শব্দের বাচ্য বা অভিধেয়। প্রাতিপদিকার্থ ধাত্বর্থ ত্বতলাদি প্রত্যয়ার্থ বলিতে বৈয়াকরণগণ এই সর্ব্বব্যাপিকা সর্ব্বাত্মকরূপা নিত্যা চিন্ময়ী মহাসত্তাকেই বুঝিয়া থাকেন—

সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বেশব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥
তাং প্রাতিপদিকার্থং চ ধাত্বর্থং চ প্রচক্ষতে।
সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহু স্ত্বতলাদয়ঃ॥

(বাক্যপদীয় ৩।৩৪)

—ক্রমশঃ

পুরুষ ও প্রকৃতি

প্রকৃতির যত কিছু আয়োজন উদ্যোগ, সবই পরের প্রয়োজনে উৎসর্গীকৃত। এই পরকেই সাংখ্য বলিয়াছেন "পুরুষ"। পুরুষের মনস্তুষ্টির দরুণই—প্রকৃতির এই নিয়ত ক্রিয়াশীলতা। প্রকৃতি কিছুতেই উদাসীন পুরুষকে তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, এইজন্যই প্রকৃতির প্রাণে এক অফুরন্ত ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। প্রকৃতি দেহ-মন প্রাণ সব উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, পুরুষের তৃপ্তির দরুণ। এই যে স্বার্থত্যাগ, পুরুষ মুগ্ধ-বিস্মিত হইয়াছেন প্রকৃতির এই অসাধারণ আত্মদানের মহিমাতেই। পুরুষ নির্ব্বিকার উদাসীন না হইলে—প্রকৃতিও কিছুতেই তাঁহাকে এত শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করিতেন না। প্রকৃতি পুরুষের এই অচল-অটল স্থৈর্য্য দ্বারাই বিমুগ্ধ। এত আয়োজন সম্ভার লইয়াও প্রকৃতি পুরুষকে তাঁহার আসন হইতে টলাইতে পারিতেছেন না—এইজন্যই তো পুরুষের পায়ে প্রকৃতি চিরকাল মাথা নত করিয়া আছেন। প্রকৃতির এই আত্ম-বিসর্জ্জনের শক্তি, পুরুষের সর্ব্বাবস্থায়

নির্ব্বিকার ভাব—উভয়ই দুরধিগম্য। কেহই কাহারও তুলনায় ছোট কিম্বা বড় নয়।

এইজন্যই গীতাকার প্রকৃতি-পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও শক্তি বা মহিমার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতি পুরুষের স্থৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ, আর পুরুষ প্রকৃতির অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ।

সাংখ্য প্রকৃতিকে জড় আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এই জড়া প্রকৃতি পুরুষের সেবার দরুণ চৈতন্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছেন। পুরুষের অদৃশ্য শক্তিতেই—প্রকৃতির ভিতর এত শক্তির স্ফুরণ হইতেছে। পুরুষের অধ্যক্ষতায়ই প্রকৃতি এই চরাচর সৃজন করিয়াছেন।

প্রকৃতির যাহা কিছু, সব পরকে লক্ষ্য করিয়া—নিজের বলিতে তাঁহার কিছু নাই, তাঁহার দেহ-মন-বুদ্ধি সবই পুরুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত। প্রকৃতির বিশেষত্ব এই খানেই—নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার আশ্চর্য্য। কি করিয়া পুরুষের মনস্তুষ্টি হয়, তাঁহার যাবতীয় কর্ম্ম প্রচেষ্টার মূলে এই একই প্রেরণা বিদ্যমান।

প্রকৃতি নিত্য নূতন ভাবে পুরুষের সম্মুখে নিজকে উপস্থাপিত করিতেছেন, কিন্তু অচল-অটল পুরুষকে তাহাতে সম্যক তৃপ্তি দান করিতে পারিতেছেন না। এইজন্যই প্রকৃতি চিরচঞ্চলা। কিছুতেই তাঁহার মাঝে স্থৈর্য্য আসিতেছে না। পুরুষের অদৃশ্য পরিশুদ্ধ ভোগাকাঙ্ক্ষাই প্রকৃতির মাঝে উপাদান সংগ্রহের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। পুরুষের ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে প্রকৃতিই। প্রকৃতির সর্ব্বস্ব দানেই পুরুষের পরম পুরুষার্থ। পুরুষ তো নির্গুণ—এইজন্যই তো প্রকৃতি তাঁহার প্রতি অমন আকৃষ্ট! ভোগলোলুপ পুরুষের প্রতি প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা রহিয়াছে—ভোগী পুরুষকে প্রকৃতি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারেন না। নির্গুণ পুরুষের অচঞ্চল অবস্থাই প্রকৃতিকে বেশী করিয়া মুগ্ধ করে। শ্রীকৃষ্ণ রাস-মণ্ডলে নিজকে অচল-অটল রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সেই আত্মারামের দরুণ গোপীগণ অমন আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রকৃতি উদাসীন নির্গুণ পুরুষকেই ভালবাসেন বেশী।—পুরুষের মাঝে এত বড় স্থৈর্য্যের ভাব রহিয়াছে দেখিতে পাইয়াই প্রকৃতি মুগ্ধ-বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। নির্গুণ পুরুষের মাঝে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র **নাই** বলিয়াই—প্রকৃতি নিঃসঙ্কোচে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্রাকৃত জগতেও দেখি কামুক পুরুষের কাছে—স্ত্রীলোক কখনো নিঃসঙ্কোচে যাইতে পারে না। পুরুষের ভোগ-তৃষ্ণাই প্রকৃতির মাঝে সঙ্কোচের ভাব জাগাইয়া তুলে। কিন্তু নির্গুণ পুরুষের ভোগ-লালসা নাই—এইজন্যই নির্গুণ পুরুষের কাছে প্রকৃতির কোন সঙ্কোচ থাকে না।

এত ভোগের মাঝে পড়িয়াও পুরুষ বিচলিত হন না দেখিয়া প্রকৃতি আশ্চর্য্য-স্তম্ভিত হইয়া যায়। এইরূপ পুরুষের কাছে নিজকে বিলাইয়া দিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? পুরুষ কিছু চাহেন না বলিয়াই, প্রকৃতির মাঝে এই আকুলতা দেখা দিয়াছে। পুরুষ যে কি চায়, প্রকৃতি প্রথমে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এইজন্যই স্থূল-ভোগ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম কত প্রকারের ভোগের প্রলোভনই না প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখে অর্ঘ্য প্রদান করে, কিন্তু তাহাতেও পুরুষের মন উঠে না। এইরূপ ভাবে ক্রম--সাধনার পর প্রকৃতির মাঝে যখন বিশুদ্ধ ভাবের উন্মেষ হয়, তখনই পুরুষের বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার তাৎপর্য্য প্রকৃতির মাঝে ফুটিয়া উঠে। তখন প্রকৃতির চাঞ্চল্য কমিয়া

আসে—পুরুষের অভিমুখী ভাবে তখন প্রকৃতি তন্ময় হইয়া যায়। প্রকৃতির মাঝে তখনই সমাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রকৃতি অন্তর্ম্মুখী না হইলে—পুরুষকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বাহিরের উপকরণ দিয়া পুরুষের মন জোগাইতে গিয়া প্রকৃতি যতই ব্যর্থ হয়, ততই তাঁহার মাঝে অন্তর্নিবিষ্ট হইবার ভাব ফুটিয়া উঠে। পুরুষ বা আত্মা চাহেন—প্রকৃতি আত্মনিষ্ঠই হইয়া থাকুক, কিন্তু প্রকৃতির মাঝে যে আবার সৃষ্টির বীজ উপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং সৃষ্টির অবসান না হইলে, প্রকৃতির ভিতর সাম্যের ভাব আসিতে পারে না। তবে প্রকৃতি বিশুদ্ধা হইলে তখন সৃষ্টির মোড় প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃত জগতের দিকে ফিরিয়া যায়। তখনও সৃষ্টি চলে, কিন্তু সেই সৃষ্টি পুরুষেরই অভিপ্রেত। পুরুষ আনন্দ পায়, প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ-সৃষ্টির লীলা দেখিয়াই। প্রকৃতি যখন অনেক তপস্যার পর এই কথাটা বুঝে, তখন তাঁহার মাঝে পার্ব্বতীর ন্যায় স্বভাবতঃই নিজের রূপ-যৌবনের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব আসিয়া পড়ে। মহাদেবকে পার্ব্বতী নিজের রূপ দিয়া ভুলাইতে গিয়াছিলেন—কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল তাঁহাকে। বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর রূপ-যৌবনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে পার্ব্বতীর—তিনি তখন তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে লাভ করিবার দরুণ যত্নপর হইয়া পড়েন।

নিজের মাঝে যখন বিন্দুমাত্র ভোগ লালসা থাকে না, তখনই বাস্তবিক প্রকৃতি পুরুষের যথার্থ সেবাধিকারিণী হইতে পারেন। পার্ব্বতীর তপস্যার ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য! ভোগ লইয়া সেবা হইতে পারে না। গোপীরা নিজেদের দেহ-সুখ, মান, লজ্জা-ভয় সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাধিকারিণী হইতে পারিয়াছিলেন। আত্মপ্রীতি কামনা—ইহাই হইল কাম, আর পরের প্রীতির কামনা ইহাই প্রেম। পুরুষ প্রকৃতির কাছে এই বিশুদ্ধ প্রেমেরই ভিখারী। প্রকৃতিও পুরুষের কাছে প্রতিদানে এই প্রেমই লাভ করিতে চায়।

কামনার শেষ আছে, দাহ আছে, নির্ব্বাণ আছে, অবসাদ আছে—কিন্তু প্রেমের অবসাদ নাই, নির্ব্বাণ নাই, শেষ নাই। প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি লীলা এই বিশুদ্ধ প্রেমের মাঝেই বর্ত্তমান। প্রাকৃত জগতের ভালবাসা তো দু'দিনের অভিনয় মাত্র। অপ্রাকৃত জগতের ভালবাসার যে শেষ নাই! সেখানে প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ই অনাদি। সমাধি অবলম্বন না করিলে এই প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

প্রকৃতি পরিণামিনী রূপেই সত্য, পুরুষ কূটস্থ-রূপে সত্য। প্রকৃতির পরিণাম রুদ্ধ হইবে না কোন দিন—তবে এই পরিণামের স্রোত বিপরীত হইয়া যায়, যখন প্রকৃতি নিজের মাঝে পুরুষের বিশুদ্ধ ইচ্ছার সঙ্কেত ধরিতে পারেন। ইহাই হইল প্রকৃতির ঊর্দ্ধমুখী পরিণাম।

প্রকৃত ভালবাসায় দেহজ্ঞান লোপ পাইয়া যাইবে—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া সর্ব্বদা মহা ভাবেই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। মহা ভাবে অধিরূঢ় হইলে কি আর তখন দেহ জ্ঞান, প্রাকৃত জগৎ জ্ঞান থাকিতে পারে? প্রকৃতি-পুরুষের মাঝে যখন এই দেহ-নিরপেক্ষ ভালবাসা জন্মে—তখন তাহাই আদর্শ ভালবাসায় পরিণত হয়। অনেক তপস্যার পর এই অপ্রাকৃত ভালবাসার সন্ধান মিলে। প্রকৃতি-পুরুষ উভয়কে তাহার জন্য তপস্যা করিতে হয়।

স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে মিলন, সে মিলনে শান্তি নাই। প্রকৃতি অচল-অটল পুরুষকে শ্রদ্ধা করে কেন, না পুরুষ তাহার স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া। প্রকৃতিও যদি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিতা থাকেন, পুরুষও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইয়া পারেন না। কেহই কাহারও আসনে অবস্থিত নয় বলিয়া প্রাকৃত জগতের নর-নারী পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সে শ্রদ্ধার ভাব নাই।

"যেমন নর্ত্তকী দর্শক পুরুষকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্তা হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া নিবৃত্তা হন।" প্রকাশের বেদনাতেই প্রকৃতি চঞ্চলা। পুরুষের কাছে নিজকে কিছুতেই মনের মতন করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই—প্রকৃতির সাজ-সজ্জার আর শেষ হইতেছে না কিছুতেই। নির্ব্বিকার পুরুষের অভিলাষ চঞ্চলা প্রকৃতি কিছুতেই ধরিতে পারেন না। যখন পুরুষের অভিপ্রায় প্রকৃতি বুঝিতে পারেন, তখন আর প্রকৃতির মাঝে চাঞ্চল্য থাকে না। প্রকৃতি তখন সমাধিস্থা। কিন্তু পুরুষের নিগূঢ় ইচ্ছা বুঝিবার পূর্ব্বে, প্রকৃতির অনেক ব্যর্থ আয়োজন-আড়ম্বর করিতে হয়। অনেক কিছু সৃষ্টির পর—প্রকৃতি যখন নিস্তরঙ্গা হন, তখন সেই সমাধিস্থ পুরুষের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন।

পুরুষ প্রকৃতির সেবার ক্ষমতা দেখিয়া বিমুগ্ধ না হইয়া পারেন না। প্রকৃতির সেবাতে পুরুষ আত্মহারা—বিমুগ্ধ। ভিতরে কতখানি শক্তি থাকিলে যে মানুষ দিবা-রাত্র পরের মনোরঞ্জনের দরুণ নিজকে অমন ভাবে তিল তিল করিয়া উৎসর্গ করিতে পারে, তাহা আর বলিবার নয়। প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান করিতে গিয়াই মহাদেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্যই বলিয়াছিলাম, পুরুষকে বুঝিতে গিয়া যেমন প্রকৃতিকে সমাধি অবলম্বন করিতে হয়, তেমনি প্রকৃতিকে বুঝিতে হইলেও পুরুষকে সমাধি যোগ অবলম্বন করিতে হয়। পুরুষ-প্রকৃতি উভয়েরই রহস্যের সীমা নাই।

পুরুষকে ভোগের ভিতর দিয়াই প্রকৃতি অপবর্গের অভিমুখী করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। পুরুষের যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে—হইতেছে, প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দিতেছেন। প্রকৃতির মাঝে অফুরন্ত শক্তি না থাকিলে, অক্লান্ত ভাবে পুরুষের সেবা করিতে পারিতেন প্রকৃতি কেমন করিয়া?

পরের প্রয়োজনে যিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে পারেন—তিনি তাহার দেহ-মন-বুদ্ধি সকলেরই দ্রষ্টা। পুরুষের দরুণ প্রকৃতি সর্ব্বস্ব দান করিয়াও যে এত আনন্দ পান, তাহার একমাত্র কারণ—প্রকৃতি তখন দ্রষ্টার আসন অধিকার করেন। পরের প্রয়োজন সিদ্ধিই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, তিনি সহজেই নিজকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন। প্রকৃতির মাঝে এইজন্যই দেহের সংস্কার প্রবল নয়—নিজকে ভুলিয়া থাকিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা রহিয়াছে প্রকৃতির। রাত দিন তিনি পুরুষের চিন্তাতেই তন্ময়। এই ভাব-তন্ময়তার মাঝে প্রকৃতির নিজের বলিয়া কোন কিছুর জ্ঞান থাকে না।

পুরুষের ইচ্ছা বা কামনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার দরুণ প্রকৃতি তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রস্তুত। ভাব-জগৎ হইতে প্রাকৃত-জগতেও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই। প্রকৃতি আত্মদানে কুণ্ঠিতা হইলে—নির্গুণ পুরুষকে আমরা কিছুতেই ধরিতে পারিতাম না। দৈবী-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই নির্গুণ পুরুষেরও অবতরণ হয়। যোগ্য

আধার না পাইলে অবতরণ সম্ভবপর হইত না কিছুতেই।

আত্মদানেই প্রকৃতির সার্থকতা। সুতরাং আজকাল যে নারীদের মাঝে পৌরুষ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছে——ইহা ঠিক ঠিক নারী-প্রকৃতির সুস্থ লক্ষণ নয়। প্রকৃতির মাঝে একটা প্রতিহিংসার ভাব যেন জাগিয়া উঠিয়াছে—পৌরুষ ভাবের আধিক্য দেখা যাইতেছে এইজন্যই। প্রতি-হিংসা জাগিবার একমাত্র কারণ—ভোগলোলুপতা। অথচ এই ভোগলোলুপতা কিন্তু কাহারও প্রাণের অভিপ্রায় নহে। নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝে সংযমের অভাব দেখা দিয়াছে বলিয়াই——পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ের মাঝে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারিতেছে না। আত্মস্থ পুরুষের কাছে আত্মদান করিতে পারিলে প্রকৃতি নিজকে সার্থক বলিয়াই মনে করেন।

প্রকৃতি-পুরুষ উভয়েরই তপস্যার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। উভয়েরই প্রকৃতিস্থ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কাম থাকিলে মিলন হইতে পারে না। দৈবী প্রকৃতিতে কামগন্ধ নাই। বৈষ্ণবদের ভাষায় বলিতে গেলে দৈবী-প্রকৃতিকেই রাধা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অন্য সব গোপীদের মাঝে কিছু না কিছু কাম ছিলই—এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আনন্দ পান নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ প্রেমের ভিখারী ছিলেন—গোপীদের মাঝে একমাত্র রাধাই সেই প্রেমস্বরূপা, এইজন্যই রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ এত আকৃষ্ট ছিলেন।

রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একমাত্র কামজয়ী পুরুষ, আর শ্রীরাধিকা ছিলেন গোপীদের মাঝে কাম-জয়ী নারী। আর সকলের ভিতরই কিছু না কিছু কামের লেশ ছিল। এইজন্যই অন্য সব গোপীদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কামনা পূরণ হইত না। বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপা শ্রীরাধিকার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকাম সার্থক হইত। চৈতন্য চরিতামৃতে যথা—

> ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
> তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥
> সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাস-লীলা।
> রাস-লীলা বাঞ্ছাতে এক রাধিকা শৃঙ্খলা॥
> তাহা বিনু রাস-লীলা নাহি ভায় চিতে।
> মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
> ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
> বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হইয়া॥
> শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
> ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

—শেষোক্ত দুইটী ছত্র অতীব নিগূঢ় অর্থ দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণের কামনা শতকোটী গোপীতেও পরিতৃপ্ত হয় নাই—একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের কামনা নির্ব্বা-পিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে কি প্রাকৃত ভোগের কথা মনে জাগে? শতকোটী গোপীতেও যাঁহার কাম নির্ব্বাপণ হয় নাই—একমাত্র শ্রীরাধিকা কাম নির্ব্বাপণ করিলেন কেমন করিয়া? ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে। সকলের ভিতরই কিছু না কিছু কাম ছিল—কিন্তু শ্রীরাধিকার চিত্ত সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ছিল। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ কামজয় পূর্ব্বক লীলা করিয়াছিলেন—সুতরাং সেই কামজয়ী পুরুষের সঙ্গে কামজয়ী নারী ছাড়া আর কাহার মিলন হইতে পারে? রাসমণ্ডলে একমাত্র রাধা ছাড়া আর কেহই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় যোগ্য অধিকারিণী ছিলেন না। রাধা-কৃষ্ণের মিলনই—প্রকৃতি-পুরুষের আদর্শ বিশুদ্ধ মিলন। এই মিলনে কাম ভস্মীভূত।

যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাম নির্ব্বাপণ হয়, সেই প্রকৃতিই নির্গুণ পুরুষের বাঞ্ছনীয়। পুরুষ এই বিশুদ্ধা প্রকৃতিকেই চাহেন। তেমনি যে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টির উত্তেজনা নির্ব্বাপিত হয়, সেই পুরুষকেই প্রকৃতি বাঞ্ছা করেন। সৃষ্টির কামনা

অব্যাহত রাখিয়া প্রকৃতি কিছুতেই আত্মস্থ পুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারেন না। পুরুষকে পাইতে হইলে——প্রকৃতির নিম্নাভিমুখী পরিণামকে রুদ্ধ করিতেই হইবে। আত্মনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া নিম্ন পরিণাম রুদ্ধ করিবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পুরুষ প্রকৃতির আশ্রয় চায়, কাম নির্ব্বাপণের দরুণই। কিন্তু অবিশুদ্ধা প্রকৃতি পুরুষকে নিবৃত্তির পথে না লইয়া গিয়া কামনা-বৃদ্ধির পথেই নিয়া চলে। এইজন্যই ভোগে এত অসন্তুষ্টি দেখা যায়—কেন না ভোগ করা পুরুষের অভিপ্রায় নহে—ভোগের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে নির্ব্বাপিত হয়—এইজন্যই প্রকৃতির শরণাপন্ন হওয়া।

প্রকৃতি পুরুষের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ অভিপ্রায় যতদিন বুঝিতে না পারে, ততদিনই জড়া। কিন্তু পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে তখন আর তাহার মাঝে নিশ্চেষ্ট ভাব থাকে না। প্রকৃতির প্রাণে তখন নব নব আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। অপরের প্রীত্যর্থে প্রকৃতি তখন উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। তথাহি চৈতন্য চরিতামৃতে—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহ প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ॥

প্রকৃতির মাঝে যখন বিশুদ্ধ সেবার ভাব জাগিয়া উঠে—তখন নিজ দেহের প্রতি উপেক্ষার ভাব চলিয়া যায়। ইষ্টপ্রীতির দরুণ তখ। দেহের প্রতি যত্নপরা হন প্রকৃতি। নিঃস্বার্থ ভাবে পুরুষের মনস্তুষ্টির দরুণ প্রকৃতি তখন আয়োজন করেন। এই আয়োজনে যা ভোগে প্রকৃতি নিজে সাক্ষী স্বরূপ। শিবকে যেমন নির্গুণ পুরুষ বলা হইয়া থাকে, তেমনি শ্রীরাধিকাও নির্গুণা; উভয়েই দ্রষ্টা—সাক্ষী।

চঞ্চলা প্রকৃতি কোন দিন পুরুষকে তৃপ্তিদান করিতে পারে না। সমাধিস্থা প্রকৃতিই নির্গুণ পুরুষের যথার্থ সেবাধিকারিণী। কামনা লইয়া সেবা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পার্ব্বতী হরের কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। তপস্যার পর সকল বাসনা-কামনা যখন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তখনই পার্ব্বতী মহাদেবের প্রিয়-পাত্রী হইতে পারিয়াছিলেন। প্রাকৃত জগতের নর-নারী যদি হর পার্ব্বতীর জীবনের আদর্শ ধরিয়া চলিত, তাহা হইলে এই সংসারই কবে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হইয়া যাইত!

পুরুষকে আত্মারাম হইতে হইবে, তাহা হইলেই বিশ্ব-প্রকৃতি সেই আত্মারামের সেবার দরুণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন। মানুষ ভোগ চায়, সেবা চায়, কিন্তু কাজ করিয়া বসে ভোগের বিরোধী, সেবার বিরোধী। নিজকে অচল-অটল-কূটস্থ করিতে না পারিলে, প্রকৃতি তাঁহার পায়ে লুণ্ঠিত হইবে কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়া? ভোগের আসক্তি ক্ষয় হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ভোগের উপকরণ আসিয়া জুটে। ভোগী সম্পূর্ণ ভোগ-বাসনা লইয়া যায় ত্যাগীর মত ভোগ করিতে, ইহা কি কখনো সম্ভব?

তপস্যার পরিণামে একটা সার্থকতা আছেই। তপস্যা করিতে যাহারা ভয় পায়, তাহারা সেই সার্থকতার সন্ধান পায় না। সত্যনিষ্ঠ সাধককে দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় না করিয়া পারেন না। প্রকৃতির কাজ তো মানুষকে নরকে ডুবানো নয়—মানুষকে স্বর্গে উন্নীত করাই হইল প্রকৃতির আসল কাজ। নিম্ন-প্রকৃতির প্রতি যাঁহারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিয়া যান, তাঁহারা

সেইখানে গিয়া দেখিতে পান, পরা-প্রকৃতি মায়ের মত স্নেহে হস্ত প্রসারণ করিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য উৎকন্ঠিতা!

পুরুষ যেখানে আত্মস্থ, প্রকৃতি সেখানে চাঞ্চল্য পরিহার না করিয়া পারিবেই না, তেমনি প্রকৃতি যেখানে সমাধিস্থা, সেখানে পুরুষেরও চাঞ্চল্যের বিরতি না হইয়া পারিবে না। আত্মস্থ পুরুষ এবং আত্মস্থ প্রকৃতিই--নর-নারীর আদর্শ। সমাজে আজ এত ব্যভিচার, এত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে—ইহার একমাত্র কারণ, স্বরূপ হইতে নারী-পুরুষ উভয়ই বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষ এবং প্রকৃতির মাঝে এইজন্যই বিক্ষোভেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজের স্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিতে হইলে—নারী-পুরুষ উভয়কে সংযত হইতে হইবে। এইজন্য নিয়মিত সাধনাও চাই।

দোল্

অরুণ আজি পথের ধূলা
চরণ পেয়ে কার—?
শুভ্র বুঝি রাতের বরণ
হাসি পেয়েই তার!

নিঝুম মাঠের অন্তরেতে
কার ওই ধেয়ানরূপ্—?
কোন্ পরশে মুখরিত
যে গ্রাম ছিল চুপ্?

নীল আকাশে ফাগের রঙে
ওই যে লোহিত রাগ্—
নীল আঁখিটী লাল হয় পেয়ে
কোন্ সে অনুরাগ?

হৃদয়-দোলায় দুল্‌ত যে জন
দুঃখ-সুখের মাঝ—
বাইরে বুঝি দরশ দিতে
নাম্‌ল ধরায় আজ!

এই ভুবনে আজ ফাগুনে
জগৎ মাঝে দোল্—
দুঃখ হ'তে সুখের মাঝে
আনন্দ-হিল্লোল!

নিত্য দিনের দৈন্য মাঝেও
কিসের কলরোল—?
প্রিয়তমের পরশ সে যে,—
ভোল্ হাহাকার ভোল্!

জগৎ জুড়ে কান্না মাঝে
যে জন দিল কোল্—
তাঁরই নামে মাথা তুলে
তোল্‌রে নিশান্ তোল্।

দুঃখ কিসের? আছে মোদের
মরণ-জয়ের বোল—
মদনমোহন মন ভোলাতে
দিচ্ছে যে আজ দোল।

———×———

প্রশ্নের উত্তর

অনেক দিন হয় তোমার চিঠিখানা এসে পড়ে আছে, কিন্তু উত্তর দেবার কথা মনে হলে মনে নিদারুণ দুঃখ-আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এরই জন্য এতদিন নীরব ছিলাম। ভেবে দেখলাম, চুপ করে থাকাটাও তোমার মনে নানা সন্দেহের আলোড়ন তুল্‌বে, তাই আজ দু'চার কথা লিখছি।

আজ কালকার বস্তুতন্ত্র সাহিত্য নিয়েই তোমার প্রশ্নটা ছিল। কেমন নয় কি?

আধুনিক সাহিত্য পড়ে কেন জানি আমার মন বিশেষ উল্লসিত হয় না। তুমি হয় ত একে বল্‌বে জড়তা বা বোধশক্তির অভাব—অর্থাৎ আমি সাহিত্যের সমজদার নই। কিন্তু আমার মতে এরূপ সাহিত্যে রস-বোধটা আমার কেন, সমাজের লোকেরও যত কম জাগে ততই মঙ্গল। অরুচি আস্‌লে বুঝব সমাজ পুনঃ স্বাস্থ্যের পথে, মঙ্গলের পথে যাবার দরুণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বিচার করি আমরা দু'একটা কথা ধরে নয়, রচয়িতার রচনার অধিকাংশ ভাব দেখে। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতি মৃত, এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান যেখানে মনেরই বিকৃত-রুচি, সেখানে বরঞ্চ সৃষ্টির চেয়ে বন্ধ্যাত্বই ভাল। সৃষ্টির মূলে যেখানে পবিত্রতার অভাব, সংযমের অভাব—সে সৃষ্টিকে আসুরী-সৃষ্টি বলে আখ্যা দিতে আমার মনে একটুকুও বাধে না।

প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার কর্‌তে গিয়ে যদি নিজের দুর্ব্বলতার দরুণ পুনরায় সূক্ষ্মভাবে উপভোগের মত্ততাই জেগে ওঠে প্রাণে—তাহলে স্থূল বিকৃত ভোগের চেয়ে সেইরূপ অশ্লীল সাহিত্য-সৃষ্টিকে আমি কম অপরাধ বলে গণ্য করি না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি তো দেখতে পাই—সর্ব্বত্র ভোগের উন্মত্ততা। ভাষার সাহায্যে মোলায়েম করে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাক্‌তে যাওয়ায়—প্রকারান্তরে সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একদল সাহিত্য-রথী হয়েছেন, তাঁরা দেব-দেবীর উপাসনা, হিন্দুর নিয়মানুষ্ঠান ইত্যাদিকে সময়ের অপব্যবহার বল্‌তেও কুণ্ঠিত নন, কিন্তু বসে বসে সূক্ষ্ম-লালসাপূর্ণ চিন্তা দ্বারা তাঁরা সময়ের যে কিরূপে সদ্ব্যবহার করেন, তা বুঝে ওঠবার মত বৃত্তিই আমার নাই! প্রার্থনা করি এর চেয়ে উচ্চতর-পবিত্র বৃত্তি থাক্‌তে, ভগবান্ যেন আমার মাঝে আর এরূপ বৃত্তির উন্মেষ না করেন, আমি না হয় জগতের কাছে ছোটই থেকে গেলাম।

স্পষ্ট কথা বল্‌তে গেলে প্রকৃত প্রতিকারের ইচ্ছা খুব কম লোকের মাঝেই

জাগ্রত হয়েছে। অধিকাংশের ইচ্ছাই দুর্ব্বল কামনা দ্বারা অভিভূত, এইজন্যই সমাজ সংস্কার কর্‌তে গিয়ে নিজেই তাঁরা সমাজের গ্লানির পথকে প্রশস্ত করে তুলছেন। সর্ব্বত্রই কামনার আধিপত্যই দেখতে পাচ্ছি বেশী। কামনার কত সূক্ষ্মরূপ কত ভাবে স্বরূপ প্রকাশ কর্‌তে পারে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমি তাই স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ কর্‌ছি।

'জন্ম-নিরোধ' উপায়কে প্রশংসা করে সেদিন আমায় একজন পত্র দিয়েছেন। মানুষের মনের কত শোচনীয় পরিণাম হতে পারে, তার কথা ভেবে মর্ম্মাহত হলাম। "জন্ম-নিরোধ" কর্‌লেই কি ভোগের বাসনা পরিত্যক্ত হবে, আর এই কি সুষ্ঠু উপায়? কেন, হিন্দুশাস্ত্রে নিবৃত্তিমূলক যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, তা মেনে চললে কি মানুষের সৃষ্টি-সংখ্যা বাহুল্যের হ্রাস হতে পারে না? এতে দেহে-মনে যে পবিত্রতা আনয়ন করে, জন্ম-নিরোধ উপায়ে কি তা লাভ হবে? এ সব অবৈধ উপায় অবলম্বনে সমাজের গতি কোন্ দিকে ফির্‌বে, তার লক্ষণ ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। হয় ত সমা-জের পবিত্র শৃঙ্খলা ক্রমশঃই লোপ পেয়ে যাবে, আসুরী-ভাবের প্রাবল্যে জগৎ থেকে সুখ-শান্তি অপহৃত হয়ে যাবে।

উপনিষদে একটী কথা আছে—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"——সৃষ্টির মূলে থাকা চাই তপস্যা সংযম। সৃষ্টিকে আমি ব্যাপক অর্থেই ধরে নিয়েছি—যে কোন সৃষ্টির মূলেই তপস্যা থাকা চাই। রসিক সাহিত্যিকের চেয়ে—তপস্বী সাহিত্যিককে আমি বেশী শ্রদ্ধা করি। রচনা পড়লে মন যেখানে পবিত্রতায় ভরপূর না হয়ে ওঠে, সেই রচ-নার মূল্য কি? নিছক উপভোগের জন্যই কি সাহিত্য সৃষ্টি—না তা সমাজের লোকের মতি-গতিকেও উন্নতির পথে পরিচালিত কর্‌বে?

ধৃতিশক্তির অভাব, বীর্য্যের অভাব—তাই কষ্টের ভিতর দিয়ে, দুঃখের ভিতর দিয়ে সত্য দর্শনের ব্যাকুলতা মানুষের কমে গিয়েছে। সত্যি কথাটাকে কত প্রলেপ দিয়েই না ব্যক্ত করা হচ্ছে—তাতে প্রলেপই বড় হয়ে উঠছে, সত্য পড়ে যাচ্ছে অতলে চাপা।

দরদী হলেই মানুষের অশুভ কামনা-বাসনার প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে, তার কি মানে? সমাজের অপবিত্রতা দূর করতে হলে, নিজের মাঝে সর্ব্বাগ্রে তপস্যার আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌তে হবে। নিজে সম্পূর্ণ কামনাশূন্য হলে—অপরকেও তখন কামনা-রাজ্যের ঊর্দ্ধে উঠে কি করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, তা বলে দেওয়া সহজ হবে। আজ কালকার সাহি-ত্যিকের মাঝে তপস্বী আছেন কয়জন? সাহিত্য যদি কেবল উপভোগের সামগ্রী হলেই চলে, তাহলে তোমাদের কথায় খুব ভাল ভাল সাহিত্যেরই সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু

বাক্য-বিন্যাস দ্বারা মানুষের দেহ-মনকে পবিত্র পথে পরিচালিত করতে পারা যায় না, এর জন্য চাই জ্বলন্ত তপস্যা। তপস্যার অভাবেই—সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি দেখা দেয়। যেখানে বিকৃতি প্রকাশ পায় এবং পেয়েছে, সর্ব্বত্রই জেনে রাখবে,ভোগের বাসনায় মানুষ অন্ধ হয়ে গিয়েছে—তপস্যাকে তারা আমলেই আন্‌তে চায় না। এই দুর্গতির দিনে—সমাজের স্বাস্থ্য পুনঃ ফিরিয়ে আন্‌তে হলে, দুর্ব্বলতায় দরদী না হয়ে মানুষের মাঝে তপস্যার অগ্নি যাতে প্রজ্বালিত হয়ে ওঠে, সেইরূপ বাণী প্রয়োগ, সেইরূপ আচার-ব্যবহার করতে হবে। সমাজের প্রকৃত দরদী বল্‌ব তাঁকেই!

আরও একবার তোমাকে বলেছিলাম যে—সাহিত্য যেদিন দেহ-বোধকে জাগ্রত না করে দেহ-বোধকে লুপ্ত করে নিছক পবিত্র ভাব জাগিয়ে তুলবে প্রাণে, সেদিনই বুঝবে প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই-জন্যই বলি, সাধক না হলে—পবিত্র সৃষ্টি হয় না। কেবল ভোগ—ভোগ, ভোগ ছাড়া আর কোন কথা নাই। মানুষ ভোগের কতখানি দাস হয়ে পড়েছে, তাই ভাবি!

মুনি-ঋষিদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুন মান্‌তে আজকাল সবাই অনিচ্ছুক, কেন না তাতে অবাধ-ভোগে বিঘ্ন হবে। সংযমের স্থলে স্বেচ্ছাচারিতাই তাই প্রবল হয়ে উঠেছে। শাস্ত্র বাক্যের অর্দ্ধেকখানা মানব (অর্থাৎ যেখানে ভোগের অনুকূল বিধান পাই) আর বাকী অর্দ্ধেক কথা মান্‌ব না—এই হচ্ছে আজ কালকার শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। মোট কথা, নিজের স্বার্থে—নিজের ভোগে যেখানে বাধা পড়বে, সেখানেই মানুষ পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উৎসুক। এই সব লক্ষণ কি মনের সুস্থতার লক্ষণ?

দেহসুখ সম্পূর্ণ বজায় রেখে মানুষ চায় মানুষ হতে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে হলে যে কতখানি ত্যাগ-সংযমের আবশ্যক, সেদিকে লক্ষ্য খুব কম লোকেরই। দেহ-ভাবনা ছাড়বার কথা বললে মানুষ আঁৎকে ওঠে; কেন না চিন্তা-ভাবনা সব যে এই দেহটাকে নিয়েই পড়ে আছে! সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হবে কিসে-সে চিন্তা করবার মত তপস্বী-সাধকেরই অভাব। খ্যাতনামা এক সাহিত্যিক মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা না করেই রায় দিয়ে বস্‌লেন——"এসব আশ্রম দিয়ে, নিয়ম-সংযম দিয়ে কিছু হবে না।" অর্থাৎ মানুষকে যথেচ্ছাচারী হতে দিলেই যেন ওঁর মতে দেশের লোকের কল্যাণ হবে। মঠ-আশ্রমের চিন্তাধারা দিয়ে জগতের কোন উপকারই হচ্ছে না—উপকার হচ্ছে তাঁর অভিনব সাহিত্যের বাণী দিয়ে! শ্রদ্ধা-নিষ্ঠার অভাবে মানুষের মন যে কতখানি নীচে নেমে আস্‌তে পারে, তাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ভাবি!

যে চিন্তার ধারা মানুষের মনের খোরাক যোগায়, সে বিচার ধারা খুব চিন্তা করেই প্রকাশ করতে হয়। উত্তেজনার ভিতর

দিয়েও এক রকম ভোগ করা যায়, আবার ইন্দ্রিয়গুলো প্রশান্ত করেও আর এক রকম দিব্য ভোগ করা যায়। শ্রেয়—প্রেয় দুই পথই আছে; সাহিত্য কি প্রেয়ের পথই দেখাবে শুধু, শ্রেয়ের পথে ভ্রূক্ষেপও করবে না? পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ ধ'রে অনেকে চান আমাদের সমাজ সংস্কার করতে। কিন্তু সে দেশেও যে ভোগের অশুভ পরিণামের কথা অনেক চিন্তাশীল সাহিত্যিকের মুখ দিয়েই এখন বের হচ্ছে! এসব দেখে-শুনেও কি শিক্ষা হচ্ছে না?

যৌন-লালসা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই লালসার ইন্ধন জুগিয়ে যাঁরা তরুণের মনকে উস্কিয়ে তুলেন, তাঁদের ভিতর যে কতখানি বিকৃতি দেখা দিয়েছে, তা আর কি বলব? ব্যাসদেব, কালিদাস প্রভৃতি মহাজনগণও সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন—কিন্তু তাঁদের সাহিত্যে লালসার কথাটাই উৎকটরূপে প্রকাশ পাচ্ছে না। যেখানে ভোগের কথা উঠেছে, সেখানেও দেখতে পাই মূলে কি কৃচ্ছ্র-তপস্যার কথাও রয়েছে! কুমারসম্ভবের পার্ব্বতীর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় না কি? দেহ-মনকে পীড়ন না করে কে কবে কামজয় করতে পেরেছে? কাম স্বাভাবিক বলেই কি তাকে অস্বাভাবিক করে তুলতে হবে? মানুষের মাঝে এই বৃত্তি ছাড়া কি আর কোন দৈবী-বৃত্তি নাই, যার উন্মেষে মানুষ পশু-ভাব ছেড়ে দেব-ভাবে উন্নত হতে পারে? ভোগের সুপ্ত-বাসনা উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া, সাহিত্যের মাঝে দেব-জীবন লাভের সঙ্কেত খুব কমই দেখতে পাই। শুধু মৌখিক কথায়, আর আজকালকার ভদ্রতায়ই কি মানুষের ভিতর হতে এই দুর্নিবার রিপুর মূল উৎপাটন হবে, এই কি প্রকৃত প্রতিকারের উপায়? মানুষের মাঝে মহত্বের দিকটাকে চাপা দিয়ে, তার ভিতরকার পাপ-পঙ্কিল ভাবকে জাগ্রত করে তোলা যে কতখানি গর্হিত কাজ, তা আর কি বলব? "বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায়, একমাত্র অবাধ মিলা-মিশাতেই যৌন-সমস্যার সমাধান হবে।" —যাদের মস্তিষ্ক হতে এরূপ সুচিন্তা বের হয়—তারা বাস্তবিকই সমাজকে কল্যাণের দিকেই অগ্রসর করে নিয়ে চলবে! তাদের যত দুঃখ-দরদ তা শুধু এই সমস্যা নিয়েই। এরূপ সাহিত্যিকের চিন্তাধারা দিয়ে যে কি কল্যাণ হচ্ছে—তা তরুণ-তরুণীর মতি-গতি দেখলেই বেশ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়।

লালসা-ভাব পূর্ণ সূক্ষ্ম চিন্তাতে মানুষের যে নৈতিক অবনতি ঘটায়, অন্য কিছুতে আর তেমন অবনতি ঘটে না। মানুষের দেহ-মনকে সুস্থ-সবল-পবিত্র ভাবে গঠিত করতে হলে, সাহিত্যের মাঝেও সেইরূপ সবল-সুস্থ উপাদান থাকা চাই। সাহিত্যিকের দুর্ব্বল মনের বিকৃত রুচি প্রকাশ পেলে, তাতে অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ সাধিত হয় না। যাক্, অনেক কথাই লিখে

ফেললাম—তুমি হয় ত আমার ভাবধারা পড়ে ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু কি করব—দু'চারটা সত্য কথা বলা প্রয়োজন বলেই লিখলাম।

পরিশেষে, সংক্ষেপে আমার এই বক্তব্য যে—"তপঃশক্তির অভাবেই সর্ব্বত্র ব্যভিচার দেখা দিয়েছে, কি সাহিত্যে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে। সুতরাং জাতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী যাঁরা, সর্ব্বাগ্রে তাঁদের তপস্বী হতে হবে—সংযমী হতে হবে। ছেলের ভাল'র দরুণ মা যেমন তপস্যা করেন, তেমনি সমাজের কল্যাণের দরুণ সাহিত্যিককেও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তপস্যা করতে হবে—এ কথাটী যেন ভুলে যেও না।" আজ এই পর্য্যন্তই। লিখবার প্রয়োজন মনে করলে, ভবিষ্যতে হয় ত এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখ্ব তোমায়।

শেষ চিঠি

ভাই!

আজ প্রথমেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। সংস্কারমুক্ত মনই সত্যানুভূতির বাধা। তুমি এ সম্বন্ধে যা চিন্তা করেছ, তা ঠিকই। প্রশ্ন হচ্ছে, সংস্কার কাকে বল্‌ব? পতঞ্জলি কিন্তু সংস্কারকে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। বাসনারও সংস্কার হতে পারে, সমাধিরও সংস্কার হতে পারে। সংস্কার বল্‌তে বুঝি স্থিতি স্থাপকতা—inertia—যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় থাক্‌বার জন্য একটা স্বাভাবিক tendency. এটাকে মনের তমোবৃত্তি বল্‌তে পার; আবার জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্মও এই সংস্কার—সুতরাং একে সাত্ত্বিকও বল্‌তে পার। বোধ হয় মনে আছে, বলেছিলাম—সত্ত্ব আর তমো—দুটা passive state মাত্র। Activity র principle বা রজঃ হচ্ছে একটা middle point. ওই রজঃই প্রাণের ক্রিয়া। Undifferentiated হতে differentiated এর দিকে move করবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা এই সৃষ্টির অণু-পরমাণুতে। এইটা আমাদের প্রাণের প্রকাশের এক দিক—it is just describing a semi-circle. Circleটা complete করতে হলে আবার differentiated এর দিক থেকে undifferentiated এর দিকে move করতে হয়—just in the reverse order. আবার ঘুরে যখন undifferentiated এ যাই—তখনই আমাদের Existence এর চরম সার্থকতা। কিন্তু এই দুটী undifferentiated অবস্থা একেবারে বিপরীত—একটী অব্যক্ত, আর একটী পূর্ণ

বাক্ : এক প্রকৃতি, অপর পুরুষ। এক হচ্ছে mother at the relative Existences ; আর এক হচ্ছে, Absolute ! অবিবেকী মনের কাছে দুই-ই এক—কিন্তু বিবেকীর কাছে এতে আকাশ-পাতাল তফাৎ !

এই circleটা complete সকলকেই করতে হবে, কিন্তু বিপদ কোথায় জান ? Differentiated এর দিকে move করে যখন তার চরম প্রান্তে উপস্থিত হই, অর্থাৎ একটা semi-circle complete করি, তখন কোন্ রাস্তায় গিয়ে বাকীটুকু complete করব, তাই হচ্ছে ভাবনা। কেউ কেউ আবার ঘুরে undifferentiated প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চাই। তাদের কাছে প্রাণ পাপ, পুণ্য হচ্ছে প্রাণহীন হওয়া। এই ধর্ম্ম আমাদের দেশ ছেয়ে আছে। সত্যিকার পথ হচ্ছে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা; বিদ্যয়াঅমৃতমশ্নুতে।"

Differentiated এর চরমে গিয়ে তাকেও push করে আরো এগিয়ে যাওয়া—never to turn back. তাহলে কি চাই ? চাই fuller activity—activity in a higher plane. If your body has worked so long in the line of Differentiated, let your mind now work all the move. এই processটা ধ্যানে apply কর। Differentiated worldএ move করে দেহ-মন-প্রাণের যা নাকি চরম উৎকর্ষ তুমি করতে পেরেছ—তোমার অন্তরের চরম স্ফূর্ত্তি যা হচ্ছে—carefully make a note of that. And then, instead of an attempt to kill all good impulses in you, try to sublimate them—make them purer, freer from all grossness of matter. And the end will be—the Absolute—the one in all fullness. In trying to kill the bad, do not kill the good also. সংস্কার মাত্রেই খারাপ নয়, প্রাণ স্পন্দন মাত্রেই অবিদ্যা নয়। মনে করো গীতার কথা— "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"—ওই হচ্ছে গীতার secret. You must move in the path of **Karma** which is only another name for **প্রাণ**—উপনিষদের "মুখ্য প্রাণ" যাকে তুমি বলতে। You must be full of life ! The path of religion is all light—all beauty—all bliss ! বুদ্ধদেবের ভাষায় বলি, "প্রাণাতিপাত বা **প্রাণ**-হত্যা" মহাপাপ। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই দিক দিয়ে বোঝ। Never kill life neither in you, nor in others. Life finds expression in beauty, in activity, in radiance ! দেহ নির্ম্মল, শক্তিশালী, প্রাণপূর্ণ হোক্ ; ইন্দ্রিয়সমূহ অক্লান্ত, সতেজ, দিব্যদর্শী হোক্ ; মন পূর্ণ বেগে ছুটে চলুক বিশ্বের মর্ম্মকে যে নিলীন সত্যের সন্ধানে ! Cultivate life by all means. Never lag behind, never sit idle in darkness, never allow your energy to rust !

এই যে প্রাণের উপাসনা—এই হচ্ছে বিরাটের মনের সঙ্গে যোগ, তুমি যার কথা বলেছ। ভাই, আমার হৃদয় ফুলে উঠছে সে কথা ভাবতে গিয়ে। মহাপ্রাণের অজস্র আশীর্ব্বাদ তোমার শিরে বর্ষিত হোক্। Just as the eagle soars towards the sun, the moment it burstsforth from the shell—so crush the shell of **Maya** and soar for the Absolute ! যা নাকি মনকে,

দেহকে, প্রাণকে ছোট করে দেয়—তার প্রতি নির্ম্মম হয়ো। নিজের বা পরের মাঝে যেখানেই এই ক্ষুদ্রতা দেখ, সবিতা হয়ে তার ওপর আলো ঢেলে দাও—তবেই তুমি সবিতার উপাসক ব্রাহ্মণ! হে অদীন প্রাণ! প্রাণের উপাসনায় অদ্বৈতকে লাভ কর।

তোমার………।

হিমাচলের পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৯শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, বুধবার—হরিদাস ভায়া অসুখের জন্য খুব কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে ত তার প্রতিকারের কোন উপায় দেখছি না। কাজেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্থির করলাম, ভায়াও রাজী হল।—অনেক বেলায় চামেলী হতে বের হলাম। হরিদাস ভায়ার অসুখ দেখে সঙ্গীয় অনেকেই তাকে এখানে ফেলে যেতে তৈরী হলেও কিন্তু আমি তাকে ফেলে যাব না স্থির সঙ্কল্প। অনেক বচসার পর ধীরে ধীরে রওনা হলাম। অলকানন্দার উপরিস্থিত ২৩৩ ফিট লম্বা ঝুলান পুলটি পার হয়ে অলকানন্দাকে ডাইনে রেখে পূর্ব্ব দিকে চলতে লাগলাম। অলকানন্দা পার হয়ে পশ্চিম দিকে যে পথটি গিয়েছে, সেটী কেদারনাথে যাবার, আমরা সেই পথেই কাল এসেছি। অলকানন্দার এ পাড়ের পাহাড়টি দেখে মনে হচ্ছিল, গোহনা বন্যায় তার কোলস্থিত সুরম্য সহরটী নষ্ট হওয়ায়, সেই দুঃখে দুঃখিত হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে সে যেন তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে অলকানন্দার আস্ফালন দেখছে। এ দিকের পাহাড়টির গম্ভীরতা স্থির চিত্তে চিন্তা করলে তার দৃঢ়তা দেখে হৃদয় কেঁপে উঠে। কী বীর দর্পে দাঁড়িয়ে আছে! দেখবার তথা ভাববার বিষয় বটে! কিন্তু নদীর তট দিয়ে যে পথে আমরা চলেছি, সে রাস্তাটি অতি সুন্দর। নদী গর্ভ হতে বড় বড় পাথরদ্বারা বাঁধান পথটির একপাশে খরস্রোতা অলকানন্দা, অন্য পাশে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা; সুন্দর বটে!

সঙ্গীয় সকলেই আগে চলে গেছে। আমি হরিদাস ভায়ার সঙ্গে ভায়াকে ধরে ধরে চলতে লাগলাম। সামান্য সামান্য ক্রমোচ্চ চড়াই করে দুই মাইল যাবার পর **মঠ** চটী। সেখানে পৌছে দেখি, সঙ্গীয় সকলেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এই দুই মাইল পথ আসতেই ভায়ার যেরূপ কষ্ট দেখলাম, তাতে প্রাণে বড্ড ব্যথা লাগলো। হায়! কেমন করে ভায়াকে নিয়ে যাব? ভায়ার যে কী গতি করবো, ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না, বহু কষ্টে ভায়াকে নিয়ে এ চটী পর্য্যন্ত এসেছি। এ বেলা এখানেই আড্ডা জমান গেল।

মঠ চটী
২ মাইল

মঠ চটী বেশ সুন্দর! চটীতে প্রবেশের মুখে একটি বড় জলপ্রপাত উচ্চ পর্ব্বত শিখর হতে প্রবল বেগে ঝরে নীচে পড়ছে, এবং যেখানে পড়ছে,

সে জায়গাটি জলের চোটে একটি কুণ্ডের মত হয়েছে, তাতে বেশ জল জমে আছে। সেখানে স্নান করার লোভ সম্বরণ করতে না পারায় তাড়াতাড়ি পাক করেই তথায় ঘণ্টা খানেক ভরে স্নান করলাম। এ দিকে ত নিত্যই জ্বর হচ্ছে,—সে দিকে কিন্তু লক্ষ্য নাই। কিন্তু অধিক সময় স্নান করায়ও জ্বর বাড়ে নি। এ চটীর জমিগুলি খুব উর্ব্বর, সরস, চাষ আবাদ খুব হচ্ছে। কলা বাগান অপর্য্যাপ্ত, তাতে রাশি রাশি কাঁচ কলা ও অন্যান্য কলা ঝুলছে। আম গাছও নেহাৎ কম নয়, তাতে কচি কচি আমগুলি সামান্য বায়ু তাড়নে হেলে দুলে যেন আমাদের সাদর সম্ভাষণ কচ্ছে। আবার কোন কোন আম গাছ তখনও মুকুলে আচ্ছন্ন,—সে যেন যৌবনত্বের গর্ব্বে একটুকুও নুইয়ে পড়তে চায় না; তাতে নানা রং বেরঙ্গের ভ্রমর গুণ্ গুণ্ স্বরে তারই বুকের উপর বসে তারই মধু পান কচ্ছে; আবার তার মধু শূন্য হলে তাকে যেন উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছে। হায়রে স্বার্থান্ধ জগৎ!

পেয়ারা ও ডালিম গাছে তখনও ফল না ধর্‌লেও ফুলের অভাব নাই। তারই পাশে রক্ত করবী গাছে অপর্য্যাপ্ত রক্ত বর্ণ ফুল ফুটে আছে, তাদের দেখে বালারুণের কথা স্বতঃই মনে জাগে। আবার মায়ের চরণের অর্ঘ্যের কথা হৃদয় ভেদ করে বের হয়ে পড়ে:—

রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়
মুঠো মুঠো।
দেনা মা সাধ হয়েছে
পরিয়ে দেনা আমায় দুটো॥
মা বলে ডাকব তোরে
হাততালি দে নাচব ঘুরে
দেখে মা হাস্‌বি কত
আমায় বেঁধে দিবি ছুটো॥

* * *

তরি তরকারীর গাছও ত কম নয়! —মূলা শাক, ঢেরস, কাঁচা লঙ্কা, বেগুণ, কপি, করল্লা, কাঁচা কলা আদিও অপর্য্যাপ্ত। চাষারা বেশ চালাক, তারা জানে, এ পথের যাত্রীরা পথে কোথাও শাকসব্জী, তরি-তরকারী পায় না। তাজা জিনিষ পেলে যাত্রীরা পয়সার মায়ায় কিন্তু কিন্‌তে ভুল্‌বে না—তার দাম যতই হোক্ না কেন! অন্য জিনিষ চাষের চেয়ে, এ তরি-তরকারী চাষে তাদের লাভও বেশী। তাই এখানকার চাষারা অন্য কোন জিনিষের দিকে না ঝুঁকে তরি তরকারীরই চাষ আবাদ কচ্ছে। তাদের বাগানের শোভা দেখে প্রাণে খুব আনন্দ হল। আমরা চাষীদের দিয়ে কচি কচি আম বোটা সহ ৩২টী চারি আনার, কাঁচা লঙ্কা পয়সায় দুটো করে দু' আনার, তা ছাড়া ঢেরস, বেগুণ, করল্লা, কাঁচাকলা, মূলা, কিনে আজ খুব ভালরূপ ভাবে দুপুরের ভোজন সমাপ্ত কর্‌লাম। হিমালয়ের ভিতর ঢুকে আর কোথাও আমরা এমন জায়গা পাই নি। পয়সা কিছু বেশী গেল বলে আমাদের কোন দুঃখ হল না—বরং খুবই আনন্দ হচ্ছিল যে বাঙ্গালা দেশের মত তরি-তরকারী এখানে পাওয়া গেল। দোকানে যা কিছু ছিল, আমরা সবই কিনে নিলাম। ইচ্ছা ছিল আরও কিছু কিনে নেব, কিন্তু আমাদের আস্‌তে দেরী হওয়ায় আগে যে সব যাত্রী এসেছে, তারা নিয়ে গেছে।

বৈকালে হরিদাস ভায়া আরও কিছু এগিয়ে যেতে চাওয়ায় বের হয়ে পড়্‌লাম। সামান্য একটু চড়াই উৎরাই করার পর প্রায় মাইল খানেক ক্রমোচ্চ চড়াই করে ছিন্‌কা চটীতে যেয়ে পৌছি।

ছিন্‌কা
২ মাইল

মঠ চটী হতে **ছিন্‌কা** চটী দুই মাইল, এর অন্য নাম বাবলা চটী। এ চটীতে কয়েক জন

দোকানদার আছে। সামান্য কলা বাগানও আছে, কিন্তু জলকষ্ট খুব। আমি ভায়ার সাথে চিনে জোঁকের মত লেগে আছি। এখান হতে বের হয়ে সামান্য যেয়েই বিরহী গঙ্গা ও অলকানন্দার মিলন স্থান দেখতে পেলাম। সামান্য সামান্য ক্রমোচ্চ চড়াই উৎরাই করে, অলকানন্দার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চলে ছিন্‌কা চটী হতে তিন মাইল দূরস্থ **সিয়াসিন** চটীতে যেয়ে পৌছি। তখন সূর্য্যাস্ত না হলেও কিন্তু সূর্য্যদেব ছুটীর জন্য বড্ড তাড়া হুড়ো কচ্ছিলেন। চটীতে পৌছে খুব আনন্দ হল। স্থানটী বেশ! একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আছে। নানা দেশীয় নানা জাতীয় যাত্রীগণ সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত,—কেউ বা পাক কচ্ছেন, কেউ বা খাচ্ছেন, কেউ বা আটায় জল দিয়েছেন, আবার কেউ বা খেয়ে দেয়ে বাসনাদি মাজা-ঘসা কচ্ছেন, আবার কতকগুলি লোকের নাসিকাধ্বনিতে স্বতঃই কুম্ভকর্ণের কথা মনে হল। আবার একদল পূরবীয়া স্ত্রীলোক কাজ-কর্ম্ম সেরে শ্রীশ্রীবদরীনাথের ভজনে মগ্ন হওতঃ বিভোর হয়ে মিশ্রিত কণ্ঠে কজ্জলী সুরে গজল গাচ্ছেন :—

সিয়াসিন চটী
৩ মাইল

প্রভো বদরীনারায়ণজী তুম্‌হী জো মন সে ধ্যাতে হৈঁ। *
সুখী বে নিত্য রহতে হৈঁ, পদারথ চারো পাতে হৈঁ।
জো তন মন সে গয়ে বদরী, হুএ দুখ দূর ওনকে হী।
বহী নরতনু সফল করকে, পরম পদলাভ পাতে হৈঁ॥
ধরে জো ধ্যান বদরীকা, ন আবে গর্ভ মাতা কে।
ওন্‌হী কো মোক্ষ মিলতা হৈ, যহী সব শাস্ত্র গাতে হৈঁ॥
অরে মন ভুলতা ক্যোঁ হৈ, ফঁসা তু জালমেঁ কৈসা।
লাগালে নেহ তু নিশিদিন, বহী শুভদিন দিখাতে হৈঁ॥
তুম্‌হী সবকে পিতা-মাতা, তুম্‌হী হো দীনকে ভ্রাতা।
তুম্‌হী সর্ব্বস্ব ভক্তোঁকো, তুম্‌হে হী বেদ গাতে হৈঁ॥
পদারথ চার ভক্তোঁকো কৃপা অপনী সে দেতে হৈঁ।
জো মনসে ওনকো ভজতে হৈঁ, বহী কল্যাণ পাতে হৈঁ॥
কুলানন্দকী যহী বিনতী ভজো বদরীশ কো চিত্ত সে।
ইসীমেঁ হিত তুম্‌হারা হৈ, যহী মুনি সব বাতাতে হৈঁ॥

* "হৈঁ" এর উচ্চারণ "হায়" হইবে।

এখানে অনেকগুলি চটী, বেশ ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিনিষাদির দামও বেশী নয়। স্থানটীও বেশ খোলা মেলা। এখান হতে দুই মাইল পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত পথটাই সুন্দর। তার দুই পার্শ্বে অনেক রকম ফলের গাছ পুতে দিয়েছে। সেগুলি যাতে গরু, মহিষ, ঘোড়ার অত্যাচারে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য চারিদিকে গোল করে বেড়া দিয়েছে।

আজ আমরা মাত্র ৭ মাইল পথ এসেছি; কিন্তু এই সাত মাইল পথ আস্‌তেই ভায়ার যেরূপ কষ্ট হয়েছে, তা আর পাঠকদের কী জানাব? চল্‌বার কষ্ট অসহ্য হওয়ায় ভায়া রাতে বল্‌লো,—"এই চটীতে থেকে সে মরুতেও প্রস্তুত, তবুও সে আর এগিয়ে যেতে পার্‌বে না।" কাণ্ডী করে নিয়ে যেতে চাওয়ায় ভায়া পুনরায় বল্‌লো,—"আমার কাছে টাকা নাই। কাজেই আমি ডাণ্ডী-কাণ্ডীর ভাড়া দিতে অসমর্থ।"

ডাণ্ডীর ভাড়া অবশ্য বেশী, কিন্তু কাণ্ডীর ভাড়া এখান হতে বদরীনাথ পর্য্যন্ত ১০।১২৲ টাকা লাগবে বটে, কিন্তু সঙ্গীয় অন্যান্য সকলকে তার কাণ্ডীর ভাড়া অংশানুসারে দিবার জন্য অনুরোধ করলেও কিন্তু সকলেই ভাড়া দিতে অস্বীকার কর্‌লেন। হায় রে সময়ের ফের! আমি ত অর্থশূন্য অবস্থায় বেয়ারিং পোষ্টের আসামীর মত চিদানন্দ দাদারই আগ্রহে চলেছি। এ পথে যে টাকা পয়সা ছাড়া চলা কি কষ্টকর ব্যাপার, তদুপরি অসুখ হলে যে কী ভীষণ অবস্থা দাঁড়ায়,—তা একমাত্র জানে ভুক্তভোগী, আর জানেন তাঁর অন্তর-নিবাসী হৃদয়েশ্বর।

যাঁর নাম নিয়ে এমন বিপদসঙ্কুল পথে পা দিয়েছি, তাঁর অহৈতুকী কৃপায় কতই না বিপদের হাত হতে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ চুপ করে

থেকে তাঁর হৃদয়-মন-চিত্ত-বিনোদনকারী সুমধুর মনোময় মূর্ত্তি ধ্যান তথা সার্ব্বভৌম তাঁরই মহামন্ত্র জয়গুরু জয়গুরু জপ করতে করতে হৃদয়ে বল এল—বুঝলাম সবাই ফেলে গেলেও তাঁর কৃপায় তাঁর পরম স্নেহের সেবক হরিদাস ভায়াকে রক্ষা করতে পারবো। এর আগেই আমি অনেক টাকা বৃন্দাবনের মাতাজীদের নিকট হতে হাওলাত করে চলেছি। এবার হরিদাস ভায়াকে কাণ্ডী করে নিবার জন্য সারদা ভায়ার কাছে টাকা হাওলাত চাওয়ায়, ভায়া দিতে রাজি হ'ল। মনে করেছিলাম বদরীনাথ পৌছে পাণ্ডার নিকট হতে কর্জ্জ করে তার দেনা শোধ করব। বদরীনাথে কিন্তু পাণ্ডা মহারাজ আমাদের এক পয়সাও হাওলাত দেন নি। সে সব কথা সময় মত বল্‌বো। টাকা মিল্‌ল; কিন্তু কাণ্ডী এখানে পাওয়া গেল না। কাণ্ডীর জন্য সকালেই চামেলীতে যেতে হবে স্থির করলাম। যেখান হতে আজ সকালে এসেছি, ৭ মাইল পার্ব্বত্য পথ। রাতে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল।

২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার —ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই কাণ্ডীর জন্য বের হয়ে পড়লাম। ৮টার সময় পার্ব্বতীয় ৭ মাইল পথ অতিক্রম করে গত কাল যে চটী হতে রওনা হয়ে এসেছিলাম, সেই চামলী চটীতে যেয়ে পৌছি। খোরাকী সহ রোজ এক টাকা ভাড় ঠিক করে একটী কাণ্ডী নিয়ে দুপুরের পূর্ব্বেই এই সিয়াসিন চটীতে ফিরে এলাম। সকালেই ১৪ মাইল পথ পাড়ি জমালাম। আসার সময় মঠ চটী হতে মূলাশাক আদি কিছু কিনে এনেছিলাম। দুপুরের আহারাদির পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই ভায়াকে কাণ্ডীতে বসিয়ে রওনা হলাম। পথ একদম সীধা, অতি সুন্দর। আবার তার দুই ধারে নানা প্রকার ফলের গাছ। আনন্দের সহিত এক মাইল আসার পর **নারায়ণ চটী।** এর অন্য নাম **হাট চটী** বা **থোপা ঘাট।**

নারায়ণ চটী
১ মাইল

এ চটীটিও বেশ বড়। ছোট্ট একটী মন্দিরে বিল্বেশ্বর শিব বিরাজিত, পার্শ্বেই বড় ঝরণা তথা অনেকগুলি বেলগাছ শোভা পাচ্ছে। তাই বোধ হয় এখানকার শিবের নাম বিল্বেশ্বর। জায়গাটী বেশ!

এখানে অপেক্ষা না করে কাণ্ডীর সঙ্গে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগলাম। নারায়ণ চটী হতে অলকানন্দার পূর্ব্ব তীরস্থ পথটী বামুনের পৈতার মত দেখা যেতে লাগলো—কিন্তু ভীষণ চড়াই বটে! এটী চড়াই করে আমাদের পিপ্পল কুটীতে যেতে হবে। নারায়ণ চটী হতে খানিক দূর এসেই অলকানন্দার উপরিস্থিত ৮০ ফুট লম্বা লোহার ঝোলান পুলটী পার হয়ে, পূর্ব্বে যে পথটী দেখেছিলাম, সেই পথে ক্রমোচ্চ চড়াই করতে লাগলাম। পুলটীর উপর দাঁড়িয়ে অলকানন্দার জলের দৃশ্য দেখলে হৃদয় কেঁপে উঠে—মাথা ঘুরে যায়। সে কী প্রচণ্ড বেগ! অলকানন্দা যেন উচ্চ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় বদ্ধ হওয়ায় অধীর হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার জন্য বেগে—অতি বেগে ছুটে চলেছে। কার সাধ্য সে জলের স্রোত রোধ করতে পারে? জলের সে প্রচণ্ড বেগ দেখলে চোখ ঝল্‌সে যায়—চোখে সরষে ফুল ফুটতে থাকে। সে কী ভীষণ দৃশ্য!!

এখন হতে অলকানন্দা আমাদের বাঁয়ে রইল। এ পথে যাত্রীর অন্ত নাই—এক এক দল আস্‌ছে আবার এক এক দল যাচ্ছে। সবারই মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে। যারা বদরীশকে দর্শনের জন্য ছুটে চলেছে, তাদের হৃদয়ের কী আবেগ, প্রাণে কী উৎকণ্ঠা, কত সহিষ্ণুতা, কত

তিতিক্ষা!—তাদের দেখলে বাস্তবিকই হৃদয়ে আনন্দের লহর বয়ে যায়। চির আরাধ্য দেব, যাঁকে দর্শন করে মানব জীবন ধন্য করবে, যাঁর জন্য অত কষ্ট সহ্য করে ছুটে চলেছে, যাঁর দর্শনে আর জন্ম-মৃত্যুর গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে না—যাঁর দর্শনে যম রাজার রাঙ্গা চক্ষুর দাপটে ভয়ে জড়সড় হতে হবে না—তাঁকে দর্শন করতে ছুটে চলবে না ত পথে আর কার জন্য বসে থাকবে? তাঁকে প্রাণের সব জ্বালা জানাবে না ত আর কাকে জানাবে? তাঁর মত আত্মীয়, তাঁর মত সহায়ক, তাঁর মত আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরও আত্মীয় হৃদয়েশ্বরের জন্য লোক উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটে চলেছে! সে দৃশ্য কী মধুর! সে দৃশ্য কত আনন্দদায়ক!! সে দৃশ্য কত শান্তিপ্রদ!!! (ক্রমশঃ)

ললিত-স্মৃতি

এত শীঘ্র যে দাদা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। ৬৮ বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার শরীরের গঠন এমন দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম ছিল যে, কাহারও পক্ষে তাঁহার এত শীঘ্র প্রস্থিতির কল্পনা করা অসম্ভবই ছিল। আমাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, দাদাকে লইয়া অন্ততঃ আরও ১০টা বৎসর ঠাকুর-প্রসঙ্গে আনন্দে কাটাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই আর বেশী দিন তাঁর উদার-সঙ্গ লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কর্ম্মবীরের কর্ম্ম শেষ হইয়াছিল, তাই বুঝি কর্ম্ম-বিধাতা তাঁহাকে কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে চির-অপসৃত করিয়া লইলেন।

তাঁর স্নেহের ডাক ছিল "ভাইটী"। তিনি আমাদের কাহাকেও "ভাইটী" কাহাকেও বা "ভায়া" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আমরা তাঁহাকে কেবল "দাদা" বলিয়াই ডাকিতাম। বয়স হিসাবে—অভিজ্ঞতা হিসাবে বগুড়া সঙ্ঘের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বতো বৃদ্ধ,—গুরুভ্রাতাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল অতীব মধুর। তাঁহার আকার-প্রকার, বেশ-ভূষা, সুপক্ক কেশ-শ্মশ্রু সকলের চিত্তে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষির কথাই স্মরণ করাইয়া দিত; তাই আমাদের সঙ্ঘে তিনি 'দেবর্ষি নারদ" বলিয়াই অভিহিত হইতেন। আজ আমাদের সেই দেবর্ষিকে আমাদের সঙ্ঘ হইতে হারাইয়া প্রকৃতই যেন আমরা অভাবগ্রস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি।

তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক, চাহনি ছিল মধুর, হৃদয় ছিল কোমল, দৃষ্টি ছিল নিরপেক্ষ; যে কেহ তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছে, সে-ই মুগ্ধ না হইয়া পারে নাই। দাদার ছিল বসুধৈব কুটুম্বকম্, শত্রু বলিয়া—অনাত্মীয় বলিয়া কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন আদর্শ-কর্ম্মবীর, সংসারে কঠোর কর্ম্মী সাজিয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সবই নিরাসক্ত ভাবে, কোন কর্ম্মই তাঁহাকে আসক্তির বাঁধনে বাঁধিতে পারে নাই। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি যেন একটু বেশী রকম সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই দেখিয়া আমরা মাঝে মাঝে বলিতাম—"এই শেষ বয়সে আর কর্ম্মের মাঝে কেন? এখন অধ্যাত্ম-চর্চ্চা—পর পারের চিন্তা লইয়াই থাকা ত আপনার কর্ত্তব্য!" তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন—"ভায়া, আমি কর্ম্ম বাড়াইতেছি না, কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া যাইতেছি। সংসারের যে কি সুখ, এ পর্য্যন্ত তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া আসিলাম, এখন কায়মনে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি, আর যেন এ দেহ-কারাগারে বদ্ধ হইয়া অশান্তিপূর্ণ সংসারে আসিতে না হয়, যত কিছু কর্ম্ম আছে, সব যেন এই দেহেই শেষ হইয়া যায়।"

এমন সদসৎ বিচারক্ষম সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন পূর্ণ মানুষ অতি বিরল। এমন কর্ম্ম ছিল না যাহাতে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রতিনিয়ত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও অধ্যাত্ম চর্চ্চায় বিরাম তিনি কখনও দেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণের পর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তিনি নিয়মিত ভাবে জপ-

সন্ধ্যা-স্তোত্র পাঠাদি করিয়া আসিয়াছেন—এ বৈধ কর্ম্ম তিনি সুস্থদেহে থাকিতে কখনও ত্যাগ করেন নাই। অবসর সময়ে সদ্‌গ্রন্থরাজি ছিল তাঁহার সহচর। তাঁহার অধ্যয়নের নেশা এমন ছিল যে, পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি চোখের উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। এই শেষের দুই বৎসর যেন তিনি অধ্যাত্মগ্রন্থ পাঠে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বাহিরের কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও তিনি মনে মনে ঐ সব বিষয়েরই আলোচনা করিতেন, বিচার করিতেন, শাস্ত্র-সমন্বয়ের প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল সদর রাস্তার উপর। কোন কার্য্যোপলক্ষে সে রাস্তা দিয়া কোন গুরু ভাই গেলে তিনি তাঁহাকে আপনার কাছে না ডাকিয়া ছাড়েন নাই, অন্ততঃ আমি ত তাঁহার স্নেহ-আহ্বান হইতে কোন দিন রেহাই পাই নাই। কর্ম্ম-ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমি যদি কোন দিন তাঁহাকে পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেও চাহিয়াছি, তথাপি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই, অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া বসিতে হইয়াছে। তাঁহার নিকট আসিলেই ঠাকুরের প্রসঙ্গ, আর যে যে বিষয় তিনি পড়িতেছেন, সেই সেই বিষয়ের আলোচনা হইত। এক এক দিন দেখি প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় তিনি তত্ত্ব-আলোচনা করিতে আশ্রমে আসিয়া হাজির! এমনি ছিল তাঁর মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা!

তিনি আমাদের বলিয়া রাখিয়াছিলেন—"আমি বেশ সুস্থ সবল অবস্থায় মরিতে চাই, বেশী যেন ভুগিতে না হয়, পরের অধীন হইয়া যেন বেশী দিন কালক্ষেপ করিতে না হয়।" তিনি আরও বলিতেন—"ঠাকুরের আশ্রয় লইয়াছি যখন, তখন দক্ষিণায়নে যে মৃত্যু হইবে না তা নিশ্চয়ই, তোমরা দেখিও উত্তরায়ণ না হইলে আমি কিছুতেই মরিব না। তবে আমার মৃত্যুর সময় তোমরা সকলে আমার নিকটে থাকিয়া আমাকে ঠাকুর-স্মরণ করাইয়া দিও, আমাকে ঠিক পথে তুলিয়া দিও। দেখিও যেন সে সময় কেহ আমার জন্য না কাঁদে।" দাদার এই বহু কালের পুরাতন কথা আমরা তাঁর শেষ সময়ে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছি, ইহাই বর্ত্তমানে আমাদের সান্ত্বনা!

তাঁহার হাব-ভাব দেখিয়া মনে হইত, তিনি যেন সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছেন। প্রায়ই তাঁহার মুখে লাগিয়া রহিত—

"এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তাই সাজে,—"

রোগ-শয্যায়ও দেখিলাম তাই, তিনি কোন দিন ভুলিয়াও সাংসারিক কথার উত্থাপন করেন নাই, সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে বুঝিয়াও বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই।

আশ্রমের কাজে তাঁহাকে যখন যে অবস্থায় ডাকিয়াছি, সে অবস্থায়ই পাইয়াছি। ঠাকুরের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—দৃঢ় ভক্তি ছিল। গুরু-ভাইদিগকে তিনি অতি আপনার জন বলিয়াই মনে করিতেন, তাই আমাদের দেখিলে যেন তাঁহার আনন্দ উথলিয়া উঠিত।

মাঝে মাঝে আমরা কয়েক জন গুরু ভাই মিলিয়া আনন্দ-বৈঠক করিতাম, তিনি ছিলেন তাহার মধ্যে একজন একনিষ্ঠ সভ্য। শারীরিক অসুস্থতা ব্যতীত কোন দিন তাঁহার এ বৈঠকে অনুপস্থিতি থাকিত না। এই সে দিনও (১১ই চৈত্র, শনিবার) হরপ্রসাদ দার বাসায় তিনি, আমি, হরপ্রসাদ দা ও ঢাকার যদু দা * রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের প্রসঙ্গ লইয়া কাটাইয়া দিলাম। সেদিন তখনও জানি না যে আমাদের দাদার সহিত আনন্দ বৈঠক এই শেষ, সেদিন তখনও জানি না যে কালই কালব্যাধি নিউমোনিয়া আসিয়া দাদাকে শয্যা গ্রহণ করাইবে, সেদিন তখনও জানি না যে এক সপ্তাহ পরেই দাদাকে চির-বিদায় দিতে হইবে!

১৩ই বৈশাখ বুধবার বেলা ১০টার সময় জানিতে পারিলাম, দাদার ভীষণ জ্বর, গত রবিবার হইতে তিনি শয্যাশায়ী কাতর। সংবাদ শুনিয়াই অমনি তাঁহার বাসায় ছুটিলাম, দেখি তখন তিনি শুইয়া শুইয়া ধীরভাবে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "ভাইটী এসেছ?" আমি বলিলাম—"এইমাত্র জানতে পারলাম যে

---

*শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, নবগ্রাম—ঢাকা; এক গ্রামে জন্ম, দাদার বাল্যবন্ধু, দাদা ইঁহাকে "যদু খুড়ো" বলিয়া ডাকিতেন। দৈববশে ইনি হঠাৎ এক দিনের জন্য বগুড়া আসিয়া দাদার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। —লেখক।

আপনার অসুখ, তাই ছুটে এলাম। এখন কেমন লাগছে?" তিনি উত্তর করিলেন—"বিশেষ ভাল বোধ করছি না, বুকের বেদনা অসহ্য, ডাক্তার বলছে অবস্থা একটু ভালর দিকে, কিন্তু আমি তো কোন ভাল দেখছি না।" তারপর তিনি নিজের মুখে আনুপূর্ব্বিক রোগের ঘটনা সব বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শুনিলাম মঙ্গলবার দিনই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (আমাদের গুরু ভ্রাতা) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ (এম, এ, বি, এল) কে ডাকাইয়া বলিয়াছেন—"দেখ, আমার ত এইবার শেষ যাত্রা। তোমরা ছয়টী ভাই বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকিও; পৃথক্ হইবার চিন্তাও মনে স্থান দিও না, একত্রে থাকার যে কত বড় শক্তি, তা একত্রে থাকিলেই বুঝিতে পারিবে। এখন ত তোমার অন্যান্য ভাইয়েরা নিকট কেউ উপস্থিত নাই, কাজেই তোমাকেই আমার শেষ কথা বলিয়া গেলাম, আর তুমিই সকলের বড়, সব দিক সামাল দিয়া একটু সহ্য করিয়া চলিও।" তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্র-বধূকেও ডাকিয়া বলিয়াছেন—"বৌমা! আর কেন? এখন আমায় বিদায় দাও।"

দাদা ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার ভীষণ অসুখে আক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন দিন এমন করিয়া বিদায় চান নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসুখে যদি তাঁর আত্মীয়-স্বজন একটু কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, ভবিষ্য-বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি তিনি বলিয়াছেন—"চিন্তা কর কেন? আমি এখনই যাইব না, আমার যাওয়ার দেরী আছে, কর্ম্ম শেষ না করিয়া আমি যাইতেছি না, যখন যাইব, তখন বলিয়া কহিয়াই যাইব।"

দাদার পূর্ব্বের সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া সকলেই বুঝিলেন, তিনি এবার সত্যই চলিয়া যাইবেন; কাজেই দূরান্তরস্থিত পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি সকলকে একত্র হইবার জন্য তারে সংবাদ দেওয়া হইল, সংবাদ পাইয়াই যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, চলিয়া আসিয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

* * *

ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা মন্দ হইতে মন্দের দিকে যাইতে লাগিল। তাঁহার এত বড় সহ্য শক্তি, তথাপি দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে যন্ত্রণার কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। এই অবস্থায়ও তিনি প্রায়ই নিজের নাড়ী নিজে দেখিতেন, আর জিজ্ঞাসা করিতেন—আজ কি বার, কয়টা বাজল্ ইত্যাদি! শুক্রবার তিনি স্পষ্টই বলিলেন—"রবিবার আমার ছুটী, সে দিন আমার শেষ বিশ্রামের দিন!" সে দিনও কি জানি, দাদা প্রকৃতই রবিবার আমাদের ছাড়িয়া চির বিশ্রাম লাভ করিবেন?

চিকিৎসার চরম হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না; অজস্র অর্থ ব্যয় হইল, কিন্তু দাদার গতি ফিরিল না; দাদা যে আজ অনন্ত পথের যাত্রী! কে তাঁর গতি রোধ করিবে? তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত বলিলেন—"কেন আর তোমরা আমার জন্য এত কর? কেউ আর আমায় এবার রাখিতে পারিবে না।"

এই কয় দিন—দিন-রাত্রি তাঁহাকে লইয়া আমরা অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের এমন একজন অকৃত্রিম বন্ধু রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন—তাহা দেখিয়া কোন্ প্রাণে নীরবে সে সব সহ্য করা যায়? শনিবার সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর, তার পর দিন ১৯শে চৈত্র রবিবার আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় (বেলা তখন ২॥টা কি ৩টা হইবে) তাঁর বাড়ীর এক কর্ম্মচারী আমাদের আসিয়া সংবাদ দিল যে কর্ত্তার অবস্থা খুব খারাপ্—আপনারা শীঘ্র চলুন! আমরা এই সংবাদ শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিলাম, গিয়া দেখি দাদা তখন উর্দ্ধনেত্র হইয়াছেন, রীতি মত নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! আমি ভাবিলাম—দেখি এ অবস্থায়ও দাদার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ঠিক আছে কি না! এই ভাবিয়া তাঁহার গায়ে ধীরে হাত দিয়া ডাকিলাম—"দাদা! দাদা! জয় গুরু!" আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মরণোন্মুখ বাহ্যজ্ঞানশূন্য দাদা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলেন "জয় গুরু!" আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল, বুঝিলাম দাদা আমার চির

প্রস্তুত—গৃহস্থ হইলেও দাদা যে আমার **নির্লিপ্ত ব্রহ্মচারী !**

* * *

জাগতিক ও পারমার্থিক আত্মীয় স্বজনে তাঁর চারি দিক পূর্ণ। জাগতিক আত্মীয়গণ তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, আর পারমার্থিক বন্ধুগণ তাঁহাকে এই দেহ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়া অনন্ত-আনন্দে উন্নীত করিয়া দিতে প্রস্তুত ! রীতিমত গীতা-চণ্ডী পাঠ আরম্ভ হইল, তাঁহার শিয়রে বসিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে আমি—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" প্রভৃতি গীতার মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলাম।—বগুড়ার আদি কেশব গোবিন্দ দা সময় বুঝিয়া আবেগময়ী কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারই করুণা-চন্দনে।
কবে ভবেরই সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীগুরু স্মরিয়া—
এ দেহ টলিবে না, পরাণ গলিবে না,
কাহারও আকুল ক্রন্দনে।"

দাদা আমার যেন এই মধুময়ী গীত-সুধা ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন, আনন্দে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা চরমে দাঁড়াইল, আর বুঝি বড় বেশী বিলম্ব নাই, এমন সময় দাদার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ অকুণ্ঠিত প্রাণে অকম্পিত কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"অন্তে স্মরি যেন গঙ্গা নারায়ণ রাম নাম প্রাণ ভরে,
হরে মুরারে—মধুকৈটভারে——"

তারপর আরম্ভ হইল "জয় গুরু" মহানামের বিজয় ধ্বনি। সে সময় প্রায় ৫০ জন লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের মুখেই—"জয়গুরু"। সমকণ্ঠে তালে তালে সেই অভয় ধ্বনি উঠিয়া যেন সেখানের আকাশ বাতাস পবিত্রীকৃত—আলোড়িত করিয়া দাদার যাত্রা-পথের বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া দিল। হাসিতে হাসিতে আমরা দাদাকে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিলাম, দাদাও হাসিতে হাসিতেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। শেষ সময়—দেহের সহিত আত্মার শেষ বন্ধন ছিন্ন করিবার সময়—তিনটী প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, তারপর সব শেষ।* দাদার অবিনশ্বর আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর রাজ্যে প্রয়াণ করিল, কিন্তু তখনও যেন দাদার স্বাভাবিক হাসিটুকু মুখের মধ্যে লাগিয়াই রহিল। তার পর সকলে মিলিয়া মহা-আনন্দে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দূরবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া দাদার দেহ চিতায় তুলিয়া দিলাম, ৩ ঘণ্টার মধ্যে তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

* * *

স্থূল ভাবে দাদাকে আমরা হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু অন্তরে তাঁর ললিত-স্মৃতি চির জাগরূক থাকিবে, তিনি চির দিনই আমাদের হৃদয়াসনে বসিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি পাইবেন।

* ১৯শে চৈত্র রবিবার বাসন্তী সপ্তমী, সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিট।

বর্ষ-শেষে

অনন্ত কাল পারাবারে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত একটী বৎসর মিলাইয়া গেল, সঙ্কীর্ণ মানব-কল্পনার গণ্ডীবদ্ধ সীমারেখায় একটী যতি পড়িল। মহাকালের মাঝে ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, আছে শুধু বর্ত্তমান। অল্প-বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ-চিত্ত মানব আপন চিত্তের পরিমাপ যন্ত্রে কালের পরিমাণ ধার্য্য করিয়া কল্পনার তুলিকায় ভূত, ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া লইয়াছে, অখণ্ডকে খণ্ডের মাঝে——অনন্তকে সান্তের মাঝে আনিয়া ফেলিয়াছে। ইহা মানব-মনেরই কল্পনা প্রসূত, অতএব মিথ্যা। এই মিথ্যার কুহেলী মাখা কালের কঠোর চক্রতলে পড়িয়া গণ্ডীবদ্ধ মন নিষ্পেষিত, চঞ্চলতাবিক্ষুব্ধ, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বাভিঘাতে চির চঞ্চল! ক্ষণের পর ক্ষণ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এমনি করিয়া খণ্ডিত কাল মানব-চিত্তকে আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় দোলাইয়া কোন্ মরীচিকার পানে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে কে জানে? তাই তো দেখি, অতীতের অসহনীয় গ্লানি, মর্ম্মন্তুদ ব্যথা, হৃদয়বিদারী করুণ ক্রন্দন, সকলকে সহ্য করিয়া—উপেক্ষা করিয়াও সে অনাগতের প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকে, ভাবে তাহা বুঝি কত মধুময়! কিন্তু ক্ষুদ্র জীব জানে না, যে ভবিষ্যৎ তাহার নিকট আগত প্রায় বা অদূরবর্ত্তী, সে তাহাকে কি উপহার প্রদান করিবার জন্য সমুদ্যত হইয়াছে—আলো না আঁধার, অমৃত না গরল! তথাপি মানুষ সুখের কল্পনাই করিতে ভালবাসে, অতীতের ব্যথা-বেদনা বিস্মৃতির অতল-তলে চাপিয়া, বর্ত্তমানের দহন প্রশমন করিতে ভবিষ্য-সুখের আলেখ্য রচনায় তৎপর হয়। এমনি করিয়াই সে আশা-নিরাশার আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়, ক্ষুদ্র অহমিকার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বহন করিয়া বৃথা অশান্তির দাবদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

* * *

যে অবস্থায় দেশ নাই, কাল নাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, উদ্বেগ নাই, অশান্তি নাই, আছে কেবল সচ্চিদানন্দ স্বরূপের প্রশান্তিময় অবস্থান, সে অবস্থা যে কত সুন্দর, কত মধুর, তাহা আজ আর আমাদের স্মরণে আসে না, স্মৃতির কোন্ সুদূর পারে সে যে তাহার আসন রচনা করিয়া বসিয়া আছে, তা কে জানে? বহুদিন ধরিয়া বহু অবস্থার মধ্যে নামিতে নামিতে আমরা আমাদের আনন্দময় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি, খণ্ডিত বিকৃত রূপের গণ্ডীতে পড়িয়া নিরানন্দ-সাগরে হাবু-ডুবু খাইতেছি! যেদিন সত্য সঙ্কল্পের সঙ্কল্প মাত্রে লক্ষ কোটী অহঙ্কারের সৃষ্টি হইল, সেদিন হইতেই আত্মচৈতন্যের নিম্নাবতরণের সূচনা, আর আজ সেই আত্মচেতনা ক্রম-নিম্নাভিমুখী হইয়া নামিতে নামিতে আসিয়া পড়িয়াছে এক একটী ক্ষুদ্র সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত জড়দেহে। যে "আমি" ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেই "আমি" আজ লক্ষ কোটী ব্যষ্টি আকার ধারণ করিয়া অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দ স্বরূপে পরিণত!

* * *

লক্ষ কোটী জীবের কণ্ঠ মথিয়া নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে "আমি" "আমি", কিন্তু এ "আমি" কে? কে তার সন্ধান রাখে? এ আমি কি আমাদের এই স্থূল দেহ, না তদপেক্ষা সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতি যাহার আত্মচেতনা যে

স্তরে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, সে সেই ভাবে 'আমি'র স্বরূপ অবধারণ করিয়া এই জাগতিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে। প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান তো কেহ রাখে না, রাখিবার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে না! মায়ার কুক্ষিতলে পড়িয়া গতানুগতিকতার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া 'আমি' 'আমি' করিয়া প্রতিনিয়তই "আমি"র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানতৎপর জীবের 'আমি'কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এত আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি, কিন্তু সে সেই 'আমি'র স্বরূপ জানে না, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? আমরা 'আমি'র জন্যই সব করিতেছি, কিন্তু 'আমি' যে কে তাহা জানি না, আমরা বহির্জ্জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতেছি, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সর্ব্বভাবে সর্ব্বকার্য্যে জড়িত এই "আমি"র সন্ধান রাখি না, ইহা অপেক্ষা আর অজ্ঞানতার পরিচয় কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য দেশবাসী, তথা পাশ্চাত্য পদাঙ্কানুসরণকারী আত্মবিমুখ ভারতবাসী এই 'আমি'র সঙ্গে পরিচিত না থাকিলেও, প্রাচীন ভারতীয়দের কিন্তু এই 'আমি'র সন্ধানেই যুগের পর যুগ কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহারা বিশিষ্টরূপে আত্মস্বরূপের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া সেই সত্য অমৃত বাণী শ্রুতি-স্মৃতির বুকে অক্ষয় ফলকে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিবাবতার ভারত গৌরব আচার্য্য শঙ্কর ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত সেই অমৃতময়ী বাণী নির্ব্বাণষটকে উপনিবদ্ধ করিয়া আত্মহারা সম্বিৎহারা ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে সেদিন গাহিয়া গেলেন—

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদিনাহং—"

'আমি' মন নয়, বুদ্ধি নয়, অহঙ্কার নয়, চিত্ত নয়, শ্রবণেন্দ্রিয় নয়, রসনেন্দ্রিয় নয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নয়, দর্শনেন্দ্রিয় নয়, আকাশ নয়, ভূমি নয়, তেজ নয়, বায়ু নয়, "আমি" শিবময়—মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ!

"আমি" প্রাণসংজ্ঞক পঞ্চ বায়ু নয়, সপ্ত ধাতু নয়, পঞ্চ কোষও নয়, অথবা বাক্-পাণি-পায়ু-উপস্থ ইহাদের মধ্যেও কিছু নয়, "আমি" মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ!

"আমি"র পুণ্য নাই—পাপ নাই, সুখ নাই—দুঃখ নাই, মন্ত্র নাই—তীর্থ নাই, বেদ নাই—যজ্ঞ নাই, "আমি" ভোজনও নয়, ভোজ্যও নয়, ভোক্তাও নয়, "আমি" মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ!

"আমি"র দ্বেষ নাই, অনুরাগ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্য নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, কাম নাই, মোক্ষ নাই, "আমি" মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ!

"আমি"র মৃত্যু নাই, শঙ্কা নাই, জাতিভেদ নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, জন্ম নাই, বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, শিষ্য নাই, "আমি" মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ!

"আমি" সঙ্কল্প বিকল্প বিহীন, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের বিভুরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; "আমি"র বন্ধন নাই, মুক্তি নাই, ভয়ও নাই, "আমি" পরম মঙ্গলময় চিদানন্দ স্বরূপ!

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ সর্ব্বত্র এই "আমি"রই বর্ণনা, এই "আমি" স্বরূপ প্রাপ্তিরই উপায় উদ্ভাবনে ভারতীয় ঋষিগণের জীবনাতিপাত। আবার গীতাকারও 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব-ভূতাশয়স্থিতঃ', "অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ", 'ময়া ততং ইদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা' বলিয়া এই "আমি"র স্বরূপই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ লোকে 'আমি' বলিতে যেমন স্বভাবতঃ স্বকীয় গণ্ড

দেহময় অবস্থাকেই বুঝিয়া থাকে, তেমনি তাহারা মনে করে, শ্রীকৃষ্ণও বুঝি 'আমি' এই শব্দদ্বারা তাঁহার মানবীয় আকার, দেহ ও মন প্রভৃতিকেই বুঝিতেন। আত্মভাবে অথবা ঈশ্বর ভাবে নিয়ত দৃঢ়ভাবে ভাবিত যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ, দেবগণ, ঋষিগণ যে কখনও 'আমি' এই শব্দদ্বারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র খণ্ড দেহস্থ স্বরূপ অথবা মনোময় স্বরূপকে উপলব্ধি করেন না—নির্দ্দেশ করেন না, তাহা সাধারণ জীবের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার! দেহ-মনাদি প্রকৃতি হইতে আত্মা বা আমি স্বরূপ পুরুষ যে স্বতন্ত্র, এক, অব্যয় এবং নিত্য, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। দেহ মন প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে অনন্ত প্রকার ভেদ থাকিলেও "আমি" যে সকল ভূতেই সমান, "আমি"র যে কোন অংশ-অংশী ভেদ নাই, তাহা "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" —শ্রীভগবানের এই উক্তিই সুপ্রমাণিত করিতেছে। নিয়ত আত্মস্থ মহাত্মা কদাচ আপনাকে আত্মা ভিন্ন দেহ-মনাদি রূপে অনুভবই করিতে পারেন না। জীবের মূল ও সত্য উপাদানই হইতেছে ঐ আত্মা। দেহ ও মন ত তাহার অস্থায়ী ও অসত্য উপাদান মাত্র। অথচ সাধারণ জীবের আমি জ্ঞান এই ব্যষ্টিদেহ ছাড়িয়া আর ঊর্দ্ধমুখী উঠিতেই চায় না, ভাবে—না জানি তাহা কোন্ অন্ধকারময় শূন্য স্বরূপ! ভাবে—ক্ষুদ্র হস্ত পদ-বিশিষ্ট সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত মানব আমি—আমি কেমন করিয়া বিরাটের আসন গ্রহণ করিব? —সাকার সাবয়ব ক্ষুদ্র জীব আমি, আমি কেমন করিয়া নিরাকার নিরবয়ব, ব্যাপী বিভুর পদবীতে উন্নীত হইব?

অবিদ্যার কি মোহিনী মায়া! স্বরূপ আমি হইতেই বিচ্যুত হইয়া আত্ম চেতনা নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতে আজ নামিয়া পড়িয়াছে বিরূপ আমিতে—ব্যষ্টি দেহে! এক সত্য আমির আসন আজ অধিকার করিয়াছে বহু মিথ্যা আমি, দেবতার আসনে সুরু হইয়াছে দানবের তাণ্ডব নৃত্য, অথচ এই বিকৃত অবস্থাকেই ভ্রান্ত জীব আপন স্বরূপ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া ভয়ে ভয়ে আত্মস্বরূপ হইতে দূরে থাকিয়া যাইতেছে, আত্মস্বরূপের কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিতেছে।

* * *

যে পথ বহিয়া ধাপে ধাপে আমাদের আত্ম-চেতনা জড় দেহে নামিয়া আসিয়াছে, সেই জড় দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া তিল তিল করিয়া আবার আমাদিগকে আমাদের আত্ম-চেতনাকে ঊর্দ্ধমুখী উঠাইয়া লইতে হইবে, বহির্মুখী বিষয়-বাসনামুগ্ধ চিত্তকে নির্ব্বিষয় অন্তর রাজ্যের অভিমুখে প্রেরণ করিতে হইবে; আর এই ভাবে চেতনাকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া স্বরূপে লগ্ন করাই আমাদের স্ব-ধর্ম্ম, নতুবা আর যত কিছু সব পর-ধর্ম্ম।

* * *

ক্ষুদ্র জীব আপনার ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়, ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিমাপে সকলই পরিমাপ করিতে চায়, তাই তাহার কাছে সব খণ্ডিত হইয়াই দেখা দেয়, অখণ্ডরূপের সন্ধান সে পায় না! যাহারা মুখে বলে স্বাধীন, অথচ স্ব-স্বরূপের সন্ধান না রাখিয়া নিয়ত পর-চর্চ্চায় পর-সেবায় নিরত, প্রকৃত তাহারাই পরাধীন! এই পরাধীনতা—ক্ষুদ্র মন-বুদ্ধি চিত্ত-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয়াদি-পরতন্ত্রতাই পর-ধর্ম্ম, এই পর ধর্ম্মকেই গীতাকার ভয়াবহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ নিম্নাভিমুখী চেতনার গতি এই পর-ধর্ম্মের দিকেই। এই পর-ধর্ম্ম আপাতঃ সুখকর হইলেও পরিণামে তাহা লইয়া আসে অশান্তি, অবসাদ, দুঃখ, শোক, তাই তাহা ভয়াবহ; আর স্বরূপাভিমুখী আত্ম-চেতনার গতিরূপ স্ব-ধর্ম্ম

আপাতঃ কষ্টকর হইলেও পরিণামে তাহা লইয়া আসে পরা শান্তি, আত্যন্তিক সুখ, স্বরূপ-সংস্থিতি, তাই তাহা বরণীয়। যতদিন না আমাদের আত্ম-চেতনা ক্রম উর্দ্ধমুখী উঠিয়া স্বস্থানে স্বরূপে উপনীত হইতেছে, তত দিন দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান নাই, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বাভিঘাতে নিয়ত আন্দোলিত হইবার বিরাম নাই। নিত্য সুখ, নিত্য আনন্দ লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে তাই স্বরূপ-সংস্থিতির সাধনাই জীবনের একমাত্র ধ্যান—জ্ঞান—তপস্যা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* * *

যাঁহারা আত্ম-স্বরূপের সন্ধানকে ভারতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার বলিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারা-প্রসূত কঠোর সাধনলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজিকে উপহাস-কণ্ঠে উড়াইয়া দিয়া, ক্ষণবিধ্বংসী জড় জগতের উন্নতি বিধানে, জড় দেহের সুখ সম্পাদনে আপনাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা উচ্চ কণ্ঠে পর-ধর্ম্ম সেবী বলিয়া ঘোষণা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। জড়বাদীরা এই জড় জগতের চৈতন্য-বিধানে, অসুখময় অনিত্য উপাদানে গড়া এই অনিত্য জগতের সুখময়ত্ব ও নিত্যত্ব সম্পাদনে যতই প্রয়াস পান না কেন, মহাকালের ডমরু ধ্বনিতে একদিন সব রেণু রেণু হইয়া খসিয়া পড়িবেই, মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যে সব চুরমার হইয়া যাইবেই। তাই ভারতীয় ঋষি এই অনিত্য উপাদানে গড়া অনিত্য জগতের সুখৈশ্বর্য্য-বিধানে তাঁহাদের অমূল্য জীবন ব্যয়িত না করিয়া চাহিয়াছিলেন শাশ্বত শান্তি, শাশ্বত সত্য, তাঁহারা পাইয়াছিলেনও তাই। তাই বৈদিক ঋষির কণ্ঠ মথিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—"

"হে অমৃতের পুত্রগণ! কে কোথায় রহিয়াছ ছুটিয়া এস, আমি কোটী সূর্য্য সম প্রভ কোটী চন্দ্র সুশীতল সেই জড়াতীত মহান্ পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি, আমি তাঁহাকে জানিয়া অমৃত হইয়া গিয়াছি, এস তোমরাও এই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া যাও!" এই তো ভারতীয় ঋষির অবদান, বেদনাপ্লুত করুণ হৃদয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন! এই অবদানকেই শ্রেষ্ঠ বলিব, না বর্ত্তমান জড়-সমুদ্র মন্থনোত্থ দিগ্‌দাহী হলাহলকেই শ্রেষ্ঠ বলিব?

* * *

জড় জগতের পশ্চাদ্ধাবন করা ভারতের স্বধর্ম্ম নয়, তাহা তাহার পর ধর্ম্ম; স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা ভগবৎ প্রাপ্তিই তাহার আপন ধর্ম্ম। যতদিন ভারত এই স্বধর্ম্মের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিল, ততদিন সে জগতের মুকুটমণি হইয়াছিল, যে দিন হইতে সে 'স্ব'কে হারাইয়াছে, সেদিন হইতে তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ভারতের জাতির জীবনের লক্ষ্য ইহকাল-সর্ব্বস্বতার দিকে প্রধাবিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কিন্তু ভারত-দেবতার চির আদরের এই ভারতে কেমন করিয়া যে এই সংক্রামক ব্যাধি আসিয়া প্রবেশ করিল, আশ্চর্য্য হইয়া তাহাই ভাবি! কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে ভারতের দেবতা জিজ্ঞাসু ভারতের প্রতীক অর্জ্জুনকে ভারতের এই চিরন্তন স্বধর্ম্ম স্মরণ করাইয়াই বলিয়াছিলেন—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"

'তুমি এই নশ্বর ও দুঃখপূর্ণ স্থূল জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার উপাসনা কর অর্থাৎ অনিত্য অসুখকর এই জড়দেহ হইতে আত্ম-চেতনাকে উপসংহৃত করিয়া নিত্য চেতন স্বরূপ "আমি"তে সংলগ্ন কর।'

* * *

আজ এই বর্ষ-শেষে দেখিতে হইবে, পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, আমরা স্বধর্ম্মের সেবায় কতটুকু আত্মনিয়োগ করিয়াছি। পর ধর্ম্ম অর্থাৎ জাগতিক সুখ-সুবিধা, উন্নতি-শৃঙ্খলাসাধনে কে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, ক্ষুদ্র ব্যষ্টি অহংএর সুখ-দুঃখাভিঘাতে কে কতটুকু লাভ-ক্ষতি-যুক্ত হইয়াছি, তাহা দেখিলে চলিবে না। কারণ পর-ধর্ম্মসাধনে জগতের অন্যান্য স্থানের মানব যতই উন্নত হোক না কেন, কিন্তু ভারতের তাহা স্বধর্ম্ম নয়,—পরঃ পরঃ সদা!

* * *

বাহিরের রাষ্ট্রগত, সমাজগত, জাতিগত, অধিকার-অনধিকার অর্জ্জন-বর্জ্জনে ভারতবাসী যে প্রয়াস করিয়াছে, অন্তর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে—চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের দিকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও করে নাই। বরং এই ধর্ম্মের প্রতিকূলে বহু মত—বহু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবারও প্রয়াস পাইয়াছেন, কোন কোন প্রথিতনামা সাহিত্যিক পর ধর্ম্ম—ইন্দ্রিয় ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া তাহারই জয় গান করিয়া ভারতীয় স্বধর্ম্মকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবারই স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—"ধর্ম্ম মানুষের কল্পনাপ্রসূত একটী খেয়াল বিশেষ, হাওয়ার উপরে তাহার ভিত্তি স্থাপিত, নেশা-খোরের নেশার মত উহা অহিফেন, তাম্রকূট, গঞ্জিকার সম পর্য্যায়ভুক্ত একটী নেশা, সে নেশায় মসগুল থাকিয়া স্বপ্নরাজ্যের বাদশাহ বনা যায়, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার দ্বারা কোনই উপকার আসে না।" বলিহারি সাহিত্যিকের মন্তব্য! স্বরূপ—স্বধর্ম্ম হইল তাঁহাদের কাছে অসম্ভব, আর অবিদ্যা-মায়ার বিকার এই ইন্দ্রিয়গ্রামগ্রাহ্য বস্তুজগৎ হইল বাস্তব! অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি তাঁহাদের জড় বুদ্ধির অতীত অতএব মিথ্যা, আর ইন্দ্রিয়ের সেবালব্ধ ক্ষণিক ভোগ ইন্দ্রিয়গম্য অতএব সত্য—চিরন্তন!

* * *

এই প্রকার স্বাধীনচেতা (?) মানুষে আজ দেশ ভরিয়া গিয়াছে, তরুণদের শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহের সঙ্গে এই ভাবধারা বিজড়িত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাহাদের মতে ভগবান্ অপ্রয়োজনীয়, ধর্ম্ম নিরর্থক, ইন্দ্রিয় সংযম বাতুলতা! জীবনে তাহারা কোনই কাজে লাগে না। ধর্ম্ম বা ভগবৎ প্রাপ্তির খেয়াল নাকি মানুষকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবিধ উপভোগ্য বস্তু হইতে মানুষকে অতর্কিতভাবে ছিনাইয়া লইয়া কোন্ স্থাবরতা নীরাসতার মাঝে স্থাপন করিতেছে! আমরা বলি, স্বাধীন চিন্তার অনুবর্ত্তিতা বা স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অতলে তলাইয়া যাওয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম আর ভগবান্‌রূপ খুঁটিতে আবদ্ধ থাকা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাহারা যদি জীবনকে পঙ্গুও করিয়া রাখে তবুও ভাল, তথাপি অগ্নিশিখাভিমুখী শলভের মত বিদ্যুৎ ক্ষিপ্র চঞ্চল-প্রগতি বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ সে প্রগতি যে জীবনের বিকাশ সম্পাদন না করিয়া বিনাশ সাধন করিবে, অমৃতের স্থলে গরল আনিয়াই জীবনের পাত্র পূর্ণ করিবে তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি, এতদপেক্ষা আধ্যাত্মিক অবনতি বোধ হয় আর ভারতের ভাগ্যে কোন দিন হয় নাই, এত ইহকালসর্ব্বস্ব আত্ম-বিমুখতার ভাব ভারতীয় প্রাণে কোন দিন নামিয়া আসে নাই। আজ এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য ভারতবাসী পূর্ব্বতন ঋষিদের বিকৃত মস্তিষ্ক ঘোষণা করিয়া নিজেদের জ্ঞান-গভীরতা যতই জাহির করুন না কেন, মহাকালের দণ্ডাঘাতে

তাহা একদিন চূর্ণিত হইয়া যাইবেই, এই আসুর ভাবের ধ্বংসে সত্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একদিন হইবেই। সেই সুদিনও বুঝি নিকটবর্ত্তী, তাই নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখার মত অসত্যের অসৎ শক্তি তাহার চরম প্রভাব প্রকাশ করিলেও ইতি-মধ্যেই তাহার অচির বিনাশ-সূচক নিদর্শনরাজিও পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের বুকে যে মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য হইবে, তাহার অগ্রদূতরূপী প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সমূহ ডঙ্কা বাজাইয়া দেশের মাঝে নানা ভাবে যেন সেই বার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে।

সবে মাত্র এই অভিনয়ের আরম্ভ, একদিনেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে না। যত দিন না পর-ধর্ম্মরূপী আবর্জ্জনা স্তূপ নিঃশেষে ধ্বস্ত হইতেছে, যত দিন না অনাত্ম ভাবের ঐকান্তিক বিলোপ সাধিত হইতেছে, তত দিন এ রৌদ্র লীলার অবসান হইবে না, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের বিরতি ঘটিবে না। মহাকালের ঈষদান্দোলিত চরণ-ক্ষেপেই আজ এই দশা, না জানি ডমরুধ্বনিসংযুক্ত পূর্ণ নর্ত্তন দিবসে কি হইবে!

যাঁহারা আত্মবিশ্বাসী—ভগবদ্বিশ্বাসী, তাঁহা-দিগকে বলি, সব সহিয়া যাও, দেশের বুকে মহাকালের যে তাণ্ডব নৃত্যাভিনয় হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও, নীরবে অবিক্ষুব্ধ প্রাণে মহেশ্বরের করুণাকণার ভিখারী হইয়া শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাক, শুভ দিনে শুভ লাভ করিয়া ধন্য হইবে। অনিত্য উপাদানে গড়া অনিত্য জগতের মোহে আত্মচেতনাকে লুপ্ত করিয়া দিও না, অমৃতকে ভুলিয়া মৃতের সেবায় কালাতিপাত করিও না। সমষ্টিগত ভাবে দেশের বুকে পরধর্ম্ম-রূপী যে আবর্জ্জনারাশি আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, এখন তাহার বিনাশ একান্ত প্রয়োজন। এই পুঞ্জীভূত অসত্যের স্তূপ নিঃশেষে ধ্বস্ত না হইলে ত তাহার উপর সত্যের সৌধ গড়িয়া উঠিবে না, পর ধর্ম্মের অন্তরায় থাকিতে ত স্বধর্ম্ম আত্ম প্রকাশ করিবে না! তাই আজ চাই মহাকালের ভীম-নর্ত্তন-সহনোপযোগী অকম্পিত হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা, আগমিষ্য প্রবল ঝঞ্ঝা মাথা পাতিয়া লইবার মত অচঞ্চল প্রস্তুতি!

* * *

বর্ষে বর্ষে পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনের আবাহন করিয়া আসিয়াছি, অসত্য অসুন্দরকে দূরে সরাইয়া সত্য সুন্দরের আগমনগীতি গাহিয়াছি, কিন্তু অবসাদগ্রস্ত ক্ষীণ কণ্ঠের সে আবাহনে চির-নূতনের আসন টলে নাই, সে গীতিকায় সত্য সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে সেই অসত্যরূপী পুরাতনই নূতনের রূপ ধরিয়া, পরধর্ম্ম স্বধর্ম্মের বেশ পরিগ্রহ করিয়া। তাই আমরা পাইয়াছি শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ, অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল!

যে অসত্যরূপী পর-ধর্ম্ম আমাদিগকে এমনি করিয়া মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত ক্ষিপ্র চরণে দিগন্তের পানে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে, জীবন-মরণের আবর্ত্তে ফেলাইয়া আমাদের আত্মচেতনাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কোমল কঠোর মোহ-বাহু হইতে মুক্তি পাইবার জন্য—আজ চাই অকুণ্ঠিত চিত্তে অকম্পিত প্রাণে প্রলয় দেবতার আবাহন, যে আবাহনে মহারুদ্রের আসন টলিয়া যাইবে—তাঁহার দোধূয়মান জটাক্ষিপ্ত অনল শিখায় অসত্যরূপী আবর্জ্জনাস্তূপ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

দিকে দিকে মহাকালের আগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত হোক্, কোটী কণ্ঠে তাঁহার বোধন-গীতি গীত হইতে থাকুক, প্রলয়ঙ্কর ডমরুনাদসহকৃত তাঁহার প্রলয় নর্ত্তনে অসত্য অসুর ভাব সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাক্। তাহা হইলেই অচিরে ভারত দেব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহার বুকে নব গৌরবে নব বর্ষ জাগিয়া উঠিবে।

—×—

সংবাদ ও মন্তব্য

উৎসব-সংবাদ

আগামী ১৪ই বৈশাখ হইতে ১৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয় অত্রত্য আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ষড়বিংশ বার্ষিক মহোৎসব ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম মহোৎসব সম্পন্ন হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্য-দর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহকও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি

গত ফাল্গুন সংখ্যায়ই আমরা ১৩৩০ সনের আর্য্য-দর্পণ সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় বক্তব্য গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন করিয়াছি। বর্ত্তমানে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই বৈশাখের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষ—"আর্য্য-দর্পণ" উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, পোষ্ট বগুড়া, এই ঠিকানায় পত্রিকার বার্ষিক মূল্য (২॥০) অথবা নিষেধ সূচক পত্র প্রেরণ করেন। ১৫ই বৈশাখের মধ্যে যাঁহাদের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধ সূচক পত্রাদি না পাওয়া যাইবে, তাঁহাদের সকলের নামেই নূতন বৎসরের পত্রিকা যথারীতি ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইবে। আশাকরি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণ ঔদাসীন্য বশতঃ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আর্য্য-দর্পণের নূতন নিয়মাবলী

আগামী ১৩৪০ সন হইতে আর্য্য-দর্পণ সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন হইল, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল :—

(১) অতঃপর আর্য্য-দর্পণে অন্তেবাসী (সারস্বত মঠ ও আশ্রমান্তর্গত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী) ভিন্ন অপর সমস্ত লেখকের নামই প্রকাশ করা হইবে।

(২) নাম প্রকাশ করা হইলেও সমস্ত লেখাই সম্পাদকের দায়িত্বে প্রকাশিত হইবে ; সুতরাং প্রবন্ধের কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

(৩) সনাতন ভাবানুকূল ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অবান্তর আলোচনা ইহাতে স্থান পাইবে না। টিকিট ও শিরোনামাযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি আসাম—সারস্বত মঠ, পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট (আসাম) এই ঠিকানায় সম্পাদকের নামে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত পত্রিকা সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়, টাকা-কড়ি, চিঠিপত্র, পত্রিকার অপ্রাপ্তি সংবাদ প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

বিনীত—

কার্য্যাধ্যক্ষ—আর্য্য-দর্পণ

উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, বগুড়া

P.O. Bogra, (BENGAL).